লালকেল্লা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

—পঁয়ত্রিশ টাকা-

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৭০

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও দি শ্রীধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬ হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র পান কর্তৃক মুদ্রিত

ঐতিহাসিক উপন্যাসের রাজ্যে হর্ষবর্ধন

শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্মলহৃদয়েষু

লেখকের অন্যান্য বই ॥

কেরী সাহেবের মুন্সী
অনেক আগে অনেক দূরে
মাইকেল মধুসূদন
রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প
রবীন্দ্র-বিচিত্রা
জোড়াদীঘির উদয়াস্ত
রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ
রবীন্দ্রসরণী
নিকৃষ্ট গল্প
গল্প-পঞ্চাশৎ
ভূতপূর্ব স্বামী
কোপবতী
পদ্মা
সিন্ধুনদের প্রহরী
নীলমণির স্বর্গ
বাংলার কবি
শ্রেষ্ঠ কবিতা
প্রাচীন আসামী হইতে
হংসমিথুন
চিত্র ও চরিত্র
বিচিত্র উপল
বিপুল সুদূর তুমি যে
শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব
শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব
চাপাটী ও পদ্ম
নীলবর্ণ শৃগাল
অমনোনীত গল্প
হিন্দী উইদাউট টীয়ার্স
পূর্ণাবতার
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প
বঙ্কিম-সরণী
বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য
নানারকম
প্রাচীন পারসীক হইতে
মৌচাকে ঢিল
ঋণং কৃত্বা
সানিভিলা (ঘৃতং পিবেৎ)
পরিহাস-বিজল্পিতম
বঙ্গভঙ্গ
গান্ধী জীবনভাষ্য
শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ
কাব্যগ্রন্থাবলী ১ম, ২য়, ৩য়

ভূমিকা

মানুষকে যেমন ভূতে পায় আমাকে তেমনি দিল্লিতে পেয়েছিল। পেয়েছিল বা বলি কেন, দিল্লির ভূত এখনো আমার ঘাড় থেকে সম্পূর্ণ নামে নি। আবার কোনদিন নিশ্চয় কলম হাতে দিল্লির প্রসঙ্গে ফিরে আসতে হবে। কিছুই বিস্ময়ের নেই এতে। দিল্লির কি একটি রহস্যময় দুর্বার আকর্ষণ আছে, যার টানে কালে কালে—পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও আধুনিক কালে—চন্দ্রবংশের নৃপতিগণ, হিন্দুরাজগণ, পাঠান, মুঘল, ইংরেজ ও স্বাধীন ভারতের সরকার দিল্লিতে শাসনের আসন পেতেছে। সেই আকর্ষণে সামান্য একজন লেখকের চিত্ত যে মুগ্ধ হবে এ তো খুবই স্বাভাবিক।

এই উপন্যাসের যথার্থ নায়ক শাহ্‌জাহানাবাদ ও লালকেল্লা। নিজের কথা বলা অশোভন হ'লেও এ প্রসঙ্গে অপরিহার্য। অনেক কাল আগে চাঁদনিচকে একাকী ঘুরতে ঘুরতে আজকার দিনের জনসংঘট্ট হঠাৎ কি ভাবে লেখকের চোখে অনেক যুগ আগেকার জনসংঘট্টে রূপান্তরিত হ'ল, এ যুগের লেখক সেই যুগের একজন পথিকে পরিণত হয়ে গেল। কোন্ অজ্ঞের জাদুমন্ত্রে কালস্রোতের উজান ঠেলে সেকালে গিয়ে পৌঁছলো—সে অভিজ্ঞতা কখনো ভুলবার নয়। দেশকালের এই বিভ্রান্তি অনেক দিন তাকে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় রেখেছিল, এখনো দিল্লিতে গেলে সেইরকম মোহাচ্ছন্ন ভাব পেয়ে বসে। এই অভিজ্ঞতার মধ্যেই লালকেল্লা উপন্যাসের বীজ নিহিত ছিল। ছোট মুখে বড় কথা বলা যদি অপরাধ গণ্য না হয় তবে বলতে পারি, ঐতিহাসিক গীবন একদা রোম নগরীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে দাঁড়িয়ে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের ইতিহাস লিখবার সঙ্কল্প করেছিলেন। বর্তমান লেখক গীবন নয়, আর এই কাহিনীও সেই অমর ইতিহাস গ্রন্থ নয়—তবু গোড়ায় দুয়ে মিল আছে, একই শ্রেণীর অভিজ্ঞতার মধ্যে।

ইতিহাসের উল্লেখে মনে পড়লো সে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের রীতি বর্তমান লেখক অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের

প্রতিভা তো সাধারণ মানুষে সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ভারতীয় ইতিহাস গ্রন্থের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তিন-চারখানা ইতিহাস গ্রন্থের উপরে নির্ভর ক'রে যে ইতিহাসের সত্যে তিনি উপনীত হ'তে সক্ষম হয়েছিলেন তার মূলে তাঁর দিব্য প্রতিভা। এখন ইতিহাস গ্রন্থ সুপ্রচুর, প্রতিভা না থাকলেও নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় যোগে লেখকের পক্ষে ইতিহাসের সত্যে পৌঁছানো একেবারে অসম্ভব নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে রাজসিংহকে একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। তবে পরবর্তীকালে আচার্যগণ তাঁর অন্য অনেক উপন্যাসকেও ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দিয়েছেন। যদুনাথ সরকারের মতে দুর্গেশনন্দিনী ও সীতারামও ঐতিহাসিক উপন্যাস। সেই সঙ্গে ধরতে হবে চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীকেও। দেবী চৌধুরাণী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের নিষেধাজ্ঞা সর্বজনবিদিত। এ বইখানাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে মনে করতে তিনি নিষেধ করছেন। আনন্দমঠ সম্বন্ধেও তাঁর নিষেধবাক্য প্রযোজ্য। কেন না, আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায় এবং দেবী চৌধুরাণীর দেবী ও ভবানী পাঠক ইতিহাস নয়, অতীতের মধ্যে ভবিষ্যতের আরোপ। এই হচ্ছে তাঁর নিষেধবাক্যের তাৎপর্য। তৎসত্ত্বেও যে কাঠামোর মধ্যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে, ভবিষ্যৎকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে নিঃসন্দেহ তা ঐতিহাসিক। চন্দ্রশেখর সর্বাংশে ইতিহাস-সম্মত এবং বইখানা তাঁর একখানি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত প্রক্রিয়াতে বঙ্কিমচন্দ্রের অর্থাৎ ভবিষ্যতের আরোপ দেখবার প্রয়োজন নেই, যেহেতু এক্ষেত্রে তিনি হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানকে অনুসরণ করেছেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টির কৌশলে, কোম্পানীর সঙ্গে নবাবের সম্বন্ধ বিচারে এবং কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীগণের সহিত দেশীয় লোকের সম্বন্ধ বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র যে দিব্যদৃষ্টি দেখিয়েছেন তার ফলেই প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের পদবী লাভ করেছে। তারপরে ঐ পর্ব সম্বন্ধে অনেক ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তবু উল্লেখযোগ্য ভুল আবিষ্কৃত হয় নি চন্দ্রশেখর উপন্যাসে। সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষমতা একটি বিশেষ গুণ। এ পর্যন্ত এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ, একক বললেও অন্যায় হয় না।

তবে কিনা এক হিসাবে সমস্ত উপন্যাসই ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বর্ত্তমানকে অবলম্বন ক'রে লিখলে বলি সামাজিক উপন্যাস, তবে সেই বর্ত্তমান যখন অতীতের পর্যায়ভুক্ত হয় তখন কি তাতে ঐতিহাসিকতার আরোপ হয় না? মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর কালকেতু উপাখ্যানকে কেউ ঐতিহাসিক আখ্যা দেয় না সত্য, কিন্তু বাংলার ষোড়শ শতকের রাজনৈতিক ও সামাজিক তথ্যের ওরকম আকর আর কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস বিষবৃক্ষ অতীতের কুক্ষিগত হয়ে ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করেছে। বিধবা বিবাহ আইন তৎকালে যে সামাজিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল তার বিবরণ পাওয়া যাবে ঐ গ্রন্থে। রাজা-রাজড়ার লড়াইকে যদি ইতিহাসের একমাত্র উপাদান বলে স্বীকার না করা যায় তবে নিঃসন্দেহ যে সব সামাজিক উপন্যাস কালের কুক্ষিগত হয়ে আজও টিকে আছে তাদের এই অর্থে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে গ্রহণ করা উচিত। ঐতিহাসিক উপন্যাস আর কিছুই নয়, কোন বিগত কাল-বিশেষকে বর্ত্তমান বলে উপলব্ধি ক'রে তার তথ্যনিষ্ঠ চিত্রণ মাত্র। অন্ততঃ ঐ নীতিটিই লেখক অনুসরণ করেছে—বর্ত্তমান কাহিনীতে।

কাহিনীর রচনা-নীতি সম্বন্ধে বলা হ'ল, এবারে কাহিনীর বস্তু। সিপাহী বিদ্রোহের একটি ঘটনা কাহিনীর বস্তু। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিক ও রাজনীতিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ব্যাপারটা নবযুগের প্রথম সিংহনাদ বা মধ্যযুগের অন্তিম আর্তনাদ এ নিয়ে ঐতিহাসিক ও রাজনীতিকগণ তর্ক করুন। শিল্পী এ বিষয়ে কোনপক্ষে মতপ্রকাশ করতে বাধ্য নয়। তার যদি কোন সিদ্ধান্ত থাকে তবে ইতিহাস-জিজ্ঞাসুরূপে আছে, শিল্পের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অনিবার্য নয়। শিল্পীর চোখ দেখছে যে সিপাহী বিদ্রোহ (বা যুদ্ধ) উপলক্ষে হিন্দুস্থানে একটা বিরাট ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল আর তার ফলে তারই মধ্যে নিক্ষিপ্ত অগণিত নরনারী দুঃখ বেদনা আর্তিতে ক্ষণে ক্ষণে হাহাকার ক'রে উঠেছে। এই হাহাকারটাই শিল্পীর বস্তু। রাজায় রাজায় চলছিল যুদ্ধ, উলুখড়ের বনে চলছিল বিপর্যয়—এই বিপর্যয়টাই শিল্পীর বস্তু। শিল্পীর দায়িত্ব ইতিহাস বা মতবাদের কাছে নয়—মানবজীবনের নানারঙের ডোরাকাটা ঐ ছবিখানার কাছে। শিল্পীর স্থান রাজা-রাজড়ার পক্ষে নয়, শিল্পীর স্থান আন্দোলিত, বিমর্দিত, বিপর্যস্ত উলুখড়ের পক্ষে। তার একমাত্র দায়িত্ব তাদের জীবন-কাহিনী অঙ্কন। তত্ত্ব নয় মত নয়, চিত্র ও গল্প তার একমাত্র লক্ষ্য। বর্ত্তমান লেখক যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে একখানি চিত্র

অঙ্কন করতে, একটি গল্প বলতে, সিপাহী বা কোম্পানী—কোন পক্ষভুক্ত না হ'তেই চেষ্টা করেছে।

বর্তমান কাহিনীর নায়ক-নায়িকাগণ সকলেই নিতান্ত সাধারণ মানুষ। জীবনলাল, (প্রসঙ্গত বলে রাখি সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে ডায়ারী লেখক মুন্সী জীবনলাল আর এই নায়ক জীবনলাল আলাদা লোক) পান্না, তুলসী, রুমালী, খুরশিদজান, স্বরূপরাম, সরাব মিঞা প্রভৃতি সকলেই সাধারণ ব্যক্তি, কেবল দুঃখভোগের মহিমাতেই তারা অসাধারণ। তারা সকলেই অসহায় ভাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল হিন্দুস্থানব্যাপী ঘূর্ণিপাকের মধ্যে—সেই কাহিনীই বর্তমান গ্রন্থ। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঐতিহাসিক ব্যক্তি থাকে, এ গ্রন্থেও আছে। বাদশা বাহাদুর শা, বেগম জিনৎমহল, জেনারেল আর্চডেল উইলসন, জেনারেল নিকলসন প্রভৃতি অনেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কাহিনীর খাতিরে ঐতিহাসিক চরিত্রের আকৃতি বা রঙ বদলানো উচিত নয়। তথ্য সম্বন্ধেও সেই কথা। "Facts are sacred" কোন সুপরিজ্ঞাত তথ্যের বিকৃতিসাধন অনুচিত। তবে চরিত্র ও তথ্যের প্রবণতা বা তাৎপর্য সম্বন্ধে লেখকের স্বাধীনতা অবশ্যই আছে। বস্তুত এই রকম স্বাধীনতা আছে বলেই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা সম্ভব। ইতিহাসের কাঠামো অবিকৃত রেখে তার মধ্যে কাহিনীর আরোপের কৃতিত্বের উপরে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা নির্ভর করে। সে কৃতিত্বের দাবী বর্তমান লেখক করে না, তবে তার দাবী এই যে, সুপরিজ্ঞাত কোন চরিত্রের বা তথ্যের বিকৃতিসাধন তার দ্বারা হয় নি। প্রয়োজনও হয় নি, কেন না কল্পনার চেয়ে ঘটনার জলুস অনেক বেশি। মানুষের চেয়ে অনেক উঁচুদরের কারিগর ইতিহাস।

ঐতিহাসিক উপন্যাসকে সংক্ষেপে রোমান্স বলে লঘু ক'রে দেওয়ার প্রবণতা কোন কোন মহলের আছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস হ'লেই যে রোমান্স হবে এমন কথা নেই। দুর্গেশনন্দিনী রোমান্স হ'তে পারে, তাই বলে চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ এবং ওয়ার এণ্ড পীস নিশ্চয় রোমান্স নয়। এসব উপন্যাসে জীবনের একটি সম্পূর্ণ ধারণা প্রকাশের চেষ্টা আছে। ঐ জীবন-ধারণার অস্তিত্বের ফলেই এসব উপন্যাস রোমান্সের চেয়ে মহার্ঘতর পদবীতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমান উপন্যাস সম্বন্ধে কোন মহার্ঘতার দাবী লেখকের মনে নেই, তৎসত্ত্বেও খুব সম্ভব একটি জীবন-ধারণা প্রকাশিত হয়েছে কাহিনীটিতে। সে আর কিছুই নয়, মধ্যযুগের খোলস ভেঙে নব্য ভারতের

গরুড়ের আত্মপ্রকাশ। অষ্টাদশ শতকে আরম্ভ হয়েছিল এই প্রক্রিয়াটি। নাদির শা, আহম্মদ শা আবদালি ও ক্লাইভ আঘাত করেছে জীর্ণ খোলসটার উপরে। উনবিংশ শতকে বাংলাদেশে এই প্রক্রিয়া অন্তরূপে দেখা দিয়েছে, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার তন্মধ্যে প্রধান। সিপাহী বিদ্রোহ এই খোলসের উপরে চূড়ান্ত শেষ আঘাত। খোলস বিদীর্ণ হয়ে পড়ে গিয়ে নব্য ভারত "মহৎ ক্ষুধার আবেশ" নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে, তার অগ্নিময় পক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে পুবে পশ্চিমে, চন্দ্রলোক থেকে সুধা আহরণ ক'রে আনবার জন্যে সে উদ্যত। এ কাহিনী মহাকবিদের লেখনীর যোগ্য। বলা বাহুল্য সে শক্তি থেকে লেখক বঞ্চিত। তৎসত্ত্বেও এই কাহিনীর অসম্পূর্ণ খসড়া আঁকতে চেষ্টা করেছে সে, কেরী সাহেবের মুন্সী উপন্যাস সেই চেষ্টারই আর একটি অসম্পূর্ণ উদাহরণ।

অবশেষে আর দু'একটি কথা বললেই ভূমিকার পরিসমাপ্তি ঘটে। কাহিনীর অধিকাংশ পাত্রপাত্রী তরুণ কেন, মন্তব্য করেছেন অনেক পাঠক। অবশ্য প্রবীণ ব্যক্তিও অনেক আছেন কাহিনীতে—তৎসত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে জীবনলাল, গুরবচন সিং, তুলসী, পান্না, রুমালী, খুরশিদজান, সরাব মিঞা প্রভৃতি তরুণ আর কাহিনীটি মোটের উপর তাদেরই নিয়ে। যুদ্ধ বিদ্রোহ স্বভাবতই তরুণদের প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র, তখন প্রবীণরা পিছিয়ে প'ড়ে যায়। কাজেই তরুণের সংখ্যাধিক্য অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। তবে এই সব তরুণকে বিচারের সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে তারা তৎকালীন ইতিহাসের সম্ভাবনাজাত পাত্রপাত্রী কিনা, লক্ষ্য রাখতে হবে যুগবহ্নিতে যে হবির্নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তা থেকে দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মতো এই সব পাত্রপাত্রী জন্মলাভ করেছে কি না! লেখকের ধারণা তাই। এক্ষেত্রে সংখ্যার প্রশ্ন অবান্তর।

কোন কোন পাঠক প্রশ্ন করেছেন যে তোপের মুখে বেঁধে আসামীকে উড়িয়ে দেওয়ার বর্ণনায় লেখক বাড়াবাড়ি করেছেন। ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন যে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে এইভাবেই আসামীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ত। আগেই বলেছি, আর একবার বলা যেতে পারে যে, ইতিহাসের কাঠামো ও ঘটনা সম্বন্ধে আমি নিষ্ঠাবান হ'তে চেষ্টা করেছি, অবশ্য গল্পটা বানাতে হয়েছে। তবে গল্পের খাতিরেও এমন কোন মানুষ বা ঘটনার অবতারণা করি নি যা সেকালে সম্ভব ছিল না।

কাহিনীতে ব্যবহৃত হিন্দিগানের অনেকগুলি, সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীবিজয়-

কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পেয়েছি, তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কাহিনীটিকে প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন বলে দেশ পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অলমতি।

২১-২-৬৪

কাহিনীটির রচনারম্ভ
১লা মার্চ, ১৯৬২

কাহিনীটির রচনা-সমাপ্তি
২রা ডিসেম্বর, ১৯৬৩

লালকেল্লা

প্রথম খণ্ড

"জব ছোড় চলে লখনৌ নগরী"

অবশেষে জীবনলাল সত্য সত্যই পথে বের হয়ে পড়লো। তখন বেলা হবে নয়টা, চৈত্রমাসের রোদে আকাশ ছাপিয়ে গিয়ে এত বড় পৃথিবীটার কানায় কানায় ভরে উঠেছে। লোহার পুলটা দিয়ে গোমতী নদী পেরিয়ে এসে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে লখনৌ শহরের দিকে তাকালো, দেখতে পেলো অর্ধচন্দ্রাকৃতি নদীর দক্ষিণ ধার বরাবর লখনৌ শহরের উচ্চাবচ প্রাসাদমালা। পশ্চিম দিক থেকে শুরু করলে প্রথমেই শিশমহল, তারপর মচ্ছি ভবন, তার পিছনে বড় ইমামবাড়া, আর একটু দূরে এলে রেসিডেন্সি, ফরহাদ বক্শ্ প্রাসাদ, ছত্তর মঞ্জিল, তারপরে মোতিমহল, সাহনজফ, সবচেয়ে দূরে কদম রসুল। প্রথম সারের পিছনে কেসর বাগ, ইমামবাড়া, সেকেন্দ্রাবাগ, নবাব কি কোঠির কতক চোখে পড়ে, কতক আভাসে বুঝে নেয় অভ্যস্ত চোখ। কতবার এই দৃশ্য সে দেখেছে, গোমতীর উত্তর তীরে হাজারিবাগের কাছে দাঁড়িয়ে। আজ আর একবার দেখে নিলো, সে ভাবলো হয়তো এই শেষবার, আর যে লখনৌ শহরে ফিরবে এমন তার ইচ্ছা ছিল না, অন্তত শীগ্‌গীর তো নয়ই। উত্তর মুখে রওনা হওয়ার আগে আরও একবার দৃশ্যটা দেখে নেবার ইচ্ছায় ফিরে তাকালো শহরের দিকে।

নদীতীরের এই দৃশ্য তার মনে এনে দিল নদীতীরের আর এক শহরের ছবি। কতবার সে গঙ্গায় বজরার ছাদ থেকে কাশীর দৃশ্য দেখেছে। সে-ও এমনি, তবু ঠিক এমনি নয়। এখানে শহরটা আর নদীর জল প্রায় সমতল। কাশীতে নদীর জলের মধ্যে থেকে উঠে গিয়েছে সিঁড়ি—উঃ কত উঁচুতে, তারপরে বাড়িগুলো, তাদের উচ্চতাও কম নয়। ঘাটে সিঁড়িতে বাড়িতে মন্দিরে মসজিদে, হ্যাঁ মসজিদও আছে বই কি, হিন্দুরা যার নামকরণ করেছে বেণীমাধবের ধ্বজা - সেও এক অর্ধচন্দ্রাকৃতি দৃশ্য। কতবার তার মনে হয়েছে —সমস্ত শহরটা অনেক উঁচু থেকে যেন ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ছে নদীর জলে। আর এ লখনৌ শহর নদীর তীরে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। কাশীর শহর যদি স্নানার্থী, লখনৌ শহর বেড়াতে বেড়িয়েছে নদীর ধারে। কিন্তু না, বেশি ভাববার সময় তার ছিল না, আম্বালা পৌঁছতে অনেক দিন সময় লাগবে।

তবু কি ভেবে আর একবার এসে দাঁড়ালো লোহার পুলটার উপরে। তিনটা পুলের মধ্যে এটাই সবচেয়ে হালের - এখনো খোদাই করা তারিখ বেশ স্পষ্ট পড়তে পারা যায়। শিশমহলের কাছে যে পুরানো পাথরের পুল আছে সেটা দিয়ে পার হলেই তার পথ অনেকটা কম হতো—অবশ্য ফরহাদ বক্শ্ প্রাসাদের নৌকার পুলের প্রশ্নই ওঠে না, অনেকটা পথ বেশি হাঁটতে হয়, তবে যে লোহার পুলটা নির্বাচন করেছিল- তার কারণ আছে। বছর দুই জঙ্গী বিভাগে, তার মধ্যে শেষ বছরটা আবার রেসালাদার মেজর (Cavalry Officer) পদে কাজ করবার ফলে আগে থেকে পরিকল্পনা স্থির করে কাজ করতে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই লোহার পুলে পার হওয়াটা আকস্মিক নয়, তবে বাস্তব অনুমোদনও যে এমন কিছু আছে তা-ও নয়, ব্যাপারটা নিতান্তই একটা করুণ বিদায়ের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত।

বছর খানেক আগে, না, এক বছরের কিছু বেশিই হবে,—মানসাঙ্কে গণনা করে সে চমকে উঠল—কি আশ্চর্য, পুরোপুরি ঠিক তেরো মাস, সে তারিখটা ভুলতে পারবে না লখনৌ-এর কোন অধিবাসী, অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শা ঐ পুল দিয়েই নদী পার হয়ে লখনৌ পরিত্যাগ করেছিলেন। সে স্থির করেছিল সে-ও যখন লখনৌ পরিত্যাগ করে যাচ্ছে ঐ পুল দিয়ে নদী পার হওয়াই সমীচীন। ওয়াজিদ আলি শার সঙ্গে নিজের তুলনায় হাসিতে তরঙ্গিত হয়ে উঠল সূক্ষ্ম কোমল গোঁফের রেখা। ওয়াজিদ আলি শা-ই বটে। তারপরে ভাবলো তাহলে তুলনাটা আরও একটু টেনে নেওয়া যাক না কেন। তখনই গুনগুন সুরে গান ধরলো—

জব ছোড় চলে লখনৌ নগরী
তব হালে আলি পর ক্যা গুজরী,
মহল মহল মে বেগম রোয়ে,
জব হাম গুজরে দুনিয়া গুজরী ॥

ওয়াজিদ আলি শার বিদায়ের পরে গজলটা লোকের মুখে মুখে ফিরতো, শোনা যায় নবাব নাকি গজলটা তৈরি করে গান করেছিলেন শহর ত্যাগের আগে।

নাঃ, আর ভাববার সময় নেই। জোর করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রওনা হল উত্তর মুখে। ঐ মুখ ফিরিয়ে নিতে বেশ একটু জোর লাগলো। কত দিনেরই বা তার সম্বন্ধ লখনৌ-এর সঙ্গে, নিজ শৈশবের পাঁচ-ছয় বছর আর এদিকে বছর দুই—এই তো। তবু পিতার ইতিহাসকে ধরলে দুই পুরুষ বলতে হয়।

হঠাৎ তার মনে হল এই সামান্য ক'বছরের সম্বন্ধ ছাড়তে যখন এত কষ্ট— চিরকালের জন্য সংসার ছেড়ে যেতে না জানি কত কষ্ট হয়। কথাটা মনে পড়ায় আবার তার হাসি পেলো, সামান্য কারণে এমন কি বিনা কারণে হাসি পাওয়া তার এক রোগ। তখনই আবার হাসি পেলো যখন মনে পড়লো এক রোগের কত রকম ব্যবস্থা। কাশীতে যখন বেনারস কলেজে পড়তো, এই কারণে অকারণে হাসি দেখে অধ্যক্ষ ব্যালেণ্টাইন সাহেব বলতো, I don't like grinning fools! আবার এই হাসি দেখেই লখনৌ-এর চীফ কমিশনার স্যার হেনরি লরেন্স বলতেন, I like smiling faces। ভৈরব কাকা বলেছিলেন, বাবাজীবন, তোমার খুব উন্নতি হবে। হয়েও ছিল তাই। এক বছর নবাবের রেসালায় থাকতে না থাকতে স্যার হেনরি লরেন্স তাকে আনিয়ে নিলেন কোম্পানীর রেসালায়, করে দিলেন রেসালাদার মেজর, দেশী লোকদের প্রাপ্য উচ্চতম পদ। সাহেব ভৈরব চাটুজ্জেকে বলেছিলেন, বেরব, (স্নেহাত্মক নামের বিকৃতি সাধন স্যার হেনরি লরেন্সের এক মুদ্রাদোষ। তাই ভৈরব হয়েছিল বেরব আর জীবন হয়েছিল গীবন)– সাহেব বলেছিলেন—বেরব, আমার কাছে রাখবার উদ্দেশ্যে গীবনকে আমি A D C করে নেবো—কারণ I wish to remain surrounded by smiling faces

জীবন জনতো শেষ পর্যন্ত A D C হবেই, এমন সময় বিদায় চেয়ে বসলো সে।

অনেক কথা মনে পড়ে জীবনলালের। ভৈরব কাকার কথা মনে পড়তেই মৃত্যু সম্বন্ধে মন্তব্যের মূল মনে পড়ে। ওটা ভৈরব কাকার সান্নিধ্যের ফল। তিনি রেসিডেন্সির খাজাঞ্চী হলেও আসলে যোগী পুরুষ। দিনমানটা টাকাপয়সা গুনে যে পাপ করেন সারারাত ধরে জপতপ প্রাণায়ামে চলে তার স্খালন। তখনি মনে পড়ে স্যার হেনরি লরেন্সের কথা। জীবন জানে এই দুইজন ব্যক্তি তার সর্বপ্রকার উন্নতির মূল।

সাহেবের প্রকাণ্ড কক্ষ যখন তখন উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠতো, গীবন, গীবন! জীবন স্যালুট করে এসে দাঁড়ালে সাহেব হেসে বলতেন, nothing in particular, I like smiling faces!

জীবন চলে যেতেই আবার হয়তো আধ ঘণ্টা পরেই ধ্বনিত হতো, গীবন গীবন!

জীবন, এই নাও তোমার পরিচয়-পত্র। এখানা সাধারণভাবে লিখিত—যাতে সর্বত্র ব্যবহার করতে পারো।

জীবনলাল কৃতজ্ঞভাবে বলে—জেনারেল, স্যার, আপনার কাছে আমি ঋণী।

তবে ঋণভার আরও বর্ধিত হোক, এই বলে স্যার হেনরি আর একখানা চিঠি এগিয়ে দেয় জীবনের দিকে।

জীবন চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন করে, এখানা কি? সাহেব বলে, চিঠিখানা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কর্নেল ব্রিজম্যানের নামে। তিনি এখন ঠিক কোথায় আছেন বলতে পারিনে, তবে দিন পনেরো আগে দেরাদুনে ছিলেন, এখনো সেখানেই থাকা সম্ভব।

তবে কি আমি প্রথমে দেরাদুনের দিকেই রওনা হবো?

দেরাদুনের দিকে নয়, মাই বয়, সোজা দেরাদুন যাবে। সেখানে গিয়ে কর্নেলকে না পেলে অন্যত্র সন্ধান করবে। কাজেই আমার পরামর্শ বেরিলি হয়ে দেরাদুনে চলে যাও।

জীবন সবিনয়ে নিবেদন করে, স্যার, কেমন করে পরিশোধ করবো আপনার ঋণ?

জানতে চাও কেমন করে? সর্বদা মুখের প্রসন্নতা রক্ষা করবে, জীবনব্যাধির ওর চেয়ে বড় প্রতিষেধক আর নেই। এই বলে সাহেব চুপ করে।

জীবন চেয়ে দেখে তার মুখ গম্ভীরতর হয়েছে। জীবন ভাবে সাহেবের মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা গভীর বিষাদের উৎস। কিন্তু তার অনভিজ্ঞ দৃষ্টি বেশিদূর চলে না। সাহেব হাত দুটো বুকের উপরে আড়াআড়ি রক্ষা করে পায়চারি করতে থাকে, সেই অবসরে জীবন শেষবার তাকে দেখে। সে লক্ষ করে স্যার হেনরির কপালের প্রকাণ্ড গম্বুজটা চোয়ালের কাছ অবধি নেমে এসে হঠাৎ সরু ছুঁচলো হয়ে গিয়ে চিবুকে এসে যে সূক্ষ্ম বিন্দুটির সৃষ্টি করেছে তা তেমন লক্ষ্যগোচর হয় না, তার কারণ একগুচ্ছ পাতলা সাদা-পাকা দাড়ি। চোখ দুটো সবদা মাটির দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁটে বেড়াচ্ছে। মুখের ভাব সন্দেহ অবিশ্বাস ও অপ্রসন্নতায় মাখানো। এমন লোকের কি

করে সে প্রিয়পাত্র হল ভেবে পায় না। তখনি আবার তুলনায় মনে পড়ে জেনারেল উট্রামের মুখ। মাথাটা মুগুরের মুণ্ডটার মতো নিরেট আর প্রকাণ্ড—অথচ মুখে প্রসন্নতার অভাব নেই। কালো দাড়ি গোঁফে চুলে মাথা গাল চিবুক বেশ ঘের-দেওয়া। সেই কালো ফ্রেমের মধ্যে স্বাভাবিক প্রসন্নতাকে প্রসন্নতর মনে হয়। তার মনে পড়ে যে উট্রামের সঙ্গে পরিচয় সামান্য হলেও ভৈরব কাকার পরিচয়ে তার কাছ থেকেও একখানা প্রশংসাপত্র পেয়েছে সে।

দ্যাখো গীবন, বিদায়ের আগে বন্ধুভাবে তোমাকে একটা পরামর্শ দিই—এই বলে সাহেব হাত দুখানা লম্বা করে তার দুই কাঁধের উপরে রাখে আর সান্নিপাতিক দৃষ্টি তার মুখের উপরে স্থাপন করে বলে—শীঘ্রই একটা প্রকাণ্ড ঝড় উঠবে।

জীবন জিজ্ঞাসা ও প্রত্যয়ের মাঝামাঝি সুরে বলে, গ্রীষ্মের ঝড়!

সে ঝড় নয়, সে ঝড় নয়, মাই বয়।—তার মুখে ফুটে ওঠে একটা হাসির রেখা। গম্ভীরের হাসি মরুভূমির জলের মতোই নির্মল।

অপ্রস্তুত হয়ে গম্ভীর হয় জীবন। নিত্যপ্রসন্নের গম্ভীরতা দাতার কৃপণতার মতোই কৌতুকের বিষয়।

কার্তুজের কথা নিশ্চয় তোমার কানে এসেছে!

ব্যাপারটা তো গুজব।

তার মানে অবাস্তব, এই তো। নিশ্চয় অবাস্তব। কিন্তু গীবন, মেঘে বিদ্যুতে বাতাসে যে প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়, মাটি পাথরের তুলনায় সে-ও তো অবাস্তব।

কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না জীবন।

এমন ঝড় হিন্দুস্থানে আগে আর ওঠেনি।

নীরবতা। তার পরে আবার—

কোম্পানীর রাজত্ব বনিয়াদ সুদ্ধ নড়ে উঠবে।

অপরের মুখে যা অবিশ্বাস্য—সাহেবের মুখে তা প্রত্যয়ের বোধ আনে জীবনের মনে, একটা আশঙ্কার ছায়া খেলে যায় তার মুখে, লক্ষ্য ক'রে সাহেব বলে—না কোম্পানীর রাজত্ব ধ্বংস হবে না, তবে খুব একটা নাড়া খাবে। ব্যক্তিগত বিপদ ও মৃত্যু অবশ্য অনিবার্য।

আবার নীরবতা। তারপরে পুনরায়—

আমার পরামর্শ এই যে কোম্পানীর বিরুদ্ধে কখনো যেয়ো না, তুমি তো জানো

কোম্পানীর গুলি সোজা ছোটে আর আমূল গিয়ে বিদ্ধ হয়।

জীবনের মনে পড়ে খুব ছেলেবেলার কথা। একদিন ফিরতে দেরি হয়ে যাওয়ায় মা জিজ্ঞাসা করেছিল—আজ যে দেরি হ'ল, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

গুমতী নদীর চরে।

গুমতী নদীর চরে ? কি করছিলি ?

লড়াই।

কার সঙ্গে রে ?

কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গে, আমি নবাবী ফৌজের জাঁদরেল।

মা বলে ওঠে, দেখছি একদিন তুই কোম্পানীর গুলিতেই মরবি।

মায়ের ভয় দেখে ছেলে হেসে ওঠে, শুধোয়, কেন বলো তো মা ?

কেন আবার কি! রোজ রোজ তুই নবাবী ফৌজের জাঁদরেল সাজিস, কোম্পানীর ফৌজের জাঁদরেল সাজতে পারিস নে ?

নবাবী ফৌজের পোশাকের ভারি জলুস।

আর কোম্পানীর গুলি যে সোজা ছোটে।

ছুটুক।

ছুটুক কি রে! এখন থেকে স্বভাব যদি না বদলাস তবে কোন্ দিন মরবি কোম্পানীর গুলিতে।

ছেলে বুঝতে পারে না মায়ের ভয়ের কারণ। গুলি যেমনই ছুটুক পোশাকের জলুসটাই তো আসল। তা ছাড়া মৃত্যুটা শিশুদের কাছে তেমন ভয়াবহ নয়, ওরা যে কেবল পেরিয়ে এসেছে জীবনমৃত্যুর সীমানা। বয়সের সঙ্গে মৃত্যুভয় বাড়ে, সীমানাটা ক্রমে দূরে চলে যায় কি-না। বৃদ্ধের মতো মৃত্যুভীতি আর কার ?

আজ স্যার হেনরির কথায় মনে পড়ে সেই অনেকদিন আগেকার ভুলে যাওয়া কথা, চাপা পড়া মাতৃমুখ।

স্যার হেনরি আবার আরম্ভ করে—

জীবন, নবাবী ফৌজ ভেঙে দেওয়ার পরে যখন তোমাকে কোম্পানীর রেসালায় নিয়ে আসি, ইচ্ছে ছিল বরাবর তোমাকে আমার কাছে রাখবো। কিন্তু কলকাতা থেকে হুকুম এসেছে, রেসালার বড় একটা অংশ কানপুরে পাঠিয়ে দিতে হবে। ক্রমে ক্রমে হয়তো সবটাই পাঠিয়ে দিতে হবে, কাজেই তোমাকে তো আর কাছে রাখা সম্ভব হবে না। তাছাড়া তোমার উন্নতির পথে বাধা জন্মাবার আমার কি অধিকার আছে ? বৃহৎ পৃথিবী, বিপুল

কর্মক্ষেত্র, যাও বেছে নাও তোমার আপন পন্থা। God be with ye, my boy!

জীবন আশ্চর্য হয়ে যায়। সে জানতো সাহেবের স্নেহের পাত্র সে, কিন্তু এতখানি স্নেহ ছিল ঐ শুষ্ক লোকটির মনে আবিষ্কার করে সে বিস্মিত হয়ে যায়। শুষ্ক মেওয়া মধুরতর।

আসন্ন দুঃসময়ে তোমার মতো একজন বিশ্বাসী লোক পাশে থাকলে নিশ্চিন্ত হতাম।

আবেগের সঙ্গে বলে উঠল জীবন, যদি ইচ্ছে করেন আমার যাওয়া স্থগিত রাখতে পারি।

নিশ্চয়ই নয়। ভাবাবেগে কোন কাজ করা উচিত নয়। তাছাড়া কে বলতে পারে দূরে গিয়েই তুমি আমাদের বেশি সাহায্য করতে পারবে না?

এবারে বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে মনে করে জীবন স্যালুট করে।

সাহেব বলে ওঠে, ফাঁকা প্রশংসাপত্রের চেয়েও অনেক বেশি দরকারী একটা বস্তু তোমাকে দিচ্ছি, সাবধানে রক্ষা করো।

এই বলে টেবিলের দেরাজ খুলে বের করে আনকোরা একটি নতুন পিস্তল—

এই নাও, এর গুলি সোজা ছোটে আর আমূল বিদ্ধ হয়। কাছে থাকলে অনেক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

কৃতজ্ঞভাবে গ্রহণ করে সাহেবের এই দান। তারপরে পুনরায় স্যালুট করে প্রস্থান করতে উদ্যত হলে সাহেব সাগ্রহে করমর্দন করে জীবনের আর বলে, Keep your face smiling, my boy—মনে রেখো দুঃসময়েই হাসির সর্বাধিক প্রয়োজন। আর শোনো, গিয়েই অবিলম্বে বেরবরাবুকে পাঠিয়ে দিতে ভুলো না।

তারপরে কতকটা যেন নিজের মনেই বলে যায়, বেরবরাবু যদিও জঙ্গী আদমি নয়, তবু আশ্চর্য সাহস আর বুদ্ধি, কাছে থাকলে একশো সৈন্য থাকবার কাজ হয়। জীবন, এমন খুড়ো পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়, এইজন্যে তোমাকে মনে মনে অনেকবার অভিনন্দন জানিয়েছি। যাও, তাকে গিয়ে এখনি পাঠিয়ে দাও।

জীবন জানায়, এখনি পাঠিয়ে দেবে।

জীবন বের হয়ে যায়, সাহেব তাকিয়ে দেখে আর অবাক হয়ে ভাবে ছ'ফুট খাড়াই মানুষটা যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, ইউরোপীয় গড়নের দেহ, হাড়ে মাসে

পেশীতে একবাট্টা, যেমন সতেজ তেমনি সবল তেমনি সপ্রতিভ, আর রঙটাতেও ভারতের মাটির চেয়ে ইউরোপের তুষারের মিল বেশি। সবচেয়ে স্মরণীয় তার হাসিটা। I love smiling faces! এমন সময়ে সাহেব চমকে ওঠে, সম্মুখে ঐ চির-অপ্রসন্ন লোকটা কে?

সাহেবের ছায়া পড়েছে আয়নায়।

॥ ৩ ॥

খাজাঞ্চী- যাগী ভৈরব চাটুজ্জে

সাহেবের কথায় জীবনের মনটা চলে যায় ভৈরব চাটুজ্জের স্মৃতিতে। ভৈরব চাটুজ্জে তার আত্মীয় বা জ্ঞাতি নয়, পিতার বন্ধুত্বের সুবাদে কাকা। ভৈরব চাটুজ্জে ব্রাহ্মণ, জীবনলালরা কায়স্থ। কিন্তু ঐ নিষ্পর ভৈরব চাটুজ্জের চেয়ে তার বেশি আপনার আজ আর কেউ নেই। পর যখন আপন হয় তখন তার মতো আপনার আর কেউ হয় না। ভৈরব চাটুজ্জের কথা ভাবতে গেলেই মনে পড়ে স্যার হেনরি লরেন্সের কথা, আবার স্যার হেনরির কথা ভাবতে গেলেই মনে পড়ে ভৈরব কাকার কথা। এরা দুজনে তার পিতামাতার স্থান অধিকার করেছিল। আপন পিতা-মাতা এখন তার মনে মধুর স্মৃতিমাত্র, তারা যেন দূর আকাশের যুগলতারা, তাদের আলো এসে পৌঁছয়, তাপ পৌঁছয় না। স্যার হেনরি আর ভৈরব চাটুজ্জে তার আকাশের চন্দ্র আর সূর্য, তার দিবা-রাত্রিকে নিয়ন্ত্রিত করছে, তাপ আর আলো দিয়ে সুগম করে তুলছে তার জীবনযাত্রাকে।

কিন্তু না, বসে বসে ভাব-রোমন্থনের সময় নাই, রেসিডেন্সি থেকে ইসমাইলগঞ্জ অনেকটা পথ, পৌঁছে হয়তো দেখবে বেশ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে ভৈরব চাটুজ্জের। রেসিডেন্সির খাজাঞ্চীর চোগা চাপকান অন্তর্হিত, তার বদলে তসরের ধুতি আর নামাবলী উঠেছে যে দেহে—তার কণ্ঠ থেকে বক্ষস্থল নানা আকারের রুদ্রাক্ষের আর নানা রঙের স্ফটিকের মালায় আচ্ছন্ন। হয়তো বা বসে গিয়েছেন আসনে। লখনৌ শহরের সবাই জানে ভৈরববাবু আসনে বসলে বাহ্যজ্ঞান বিবর্জিত হন। সারারাত্রি চলে ধ্যান আর জপ। বছরখানেক আগে ওয়াজিদ আলি শার লখনৌ পরিত্যাগের কিছু পরে একদিন রাত্রে মাঝারি বেগের একটা ভূমিকম্প হয়ে গেলে পরদিন প্রাতে সাহেব ভৈরব চাটুজ্জের ধ্যানের গাঢ়তা যাচাই করবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করেছিল—বেরব,

ভূমিকম্পের সময়ে তুমি কি করছিলে ?

বিস্মিত ভৈরব বলে, ভূমিকম্প ! কখন হলো ?

সাহেব স্থির করে যে বেরব একজন genuino yogi, নইলে এমন তন্ময়তা হয় না। সাহেব ভাবতে থাকে এমন তন্ময়তা উৎপাদন করে কোন্ শক্তিতে। সাহেব আরও একটু বেশি খোঁজ করলে জানতে পারতো প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভৈরব চাটুজ্জে এক ভরি অহিফেন সেবন করে থাকে।

দিনের বেলায় তার অন্য মূর্তি। সূক্ষ্ম হিসাবী, গূঢ় বুদ্ধি, প্রবল কাণ্ডজ্ঞান, আত্মসম্মান ও সাধুতার খ্যাতিসম্পন্ন টাক-টিকিমণ্ডিত কৃষ্ণকায় স্থূলোদর ব্যক্তিটিকে লখনৌ শহরের সকলেই সমীহ করে চলতো। এই সকলের মধ্যে খোদ নবাব ও রেসিডেণ্ট সাহেবও পড়েন। রবিবার দুপুর বেলাটা পুরোপুরি তাকে পেতো জীবনলাল। ঘণ্টা তিন-চার কাকার কাছে বসে পুরানো দিনের গল্প শুনতো জীবন। বাপ-মায়ের কথা, নবাব গাজিউদ্দিন শার কথা, নাসিরউদ্দিন শার কথা, ওয়াজিদ আলি শা আর তার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মোরসার ডি রাসেট সাহেবের কথা। ভৈরব চাটুজ্জে গল্প বলতে জানে বটে, চোখের উপরে ছবি জাগিয়ে তুলতো। আবার কখনও বলতো কাশীর কথা। কেমন করে তার বাপ আর সে নিতান্ত কিশোর বয়সে কলকাতা থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কাশীতে এসে পৌঁছল, কাশী থেকে পরে লখনৌ। একদিন কথা প্রসঙ্গে ভৈরব চাটুজ্জে মন্তব্য করেছিল—দ্যাখো বাবা, অনেক দেশীয় রাজ্যের খোঁজ রাখি, মোটের উপরে বাঙালীরা লখনৌতে ভালোই আছে বলতে হবে।

প্রতিবাদ করে জীবনলাল বলে, কি বলছেন কাকাবাবু, এই তো বছরখানেক আগেও দেখেছি যে ওরা বাঙালীর সঙ বের করেছে। বড়ই ঘৃণা করে বাঙালীকে ওরা।

ঘৃণা নয় বাবা, ঘৃণা নয়।

ঘৃণা নয় ?

না, হিংসা। বাঙালীর বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতিতে এদের মনে হিংসার অন্ত নেই। যাকে এমনিতে ধরতে পারা গেল না, তাকে সঙ সাজিয়ে মনে শান্তি পায় লোকে। দেখ নি ছোট ছেলেরা উড়ন্ত চিলের ছায়াটার উপরে লাঠির আঘাত করে কেমন আনন্দে লাফায় ?

তারপরে একটু থেমে বলে—এখন তবু তো কমে গিয়েছে, আমরা প্রথম যখন আসি বাঙালীর সঙ নিত্যিকার ব্যাপার চলেছে।

কমেছে শুনে খুশী হলাম। সুবুদ্ধি হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

সুবুদ্ধি কি সাধে হয়. ওর মধ্যে অনেক কিন্তু আছে। তবে শোন।

এই বলে তাকিয়াটা বুকের তলে জুত করে টেনে নিয়ে আরম্ভ করে, তবে বলি শোন। আমি প্রথমে যখন আসি, তোমার বাপ বছর কয় আগেই এসেছে, তখন কয়জনই বা বাঙালী ছিলাম এখানে। সংখ্যায় কম হলেও বাঙালীর খ্যাতি কম ছিল না। বাঙালী নাকি জাদুকর। ঘড়ি তৈরি করতেও ওরা, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের মাপজোক করতেও ওরা, ইংরাজী বলতে কইতেও ওরা, জাদুকর না ভাববে কেন? নবাব গাজিউদ্দিনেরও সেই বিশ্বাস ছিল। সে কথা থাক। এখন যা বলছিলাম শোনো। আমরা এসে দেখি বাঙালীর সঙ নিত্যিকার ঘটনা। সন্ধ্যাবেলা বাজারের মধ্যে একটুখানি জায়গা করে নিয়ে আলো জালিয়ে শুরু হয়, প্রথম খানিকক্ষণ নাচ গান চলে, ঢোল করতালে বাজনা চলে, কিন্তু সবচেয়ে জমে ওঠে যখন বাঙালী সঙ দেখা দেয়। একটা লোককে ধুতি-চাদর পরিয়ে বাঙালী সাজায়, উল্টো গাধায় চড়ে সে প্রবেশ করে। তখন এইভাবে প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে: একজন জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে?

সে বলে, আমি বাঙালী?

গাধা উল্টো কেন?

আমাদের দেশে সবই উল্টো।

মাথায় পাগড়ী বা টুপি কিছু নেই কেন?

ভিতরেও কিছু নেই, তাই বাইরেও কিছু নেই।

লখনৌ শহরে কেন?

বেচা-কেনা করতে।

বেচবেই বা কি আর কিনবেই বা কি?

বেচবো জরু, কিনবো গরু।

তখন কি হাসির হররা আর কি হাততালি। তখন দুইজন লোক এসে দুই কান ধরে তাকে গাধা থেকে নামায় আর মারতে থাকে, মারটা অবিশ্যি থিয়েটারে যেমন মারে, আস্তে আস্তে, যতক্ষণ না সে বলে—হামি বাঙালী না আছি। ঐ স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসির হররা আর হাততালি। তখন প্রথম এসেছি, বয়সও অল্প, বেজায় রাগ হতো। অথচ কিছু বলবার উপায় নেই, রুজিরোজগার এ দেশে। তখন একদিন দুর্গাচরণ বাঁড়ুজ্জে, চন্দ্রশেখর মিস্ত্রির আর প্রিয়নাথ মিত্তির আর আমি—সবাই মিলে ভেবে এক

উপায় স্থির করলাম। দুর্গাচরণের মাথায় আসতো নানা রকম প্ল্যান আর গায়েও ছিল তেমনি জোর। একদিন আমরা সবাই মিলে ওদের কাছে গিয়ে বললাম—ভাই, তোমাদের রঙ বড়ই মজাদার, কেবল একটা খুঁত।

বাঙালীর ভালো লাগছে বাঙালীর সঙ, যাতে নিত্য অপমান করা হচ্ছে বাঙালীকে—শুনে ওরা খুব খুশী হল, শুধলো, কি খুঁত?

দুর্গাচরণ বলল—বাঙালী সঙকে যদি বাঙালীর হাত দিয়ে মারাও তবে আসর আরো জমে।

ওরা এক বাক্যে কেয়াবাত কেয়াবাত করে উঠল—বলল এ বাত ঠিক হ্যায়।

দুর্গাচরণ বলল—তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে তবে আমি বাঙালীকে মারতে রাজী আছি।

আপত্তি? বিলক্ষণ, আমরা খুব রাজী।

দুর্গাচরণ বলে, আর সেই সঙ্গে কিছু কিছু বাংলা গান ছাড়বো।

বাহোবা, বাহোবা করে ওঠে ওরা।

ভবানী দীন বলে—এহি তো আচ্ছা বাত, জিসকী বন্দরী বহী নচায়ে।

টীকারাম বলে—বাঙালী আবার গালাগালি জানে নাকি? আমরা তো জানি লখনৌবালার কাছে কেউ নয়।

তাকে থামিয়ে দিয়ে ভবানী দীন বলে—দু-চারটে নমুনা শুনি।

দুর্গাচরণ বলল—প্রথমেই বলবো মারো শালাকে।

শালা সম্বোধন শুনে সমস্ত আসর উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে, ভবানী দীন তো একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে দুর্গাচরণকে—বিস্ময়ে অর্ধ-বিশ্বাসে বলে, আরে ইয়ার, তোমাদের ভাষাতেও শালা আছে?

তদধিক বাক্যব্যয়ের শক্তি তখন তার অন্তর্হিত হয়েছে। দুর্গাচরণ থামবার পাত্র নয়, সে বলে, ইয়ার, এতেই এই, এখনি কি হয়েছে! বলে আউড়ে যায় স-কার ব-কারের নামতা।

বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যে তারা এতই মুগ্ধ হল যে প্রথম দু-চার মিনিট হতভম্ব হয়ে বসে রইল, তারপরে সকলে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে দুর্গাচরণকে কোল দিতে উদ্যত হল। টীকারাম বলল,—ইয়ার এতদিন আমরা ভাবতাম যে বাঙালী বিলকুল বেওকুফ, এখন ভুল ভাঙলো, বুঝলাম যে বাঙালী বহুৎ এলেমদার।

কিন্তু তখন তারা বাঙালীর গুণে এমনি অভিভূত যে বাঙালীকে সঙ

সাজানোর ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে উদ্যত। আমরা দেখলাম সব মাটি হয়। তখন অনেক অনুনয় বিনয় করে বললাম, সঙ বন্ধ ক'রো না, তাহলে তোমাদের দুর্নাম হবে, লোকে বলবে বাঙালীর কাছে ভয় পেয়ে গেলে।

তারা বলল—ঠিক বাত। জৈশা লাঠি ওইসা ভৈঁস। তখনি রাজী হল। কিন্তু জানত না যে, জহাঁ গুল হায় বঁহা কাঁটা ভি হায়।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে পাজি ছিল ছজ্জু সিং। বলে কয়ে তাকে বাঙালী সাজানো হল। আর দুর্গাচরণ সাজলো লখনৌবালা, পাগড়ি থেকে লপেটা পর্যন্ত এমন জমকালো পোশাক পরলো যে, ওয়াজিদ আলি শা বলে মনে হচ্ছিল। আগে উল্টো গাধায় বাঙালী সেজে ঢুকলো ছজ্জু সিং, তারপরে ঢুকলো দুর্গাচরণ। এখনো বেশ মনে আছে তার পোশাকের জলুস দেখে দর্শকদের একজন বলে উঠেছিল, ছছুন্দর কে শির পর চমেলী কা তেল। দুর্গাচরণ গিয়ে ওর কান ধরলে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হল। কান ধরে তাকে হিড়হিড় করে নামিয়ে ফেলল গাধা থেকে, তারপরে আরম্ভ হল মার। দুর্গাচরণ আবার ছড়ির বদলে নিয়ে গিয়েছিল একগাছা শঙ্করমাছের লেজ। সে কি মার। আর দর্শকের কী উল্লাস। একজন খাস বাঙালীকে দিয়ে বাঙালী সঙকে মারানো হবে খবর রটে যাওয়ায় সেদিন ভিড়ও জমেছে বটে। মার, মার, সে কী মার।

মারের ঠেলায় ছজ্জু সিং বলে, বহুৎ হুয়া, আভি ছোড়ো।

কে কার কথা শোনে। মেরেই চলে দুর্গাচরণ। ছজ্জু সিং দেখলো আজ কিছু বাড়াবাড়ি, কিন্তু তখন নিরুপায়, পালাবার উপায় নাই, এক হাতে দুর্গাচরণ তাকে ধরে রেখেছে আর এক হাতে চাবুক চালাচ্ছে। সে হাত জোড় করে আর বলে, ছোড় দো ভাইয়া। দর্শক তখন মেতে উঠেছে, হেঁকে ওঠে—ছোড়ো মৎ, ছোড়ো মৎ! আর দুর্গাচরণই বা ছাড়বে কেন, সে তো মেরে জখম করে ফেলবার উদ্দেশ্যেই গিয়েছে। অবশেষে ছজ্জু সিং যখন মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো দুর্গাচরণ দুই পায়ে চালাতে লাগলো লাথি। সমস্ত আসর হাসছে, আমরা মুখে কাপড় দিয়ে হাসছি, কোণে দাঁড়িয়ে গাধাটা হাসছে—আর সকলের হাসিকে ছাপিয়ে উঠছে ছজ্জু সিং-এর কান্না, গোড় লাগে ছোড় দো।

দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল—বাঙালী মারনে ভি জানতা।

আর কোন উপায় নেই দেখে ছজ্জু সিং পালাবার উদ্দেশ্যে লাফিয়ে পড়লো আসরের মধ্যে। কিন্তু দর্শক তখন ক্ষেপে উঠেছে, ছাড়বে কেন, ধরে ফেলে

আচ্ছা করে কিল চড় ঘুষি লাথ চালাতে লাগলো, মারো শালা বাঙালীকো।
আমরাও আড়াল থেকে বলতে লাগলাম, ছোড়ো মৎ--মারো শালাকো।

বুঝলে বাবাজীবন, সেদিনের কাণ্ড ভুলবার নয়।

জীবন শুধোয়, তারপর ?

তারপর আর বাঙালী সাজবার লোক পাওয়া যায় না ক্রমে বন্ধ হয়ে এল সঙ্ দেওয়া। তুমি বলছিলে ওদের সুবুদ্ধি হয়েছে। সুবুদ্ধি কি সাধে হয়েছে ? গুঁতোর চোটে হয়েছে।

গুড়ুম গুড়ুম দুম।

চমকে ওঠে জীবনলাল। অসম্পূর্ণ গানের পদ বেধে যায় তার কণ্ঠে—জব ছোড চলে লখনৌ নগরী। এতক্ষণ পুরাতন সুখ-দুঃখের মসৃণ স্মৃতির পথে চলছিল মনোরথ, হঠাৎ বন্দুকের গুলির আওয়াজে তা ছিটকে পড়ে। এ পর্যন্ত সে মনের মধ্যে তাকিয়ে চলছিল, এবারে বন্দুকের আওয়াজের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে—

॥ ৪ ॥

অহিফেন রহস্য

ডানদিকে শ দুই গজ দূরে ছোট একটা গ্রাম—সেখানে একটা হল্লা চলছে, জন পঞ্চাশ লোক চড়াও হয়েছে একটা বাড়ির উপরে। কোন পক্ষ বন্দুক চালিয়ে থাকবে, তারই আওয়াজ সে পেয়েছে। জীবনলাল ভাবলো এগিয়ে দেখা যাক কি ব্যাপার। কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময়ে দেখল একটা লোক দৌড়ে তার দিকেই আসছে। লোকটা কাছে এসে জীবনকে দেখে থমকে দাঁড়ালো, সেলাম করে বলল—জীওনবাবু, সেলাম।

জীবন বলল, টীকা সিং, খবর কি ?

এ সেই ছজ্জু সিং-এর পুত্র, বাপের অভিজ্ঞতার সূত্রে সে খাতির ক'রে চলে বাঙালীকে। তারা পরস্পরের পরিচিত।

টীকা সিং বলে, ওদিকে যাবেন না।

কেন বলো তো ?

ভারি হল্লা বেধেছে।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু হল্লা বাধলো কি নিয়ে ?

টীকা সিং বলে, শালা ডাকু লোক চড়াও হয়েছে আফিঙ-গোলার উপরে।

বলো কি! এত ডাকু এলো কোথা থেকে?

বাবু সাব, আফিঙ লুটতে সবাই ডাকু।

সমস্ত ব্যাপারটাই ঠেকে রহস্যময় জীবনের কাছে। শুধোয়, আফিঙ দু'চার পয়সার মাল, লুটতে যাবে কেন?

দু'চার পয়সাই বা বেকার আদমির মিলবে কোথায়?

জীবন বলে, আফিঙ লুট তো আগে শুনিনি।

আগে তো আফিঙের উপর খাজনা না ছিল। শালা কোম্পানীরাজ হওয়ার পরে আফিঙের উপর খাজনা চাপিয়েছে, লোকে না লুটে কি করবে।

জীবন বুঝলো যুক্তি অকাট্য, যুক্তির পথে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে শুধলো, তুমিও লুটতে গিয়েছিলে নাকি? দেখি কতটা লুটলে?

টীকা সিং বলে, রাম কহো, রাম কহো বাবু সাব, আমি লুটতে যাবো কেন? আমি তো কোম্পানীর নোকরি করি, আফিঙ গোলার ঠিকেদারের আমি চাকর।

তবে কি হল্লা দেখে ভেগে পড়ছ নাকি?

টীকা সিং হেসে বলে, জীওন বাবু, পহলে আৎমা তব পরমাৎমা। গোলাতে এক বন্দুক, সেটা আবার ঠিকেদারের হাতে। তাই আমি—

জীবন বলে, বন্দুক না-ই থাকলো, লাঠি ধরলেই পারতে।

কি যে বলেন বাবু সাহেব। মহাৎমা কবীর সাহেব বলেছেন, খেত খায় গদ্‌হা মার খায় জুন্‌হা। শালা ঠিকাদার মারবে নাফা আর আমি ধরবো লাঠি?

জীবন বুঝলো, টীকা সিং চাচা-আপন-বাঁচা পল্টনের লোক। কাজেই কবীর সাহেব বলুন আর না-ই বলুন, ও সরে পড়বেই। বলল, আচ্ছা তুমি যাও, আমি একবার এগিয়ে দেখি কতদূর কি হ'ল?

তার কথা শুনে টীকা সিং দুই হাত জোড় করে, পথ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে বলল, এ কাজ করবেন না বাবু সাব, আপনার পথে আপনি যান, শালা ডাকু আদমির মধ্যে যাবেন না।

জীবন কী যেন ভাবলো, শেষে বলল, আচ্ছা তুমি যাও, আমি যাবো না ওদিকে।

এই বলে বড় শড়কের উপরে আবার ফিরে এলো। দূর থেকে একটা সেলামের খসড়া জানিয়ে পহলে-আত্মা-তব-পরমাত্মা নীতির প্রেরণায় টীকা সিং সোজা ছুটলো লখনৌ শহরের দিকে।

জীবনলাল আবার পথ চলতে শুরু করলো। টীকা সিং-এর মতো চাচা-আপন-বাঁচা নীতির লোক নয় সে, তাহলে তো অনিশ্চিষ্টের মুখে না বের হয়ে জেনারেল লরেন্সের কাছেই থাকতে পারতো। একটা বড় উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছে, এখন ছোটখাটো হল্লার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চায় না সে।

এই ঘটনায় চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল তার। দেখলো বেলা দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি সব এক সঙ্গে এসে চেপে ধরলো ছিন্ন চিন্তার ফাঁক দিয়ে। গোমতীর উত্তর দিকে সে আসে নি, এ দিকটা বেবাক তার অপরিচিত। দক্ষিণ দিকে ফিরে দেখলো লখনৌ শহরের মিনার মসজিদ মঞ্জিলের শেষ চিহ্নটুকু কখন মিলিয়ে গিয়েছে। আর অর্জুন নিম হরতকি বনের মধ্যে দিয়ে সোজা উত্তরে চলেছে তার পথ। কাছোভিতে কোথাও একটা চটি পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করতে করতে চলতে লাগলো সে।

তিন দিন তিন রাত অতিবাহিত হয়েছে তার পথে। দুপুরবেলা চটি পেলে ভালো নতুবা গাছের তলায় বিশ্রাম করে, সন্ধ্যাবেলা খুঁজে নেয় একটা চটি, অভাবে গৃহস্থের বাড়ি। গৃহস্থের বাড়িতে চটির স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, তবে প্রচুর আদর-যত্ন পাওয়া যায়, পয়সাও লাগে না। এ কয়দিনের মধ্যে শহর বলতে কিছু তার চোখে পড়েনি, যেসব গ্রাম চোখে পড়েছে তাদেরও নিতান্ত লক্ষীছাড়া চেহারা। লক্ষীশ্রীর অভাবের কারণ সে এখন বুঝতে পারে, দেশের সমস্ত শ্রী চোলাই হয়ে গিয়ে লখনৌ শহরকে মণ্ডিত করেছে হিন্দুস্থানের বিলাসপুরীতে। জনপদ ক্রমেই বিরলতর হয়ে আসছে। চাষের ক্ষেত বাদ দিলে সমস্ত ভূখণ্ড শাল মহুয়া অর্জুন নিম মহানিমে আচ্ছন্ন। মাঝখান দিয়ে সরু পথ। পথে লোক চলাচল কম, মাঝে মাঝে টাট্টু ঘোড়ার সোয়ার বা দু একখানা একা গাড়ি। সে ভেবে পায় না লোক-চলাচলের অভাব এদিককার স্বাভাবিক অবস্থা, না কোন বিশেষ কারণ আছে? বিশেষ আর কি থাকবে, ভাবে সে। এই সময় পথ চলার জীবনে আর একটা অভিজ্ঞতা ঘটলো, ঐ আকণ্ডগোলা লুটের মতোই, তবে তার চেয়ে অনেক বড়। সেই ঘটনার সঙ্গে মন্তব্য মিলিয়ে নিয়ে খানিকটা বুঝতে পারে দেশের অবস্থা জীবনলাল।

॥ ৫ ॥

খাজনা আদায়ের চিরন্তন পদ্ধতি

নিতান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে সন্ধ্যারাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল জীবনলাল। অনেক রাতে যখন তার ঘুম ভাঙলো খুব খিদে অনুভব করলো, মনে পড়লো

চাপাটি তৈরি করতে দেরি আছে দেখে শুয়ে পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে। উঠে আলো জ্বালিয়ে দেখলো যে চটির যে চাকরটিকে চাপাটি তৈরি করতে বলেছিল, সে খানকতক চাপাটি কিছু ভাজি আর এক লোটা জল রেখে গিয়েছে। মুখ ধুয়ে চাপাটিগুলো খেয়ে, পেট-ভরে জলপান ক'রে আলো নিবিয়ে দিয়ে আবার এসে শুয়ে পড়লো। এবারে আর ঘুম আসে না, না আসবার কারণও আছে, বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়েছে। ঘুম এলো না তবে বন্যার বেগে এলো সারাদিনের ঘটনার স্মৃতি। সারাদিনে যা এলোমেলো-ভাবে ঘটে গিয়েছে এখন তা গুছিয়ে মনের মধ্যে সাজাতে চেষ্টা করলো। বুঝতে পারলো যে সেদিনের আফিঙের গোলা লুট আর আজকার কোম্পানীর তহসিলদারের খাজনা আদায়ের পদ্ধতি এক সুতোয় গাঁথা।

নবাব সরকারের দুর্দান্ত তহসিলদার রঘবীর সিং-এর কাহিনী সে অনেকবার শুনেছে। কোন তহসিলে দীর্ঘকাল অনাদায়ী থাকলে নবাব সরকার থেকে রঘবীর সিং-এর উপরে ভার দেওয়া হতো। নবাবী ফৌজ সঙ্গে ক'রে গিয়ে সে চড়াও হতো তালুকদারের কেল্লার উপরে। এ একটা রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ। পরাজিত না হলে কেউ উপুড়-হস্ত হতো না। যা আদায় হতো তা থেকে প্রথম খরচ-খরচা বাদ যেতো, তারপরে ভাগাভাগি হতো উজির নাজির তহসিলদারের মধ্যে, টাকায় ছ'আনার বেশী জমা পড়তো না নবাব-সরকারে। শেষ পর্যন্ত যখন রঘবীর সিং-এর নিকাশের তলব হলো, তখন সে কেঁচো ফুলে সাপ, সাপ ফুলে ঢোল হয়েছে! নিকাশ দিতে গেলে ফিরে কেঁচো হতে হয়, সেই সঙ্গে দিতে হয় গর্দান। কাজেই সে নবাবের রাজত্ব ছেড়ে কোম্পানীর রাজত্বে সরে পড়লো। নবাবের তহসিলদার প্রত্যেকেই রঘবীরসিং। বিপদের আশঙ্কায় সবাই সরে পড়েছে, যে পারেনি সে ধনেপ্রাণে মারা পড়েছে। এ সব ছিল নবাবী আমলের কথা। কিন্তু কোম্পানীর আমলেও যে পুরানো রীতি চলছে-- ভাবতে পারেনি সে।

গাঁ-টার নাম বন্দীপুর। কাছে আসতেই দেখলো যে একটা মাটির কেল্লাকে ঘিরে দুই পক্ষে রীতিমতো বন্দুক চলছে। তার মনে হ'ল এদের কোন ঘরোয়া হাঙ্গামা হবে, দুই তালুকদারের মধ্যে এমন তো হয়েই থাকে। এগিয়ে যাবে কিনা ভাবছে, এমন সময়ে দেখতে পেলো ইঁদারার ধারে বসে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লোটা মাজছে।

জীবন শুধালো, পাঁড়েজি ব্যাপার কি, কিসের হাঙ্গামা?

পাঁড়েজি তাকে ভালো ক'রে নিরীক্ষণ করে নিয়ে বলল, ও কথা ছেড়ে দিন সাহেব।

তবু শুনি না কী হচ্ছে। তালুকদারের লড়াই নাকি ?

পিতলকে ঘষে ঘষে সোনা করা যায় কিনা পরীক্ষায় রত বৃদ্ধ বলল, আপনার অনুমান আধা সত্য, এক পক্ষে তালুকদার।

আর এক পক্ষে ? শুধোয় জীবন।

মুলুকদার।

বুঝতে না পেরে জীবন বলে, সে আবার কে ?

কোম্পানীরাজ।

কোম্পানীর সঙ্গে লড়াই ! সে আবার কি ? চমকে ওঠে জীবনলাল।

জীবন নীরব বৃদ্ধ লোটা মেজে চলে।

কিছুক্ষণ পরে জীবন বলে, লড়াইটা কি নিয়ে ?

এবারে তত্ত্বদর্শী বৃদ্ধ যে উত্তর দেয় তা 'পৃথিবীর ইতিহাস' নামে যদি কোন মহাগ্রন্থ থাকে তবে তার মলাটের উপরে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য। সে বলে, চিরকাল যা নিয়ে লড়াই হয়ে আসছে—জরু আর গোরু।

জরু তো বুঝি, গোরু এলো কোত্থেকে ?

গোরু বুঝলেন না সাহেব, জিনকো গোধন বোলতা ! তারপরে বৃদ্ধ বলে, সংস্কৃতে যাকে বলে কামিনী-কাঞ্চন। লড়াই তো এই দুই নিয়ে। আর কি নিয়ে কবে লড়াই হয়েছে বলুন সাহেব, রামায়ণ, মহাভারত সব তো এহি।

তবে কি খাজনা আদায় করতে এসেছে কোম্পানীর তহসিলদার ?

এবারে ঠিক সমঝেছেন, সাহেব।

কিন্তু খাজনা দেয় না কেন ?

কেন দেবে ! তালুকদার বলে তালুক তার লাখোরাজ, নবাব সরকারে আধলা কভি নেহি দিয়া। কোম্পানী দলিল দেখতে চায়। এত বয়স হ'ল এমন অদ্ভুত কথা তো কখনো শুনি নি। দলিল আবার কি ? নবাবের জবান দলিল।

অতঃপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যা বলল, সে কথাও 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের' উপরে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা আবশ্যক।

সে বলল, সাহেব, এ হচ্ছে শ্রুতি স্মৃতির দেশ। বেদবেদান্ত পুরাণ ষড়দর্শন সমস্তই তো মুখের কথা আর কালের স্মৃতি। বলুন সাচ বাৎ কিনা ? বেদব্যাসের ভিটায় কি দলিল ছিল, না গৌতম মুনির দস্তাবেজ ছিল। দলিল দস্তাবেজ পাট্টা কবুলিয়ত সব তো এসেছিল মুসলমানদের সঙ্গে, তবু নবাব দলিল দস্তাবেজ দেখতে চায় নি। মুসলমান হ'লে কি হবে, হিন্দুরীতি মান্য ক'রে চলতো। আজ শালা কোম্পানী দেখতে চায় দলিল।

না, পিতল সোনা হওয়ার নয়। লোটা ধুয়ে উঠে দাঁড়ালো বৃদ্ধ।

আজ সকালে কোম্পানীর ছুটো বরকন্দাজ জখম হয়ে গিয়েছে। জৈসী করনী বৈসী ভরনী।

তারপরে জীবনের উদ্দেশ্যে বলল, ওদিকে যাবেন না সাহেব, আপনার কাজে যান।

জীবন বুঝলো সেই ভালো, সে রওনা হতে যাচ্ছে, এমন সময়ে বৃদ্ধ তাকে ডেকে বলল, দেখবেন সাহেব, কোম্পানীরাজ দুদিনে ফৌত হয়ে যাবে। শালা আফিঙচোর সরকার।

জীবনলাল শুনলো আফিঙখোর। বলল, আফিঙখোর! আফিঙ খায় কে?

সবহি লোক খায়। বয়স হ'লে আপনিভি খাবেন। শালা আফিঙচোর সরকার।

তারপরে আফিঙচোর সরকারের বাপান্ত ও ফউত কামনা করতে করতে বৃদ্ধ রওনা হ'ল গাঁয়ের দিকে। দুই পক্ষে তখনো জোর লড়াই চলছে।

ছাখো বাবা উপকার করবার ইচ্ছাটাই সব নয়, উপকার করবার পন্থাটা জানাও আবশ্যক।

ভৈরবের কথার উত্তরে জীবন জানায় নবাবী আমলে এ রাজ্যে বিচার ছিল না, ছিল অত্যাচার আর অন্যায় আর জুলুম। নবাবের না ছিল উপকার করবার ইচ্ছা না ছিল শক্তি, না ছিল পন্থার জ্ঞান।

তবু তো লোকে নবাবকে ছাড়তে চায় নি। অত্যাচারী ওয়াজিদ আলী শার লক্ষ্ণৌ ত্যাগের দৃশ্য তো দেখেছো।

ওটা সাময়িক দুঃখ। সাপে কাটা আঙুলটা কেটে ফেলতেও দুঃখ হয়। সেই রকম দুঃখ।

সাময়িক দুঃখ বলি কি রকমে? এ রাজ্যে এত অত্যাচারই যদি হবে কই লোকে তো রাজ্য ছেড়ে কোম্পানীর মুলুকে গিয়ে বাসা বাঁধে নি!

কিন্তু উল্টো পক্ষে এ কথাও তো বলা যায় যে কোম্পানীর রাজত্ব হওয়ায় সবাই যদি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে, কই তার চিহ্ন তো দেখতে পাচ্ছি না। লোকে তো বিদ্রোহ করছে না।

আজ করছে না বলেই কাল করবে না, কোন কালে করবে না এমন নয়।

কাকাবাবু, রঈস লোকে, তালুকদারে, ফৌজের কর্নেল জেনারেলরা অসন্তুষ্ট হতে পারে, সাধারণ লোকে সুখেই আছে।

বাবা সবচেয়ে দুঃখ সাধারণ লোকেরই।

তাদের দুঃখের কারণ?

কোম্পানী যে আফিঙে হাত দিয়েছে। আফিঙের উপরে ট্যাক্স বসানোয় রাজ্যের প্রত্যেক গরীব গুর্বো চাষা-ভূষোর ঘরে অসন্তোষ আগুন গলিয়ে দিয়েছে। আফিঙ আর নুন গরীবের দুই সম্বল। এ দেশে অন্ন কেড়ে নিলে লোকে এমন অসহায় বোধ করে না, উপবাসে এরা অভ্যস্ত; বস্ত্র কেড়ে নিলেও অসহায় নয়, বিভূতি মেখে লজ্জা নিবারণ করে। কিন্তু আফিঙ! গৃহীর আফিঙ সন্ন্যাসীর গাঁজা—এ দুই যেন কোন রাজা স্পর্শ না করে।

আর নুন?

নুনের উপরেও এরা বসাবে ট্যাক্স। এ কথা জেনো বাবা কোনকালে কোম্পানীর রাজত্বের বিরুদ্ধে যদি বিদ্রোহ করবার দরকার হয় তবে নুন নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

সবাই আফিঙ খাবে এটাই কি ভালো?

ভালো নয়। কিন্তু সবাই যদি আফিঙের ট্যাক্সকে মন্দ ভাবে তবে মন্দ বলেই ধরে নিতে হবে। ঐ যে বললাম, উপকার করবার ইচ্ছাটাই সব নয়—পন্থাটাও জানা আবশ্যক। আবার দ্যাখো, হিন্দুস্থানের কি গরীর কি রঈস আদমি লাখেরাজ, দেবত্র, ব্রহ্মত্র, পীরত্রে অভ্যস্ত। কোম্পানীর রাজত্ব পেয়েই দলিল দাবি ক'রে বসলো। এ দেশের রাজার জবান যে সবচেয়ে বড় দলিল। এরা দলিল দেখাবে কেমন ক'রে।

তাই বলে বিনা স্বত্বে ভোগ করবে?

কার জিনিস ভোগ করছে বলো।

যার জিনিসই ভোগ করুক, খাজনা না হ'লে কোম্পানীর চলবে কি করে?

নবাবের চলতো কি ক'রে?

নবাবের চলতো জুলুম ক'রে।

জুলুম তো এক রকমের নয় বাবা। এই যে ধরো এক কলমের আঁচড়ে নবাবের ফৌজের পঞ্চাশ হাজার সিপাহীকে বরখাস্ত ক'রে ফৌজ ভেঙে দেওয়া হ'ল—এ কি কম জুলুম! বেকার সিপাহীর মতো ভয়ানক বস্তু আর নেই রাজ্যের পক্ষে। প্রত্যেকে একটা চলন্ত কামান।

এ কথা কি সাহেবরা বোঝে না?

কেউ কেউ বোঝে, সবাই বুঝবে এমন ভরসা করা উচিত নয়। তবে বলি শোনো। উট্রাম সাহেব বিদায় নিচ্ছেন, স্যার হেনরি এসেছেন চীফ

কমিশনার পদ গ্রহণের জন্যে। খাস কামরায় দুজনে কথা হচ্ছে। আমি পাশের ঘরে অপেক্ষা করছি, উট্রাম সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন, খবর হলেই ভিতরে ঢুকবো। সাহেবদের মধ্যে কথা চ'লছে, আমার কানে আসছে কথার টুকরো। উট্রাম বলছেন, স্যার হেনরি, তোমাকে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে রেখে যাচ্ছি বলে দুঃখিত।

স্যার হেনরি শুধোলেন, বিপদটা কিসের ?

কিসের নয়।—বললেন উট্রাম। বললেন, একটি সগুপ্রোথিত বিষবৃক্ষের ভার তোমার উপরে দিয়ে চললাম।

বিষবৃক্ষ!—চমকে উঠলেন স্যার হেনরি। তারপরে বললেন, কেন ?

নবাবের ছিল ষাট হাজার সৈন্যের ফৌজ। তার পনেরো হাজার মাত্র রেখে বরখাস্ত করা হয়েছে পঁয়তাল্লিশ হাজার সিপাহীকে। এদের রুজি-রোজগার গেল, নবাবী ফৌজে থাকাতে লোকচক্ষে এদের যে মান-সম্ভ্রম ছিল তাও গিয়েছে। এই বেকার সিপাহীদের প্রত্যেকে কোম্পানীর উপরে অসন্তুষ্ট।

স্যার হেনরি বলেন, এত বড় ফৌজ রাখবার তো কারণ নেই। তাছাড়া কোম্পানীর নিজেরই আছে হাজার হাজার সিপাহী।

সেটাও বিপদের আর একটা মস্ত কারণ।

কেন বলো তো ?

উট্রাম বলেন—কোম্পানীর ফৌজের অধিকাংশ সিপাহী, যাদের বলা হয় পুরবিয়া, এই অযোধ্যা রাজ্য থেকে সংগৃহীত। পঁয়তাল্লিশ হাজার সিপাহীর এরা সবাই kinsman। এদের অসন্তোষ কোম্পানীর ফৌজের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। দুই পক্ষের মধ্যে চালাচালি হয়েছে এমন অনেক চিঠি আমার হাতে এসেছে যা থেকে বুঝতে পেরেছি, ওদের নোকরি গিয়েছে আমাদেরও থাকবে না—এ সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে সকলেরই মনে।

স্যার হেনরি সমর্থন জানিয়ে বলেন, এমন হয়ে থাকলে বিপদের কথা বটে।

বিপদের উপরে বিপদ—আবার ঐ accursed চবি-মাখা কার্তুজের ব্যাপার।

ওটা অবশ্যই fiction!

অবশ্যই fiction! স্যার হেনরি তুমি অভিজ্ঞ লোক, তোমাকে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। বহুজনের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই fiction

স্থানগ্রহণ করে fact-এর। বিচারে নামলে প্রমাণ হবে যে চর্বি মাখানো কার্তুজ mare's nest-এর মতো অসম্ভব। কিন্তু বিচারে বসছে কে? অন্ধবিশ্বাসের হাওয়া উঠেছে, আগুন কতদূর ছড়াবে কে জানে! সেইজন্যেই প্রসন্নমনে বিদায় নিতে পারছি না। তবে ভরসা এই যে, তোমার মতো বিচক্ষণ কাণ্ডারীর হাতে ভার দিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

ভৈরব চাটুজ্জে থামলে জীবন বলে, আচ্ছা কাকাবাবু, জেনারেল উট্রাম আর স্যার হেনরি দুজনেই প্রধান রাজপুরুষ। এঁরা যখন বিপদ বুঝছেন তখন প্রতিকার করেন না কেন?

বাবা এ নবাবী মুল্লুক নয়। নবাব বললেন—উসকো শির লাও। গেল মানুষটা। আবার নবাব বললেন—উসকো তালুক দো। হ'ল সে তালুকদার। নবাবের ইচ্ছাধীন নবাবী শাসন।

আর কোম্পানীর শাসন?

ব্যক্তিগত ইচ্ছার স্থান নেই তাতে, সমস্ত আইনের অধীন। এরা যত বড়ই হোন, একক কিছু করবার ক্ষমতা নেই এঁদের। তুমি তো ইংরেজী পাটীগণিত পড়েছ। সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক মনে পড়ে? ধাপে ধাপে উঠতে হবে, এক ধাপ ডিঙিয়ে যাবার উপায় নেই। গাঁয়ের চৌকিদারটা থেকে বড়লাট অবধি ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে। ধাপ ডিঙোতে গেলে কি, ভুল করলে।

জীবন বলে, তবে তো ধাপ উঠতে উঠতেই কেল্লা ফতে।

কেল্লা ফতেই হোক আর কেল্লা গড়াই হোক, ধাপ ডিঙোবার উপায় নেই।

কত কথা মনে আসে জীবনলালের। আশ্চর্য হয়ে যায় এমন ক'রে কে এগুলো সাজিয়ে রেখেছিল মনের মধ্যে। চিন্তার জোয়ারের বেগে ঘুম পালিয়েছে, গরম লাগে, পিরান খুলে ফেলতেই গলায় দুলে ওঠে রূপোর সরু শিকলিতে বাঁধা সোনার তক্তিটা। এটার কথা এ কয়দিন ভুলেই গিয়েছিল। চমকে ওঠে সে। চিন্তার ধারা আবার বইতে শুরু করে নূতন খাতে।

॥ ৬ ॥

তুক না তাক

জীবন উঠে বসে বাতি জ্বালায়, তারপরে গলা থেকে তক্তিটা খুলে এক দৃষ্টে তাকিয়ে দেখে, না জানি কি রহস্য আছে এর মধ্যে নিহিত। এক ইঞ্চি চওড়া, দু' ইঞ্চি লম্বা, পুরুতে আধ ইঞ্চির কম তক্তিটার দু'দিকেই আগাগোড়া

সূক্ষ্ম কাজ করা পাতলা সোনার পাতে মোড়া, একদিকে ইংরেজি অক্ষরে খোদাই করা "২৮-শে আগস্ট, ১৮৫৭ সাল", আর একদিকে ইংরেজিতে লিখিত জীবনলাল; ভালো ক'রে দেখলে তবে নজরে পড়ে। ছোট ছেলেদের গলায় অনেক সময়ে যেমন তক্তি ঝুলিয়ে দেয়—বাইরে থেকে দেখতে সেইরকম। ভিতরে কী আছে ভাবে জীবন। লখনৌ থেকে বিদায়ের ঠিক পূর্বে যখন সে ভৈরব চাটুজ্জেকে প্রণাম করতে গেল, ভৈরব বললেন, একটু বসো বাবা। এই বলে তিনি শয়নগৃহে গিয়ে সিন্দুক খুলে বের ক'রে নিয়ে এলেন তক্তিটা, বললেন, গলায় পরো। এই বলে নিজেই গলায় রূপোর শিকলি এঁটে দিয়ে বুকের উপরে ঝুলিয়ে দিলেন।

জীবন ভাবলো এটা বোধ হয় রক্ষাকবচ জাতীয় কিছু হবে, অনির্দেশের মুখে বের হচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন পিতৃস্থানীয় গুরুজন পরিয়ে দিলেন গলায়। সময়োচিত কিছু বলা কর্তব্য মনে ক'রে জীবন বলল, ভালই হ'ল, যে পথে বের হচ্ছি, সঙ্গে দেবতার আশীর্বাদ থাকা ভালো।

একটু চিন্তা ক'রে নিয়ে ভৈরব বললেন, হ্যাঁ, দেবতার আশীর্বাদ বইকি, সকল দেবতার বড়।

খট্‌কা লাগে জীবনের মনে।

ভৈরব বলেন, তোমার পিতার মৃত্যুর সময়ে তুমি কাছে ছিলে না। সময় হয়ে এসেছে বুঝতে পেরে নবীন বলল, ভৈরব, জীবনকে আসতে লিখেছ বটে, কিন্তু বোধ হচ্ছে, এসে পৌঁছবার আগেই আমাকে যেতে হবে। বলল, আমার স্থাবর অস্থাবর যা আছে তুমি সব জানো, তাকে বুঝিয়ে দিয়ো। আর নিজ হাতে তাকে এইটি দিয়ো—এই বলে বালিশের তলা থেকে বের করলো তক্তিটা। তারপরে একটুখানি মৃদু হেসে,—নবীনের সেই হাসিটা তুমি পেয়েছ, মন্তব্য করলো, কখন ডাক আসে কে বলতে পারে, তাই হাতের কাছেই সর্বদা রেখেছি। এই বলে আমার হাতে তুলে দিল তক্তিটা।

অধীর কৌতূহলে জীবন জিজ্ঞাসা করলো, কাশী থেকে দু' বছর হ'ল এসে পৌঁছেছি, এতদিন কেন দেন নি কাকাবাবু?

তারপরে বলল, রাগ করবেন না কাকাবাবু, বাবার হাতের শেষদান কিনা, তাই বলছি।

রাগ করবো কেন বাবা! এমন ভাবা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এতদিন না দেওয়ার কারণ অবশ্য আছে। এ দু' বছর কাছে কাছেই ছিলে তাই দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি নি। আজ বিদায় নিচ্ছ বলে দিলাম, নতুবা

আরো কিছুদিন না দিলেও চলতো।

রহস্য ঘনতর হয় জীবনের মনে, শুধোয়, বাবা কি দেওয়ার তারিখ বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন ?

দেওয়ার তারিখ নয়, এটা খুলবার তারিখ, এই বলে তিনি তক্তিটা উল্‌টিয়ে তুলে ধরেন তার চোখের সম্মুখে, শুধোন, দেখতে পাচ্ছ কিছু ?

কই, না !

খুব ঠাহর ক'রে ছাখো তো।

এবারে জীবন বলে, হ্যাঁ, কি যেন লেখা রয়েছে।

ঠিকই ধরেছ।

জীবন পড়ে ফেলে, "২৮শে আগস্ট, ১৮৪৭ সাল।" তারপরে শুধোয় হঠাৎ, এ তারিখটার অর্থ কি ?

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নবীন বলল, ওটা জীবনের জন্ম-তারিখ।

ভৈরবের কথায় বাধা দিয়ে জীবন বলে ওঠে, আমার জন্ম তারিখই তো বটে, বাবার মুখে অনেকবার শুনেছি, তিনি সর্বদা ইংরাজী সন তারিখ ব্যবহার করতেন।

ঠিকই শুনেছ। আমি ভাবলাম, তক্তিটা বুঝি জন্মদিনের আশীর্বাদ। বললাম, বেশ তাকে দেবো।

নবীন বলল, শুধু দিলেই চলবে না, বলো যে ঠিক ঐ তারিখে তক্তিটা ভেঙে ভিতরে যে কাগজ আছে সেটা যেন পড়ে। আমার নিজের হাতের লেখা। শুধোলাম, কী আছে জানতে পারি কি ? সে বলল, সে কথা আর শুধিয়ো না, সেটা শুধু জীবনের কানের জন্যই। বলল, পাছে ভুল হয় তাই খোদাই করে দিয়েছি, ঐ তারিখে জীবনের বয়স একুশ বৎসর পূর্ণ হবে। বলল, পড়া হলে কাগজ টুকরো যেন ছিঁড়ে ফেলে দেয়—আর সোনাটুকু রেখে দেয় যেন, যখন বিয়ে করবে বউয়ের কানপাশা গড়িয়ে দিলে খুশী হব। ভাবলাম অবসরমতো আর একবার ভালো করে শুধিয়ে ভিতরের রহস্য জেনে নেবো। কিন্তু হঠাৎ সেই রাত্রেই তার ডাক পড়লো। শেষ রাতে তুমি এসে পৌঁছলে মাতুলালয় থেকে।

জীবন স্তব্ধভাবে বসে থাকে, সেই শোকাবহ দৃশ্য আর একবার অভিনীত হয়ে চলেছে তার মনে।

ভৈরব বলে, ভেবেছিলাম তক্তিটা যখন খুলবে তখন জেনে নেবো কী লেখা আছে। কিন্তু দেখছি তা হয়ে উঠল না। এটাকে সর্বদা সযত্নে রক্ষা করবে,

গলায় ঝুলিয়ে রাখাই সবচেয়ে নিরাপদ।—তারপর পিঠের উপরে বাঁধা ফৌজী থলিটাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, ও তোমার থলি-ঝুলি আদৌ নিরাপদ নয়। পথে ঘাটে চোর-ছ্যাচড়ের দৃষ্টি সকলের আগে পড়বে ঐ তোমার থলির দিকে। দেখো, বাবার কথার যেন অন্যথা না হয়—এই বলে তিনি প্রণত জীবনকে আশীর্বাদ করলেন।

জীবন প্রণত অবস্থাতেই বলল, বাবার, আপনার—কারো কথার অন্যথা হবে না নিশ্চয় জানবেন।

তখন দুজনেরই মনের যে অবস্থা, অধিক কথা বলবার উপায় ছিল না কারো। চোখের জলে মেয়েরা সুন্দর, পুরুষে বিব্রত।

কিন্তু বেশি ভাববার সময় থাকে না, ভোর হয়ে আসে, যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। হাত মুখ ধুয়ে দাম চুকিয়ে দেয়। তারপর পোশাক পরে ফৌজি থলিটা পিঠের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধে, তাতে ভ'রে নেয় খানকতক চাপাটি আর একটু গুড়। স্যার হেনরি লরেন্সের দেওয়া পিস্তলটা পেটির মধ্যে ভ'রে কোমরবন্ধের সঙ্গে বাঁধে, হাতে নেয় পাকা বাঁশের লাঠিখানা, চটিদারকে সেলাম জানিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে জীবনলাল। এ হচ্ছে গিয়ে তার নিয়মিত উদ্যোগপর্ব—ক'দিন এই একভাবে চলছে।

চটিদারের কাছে খবর সংগ্রহ করেছে আর দিন তিনেকের মধ্যেই বেরিলি পৌঁছনো যাবে। চটিদার লোকটি বেশ মোটাসোটা গোলগাল, চটিদারের যেমন চেহারা হওয়া উচিত তেমনি। সকলেরই আস্থাভাজন। সংসারে মোটা লোককেই সকলে সহজে বিশ্বাস করে, ওদের ভরা পেট কিনা, ঠকিয়ে নেবার প্রয়োজন কম।

চটিদার শুধিয়েছিল, বেরিলিতে কেন সাহেব? আপন লোকজন আছে?

কর্নেল ব্রিজম্যানের কথাটা চেপে গিয়ে বলল, সাহেব, কোম্পানীর ফৌজে চাকুরির আশায় যাচ্ছি।

কোম্পানীর ফৌজে! তার বিস্ময় চাপা থাকে না, বেরিয়ে পড়ে ঐ দুটি শব্দে। আবার বলে, কোম্পানীর ফৌজে!

তার বিস্ময়ে বিস্মিত হয়ে জীবন শুধোয়, ক্ষতি কি?

ক্ষতি আর কি? কোম্পানীর ফৌজের মতো সুখের চাকুরি আর কোথায় আছে? কিন্তু বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। তার চেয়ে বরঞ্চ—

কথাটা শেষ করে না, এদিক ওদিক তাকায়।

জীবন শুধোয়, তার চেয়ে বরঞ্চ কি বলুন ?

চটিদার সে কথার মধ্যে না গিয়ে বলে, সাহেব, আপনাকে দেখে তো রঈস আদমি মনে হচ্ছে, আপনাকে বলতে আর ক্ষতি কি—এই বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে কুলুঙ্গি থেকে চারখানা ছোট ছোট চাপাটি বের করে।

জীবন বলে, আমি তো খান আষ্টেক চাপাটি নিয়েছি, আমার আর দরকার নেই।

সাহেব, এ খাওয়ার জন্যে নয়, সামনের গাঁয়ে পৌঁছে দেবার জন্যে।

কাকে পৌঁছে দিতে হবে ? আমি তো কাউকে চিনি না !

সে আপনাকে চিনে নেবে।

তা কেমন ক'রে সম্ভব ? আমি না চিনলে সে চিনবে কেমন করে ?

বাতলে দিচ্ছি সাহেব। গাঁয়ে ঢুকলে যদি কোন লোক আপনাকে দেখে বলে ওঠে "জিন ঢুঁঢ়া তিন পাইয়াঁ, গহরে পানি পৈট" আপনি তার উত্তরে দোঁহার বাকি ছত্রটা বলবেন। "ম্যঁায় বৌরি ঢুঁঢ়ল গয়ী, রাই কিনারে বৈঠ।" অমনি দুজনে জানপয়চান হয়ে যাবে। তখন সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, "দো চার", আপনি তখন চাপাটি চারখানা তার হাতে দিতে দিতে বলবেন, "হাম লাচার।" চাপাটি দিয়েই জোর কদমে হেঁটে চলে যাবেন. পিছনে তাকাবেন না, কিংবা সে গাঁয়ে বিশ্রাম করবেন না।

জীবন অবাক হয়ে যায় ব্যাপারটা শুনে, বুঝতে পারে না রহস্য। তখনি অবশ্য মনে পড়ে যে, গ্রামাঞ্চলে এইভাবে বেমার চালান দেওয়ার একটা তুক প্রচলিত আছে বটে। শুধোয়, আপনাদের গাঁয়ে কি বেমার আছে ?

চটিদার বলে, বড় ভারি বেমার সাহেব। এই বলে একটু মুখ টিপে হাসে, সেটা জীবনের চোখ এড়িয়ে যায়।

তখন চটিদার ছড়াটা বার কয়েক আবৃত্তি করিয়ে মুখস্থ করিয়ে দেয় জীবনকে, সতর্ক ক'রে দেয়, সাহেব চাপাটি দিতে ভুলে গেলে, বেমার আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাবে, হুঁশিয়ার থাকবেন, ভুল যেন না হয়।

ভুল হবে না জানিয়ে রওনা হয়ে যায় জীবন।

চটিদার বলে, এই ভগেলু, কে গেল জানিস ?

ভগেলু আটা ঠাসতে ঠাসতে বলে, একটা আদমি।

চটিদার একটা সরু পালক দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে বলে, একটা গদ্ধা।

কর্তব্যনিষ্ঠ ভগেলু মুখ তোলে না, বলে, পোশাক-আশাক তো রঈস আদমির মতোই।

তবে রঙ্গীন গন্ধা। এদের মতো বুদ্ধু লোক দিয়েই আমাদের কাজ হাসিল হবে।

আটায় আর একটু জল দিতে দিতে ভগেলু উত্তর দেয়—"অকেলা চনা ভাড় নহি ফোড়তা।"

কণ্ডুয়ন-সুখে-নিমীলিত-নেত্র চটিদার বলে, তুম ভি বুদ্ধু। শোনো নি কি—"রোজ রোজ রগড় সে পত্থর ভী ঘিস জাতা হ্যায়।"

সর্বশক্তিমান প্রবাদের শক্তিতেও প্রত্যয় জন্মায় না ভগেলুর মনে, মুখ তুলে নীরব জিজ্ঞাসায় তাকায় মনিবের দিকে। মনিব পালকটা সযত্নে রেখে দিয়ে বলে, তবে বুঝিয়ে দিই শোন।

এই বলে সে রামচরিত-মানসের একটা শ্লোক আবৃত্তি করে।

রহা না নগর বসন ঘৃত তেলা।
বাঢ়ী পুঁছি কীন্হ কপি খেল ॥
কৌতুক কহঁ আয়ে পুরবাসী।
মারহি চরণ করহি বহু হাঁসী ॥

তারপরে জিজ্ঞাসা করে, কি বুঝলি বল?

ভগেলু বলে, হনুমানজী লঙ্কা দহন করলেন।

বাহবা! কি দিয়ে দহন করছেন!

মহাবীরের লেজ দিয়ে।

বাহবা! কিন্তু লেজ কি মহাবীর?

দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে ভগেলু বলে, মহাবীর তো পরমাত্মা।

বাহবা, বাহবা! লেজ তো একটা মাংসের রস্‌সি, না আছে তার আঁখ, না আছে তার হাত, না আছে তোর মতো এত বুদ্ধি, না আছে আমার মতো আত্মা, তবু তাই দিয়ে তো লঙ্কাকাণ্ড ঘটালো পরমাত্মা। ঐ আদমিটার মতো,—তখনো দূরে দেখা যাচ্ছিল জীবনকে,—লোককে দিয়েই কোম্পানীর সোনার লঙ্কায় অগ্নিকাণ্ড ঘটাবে পরমাত্মা!

অবোধ ভগেলু তবু শুধোয়, পরমাত্মা কে?

চটিদার বিস্ময়ে ক্ষোভে বলে ওঠে, ওরে ভগেলু, তুই যে একেবারে বুদ্ধু বনে গেলি। এমন মর্মান্তিক অভিযোগেও চৈতন্যোদয় হয় না তার, অবুঝ দৃষ্টিতে সে তাকিয়েই থাকে মনিবের দিকে। চটিদার দেখে যে, রূপকে বুঝবার লোক নয় ভগেলু, নগদ টাকা ছাড়া ও খুশী হবে না। তখন বলে, মনে নেই ক'দিন আগে লখনৌ গিয়েছিলি কাকে দেখতে? হাতীতে চেপে এসেছিল কানপুর

শহর থেকে—

এবারে ভগেলুর চোখে প্রত্যয়ের আলো জলে ওঠে, সোৎসাহে বলে, নানা মহারাজ।

খুব হয়েছে, নে এখন কাজ কর।

ভগেলু আটার তালের উপরে প্রবলবেগে মুষ্ট্যাঘাত চালাতে চালাতে গান ধরে—

"অবধ মে রানা ভয়ো ময়দানা
পহলো লড়া ভই বক্সর মে,
সিমরি কে ময়দানা,
অবধ মে রানা ভই মরদানা
তবৈ লাট ঘবড়ানা।"

চটিদার ডাক দিয়ে বলে, ওরে মরদানা, থালাথানা বক্সরের ময়দান নয়, ভেঙে ফেলবি যে।

কে কার কথা শোনে, অনেক চেষ্টায় একটা স্থূল কথা বুঝতে সক্ষম হয়েছে, প্রবলতর বেগে ঘুষি চালাতে চালাতে অধিকতর উৎসাহে সে গেয়েই চলে—

"অধম মে রানা ভয়ো মরদানা
তবৈ লাট ঘবড়ানা।"

"পুরনো সেই দিনের কথা"

এ পথের কি অন্ত নেই? কোথায় শেষ এ পথের? ভাবতে ভাবতে চলে জীবনলাল। এ অঞ্চলটা ফাঁকা মাঠ নয়, ঘন আমবাগানে পূর্ণ। বোলের গন্ধে বাতাস মন্থর, মধুতে পল্লব মসৃণ, আর মৌমাছিদের চাপা গুঞ্জনে আকাশ মুখর। কিন্তু সেদিকে আজ জীবনের মন ছিল না, সে ভাবছিল এ-পথের কি অন্ত নেই, কোথায় শেষ এ-পথের? কুড়ি বছরের যুবকের চিন্তার ধরন এ নয়। তার ভাবনা, কেন পথ শেষ হয়! জানি এ-পথের অন্ত কোথায়! অল্প বয়সে মানুষ সর্বজ্ঞ, বয়স বাড়বার সঙ্গে কমে আসে তার সর্বজ্ঞতা, অবশেষে মরবার সময়ে বোঝে, কিছুই জানে না সে। তবে যে আজ জীবনের চিন্তার স্রোত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল, তার কারণ ঐ তক্তিটা। পিতার জীবনের সমস্ত রহস্য নিয়ে ওটা ঝুলছে তার গলায়। নিজের বয়সের সঙ্গে পিতার বয়স

মিলে গিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে তার বয়সটা। অথচ এ ক'দিন কেমন করে ভুলে ছিল তক্তিটার কথা। পথের অভিনবত্বই ভুলিয়ে দিয়ে থাকবে। আফিঙগোলা লুট, বন্দীপুরে খাজনা আদায়ের পদ্ধতি থিতোতে দেয় নি মনটাকে। কাল রাত্রে নূতন করে যেন আবিষ্কার করলো তক্তিটাকে; এখন প্রতি পদক্ষেপে ওটা বুকের উপরে ঠুক ঠুক করে ঠেকা দিয়ে যাচ্ছে, ভুলতে দেবে না নিজের অস্তিত্ব! একবার হঠাৎ একটা চিন্তার লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়া ছুটে চলে যায় মনের মধ্য দিয়ে। বিবাহ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ কি? বাবা থাকতেন লখ্‌নৌতে, কাশীতে মামার বাড়িতে থেকে সে পড়তো বেনারস কলেজে, বয়স যখন তার ষোল-সতেরো, বড়মামা বাবাকে জানিয়ে দিলেন, নবীনবাবু এবারে জীবনের বিয়ের যোগাড় করি, আজ্ঞা করুন।

বাবা লিখেছিলেন, এখনো ওর বিয়ের বয়স হয় নি।

প্রত্যুত্তরে মামা জানালেন, বিলক্ষণ, আমারই দুই ছেলের বিয়ে দিয়েছি এর চেয়ে কম বয়সে।

বাবা লিখলেন, ওর বিয়ের ব্যবস্থা আমিই করবো।

তারপরেই বাবার মৃত্যু হ'ল, ও চলে এলো লখনৌ। নানা গোলমালে বিয়ের কথা আর ওঠে নি—বাবা-মা নেই, তুলবেই বা কে।

তখনি তার মনে হয়, এ হতেই পারে না। তার বিয়েটা এমন গুরুতর ব্যাপার নয় যে, তার জন্যে সোনার তক্তির পরিকল্পনা করতে হবে। আর তাছাড়া এ বিষয়ে কোন বিধিনিষেধ থাকলে ভৈরব কাকাকে বলে গেলেই চলতো। আবার কখনো বা মনে হয়, হয়তো গুপ্তধনের সংবাদ আছে। তখনি হাসি পায়। মৃত্যুকালে যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ভার যাঁর উপরে দিয়ে গিয়েছেন, সেই ভৈরব কাকাকেই বলে যেতে পারতেন গুপ্তধন থাকলে তার সন্ধান। না, ওটা আরো অসম্ভব। আর যে কি সম্ভাবনা থাকতে পারে, ভেবে পায় না সে। হঠাৎ পথের দিকে দৃষ্টি পড়ে। না! শেষ নেই এ-পথের। অদৃষ্টের কুণ্ডলীকৃত ফিতের মতো খুলেই চলেছে পায়ের নীচে থেকে দিগন্তের প্রান্ত অবধি। হঠাৎ মনে পড়ে এই পথচলার সঙ্গে তার দুই পুরুষের ইতিহাস জড়িত। পিতার জীবনটাও শুরু হয়েছিল পথচলা দিয়ে, তার স্বাধীন জীবনেরও শুরু হ'ল ঐ পথচলাতেই। সে গল্প কতবার শুনেছে বাবার কাছে, ভৈরব কাকার কাছে। এই যাত্রায় বেরিয়ে পড়বার কয়দিন আগে থেকে কেবল ঐ কথাই হয়েছে ভৈরব কাকার সঙ্গে। কতবার শোনা, তবু শেষ হতে চায় না। সে ভাবে, এই পথ, ঐ গল্প দুই-ই অশেষ।

ভৈরব বলে, আমাদের দুজনেরই বাড়ি ছিল রিষড়ের কাছে। ইংরাজী শিখতে হবে নেশা পেয়ে বসলো, কলকাতায় এসে হেয়ার সাহেবের পটলডাঙার ইংরেজী পাঠশালায় ঢুকলাম।

ঠাকুর্দা আপত্তি করলেন না? শুধোয় জীবন।

করেন নি আবার। কিন্তু গাঁয়েই দুজন ইংরেজী-পড়া ভদ্রলোক ছিলেন, বেশ রোজগার করতেন, তাঁরা বোঝালেন, বললেন, গাঁয়ে বসে গাঁজা-গুলি খেলে কি ভালো হতো। পড়ুক, পড়ুক, আখেরে উন্নতি হবে। বাবা আর আপত্তি করলেন না। মা কিছুদিন কান্নাকাটি করলেন, ইংরেজী শিখে খৃষ্টান হয়ে যাবে ছেলে।

এ তো আমার ঠাকুর্দা, ঠাকুরমার কথা। আপনার?

আমার ও দুই বালাই আগেই ঘুচেছিল।

কিন্তু পশ্চিমে আসবার ভূত চাপলো মাথায় কি ক'রে?

বাবা, আগে মাথার খবর নাও, তারপরে ভূতের খবর নিয়ো। কয়েক বছর পটলডাঙার পাঠশালায় পড়ে দুজনে ঢুকলাম হিন্দু কলেজে। সঙ্গে সঙ্গে নবীন হেয়ার সাহেবের কারখানায় ঘাড় মেরামতের কাজ শিখতে লাগলো। হেয়ার ওর উপরে খুব খুশী। তাঁর বিশ্বাস, বাঙালী কেবলই কেতাবী পড়াশোনা নিয়ে থাকে, হাতের কাজ শিখতে চায় না। নবীন দুই দিকেই আছে, তাই তাঁর বড় প্রিয়পাত্র—মুখে লেগেই আছে নবীন ডাট্! তোমরা বালির দত্ত কি না, মস্ত কুল।

আর আপনারা?

চাটুজ্জে তো জানই। এখন কুলের কথা থাক, কি ক'রে অকূলে ভাসলাম, তাই শোনো। একদিনের ওলাউঠোয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমার ঠাকুর্দা, ঠাকুরমা গত হলেন। তখন আমাদের দুজনের কারোরই আর পিছু ডাকবার লোক রইলো না। শুনেছিলাম যে, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরাজী-জানা লোকের কদর খুব বেশি। তখন দুইজনে শলা-পরামর্শ ক'রে সামান্য যা কিছু হাতে ছিল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কাশী ব'লে।

জীবন স্বগতোক্তিতে বলে ওঠে, সে যে অনেক পথ।

অনেক পথ বইকি! এখন তবু রানীগঞ্জ অবধি রেলগাড়ি হয়েছে—শুনছি শীগ্‌গীর কানপুর অবধি চলবে রেলগাড়ি।

এলেন কি ক'রে?

যে ক'রে তোমাকে চলতে হবে। চরণ মাঝির নৌকাই একমাত্র ভরসা।

না, ওটা ঠিক হ'ল না, কেবলই যে হেঁটেছি, তা নয়। কখনো নৌকা, কখনো ঘোড়া, কখনো উট, তবে পায়ে হেঁটেই বেশি। তেমন পয়সা থাকলে আগাগোড়াই নৌকায় যাওয়া যায়। আমাদের সামান্য পুঁজি, নৌকা চড়ায় বাবুগিরি করলে চলবে কেন? তাই পায়ে হাঁটতেই হয়েছে বেশি পথ। এইভাবে তিন মাসে এসে পৌঁছলাম কাশীতে। তারপরের সব কথাই তো জানো।

তবু বলুন, ভালো ক'রে মনের মধ্যে গেঁথে নি। আর কতদিন শুনতে পাবো না কে জানে।

গল্প আর পথ কখনো পুরনো হয় না।

কাশীতে এসে হেয়ার সাহেবের প্রশংসাপত্রের বলে সহজেই দুজনে কাজ পেলাম ইংরেজী স্কুলে।

এই পর্যন্ত বলে ভৈরব মন্তব্য করেন, বাবা, আজ দেখছি সেদিনের দুঃখের স্মৃতিও মধুর হয়ে উঠেছে। টক আমের আমসত্ত্বও মিষ্টি বই নয়।

তারপর আবার শুরু করেন।

নবীন সঙ্গে সঙ্গে খুলল ঘড়ি-মেরামতের কারখানা, বেশ দু' পয়সা রোজগার করতে লাগলো। এমন সময়ে সংবাদ পেলো যে, অযোধ্যার নবাব গাজিউদ্দিন শা ঘড়ি মেরামত করবার লোক খুঁজছেন। তাঁর ছিল কল-কারখানার উপরে ঝোঁক। নবীন চলে গেল লখনৌ। একাই গেল। তোমার মাকে রেখে গেল আমাদের বাড়িতে। কিছুদিন আগে আমরা দুজনেই বিয়ে করেছি। এই সময়ে, তার লখনৌ বাসের বছর পাঁচেক সম্বন্ধে বেশি জানি না। মাঝে মাঝে আসতো কাশীতে, তবে লখনৌর কথা বড় বলতো না। জিজ্ঞাসা করলে মন্তব্য করতো, লখনৌ আমাদের মতো গেরস্তর জায়গা নয়। কেন, শুধোলে বলত—এক কথায় বলতে পারবো না, গিয়ে দেখো। এমন সময়ে একটা সুযোগ জুটে গেল লখনৌ যাওয়ার। রেসিডেন্সির খাজাঞ্চী ছিলেন উত্তরপাড়ার প্রিয়নাথ মুখুজ্জে। তিনি একজন ইংরেজী-নবিশ নায়েব-খাজাঞ্চীর সন্ধান করছিলেন। নবীনের কাছে সেই খবর পেয়ে গেলাম, চাকরিও জুটে গেল। তোমার মা আর কাকীমা রইলেন কাশীতেই। সেখানে গিয়ে দেখলাম, নবীন যা বলেছিল সত্য। লখনৌ আমীর ওমরা রঈস আদমি গুণ্ডা আর দাগাবাজদের শহর।

এই বিচিত্র পৃথিবীর উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু হচ্ছে নবাব আর রেসিডেন্ট সাহেব। আমরা দুজনেই রেসিডেন্টের আশ্রিত। গাজিউদ্দিন শার মৃত্যুর

পরে নবাব নাসিরুদ্দিন শা ঘড়ির কারখানা তুলে দিলে নবীন রেসিডেণ্টের কাছে মীরমুন্সীর কাজ নিয়েছিলেন। নিয়ে গেলাম তোমার মা আর কাকী-মাকে। নাসিরুদ্দিন শার এন্তেকাল হওয়ার কয়েক দিন আগেই হ'ল তোমার জন্ম। বেশ সুখে কাটছিল। তবে সুখ শীতের রোদ, বেশিক্ষণ থাকে না। তোমার বয়স যখন বছর পাঁচেক, তখন তিন দিনের জ্বরে তোমার মা আর কাকীমা স্বর্গে গেলেন, আগে তোমার মা তারপরে তোমার কাকীমা। তাঁরা ছিলেন দুই বোনের মতো। এক বোঁটায় যেন ফুটেছিলেন, এক ঝড়ে তেমনি ঝরে পড়লেন। এক ফুঁয়ে সুখের বাতি নিবে গেল; তেলও ছিল, সলতেও ছিল, কেবল যা না থাকলে সব না থাকার সামিল, সেই আলো গেল নিবে।

এই পর্যন্ত বলে ভৈরব নীরব হন। বুঝতে পারা যায় প্রচুর রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালার বর্ম পরিমান সত্ত্বেও বুকের মধ্যে কাঁচা ক্ষত রয়ে গিয়েছে।

জীবন ব্যথার অংশ ভাগ করে নিয়ে বলে, আমার দুজনকেই বেশ মনে পড়ে, দুজনেই লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি পরতেন আর দুজনেরই নাকে ছিল নথ।

বিস্মৃত ছবি ছবি ঝলক মেরে ওঠে ভৈরবের চোখে, সোৎসাহে বলতেন, ঠিক বলেছ বাবা—ঐ ছিল তখন ভদ্র গৃহস্থ মেয়ের পোশাক।

আমি খেলা করে ফিরে এলে মা শুধাতেন, কি করছিলে এতক্ষণ?

কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গে লড়ছিলাম।

তিনি হেসে বলতেন, তুই দেখছি একদিন কোম্পানীর গুলিতেই প্রাণ হারাবি।

কাকীমা বলতেন, খেলা বই তো নয়, কেন ও সব অলুক্ষণে কথা বলো!

ভৈরব বলে, তারপরে দুজনে যুক্তি করে তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল কাশীতে তোমার মাতুলালয়ে।

পথ চলতে চলতে কত কথাই না মনে পড়ছে জীবনের! সে ভাবে এই অপরিচিত পথ যেন নেপথ্যবর্তী শ্রুতিকারের মতো অস্ফুট কণ্ঠে পূর্ব কাহিনীর সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছে তার হাতে। জানলো কি করে? পথ সব কথা জানে। পথ চলা যেন পা দিয়ে গল্প বলা।

"জিন ঢুঁঢ়া তিন পাইয়া, গহরে পানী পৈঠ" চমকে ওঠে জীবন। হ্যাঁ, একটা গাঁয়ের কাছে এসে পড়েছে বটে, সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটা লোক। লোকটা আবার আবৃত্তি করে—

"জিন টুঁটা তিন পাইয়া, গহরে পানী পৈঠ।" হঠাৎ মনে পড়ে না বাকী ছত্রটা। দু'এক মুহূর্ত মনের মধ্যে হাতড়িয়ে খুঁজে পায় ছত্রটা, বলে ওঠে—

"ম্যাঁয় বৌরী ঢুঢ়ন ভঈ, রহি কিনারে বৈঠ।" লোকটা হাত বাড়িয়ে দেয়—"দো চার।" এবারে আর ভুল হয় না জীবনের, "হাম লাচার" বলতে বলতে চাপাটি চারখানা তার হাতে দিয়েই হন হন করে এগিয়ে যায়, পিছনে তাকানো চলবে না, এ গাঁয়ে থাকা চলবে না।

॥ ৮ ॥

"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ"

ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসে জীবনলাল। উঃ, কি ভীষণ দুঃস্বপ্ন! গায়ের কাপড় ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি সব খুলে ফেলে নূতন কাপড়-চোপড় পরে। তারপর বাতিটা জ্বেলে স্থির হয়ে বসে। কিন্তু স্থির হয়ে থাকবার কি উপায় আছে! হৃৎপিণ্ড আছাড় খাচ্ছে, সেই তালে কাঁপছে সমস্ত শরীর। স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্তের দিক থেকে ঘুরিয়ে নিতে চায় মন, কিন্তু তার কি উপায় আছে! নাগপাশে ক্লিষ্ট হরিণ যেমন অজগরটার দিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকাতে বাধ্য হয়, তেমনি ক'রে তার দৃষ্টি পড়ছে স্বপ্নের ভীষণ মাধুর্যের দিকে। একটা বলবান লোককে চার-পাঁচটা বলবান লোকে গলা টিপে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে। সে কী ধস্তাধস্তি। ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসে লোকটা। অসাড়, অজ্ঞান, এবারে বোধ হয় মৃত। তখন আততায়ীরা ছুটে পালায়। ও কি, একজনের হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে কেন? রক্ত পড়বে না আশা ক'রেই গলা টিপে মারে মানুষকে। তবে রক্ত এলো কোথা থেকে? আর্তনাদ করতে করতে ছুটতে থাকে লোকটা। নাঃ, এদের কাউকে চেনে না জীবন। কিন্তু এ কি, হঠাৎ আবির্ভাব কেন তার পিতার? তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন কার দিকে? কার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান? তারই কি? কিন্তু দেখাতে চান কাকে? ঐ আর্তনাদকারী আহত লোকটাকে কি? সে কি রক্ষা করতে এসেছিল, না আততায়ীদের একজন? কিছুই বুঝতে পারে না জীবন। হয়তো স্বপ্নটার স্থায়িত্ব মুহূর্তকাল, কিন্তু জাগ্রত চৈতন্যের স্পর্শে ক্রমে দীর্ঘ বিস্তারিত হয়ে পড়ছে, দামী রেশমী কাপড়ে এক ফোঁটা রঙ যেমন দেখতে দেখতে ছড়িয়ে যায়।

জীবন ভাবে, এ-স্বপ্নের মূল কোথায়? এমন কোন ঘটনার কথা তো

জানা নেই। তাছাড়া এ-স্বপ্নের সঙ্গে তার পিতার সম্বন্ধই বা কি? তিনি তো নিতান্ত ভালো মানুষ ছিলেন। পিতার মুখে, ভৈরব কাকার কাছে তাঁদের জীবনের পর্বানুক্রমিক সমস্ত বৃত্তান্তই তো শুনেছে, কই, তার মধ্যে এমন ভয়াবহ স্বপ্নের ভূমিকা তো নেই। দুঃস্বপ্নে দুশ্চিন্তায় তার মস্তিষ্ক ও শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে। সে বোঝে, বসে থাকলেই দুশ্চিন্তার নাগপাশ নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠবে। রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়। বাইরে এসে দেখে, ভোর হতে বাকি নেই। চটিদারকে জাগিয়ে দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বেরিলির দূরত্ব জেনে নেয়।

চটিদার জানায়, এই নকিপুর গ্রাম থেকে শহর বেরিলি ছ' ক্রোশ পথ, একটু পা চালিয়ে গেলে দুপুরের আগেই পৌছতে পারবেন। 'রাম-রাম' জানিয়ে বিদায় নেয় জীবন।

পথ চলছে সে অন্য মনে, সন্ধান করছে স্বপ্নের মূল। হঠাৎ তার মনে পড়ে, এমন একটা ঘটনা যেন শুনেছিল। ভৈরব কাকা প্রায়ই বলতেন, চারটি শব্দে অযোধ্যার নবাবের ইতিহাস বিবৃত করা যায়। বিলাসী নবাব, অর্থগৃধ্নু উজীর, অত্যাচারী রাজকর্মচারী আর দোমনা ইংরেজ রেসিডেন্ট। এর অন্যথা নেই, বদল নেই, ব্যতিক্রম নেই—এক ছাঁচে সব ঢালা। তবু তার মধ্যে যদি ইতঃবিশেষ করতে হয়, নাসিরউদ্দিন শাকে সবসে-আচ্ছা বলতে হয়। গাজিউদ্দিন শার বিশ্বাসী উজীর ছিল আগা মীর। নবাবদের নিয়ম এই, সিংহাসনে বসেই আগের আমলের উজীর-নাজিরদের তাড়িয়ে দেওয়া। আগা মীরের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হ'ল—কিন্তু কয়েক মাসের জন্য মাত্র। গ্রেপ্তারী হুকুম বের হবে আশঙ্কায় মীরসাহেব ধনদৌলত ও ছেলেমেয়ে নিয়ে রেসিডেন্টের শরণ নিল। জোঁকের মুখে নুন পড়লো। রেসিডেন্টের আশ্রিতের কেশ স্পর্শ করবার ক্ষমতা নেই নবাবের। আগা মীর তো কোম্পানীর ফৌজের পাহারায় পাঁচ কোটি টাকার ধনসম্পত্তি নিয়ে চলে গেল কানপুরে। তারপরে উজীর হ'ল কজল আলি। লোকটা আবার বাদশা-বেগমের অনুগৃহীত। লোকটা চোদ্দ মাসে ত্রিশ লক্ষ টাকা কামালো। তারপরে ও'র পর এলো রামদয়াল আর আকবর আলি। ভৈরব চাটুজ্জে বলেন, এ বিষয়ে হিন্দু মুসলমান এক রকম। প্রভেদের মধ্যে একজন সোজা কাটে একজন জবাই করে, পাঁঠার তাতে অল্পই লাভ। একটা কথা জেনে রেখো বাবা, সংসারে দুটিমাত্র জাত আছে, সবল আর দুর্বল। সব সবল এক জোট।

জীবন শুধোয়, সব দুর্বল একজোট নয় কেন?

তবে আর দুর্বল বলছি কেন? দুর্বল বলেই একজোট হয় না, একজোট হয় না বলেই দুর্বল। আর যখন একজোট হ'ল তখন আর দুর্বল থাকল না, সন্ধানে লাগলো নূতন দুর্বলের।

হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে ভৈরব বলে, ঐ ছাখো বুড়ো বয়সের রোগ, সুযোগ পেলেই বকুনি শুরু হয়ে যায়। যাক গে, তারপরে শোনো। শুনে রাখো এ সব কথা। আমরা আর কদিন। শেষ দুই উজীরের সময়ে লখনৌ শহরের অধিবাসীর ধনপ্রাণ সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠলো। আগে এক অত্যাচারী ছিল নবাব—এখন দেখা দিল হাজার অত্যাচারী; চোর ডাকাত ঠগ জালিয়াত আর পথেঘাটে দিনে-দুপুরে মেয়েরা বেইজ্জত হতে লাগলো। শেষে এমন চরমে উঠলো যে রেসিডেন্ট বড়লাটকে জানাতে বাধ্য হলেন, বড়লাট চাপ দিলেন, নবাবের সংবিৎ হ'ল। তখন নবাব হাকিম মেহেদি নামে একজন জবরদস্ত লোককে উজীর নিযুক্ত করলেন। হাকিম মেহেদি যোগ্য লোক কিন্তু তাই বলে তার লোভ কম নয়,—হয়তো সেইজন্যই বেশি। কর্মী লোক প্রায়ই দুর্বৃত্ত আর সৎ লোক প্রায়ই অকর্মণ্য। এই বিচিত্র কেন্দ্রে রয়েছে জগতের সংসারের বারো আনা দুর্দশা। তার উজীর হওয়ার আগেকার কথা বলছি। ছোট জেলার আদায়ী ভার ছিল তার উপর। তার পরে হঠাৎ একটা জেলার ভার পেলো। আগেকার তহশীলদার অমর সিং, জাতিতে রাজপুত, বেশ ধনী আর ক্ষমতাশালী, সে ছাড়বে কেন? হাকিম মেহেদি তাকে হত্যা করবার সুযোগ খুঁজতে লাগলো। অমর সিং সাবধান হয়ে চলে। হঠাৎ মিলে গেল সুযোগ। একদিন সকালে অমর সিংকে মৃত অবস্থায় তার ঘরে পাওয়া গেল। হাকিম মেহেদি রটালো, বিষপানে আত্মহত্যা করেছে সে। মৃতদেহ দেওয়া হ'ল আত্মীয়-স্বজনকে। অন্ত্যেষ্টি সৎকারের সময়ে গঙ্গাজল দেওয়ার জন্যে যখন তার মুখ খোলা হ'ল দেখা গেল যে, মুখের মধ্যে একটা তর্জনীর ছিন্ন কর্তিত অংশ। চমকে ওঠে সকলে।

চমকে ওঠে জীবন। তবে কি ওই ছিন্ন তর্জনী স্বপ্নে দৃষ্ট রক্ত-ঝরা ঐ লোকটার? তাও কি সম্ভব? স্বপ্নে কি গল্পের পাদপূরণ সম্ভব? যদি বা সম্ভব হয়—এই গল্পের কাঠামোর মধ্যে কোথায় তার পিতার স্থান? সে নিশ্চয় দেখেছে পিতাকে, বাপকে চিনতে ভুল করবে কেন? কি বলতে চেয়েছিলেন তিনি? ছিন্ন-অঙ্গুলি ঐ লোকটা কে?

আরে, কিধার যাতা?

জীবন উত্তর দেয়, শহর বেরিলি।

প্রশ্নকর্তা বিস্ময়ে পরামর্শ দেয়, যাও, গাঁও মে যাও। বেরিলি মৎ যাও।

কেন বাপু?

"বেরিলি কি বাজার মে লাঠি গিরারে" গান করতে করতে সে ছুটে চলে যায়।

উপরের প্রশ্নোত্তরে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠে জীবন দেখে যে চারদিকে কেমন একটা অরাজকতার দৃশ্য। সবাই যেন শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। কারো মাথায় মোট, কারো ঘাড়ে মোট, কারো কাঁধে মোট, কেউ স্ত্রীর হাত ধরে শিশুসন্তানকে বগলে করে দৌড়চ্ছে, কেউ বা দৌড়তে দৌড়তে প'ড়ে গিয়ে আহত হচ্ছে, সঙ্গীরা তাকে তুলবার জন্যে অপেক্ষা করছে না।

ব্যাপার কি, ভাবে জীবনলাল। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাওয়া যায় না, উত্তর দিতে গেলেও তো একবার থামতে হয়, সে সময় কারো নেই। তাকে দেখেও দেখছে না কেউ। সেই ধাবমান, পলায়মান জনতার মধ্যে সে একাকী উল্টো মুখে চলেছে। ব্যাপার কি ভেবে পায় না জীবনলাল। অবশেষে একজন ছুটতে ছুটতে পিছনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালো। অঙ্গুলি অনুসরণ করে সে দেখতে পেলো শহরের উত্তর দিকে, সে এগোচ্ছে দক্ষিণ থেকে, অনেকটা জায়গা জুড়ে আগুন জ্বলছে। সে বোঝে যে ঘরবাড়ি পুড়ে গিয়েছে বলেই এরা পালাচ্ছে। এমন সময় এক ঝাঁক গুলির শব্দ একসঙ্গে কানে আসে, সেই সঙ্গে তুমুল কোলাহল। এগিয়েই দেখা যাক। শহরের মধ্যে ঢুকে দেখে যে দুদিকের বাড়ির দরজা, জানালা, ঘুলঘুলি সব বন্ধ, ভিতরে লোক আছে কি না আছে বুঝবার উপায় নাই। সমস্ত শহর যেন আজ দিনদুপুরে জনশূন্য কিম্বা নিদ্রিত। হঠাৎ চমকে উঠলো, বোঁ করে একটা গুলি কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল নাকি? ঠিক সেই সময়ে পিছন থেকে কে উচ্চস্বরে সতর্ক করে দিল—রাস্তায় থেকো না, বাড়িতে আশ্রয় নাও, গুলি চলছে।

গুলি তো চলছে, কিন্তু আশ্রয় নেব কোন্ বাড়িতে, সব যে দরজা বন্ধ।

যেখানে পারো ঢুকে পড়ো, ঢুকে পড়ো, ওরা এদিকে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুই গুলি কানের কাছ দিয়ে পাগড়ির উপর দিয়ে ছুটে চলে গেল।

জীবন দেখলো আর বিচারের সময় নেই, সামনে যে বাড়ি পেলো দরজায় মারলো ধাক্কা। আশ্চর্য, দরজা খুলে গেল আর দেখতে পেলো সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক রমণী। সেই আলো-অন্ধকারের মধ্যে, সেই সবে কৈশোরোত্তীর্ণ পুরুষের অনভ্যস্ত চক্ষুও বুঝতে পারলো যে, রমণী যুবতী আর আশ্চর্য সুন্দরী।

বাবুসাহেব, আপনি কি বাঙালী?

॥ ৯ ॥

ঘরণী না স্বৈরিণী না কুহকিনী

জীবন আবার শুনতে পেলো, আপনি কি বাঙালী? এতক্ষণ নারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিল, এবার তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল বুদ্ধিতে অভিভূত ভাব, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই অভিভব কাটিয়ে শুধোল, কি করে বুঝলেন?

বাঙালীবাবুদের মুখে-চোখে এমন একটা কিছু অসামান্য আছে, যা সহজেই বুঝিয়ে দেয় বাঙালী বলে।

আপনি বুঝি অনেক বাঙালী দেখেছেন?

অনেক আর দেখলাম কই। অনেক দেখলে শেষ পর্যন্ত হয়তো বাংলা মুলুকেই চলে যেতাম।

জীবন কি উত্তর দেবে ভাবছে, এমন সময় বাইরের গোলমাল উৎকটতর হয়ে উঠল।

যুবতী বলল, ভিতরে চলুন লুকোতে হবে।

কেন, লুকোবো কেন?

তবে এই বাড়িতেই বা ঢুকলেন কেন?

গুলি চলছিল, গায়ে লাগতে পারে আশঙ্কায়।

সে আশঙ্কা এখনো যায়নি, বরঞ্চ বেড়েছে।

কেমন?

এখনই ওরা এসে খানাতল্লাসি করবে।

ওরা কারা?

তা বুঝি জানেন না? সিপাহীলোক ক্ষেপে উঠেছে।

কাদের উপরে?

কিছুই খোঁজ রাখেন না আর রাহী সেজে পথ চলছেন! সাহেবদের উপরে।

আমি সাহেব নই, সাহেবের চাকরিও করি না, আমার উপরে রাগবে কেন?

কিন্তু আপনি তো বাঙালী। ওদের এক বুলি, ইংরেজ ঔর বাঙালী এক হ্যায়।

এবারে হেসে ওঠে জীবন। স্যার হেনরি উপস্থিত থাকলে বলতেন, I love that smiling face

যুবতী বলে, এ সময়ে আপনার হাসি পায়! আপনার সাহস তো কম নয়!

হাসতে যে সাহসের দরকার হয় এই প্রথম শুনলাম কিন্তু এখনো শুনলাম না, কেন বাঙালীর উপরে রাগ!

সেটা না হয় রয়ে-বসে পরে শুনবেন। এখন এইটুকু জেনে রাখুন, আপনাকে যে সিপাহী ধরবে সে পঁচিশ টাকা ইনাম পাবে। আসুন, ঐ শুনুন ওরা আরও কাছে এসে পড়েছে। অন্ধকারে চলতে আপনার অসুবিধা হবে, আমার হাত ধরুন,—বলে অপেক্ষা না করে ধরলো জীবনের হাত- নিন আসুন।

জীবন ইতিপূর্বে কখনো অনাত্মীয় যুবতীর অঙ্গ স্পর্শ করে নি। চলতে চলতে সে বলল, বাঙালীর মাথার দাম মাত্র পঁচিশ টাকা—শুনলে সব বাঙালী ক্ষেপে উঠবে। টোলে পড়বার সময়ে পণ্ডিতমশাই বলতেন, আমার মাথার মধ্যে নাকি গোবর ভরা—তবু তার দাম পঁচিশ টাকারও বেশি।

পচা গোবর হ'লে অবশ্যই বেশি।

কেন?

কেন কি, পচা গোবর যে সার, ফুল ফোটায়, ফল ধরায়।

দুজনে দোতলার একটি প্রশস্ত কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। দরজা-জানালা বন্ধ—একটি শেজের আলো জ্বলছে।

যুবতী বলল, এই ঘরে আপনাকে লুকিয়ে থাকতে হবে।

জীবন এক নজরে ঘরটা দেখে নিল, একধারে প্রশস্ত পালঙ্কে কোমল শয্যা, দেয়ালে তৈলচিত্র, এক পাশে বাদ্যযন্ত্র, বুঝল যুবতীর পরিচয়। তখনি তার হাত ছেড়ে দিয়ে, ঘরে নিরাপদে ঢুকবার পরেও এতক্ষণ হাত ছাড়ে নি, যুবতীও আপত্তি করে নি, বলে উঠল, আমি তোমার ঘরে লুকিয়ে থেকে প্রাণ বাঁচাতে চাইনে।

এক দমকায় 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামাতেই বুঝতে পারছি যে আমার পরিচয় বুঝতে ভুল হয় নি আপনার।

এই সপ্রতিভ রমণীর কথার উত্তর খুঁজে পায় না জীবন।

রমণী আবার বলে- কিন্তু এখন বুঝছি যে ও মাথার দাম পঁচিশ টাকাও নয়, ওতে পচা গোবরের বদলে আছে তাজা গোবর।

ঈষৎ বিরক্তির সুরে জীবন বলল, এখন ঠাট্টা রাখো।

সত্যি বলছি ঠাট্টা নয়। এমন নিরেট মাথা অল্পই দেখা যায়। আপনি অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছেন, এখন হাতের কাছে যা পাবেন তাই দিয়ে আত্মরক্ষা করবেন—এই তো স্বাভাবিক। অত্যাচারের মুখে আচার আঁকড়ে থাকলে মরতে হয়।

মরলামই বা।

তবে বাড়িতে ঢুকলেন কেন?

গুলিতে মরতে চাই না।

ফাঁসিতে মরতে চান! হাজতে পচে মরতে চান! বাস্তবিক, আপনার বুদ্ধির তারিফ না ক'রে পারা যায় না।

অনেকটা নরম হয়ে জীবন বলে, কি করতে হবে?

পিঠের ওই বোঁচকাটা খুলুন, পাগড়ী খুলুন। বাপরে বাপ, কোমরবন্ধে আবার পিস্তলও আছে দেখছি। এমন জঙ্গী বাঙালী পেলে সিপাহীরা আপনাকে জেনারেল না ক'রে দিয়ে ছাড়তো না।—এই বলে সাহায্য করে পাগড়ী, বোঁচকা, পিস্তল খুলতে।

এবারে?

দাঁড়ান, আগে এগুলো পাশের ঘরে লুকিয়ে রেখে আসি।

জিনিসগুলো নিয়ে যুবতী প্রস্থান করলে পরিশ্রান্ত জীবন পালঙ্কের উপরে বসে। মুহূর্ত পরে যুবতী ফিরলে শুধোয়, এবারে কি করতে হবে?

উপরের পিরানটা খুলে পালঙ্কে শুয়ে পড়তে হবে, অভিনয় করতে হবে যেন আপনি আমার পেয়ারের মানুষ।

তড়াক ক'রে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে জীবন, পারবো না।

বাপরে, বীর পুরুষ!

তার স্বর স্নেহময় ব্যঙ্গে মিশ্রিত। তারপরে হেসে বলে, ওঃ, অভিনয়ে আপত্তি বুঝি, একেবারে আসল চাই!

একটু থেমে বলে, সকি খাঁর লোকের হাতে মাথাটা বেঁচে গেলে ইচ্ছা করলে তাও পাবেন। ওই শুনুন, নিচের তলায় ঢুকে পড়েছে। শুয়ে প'ড়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকুন, কারণ এখন আমি যা করবো তা দেখা আপনার মতো বীরপুরুষের কর্ম নয়।

জীবন শুয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরায়, ভিতরে ভিতরে ঠেলা মারতে থাকে প্রচণ্ড কৌতূহল। সিঁড়িতে অনেকগুলি লোকের পায়ের শব্দ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। যুবতী দক্ষ দ্রুত হস্তে দোপাট্টা কাঁচুলি ঘাগরা খুলে ফেলে স্বচ্ছ একটা ওড়না গায়ের উপর টেনে নেয়, অপেক্ষা করে খোলা দরজার সম্মুখে। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় তমিজ মিঞা, সঙ্গে পাঁচ-সাতজন বন্দুক কিরিচধারী সিপাহী।

তমিজ মিঞা যুবতীকে ঐ বেশে দেখে এক গাল হেসে বলে, এ কি পান্নাবিবি,

আজ যে দিনদুপুরে চাঁদের জলুস !

তার কথার উত্তরে মাথা ঘুরিয়ে-দেওয়া হাসি নিক্ষেপ করে প'ন্না বলে, কেন মিঞা সাহেব, দিনদুপুরে চাঁদ কি কখনো দেখ নি ?

তমিজ মিঞা গজল রচনা করে, গান গায়, কোম্পানীর আবগারী বিভাগে কাজ করে, নানান রসের উপরে তার স্বাভাবিক অধিকার, রসিক লোক। সে বলল, এখন দুঃখ হচ্ছে যে আগে দেখি নি। রাতের চাঁদের চেয়ে দিনের চাঁদ অনেক বেশি সুন্দর।

পান্না বলে, কেউ দেখে না তাই রক্ষা।

এমন সময়ে তমিজ মিঞার লক্ষ্য পড়ে পালঙ্কের দিকে, বলে, রক্ষা আর কই চাঁদবিবি, ওই যে রাহু হাজির !

পান্না তাকে দেখিয়ে বলে, আর এদিকে এই যে খোদ কেতু হাজির !

না পান্নাবিবি, একসঙ্গে রাহু আর কেতু আক্রমণ করলে চাঁদ আর আস্ত থাকবে না, এখন চললাম।

প্রস্থানোদ্যত তমিজ মিঞাকে শুধোয়, তা কি মনে ক'রে এদিকে এসেছিলে মিঞা সাহেব ?

বাড়ি বাড়ি তলাসী ক'রে বেড়াচ্ছি বখৎ খাঁর হুকুম। লোকে বলল, এখানে নাকি একটা আদমী ঢুকেছে।

পান্না বলে, ঐ তো দেখতে পাচ্ছ আদমী।

তমিজ মিঞা রসিক পুরুষ, আদমীতে আদমীতে তফাত বোঝে, বলল, কী যে বলো, বিবি! পেয়ারের আদমী আর দুশমন আদমীতে তফাত কি বুঝতে পারবো না ? এখনো বুড়ো হই নি বিবি, চুলদাড়ি যে পেকেছে ওটা আমাদের বংশের ধাত।

সেলাম মিঞাসাহেব। আর একদিন এসো।

দিনে না রাতে ?

যখন ফুরসত হবে তোমার।

পান্নাবিবি, ফুরসত বুঝি আর হবে না।

কেন ?

বখৎ খাঁর হুকুম, সবাইকে দিল্লি রওনা হতে হবে।

কৃত্রিম দুঃখে পান্না বলে, তবে তো বড় মুশকিল।

তখন উভয়পক্ষে সেলাম জানানোর পরে তমিজ মিঞা দলবল নিয়ে বিদায় হয়ে যায়।

মুখ ফেরাতে পারি ? শুধোয় জীবন।

মুখ ফেরাতে পারি! বড় সাধু! লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা হচ্ছিল, দেখি নি কি ?—ঘাগরা, কাঁচুলি পরতে পরতে উত্তর দেয় পান্না।

কথ্খনো না, বলে উঠে বসে জীবন।

অনুমতি না নিয়েই উঠে বসলে যে ? যদি আমার কাপড় পরা না হ'ত ? দেখবার ইচ্ছাটি আছে সাহস নেই। কাপুরুষ!

এ অপবাদের উত্তর না দিয়ে জীবন বলে, আবার ঐ লোকটাকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলে কেন ?

তোমার কি একাই ভোগদখল করবার মতলব নাকি ?

কথ্খনো না—বলে রেগে ওঠে জীবন।

পৌরুষের আর কিছু না থাক রাগটি আছে, তবু ভালো।

তোমারই মতলব ভালো নয় দেখছি।

কচি ছাগ-মাংসে আমার লোভ নেই, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

তাই বুঝি বুড়ো ভেড়াকে নিমন্ত্রণ ক'রে রাখলে ?

কাজেই, শাস্ত্রেই বলেছে কি না কচি পাঁঠা বৃদ্ধ মেষ।

বাক্যুদ্ধে বিজয় সম্ভাবনা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে জীবন বলে ওঠে, পান্না, তোমার কোন্ কথাটা যে সত্য আর কোন্টা পরিহাস বুঝতে পারি না।

সময়ে পারবে। আর তা ছাড়া পরিহাসের মতো নিষ্ঠুর সত্যই বা কোথায়! নাও, এখন ওঠো খোকাবাবু।

অনাত্মীয় যুবতীর মুখে বিশ বৎসরের যুবককে খোকাবাবু সম্বোধন অপমানের চূড়ান্ত। জীবন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, দ্যাখো অপমান ক'রো না।

মুখ টিপে হাসে পান্না, বলে, খোকাবাবু নয় তো কি ? শুতে বললাম শুলে, উঠতে বললাম উঠলে!

বাক্যুদ্ধে পর্যুদস্ত জীবন বলে, এবারে আর শোয়াও নয়, ওঠাও নয়। আমার জিনিসগুলো দাও।

বিস্মিত পান্না শুধোয়, কেন ?

রওনা হবো।

কোথায় ? বখৎ খাঁর সঙ্গে দিল্লি নাকি ?

পাগল, আমি ওদের সঙ্গে যাবো কেন ?

কথাটা ফিরিয়ে দিয়ে পান্না বলে, পাগল না হ'লে কেউ এখন রওনা হওয়ার

কথা ভাবে না।

কেন ?

দেখলেই খুন করে ফেলবে।

তবে ?

তবে আর কি, ওরা রওনা না হয়ে যাওয়া অবধি এখানে থাকবে।

কতদিন হবে ?

তিন দিন হ'তে পারে আবার তিন মাসও, ঠিক নেই।

অসহায়ভাবে বলে, এইভাবে বসে থাকবো ?

বসে থাকবে কেন ? বালাই ! খাবে, শোবে, ঘুমোবে, গান যদি জানো তো গাইবে -আমি সঙ্গে নাচবো, কিন্তু সব আগে স্নান করবে, রোদে তেতেপুড়ে এসেছ, অতএব ওঠো।

বিস্ময়ের অবধি থাকে না জীবনের। কে এই রমণী ? বিনা ভূমিকায় কেমন করে সে প্রবেশ করলো তার জীবনের মধ্যে। সে ভাবে, এক মুহূর্তের পরিচয়ে চিরকালের জানা হয়ে যাওয়ার নামই কি প্রেম ! শুধোয়, আমার পরিচয় জানো না, নাম জানো না, কোথা থেকে আসছি কোথায় যাবো কিছুই জানো না, বাড়িতে স্থান দিচ্ছ—মনে ভয়-ডর নেই ?

এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেললে, দাঁড়াও একে একে উত্তর দিই। এই বলে আরম্ভ করে—তোমার নাম জীবনলাল, আসছ লখনৌ থেকে, যাবে—

বাধা দিয়ে বিস্ময়ে জীবন বলে ওঠে তুমি কি মায়াবী নাকি, তুমি কি জাদু জানো ?

গম্ভীরভাবে পান্না বলে, কিছু কিছু জানি বই কি। বোকা পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে ফেলতে পারি।

সে কথাটা কানে না তুলে জীবন শুধোয়, আচ্ছা জাদু যদি জানো—বলো যাবো কোথায় ?

জানি না, কারণ তুমিও জানো না ; তবে মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত দিল্লিতেই যেতে হবে।

বখৎ খাঁর সঙ্গে নাকি ?

না, কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গে।

জীবনের আর সন্দেহ থাকে না যে পান্না জাদুকরী। সত্যিই তো এইমাত্র সে মনে মনে সঙ্কল্প করছিল যে কর্নেল ব্রিজম্যানের ফৌজে যোগ দিয়ে দিল্লি যাবে আর সিপাহীদের বিরুদ্ধে লড়বে। স্বীকারোক্তির সুরে সে বলে উঠল, পান্না,

সত্যিই তুমি জাদু জানো!

সেই সঙ্গে কিছু ইংরেজীও জানি।—তারপরে ব্যাখ্যার সুরে বলে, আমার কিছু কিছু ইংরেজ ভক্তও আছে কি না, তাদের কাছেই শিখেছি।

না হয় শিখলে কিন্তু তাতে ক'রে আমার নামধাম জানা যায় কি ক'রে?

এমন বোকাও তো দেখি নি। তোমার ঐ থলেটার ওপরে ইংরেজী অক্ষরে জীবনলাল, লখনৌ লেখা আছে কিনা!

এমন জটিল সমস্যার এমন সরল সমাধানেও সংবিৎ হয় না জীবনের, শুধোয়, আর দিল্লি যাওয়া?

সেকথা ধীরেসুস্থে বলবো, এখন ওঠো তো, এই নাও তোমার থলিঝুলি—এই বলে পাশের ঘর থেকে এনে দেয় সেগুলো, নাও লক্ষ্মী ছেলের মতো কাপড়-চোপড় বের করো আর ছেড়ে ফেলো গায়ের পিরান, কোর্তা।

নত হয়ে থলিটা তুলে নিয়ে জীবন রওনা হয়।

ও কি চললে কোথায়?

যেখান থেকে দু'মুহূর্ত আগে এসেছিলাম সেখানে।

বুদ্ধিমতী পান্না মুহূর্তে সব বুঝে নেয়, বলে, আমার ঘরে, আমার হাতে জলগ্রহণ করবে না, এই তো?

ক্ষণকালের জন্য একটা স্বচ্ছ বাষ্পের পর্দা ঢেকে দেয় পান্নার হাসিতে উজ্জ্বল চোখ দুটি। তখনি সামলে নিয়ে বলে, তার প্রয়োজন হবে না। আমাদের শিবপূজার জন্যে পাঁড়ে ঠাকুর আছে। সে রাঁধে ভোগ—প্রসাদ পাবে তুমি। হ'ল তো?

ধীরে ধীরে থলিটা নামিয়ে ফেলে জীবন। সত্যই সে বড় পরিশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত। তার খাদ্যের ও বিশ্রামের একান্ত আবশ্যক।

পান্না বলে, জীবন, তুমি আমাকে কিছুই জানো না, আমি তোমাকে যতটা জানি তার চেয়েও কম জানো তুমি আমাকে।

স্বীকারোক্তির দৃষ্টিতে সে তাকায় পান্নার দিকে, সত্যই বুঝতে পারে না এই অপরিচিতা ঘরণী না স্বৈরিণী না কুহকিনী!

পান্না তার হাত ধরে বলে, এসো আমার সঙ্গে।

"পান্না ষোড়শী, অকলঙ্ক শশী। সর্বাঙ্গ-সুন্দরী বলে পান্না রোহিলখণ্ডে সুবিখ্যাতা। ঐ প্রদেশের সর্বসাধারণের ধারণা, পান্নার ন্যায় রূপবতী এবং গুণবতী রমণী বুঝি ধরাধামে আর জন্মগ্রহণ করে নি। পান্না সুশীলা, চরিত্রযুক্তা, বুদ্ধিমতী। নর্তকী বলে সে বারবিলাসিনী নয়। বিধাতার বিধানে সে পরপুরুষগামিনী বটে, কিন্তু একের প্রতিই তার মতিগতি, যখন যার তখন তার। কর্নেল ক্রুসম্যান বলেন, পান্নার মুখের মধুর হাসিটুকুর দামই দশ হাজার টাকা। পান্না রামজানি জাতীয়া। আচার-নিষ্ঠা প্রকৃত হিন্দুর ন্যায়। প্রত্যূষে স্নান করে পান্না ঘণ্টাকাল শিবদুর্গার পূজা করে এবং সেই সময় কাগজে হিন্দী অক্ষরে একশত আটটি করে রাম-নাম লেখে: সপ্তাহান্তে প্রত্যেক রাম নাম স্বতন্ত্র করে কেটে টুকরো টুকরো করে। সেই কাগজের টুকরো আটার সঙ্গে মিলিয়ে মটরের ন্যায় এক-একটি বড়ি তৈয়ারি করে। এইরূপে সপ্তাহে ৭৫৬টি রামনামের গুলি তৈয়ারি হয়। একজন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ সেই রামনামের গুলিসমূহ মৎস্যকুলের আহারের জন্য রামগঙ্গার জলে নিক্ষেপ করেন। পান্না মাছমাংস খায়। পান্না যেখানে বসে সেখানে কোন নীচ জাতি বসতে পায় না। নীচ জাতি কর্তৃক স্পৃষ্ট হলে সে স্নান করে। যে বিছানায় হুঁকা থাকে সে বিছানা হঠাৎ কোন অপর জাতি কর্তৃক স্পৃষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ হুঁকার জল পরিবর্তিত হয়। উচ্চশ্রেণীর রামজানি জাতীয় প্রায় সকল নর্তকীই এইরূপ আচারবতী। পান্না ভ্রাতৃগৃহেই থাকে। ভ্রাতা গৃহস্থ, তার স্ত্রী কুলবধূ, মাতাও পর্দানশিন। ভ্রাতৃবধূর ঘোমটা দীর্ঘ। অসূর্যম্পশ্যারূপা বলে যে কথা আছে তা পান্নার ভ্রাতৃজায়াতেই সার্থক হয়েছে। বাইরের বৈঠকখানাই পান্নার অধিকারে। পান্না সেখানেই থাকে, সেখানেই ওস্তাদ এসে পান্নাকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দেয়। সেখানেই পান্নার বন্ধুবান্ধব এসে তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে। অন্দরে থাকে পান্নার ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া ও মাতা। তারা গৃহস্থ। পান্নার রঙ সাদা ধপধপে, সেই শ্বেত পদ্ম থেকে গোলাপী রঙের আভা ঈষৎ দৃষ্ট হয়। মনে হ'ত বুঝি কোন স্বর্গের বিদ্যাধরী ধরাধামকে আলোকিত

করতে এসেছেন। বড় বড় ইংরেজগণ বলতেন, ইংলণ্ডীয় রমণী বলে পান্নাকে ভ্রম হয়, কেননা পান্নার যেমন রঙ সেরূপ রঙ এদেশে সম্ভবে না।"*

এই রামজানি সম্প্রদায়ের আদিবাস নৈনিতালের পার্বত্য অঞ্চলে, তারা নিজেদের পৌরাণিক কিন্নর জাতির বংশধর মনে করে। তাদের আদিবাস যেখানেই হোক তারা ছড়িয়ে পড়েছে অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, পাঞ্জাব, দিল্লি অঞ্চলে। এদের রমণী সকলেই অসামান্য সুন্দরী, নৃত্যগীতবাদিতে দক্ষ। পান্না সকলের উপরে। জঙ্গী ইংরেজ মহলে তার বড় খাতির। বেরিলি, মীরাট, দিল্লী, আম্বালা প্রভৃতি শহরে পান্নার নৃত্যগীত না হ'লে ইংরেজদের আসর জমে না। এমন কি একাধিক বার তাকে সিমলা পর্যন্ত যেতে হয়েছে। একবার লাহোর যাওয়ার ডাক এলো, পান্না বলল, বুড়ো মাকে ছেড়ে এত দূরে যেতে পারবে না। হাজার মোহর পাবে। না, সে লোভেও নয়। অন্য শ্রেণীর নর্তকীরা স্বভাবতই ঈর্ষা করে, বলে ওর রঙটা আসল নয়, মেমসাহেবদের কাছে থেকে রঙ চেয়ে নিয়ে মাখে। দু-একজন গোপনে সে পরীক্ষা করেছে—আসরের মধ্যে ঘামে রঙ গলে গিয়ে মুখ বিচিত্ররূপ ধারণ করেছে। তাদের আর ডাক পড়ে নি।

"পান্না ষোড়শী।" ওটা অলঙ্কার, তার বয়স পঁচিশের কম নয়। তবে ষোড়শী বলতে বাধা নেই, কারণ সুন্দরী রমণীর বয়স পুরুষের চোখে, চোখ যদি বলে ষোড়শী, তবে অবশ্যই ষোড়শী। এই পান্নার ঘরে অদৃষ্টের দূরপ্রসারী হাত নিয়ে এলো জীবনলালকে।

ওগো জীবনবাবু, ওঠো ওঠো, আর কত ঘুমোবে!

ঘুম ভেঙে গিয়ে জীবন ধড়মড় করে উঠে বসে, বলে, খুব ঘুমিয়েছি। কিন্তু হঠাৎ আবার জীবনবাবু হতে গেলাম কেন?

শুনেছি যে বাবু না বললে বাঙালীরা রাগ করে। যত বাঙালী দেখলাম সবাই বাবু। আচ্ছা তোমাদের দেশে কি সকলেই বাবু?

উল্টে প্রশ্ন করে জীবন, তোমাদের দেশে কি বাবু নেই?

আছে বৈকি। এই বেরিলিতেই কত বাবু আছে। বাবু লছমি নারায়ণ, বাবু মহাদেও পরসাদ। আমাদের দেশে বাবু মানে জমিদার। তোমাদের দেশে সকলেই জমিদার নাকি?

এটা সরল জিজ্ঞাসা না গোপন ব্যঙ্গ বুঝতে না পেরে জীবন স্বীকার করে, সত্যি কথা বলতে কি—বাংলা দেশে আমি কখনো যাই নি। আমার জন্ম

* 'বিদ্রোহে বাঙালী' নামে গ্রন্থ থেকে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে গৃহীত।

লখনৌ শহরে, মানুষ কাশীধামে, আপাতত উপস্থিত বেরিলিতে তোমার বাড়িতে।

বাপ-মা ছেড়ে এমন বেগানা ভাবে বেরিয়ে পড়তে গেলে কেন?

তাঁরা ছেড়ে গিয়েছেন, তাই আমার ছাড়বার কথা ওঠে না।

দুজনেই ছেড়ে গিয়েছেন? কতদিন আগে?

বাবা গিয়েছেন দু-বছর হ'ল, মা গিয়েছেন আমার বয়স যখন পাঁচ। কিন্তু আমার জীবন-চরিত না হয় পরে শুনো। এই তহ্‌খানার অন্ধকারে আর ভালো লাগছে না। ঘুলঘুলিটা খুলে দাও, আলো বাতাস আসুক।

সেই সঙ্গে বখৎ খাঁর লোক!

এখনো সে ভয় আছে নাকি?

ভয়? তুমি যখন ঘুমোচ্ছিলে দু'বার এসে খোঁজ করে গিয়েছে।

কি বললে?

বললাম খুঁজে ছাখো।

যদি খুঁজতো?

খুঁজে পাবে কেন? এই তহ্‌খানার খোঁজ মা আর ভাই ছাড়া কেউ জানে না।

তারপর বলে, মাকে তো আহারের সময় দেখেছ। ভাই শহরের বাইরে গিয়েছে—সন্ধ্যাবেলায় আসবে।

জীবন বলে, তোমার মাকে প্রণাম করে কী মনে হ'ল জানো, যেন দেবী প্রতিমাকে প্রণাম করে উঠলাম।

মিথ্যা বল নি জীবন, দুঃখ সহ্য করবার অপরিসীম ক্ষমতা যদি দেবত্বের লক্ষণ হয় তবে মা আমার দেবী নিশ্চয়।

সংসারে অনেক কথা আছে যার সূত্র অনুবৃত্তি সম্ভব নয়, নীরবতাই তার যথার্থ উপসংহার।

কিছুক্ষণ পরে জীবন বলল, তোমার ভাই এলে নিয়ে এসো, পরিচয় করব।

এ মহলে তারা কেউ আসবে না, মা ভাই ভাইবউ কেউ নয়, এ মহলে আমার একার অধিকার। পরিচয় করতে হ'লে তোমাকেই যেতে হবে অন্দর মহলে।

এদের জীবনযাত্রার প্রকৃতি বুঝতে পারে না জীবন, চুপ করে থাকে। তারপরে শুধোয়, বেলা কত হবে?

বোধ হয় ছ'টা।

তবে এখনো রোদ আছে। ঐ উপরের ঘুলঘুলিটা খুলে দাও, ওখান দিয়ে বখৎ খাঁর লোক আসতে পারে না।

তক্তপোশের ওপর ঘুলঘুলি খুলে দিতেই পিচকারি আলো এসে পড়ে পান্নার মুখে। প্রথম পূর্ণ চন্দ্রোদয় দর্শনে প্রথম মানুষের বিস্ময় দেখা দেয় জীবনের মুখে চোখে, স্থানকালপাত্র ভুলে নিনিমেষে তাকিয়ে থাকে পান্নার দিকে। ঘরের আলো-আঁধারির মধ্যে সে বুঝতে পেরে ছিল পান্না সুন্দরী কিন্তু সে সৌন্দর্য যে এমন সুন্দর এই প্রথম বুঝলো। পান্নার ভারি ভালো লাগে। পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি নারী-সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

দ্রষ্টা ও দৃষ্ট এইভাবে কিছুক্ষণ থাকবার পরে পান্না ওষ্ঠাধরে আদিম ঊষার জাদু ফুটিয়ে তুলে শুধোয়, সে স্বর স্বপ্নের পদক্ষেপের মতো মৃদু, কি দেখছ?

জীবন বলে, পান্না তুমি সুন্দর। সেই বিশেষণহীন অলঙ্কার-বর্জিত ছোট তিনটি শব্দ অগ্নিগর্ভ বজ্রদণ্ডের মত মুহূর্তে আমূল বিদ্ধ হয়ে যায় পান্নার অস্তিত্বে। বাক্যের সীমান্তে এসে পড়েছে তারা। যখন তাদের সংবিত হ'ল পান্না বলে, অন্ধকার না হওয়া অবধি তুমি অপেক্ষা করো, তারপরে তোমাকে নিয়ে যাবো তেতলার ছাদে।

কিন্তু বখৎ খাঁর লোক?

বখৎ খাঁর লোক কি আর আজ রাত্রে মানুষ থাকবে! তারা কোম্পানীর রাজত্ব জয় করেছে, এখন সারারাত গাঁজা ভাঙ সিদ্ধি চলবে, মাঝখান দিয়ে খোদ লাটসাহেব চলে গেলেও ফিরে তাকাবে না। তুমি বসো, আমার বেশি দেরি হবে না।

বেরিয়ে যায় পান্না।

জীবন হাতের উপরে মাথা রেখে ভাবতে থাকে, এ আবার কোন্ নূতন সূত্র যুক্ত হল তার জীবনে? সোনার তক্তিটার কথা এতক্ষণ মনে ছিল না। ভাবলো একটা রহস্য নিয়ে চলেছি বুকে ঝুলিয়ে—আবার হঠাৎ এসে জুটলো এই স্নেহময়ী কুহকিনী। বুঝতে পারে না কোন্ নকশা তুলতে যাচ্ছে ওস্তাদ কারিগর তার জীবনের কিংখাপের উপরে। কেবল বোঝে যে বুনন ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। নিজের জীবনের উপরেও অধিকার নাই মানুষের, কত অসহায় সে।

॥ ১১ ॥

"পিয়া মহঁ‌ারে নৈণাঁ আগে রহযো জী"

সন্ধ্যাবেলায় পান্না যখন জীবনকে নিয়ে তেতলার ছাদে গিয়ে বসলো তখন চৈত্র মাসের আকাশে তারা উঠেছে। চাঁদ ওঠবার তিথি নয়। শতরঞ্জির উপরে সাদা জাজিম বিছানো, এক পাশে ছোট দুটি তাকিয়া। দেয়ালের পাশে রক্ষিত জলভরা নূতন কুঁজো থেকে সোঁদা সুগন্ধ উঠছে. রেকাবিতে রাখা বেলফুল ছড়াচ্ছে গন্ধ; নীচে বাগানে ফুটেছে রজনীগন্ধা, মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে তার গন্ধ এসে পৌঁচচ্ছে। সারাদিন শহরময় যে তাণ্ডব চলেছিল তাতে বিরাম ঘটায় এখন সমস্ত নিস্তব্ধ।

প্রথমে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে বসে থাকবার পরে পান্না প্রথম কথা বলল, জীবন একটা গান গাও।

গান! চমকে ওঠে জীবন।

চমকে উঠলে কেন, লখনৌ তো গান-বাজনার জায়গা।

তা বটে, কিন্তু আমি তো লখনৌর মানুষ নই, তোমাকে তো বলেছি আমি মানুষ হয়েছি কাশীতে।

কাশীতে কি মানুষে গান করে না?

গান করে, গান শেখে না। অন্তত আমি শিখি নি। কিন্তু এত বাদবিতণ্ডায় দরকার কি, শুনতে চাও গাইছি, তবে দ্বিতীয়বার আর শুনতে চেয়ো না, এই একটি গানমাত্র জানি।

প্রাণরক্ষাকর্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করবার ইচ্ছা তার হ'ল না। সে গাইল—"অব ছোড় চলে লখনৌ নগরী।"

গান শেষ হলে পান্না বলল, তোমার গলা আছে, সাধলে বেশ দাঁড়াবে।

তাহলে সাগরেদ করে নাও না কেন?

পান্না হেসে বলল, আমার সাগরেদ হ'লে সারাজীবন তামাক সেজেই কাটাতে হবে, আমার গলা থাকতে তোমার গলা কে শুনতে চাইবে?

বেশ, একবার পরীক্ষা হোক কেমন গলা তোমার।

পান্না কথা বলে না, তাই সে উপরোধের সুরে বলল, পান্না একটি গান

কি গান ফরমাশ করো ? আমি নাচওয়ালী, সেই গান শুনবে ?

জীবন বলে, ঠিক এই মুহূর্তে যে গানটি আমাকে শোনাতে ইচ্ছা করছে তাই গাও। নিজেই নিজেকে ফরমাশ করো।

বেশ, তবে তাই হোক, তানপুরাটা নিয়ে আসি।

উঠে গিয়ে তানপুরা নিয়ে এসে বসলো। তারপরে তানপুরাটা কোলের কাছে খাড়া করে ধরে বাজাতে আরম্ভ করল—

"পিয়া মইঁারে নৈণাঁ আগে রহয্যো জী
নৈণাঁ আগে রহয্যো মইঁানে ভুল মৎ জায্যো জী।"

সে কী কণ্ঠ! মধুরে-কোমলে মিনতি-অনুনয়ে, জীবন অবাক হয়ে ভাবে সে কী কণ্ঠ!

"ভওসাগর মে বহী জাত হুঁ
বেগ মইঁারী সুধ লীজ্যো জী।"

ছাড়া পাওয়া খাঁচার বিহঙ্গের মতো সুর উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠতে উঠতে কোন্ শূন্যে চলে গিয়েছে, মিলিয়ে গিয়েছে, আর চোখে পড়ে না। আবার পরমুহূর্তে ডানা গুটিয়ে ফিরে আসে খাঁচার কাছে—

"পিয়া মইঁারে নৈণাঁ আগে রহয্যো জী।"

সে কী কণ্ঠ ভাবতে ভাবতে অনুবাদ করে নেয় মনে মনে—প্রিয়া আমার আঁখির আগে দাঁড়াও, আঁখির আগে দাঁড়াও, আমাকে ভুলো না। এই ভব-সাগরে আমি ভেসে যাচ্ছি, একবারটি আমার খোঁজ নাও।

তানপুরার তারে তারে অঙ্গুলির লীলায় সুর জাগিয়ে পান্না গায়—

"মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর,
মিল বিছুড়ন মৎ কীজ্যো জী।"

হে মীরার প্রভু, হে গিরিধারী নাগর, একবার মিলন হ'লে আর যেন ছেড়ে যেয়ো না।

"মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর"—ঐ ছত্রটিতে সুর যেন ফিরে ফিরে মাথাকুটে মরছে, হে মীরার প্রভু ছেড়ে যেয়ো না, ছেড়ে যেয়ো না।

জীবন অবাক হয়ে ভাবে, এ কোন্ আত্মনিবেদন গুপ্ত ছিল ঐ লাবণ্যময়ী স্বৈরিণীর অন্তরে! এই অজ্ঞাত উৎসের স্বচ্ছ উজ্জ্বল উৎসারণে নিজেই যেন অবাক হয়ে গিয়েছে নারী।

"পিয়া মহঁারে নৈণ"া আগে রহয্যো জী—
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর"—

ছত্র দুটি ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে বারে বারে গায় পান্না। জীবন বুঝতে পারে কেউ শুনতে চায় নি এ গান, তাই আজ প্রথম আহ্বানে বেরিয়ে এসে আর থামতে চাইছে না। মীরার ভজন আগেও শুনেছে সে, কিন্তু বুভুক্ষু চিত্তের প্রথম খাদ্যমুষ্টির অমৃত ছিল না তাতে। ওর মনে পড়ে, বলেছিল পান্নাকে, তোমাকে বুঝতে পারি না, এখন বুঝলো না-বোঝার পরিমাণ অতল-স্পর্শ! স্নেহময়ী পান্না, রহস্যময়ী পান্না, বীরাঙ্গনা পান্না, সাধিকা পান্না। না জানি আরো কি রূপ আছে তার। সে বোঝে এক মানুষের মধ্যে হাজার মানুষের বাস।

গান শেষ হয়ে গেলেও তন্ময় ভাব কাটে না জীবনের, সে তখনও শুনছে "পিয়া মহঁারে নৈণ"া আগে, মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর।"

কি গো, সারা রাত গান শুনেই কাটাবে, না খাওয়া-দাওয়া আছে?

পান্না, এখন বিরক্ত ক'রো না।

পান্না হেসে বলে, গান শুনে যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হয় এতদিন কানে শোনা ছিল, এবারে চোখে দেখা গেল।

পান্না এমন করে নিজের গানকে নিজে লঙ্ঘন করে যেয়ো না।

ওগো নির্বোধ পুরুষ, নিজের গানকে লঙ্ঘন করে যেতে পারি বলেই আজও বেঁচে আছি।

স্পষ্ট দেখতে পায়, বোঝে না কথাটা জীবন। পুরুষের ফরমাশে যে-সব গান গাইতে হয় তাদের লঙ্ঘন করতে না পারলে কবে তলিয়ে যেতো এই পান্না।

তবু যে বোঝে জীবন, মনে হয় না পান্নার। প্রসঙ্গ উল্‌টিয়ে বলে, গানেই তো পেট ভরে গিয়েছে বুঝলাম, এখন শুনি শোয়াটা কোথায় হবে?

আর যেখানেই হোক, তোমার ঐ পাতালপুরী তহ্‌খানায় নয়।

তবে কি পান্নার কাছে নাকি?

রুষ্ট কণ্ঠে জীবন বলে, পান্না, তোমার কি লজ্জা নেই?

তোমার আছে জেনে নিশ্চিন্ত হলাম, নাও এখন ওঠো।

পান্নার বাড়িতে দিন কাটে জীবনের। সারাদিন লুকিয়ে থাকতে হয় তহ্‌খানায়, তবু সেখানেও মাঝে মাঝে চাপা আওয়াজে এসে পৌঁছয় শহরের তাণ্ডব। কখনও কামানের গুম্ গুম্, কখনও বন্দুকের দুড়ুম দুড়ুম, কখনও

জনতার হল্লা।' পান্না এসে শুনিয়ে যায় টুকরো-টাকরা খবর যা লোকমুখে ভেসে আসে, তার কতক সত্য, কতক গুজব। শহরের সাহেবরা ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গিয়েছে নৈনিতালের দিকে, মেম ও শিশুরা পালকির বাহক না পাওয়ায় সাহেবদের সঙ্গে ঘোড়াতেই পালিয়েছে। পল্টনের ছাউনি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সরকারী খাজাঞ্চিখানা থেকে লুটে নিয়েছে পাঁচ লাখ টাকা। হীরানন্দ শেঠ, জহরিমল শেঠ, লছমিনারায়ণ প্রভৃতি প্রত্যেকে আড়াই লাখ টাকা ভেট দিয়েছে বখৎ খাঁকে, যিনি এখন বেরিলির নবাব। পান্না বুঝিয়ে দেয়, নামে ভেট—আসলে জোর করে আদায়।

আবার কোনদিন বা এসে বলে যায়, দিল্লিতে বাহাদুর শাহ আবার হিন্দুস্থানের বাদশাহী নিয়েছেন। মীরাটে একটিও সাহেব জীবিত নেই। জঙ্গীলাট লজ্জায় আত্মহত্যা করেছে—মতান্তরে সিপাহীদের হাতে মারা পড়েছে। কলকাতা থেকে বড়লাট ছেলেমেয়েদের নিয়ে জাহাজে চড়ে সোজা দেশে রওনা হয়েছে। লখনৌতে স্যার হেনরী লরেন্স সিপাহীদের হাতে বন্দী। ওয়াজিদ আলি শা লখনৌ বলে রওনা হয়েছেন। এমন কত কথা।

জীবনের দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। ভয়ে নয়, ভীরু লোক অনিশ্চয়ের মুখে একাকী পথে বের হয় না। নিষ্ক্রিয়তাই তার দুশ্চিন্তার হেতু। এই রাজ্যব্যাপী ওলট-পালটের মধ্যে নিজের স্থান করে নেবে, বাহুবলে ভাগ্যলক্ষ্মীকে জয় করবে—এই তার ইচ্ছা। কিন্তু পান্নার ইচ্ছা অন্যরূপ। যাওয়ার প্রস্তাব করলে পান্না নিষেধ অনুরোধ উপরোধ ব্যঙ্গ পরিহাস করে, অবশেষে কাঁদতে শুরু করে। জীবনকে নিরস্ত হতে হয়। কখনও ভাবে জোর করে চলে যাবে—পান্না তার কে। এ চার-পাঁচ দিন আগেও তো সে ছিল না তার জীবনে। একদিন শুধিয়েছিল, তুমি আমাকে বাঁচাতে গেলে কেন? পান্না বলেছিল—এত বাড়ি থাকতে তুমি আমার বাড়িটাতে ঢুকতে গেলে কেন?

জীবন বলে, সেটা আকস্মিক।

পান্না উত্তর দেয়, এমন সব আকস্মিকের মালার নামই তো অদৃষ্ট।

রক্ষা করেছ বেশ করেছ, এখন যেতে দাও।

সেটা তোমারও হাতে নেই আমারও হাতে নেই, নইলে আর অদৃষ্ট কেন!

জীবন শুধোয়, আমার সঙ্গে তোমার ক-দিনের পরিচয়! আমার প্রতি এমন স্নেহ কেন?

সদ্যোজাত শিশুর সঙ্গে মায়ের ক-দিনের পরিচয়, তার প্রতি মায়ের স্নেহ কেন?

উত্তর খুঁজে পায় না জীবন।

এক একবার তার সন্দেহ হয়—পান্না কি তাকে ভালোবেসে ফেলেছে! জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না। সে বুঝে নিয়েছে পান্নার ব্যক্তিত্ব খরধার অসির মতো, যার সোনার হাতলটি মনোরম কারুকার্যে ভরা। ঐ কারুকার্যে মুগ্ধ হতে না হতে কখন ঝলসে ওঠে ইস্পাতের ফলা। সে মনে মনে ভয় করে পান্নাকে। ভালবাসায় ভয় গিনি সোনার খাদ—ওটুকু আছে বলেই মনে মনে গড়া যায় অলঙ্কার।

একদিন দুপুর বেলা ঘুম থেকে জেগে দেখে যে পান্না পাশে বসে বাতাস করছে। বলল, তুমি আবার কষ্ট করতে গেলে কেন?

আগাগোড়া ঘামে ভিজে গিয়েছে, জামাটা খুলে ফেলো।

জামা খুলতেই চকচক করে উঠল সোনার পাটা। এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল জীবন, পান্নার ঠাট্টার ভয়ে।

বুকের উপরে ওটা আবার কি? হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বলল, সাধে কি খোকাবাবু বলি! এ রক্ষাকবচ পরিয়ে দিল কে?

রাগত স্বরে জীবন বলল, এটা রক্ষাকবচ নয়।

ওঃ বুঝেছি, কর্ণের মতো অক্ষয় কবচ। বীরপুরুষ তাতে আর সন্দেহ কি? তাহলে দুর্যোধনের মতো দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকিয়ে আছ কেন? মার মার শব্দে বেরিয়ে পড়ো।

এ সব শ্লেষের উত্তর যোগায় না তার, হতাশভাবে বলে ওঠে, পান্না, তুমি কখন যে ঠাট্টা করো, কখন যে সত্য কথা বলো বুঝতে পারি না।

ও দুই ভিন্ন নয়। কিংখাবের উপরের দিকে যেটা পদ্মফুল নীচের দিকে সেটাই নিরর্থক আঁকজোক, সেটাই তো হ'ল ঠাট্টা।

তারপরে বলে, এটা যদি রক্ষাকবচ নয়, অক্ষয় কবচ নয়, তবে কী এটা?

সে কথা আমিও জানি নে।

তবে কি ভূত এসে পরিয়ে দিয়ে গিয়েছে?

তাও নয়। এই বলে সমস্ত বিবৃত করে জীবন। সমস্ত শুনে পান্না গম্ভীরভাবে বলে, তোমার জীবনেও অদৃষ্ট একটু মোচড় দিয়ে গিয়েছে দেখছি।

চমকে উঠে বলে, পান্না তবে কি তোমার জীবনেও অদৃষ্টের মোচড় আছে নাকি?

কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলে, নির্দিষ্ট তারিখের আগে ওটা কখনও খুলো না, নিশ্চয় বিশেষ কারণ আছে।

ছি ছি ছি, এমন কথা মুখে আনতে নেই, বলে হাত দিয়ে জীবনের মুখ চেপে ধরে।

তারপরে বলে, তা ছাড়া কি জানো—দুর্বলের দোষ চিরকাল। যাক শোনো। আমার বয়স যখন ছয়-সাত বছর, তখন আবার সন্তান হবে মা'র। বাবা মাকে বললেন, আবার যদি মেয়ে হয় তবে একটা আস্ত চিড় গাছ ভাঙবো তোমার পিঠে। বাবার যে কথা সেই কাজ, মায়ের চেয়ে বেশি কেউ জানতো না। তবু এতটুকু বিকার দেখা দিল না তাঁর মুখে। তাঁর গায়ে সোনার দাগ আর চিড় গাছের চাবুকের দাগ সমান শোভা পায়। জীবন, সেদিন তুমি বলেছিলে যে আমার মা যেন পাষাণের দেবী-প্রতিমা। আরো বাড়িয়ে বলতে পারতে। এমন আঘাত আছে যাতে পাষাণ ভাঙে, মা কখনও ভেঙে পড়ে নি। পাষাণের চেয়েও কঠিন মানুষের ধৈর্য। তারপর ক্রমেই আসন্ন হতে লাগলো সেই ভীষণ দিন। এমন সময়ে এসে উপস্থিত হলেন আমার মাতুল। তিনি এসে সব অবস্থা শুনে আর বাবার নিত্যনতুন চাবুক কাটা দেখে দাদার সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করলেন। আমি জানতে পারবো কেন, আমি তো নিতান্ত ছেলেমানুষ। সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই মা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, যখন জ্ঞান হ'ল দেখলেন বাবা সম্মুখে দাঁড়িয়ে, কোলে সদ্যজাত পুত্রসন্তান হাতে সোনার অলঙ্কারের পেটি।

ব্যাপারটা কি হ'ল বুঝলাম না!

এটা আর বুঝলে না। মায়ের অজ্ঞান হওয়ার সুযোগে সন্তান বদলা-বদলি হ'ল। হয়েছিল মেয়ে, সে জায়গায় রাখা হ'ল ছেলেকে।

এমন যোগাযোগ ঘটা তো সহজ নয়।

নয়ই তো। অনেক খোঁজাখুঁজি অনেক খরচের পরে মামাকে ব্যাপারটি ঘটাতে হয়েছে। তিনি আর দাদা অনেক সন্ধান করে বার করলেন যে পাশের গাঁয়ের আমাদের সম্প্রদায়ের একটি গরীব পরিবারে আসন্ন-প্রসবা এক রমণী আছে। মামা তাদের কিছু টাকা দিয়ে রাজী করালেন আর ওকে নিয়ে এলেন আমাদের গাঁয়ে। তারপরে দুই বাড়ির দাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে টাকা খাইয়ে সমস্ত পাকা করে রাখলেন। জীবন, টাকায় অনেক কিছু হয়। তারপরে যথাসময়ে টাকার লীলা প্রকট হ'ল। মেয়ের স্থানে এলো ছেলে, ছেলের স্থানে গেল মেয়ে।

উপন্যাসের মতো বিস্ময়-কাহিনী শুনে অবাক হয়ে যায় জীবন। শুধোয়, তোমার সে বোনের কি হ'ল পরে খোঁজ নিয়েছিলে?

আমার তো খোজ নেওয়ার কথা নয়। তবে তারা নিজ গ্রামে ফিরে গেলে দাদা লুকিয়ে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতো, কখনো কখনো টাকা দিত। বছর খানেক পরে একবার ফিরে এসে দাদা বলল, মেয়েটি নাকি মারা গিয়েছে, তবে তার বিশ্বাস টাকার লোভে কাউকে বেচে দিয়েছে, নিজের মেয়ে তো নয়। আমি অবশ্য এসব কথা বড় হয়ে অনেক পরে শুনেছি।

কে নিলো, কোথায় নিয়ে গেল, কিছু জানতে পেয়েছ কি?

কেমন করে জানবো? দুনিয়াটা ছোট নয়। যদি মরে গিয়ে থাকে তো কথাই নেই।

আর সেই ভাইটি?

যার আসবার কথা নয় এ সংসারে, এসেও সে রইলো না।

অধীর আগ্রহে জীবন বলে, কি হ'ল মুখে বলো! মৃত্যু?

তার চেয়েও হয়তো ভীষণ। তার বয়স যখন বছর দুই—একদিন রাতে নেকড়েতে নিয়ে গেল।

নেকড়েতে নিয়ে গেল! চমকে ওঠে জীবন।

চমকে উঠলে কেন? এমন তো হামেশাই হচ্ছে, বিশেষ গ্রীষ্মকালে, গেল বছরেও এ গাঁয়ের দুটো ছেলে নেকড়ের পেটে গিয়েছে। গরমীকালে রাতের বেলায় সবাই বাইরে চারপাই পেতে শোয়, তখন মাঝে মাঝে নেকড়ে এসে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মুখে ধরে তুলে নিয়ে যায়।

লোকে তাড়া করে না?

জানতে পারলে করে, কিন্তু ওরা এমন কৌশলী যে নিঃশব্দে কাণ্ডটি ঘটে। আর ছেলেটা যদি একবার কেঁদে ককিয়ে ওঠেও, শুনছে কে? সবাই তখন ঘুমে অচেতন।

কি হ'ল সেই ছেলেটার অনুমান করতে পারো?

অনুমানের অবকাশ কোথায়? হয়তো পশুর পেটে গিয়েছে, আর যদি বেঁচে গিয়েই থাকে তবে হয়তো পশুতে পরিণত হয়েছে।

তোমার মা এসব বিবরণ জেনেছেন?

জেনেছেন অনেক পরে, বাবার মৃত্যুর পরে দাদা সব খুলে বলেছে।

মা নিশ্চয় খুব কাঁদলেন!

জীবন, পাষাণ কি কাঁদে?

তবে ঝরনা ঝরে কেন?

কিন্তু যে পাষাণের চেয়েও কঠিন!

তুমি কাঁদো নি পান্না ?

ভাই, কাঁদতে গেলে সারা জীবনভোর কাঁদতে হয়।

একটু আধটু কাঁদলেই বা।

হিসাব ক'রে কাঁদা যায়! এখান থেকে শরৎকালে উত্তর দিকে তাকালে হিমালয়ের বরফ দেখতে পাওয়া যায়, সোনার রোদে ঝকঝক করছে। বলো তো সে হাসি না কান্না ? হাসি যদি তবে গ্রীষ্মকালে গ'লে গিয়ে বন্যা নামায় কেমন ক'রে, কতবার তো ভেসে গিয়েছে আমাদের রামগঙ্গা। কান্না যদি তবে এমন সকৌতুক উজ্জ্বল কেন ?

উত্তরের আশা না রেখে বলে যায় পান্না, যেন সে নিজেকেই শোনাচ্ছে।

জীবন, তুমি অনেকবার বলেছ আমি কথায় কথায় হাসি। কেন জানো ? আমার হাসিই কান্না। সন্ধ্যাবেলায় মুজরার আসরে যখন ইয়ারদের রসিকতায় হাঃ হাঃ শব্দে হেসে উঠি তখন অনেক সময়ে পাশের ঘরের লোক চমকে উঠেছে—পান্না কাঁদে কেন ? পান্না কাঁদে কেন ? পান্নার হাসিই যে কান্না।

জীবন বুঝলো অনেককালের রুদ্ধ উৎস খুলে গিয়েছে, সহজে থামবে না।

বুঝলে জীবন, হাসির তবকে মুড়ে জমাট চোখের জল এনেছি থরে থরে, লোকে বিচার না ক'রে হাসির মুদ্রা ভেবে নিয়ে যায় জেব্ ভরে। যাক, তাতেই যদি খুশী হয়। লোকে বলে—পান্নার হাসির দামটুকুই হাজার মোহর। এ হাসি অশ্রুগর্ভ বলেই যে তার মূল্য। নইলে ফাঁকা হাসির আওয়াজে কাকপক্ষীটাও মরতো না।

জীবন চৈত্র মাসের আকাশের দিকে তাকায়, দেখে যে পান্নার বেদনা বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠে আকাশের তারাগুলোকে টনটন করাচ্ছে। ঐ নূতন কুঁজোর ভেজা মাটির গন্ধ, ঐ বেলফুলের প্রগাঢ় গন্ধ, সমস্ত যেন স্তম্ভিত হয়ে কান পেতে আছে, সন্ধান করছে পান্নার অশ্রুর গোপন উৎসটির।

পান্না আবার বলতে শুরু করেছে এমন সময়ে শহরের উত্তর দিকে তুমুল কলরব উঠলো, "গোরে আয়ে, গোরে আয়ে, গোরে আয়ে, গোরে আয়ে।"

চটকা ভেঙে যায় পান্নার, বলে, তুমি বসো, আমি খোঁজ নিয়ে আসি ব্যাপার কি ? সত্যিই কি কোম্পানীর ফৌজ এসে পড়লো নাকি ?

॥ ১৩ ॥

"পথ আমারে পথ দেখাবে।"

কিছুক্ষণ পরে পান্না ফিরে এসে বলল, তুমুল গণ্ডগোল ছাড়া আর কিছুই

বুঝতে পারা যাচ্ছে না। সবাই কারণ জিজ্ঞাসা করছে, কি ঘটেছে কেউ জানে না।

সিপাহীদের কাউকে জিজ্ঞাসা করলে অবশ্যই জানতে পারা যাবে, বলল জীবন।

সিপাহীদের অবস্থা দেখলে দয়াও হয়, হাসিও পায়। তারাই সবচেয়ে ভয় পেয়েছে, উত্তর দেওয়ার জন্যে দাঁড়াবার সময় নেই, মুখে একমাত্র রব—গোরে আয়ে গোরে আয়ে।

তবে ?

তবে আর কি রাতটা ঘুমোও, কাল সকালে খোঁজ নিলেই চলবে। সত্যি যদি কোম্পানীর ফৌজ এসে থাকে, তবে তো ফাঁড়া কেটে গেল।

পরদিন বেলা আটটা নাগাদ পান্না ও তার দাদা এসে উপস্থিত হ'ল জীবনের ঘরে। পান্নার দাদা মহাদেব মিছির চার হাত লম্বা—তদনুরূপ চওড়া বিরাট পুরুষ, বয়স বছর তিরিশ, বেশ গম্ভীর মুরুব্বী ভাব। পান্নাকে বলে খোঁকী, পান্না প্রবল আপত্তি করে, অবশেষে দুই পক্ষে অনেক বাদানুবাদের পরে এখন বলে খোঁকী ভাই। জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, তাকে বলে জীওনবাবু।

'গোরে আয়ে গোরে আয়ে'র রহস্য ব্যাখ্যা করতে শুরু করে মহাদেও, বলে, কাল বখৎ খাঁ শালা, হাতী ঘোড়া আর যত হীরা জহরত লুট করেছে। সব নিয়ে দিল্লি রওনা হয়ে যায়, মতলব এই যে সেখানে গিয়ে বাদশাহকে ভেট দিয়ে কমাণ্ডার-ইন-চীফ বনবে। যাওয়ার সময়ে বেরিলি শহরে রেখে যায় এক পল্টন ফৌজ, কিছু ঘোড়া উট আর একটা হাতী। বখৎ খাঁ বিদায় নিতেই কাল সন্ধ্যাবেলা থেকে সিপাহী লোক গাঁজা, গুলি, ভাঙ, চণ্ডু, চরস শুরু করে দিল। শেষে এমন হাল হ'ল যে কেউ কাউকে চিনতে পারে না, কারো উঠে দাঁড়াবার সাধ্য নেই। সন্ধ্যাবেলা উট আর ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রাখতে ভুলে গিয়েছিল, সেগুলো ছুটোছুটি আরম্ভ করতেই ওদের ধারণা হ'ল যে, কোম্পানীর ফৌজের পায়ের শব্দ! তখন আর কি ?

এই পর্যন্ত বলে সে থামে। মহাদেওর বোধ করি ধারণা মুরুব্বী লোকের একসঙ্গে অনেক কথা বলা উচিত নয়।

জীবন শুধোয়, তার পরে কি হ'ল মহাদেওজী ?

মহাদেবও যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে ঘনীভূত করে একটি প্রবাদ উচ্চারণ করে —হাথী ঘোড়ে বহে জাঁয়, গদ্‌হা কহে কিৎনা পানী। শালালোগ লড়বে

কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গে, নিজের ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনে মূরছা যায়! মারাঠা গেল, শিখ গেল, এখন এরা লড়বে কোম্পানীর সঙ্গে।

জীবন বলে, শুনেছি বখৎ খাঁ মস্ত বীর।

বুড়ী ঘোড়ীকে লাল লগাম! বখৎ খাঁ মস্ত বীর!

তবে দিল্লি রওনা হ'ল কেন?

অভী দিল্লি দূর হায়, জীওনবাবু, অভী দিল্লি দূর হায়। শালার মতলব বুঝছেন না। শালা ভাগ গয়া, তামাম হীরা জহরত লিয়ে ভাগ গয়া।

তবে ফৌজ নিল কেন সঙ্গে?

পাহারা দেবে কৌন?

আর এখানে যে ফৌজ রেখেছিল তার কি হ'ল?

শালালোগ এমন ভয় পেলো যে কাল রাতেই যে-যার গাঁয়ে পালিয়ে গিয়ে জরুর আঁচলের তলে ঢুকেছে। গঙ্গা গয়ে গঙ্গারাম, যমুনা গয়ে যমুনাদাস। বুঝলেন না বাবু সাব!

তবে এখন বেরিলির অবস্থা কি?

তামাম শুধ্! একটা সিপাহী নাই। হিন্দু লোগ গিয়েছে ধোপেশ্বরের মন্দিরে পূজা দিতে, মুসলমান লোগ গিয়েছে দরগায় শিরনি চড়াতে।

আবার যদি ওরা ফিরে আসে?

কারা? বখৎ খাঁর সিপাহী? শালালোগ নিদমে গোরার লাল মুখ দেখে ফুকরে ওঠে। ছ' মাহিনার মধ্যে আর ফিরবে না ওরা।

মুক্তির উপায় চোখে পড়ে জীবনের। সে বলে, তবে তো এবার আমি রওনা হতে পারি।

মহাদেবও বলে, যদি যাওয়া ঠিক ক'রে থাকেন, তবে এই সময়। কিন্তু যাবেন কোন্ দিকে?

দেরাদুনের দিকে যাবো বলেই বেরিয়েছিলাম, কর্নেল ব্রিজম্যানের নামে ছিল চিঠি। এখন যে কি করবো ঠিক বুঝতে পারছি না।

এতক্ষণ পান্না নীরব ছিল, জীবন যাবে শুনে চঞ্চল হয়ে উঠল, বলল, আর ক'দিন থেকে গেলে হয় না!

জীবন বলল, তখন আবার কি ঝামেলা হবে কে জানে?

মহাদেও তাকে সমর্থন করে বলে, হাঁ বাবু সাব, এই সুযোগ।

কিন্তু যাবো কোন্ দিকে তাই ভাবছি।

আপনি দিল্লির দিকে রওনা হ'ন, মতলব এই যে পথে কোম্পানীর ফৌজের

সঙ্গে দেখা মিলবে, তখন কর্নেল,—ঐ শালার কি নাম ?

জীবন বোঝে যে উক্ত অভিধা ব্যবহারে মহাদেও যেমন উদার তেমনি নিরপেক্ষ। নামটি মনে করিয়ে দেয়।

মহাদেও বলে, ঐদিকেই কর্নেলের পাত্তা মিলবে।

কিন্তু ঐ পথে যে বখৎ খাঁও গিয়েছে, আমি ওর লোকের হাতে পড়তে চাই না।

ও শালা ডাকুর হাতে কেন পড়তে যাবেন! ওরা গিয়েছে বুলন্দশর, সিকান্দ্রাবাদের পথে—ঐ পথটাই সিধা। আপনি রামগঙ্গা পার হয়ে মোরাদাবাদ, মীরাটের পথে যান। তবে কোন বড় শহরে ঘুষবেন না, কি জানি কেমন হাল!

সেই কথাই ভালো, আজ বিকালেই রওনা হব। মহাদেওজী আমাকে একটা ঘোড়া খরিদ ক'রে দেন, যা দাম লাগে দিচ্ছি।

মুরুব্বী লোক কম হাসে, কিন্তু যখন হাসে তা গভীর অর্থদ্যোতক। এহেন একটি হাসি চমকে উঠল মহাদেওর ওষ্ঠাধরে। সে বলল, বাবুসাব, বেরিলিতে আজ গেঁহু, চাবল সব মাঙ্গা, সস্তা ঘোড়া আর উট।

এ কেমন ক'রে হ'ল ?

বুঝলেন না জীওনবাবু, সিপাহী লোকের ঘোড়াগুলো যে পারে নিয়ে নিচ্ছে। আমি দুটো ধরে এনেছি, আপনি একটা নিয়ে যান।

মহাদেও চলে গেলে পান্না শুধোলো, জীবন, সত্যিই কি যাবে ?

পান্না এমন সুযোগ আর মিলবে না, আমাকে বাধা দিয়ো না।

পান্না বলে, বাধা দিলেই বা শুনবে কেন, আর আমি বাধা দেবারই বা কে ?

এ তো রাগের কথা হ'ল।

হ'লই তো। বলে বেরিয়ে চলে গেল পান্না।

জীবন মনে মনে সঙ্কল্প করে জীবনস্রোতে ভাসতে শুরু ক'রে প্রথম ঘাটেই পড়বে না। ভাবে, পান্নার চোখের জলে স্রোত যদি প্রবলতর হয় ভালই, ঘাটের থেকে ঠেলে দিয়ে দ্রুততর বেগে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ পরে তার ফৌজী থলি, কোমরবন্ধ, পিস্তল প্রভৃতি নিয়ে প্রবেশ করে পান্না।

নাও তোমার সব জিনিসপত্র বুঝে নাও।

বুঝে নেবার কোন উদ্যম প্রকাশ না করে জীবন বলে, থলিটা যেন এবারে বেশি ভারি মনে হচ্ছে!

খানকতক চাপাটি আর গুড় দিয়েছি, শুধু পান্নার চিন্তায় তো পেট ভরবে না।

কথাটা বলে পান্না হেসে ওঠে। জীবন বলে, এই তো আমার চিরপরিচিত পান্না।

জীবন, ঐ সের-প্রমাণ হাসিটাকে নেঙড়াও, বেরিয়ে আসবে ছটাক-পরিমাণ কান্না। অদৃষ্ট যে পান্নার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন কান্না। মানুষের সাধ্য কি দুঃখের হাত থেকে আমায় বাঁচায়!

পান্না, পথে নেমেই তোমার দেখা পেলাম। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না যে এমনটি সম্ভব। তোমার তুলনা নেই।

কি ক'রে জানলে? এখনো তো পথের চোদ্দ আনাই বাকি।

এ হচ্ছে সাপের মাথার মণি। প্রথমেই চরম রত্ন, তারপরে বাকি চোদ্দ আনাতে আর কিছু আছে কি?

না জীবন, ওসব অলীক কথা দিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা ক'রো না। ক্রমে পথের মোড়ে মোড়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর রত্ন দেখতে পাবে, ফিকে হয়ে আসবে পান্নার স্মৃতি।

তারপরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে, অনেক ঠকেছি, অনেক ঠকেছি, বেশী কিছু আশা করবার সাহস আর নেই। কেবল একটি কথা বলে যাও যে, আবার দেখা হবে।

জীবনের মুখে আসে, তোমার সেই ছোট্ট বোনটি থাকলে নিশ্চয় দেখা হতো। কিন্তু সেটা আর বলে না। বলে, দেখা হবে বই কি পান্না—নিশ্চয় দেখা হবে।

জীবন, তোমার বয়স অল্প বলেই মনে করছ দুনিয়াটা ছোট। যেন এ-বাড়ি ও-বাড়ি, ফিরে এলেই হ'ল। না ভাই, দুনিয়া মস্ত—একবার ছাড়াছাড়ি হ'লে আর কাছাকাছি হ'তে চায় না।

হোক দুনিয়া বড়, তবু এখান থেকে দিল্লি কতটুকু পথ!

ঐ তো শুনলে না এখনি দাদার মুখে—অভি দিল্লি দূর হায়।

এ সব কথার কি আর শেষ আছে! চিরকাল চালানো যায়, যে-কোন জায়গায় থামানো যায়। সংসারে কাজের কথার শেষ আছে, অকাজের কথা অনন্ত।

তারপরে দুপুর বেলা পান্নার মাকে প্রণাম ক'রে, মহাদেওকে নমস্কার জানিয়ে, পান্নাকে গদগদশ্রুলোচনা ক'রে, কোন রকমে নিজের চোখের জলটি চেপে রেখে ঘোড়ায় চড়ে বিদায় হয়ে গেল জীবন। পান্না ঘরে ফিরে এসে

বালিশ বুকে গুঁজে উপুড় হয়ে পড়লো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে গেল পথিক জীবনের মন থেকে। সমস্ত দুঃখের প্রতিষেধক ঐ পথ।

॥ ১৪ ॥

"ক্ষণে হাতে দড়ি—

আবার পথ। যখন সে ঘরে ছিল, ভেবেছিল ঘরটাই সত্য, পথটা সাময়িক; পথে বের হওয়ার পর থেকে বুঝতে পেরেছে পথটাই নিত্য, ঘর নৈমিত্তিক মাত্র। জীবনলাল যদি অনভিজ্ঞ যুবক না হয়ে প্রবীণ দার্শনিক হ'ত, তবে বুঝতো যে পথের সূতো দিয়ে ঘরের মালা গাঁথা চলছে সংসারে। কিন্তু ঐ সূতো আর ফুলের মধ্যে কোন্‌টা সত্য তার উত্তর তো এ পর্যন্ত কোন প্রবীণ দার্শনিক দিতে পারে নি। কিন্তু এত কথা ভাববার তার বয়স নয়। এখন সে অশ্বারোহী তাই অল্প সময়ের মধ্যেই রামগঙ্গার ঘাটে এসে উপস্থিত হ'ল, আর খেয়াতে পার হ'তেও কোন প্রতিবন্ধক ঘটলো না। খেয়াঘাটে লোকজনের মধ্যে যে কথাবার্তা চলছিল তাতে বুঝলো যে এতদিন খেয়াঘাটে সিপাহী পাহারা ছিল, পাস না দেখাতে পারলে কাউকে পার হ'তে দিত না। কিন্তু বাবা ধোপেশ্বরের দয়ায় ডাকুলোক সব পালিয়েছে—এখন যে খুশি পার হয়ে যাও, মাঝিকে একটা ঢেবুয়া দিলেই হ'ল।

চাঁদনী রাত ছিল। সন্ধ্যা বেলাতে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে নিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করলো। এই কয় ঘণ্টা পথ চলেই সে বুঝে নিয়েছে—বড় বড় শহরে অশান্তি দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চল সম্পূর্ণ নিরাপদ, শহরের অশান্তির সামান্য ঢেউটা পর্যন্ত সেখানে পৌছয় নি। এই তো সারারাত সে একাকী পথ চললো, কই, কেউ তো বাধা দিল না। না দেখা গেল একটা সিপাহী, না শোনা গেল একটা বন্দুকের আওয়াজ। পরদিন দুপুরতক পৌছলো মোরাদাবাদ শহরের কাছে। শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিয়েছিল মহাদেও, তার নিজের অভিজ্ঞতারও সমর্থন পেয়েছে এই অল্প সময়ের মধ্যে। কাজেই মোরাদাবাদকে বাঁ দিকে রেখে সে এগিয়ে গেল। মাঠের মধ্যে গাছের তলায় বসে পান্নার হাতের চাপাটি খেয়ে বিশ্রাম করে নিল। তারপর ঘোড়াটাকে জল খাইয়ে আবার রওনা হয়ে পড়লো। ভাগ্যিস পান্না অনেকগুলো চাপাটি দিয়েছিল—গুনে দেখলো আরো দিন-দুই চলবে। ঐ চাপাটি আর গুড় সঙ্গে না থাকলে বোধ করি অনাহারেই থাকতে হ'ত। এবারে

সে চলেছে মীরাটের দিকে। ভোর বেলা গঙ্গা পার হ'ল নিরাপদে। কিন্তু এভাবে শহর এড়িয়ে এড়িয়ে চললে কর্নেল ব্রিজম্যানের সন্ধান পাওয়া যাবে কি করে? দেহাতের লোক নিশ্চয় তার সন্ধান রাখে না। আবার জিজ্ঞাসা করার মধ্যে বিপদ থাকতে পারে। ওদের মধ্যে যদি কেউ সিপাহী থাকে, কোম্পানীর লোক মনে করে খুন করতে পারে জীবনকে। তাই সে স্থির করলো যে মীরাটের কাছে গিয়ে যদি শহরের অবস্থা শান্ত মনে হয়, তবে ব্যারাকে গিয়ে খোঁজ নেবে কর্নেল ব্রিজম্যানের গতিবিধির।

মীরাটের কাছে পৌছে দেখলো যে শহরের অবস্থা শান্ত, কিন্তু আর একটু এগোতেই মিলিটারি ব্যারাকের দগ্ধ ঘরগুলো দেখে বুঝলো এখানেও অশান্তি দেখা দিয়েছিল। তবে এখন বোধ হয় আর ভয়ের কারণ নেই। আরো খানিকটা এগোতেই দেখতে পেলো জায়গায় জায়গায় গোরা সিপাহী সঙিন উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে। তাকে দেখতে পাওয়া মাত্র একজন গর্জে উঠল—হুকুমদার! জীবন ততোধিক উচ্চস্বরে বলল—ফ্রেণ্ড। আর তখনই ঘোড়া থেকে নেমে দুই হাত উঁচু করে দেখালো যে সে নিরস্ত্র।

এডভান্স।

গোরা সিপাহীর কাছে গিয়ে ইংরাজীতে বলল, ছাখো আমি আসছি লখনৌ থেকে, সন্ধান করছি কর্নেল ব্রিজম্যানের, আমার কাছে পরিচয়পত্র আছে জেনারেল উট্রাম ও স্যার হেনরি লরেন্সের।

দুইজন সুপরিচিত ব্যক্তির কথা শুনে গোরা সৈনিকটি বলল, তুমি আমাদের কর্নেলের সঙ্গে দেখা করো, তিনি জানতে পারেন।

আমার সঙ্গে একজন গাইড দাও, নইলে গুলি ক'রে মেরে ফেলতে কতক্ষণ।

রাইট! একজনকে বলল, একে নিয়ে যাও কর্নেলের কাছে।

বাংলোর বারান্দায় বসে কর্নেল ও তার স্ত্রী আলাপ করছিল; অনেকদিন পরে পাহাড় থেকে ফিরেছে স্ত্রী, কাজেই সাহেবের মেজাজ বেশ সরিফ ছিল। জীবন গিয়ে স্যালুট করে দাঁড়াতেই জিজ্ঞাসা করলো—ব্যাপার কি? জীবন সব কথা বলে পরিচয়পত্র দুখানা এগিয়ে দিল। কর্নেলের আর অবিশ্বাসের কারণ রইলো না, বলল, ইয়ংম্যান, আমি খুশী হলাম যে তুমি কোম্পানীর ফৌজে ঢুকতে চাও। তবে ব্রিজম্যান এখন ঠিক কোথায় বলতে পারি না। ক'দিন আগেও আম্বালায় ছিলেন। এতদিনে বোধ হয় কর্নালে এসে পৌচেছেন। তুমি এক কাজ করো, সোজা জুমনা পেরিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে গিয়ে পড়ো—দু'দশ মাইল আগে পিছে নিশ্চয় তার দেখা পাবে।

জীবন স্যালুট করে বিদায় নিলে কর্নেল হুইটনি যতখানি সম্ভব বায়ু ফুসফুসে টেনে নিয়ে বিস্ফারিত বক্ষে পত্নীকে বলল, Dearie, India is again ours.

পত্নীর যে খুব একটা বিশ্বাস হ'ল তা মনে হয় না, এখনো সম্মুখে ভস্মীভূত পল্টন ছাউনি, বলল, বুঝলে কি করে ?

দেখছ না ঝাঁকে ঝাঁকে লোক আসছে আমাদের কাছে !

কোথায় ঝাঁকে ঝাঁকে। ও তো একটি মাত্র লোক। One Swallo does not make the summer.

তুমি দেখছ একটি, আমি দেখছি দুটি।

কোথায় দুটি দেখলে ?

একজন ঐ যাচ্ছে, আর একজন এই আমার পাশে।

মীরাট থেকে যে পথে যমুনা পার হ'তে হয়েছে জীবনকে তাকে পথ বলা উচিত নয়, পোড়ো মাঠ আর চাষের জমি। একটা গোটা রাত লেগেছে যমুনার পশ্চিম তীরে পৌঁছতে। রাতে একবারও বিশ্রাম করে নি, পাছে ব্রিজম্যানের নাগাল না পায়। যমুনা থেকে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড প্রায় দশ মাইল। যখন সেখানে এসে পৌঁছলো আর এক পা চলবার শক্তি রইলো না, না আরোহীর না ঘোড়ার। পাশে একটা মস্ত বট গাছ ছিল। গাছের ডালে বাঁধলো ঘোড়াটাকে। তারপরে থলিটা পিঠ থেকে খুলে শেষ চাপাটি ক'খানা বের করলো, ঘামে আপাদমস্তক গা ভিজে গিয়েছিল, জামার বোতাম খুলে দিল, চকচক করে উঠল সোনার তক্তিটা। তারপরে একটু জিরিয়ে নিয়ে খান দুই চাপাটি খেল, খান চারেক পড়ে রইলো ; জল নেই, গলা শুকিয়ে গিয়েছিল ; পেটে খিদে থাকা সত্ত্বেও গলা দিয়ে নামল না। ঘুমুবে না, কেবল একটু গড়িয়ে নেবে মনে ক'রে থলিটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লো। অমনি প্রগাঢ় ঘুম। এমন ঘুম কেবল পথিকেই সম্ভব।

কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছে জানে না। হঠাৎ পাঁজরে একটা গুঁতো খেয়ে হকচকিয়ে চোখ মেলে দেখে যে তার নাকের আধ হাত উপরে একটা বন্দুকের চোঙ আর তার হাত-দুই উপরে প্রকাণ্ড একটা লাল মুখ।

সে ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে উঠতেই লাল মুখ প্রশ্ন করলো, Who are you ?

জীবন বলে, I am a friend of the Government.

লাল মুখের শুষ্ক অধর ব্যঙ্গে ঈষৎ বঙ্কিম হয়ে শুধায়, Which Govern-

ment, eh ? Badshah Government ?

I mean the friend of the British Government.

Indeed ?

জীবন দেখে লাল মুখে নিষ্ঠুরতাজাত বিদ্রূপের হাসি। তখন দুই পক্ষে ইংরাজিতে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে।

বিশ্বাস না হয় আমি জেনারেল উট্রাম ও স্যার হেনরি লরেন্সের পরিচয়পত্র দেখাতে পারি।

বেশ, বের করো পত্র।

থলিটা কোথায় ? ঘোড়াটা কোথায় ? গলায় হাত দিয়ে দেখে তক্তিটা কোথায় ? এক মুহূর্তে সঙ্কটের গুরুত্ব প্রকট হয় জীবনের কাছে। সে হতাশভাবে বলে ওঠে, যে থলির মধ্যে পরিচয়পত্র দু'খানা ছিল ! সেটা দেখছি না, ঘোড়াটাও দেখছি না। আমি হৃতসর্বস্ব। I am lost !

Not before we blow you from that gun—এই বলে বাঁ হাতে বুড়ো আঙুল বেঁকিয়ে নির্দেশ করলো। জীবন দেখলো অদূরে তিনটি কামান, দুটোর মুখে দুজন দেহাতী লোক শক্ত করে বদ্ধ।

The third one is for you !

তারপরে মন্তব্য করলো, উট্রাম ও লরেন্সের নাম ক'রে বেশ একটি গল্প ফেঁদে-ছিলে, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলে না।

জীবন দেখলো এখন দমে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু। শেষ চেষ্টা করবার উদ্দেশ্যে বলল, ছাখো অরাজকতার সময়ে মাঠের মধ্যে নিঃসঙ্গ নিদ্রিত পথিক যে অপহৃত হবে এ তো খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু তার চেয়েও স্বাভাবিক তোমার গল্পটা, প্রায় বিশ্বাস করিয়েছিলে আর কি ! হ'লে কি হয়, যথাকালে তোমার প্রমাণগুলো অলীক পাখির মতো উড়ে পালিয়েছে।

জীবন যেন কী বলতে উদ্যত হয়েছিল, বাধা দিয়ে সৈনিকটি বলল, তোমার পক্ষের প্রমাণ তো দেখাতে পারলে না—আমার পক্ষের প্রমাণ দেখবে কি ?

কি প্রমাণ ?

ওগুলো কি ? বলে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো ভুক্তাবশেষ চাপাটিগুলোর দিকে। ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন গোরা সৈনিক এসে উপস্থিত হয়েছে। লাল মুখের ইঙ্গিতের অর্থ জীবন বুঝবার আগেই তারা বুঝলো, একসঙ্গে চমকে উঠল, সমস্বরে বলল, Those infernal letters ! সেই পৈশাচিক চিঠি !

কোথায় চিঠি, কেন পৈশাচিক—কিছুই বুঝতে পারে না জীবন। কিন্তু ওরা ভাবে এটা অজ্ঞতা নয়, অজ্ঞতার ভান মাত্র। লোকটা পাকা অভিনেতা, গ্যারিক বললেই চলে।

সবাই বলে, তবে আর দেরি ক'রে লাভ কি, তিনটে Pandyকেই একসঙ্গে সাবাড় করে দেওয়া যাক।

মঙ্গল পাণ্ডে ঈশ্বর পাণ্ডে, প্রথম বিদ্রোহী। পুরবিয়া ফৌজের অনেকেই—পাণ্ডে—তারাই বিদ্রোহের অগ্রণী। সেই সুবাদে ইংরাজের কাছে বিদ্রোহী-মাত্রেই পাণ্ডে বা Pandy!

জীবনকে নিয়ে গিয়ে তৃতীয় কামানের মুখে এমনভাবে বাঁধা হ'ল যে তার মাথাটা পড়লো কামানের চোঙের মুখে। মাঝখানে সে, দু' পাশে দুজন দেহাতী লোক। তাদের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণ তাদের সুস্থ সবল দেহ। এমন বলবান ব্যক্তিরা বিদ্রোহী না হয়ে যায় না। গাছে লটকে ফাঁসি দেওয়াতে খরচ কম হ'লেও সব সময় হাতের কাছে তেমন মজবুত গাছ পাওয়া সম্ভব নয়। তখন কামান দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। পন্থাটা ঘোরতর পৈশাচিক হ'লেও ওতে নাকি যন্ত্রণা নেই, মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যায়। দয়ালু হত্যাকারী।

জীবন বুঝলো ঘটনাস্রোতের দ্বিতীয় ঘাটে এসেই তার এ জন্মের লীলা শেষ। প্রথম ঘাটটি ছিল যেমন মনোরম দ্বিতীয়টি তেমনি নিদারুণ, তৃতীয় বলে আর কিছু রইল না। ভয় অবশ্যই তার করছিল, মৃত্যুকে যে ভয় করে না সে হয় দেব নয় দৈত্য। কিন্তু এই চরম মুহূর্তে এসে বুঝতে পারলো, দূর থেকে মৃত্যু যেমন ভীতিকর, বস্তুত তেমন নয়। এই অভিজ্ঞতার যুক্তি অনুসরণ করে চললে হয়তো মৃত্যুর পরের অবস্থাও আদৌ ভীতিকর নয়—হয়তো বা প্রীতিকর। এ সব কথা কুড়ি বৎসরের যুবকের মনে উদয় হওয়ার নয়—কিন্তু এখন যে সর্বজ্ঞ মৃত্যুর ছায়া পড়েছে তার মনে, তাই অনেক কিছু সে বুঝতে পারছে—কয়েক মুহূর্ত আগেও যা ছিল দুর্বোধ্য। পাশের লোক দুটির ভরসার ভাব দেখে তার সাহস আরো বাড়লো। ওরা বেশ নির্বিকার। ঠোঁট দুটো দেখলে বোধ হয় যে কোন একটা নাম জপ করছে, যেমন হয়তো প্রত্যহ করে গঙ্গাস্নানের সময়।

রেডি, ফায়ার!

একজন পলতের করে আগুন দিল, একসঙ্গে গর্জে উঠলো দুটো কামান, আর মুহূর্ত-মধ্যে লোক দুটোর শতচ্ছিন্ন দেহ আকাশে উত্থিত হয়ে রক্ত মাংস

ক্লেদের বৃষ্টিতে অজস্র ধারায় নেমে এলো। এই নারকীয় দৃশ্যের বীভৎসতা দেখবে না ভেবে চোখ বুজেছিল জীবন, এমন সময় আবার শুনলো, রেডি! এই তার শেষ মুহূর্ত। কুড়ি বৎসরের জীবনের ছবি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো ছুটে চলে গেল চোখের সম্মুখ দিয়ে—মা, বাবা, ভৈরব চাটুজ্জে, মোতি মহল, বিশ্বনাথের গলি, গোমতীর চর, দিলখুশা পার্ক, রমনা, চটিদারের চাপাটি, পান্না, তুই কোম্পানীর গুলিতেই মরবি—হারানো তক্তির অজ্ঞাত রহস্য—

স্টপ!

ওদের মধ্যে একজন লেফ্‌টেনাণ্ট শ্রেণীর অফিসার ছিল, সে হুকুম করলো, স্টপ!

লোকটাকে ঠিক Pandy বলে মনে হয় না, হয়তো সত্যিই ওর জিনিসপত্র চুরি গিয়েছে, সেই প্রশংসাপত্রগুলোও।

আর ঘোড়াটা? শুধায় একজন।

আমার বিশ্বাস, তৃতীয় লোকটা ঘোড়ায় চেপে পালিয়েছে—তাই ধরা পড়ে নি।

তবে এখন কর্তব্য কি?

কর্নেলের জন্য অপেক্ষা করা যাক্, তিনি এসে যা কর্তব্য বোধ করেন করবেন।

জীবন ভাবলো, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

প্রবাদটা সত্য নয়। মৃত্যুর সময়ও মানুষ আশা ছাড়ে না। সেই আশার ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠেছে পরলোকের ধারণা।

॥ ১৫ ॥

—ক্ষণেকে চাঁদ”

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। লেঃ জেভার্স দূরবীন বাগিয়ে দেখে বলল, কর্নেল ব্রিজম্যানই বটে। ব্রিজম্যান এসে পৌঁছতেই সকলে স্যালুট ক'রে দাঁড়ালো। ব্রিজম্যান বলল, লোকটা যেন Satyr। ঘোড়া আর সওয়ারকে এমন এক হয়ে ছুটতে আর দেখি নি, যেন দু'য়ে মিলে এক দেহ।

পালালো নাকি?

পালালো বইকি। তবে এই থলিটা ফেলে গিয়েছে, ছাখো তো এর মধ্যে কী আছে।

এই বলে ঘোড়ার জিন থেকে খসিয়ে থলিটা ফেলে দিল। এই ঘটনা ঘটছিল কামান থেকে কিছু দূরে, তাই কর্নেল জীবনকে দেখতে পায় নি। আর জীবন এমন শক্ত ক'রে বাঁধা যে নাক-বরাবর ছাড়া তার তাকাবার উপায় ছিল না।

লেঃ জেভার্স খানতিনেক চিঠি দিল কর্নেলের হাতে। খাম খুলতে খুলতে কর্নেল বলল, এ দুখানা প্রশংসাপত্র মনে হচ্ছে। আরে, তৃতীয়খানা যে খাস আমার নামে।

অধীর আগ্রহে চিঠি তিনখানা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে শুধালো, পত্রবাহক কোথায়?

কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুতভাবে জেভার্স বলল, বোধ করি ঐ সেই লোক।

করেছ কি! ওকে কামানে বেঁধেছ কেন?

আমরা তো উড়িয়ে দেবো ভেবেছিলাম, দুটো Pandy-কে এই কয়েক মিনিট আগে উড়িয়ে দিয়েছি।

কি সর্বনাশ! ও Pandy নয়। জেনারেল উট্রাম আর স্যার হেনরি লরেন্সের বিশ্বাসভাজন প্রিয়পাত্র। স্যার হেনরি ব্যক্তিগত পত্রে আমাকে জানিয়েছেন, হাজার লোক যদি এক দিকে থাকে আর জীওন, গীবন, I can't manage these Indian words! Let us agree to say গীবন, that is easier—তিনি লিখেছেন হাজার লোক যদি এক দিকে থাকে আর গীবন একা এক দিকে থাকে তবে গীবনকে বিশ্বাস করবে। লোকটা আউধ সরকারে রেসালাদার মেজর ছিল। খুলে দাও, এখনি খুলে দাও।

সবাই দৌড়লো খুলে দিতে।

এখন আমাদের বিশ্বস্ত আর অভিজ্ঞ লোকের একান্ত অভাব। আমি এই মুহূর্তে ওকে রেসালাদার মেজর নিযুক্ত করবো।

ইতিমধ্যে বন্ধনমুক্ত জীবন কর্নেলের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে স্যালুট করলো।

ভেরি সরি গীবন, রিয়ালি ভেরি সরি। কিন্তু বুঝতেই তো পারছ অরাজকতার সময়ে এমন হওয়া বিচিত্র নয়। তোমাকে বিশেষভাবে রেকমেণ্ড করেছেন জেনারেল উট্রাম আর স্যার হেনরি লরেন্স। আমি এখনি তোমাকে রেসালাদার মেজর এপয়েণ্ট করলাম। তবে মনে রেখো দিল্লী পৌঁছবার আগে রেসালা পাবে না।

তারপর জেভার্সের দিকে তাকিয়ে বলল, জেভার্স, এর ঘোড়া আর সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা ক'রে দাও।

জীবন স্থালুট জানালো আর বুঝতে পারলো যে আয়ু-স্রোতের ঘাটের এখানেই শেষ নয়। ভাবলো, না জানি আবার কোন্ অভিজ্ঞতার আবর্ত তাকে নিয়ে ভিড়োবে নূতনতর কোন্ ঘাটে।

॥ ১৬ ॥

বাদলি-কি-সরাই

হিন্দুস্থানের সমতলভূমিতে গরম পড়তেই কর্নেল ব্রিজম্যান দেরাদুনে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে মুসৌরি যাবে ভাবছে এমন সময়ে জঙ্গীলাট জেনারেল এনসনের কাছ থেকে এলো জরুরী খবর। বিদ্রোহের খবর দিয়ে এনসন জানিয়েছে—এই পত্র পাওয়া মাত্র তাকে আম্বালা রওনা হ'তে হবে। খুব সম্ভব তার আগেই এনসন সসৈন্যে দিল্লী রওনা হয়ে যাবে। দেখা হয় ভালই। দেখা না হ'লে আম্বালায় অপেক্ষা করতে হবে ব্রিজম্যানকে। আম্বালায় ছাউনি রক্ষার জন্যে যে সামান্য ফৌজ আছে তার উপরে হাত দেওয়া চলবে না, অবশ্য দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করতে হবে না আশ্বাস দিয়েছে এনসন। পাঞ্জাবের চীফ কমিশনার স্যার জন লরেন্স ফৌজ পাঠাতে শুরু করেছে। দিল্লী যাওয়ার পথে নিত্য-নূতন ফৌজ এসে পৌঁচচ্ছে আম্বালায়। ঝিন্দ্ নাভা পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজ্যের রাজারাও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করছে। প্রথমে যে ফৌজ এসে পড়বে—দেশী এবং গোরা—তাই নিয়ে যেন ব্রিজম্যান দিল্লীর দিকে রওনা হয়। জঙ্গীলাট আদেশ করেছে যে আম্বালা থেকে দিল্লী পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের নিরাপত্তা রক্ষার ভার ব্রিজম্যানের উপরে। তারপরে সান্ত্বনা দিয়ে জানিয়েছে, সরাসরি যুদ্ধ করবার গৌরব থেকে বঞ্চিত হ'ল বলে যেন দুঃখ না করে, কেননা পাঞ্জাব থেকে দিল্লীর যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব যে-কোন যুদ্ধজয়ের গৌরব থেকে বেশি। তারপরে আরো জানিয়েছে, আম্বালার নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'লে ব্রিজম্যান কর্নালে গিয়ে কয়েকদিন থাকবে। সেখানে অশান্তির চিহ্ন দেখতে না পেলে সসৈন্য দিল্লী যাত্রা করবে। ব্রিটিশ ফৌজের সাক্ষাৎ পাবে সেখানে।

জুন মাসের প্রথম কয়দিন পর্যন্ত জঙ্গীলাটের আদেশ অনুসারে কাজ করেছে ব্রিজম্যান, যদিচ ইতিমধ্যে দিল্লী পৌঁছবার অনেক আগেই কলেরায় মৃত্যু হয়েছে জেনারেল এনসনের। নূতন জঙ্গীলাট স্যার হেনরি বার্নার্ড পুরাতন আদেশকেই সমর্থন করেছে। কিন্তু এখন আর ব্রিজম্যানের আম্বালা বা কর্নালে থাকবার

প্রয়োজন নেই, গোরা ফৌজ এসে পড়ায় প্রথম স্থানটি সুরক্ষিত, দ্বিতীয় স্থানটিও অরক্ষিত নয়। তাই এখন শ'তিনেক গোরা অশ্বারোহী, ঝিন্দের রাজা কর্তৃক প্রেরিত পঞ্চাশজন শিখ অশ্বারোহী আর তিনটি ঘোড়ায় টানা কামান নিয়ে ব্রিজম্যান কর্নাল থেকে দিল্লী রওনা হয়েছে। পথে জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

জীবনলাল নূতন সামরিক পোশাকে, নূতন ঘোড়ায় আপাদমস্তক ঝকমক করছে, যদিচ মাঝে মাঝে পান্নার দেওয়া ঘোড়াটার জন্যে দুঃখ হয়—আর সর্বদাই দুঃখ হয় হারানো তক্তিটার জন্যে। কী রহস্য ছিল, কী নির্দেশ ছিল জানা হ'ল না। শিখ রেসালাদার গুরবচন সিং তাকে আগাগোড়া দেখে নিয়ে সঙ্গীদের বলে, নাঃ, দাড়ি গোঁফ উঠলে বেমানান হবে না, লম্বায়-চওড়া'য় ঠিক আছে।

নিয়মিতভাবে শেষরাত্রে ব্রিজম্যান সসৈন্যে যাত্রা করছে, তার ধারণা আজকে এই ৮ই তারিখেই দিল্লীতে পৌছনো যাবে। কর্নেলের মুখে কথাটা শুনে সকলেরই মনটা খুশী। সৈন্যদলে দেহ স্বতন্ত্র, মন একটি, সেটি সেনাপতির। একাধিক মন যে সৈন্যদলে—তার পরাজয় অনিবার্য।

সবে ভোরের আলো হয়েছে, সাড়ে তিনশ' ঘোড়ার চোদ্দশ' ক্ষুর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাথরে তাল ঠুকতে ঠুকতে চলেছে, এমন সময় ব্রিজম্যান চমকে উঠল।

কামানের শব্দ নয়, জেভার্স?

জেভার্স কান পেতে শুনে বলল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তবে কি সিপাহীদের সঙ্গে লড়াই হচ্ছে নাকি?

হ'লে বিস্মিত হবো না, বলল জেভার্স।

ঈষৎ পুবে-হেলা দক্ষিণ দিক থেকে ঘন ঘন কামানের আওয়াজ আসতে শুরু করলো। তখন ব্রিজম্যানের আদেশে ছোট ফৌজটি অল্প সময়ের মধ্যে আলিপুরে এসে পৌছলো।

আলিপুরে এসে ব্রিজম্যান দেখল যে বৃটিশ ফৌজ মালপত্র গোলন্দাজ-বাহিনীর মেজর স্কটের জিম্মায় রেখে বাদলি-কি-সরাইয়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। মেজর স্কটের মুখে শুনতে পেলো আগের দিন ব্রিগেডিয়ার উইলসন সসৈন্যে মীরাট থেকে এসে পৌচেছে। তারপরে জঙ্গীলাট স্যার হেনরি বার্নার্ড ও উইলসন শেষরাতে এগিয়ে গিয়েছে—অনেকক্ষণ লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে, তারই কামানের আওয়াজ। এইসব বিবরণ জানিয়ে স্কট বলল, ব্রিজম্যান, তোমাকে দেখে খুশী হয়েছি। তুমি এক কাজ করো, এখানে পাহারায় থাকো, আমি এগিয়ে যাই।

ব্রিজম্যান বলল, স্কট, সেটি হবে না। আজ এক মাস ফাঁকা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক

রোড পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছি, একটা সেপাই দূরে থাক একটা শেয়াল পর্যন্ত দেখতে পাই নি। অতএব শুভ বাই।

এই বলে সে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল।

অদৃষ্টের বিদ্রূপতায় স্কট বলে উঠল, nuts!

আলিপুর থেকে বাদলি-কি-সরাই-এর দূরত্ব দশ মাইল। বাদলি-কি-সরাইয়ের কাছে এসে পড়ে রণক্ষেত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্রিজম্যান ও জেভার্স একটা টিলার উপরে উঠল, খালি চোখেই সব বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ব্রিজম্যান দেখল গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপরে দিল্লিতে অগ্রসর হওয়ার পথ রোধ করে সিপাহী ফৌজ থানা নিয়েছে। সিপাহী ফৌজের সম্মুখে একটা উঁচু টিলার উপরে দূরপাল্লার ভারি চারটে কামান। বাঁদিকে অর্থাৎ পশ্চিমে শালিমার বাগান। রাস্তার ডানদিকে অর্থাৎ পুবে এবং কামানগুলোর সমসূত্রে প্রাচীর-ঘেরা একটা পুকুর। তার পিছনে রাস্তার বাঁদিকে পিপল-আলা গাঁয়ের মধ্যে বাদলি-কি-সরাই। আর পুবে ও পশ্চিমে সিপাহী ফৌজের দুই পাশে বিল আর জলা জমি। সেখান দিয়ে ঘোড়সওয়ার বা কামান নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। বেশ অবস্থা নির্বাচন করেছে সিপাহী ফৌজ। এ অঞ্চলটা ব্রিজম্যানের সুপরিচিত, তাই মাইলখানেক দূরে দাঁড়িয়েও তার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। সে আরও দেখতে পেলো ইংরেজ ফৌজ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে লড়ছে। মধ্যে অর্থাৎ সিপাহীদের ভারি কামানগুলোর মুখোমুখি এক ভাগ, আর দুই পাশে অর্থাৎ রাস্তার পুবে ও পশ্চিমে দুই ভাগ। কোন্ ভাগ কার অধীনে এত দূর থেকে বোঝা সম্ভব নয়। ব্রিজম্যান দেখলো যে তার সৈন্য সংখ্যায় অল্প, ভাগাভাগি করলে এত দুর্বল হয়ে পড়বে যে কোন কাজে লাগবে না। সে স্থির করলো যে রিজার্ভ বাহিনীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে, তারপরে যেখানে প্রয়োজন হবে সঙ্কটের মুখে সেখানে গিয়ে লড়বে।

জীবনলাল শিখ অশ্বারোহীর অন্তর্গত হয়ে রাস্তার পুবদিকে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিপূর্বে লড়াই করা দূরে থাক—চোখেও দেখে নি ব্যাপারটা কি হয়। সে দেখল এ এমন এক ব্যাপার—যার সঙ্গে গল্পের বা ছবির মিল নেই। গল্পে ও ছবিতে সমস্ত রণক্ষেত্র একটা সমগ্র অঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়। দেখল বাস্তবে আদৌ তেমন নয়। বাস্তব রণক্ষেত্রে সব কেবল এড়া-এড়া, ছাড়া-ছাড়া ভাব; কারণহীন কার্যের মতো কে কোথায় যাচ্ছে, এগোচ্ছে পিছোচ্ছে, যেন সবটাই খাপছাড়া।

কিন্তু বেশিক্ষণ তার ভাববার সময় হল না, হঠাৎ চমকিত হয়ে দেখল কোম্পানীর ফৌজের মধ্যভাগের ঘোড়সওয়ার বাহিনী দ্রুতপায়ে ছুটে চলেছে, তাদের উপরে এসে পড়ছে সিপাহীর কামানের গোলা; ছিটকে পড়ছে সওয়ার, শুয়ে পড়ছে ঘোড়া, তবু চলেছে তারা এগিয়ে। সে দেখল ঐ গিয়ে পড়েছে তারা কামানগুলোর উপরে, এবারে হাতাহাতি, বেয়নেটে বেয়নেটে লড়াই। ঐ যে পালালো কামান ছেড়ে সিপাহী গোলন্দাজ।

এমন সময়ে সিপাহী পক্ষের ডাইনে ও বাঁয়ে কামানের আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। ব্রিজম্যান বুঝল কোম্পানীর ফৌজের ডান হাত ও বাম হাত সিপাহী ফৌজকে ঘিরে ধরতে উদ্যত। মনে মনে কার্যক্রম স্থির করে ফেলল, রাস্তার পূবদিকে—সিপাহী সৈন্যের ডানদিকে ফৌজের বাঁয়ে সে আক্রমণ করবে।

Action left!

তখন সেই সাড়ে তিনশ' ঘোড়সওয়ার দ্রুততালে চলতে শুরু করলো, গোরাদের হাতে তলোয়ার, শিখদের হাতে বর্শা। চলবার সঙ্গে সঙ্গে গতি দ্রুততর হতে থাকলো, অবশেষে সমস্ত ফৌজ বিকট চীৎকার করে উঠল; গোরার দল চীৎকার করে উঠল, হুর্‌রা, হুর্‌রা—শিখের দল চীৎকার করে উঠল, ওয়াহি গুরু, ওয়াহি গুরু,—সিপাহীপক্ষকে আক্রমণ করলো।

জীবন দেখলো যুদ্ধের যা কিছু ভয় তা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকার সময়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে আদৌ ভয় করে না। মৃত্যুভয় সৈন্যবাহিনীর মোট সংখ্যা দ্বারা বিভক্ত হয়ে গেলে প্রত্যেকের ভাগে যা পড়ে তা না পড়বারই সামিল। মৃত্যুর কথা ভাববার তার অবকাশই ঘটল না। বাঁ হাতে লাগাম ধরে, ডান হাতে বর্শা উঁচিয়ে—ওয়াহি গুরু ওয়াহি গুরু, আওয়াজ করতে করতে সে ছুটেছে। তারপরে যে কী ঘটল তার স্পষ্ট ধারণা নেই। যখন তার সংবিত হ'ল, কতক্ষণ পরে জানে না, এতক্ষণ যেন নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, দেখলো সিপাহী ছুটেছে দিল্লীর দিকে, তারা ধাওয়া করছে পিছু পিছু।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কোম্পানীর ফৌজ এসে পৌঁছলো আজাদপুর নামে একটা গ্রামে। এখানে পথটা দুই ভাগ হয়ে পশ্চিমের শাখা চলে গিয়েছে ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে, আর পূবের শাখাটা সবজিমণ্ডি হয়ে গিয়েছে দিল্লীতে। বিগ্রেডিয়ার উইলসন ও শাওয়ার্স গেল সবজিমণ্ডির দিকে, বার্নার্ড, গ্রেভস, সেই সঙ্গে ব্রিজম্যান চললো ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে।

একটু এগোবার পরেই জীবন দেখতে পেলো পূবদিকে খররৌদ্রে ঝকঝক

রয়েছে দিল্লীর লালপাথরের দেওয়াল—আর ঐ আরো একটু দূরে পাহাড়টার শিরদাঁড়ার উপরে পর পর দেখা যাচ্ছে হিন্দুরাও-কুঠি, অবজারভেটারি আর ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার। শুনতে পেয়েছে হিন্দুরাও-কুঠি তাদের লক্ষ্য। ভাবতে লাগলো না জানি তার ইতিহাসের আবার কোন নূতন অঙ্কে পটোত্তলন ঘটবে ওখানে, ঐ হিন্দুরাও-কুঠিতে, ঐ পাহাড়ে, ঐ দিল্লীতে!

॥ ১৭ ॥

"অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ"

১৮৫৭ সালে উত্তর ভারতে যে ব্যাপক অশান্তি ঘটেছিল সে ব্যাপারটা কি? যুদ্ধ না বিদ্রোহ না আর কিছু? ঐতিহাসিকগণ বলেন, বিদ্রোহ। তাঁরা বলেন, এমন সিপাহী বিদ্রোহ আগেও ঘটেছে; গোরা সিপাহী বিদ্রোহ করেছে, দেশী সিপাহী বিদ্রোহ করেছে, তবে অবশ্য কোনটাই ১৮৫৭ সালের ব্যাপকতা লাভ করে নি। রাজনীতিকগণ বলেন, ব্যাপারটা কোম্পানী শাসিত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম—যার চূড়ান্ত উপসংহার ঘটেছে ১৯৪৭ সালে দেশের ইংরেজ শাসনমুক্তিতে। দুটো মতই হয়তো আংশিক সত্য। আংশিক সত্য মানেই অসত্য। তাই ব্যাপারটা যদি বিদ্রোহও না হয়, যুদ্ধও না হয় তবে কী? অবশ্যই আর কিছু। কিন্তু কী সেই আর কিছু? যতদূর বুঝি এ হচ্ছে ভারতের মধ্যযুগের খোলস পরিত্যাগ ক'রে নব্যযুগের দেহ গ্রহণ। কাজটা সহজসাধ্য নয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই ব্যাপক অশান্তির ভিতর দিয়ে এই পরিবর্তন ঘটেছে। বাইরে থেকে দেখতে ব্যাপারটাকে যুদ্ধ বা বিদ্রোহ মনে হয়েছে, কিন্তু আসলে মধ্যযুগের খোলস পরিত্যাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতেও সেই একই প্রক্রিয়া ঘটেছে—অনুরূপ অশান্তির মধ্য দিয়ে। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ভারতের সর্বত্র এই প্রক্রিয়ায় যুদ্ধ বা বিদ্রোহ দেখা দেয় নি। সমগ্র দেশকে তিনটা অঞ্চলে ভাগ করে বিচারে নামা যেতে পারে। বাংলাদেশ, উত্তরভারত অর্থাৎ বিহার থেকে পশ্চিমে দিল্লী আর দক্ষিণে চম্বল নদীর সীমান্ত অবধি, আর দেশের অবশিষ্ট অংশ। এই তিনের মধ্যে বাংলাদেশে (অর্থাৎ খাস বাংলাদেশে, মোগল আমলের সুবে বাংলা নয়, কিংবা কোম্পানীর আমলের বাংলা ও আসাম নয়) এই খোলস বদলের ব্যাপারটা ঘটেছে সর্বাগ্রে আর অশান্তির পথে। অসির বদলে মসীতে অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষায় এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে বাংলাদেশ।

সেই সঙ্গে দেশী ও বিদেশী যুগোচিত নেতৃত্ব। রামমোহন, উইলিয়ম কেরী, হেয়ার, ডিরোজিয়ো, মেকলে, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই পরিবর্তন সাধনের নেতা। যদি যথাসময়ে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত না হ'ত, যদি যোগ্য নেতারা ঘটনার বল্‌গা ধারণ না করতেন তবে হয়তো বাংলাদেশেও এই পরিবর্তন ঘটাতে অশান্তির আবশ্যক হ'ত। বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ যে সিপাহী-বিদ্রোহকে একটা অবাঞ্ছিত হাঙ্গামা মনে করেছিল তার কারণ বাংলাদেশের পক্ষে অশান্তির প্রয়োজন আর ছিল না। ঔষধ প্রয়োগে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল, ছুরির দরকার হয় নি। সেই ছুরির দরকার হ'ল উত্তর ভারতের পক্ষে। ইংরেজী শিক্ষার অভাব ও যুগ-নেতৃত্বের অভাব, (ঝাঁসির রাণী, তাতিয়া টোপে, ফৈজাবাদের মৌলবী ও নানাসাহেব নেতৃস্থানীয় বটে কিন্তু তাঁরা বাস করছিলেন মধ্যযুগে, রামমোহন, হেয়ার প্রভৃতির মতো নব্যযুগে নয়) সমস্ত ঘটনা-বল্‌গা তুলে দিল সিপাহীদের হাতে। তার যা পরিণাম তাকেই বলা হয় সিপাহী যুদ্ধ বা সিপাহীবিদ্রোহ। এবারে দেশের অবশিষ্টাংশ। নর্মদা নদীর দক্ষিণে আদৌ যে অশান্তি দেখা দেয় নি, এমন কি খাস পেশবার দেশ মহারাষ্ট্রেও দেখা দেয় নি, তার কারণ সে-সব অঞ্চলে তখনো মধ্যযুগের মধ্যরাত্রি চলছিল। যেখানে মধ্যযুগের মধ্যরাত্রি শেষ যামে উপস্থিত হয়েছে, সেখানে সেই "রক্ত আলোয় মদে মাতাল ভোরে" মানুষ মরীয়া হয়ে উঠেছিল। নবাধিকৃত পাঞ্জাবেও এই একই কারণে অশান্তি ঘটে নি। ইতিহাসে ডবল প্রোমোশন বলে কিছু নেই। এক যুগের দাবি চুকিয়ে দিলে তবেই অন্য যুগে প্রবেশের অধিকার লাভ করা যায়। তবে দাবি চুকোবার পদ্ধতি আলাদা। কেউ বা সেই দাবি চুকোয় হেয়ারের পটলডাঙ্গার পাঠশালায় ঢুকে, কেউ বা সেই দাবি চুকোয় দিল্লীর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। কেউ বা অসিতে, কেউ বা মসীতে। পন্থা ভিন্ন হলেও লক্ষ্য এক বই দুই নয়।

কোম্পানীর শাসন ভিতর থেকে পুরনো বাঁধনগুলোকে আলগা করে দিচ্ছিল, কিন্তু সর্বত্র নূতন বাঁধন পরাতে পারে নি। বাংলাদেশে একদিকে যেমন পুরাতন সংস্কার খসে পড়ছিল তেমনি আবার নূতন সংস্কার সৃষ্টি হয়ে উঠে সমাজদেহকে শক্ত করে বাঁধছিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ভূদেব সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করলো; প্রকাণ্ড ধনী দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ পিতার আফিসের কাজ কামাই করে গোপনে উপনিষদের পাঠ নিতে আরম্ভ করলো; ফার্সী-সাহিত্যে

সুপণ্ডিত মুন্সী রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র মধুসূদন ইংরেজীতে কবিতা লিখতে শুরু করলো; রসিককৃষ্ণ দত্ত গঙ্গাজলের পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হ'লেও সরকারী চাকরির উপরে এতটুকু বিশ্বাস হারালো না; আর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিচলিত আস্থা স্থিতি পেলো গিয়ে খ্রীষ্টীয় বাইবেলের উপরে। আর সর্বোপরি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সন্তান সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর বেদান্তদর্শনকে ভ্রান্ত দর্শন ঘোষণা করলেন, বললেন, টুলো-পণ্ডিত নয়—ইংরেজী-পড়া ছোকরার দলই দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা। এ সমস্তই পুরাতন সংস্কারের বদলে নূতন সংস্কার স্বীকারের দৃষ্টান্ত। বোঝা যায় মধ্যযুগের নিশার দিগন্তে নবযুগের উষা পরিস্ফুটতর হয়ে উঠছে। এর অনুরূপ প্রক্রিয়া বিহারে ঘটে নি, আউধে ঘটে নি, কানপুরে ঘটে নি, দিল্লীতে ঘটে নি। এ সব অঞ্চলেও কোম্পানীর শাসন বা তার দৃষ্টান্ত ভিতরের বাঁধনগুলোকে ক্ষয় করে দিচ্ছিল, সামান্য যা ছিল তার সাধ্য রইল না যে সমাজসৌধক খাড়া করে রাখে— তাই একদিন অতি অতর্কিতে সমস্ত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। আউধ রাজ্য অধিকার, খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারের চেষ্টা বা চর্বি মাখানো কার্তুজ—এদের কোনটাই সিপাহী-বিদ্রোহের কারণ নয়, এসব সিপাহীবিদ্রোহের ফল, যে মূল প্রেরণার ফল সিপাহী-বিদ্রোহ, এদেরও সৃষ্টি সেই মূল প্রেরণায়। সেই প্রেরণা ইতিহাসের অমোঘ, অপরিহার্য একটি অভিপ্রায়; মধ্যযুগের জরাগ্রস্ত কলেবর পরিত্যাগ করে ইতিহাসের যুগোচিত নব-কলেবর গ্রহণ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ ১ ॥

যো কুছ কিয়া না সারে সে,
সো কিয়া কারতুস নে।

কয়েকদিন আগের কথা: ১০ই মে অপরাহ্ণ। লালকেল্লার ভিতরে দেওয়ানী খাসের কাছে পাশাপাশি তসবিখানা আর বৈঠক, প্রাচীরের বাইরে পুবদিকে যমুনা। বৈঠকের পশ্চিমে ঘনকোমল সবুজ ঘাসে ঢাকা নিভৃত খোলা জায়গা। প্রত্যহ বিকালে বাদশা বাহাদুর শা এখানে নিতান্ত অন্তরঙ্গদের সঙ্গে মিলিত হন, তখন আর কারো আসবার হুকুম নেই, এমন কি খাস উজীর সাহেবেরও নয়। শহর শাহ্‌জাহানাবাদের সবাই জানতো এই সময়টিতে বাদশাকে কোথায় পাওয়া যাবে, আর কাদের পাওয়া যাবে তাঁর কাছে।

বাদশা একখানা আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে উপবিষ্ট, বাঁদিকে শ্বেত-পাথরের মেজের উপরে রূপোর ডিবেতে পান, পায়ের কাছে রূপোর পিকদান, হাতের কাছে সোনার মুখনলওয়ালা গড়গড়ার নল, আর কোলের উপরে দামী সবুজ রঙের মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো খাতা, বাদশার লিখিত গজলে পূর্ণ। নিন্দুকেরা আড়ালে হাসাহাসি ক'রে বলে, গজলগুলোর চেয়ে খাতাখানার দাম বেশি, বলে বাদশা যখন গজল লেখেন তখন বুঝতে হবে বাদশাহীতে গলদ দেখা দিয়েছে, বলে বাদশা যখন হাসান আকসারির মতো বুজরুককে, গালিবের মতো জুয়াড়ীকে, সুখানন্দের মতো জোচ্চোরকে আর হাকিম আসাদুল্লার মতো ফেরেপবাজকে কোল দেন তখন বুঝতে হবে চিরাগতলে অঁধেরা। লোকের আশঙ্কা সত্য কিনা জানি না, তবে ঠিক ঐ কয়টি লোকই বাদশার অপরাহ্ণের নিত্যসঙ্গী। আজও তারা উপস্থিত ছিল বাদশার কাছে, বৈঠকখানার নিভৃত উদ্যানে।

বাদশার ডানে-বাঁয়ে দুই সারে নীচু শ্বেতপাথরের জলচৌকিতে উপবিষ্ট গালিব, হাসান আকসারি আর সুখানন্দ পণ্ডিত, তৃতীয় আসনখানা শূন্য, হাকিম আসাদুল্লা তখনো এসে পৌঁছয় নি। বাদশার কাছে কারো বসবার হুকুম নেই। তবে বাহাদুর শা বলেন, এখানে তো আমি বাদশা নই, এখানে

আমি শায়ের, কবি, আমি ফকির। বলেন, এখানে আমার ওস্তাদ হচ্ছেন গালিব সাহেব আর আকসারি সাহেব।

তারপরে সুখানন্দের দিকে চেয়ে হেসে বলেন, আমার আর এক ওস্তাদ সুখানন্দজী—আসমানের চাঁদ, তারা, মানুষের নসিব, কিসমত যার হাতের মুঠোয়।

বাদশার উদারতায় সবাই মাথা নাড়িয়ে নীরব কেয়াবাৎ জানায়। রাজার সমর্থন জ্ঞাপনেই পারিষদের সার্থকতা। পারিষদ রাজার দর্পণ।

এমন সময়ে বাদশা আসাদুল্লার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেন, বলেন, হাকিম সাহেবের আজ দেরি হচ্ছে।

সুখানন্দ বলে, উজীর মহবুব আলি খাঁর বীমার হওয়ায়, জাঁহাপনা হাকিম সাহেবকে উজীর বহাল করেছেন।

বিসমিল্লা! তাই কি হাকিম সাহেব চোর ডাকু ধরতে বের হয়েছেন নাকি?

এই বলে তিনি হাসেন, কাজেই পারিষদরাও হাসে। গালিব লক্ষ্য করে, হাসলে বাদশাকে আরও সুন্দর দেখায়। গালিব ভাবে হাসলে যে বুড়োকে সুন্দর মনে না হয় বুঝবে তার মনে অনেক পাপ। হাসি বার্ধক্যের বকশিশ।

এবার হাসান আকসারি কথা বলে, বলে সময়টা খারাপ, এ সময়ে একটু চোখ-কান খুলে রাখাই আবশ্যক।

বাদশা বলেন, ঠিক কথা। এ সময়ে যমুনা শুকিয়ে গিয়ে ওপার থেকে আহীর, গুজর সব চলে আসে শহরে। হাকিম সাহেব কেবল বেমারের দাওয়াই জানেন না, চোর ডাকুর দাওয়াইটাও জানেন।

যতক্ষণ ওদের দুইজনের মধ্যে কথা চলে গালিব একমনে দেখে বাদশার মুখ, সে মুখ আদৌ অপরিচিত নয়। দেখে আর ভাবে ঐ মুখে দিল্লীর বাদশাহীর তিনশ' বছরের ইতিহাস লিখিত। তিন-তিনটে পানিপথের লড়াই—শেষেরটার কথা ভাবতে ভালো লাগে না; বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আলমগীর; আলোর তেল কমে আসে, শিখা নিস্তেজ হয়ে পড়ে—তবু জলতে থাকে আমীর তৈমুরের বংশধারা। গালিব ভাবে আরো কতদিন জলবে! কোম্পানী ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। প্রার্থনা করে আরো দীর্ঘদিন জলুক।

আকসারি বলে, চোর ডাকু তো সামান্য। হাকিম সাহেবের কাছে শুনলাম যে কোম্পানীর সিপাহীর খুব গোসা হয়েছে, কলকাতা পাটনায় খুব

শোরগোল।

বাদশা বাধা দিয়ে বলে, এ তো পুরানা খবর আকসারি সাহেব। কোম্পানী যে নতুন কার্তুজ আমদানি করেছে তাতে নাকি শুয়ার আর গোরুর চর্বি আছে। হিন্দু মুসলমান সিপাহী কেউ ছোঁবে না।

তবে তো কোম্পানী খুব গোলমালে পড়বে, বলে আকসারি।

এতক্ষণ পরে বাদশার খাস জ্যোতিষী সুখানন্দ পণ্ডিত কথা বলবার সুযোগ পায়, বলে, জাঁহাপনা, কোম্পানীর এখন শনির দশা চলছে, গোচর ফল খুব খারাপ।

আকসারি বলে ওঠে—যাবে, যাবে।

কে যাবে, কোথায় যাবে প্রভৃতি ইঙ্গিত ইচ্ছা ক'রেই অস্পষ্ট রাখে, কারণ বুঝতে পারে না কোম্পানীর পতন বাদশার অভীষ্ট কিনা। যদিচ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তার মুঠোর মধ্যে—তবু বাদশার মতিগতি এই তিনের উর্ধ্বে, হোন না সে বাদশা তার চেলা।

যাবে বইকি, বলেন বাদশা।

নিশ্চয় যাবে কাফেরের রাজত্ব, সোৎসাহে বলে ওঠে আকসারি।

সে কবে হবে জানি না—এই বলে বাদশা তাকাল সুখানন্দর দিকে।

সুখানন্দ বলে, জাঁহাপনা আগামী দেড় বছর কাল কোম্পানীর নসিব বড় খারাপ, যেতেই হবে তাকে।

তবেই ছাখো সামান্য ঐ কার্তুজের কী তেজ—এই বলে খাতা খুলে সলজ্জ বিনয়ে বলেন, একটা গজল লিখেছি।

কবি মাত্রেরই অপরের সমক্ষে আপন কবিতা পাঠে একটা সলজ্জ সঙ্কোচ আছে, হোক সে কবিসম্রাট কিম্বা সম্রাট-কবি। এ যেন অপরের সম্মুখে আপন পত্নীকে প্রিয়-সম্ভাষণের লজ্জা।

সকলে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

বাদশা পড়েন—

কুছ চিল-ই-রুম নাহি কিয়া
ইয়া শা-হি-রুষ নেহিন
যো কুছ কিয়া না সারে নে,
সো কিয়া কারতুস নে—

বাদশা পর পর তিনবার পড়েন কবিতাটি। সকলে কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ ক'রে ওঠে, বলে, এমনটি আর হয় নি, এ এক সঙ্গে ইতিহাস, কাব্য, ভবিষ্যদ্বাণী।

গালিব বলে, যা রূমের বাদশা পারেন নি, সুধানন্দ বলে, যা রুশের শা পারেন নি, আকসারি বলে—সেই কাজ করলো কিনা কার্তুজে!

বাহা, বাহা, বাহা, তিনজনের মাথায় প্রোৎসাহ আন্দোলন থামতে চায় না।

বাদশার কবিত্বের হাওয়াতে তিনজনের মাথাই দোলে বটে তবু একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায় যে গালিবের মাথার দোলনটা নিতান্তই দৈহিক, মানসিক সমর্থন নেই তার সঙ্গে। কিছুকাল আগে সে একবার কলকাতায় গিয়েছিল। রামপুরের নবাবের দত্তা পেন্সন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বড়লাটের কাছে দরবার করতে গিয়েছিল, যদি লাটসাহেব মেহেরবাণী ক'রে রামপুরের নবাবকে চাপ দেন। কলকাতায় শিমলা বাজারে কালী মিঞার বাড়িতে ছিল বছর দুই-তিন। তখন গালিব দেখেছে কোম্পানীর শাসন বলতে কি বোঝায়। প্রথম যেদিন গঙ্গা নদীতে ধোঁয়া-কলের জাহাজ দেখলো, কবিকল্পনার প্রেরণায় বুঝলো এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। উটের পিঠে, পাহাড়ী ঘোড়ায় বা ছাগলের পিঠে মাল চাপিয়ে ব্যবসা করবার দিন গিয়েছে। সাগরপারের লোকে কালাপানির হাজার ঘোড়ায় পিঠে ধোঁয়ার লাগাম চড়িয়েছে। ঐ একটি দৃশ্য থেকে তফাৎ বুঝে নিল কোম্পানীর আর বাদশার শাসনের। কলকাতা আর শাহজাহানাবাদ দুই জগতের, দুই যুগের—ভিন্ন জাতের শহর। এসব কথা মনে পড়ে গালিবের। তাই সে মাথা নাড়ে বটে তবে মনটা নড়ে না।

হাসান আকসারি দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে ওঠে, আর আমাদের বাদশা রূমের শা আর রুশের শার অনেক উপরে, মর্জি হ'লে একটুখানি পানি ছড়িয়ে দিয়ে—

ওসব কথা এখন থাক আকসারি সাহেব।

থাকবে কেন জাঁহাপনা—বলে দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করে।

গালিবদের প্রশংসাবাক্যকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টার নাম তাকে উস্‌কিয়ে দেওয়া।

আকসারি অপর দুই পারিষদকে সম্বোধন ক'রে বলে, সেবার বাদশার খাস খানসামা বসন্ত আলি খাঁর পায়ে হাজা ঘা হয়েছিল, কেউ সারাতে পারে না, হাকিম সাহেব অবধি হাল ছেড়ে দিলেন। এমন সময়ে জানতে পারলেন বাদশা, এক দিনের জলপড়ায় বেবাক সেরে গেল।

সুধানন্দ বলল, সারবেই হবে, বিষস্য বিষমৌষধম্। মানে কিনা যে ক্ষতের সৃষ্টি জলে, জলেই তা সারবে। অবশ্য জলটা মন্ত্রপড়া হওয়া আবশ্যক।

সমর্থন পেয়ে ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে আকসারির উৎসাহ, বলে, সেবারে বড়লাট এসে তাঁবু গাড়লেন সবজিমণ্ডিতে, নজরানা দিতে হবে ভয়ে আসতে চান না বাদশার দরবারে, তখন বাদশা নিজে একটা মজুর হয়ে—

কি হাকিম সাহেব, খবর কি ?

হাকিম আসাদুল্লা কুর্নিশ ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে। বাদশা আবার বলেন, এক সঙ্গে হাকিম আর কোটাল, এবারে বেমার আর বদমাশ দুই-ই শায়েস্তা হবে।

জাঁহাপনা, যে-বদমাশকে চোখে দেখা যায় তাকে ভয় করিনে, কিন্তু যে বদমাশ লুকিয়ে থেকে—

কি ব্যাপার খুলে বলো।

আসাদুল্লা কথা না বলে একখানা ভাঁজ-করা কাগজ এগিয়ে দেয় বাদশার হাতে। বাদশা কাগজখানা খুলে ফেলেন, লম্বা ফর্দের মতো একখানা কাগজ ; তখনো দিনের আলো লোপ পায় নি, কাগজখানা নাকের কাছে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পাঠ করেন। পড়া সাঙ্গ হ'লে প্রশ্নাত্মক চোখ তুলে তাকান আসাদুল্লার দিকে।

জামি মসজিদের গায়ে লটকে দিয়েছিল।

কে ?

জানতে পারা যায় নি।

যে-ই হোক বুরা আদমি। কতক্ষণ ছিল লটকানো ?

দু'তিন ঘড়ি হবে।

অনেকে পড়েছে। আরও ছিল,—না একখানাই ?

একখানাই পাওয়া গিয়েছে। আরও যদি বা থাকে পাওয়া যায় নি।

এমন হতে পারে লোকে ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছে !

অসম্ভব নয়।

তল্লাসী করলে পাওয়া যায় না ?

শাহ্‌জাহানাবাদে আর শহরতলীতে ছোট-বড় পঞ্চাশ হাজার বাড়ি।

তা বটে। আচ্ছা হাকিম সাহেব, ঢোল শহরত দিয়ে জানিয়ে দেওয়া যায় না যে ইরাণের শার নামে যে ইস্তাহার বিলি হয়েছে তা জাল। হিন্দুস্তানের বাদশা তাঁর কাছে সাহায্যের দরখাস্ত পেশ করেন নি আর ইরাণের শাও এদেশে ফৌজ পাঠাতে কবুল হন নি।

তাহলে যারা জানতো না তারাও জানবে—আর কেউ বিশ্বাস করবে না।

রেসিডেণ্টের কানে কথাটা উঠেছে কি ?

ভাবেগতিকে মনে হয় তিনি জানেন না। আজ দিল্লী ব্যাঙ্কে দেখা হয়েছিল, অনেক কথা হ'ল, জানলে আঁচে আন্দাজে টের পেতাম নিশ্চয়।

হাকিম সাহেব, ইংরেজের মনের কথা মুখ দেখে জানতে পারা গেলে সুরাটের সদাগর আজ দিল্লীর মসনদের দিকে হাত বাড়াতে সাহস পেতো না।

ব্যাপারটা কি হয়েছে এতক্ষণে সকলেই অনুমান করেছে। এবারে আকসারি নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বলল, বাদশার হুকুম নিয়ে একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। সেদিন বাদশা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে পশ্চিম দিক থেকে একটা দরিয়া ছুটে আসছে সব ডুবিয়ে দিতে দিতে, এতদিনে তার অর্থ পাওয়া গেল।

ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বাদশা বললেন, কী অর্থ ?

ইরাণের শার ফৌজ নিয়ে আক্রমণ আর দরিয়ার বান এ দুই এক বই নয়, কারণ দুটোই আসছে পশ্চিম দিক থেকে।

এবারে আসাদুল্লা কথা বলে, বলে, আকসারি সাহেব, আপনি পীর মানুষ, ধর্ম নিয়ে কথা বলুন, রাজনীতি নিয়ে কথা না-ই বললেন।

আচ্ছা কথা নাই বললাম, তাই বলে কথাটা তো মিথ্যে নয়।

এমন সময় রঙমহলের বাগিচার মধ্যে বুলবুল শিষ দিয়ে উঠল। মুহূর্তে রাজনীতির জটিল আবর্ত থেকে বাদশার মন ভাসলো ঐ সরল সুরেলা স্রোতে। উৎকর্ণ বাদশা নিস্তব্ধ হলেন। কাজেই আর সকলেও উৎকর্ণ ও নিস্তব্ধ। এটি বাদশার পোষা বুলবুলি, বুলবুল-ই-হাজার দস্তান, হাজার গল্পের বুলবল। এটি যখন গান শুরু করে আশপাশের কারো সাধ্য নেই কথা বলে, সকলকেই চুপ ক'রে থাকতে হবে। এমন কি বেগম জিনৎ মহলও এ নিয়মের বাইরে নয়। বাদশা নিজ হাতে সকালবেলা একে পোকামাকড় খাওয়ান। তখন পাখীটা এসে টুক ক'রে বসে তাঁর হাটুর উপরে। খাওয়া হ'লে উড়ে গিয়ে ঢোকে ঝোপের মধ্যে। তারপরে শুরু করে গান। আর একবার গান তার সন্ধ্যাবেলায়। তার গান শুরু হ'লেই বুঝতে হবে বৈঠক ভাঙার সময় হ'ল, বাদশা এবার ফিরবেন খোয়াবগায়, যেখানে তিনি থাকেন।

তন্ময় বাদশা স্বপ্নে আবৃত্তির মতো বলতে শুরু করেন—

আনার কলির সবার পিয়ে উঠল গেয়ে বুলবুলি
সুরের রেশে উঠল জেগে ঘুমিয়ে পড়া ফুলগুলি।

নিঝ মহলে খুললো চাবি পরাণে আজ খণ্ড খ্যতাবি,
অলখপরী ওড়না খুলে বেড়ায় ঘুরে চুলবুলি।

বাদশা উঠে পড়লেন, তারপরে স্বপ্ন-গ্রস্তের মতো, বাদশাহীর শেষ রঙীন মেঘখণ্ডের মতো মিলিয়ে গেলেন অন্ধকারের মধ্যে। বৃদ্ধ বাহাদুর শার চেহারা দেখে গালিবের মনে পড়ে যায়, বৃদ্ধ আলমগীরের তসবিরখানা। দুজনেই সমায়ত, সমবয়স্ক, সমান হতভাগ্য, সব বিষয়েই সমান। বাহাদুর শা তন্ময় হয়ে পড়েন একটি পাখির গানে, আলমগীর বাদশা তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন ঐ ছোট্ট কোমল মোতি মসজিদ—ওটিও একটি পাথরে গড়া পাখীর গান। গালিব ভাবে, আশ্চর্য এই তৈমুরের বংশ! ওরা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি ভাবুক। খুন-মাখা কিরীচ এদের হাত থেকে খসে পড়ে পাখীর অতর্কিত গানে, ফুলের অভাবিত চমকে।

বাদশা যখন উঠে গেলেন আর বসে থাকা নিরর্থক। উঠে পড়লো সবাই, চললো নীরবে। হাকিম সাহেব আগে আগে। কয়েক পা অগ্রসর হয়েই থমকে দাঁড়ালো। সম্মুখে বাদশার খাস খানসামা বসন্ত আলি খাঁ। কি খবর বসন্ত আলি? কথাটা চোখের জিজ্ঞাসাতেই হ'ল। বসন্ত আলি আঙুল দিয়ে দেখালো—করিমন বিবি, হজরৎ জিনৎমহল সাহেবার খাস বাঁদী। হাকিম তার কাছে যেতেই করিমন বুলবুলের সুরে সুর মিলিয়ে বলল, বেগম সাহেবা আপনাকে তলব করেছেন। আসাদুল্লা সঙ্গীদের কাছে ইঙ্গিতে বিদায় নিয়ে রঙমহলের দিকে প্রস্থান করলে'।

এতক্ষণ হাসান আকসারির পেটের মধ্যে অনেক জলপড়া ধুলোপড়া অনেক তুকতাক স্বপ্নমন্ত্র তোলপাড় করছিল, কিন্তু বাদ সেধেছে ঐ দুশমন বুলবুলিটা। বাদশার সমস্তই ভালো, কেবল ঐ যে নিত্য একটা পাখীর কাছে আস্ত একটা পীরকে হার মানতে হয়, এ অপমান প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পায় না আকসারি সাহেব।

এতক্ষণে তারা তিনজনে দেওয়ানী আম পেরিয়ে, নৌবতখানা পেরিয়ে দীঘটার কাছে যে বড় পিপল গাছ আছে তার তলে এসে পৌঁচেছে। একে কৃষ্ণপক্ষের তিথি তাতে গাছের ছায়া, জায়গাটা বেশ অন্ধকার। হঠাৎ আকসারি গোঁ গোঁ শব্দে চীৎকার ক'রে উঠে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। চমকে ওঠে গালিব আর সুখানন্দ। ব্যাপার কি? নাকের কাছে হাত দিয়ে অনুভব করে, না মরে নি, মূর্ছা গিয়েছে। ইতিমধ্যে গোলমাল শুনতে পেয়ে নৌবতখানা থেকে লোকজন এসে পড়ে, আকসারিকে বয়ে নিয়ে যায় নৌবত-

খানায়। গালিব আর সুখানন্দও যায় সঙ্গে। মাথায় জল ও হাওয়া দিতে দিতে জ্ঞান হয় আকসারির। জ্ঞান ফিরে পেয়েই সে চীৎকার ক'রে ওঠে—বয়মপিশাচ, বয়মপিশাচ!

কেউ বুঝতে পারে না বয়মপিশাচ কি বা কোথায়? অন্য কেউ হ'লে এতক্ষণ তাকে হাঁকিয়ে দেওয়া যেতো, কিন্তু এ যে হাসান আকসারি। মস্ত পীর, খোদ বাদশা যার চেলা। তাই কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। অবশেষে তার মুখ থেকে যা সংগ্রহ করা গেল তার মর্ম হচ্ছে—আকসারি গাছের তলায় এসে উপরে তাকাতেই দেখতে পায় যে, ডালের উপরে একটা বিকট বয়মপিশাচ হাঁ ক'রে বসে আছে আর বলছে, ফিরিঙ্গি এনে দে আমার বড় খিদে পেয়েছে। ব্যাস, তারপরেই জ্ঞান লোপ পায় আকসারির। এই পর্যন্ত বলে সকলকে বলে, ইয়ে বচ্চে, যদি নিজেরা বাঁচতে চাও তবে তুরন্ত ফিরিঙ্গি এনে বলি দাও ঐ গাছতলাতে, বয়মপিশাচ ভুখা হ্যায়। আকসারির সতর্কবাণীতে নৌবত-খানার লোকেরা আগ্রহ প্রকাশ শুরু করেছে দেখে গালিব ও সুখানন্দ বিদায় নিয়ে বাড়ি রওনা হ'ল। লাহোরী দরবাজা দিয়ে গেলে অনেক ঘুরতে হবে তাই তারা বাঁয়ে ঘুরে লালকেল্লার বাজারের মধ্য দিয়ে দিল্লী দরবাজা হয়ে বেরিয়ে পড়ে। তারপরে সোনেরি দরগার গা ঘেঁষে ফৈজ বাজারের রাস্তা ধরে চলল দুজনে ফুলকি-মণ্ডির দিকে, ওরই কাছে কাছে একটা গলির এ-মোড় ও-মোড়ে তাদের বাস। অন্ধকার সরু পথ, সাবধানে চলতে হচ্ছে, চলতে চলতে কথা হচ্ছে দুজনের মধ্যে।

গালিব বলছে, পণ্ডিতজী আমাদের এই আকসারি সাহেব একজন পহেলা নম্বরের বুজরুক।

গালিব, সুখানন্দ, আসাদুল্লা প্রভৃতি সকলেই সামান্য-মতো ইংরেজী শিখে নিয়েছিল।

গালিব বলে, বাদশাকে খুশী করবার আশায় কত কথাই যে বলে। কখনো স্বপ্ন দেখছে কোম্পানী পালাচ্ছে, কখনো স্বপ্ন দেখছে ইরাণের শা ফৌজ নিয়ে এসে বাদশার হয়ে কোম্পানীর সঙ্গে লড়ছে। এমন কত কি!

বাদশা কি বুঝতে পারেন না?

বুঝতে চান না। মনের মতো কথা বলবে—এমন কতকগুলি লোক চায় রাজা বাদশা।

কাজটা তো কঠিন নয়।

খুব কঠিন। রাজা বাদশার মন ঘড়ি ঘড়ি বদলায়। এমন লোকের মনের

মতো কথা বলা কঠিন নয়, বলো কি!

সুখানন্দ বলে, কঠিন হোক না হোক লোকটা যে বুজরুক তার সন্দেহ নাই। একদিন আমাকে বলে কি—পণ্ডিতজী, তোমার কাটা আঙুলটা সরিয়ে নাও না কেন? আমি বলি, পীর সাহেব এ কি চুল না নখ, আবার গজাবে? আকলারি বলে, কিছু ভেবো না। একদিন জুম্মাবার সকালে পাঁচ ছটাক গোলমরিচ আর পাঁচটা মোহর নিয়ে যাও বাদশার কাছে। তিনি বাঁ পায়ের আঙুল, দিয়ে ছুঁয়ে দেবেন তোমার ঐ কাটা আঙুল, দেখতে দেখতে এক মাহিনার মধ্যে দিব্বি আঙুল গজিয়ে যাবে।

তবেই ছাখো লোকটা বুজরুক!

বুজরুক না শয়তান?

না, না, শয়তান নয়। শয়তান অপরকে ঠকায়, নিজে ঠকে। শয়তান যদি দেখতে চাও তবে ঐ হাকিম সাহেব, একেবারে শয়তানের জাসু।

এদিকে কিন্তু সর্বদা বেশ হাসিখুশি. সকলের সঙ্গে ভাই-বেরাদারি ভাব।

আরে ঐ তো শয়তানের আসল লক্ষণ। শয়তানকে কখনো রাগতে দেখেছ? হাসিতেই যার কার্যোদ্ধার হয়, সে রাগতে যাবে কেন? হাসির শ্বেতপাথরে বাঁধানো দোজখের সড়ক।

পর পর দুখানা তাঞ্জাম আর মশালচি যায়। সরুপথ, দুজনে এক পাশে দাঁড়ায়। তারপরে আবার পাশাপাশি চলতে চলতে কথা শুরু হয়।

ঐ যে সকলের সঙ্গেই ভাই-বেরাদারি ভাব বললে, ওটাই তো কুলক্ষণ। ফ্রেজার সাহেব, ডগলাস সাহেব, মেটকাফ সাহেব সকলের সঙ্গেই ওর ভাব। এদিকে তো বাদশা হাকিম সাহেব বলতে অজ্ঞান। আবার ঐ ছাখো না কেন রাত্রিবেলা রঙমহলে চলল ছোট বেগমের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে। ও যে কি মতলবে আছে তা খোদাও জানেন না।

সুখানন্দ বেশি কথা বলে না, নিতান্ত যেটুকু না বললে কথাবার্তার স্রোত থেমে যায় সেইটুকু মাত্র বলে। এতক্ষণ পরে লক্ষ্য করে গালিব, শুধোয়, ব্যাপার কি পণ্ডিতজী, আজ এমন মন-মরা ভাব কেন?

বড়ই দুশ্চিন্তায় আছি সাহেব। মেয়েটার বর খুঁজে পাচ্ছি না।

কেন, অভাব কি? তুলসী মাঈ তো সুশ্রী শান্ত মেয়ে।

হ'লে কি হয়, যোগ্য বাঙালী বর এদেশে পাওয়া তো সহজ নয়।

যোগ্য অবাঙালীতে ক্ষতি কি?

কিছু ক্ষতি নেই, তবে ছেলেটা রাজী নয়। বাঙালী পাত্রী জুটছে না বলে

এতদিন নিজেও বিয়ে করে নি। আমি যদি বলি ওরে নয়নচাঁদ, তোর মা থাকলে ভাবতাম না, কবে মরে যাই—তুলসীর বিয়েটা দিয়ে দে, দুশ্চিন্তার অবসান হোক, রাতে যে ঘুমোতে পারি না…বুঝলে সাহেব, সে বেটা বলে কিনা মা থাকলে তোমার দুশ্চিন্তা আরো বাড়তো। রাতের বেলায় ঘুম তো হ'তই না, দিনের বেলাতেও শান্তি পেতে না।

গালিবের মনে পড়ে নিজের বিবির কথা। ছেলেমেয়ে যে-কয়টি হয়েছিল সবগুলিই মারা গিয়েছে অল্পবয়সে। অবশেষে শালীর ছেলেকে নিয়েছিল দত্তক, সেও মারা গেল অল্প বয়সে। তারপর থেকে বিবিতে আর গালিবে বেসরকারী ফারকত চলছে। দুজনের মহল আলাদা। রসুই আলাদা, এমন কি বাসনপত্রও আলাদা।

গালিব সাহেব, নয়ন বলে, তুলসী কি তোমার গলায় বেধেছে, থাক না আর দু-চার বছর।

গালিব বলে, ওরা পিঠোপিঠি ভাইবোন, তাই বোনকে পাঠাতে চায় না স্বামীর ঘরে।

পিঠোপিঠি বইকি, বছর তিনেকের ছোট বড়। আমি বলি এক দিন তো বিয়ে দিতেই হবে। সে বলে, এক দিন তো মরতেই হবে, তবে আজই মরি, কেমন?

আজকালকার ছেলেদের ঐ এক রকম কথা।

আমি বলি, ঐ তো আছে কাগজী মহল্লার স্বরূপরাম, কোম্পানীর ছাপাখানায় কাজ করে, হুগলি-চন্দনপুরের মিত্তির, আমাদের পালটি ঘর। নয়ন কানে তোলে না।

এই যে এসে পড়েছি, বলে দাঁড়ায় গালিব, দাঁড়ায় সুখানন্দ। গালিবের বাড়িটা আগে, আদাব জানিয়ে ঢুকে পড়ে। এগিয়ে চলে সুখানন্দ, পৌঁছয় বাড়ির দরজায়। নিচু ছাদের, পুরু দেয়ালের উঁচু ঘুলঘুলির বাড়ি। মজবুত কাঠের মস্ত দরজায় একটি মাত্র মানুষ ঢুকতে পারে এমন মাপের একটা কাটা পাল্লা। দরজার কড়া ধরে বার কয়েক নাড়তেই ভিতর থেকে কাটা পাল্লা খুলে গেল, আর মাটির প্রদীপের আলোয় দেখতে পাওয়া গেল, যে-তুষারের উপরে কখনো সূর্যকরের স্পর্শ পড়ে নি, সেই অস্পৃশ্যস্পর্শা তুষারপুঞ্জে গড়া একটি বালিকামূর্তি।

সুখানন্দ বলল, তুলসী মা!

তুষার-কন্যা বলল, বাবা, আজ এত দেরি হ'ল কেন?

॥ ২ ॥

সব দরবাজা বন্ধ্

লালকেল্লার লাহোরী দরজা দিয়ে বেরিয়ে চাঁদনীচক বরাবর আধ মাইল পশ্চিমে চললে ডানে পড়বে পুবে পশ্চিমে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বেগমবাগ। বেগমবাগের দক্ষিণে, বেগমবাগ থেকে চাঁদনীচক অবধি সমান্তরাল দুটি গলি, গলি দরবার আর নিকা কাটরা। এই দুই গলির মাঝখানে অনেকখানি জায়গা নিয়ে শাহ্‌জাহানাবাদের প্রসিদ্ধ বাঈজী মহল্লা। শহরে আরো বাঈজী মহল্লা আছে, কিন্তু এটি সকলের সেরা। খ্যাতিতে অখ্যাতিতে বাঈজীর সংখ্যায় আর রূপে গুণে, আর কোন বাঈজী মহল্লা দাঁড়াতে পারে না কাছে। তা ছাড়া এর অনুগ্রাহকদের মধ্যে আছে শহরের আমীর ওমরা রঈস লোক, আছে শাহ্‌জাদার দল। ১৮৫৭ সালে শাহ্‌জাহানাবাদের পড়ন্ত অবস্থা, নিকা কাটরার বাঈজী মহল্লারও আর সে জলুস নেই। এক সময়ে, শাহ্‌জাহানাবাদের যখন বাড়বাড়ন্ত, তখন এর খ্যাতি তামাম হিন্দুস্তানকে ছাপিয়ে পৌঁচেছিল ইস্পাহান, বোগদাদ, সমরকন্দ—এমন কি রুমের রাজধানী ইস্তাম্বুল অবধি। দেশ-বিদেশ থেকে সুন্দরী বাঈজীরা আসতো এখানে ভাগ্যান্বেষণে, যেমন আসতো বীরপুরুষের দল আর ব্যবসায়ীর দল। হিন্দুস্তানের নানা অঞ্চল থেকে, আর ইরাণ, তুরান, মিশর, তুর্কী থেকে সুন্দরী বালিকাদের হরণ ক'রে এনে বেচতো ব্যবসায়ীরা। বাঈজী মহল্লার মালেকানরা কিনে নিতো দাঁও বুঝে, দু'শো চারশো টাকায়। তারপরে আরম্ভ হ'ত তাদের তালিম। সকাল বেলায় মৌলবীর পালা, শেখাতো ফারসী আর উর্দু, শেখাতো হাতের অক্ষর। তারপরে শুরু হ'ত মুখে মুখে গজল আর বয়েৎ রচনা শিক্ষা। মৌলবী দুটো ছত্র বলতো, তখনি তার পাল্টা দুটো ছত্র বলতে হবে বানিয়ে। এ বিদ্যায় যারা উতরে যেতো তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বিকাল বেলায় আসতো গানের ওস্তাদ, সঙ্গে আসতো তবলা, সারেঙ্গী তানপুরা নিয়ে খলিফাজী।

আরম্ভ হ'ত গানের মহড়া। একটু ভুল হ'লে ছড়ির ঘা অপরিহার্য। মাঝে মাঝে মালেকান হঠাৎ এসে পড়তো, দেখতো ঠিক শেখানো হচ্ছে কিনা। সুরের পদায় সামান্য একটুখানি ইতরবিশেষ হ'লে ওস্তাদের উপরে গিয়ে পড়তো, হাঁ মিঞাসাহেব, কতদিন হ'ল গান শেখাবার ব্যবসা ধরেছেন! মাস গেলে

তনথা শুনে নেন আর বাজে মাল দিয়ে বুঝ দিয়ে যাচ্ছেন! লজ্জিত ওস্তাদ এবারে ঠিক সুরটি বের করে। গানের ওস্তাদ গেলে আসতো নাচ শেখাবার ওস্তাদ। সে পালাও চলতো ঘড়ি দুই। বাঈজী মহল্লার অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জীবন আরামের নয়। হবেই বা কি ক'রে? মালেকান খানুম জান বলতো— দু'শো তনখায় কিনেছি, পাঁচ-সাত বছর খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করছি, গানবাজনা না শিখলে রোজগার ক'রে ঘরের টাকা ফিরিয়ে আনতে পারবে কেন? বলতো— শুধু রূপে কি হয়, দিল্লীর বাজারে কি রূপের অভাব আছে! সঙ্গে গুণ চাই নইলে রঈস আদমির মন বসবে কেন, কাম প্যারা, চাম প্যারা নহি।

তারপরে মেয়েটা বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে, ওর মধ্যে অনেক সময়ে মালেকানের নিজের মেয়েও থাকতো, একজন ধনী দেখে আমীর-ওমরা ধরে একদিন হাতে খড়ি হয়ে যেতো। এই উপলক্ষে যে টাকা আসতো তার পরিমাণ অনেক সময়ে ত্রিশ-চল্লিশ হাজারের কম নয়। সবটাই উঠতো মালেকানের সিন্দুকে। তারপর থেকে মেয়েটা, আগে যার নাম ছিল খুরশিদ, এখন থেকে হ'ল সে খুরশিদ জান, মালেকানের কাছে বাস ক'রেই অনেকটা স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করতো।

খুরশিদ যেদিন থেকে খুরশিদ জান হ'ল তখন আর তাকে পায় কে! তার সাজানো-গোছানো আলাদা ঘর। ছাদ থেকে ঝোলে ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো বিলাতী মানুষ-প্রমাণ আয়না, মেঝেতে বিছানো দামী মসলন্দ, পালঙ্কে বিছানো লখনৌ-এর ফুলকাটা চাদর। তার ঘরে দুইজন বাঁদী, বাইরে দুইজন বান্দা, তাদের হাতে খোলা তলোয়ার। যে লীলার উপসংহারে চরম বে-আব্রু, তার সূচনায় কড়াকড়ি না হয়ে যায় না। খুরশিদ জানের পায়ের কাছে মসলন্দের উপর গড়াচ্ছে চার-পাঁচজন সুবেশ তরুণ রঈস লোক, কেউ এগিয়ে দিচ্ছে পানের বাটা, কেউ পরিয়ে দিচ্ছে পায়ের চটি, কেউ হাতে তুলে দিচ্ছে ফরসির নল। মালেকান খানুম জানের অধীনে আরো অনেক বাঈজী আছে তবে খুরশিদ জানে কিছু বিশেষ। রূপে গুণে নাচে গানে, মুখে মুখে গজল রচনায় তার জুড়ি নাই তামাম হিন্দুস্তানে। তার রূপ সম্বন্ধে মুখে মুখে একটা ছড়া চলতো—

হিন্দুস্তানের মরদদের
গেছে চলে চোখের নিদ
কারণ হ'ল দিল-কুমারী
দিল্লীবালী খুরশিদ।

মাঝে মাঝে লুকিয়ে আসতো তার ঘরে শাহ্‌জাদারা কেউ কেউ, কখনো কখনো তার ডাক পড়তো খাস লালকেল্লার শাহ্‌জাদিনদের আসরে। অনেক টাকা দেওয়ার মতো এখন আর তাদের আস্থা নেই সত্য, তবে ইনাম না থাক নাম তো আছে। আর-সকলের থেকে সে আলাদা। যখন সে বাইরে যেতো, চার বাঁদী চলতো তার সঙ্গে, একজনের হাতে সোনার ফরসি, একজনের হাতে খসখসের পাখা, একজনের হাতে রূপোর কুঁজোয় জল, আর একজনের হাতে মুক্তো বসানো পানের বাটা। তার তাঞ্জামের আগে আগে ছুটতো তকমাধারী আসা-সোটাওয়ালার দল। খানুম জানের সেরা মাল খুরশিদ জান। তাই সে তাকে মনে মনে ভয় ক'রে বাইরে প্রসন্নতা দেখাতো।

তখন সবে সন্ধ্যা, তখনো খুরশিদ জানের আসর তেমন জমে নি, কেবল জনাতিনেক যুবক মসনদের উপরে অর্ধশায়িত অবস্থায় গড়াচ্ছিল, আর খুরশিদ জান গদিআঁটা আমার কেদারায় বসে কতক অবজ্ঞায় কতক কৌতূহলে শুনছিল তাদের কথোপকথন। এই তিনজনের কেউই আমীরওমরা নয়, এমন কি বনেদী রঙ্গস আদমিও নয়। স্বরযপ্রসাদ টাকাওয়ালা লোক কিন্তু তার টাকাগুলো এখনো বড়ই চকচকে, চিক্কণতার চাতুর্যের উপরে এখনো পড়ে নি আভিজাত্যের ছাপ।

নয়নচাঁদ ও স্বরূপরাম গড়াতে গড়াতে তর্ক করছিল, 'খুরসিদ' শব্দের সঙ্গে 'দিলকি সিঁধ' মেলে কিনা। স্বরূপ বলছিল, মিলবে না কেন? নয়নচাঁদ আপত্তি ক'রে বলে, 'দিলকি সিঁধ' একমাত্রা বেশি।

স্বরূপ বলে, এক-আধ মাত্রার বেশিতে কী এমন আসে যায়!

নয়নচাঁদ বলে, ছাপার অক্ষরে আসে যায় না, তবে কানে বাধে।

কানে বাধলো বলেই এমন মিষ্টি মিল ছেড়ে দেওয়া চলে না।

ছেড়ে দেবে কেন, ওটাকে বাগ মানিয়ে জুতসই ক'রে নাও।

বেশ, কি হবে বলো!

নয়নচাঁদ বলে, দিল-সিঁধ, খুরশিদের সঙ্গে মাত্রায় মাত্রায় মিলে গেল।

মিল হ'ল তবে মিষ্টি হ'ল না, বলে স্বরূপ। বলে, দিল কি সিঁধের জুড়ি রাত কি রানী। আচ্ছা, তুমি কি বলো স্বরযপ্রসাদ!

স্বরযপ্রসাদ বলে, ভাই আমার মাথায় মিল-উল আসে না, ওসব ছেড়ে দাও। তার চেয়ে আর এক খেলা খেলি।

কি খেলা? বলে একসঙ্গে দুইজন।

সুরযপ্রসাদ তুলে নেয় খুরশিদের জরির কাজ করা লাল মখমলের ছোট্ট জুতোর একপাটি। বলে, এসো, এটাকে আসমানে ছুঁড়ে দিয়ে পরীক্ষা করি কে মুখ দিয়ে ধরতে পারে।

প্রস্তাব শুনে দুজনে একসঙ্গে হল্লা ক'রে ওঠে, ভাই সুরয, তোমার মাথায় কী আছে ভাই?

এবারে খুরশিদ মুখ খোলে, আর যাই থাক মগজ নেই।

সুরয বলে, বিবি সাহেবা, মগজ কি মাথায় থাকে, মগজ থাকে সিন্দুকে। আমার সিন্দুকে অশ্‌শি হাজার আকবরি মোহর আছে।

তারপর বলে, নাও, এখন খেলা শুরু হোক।

খুরশিদ বলে, গেল আমার জুতোজোড়া।

জুতো যাবে জান পাবে, বলে সুরয ছুঁড়ে দেয় এক পাটি জুতো। আর মুখ দিয়ে ধরবার চেষ্টায় তিনজনে হাঁ করে উর্ধ্বমুখী হয়ে গুঁতোগুঁতি করে—জুতোটা পড়ে মাটিতে।

এসো আবার দেখা যাক্‌, বলে সুরয ছুঁড়ে দেয় জুতোটা।

তিনজনে আবার উর্ধ্বমুখে হাঁ করে গুঁতোগুঁতি শুরু করে, কিন্তু এবারে আর জুতো মাটিতে পড়ে না, ওদের মাথার উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কে ধরে নেয় জুতোটা।

তিনজনে চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, আরে, আলি খাঁ যে!

মহম্মদ আলি খাঁ কুর্নিশের ভঙ্গী ক'রে বলে, বান্দা হাজির, কেয়া হুকুম।

তার আগমনে খুরশিদ খুশী হয়ে উঠে। বলে, এসো আলি ভাই, আমার কাছে বসো, এই বলে তাকে হাতে ধরে পাশে বসিয়ে নেয়।

তারপরে ওদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলে, নাও এবার তোমাদের মিল মেলাবার লোক এসেছে। কিন্তু তখনি চোখ পড়ে আলি খাঁর হাতের একখানা কাগজের দিকে, শুধোয়, ওখানা আবার কি?

আলি খাঁ গর্বের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে কাগজখানায় দেয় নাড়া, ভাঁজ করা কাগজ খুলে যায়—লম্বা একখানা ফর্দ!

ব্যাপার কি খাঁ সাহেব, বলে ওরা তিনজন।

ইরাণের শার ইস্তাহার।

এলো কোথা থেকে?

বিস্ময়ের সঙ্গে আলি খাঁ বলে, এলো কোথা থেকে! শহরের সমস্ত লোক যা জানে তোমরা জানো না?

তারপরে একটু চিন্তা ক'রে নিয়ে বলে, আর জানবেই বা কি ক'রে? মেয়েছেলের জুতো নিয়ে যারা কামড়াকামড়ি করতে পারে তাদের জানবার কথা নয়।

সুরয বলে, মিঞা সাহেব, সাধে কি কামড়াকামড়ি করি! বলো দেখি, খুরশিদ আর দিল কি সিঁধে মাত্রায় মেলে কিনা?

এ যে দেখছি জুতো কামড়ানোর চেয়েও খারাপ।

খারাপ না হোক কঠিন, বলে সুরয। কিন্তু ঐ ইস্তাহার কোথা থেকে এলো বললে না তো!

কোথা থেকে এলো কেউ জানে না, তবে জামি মসজিদে, লালকেল্লার গায়ে, সোনেরি মসজিদে, সেলিমগড়ে সব জায়গায় লটকিয়ে দিয়েছে।

তা না হয় দিলো। কিন্তু কি আছে ওতে? বেশ খুলে বলো। সবতাতেই চাপাচাপি, ঐ তোমার এক বদ অভ্যাস, বলে খুরশিদ জান।

আরে খুলে বলবো বলেই তো এলাম ঘরে, দেখি কিনা মরদের দল মেয়েছেলে বনে গিয়েছে।

নয়নচাঁদ বলে, বেশ আবার মরদ হয়ে বসলাম, বলো।

ইরাণের শা লিখেছে যে, ফৌজ নিয়ে দিল্লির বাদশাকে সাহায্য করবার জন্ত আসছে, ইতিমধ্যে হিন্দুস্তানের হিন্দু-মুসলমান সকলে কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুক। লিখেছে, সকলে মিলে কোম্পানীর লালমুখ উল্লুগুলোকে কোতল ক'রে ফেলে হিন্দুস্তানে আবার আজাদী কায়েম করতে হবে।

নয়নচাঁদ উৎসাহের আতিশয্যে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, বাহবা, বাহবা, এই দিনটির জন্যই এতকাল অপেক্ষা করছিলাম।

সুরয বলে, আবার এক ঝামেলা শুরু হয়ে যাবে, মরতে মরবে আমার মতো গরীব আদমি।

সুরযপ্রসাদ, সিন্দুকে অশর্ফি হাজার আকবরি মোহর নিয়ে তুমি গরীব আর আমরা রঈস লোক, কি বলো?

নয়নচাঁদ ভাই—ও একটা ঠাট্টা করলাম, ওসব কথা ছেড়ে দাও।

খুরশিদ শুধোয়, আলি সাহেব, ইস্তাহারখানা সত্যি, না কেউ জাল ক'রে ছেপেছে?

জাল করবার উদ্দেশ্য?

কোম্পানীর হাজার শয়তানি। জাল ইস্তাহার বিলি ক'রে দেখতে চায় লোকের মনের ভাব। মেটকাফ সাহেব পহেলা নম্বর হারামজাদা।

না বিবি সাহেব, এর মধ্যে জালজুয়োচুরি নাই। ভাখো না কোম্পানীর কি হাল হয়।

তারপরে স্বরূপরামের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি যে বড় চুপ!

স্বরূপ বলে, জাল হোক আর সাচ্চা হোক, কোম্পানীর নিমক আমি খেয়েছি, আমি তাই এর মধ্যে নেই।

আমি নিমক খাই নি। বলে দাঁড়িয়ে ওঠে মহম্মদ আলি খাঁ—কোম্পানীর নিমক খাওয়ার ফলেই বুঝেছি ওর নিমকে গুণ নেই।

এ যে উল্টো কথা। কিছুদিন আগে তোমার মুখেই শুনেছি কোম্পানীর প্রশংসা, এক মুখে বলে শেষ করতে পারতে না,—বলল স্বরূপরাম।

তখন যে কেবলই কোম্পানীর চাকরিতে ঢুকেছিলাম—

তার মানে তুমি কি চাকরি ছেড়ে দিয়েছ নাকি?

হাঁ, তিন দিন আগে ইস্তফা দিয়ে কাল এসে পৌচেছি দিল্লিতে।

তার কথা শুনে তিনজন একসঙ্গে বলে উঠল, একটা আস্ত চাকরি ছেড়ে দিলে!

দিলাম বইকি।

আবার তিনজন একত্রে শুধোয়, কেন?

কেন শুনতে চাও? যখন দেখলাম যে, আমি রুড়কি টমসন এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের পাস করা পহেলা নম্বর ছাত্র, আমার উপরে এসে বসলো কেবলমাত্র সাদাচামড়ার সুপারিশে একটা লোক—যার ফিটার হওয়ার বেশি যোগ্যতা নেই—তখন বুঝলাম কোম্পানীর চাকরি কি চিজ! যখন দেখলাম যে সে বেটা আমাকে মিস্ত্রি মনে ক'রে হুকুম করে তখন বুঝলাম কোম্পানীর চোখে সাদা কালোয় আসমান-জমিন ফারাক। চাকরি না ছেড়ে করি কি?

খুরশিদ বলে, আর কিছুদিন না হয় দেখতে।

আর কিছুদিন দেখলে ছাড়তে পারতাম না। মাসের পহেলা তারিখে তনখা পাওয়ার নিশ্চিত আরাম মজার মধ্যে একবার ঢুকে পড়লে কি আর চাকরি ছাড়া সম্ভব হ'ত?

এখন কি করবে, শুধোয় সূর্যপ্রসাদ।

আজ সকাল অবধি জানতাম না কি করবো। তারপরে এই ইস্তাহার হাতে আসায় ভরসা পাচ্ছি। লড়াই বেধে উঠলে এঞ্জিনীয়ারের দরকার হবে।

স্বরূপরাম শঙ্কিতভাবে শুধোয়, তুমি কি লড়াই করবে কোম্পানীর বিরুদ্ধে?

ওকে লড়াই ছাড়া আর কি বলে!

আলি খাঁ, ভুলে যেয়ো না যে আজ একশো বছরের মধ্যে কোম্পানীকে কেউ হারাতে পারে নি।

তাতে ক'রে প্রমাণ হয় না যে, একশো বছরের মাথায় পরাজয় ঘটবে না!

নিশ্চয় ঘটবে, বলে নয়নচাঁদ। বলে, সেদিন পাহাড়গঞ্জের ফকির সাদিক খাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কথায় কথায় বলল, এবারে পলাশীর লড়াইয়ের একশো বছর পূর্ণ হ'লে কোম্পানীর রাজগী যাবে।

ওসব পীর ফকিরের বুজরুকি ছেড়ে দাও। ওরা তোমার কাছে বলছে কোম্পানীর রাজগী যাবে। আবার খবর নাওগে মেটকাফ সাহেবকে বলছে, বাহাদুর শার পরে বড়লাট বসবে দিল্লির সিংহাসনে।

নয়নচাঁদ গর্জে ওঠে, স্বরূপরাম, তুমি যে এত বড় একটা কাপুরুষ তা জানতাম না।

নয়নচাঁদ, কামানের কাছে চালাকি চলে না।

মরা তো চলে। তা ছাড়া বাদশার কি কামান নেই?

কামান আছে, তবে গোলন্দাজ সেপাই যে কোম্পানীর। কামান তো আপনি আওয়াজ হবে না।

ধরো সেই কামানের মুখ যদি ঘুরে যায়, সেপাই যদি বেঁকে বসে!

তারা নিমক খায় নি কোম্পানীর? বলে স্বরূপরাম।

কিন্তু ধর্মের উপরে তো নিমক নয়!

নয়নচাঁদ, এর মধ্যে আবার ধর্ম এলো কোথা থেকে?

কেন, শোন নি চর্বিমাখা কার্তুজের কথা?

সমস্ত ব্যাপারটাই গুজব, রটাচ্ছে গোঁয়ার পুরবীয়া সেপাইরা।

নয়নচাঁদ বলে, তুমি যে এক ছটাক নিমক খেয়ে এমন পাক্কা গোলাম হয়ে পড়লে, এ বড় তাজ্জব ব্যাপার।

মিছে বচসা ক'রে লাভ নেই, আমি চললাম, যা করবে ভেবেচিন্তে করো।

যাচ্ছ যাও, তবে আমার বাড়ির দিকে আর যেয়ো না।

তোমার বাড়ি কোথাও আছে বলে তো জানি না। এখন মাঝে মাঝে যাই বটে, তবে সেটা সুখানন্দ পণ্ডিতজীর বাড়িতে।

এই বলে স্বরূপরাম উঠে পড়লো, কিন্তু বের হওয়ার আগেই ঝড়ের মতো প্রবেশ করলো নবাব মিঞা। তার বাঁ হাতে চেপে রেখেছে বগলের মধ্যে

আধখালি একটা বোতল, আর ডান হাত আকাশে আন্দোলিত করছে সেই ইস্তাহার একখণ্ড। এই অবস্থায় 'মারহাব্বা', 'মারহাব্বা' বলে সে নাচতে শুরু করলো, সুর ক'রে গান ধরলো—

কোম্পানীকা মাল
দরিয়ামে ডাল,

আর শমের কাছে এসে চীৎকার করে ওঠে, মারহাব্বা মারহাব্বা।

নবাব মিঞা উপস্থিত সকলেরই পরিচিত, দিল্লি শহরের কে না চেনে তাকে, তাই কেউ বিস্ময় প্রকাশ করলো না, বরঞ্চ এ রকমটি না হ'লেই বিস্ময়ের কারণ ঘটতো।

খুরশিদ জান বললো, নবাব অনেকদিন তোমাকে দেখি না, তোমার সাকিন মোকাম কিছুই জানি না।

সাকিন দুনিয়া আর মোকাম এতক্ষণ ছিল চাঁদনীচকের নহর। বেশ ছিলাম। হঠাৎ শালা কোতোয়ালের পাইক এসে বলে, ওঠো, এখানে থাকবার হুকুম নেই। শোনো একবার শালার কথা—নহরের জলে মাছ ব্যাঙ গুগলি কত কি আছে, আর আমার থাকবার হুকুম নেই! উঠতেই হ'ল, বেটার হাতে একটা কিরিচ ছিল কিনা। তাই আজ রাতটা মোকাম তোমার বাড়িতেই হবে ভাবছি।

খুরশিদ স্নেহের সঙ্গে বলল, যখন তোমার আর কোথাও থাকবার জায়গা জুটবে না, এখানে আসলেই পারো।

তাই তো আসি, জান। কিন্তু তোমার এখানে যে আবার সব আমীরওমরা লোকের আমদানি হয়। আমার ভেজা জামা, ছেঁড়া টুপি।

নহরের জলে পড়ে থাকলে জামাকাপড় ভিজবে না? আর টুপিটা তো বেবাক ছিঁড়ে গিয়েছে।

আয়নায় ছায়া দেখে বলে ওঠে নবাবও, ইস, টুপিটা তো একদম ছিঁড়ে গিয়েছে!

আর জামাকাপড়েরই বা কি শ্রী!

খুরশিদ জান, জামাকাপড় না হলেও রঈস আদমির চলে, কিন্তু টুপি একটা চাই-ই, ওটাই ভদ্রতার মিনার।

বেশ কালকে তোমাকে টুপি কিনে দেবো, সেই সঙ্গে নূতন পিরান পাজামা।

তার চেয়ে এই ভালো, এই বলে খুরশিদের গা থেকে টেনে নেয় দোপাট্টা

আর মাথায় জড়িয়ে নিয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে নবোদ্গত গোঁফে তা দিতে দিতে বলে, কাশ্মীরের মহারাজার মতো দেখাচ্ছে না? আহা ভালো ক'রেই ভাখো না, এই বলে খুরশিদকে টেনে এনে পাশে দাঁড় করায়। কি, কাশ্মীরের মহারাজা কিনা?

একটুখানি হেসে খুরশিদ্ বলে, না, লখনৌ-এর নবাব।

কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! এর জন্মে ইনাম না দিলে নিমকহারামি হবে- এই বলে খুরশিদকে জড়িয়ে ধরে দুই গালে চুমো খেয়ে চলে।

থামবে না?

কেন থামবো? অনেক দিন পরে বর্ষা নেমেছে যে।

তারপর আবৃত্তি করে—

দিল মহলে খিল খুলেছে অনেক দিনের ভুখার পরে
আসমানে আজ মেঘ জমেছে পড়ছে ছায়া নদীর চরে।

নাঃ, আর মনে আসছে না। তবে এ-ও বলে রাখি, এরকম লিখতে পারে না তোমাদের বুড়ো গালিব। তোমরা যাই বলো না কেন।

কে বলছে পারে, তোমার কাছে কেউ নয়, নাও এখন ব'সো।

এই বলে তাকে পালঙ্কের উপরে বসিয়ে দেয় খুরশিদ, শুধোয়, খিদে পেয়েছে, কিছু খাবে?

যার পরে ভুখ নেই, যার চেয়ে সুখ নেই—এই যে খেলাম, পেট একেবারে ভরে গিয়েছে।

দুই চোখে স্নেহ বর্ষণ ক'রে খুরশিদ বলে, পাগল! তারপরে পাগড়ি খুলে ফেলে চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

কেউ বিস্মিত হয় না, সবাই জানে খুরশিদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ। সবাই জানে নবাব মির্জা বেগ সরকারীভাবে খুরশিদের মালিক আর বেসরকারী মালিক এই তরুণ যুবক, ঘর-ঠিকানা ভবঘুরে লোকটা। কাজির বিচারে এমন অপরাধ অল্পই আছে যা করে নি এই লোকটা, তবু সে-সব দাগ কাটতে পারে নি ওর মনে। পালঙ্কের পঙ্কজ সরাব মিঞা। হাঁ, একটা পৈতৃক নাম ওর আছে বৈকি—কিন্তু আজ তা প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়। সরাব-ভক্ত নিজেই নূতন নামকরণ ক'রে নিয়েছে সরাব মিঞা। ঐ নামেই ওর পরিচয়। সবাই যখন এই সব কথা ভাবছিল, খুরশিদ শুইয়ে দিয়েছিল তাকে শয্যার উপরে আর জামার বোতামগুলো খুলে খসখসের পাখা দিয়ে হাওয়া করতে শুরু করেছিল। সুরা ক্লান্তি আর নিদ্রায় নিমীলিত-প্রায় তার চোখের দিকে চেয়ে খুরশিদের মনে পড়ছিল—সেই

খুরশিদ তখনো খুরশিদ জান হয় নি, যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবার স্বাধীন অধিকার ছিল, বিকেল বেলা গিয়েছিল যমুনার চরে। এমন প্রায়ই যেতো, গরমের দিনে স্নান করতো, ঘুরে ঘুরে শামুক গুগলি সংগ্রহ করতো, তারপরে অন্ধকার হওয়ার মুখে, সেগুলো আবার ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে ফিরে আসতো নিকা কাটরায়। সেদিন যমুনার চরে গিয়ে দেখে একখানা নৌকো লেগে আছে, লোকজন আছে মনে হ'ল না, ভাবলো নৌকোখানা ঠেলে দিয়ে উঠে পড়লে মন্দ মজা হবে না। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। নৌকোখানা ঠেলে দিতেই স্রোতের মুখে পড়লো, লাফিয়ে উঠে পড়লো খুরশিদ। নৌকো যখন দ্রুত চলতে শুরু করেছে, হঠাৎ চমকে উঠে আবিষ্কার করলো নৌকোর খোলের মধ্যে শুকনো ঘাসের বিছানায় কে একজন শুয়ে ঘুমোচ্ছে—ঠাহর ক'রে দেখলো বয়সে নিতান্ত ছোকরা। এখন কি করবে? লাফিয়ে পড়বে? জল অনেক, জানে না সাঁতার। তীরে ভেড়াবে? হাল লগির কৌশল জানে না। অগত্যা সেই নিদ্রিত কিশোরের সুন্দর, হাঁ নিতান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যেও সৌন্দর্য-বোধটুকু লোপ পায় নি, সেই সুন্দর মুখখানার দিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো চেয়ে ব'সে রইলো। এমন সময়ে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো কিশোর। তারও বিস্মত হওয়ার কথা, কিন্তু মোটেই বিস্মিত হ'ল না, যেন নিতান্ত প্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে, যেন নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তি এসেছে—এমন ভাব দেখিয়ে সে বলে উঠল, মেরে জান তু—

তু সম্বোধনে সম্বিৎ ফিরে পেলো খুরশিদ, বলল—তু বলো না, আমার বয়স হয়েছে।

আরে সেই জন্যেই তো তু বলছি, বুঢ্ঢি হ'লে আপ বলতাম, শিশু হ'লে তুম বলতাম, ঠিক সে বয়সটি আমার পছন্দ সেই বয়স বলেই তু বলছি।

খুরশিদ দেখলো লোকটা দমে না। তবু সাহসে ভর ক'রে বলল, আমাকে নামিয়ে দাও।

লোকটি নির্বিকার ভাবে বলল, আমি কি তোমাকে তুলেছি যে নামিয়ে দেব! নিজে উঠেছ নিজে নেমে যাও।

নদীর দিকে তাকিয়ে খুরশিদ বলে, এখানে যে অনেক জল।

যমুনায় যে অনেক জল তা কি জানতে না পিয়ারি?

এবারে পাল্টা প্রশ্ন করে খুরশিদ, তুমি কখন নামবে?

আমি তো নামবো না।

তবে কি এমান ক'রে ভেসে চলবে ?

বিলকুল।

ভারি মজা লাগে খুরশিদের। শুধোয়, কত দিন ?

এন্তেকাল তক।

তারপর ?

তারপর আর কি ? বেহেস্ত থেকে এসেছি দোজখে গিয়ে উঠবো।

দোজখে যেতে ভয় করে না ?

তোমারও তো ভয় করছে নৌকোর উপরে। উপায় কি ?

তারপরে বলে, ওসব থাকগে। এখন শুনি তোমার নামটি কি ?

খুরশিদ।

বাঃ বাঃ, বেশ নাম, অনেক মিল পাওয়া যাবে গজল লিখতে গেলে।

খুরশিদ ব্যঙ্গের স্বরে বলল, তুমি কি গজল লেখো নাকি ? কোন গুণেরই অভাব নাই দেখছি।

বাজে কথা রাখো, শোনো।

এই বলে সে আরম্ভ করলো—

হঠাৎ আমি নদীর তীরে দেখতে পেলাম খুরশিদে
দেখতে বোকা কিন্তু তবু মেয়েটি নয় খুব সিধে
গোবদা গড়ন দেহের ধরন
রঙটা যেন মেঘের বরণ
বুঝতে নারি তবু কেন চাতক পাখীর পায় খিদে!

শুধোয়, কেমন হ'ল ?

বিশ্রী, বাজে।

বিশ্রী, বাজে ? পারে এমন লিখতে তোমার বুড়ো গালিব ?

ঠোঁট উল্টে দিয়ে খুরশিদ বলে, কিসে আর কিসে।

জানো সবাই বলে আমি গালিবের চেয়ে ভালো লিখি।

আপনে মনে মিঞা মিঠু। গালিবের সহিসটাও তোমার চেয়ে ভালো লেখে।

কি, এত বড় কথা! দেবো তোমাকে জলে ফেলে।—পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নেয় খুরশিদকে।

জলে পড়লে যে মরে যাবো।

বেশ ফেলবো না, বলো গালিবের চেয়ে ভালো লিখি।

বললেই ঢুকে যেতো। কিন্তু খুরশিদ বলে না। বোধ করি তার ভালোই লাগে এই পরুষ আলিঙ্গন। সে বুঝে নিয়েছে জলে ফেলবে না, তবে আলিঙ্গনের দার্ঢ্য বাড়তে পারে। খুব সম্ভব সেই ভরসাতেই বলে ওঠে, গালিবের ঘোড়াটাও তোমার চেয়ে ভালো লেখে।

বটে! এই দিলাম ফেলে!

ফল হয় উল্টো। খুরশিদ দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে, বলে, দাও ফেলে, দুজনেই পড়ি।

খুব যে সাহস!

সাহসের অভাব হ'তে যাবে কেন?

সত্যি? দেখি কতখানি সাহস! এই বলে তাকে ঘাসের গাদার উপরে শুইয়ে দিয়ে পাশে শুয়ে পড়ে সবার মিঞা।

ও কি হচ্ছে?

চুমো খাচ্ছি।

তুমি খুব বদলোক।

ভয় করছে তো? গেলে হেরে।

ভয় করছে তো বলি নি, বলেছি তুমি খুব বদলোক।

আমিও তো অস্বীকার করি নি। আমি বদলোক হ'তে পারি তবে শায়ের হিসাবে গালিবের চেয়ে ভালো।

গালিবের কুত্তাটাও ভালো লেখে তোমার চেয়ে।

বটে!

ও কি হচ্ছে?

এই তো ভয় পেয়ে গেলে?

কথ খলো না। তুমি বিলকুল বদলোক।

খুরশিদের মুখের সঙ্গে আচরণের মিল ঘটে না। বদলোকের কাছে থেকে যতটা দূরে থাকা আবশ্যক—তেমন দূরত্ব স্থাপনের চেষ্টা প্রকাশ পায় না তার আচরণে।

ও কি হচ্ছে! ছেড়ে দাও!

ছেড়ে দেবো, আগে বলো গালিবের চেয়ে ভালো লিখি?

তুমি বদলোক আর তার চেয়েও বদ শায়ের।

ইস, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

ছাড়ো ছাড়ো, আচ্ছা স্বীকার করছি তুমি ভালো লেখো।

কিন্তু তখন আর ছাড়বার উপায় নেই। তখন যমুনায় দোল দিয়েছে, ঢেউগুলোয় কণ্ঠ গদ্‌গদ, বাতাসে বাসরঘরের ফিসফিস, আকাশে প্রণয়-স্তিমিত নেত্র।

খুরশিদ একবার দেখতে পায় উচ্চাকাশে পাখীর বিন্দু, আবার তখনি সব ঢেকে দেয় সরাব মিঞার ঝাঁকড়া চুল। চোখে ঘনিয়ে ওঠে অন্ধকার। দোজখ কি এমনি ঘনান্ধকার? তবে চলুক নৌকা ভেসে দোজখের ঘাট অবধি। কি দরকার নামবার? কি দরকার থামবার? সরাব তাহলে মিথ্যা বলে নি সে দোজখের যাত্রী—সঙ্গে সে-ও, খুরশিদও।

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে সরাব মিঞা।

ইরাণের ফৌজ আজ কাশ্মীর দরবাজার কাছে, আর আমি এখানে শুয়ে কসবির আঁচলের বাতাস খাচ্ছি। ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে।

সে উঠতে যাচ্ছে দেখে ধরেছিল খুরশিদ।

খুরশিদ, তুমি আমাকে সরাব খাইয়ে, কাবাব খাইয়ে ভুলিয়ে রাখতে চাও!

তারপরে ওদের চারজনের দিকে তাকিয়ে বলে, আর তোমাদেরও বলিহারি যাই ইয়ার, তোমরা এখানে বসে সরাব গিলছ কোন্ মুখে?

সবাই জানে সরাবের প্রকৃতি, জানে এখনি তাকে শান্ত করতে না পারলে খুনোখুনি ব্যাপার ক'রে ফেলবে। তাই সকলের মুখপাত্র হয়ে আলি খাঁ বলল, মিছে গোসা হচ্ছ সরাব মিঞা, আমরাও চিন্তা করছিলাম আমাদের কর্তব্য। অনেক ঝামেলার পরে স্থির হ'ল আগে আসুক সরাব মিঞা তার পরে যা হয় করলেই হবে।

তবু ভালো যে বুদ্ধিটুকু হয়েছে। কিছু স্থির করেছ কি?

আলি খাঁ বলে—স্বরূপরাম আমাদের সঙ্গে নয়, তাই নয়নচাঁদ বলেছে যে স্বরূপরাম যেন তাদের বাড়িতে আর না যায়,—তার দরবাজা বন্ধ।

বহুৎ আচ্ছা। তোমার কি বলবার আছে স্বরূপরাম?

স্বরূপ তখনো অপমানে ও রাগে পুড়ছিল, তাই একেবারে গর্জে উঠল, তুমি আবার কোন্ কাজী এলে বাপু যে তোমার কাছে আরজি পেশ করবো। আমি যাচ্ছি কিন্তু তার আগে সাবধান ক'রে দিয়ে যাচ্ছি, কোম্পানীর বিরুদ্ধে যেয়ো না, মরবে, মরবে, মরবে, সব ফাঁসিকাঠে লটকাবে।

এই বলে সে দ্রুত প্রস্থান করলো।

মরবো, মরবো, মরবো, ফাঁসিকাঠে লটকাবো, সাধ্য কোন্ শালার বাঁচায় আমাকে, বলে লাফিয়ে উঠল সরাব মিঞা।

সবাই তাকে হাত ধরে টেনে বসালো, বলল, ওর কথায় কান দিয়ো না, ও লোকটা কোম্পানীর গোলাম।

তবে শোন—বলে আরম্ভ করলো সরাব মিঞা, এমন কোম্পানীর গোলাম অনেকেই আছে।

তারপরে খুরশিদের দিকে তাকিয়ে বলল, খুরশিদ তোমার কাছে যারা আসে তাদের মধ্যেও অনেকে আছে কোম্পানীর গোলাম, তোমার কাছে, বিসমিল্লাজানের কাছে, উমরাওজানের কাছে, আমীরজানের কাছে, সুলতানীজানের কাছে—নিকা কাটরার বাঈজী মহল্লার ধারে কাছে। তোমরা সব এক-কাট্টা হয়ে যদি বলো, সব দরবাজা বন্ধ্, হয় কোম্পানীর বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরো, নয় সব দরবাজা বন্ধ্—তবে দেখবে সবাই ঘুরে দাঁড়াবে।

আর যদি ঘুরে না দাঁড়ায়, শুধোয় আলি খাঁ, তবে সব দরবাজা বন্ধ্, কি বলো খুরশিদ-জান?

আমার কি অসাধ!

সাধ্য সাধ্যের কথা নয়, এ হচ্ছে ইমান। শালা কোম্পানীকে হটাবার এই হচ্ছে সুযোগ।

সরাব মিঞার অভিনব যুদ্ধরীতি শুনে বুঝলো লোকটার মাথা মদে আর অভাবে আর অত্যাচারে একেবারেই খারাপ হয়ে গিয়েছে। তবু সরাসরি না বলা উচিত হবে না। কোম্পানীকে ছেড়ে উপস্থিত বন্ধুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে কতক্ষণ। লোকটাকে ঠাণ্ডা করা আবশ্যক। আর তাকে ঠাণ্ডা করবার একটাই পন্থা আছে। তাই আলি খাঁ বলল—যা বলেছ ভাই, এ সব কথা আর কার মাথায় আসতো। এক কাজ করো না, একটা কিছু লিখে ফেলো না, গজল কি কাসিদ কি ঐ রকম একটা কিছু।

মারহাব্বা, ঠিক বাৎ হ্যায়, বলে লাফিয়ে উঠলো সরাব মিঞা।

তারপরে বাঁ হাতে বোতলটা তুলে নিয়ে ডান হাতে খুরশিদকে ধরে বলল, এসো।

খুরশিদ শুধালো, কোম্পানীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে নাকি?

সেটা পরে হবে, আগে একটা গজল—ঐ পাশের ঘরে।

নয়নচাঁদ বলল, এক হাতে বোতল এক হাতে খুরশিদ, লিখবে কি দিয়ে?

দিল্ দিয়ে। কলম দিয়ে লেখে বেওকুফেরা, যেমন গালিব। আমি দিলসে লিখি, সরাব-সে লিখি। চলো আর দেরি নয়—বলে খুরশিদকে টানতে টানতে নিয়ে যায়।

নয়নচাঁদ বলে, চলো, এই সুযোগে যাওয়া যাক।

পাগল নাকি! ওর গজল না শুনে গেলে বাড়ি ধাওয়া ক'রে শোনাবে। তার চেয়ে এখানে বসে পরামর্শটা সেরে নিই।

বলে চলে আলি খাঁ, কাল সকাল দশটার সময়ে রাজঘাটের দরবাজায় তোমরা হাজির থেকো, আরো লোক নিয়ে আমিও থাকবো।

সুরয শুধোয়, কেন হল্লা-উল্লা হবে নাকি?

নয়নচাঁদ বলে, লড়াই করতে রাজী আছ, হল্লায় ভয় করলে চলবে কেন?

আরে ভাই, লড়াই এক হল্লা আর বাঘের চেয়ে বিচ্ছুকে ভয় বেশি, ব্যাপারটা কি শুনতে বাধা কি?

শোনা কেন দেখতেই পাবে—সবুর করো না।

আচ্ছা ভাই আজ আসি, রাম রাম। সেলাম আলিসাহেব, বলে দুজনের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও বিদায় হয়ে যায় সুরযপ্রসাদ।

ও কি সব ফাঁস ক'রে দেবে নাকি?

না, সে সাহস নেই, তবে রাজঘাটের দরবাজায় হাজির থাকবে না নিশ্চয়। কিন্তু সন্দেহ করি ঐ স্বরূপরামকে। ও লোকটা মনেপ্রাণে কোম্পানীর গোলাম, আর তা ছাড়া দেহে যেমন শক্তি মনে তেমনি সাহস।

ওকে দলে টানা যায় না নয়নভাই?

সে সম্ভাবনা থাকলে আমার বাড়ির দরবাজা বন্ধ্ বলতাম না।

সত্যি দরবাজা বন্ধ করলে নাকি?

এটা ভয় দেখানো মাত্র, তবে একদিন হয়তো দরবাজা সত্যি বন্ধ্ করতে হবে।

বড় আপসোসের কথা। দিল্লি শহরে তোমরা কয়েক ঘর মাত্র বাঙালী, তার মধ্যে আবার দলাদলি।

ওটা আমাদের স্বভাব। আমাদের দেশে একটা ছড়া আছে—যেখানে বাঙালী, সেখানে কালী[illegible], সেখানে দলাদলি।

উচ্চস্বরে হেসে ওঠে আলি খাঁ, সঙ্গে যোগ দেয় নয়নচাঁদ।

এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সরাব মিঞা। এবারে বাঁ হাতে বোতলের বদলে একখানা কাগজ, ডান হাতে পেঁচিয়ে ধরেছে খুরশিদের

কোমর। তার চলনে বলনে বেশ বুঝতে পারা যায় বোতলের মধ্যস্থিত পদার্থ এখন সরাব মিঞার মধ্যস্থিত।

নাও শোনো, এই বলে আধা সুর আধা আবৃত্তির স্বরে আরম্ভ করলো—

সব দরবাজা বন্ধ্
দিল্লী সমরকন্দ্
আছ যত মরদ
ভাঙো কোম্পানীর গারদ
হাতে তুলে দেব সরস কালাকন্দ্
কোম্পানীকা মাল
দরিয়ামে ডাল
হাতে তুলে দেব তবে আসমানের চন্দ্।

বলে দেখায় খুরশিদকে। তারপরে বলে—

পারে এমন লিখতে তোমাদের গালিব?

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, কথ্‌খনো না।

একটু নাচো না খুরশিদ জান।

নাচবো, তার আগে তুমি একটু জিরিয়ে নাও।

এই বলে তাকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। বেশি জোর করতে হ'ল না। সমস্ত দিনের ধকলে সে একেবারে লবেজান হয়ে পড়েছিল, বিছানায় শোবামাত্র ঘুমিয়ে পড়লো।

এবারে আমরা উঠি--বলে উঠে দাঁড়ালো নয়নচাঁদ আর আলি খাঁ।

খুরশিদ মুখে আঙুল দিয়ে ইশারা করলো, গোলমাল হ'লে জেগে উঠবে সরাব মিঞা।

আলি খাঁ চাপাকণ্ঠে বলল, কাল সকালে রাজঘাটের দরবাজা—মনে থাকে যেন।

নয়ন ইশারায় জানালো, ভুলবে না।

ততক্ষণে নাসা-গর্জনের গম্ভীর রবে গালিবকে গজল-ছন্দে আহ্বান জানাতে শুরু ক'রে দিয়েছে সরাব মিঞা।

॥ ৩ ॥

"এবার যে ঐ এলো সর্বনাশা গো।"

১১ই মে শাহ্‌জাহানাবাদে যে প্রভাত হ'ল, তার মুখে ভাবী ভয়াবহতার চিহ্নমাত্র ছিল না। সে মুখ নিত্যকার মতো প্রফুল্ল ও নির্মল। বাহাদুর শা আসাম্মান বুরুজে বসে বুলবুলিটিকে খেতে দিচ্ছিলেন। পোষা পাখি তাঁর হাঁটুর উপরে বসে এক ঠোকরে খাদ্য নেয় বাদশার হাত থেকে, তারপরে গলাটা উঁচু ক'রে দিয়ে তাকায় আকাশের দিকে। খাদ্য নেমে গিয়ে পৌঁছয় পেটের মধ্যে, তখন ছোট্ট একটি শিস দেয়। সেটা আনন্দে,—কি আকাঙ্ক্ষায়, কি আবদারে ঠিক বোঝা যায় না। বাদশা আর একটি ছোট ছাতুর গুটি তুলে ধরেন তার মুখের কাছে, টুক ক'রে ঠোঁট দিয়ে নিয়ে গিলে ফেলে বুলবুল-ই-হজার দস্তান, হাজার গল্পের পাখি। এ সময়ে না ডাকলে কারো কাছে আসবার হুকুম ছিল না। কেবল নিঃসঙ্গ দুটি প্রাণী, বাদশা আর বুলবুল, সমান অসহায়, সমান দুর্বল। বাদশা ছোট্ট একটি পোকা তুলে ধরেছেন, পাখিটাও মুখ বাড়িয়েছে, এমন সময়ে খাস খানসামা বসন্ত আলি খাঁ এসে কুর্নিশ ক'রে দাঁড়ালো।

বিস্মিত বাদশা শুধালেন, কি খবর বসন্ত আলি?

জাঁহাপনা, বাইরে সিপাহী লোক হল্লা করছে।

সিপাহী লোক! চমকে ওঠেন বাদশা। আকবর আলমগীরের উত্তরপুরুষ সিপাহী শব্দটা একরকম ভুলেই গিয়েছিলেন। দু-এক লহমা লাগে তাঁর শব্দটার তাৎপর্য বুঝতে। তারপরে শুধান, কি চায় তারা? আবার কি তনখা বাকি পড়লো নাকি?

তারা বাদশাকে ভেট করতে চায়।

কোথায় তারা?

কেল্লার পুবে যমুনার চরে।

এবারে বাদশা উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। উৎকর্ণ হয়ে উঠলেই হল্লা কানে আসতো। আগেই আসতো। না আসবার কারণ নেই, এক সার ইমারতের মাত্র ব্যবধান। কিন্তু তিনি এমনি বুলবুলিগত প্রাণ যে, বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাম নিষ্ক্রিয়। তা ছাড়া, আলমগীরের মৃত্যুর পরে আজ দেড়শ' বছর হ'ল বাদশারা পুত্তলে পরিণত হয়েছেন। চোখ, কান প্রভৃতি নিজ নিজ কর্তব্য

একরকম ভুলেই গিয়েছে। পাখিকে আর খাওয়ানো হয় না, ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বাদশা বলে ওঠেন, না না, আমি দেখা দিতে পারবো না। কিল্লাদার সাহেবকে খবর দাও।

ক্যাপটেন ডগলাস কিল্লাদার অর্থাৎ লালাকেল্লার রক্ষক। নামে কিল্লাদার হ'লেও আসলে সে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট।

ক্যাপটেন ডগলাস এসে কুর্নিশ ক'রে দাঁড়ায়। বাদশা বলেন, ডগলাস সাহেব, ছাখো সিপাহীরা কি চায়।

ডগলাস কেল্লার পুব দিকে গিয়ে ঝরোকার কাছে দাঁড়ায়। দেখে যে যমুনার জল ও কেল্লার প্রাচীরের মধ্যে যে বিস্তৃত চর পড়েছে সেখানে হাজার খানেক সিপাহী, অধিকাংশই ঘোড়সওয়ার, পদাতিকও আছে। তাদের উর্দি দেখে ডগলাস বুঝতে পারে, কালকে রাতে গুজব আকারে যেটা শুনেছিল সেটা সত্য। এরা মীরাট ছাউনির বিদ্রোহী ফৌজ, রাতারাতি চলে এসেছে দিল্লিতে।

ডগলাস তাদের হল্লা করতে নিষেধ করলো, চলে যেতে বলল। বলল, বাদশা ভারি গোসা হয়েছেন।

তারা বলল, সাহেবের কথা তারা শুনতে চায় না। খোদ বাদশার কাছে দরবার করতে এসেছে তারা মীরাট থেকে, শহরের দরজা খুলে দেওয়া হোক।

ডগলাস আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে তাকে লক্ষ্য ক'রে একজন গুলি ছুঁড়লো।

ডগলাস বুঝলো, এদের বোঝানো যাবে না। ফিরে এসে বাদশাকে সব জানালো। বাদশা বললেন, শহরের দরজা যেন না খোলা হয়, আর রাজপুর ছাউনি থেকে পল্টন নিয়ে আসতে বললেন ডগলাসকে। ডগলাস কুর্নিশ ক'রে চলে গেল। হল্লা বাড়ছে দেখে বাদশা উঠে পড়লেন। হতচকিত বুলবুলিটা আগেই উড়ে পালিয়েছিল।

কেল্লার বাইরে যেতেই ডগলাস দেখা পেলো কমিশনার ফ্রেজার, কলেক্টার হাচিনসন ও জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট মেটকাফের। তারাও হল্লার সংবাদ পেয়ে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানবার জন্যে আসছিল ডগলাসের কাছে। শহরের দরজা বন্ধ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসিত হয়ে ফ্রেজার বলল, শহরের সব দরজা বন্ধ।

কিন্তু দরজা বন্ধ করবার যেমন লোক আছে, খুলে দেওয়ার লোকও যে তেমনি থাকতে পারে, এ খেয়াল তাদের ছিল না। হ'লও তাই। তারা কেল্লার লাহোরী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করছে এমন সময়ে কারা

খুলে দিল পুবদিকের রাজঘাটের দরজা, আইনকানুনের বাঁধ ভেঙে মীরাট ফৌজ ঢুকে পড়লো শহরের মধ্যে। এক মুহূর্তে নিত্য-অভ্যস্ত জীবনযাত্রার রঙ্গমঞ্চের উপরে নেমে পড়লো লেলিহান শিখার পর্দা।

শহরের বাসিন্দাদের অধিকাংশই জানতো না, দু' দণ্ড পরে কি হতে চলেছে, দু' দণ্ড পরে কি ঘটবে তাদের ভাগ্যে। চমনলাল ডাক্তার ডিস্পেন্সারীতে রুগী দেখছিল, প্রোফেসার রামচন্দ্র কলেজে পড়াচ্ছিল—গরমকালে মর্নিং কলেজ, ঝাঝ্‌ঝোর নবাবের এজেন্ট কাশীপ্রসাদ পাল্কীযোগে কাছারিতে চলেছিল, মুন্সী মোহনলাল ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে বসে কলকাতা থেকে সদ্যাগত খবরের কাগজ পড়ছিল, মুন্সী জীবনলাল ক্যাপটেন ডগলাসের কাছে যাচ্ছিল, আর পাহাড়-গঞ্জের দারোগা মইনুদ্দিন হাসান থানায় গিয়ে খাতাপত্র খুলে কেবলই বসেছিল। যে যার অভ্যস্ত কাজের নিরিখ ধরে চলেছে। অরাজকতার প্রথম তরঙ্গেই নিহত হ'ল চমনলাল ডাক্তার। ডগলাস, ফ্রেজার, হাচিনসন লাহোর দরবাজার কাছে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালো, মেটকাফ কোনক্রমে পালিয়ে রক্ষা পেলো। পাদ্রী জেনিংস স্ত্রী ও কন্যাসহ মারা পড়লো, সেই সঙ্গে বুঝি মারা পড়লো গুরগাঁওয়ের কলেক্টার ক্লিফোর্ডের ভগ্নী মিস ক্লিফোর্ড। তারপরে মীরাটী ফৌজ বাঁধ-ভাঙা স্রোতে ঢুকে পড়লো লালকেল্লার মধ্যে। বাদশার কাছে দরবার করবে।

মীরাটী ফৌজের ইঙ্গিতে ও দৃষ্টান্তে শহরের সিপাহীরাও ক্ষেপে উঠলো, সেই সঙ্গে ক্ষেপে উঠলো শহরের অগুনতি বেকার গুণ্ডার দল। টলমল ক'রে উঠল শাহ্‌জাহানাবাদ। প্রত্যেক বড় শহর হাতীর সওয়ার। যতক্ষণ জন্তটা শান্তশিষ্ট থাকে ততক্ষণ তার উপযোগিতার তুলনা নেই, কিন্তু একবার ক্ষেপে উঠলে এক মুহূর্ত আগেকার মালিক কি অসহায়, কি সদ্যঃপাতী।

দেখতে দেখতে দিল্লি ব্যাঙ্ক লুণ্ঠিত হ'ল। কোম্পানীর ছাপাখানায় গুণ্ডারা ঢুকে পড়ে সব ভেঙে-চুরে তছনছ ক'রে দিল। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার স্বরূপরাম বাধা দিতে এসে মার খেয়ে পালাতে বাধ্য হ'ল। তারপরে সবাই চলল দরিয়াগঞ্জের দিকে—সেখানেই সাহেবদের বাস।

ওদিকে এক দল গিয়ে আক্রমণ করলো ম্যাগাজিন বা অস্ত্রাগার। প্রভূত কামান, বন্দুক ও বারুদ মজুত ছিল এখানে। দেশী সিপাহীরা পালিয়েছে, কিংবা তারাই এখন আক্রমণকারী। পাহারায় রইলো নয়জন মাত্র গোরা সৈন্য। যতক্ষণ সম্ভব তারা বাধা দিল। তারপরে যখন অসম্ভব হয়ে উঠলো, আগুন ধরিয়ে দিলো বারুদে। তিনজন পুড়ে মরলো, ছয়জন পালালো পাহাড়ের দিকে।

দিল্লীর টেলিগ্রাফ অফিসের ভার ছিল দুজন যুবক ইংরেজের উপরে। যতক্ষণ সম্ভব তারে খবর পাঠালো তারা। অবশেষে কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠলো। তখন শেষ সংবাদ পাঠালো আম্বালা, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশবারে।

"The sepoys have come in from Meerut and are burning everything—Mr. Todd, is dead, and we hear several Europeans ; We must shut up."

পাঞ্জাবে যথাকালে এই তারবার্তা পৌঁছবার ফলেই খুব সম্ভব সেবারের মতো কোম্পানীর রাজত্ব রক্ষা পেয়ে গেল। কত ক্ষীণ সূত্রে কত বড় বড় রাজ্য-সাম্রাজ্য দোদুল্যমান থাকে।

শাহ্জাহানাবাদের পশ্চিমে যে অনতি-উন্নত পাহাড় আছে, তার উপরে ফ্লাগস্টাফ টাওয়ার একটি সুদৃঢ় ইমারত। যে-সব ইংরেজ পালাতে সক্ষম হ'ল তারা এসে মিলিত হ'ল এখানে। সারাদিন অপেক্ষা করলো গোরা সৈন্য আসবে ভরসায়, তারপরে রাত্রির অন্ধকারে তারা রওনা হয়ে গেলো মীরাটের দিকে। কতক পৌঁছলো, কতক পথে মারা পড়লো। শহর শাহ্জাহানাবাদ এখন ইংরেজহীন। যারা আছে হয় মৃত, নয় বন্দী।

॥ ৪ ॥

বাদশা ও বুলবুল

মীরাটের ফৌজ শহরে এক দফা লুটতরাজ ও খুনজখম ক'রে যখন লাল-কেল্লায় ঢুকলো তখন অনেকক্ষণ দুপুর বারো ঘড়ি বেজে গিয়েছে। ঘোড়সওয়ার ঘোড়ায়, পদাতিক পায়ে, হাতে, বন্দুক, পিঠে সামান্য কিছু জিনিসপত্র, বিভিন্ন রেজিমেন্টের পোশাক গায়ে বন্যার নানারকম গাছপালাবাহী স্রোতের মতো ঢুকে পড়লো কৌজ লাহোর দরজা দিয়ে। পাহারাওয়ালারা বাধা দিলো না, বরঞ্চ তারাও সেই স্রোতের অঙ্গীভূত হয়ে চলল সঙ্গে। লোহার দরজা ও দীঘির চত্বরের মধ্যে বাজার, গোলমাল শুনে আগেই তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনেকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে দোকানের দরজায় গুঁতো মারলো, যদি খোলা থাকে। বাজারের পরেই বড় একটা চত্বরের মধ্যে পিপল গাছের ছায়ায় মস্ত দীঘি। তারপরেই নৌবৎখানা। সেখানে এসে কেউ নামলো না ঘোড়া থেকে।

সঙ্গে যে-সব দিল্লিওয়ালা আসছিল, অবাক হয়ে গেল। কি রকম বেয়াদপ লোক এরা! যেখানে এসে হিন্দুস্তানের সব রাজা, মহারাজা, আমীরওমরা, মায় কোম্পানীর এজেন্ট পর্যন্ত ঘোড়া থেকে সসম্ভ্রমে নামে, কুর্নিশ করতে করতে এগোয়—সেখানে ঘোড়া থেকে নামলো না, সোজা এগিয়ে চলল, কি রকম গোঁয়ার লোক এরা! ভাবলো, জামানা বদল গিয়া। সামনে দেওয়ানী আম, সেখানে কেউ ছিল না। সে বাড়িটাকে ডানে রেখে আরো এগিয়ে চলল, শাঁবন বাগ বাঁয়ে পড়লো, তারা এসে হাজির হ'ল দেওয়ানী খাসের সম্মুখে। চীৎকার উঠল—বাদশা, ফৌজ হাজির হ্যায়। কিন্তু কোথায় বাদশা! অনেকক্ষণ ধরে শোরগোল চললে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো হাকিম আসাদুল্লা। ফৌজের কেউ বাদশাকে চোখে দেখে নি, তাই অনেকে বলে উঠল, বাদশা সেলাম।

আসাদুল্লা দুই হাতে কর্ণ স্পর্শ ক'রে জিভ কেটে বলল, আমি বাদশার গোলাম, শাহেনশার হাকিম।

বাদশা কোথায়?

বাদশার তবিয়ত ভালো নেই।

কেউ বলল, তবে তুমি কি রকম হাকিম?

কেউ বলল, আর আমাদেরই বা তবিয়ত এমন কি ভালো! কাল সারাদিন লড়াই ক'রে, সারারাত কুচ ক'রে এসে পৌঁচেছি। এখানেও কেল্লার বাইরে এক দফা লড়াই হয়ে গিয়েছে। বাদশার দেখা চাই।

কেউ বলল, বাদশার জন্যে আমরা জান কবুল করেছি, এখন দেখা না পেলে চলবে কি ক'রে? হুকুম তো চাই।

আসাদুল্লা বলে, তোমরা তো হুকুমের অপেক্ষা রাখো নি, তবে এখন আবার কেন?

কাফের খুন করবো, শয়তানের রাজগী খতম করবো, তাতে আবার হুকুম কি?

হুকুম না চাও তবে এখানে কেন?

বাদশাকে দেখলে মনে জোর পাওয়া যায়।

আরে, বাদশা যে নিজেই কমজোরী! বললাম যে, তবিয়ত ভালো নেই।

ঘুরে-ফিরে তর্কটা আবার পুরাতন বিন্দুতে এসে উপস্থিত হয়, মীমাংসার দিকে এগোয় না।

এমন সময়ে দেখা দেয় শাহ্‌জাদার দল,—মীর্জা মুঘল, মীর্জা খিজির সুলতান,

মীর্জা আবুবকর। ফৌজ হয়তো এদের কাউকে বাদশা মনে করতো কিন্তু একসঙ্গে তিনজনে তো আর বাদশা হ'তে পারে না। তাই পুনরায় চীৎকার ক'রে উঠল, বাদশা কোথায় ?

মীর্জা মুঘলের বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, ঘাড়ে-গর্দানে জোয়ান ব্যক্তি, বুদ্ধি ও কর্মশক্তিতেও ন্যূন নয়। সে বুঝলো, ফৌজের মেজাজ যেমন, বাদশা দেখা না দিলে সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দেবে। সে এগিয়ে এসে বলল, বাদশাকে নিয়ে আসছি, শান্ত হও।

সে ভিতরে চলে যায়, আর কিছুক্ষণ পরে বাহাদুর শা পিছু পিছু ফিরে আসে। জমানা বদল গিয়া—হিন্দুস্তানের বাদশা আসছেন, তুরী-ভেরী বাজে না, নকিব ফুকারে না। ধীরে ধীরে প্রবেশ করেন নিঃসঙ্গ, ধৃতযষ্টি, বয়স ও দুঃসময়ের ভারে নতপৃষ্ঠ বাহাদুর শা, আলমগীরের উপচ্ছায়া।

বাদশার বাস্তব মূর্তি দর্শনে ফৌজ এমন বিস্মিত হয় যে, অভিবাদন করতে ভুলে যায়। তারপরে বেশ কিছুক্ষণ পরে সকলে গর্জন ক'রে ওঠে, 'বাদশাহ জিন্দাবাদ!' বাদশা দেখেন, ফৌজ ঘোড়াসুদ্ধ হাজির, পায়ে জুতো, হাতে বন্দুক। দেখেন, না নেমেছে ঘোড়া থেকে, না খুলেছে পায়ের জুতো, না করলো আদবমাফিক কুর্নিশ, না রাখলো কিছু নজরানা। এর চেয়ে যে কোম্পানীর এজেন্ট অনেক ভদ্র। ভাবেন, এরা কোন্ গাঁও থেকে এলো! ভাবেন, এরা হুকুম চায়, না হুকুম করছে? ভয় পান; এরা বাদশার ফৌজ, না বাদশার মনিব?

ফৌজও কম বিস্মিত হয় না। এ কি রকম বাদশা! এঃ কম তিনকালগত বুড়্চাকে দিয়ে কী কাজ হবে! নাঃ, একে দিয়ে তো লড়াই চলবে না। তাদের বড় দোষ দেওয়া যায় না। এ পর্যন্ত বাদশাদের যত তসবির তারা দেখেছে, যত গল্প শুনেছে, সব জঙ্গী আদমির! আকবর শা নীল গাই শিকার করছেন, জাহাঙ্গীর হাতীতে চড়ে লড়াই করছেন, আলমগীর হাতীর সঙ্গে লড়াই করছেন। তাদেরই কি বংশধর এই বুড়্চা, বাতাসের ঠেলায় যে ঘুরে পড়ে! তবে কি তারা ভুল করলো? এর চেয়ে কানপুরে গিয়ে নানা মহারাজের ফৌজে ভর্তি হ'লে কি ভালো হ'ত না?

তোমরা কি চাও বাদশাকে বলো—বলে মীর্জা মুঘল।

ফৌজ একসঙ্গে চীৎকার ক'রে ওঠে, আমরা বাদশার হয়ে লড়াই করতে চাই, ঘুচিয়ে দিতে চাই কোম্পানীর শয়তানি, বসাতে চাই বাদশাকে হিন্দুস্তানের গদিতে।

এবারে বাদশা কথা বলেন, আমি ফকির মানুষ, গদিতে আমার কি দরকার। তা ছাড়া ফৌজ রাখবার মতো আমার টাকা নেই।

জোর যার মুলুক তার। কোম্পানী কত টাকা নিয়ে এসেছিল বিলায়েত থেকে?

কোম্পানীর আমাকে বেশ সুখে রেখেছে, আমি তার সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবো কেন?

ফিরিঙ্গি কাফের।

হিন্দুস্তানের বাদশার রাজত্বে মুসলমান, হিন্দু, কাফের সকলেরই ঠাঁই আছে।

ফিরিঙ্গি বিদেশী আদমি।

দেশী আদমি মারহাট্টাদের চেয়ে তারা সুখে রেখেছে আমাকে।

দেশের সুখ-সুবিধা তো দেখতে হবে!

দেখতেই পাচ্ছ, আমি বুঢ্ঢা হয়েছি, কমজোরী হয়েছি, আমার সে শক্তি নেই।

তবে শাহ্‌জাদাদের মধ্যে থেকে জওয়ান দেখে একজনকে বসাবো গদিতে, আর তাঁর হুকুমে লড়াই শুরু করবো।

মীর্জা মুঘল দেখলো, বাড়াবাড়ি হচ্ছে। বলল, তোমরা যদি এভাবে বেয়াদবের মতো বাদশার সঙ্গে কথা বলো তবে জেনো, আমরা কেউ নেই তোমাদের সঙ্গে। বাদশাকে নিয়ে আমরা চলে যাবো পুরানা দিল্লিতে। তারপরে তোমরা যা পারো ক'রো।

কড়া কথায় ফৌজ নরম হ'ল। তাদের মধ্যে প্রবীণরা বুঝলো, খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছে। তখন নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ ধরে শলাপরামর্শ করলো। অবশেষে কারো পকেট থেকে একখানা জীর্ণ রুমাল উদ্ধার ক'রে নিয়ে টাকা-সিকি-পয়সায় মিলিয়ে পাঁচ-ছয় টাকা সংগ্রহ ক'রে নজরানা রাখলো বাদশার পায়ের কাছে। শাহ্‌জাদার দল বুঝলো, এর চেয়ে কিছু না দেওয়াও ভালো ছিল। দীন নজরানায় দাতার চেয়ে গ্রহীতার দীনতা বেশী প্রকাশ পায়।

নজরানা দেখে বাদশার ধৈর্য ভেঙে পড়বার মতো হ'ল; ধারণা হ'ল, তাঁর দীন অবস্থাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে অপমান করা হচ্ছে। মুখে তিনি কিছু বললেন না বটে, তবে মুখের মাংসপেশী আর রেখাগুলো কঠিন হয়ে উঠল। হঠাৎ যেন তাঁর মুখের উপরে বাদশা আলমগীরের ক্রুদ্ধ ভ্রুকুটি

মুখের ছায়া এসে পড়লো। নিঃস্ব ধনীর কাছে দারিদ্র্যের উল্লেখ সেরা অপমান। তিনি নজরানার দিকে ফিরেও চাইলেন না, উদাসভাবে তাকিয়ে রইলেন চাদনী বাগের দিকে। ওদিকে ফৌজ বুঝলো, তাদের নজরানাকে অগ্রাহ্য ক'রে তাদের চরম অপমান করা হ'ল। তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠল হিংস্র বিকার। এইটিই বাদশা বনাম ফৌজের নাটকীয় সঙ্কটমুহূর্ত। আসাদুল্লা ও শাহ্‌জাদারা শঙ্কিত হয়ে উঠল, যে-কোন কাণ্ড ঘটতে পারে। হয়তো মীরাটের ঘটনার পুনরাভিনয়, নয়তো গোলাম কাদের বা সৈয়দদের নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি। লালকেল্লা মানুষের অনেক অমানুষিকতার সাক্ষী। কি হয় কি হয় দুশ্চিন্তায় আকাশ যখন ভারাক্রান্ত—তখন এক কাণ্ড ঘটলো। বুলবুলিটা উড়ে টুক ক'রে এসে বসলো বাদশার কাঁধের উপরে। তিনি মুখ ফিরিয়ে দেখলেন। অমনি এক মুহূর্তে আলমগীরের মুখোশ খসে গিয়ে জাহাঙ্গীরের মুখের কোমলতা ফুটে উঠল। হাত বাড়িয়ে দিতেই পাখীটা এসে বসলো হাতের উপরে। বসে চঞ্চুপুট ফাঁক ক'রে ইশারায় জানালো, খাদ্য পাওয়ার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। যায় বৈকি! অন্য দিন এর অনেক আগেই সুখাসীন বাদশার কোলের উপরে বসতো আর বরাদ্দ খাদ্যের গুটি গলাধঃকরণ করতো। যথাসময়ে খাদ্য না পেয়ে, যথাস্থানে বাদশাকে না দেখে এদিকে ওদিকে অনুসন্ধান ক'রে তাঁকে আবিষ্কার করেছে দেওয়ানী খাসে। পাখীর চোখে পড়ল না জনতা; বাদশার চোখ থেকেও অন্তর্হিত হ'ল জনতা; রইলো শুধু বাদশা আর বুলবুল।

মেরে বাচ্চা, মেরে বাচ্চা—বলে বাদশা পাখীর পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন। পাখীও চোখ বুজে সুখস্পর্শ অনুভব করতে লাগলো।

ফৌজ অবাক হয়ে গেল বাদশার কাণ্ড দেখে। অবশেষে একটা চিড়িয়া, তাও কিনা এক রত্তি একটা বুলবুল, বাদশাকে কর্তব্য ভুলিয়ে দিল! বিসমিল্লা! শাহ্‌জাদাদের বিস্মিত হওয়ার কথা নয়, বুলবুল প্রসঙ্গে বাদশার ব্যবহার সম্পর্কে তারা অবহিত কিন্তু এমন সঙ্কটমুহূর্তে যে এমন কাণ্ড ঘটতে পারে তা ভাবে নি। বাদশার ভবিষ্যৎ, তৈমুর বংশের পরিণাম যখন প্রচণ্ড বাদানুবাদের তরঙ্গচূড়া থেকে চূড়ান্তরে অসহায়ভাবে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে তখন ঐ পাখীটাকে দেখে বাস্তববিস্মৃত হয়ে যাবেন বাদশা—এ যেন বাড়াবাড়ি। তৈমুর বংশের অনেকে নারীর মোহে জীবন ও সিংহাসন বিসর্জন দিয়েছে এমন অনেক ঘটনা মনে পড়লো তাদের। জাহাঙ্গীর না হয় নূরজাহাদের মোহপাশে বন্দী। সে ছিল স্বতন্ত্র। কিন্তু মুরাদ আর জাহান্দার সামান্য ছুটো বাঁদীর মোহে মুগ্ধ না

হ'লে হয়তো প্রাণ বাঁচাতে পারতো। সে-ও না হয় সহ্য হয়, বাঁদী হ'লেও মানুষ। এ যে একটা তুচ্ছ চিড়িয়া! গেল, গেল, সব গেল, আমীর তৈমুরের বংশ লোপ পেতে চলল দিল্লির সিংহাসন থেকে।

বাদশা পাখীটাকে নিয়ে এক খণ্ড স্বপ্নের মতো ধীরে ধীরে চলে যান খোওয়াবগার দিকে। এতক্ষণ ফৌজ রুদ্ধনিঃশ্বাস হয়ে বিস্ময়ের তল খুঁজছিল, বাদশাকে অন্তর্হিত হ'তে দেখে, সেই সঙ্গে নিজেদের আশাভরসাকেও, প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়লো, বিসমিল্লা! এক চিড়িয়াকে ওয়াস্তে বাদশাহী দিয়া। কেউ বলল, বাদশা আস্তীন কা সাপ, বিশ্বাসঘাতক। কেউ বলল, তখনি বলেছিলাম, দিল্লি যাওয়া মানে উল্টী গঙ্গা বহানা, উল্টো রকমের কাজ। কেউ বলল, আমরা সির সে কফন বান্ধ কর, মরবার জন্য তৈয়ার হয়ে এসেছি, আর বাদশা কিনা একটা বুলবুলের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন! বেগম হ'লে না হয় বুঝতাম, নিদেনপক্ষে একটা বাঁদী।

অনেকে বলল, এখানে কাজ হবে না। চলো, কানপুর গিয়ে নানা মহারাজের কাছে হাজির হই। দেখা গেল যে, অনেকেরই সেই মত। শাহ্‌জাদারা দেখলো, সব পণ্ড হয়। এই মওকায় বাদশাহের প্রতাপ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার স্বপ্ন দেখছিল তারা। তারা ভাবলো, এখন এরা গিয়ে যদি নানা সাহেবের সঙ্গে যোগ দেয় তবে দিল্লির বাদশাহীকে ছাপিয়ে আবার হয়তো মারাঠা-রাজ কায়েম হবে হিন্দুস্তানে। শেষ চেষ্টা করা যাক ভেবে মীর্জা মুঘল কয়েকজন প্রধানকে ডেকে নিয়ে অন্তরালে গেল। তারা সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, তোমরা থাকো, আমরা আসছি। বাদশাকে তো দেখলাম, দেখি এবার শাহ্‌জাদারা কি বলেন।

ফৌজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; বুঝলো, আজ রাত এখানেই থাকতে হবে। আর থাকবেই বা কোথায়? দেওয়ানী খাসের মেঝের উপরে যার যার ছেঁড়া চট-কাঁথা প্রভৃতি বিছিয়ে নিল। হায়াত বক্স বাগের, চাঁদনী বাগের গাছের গুঁড়িতে ঘোড়া বাঁধলো; সযত্নে লালিত ফুলগাছের ডাল ভেঙে দাঁতন-কাঠি সংগ্রহ করলো; শাবন বাগ, ভাদো বাগের মধ্যে উনুন পেতে রান্না চড়িয়ে দিয়ে, শ্বেতপাথরে বাঁধানো যে নহরের জলে হাঁস সারস ছাড়া আর কেউ নামতে পারতো না, সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুব ক'রে সাঁতার কাটতে লাগলো। সকলেরই মনে এক চিন্তা—দেখি কুলিজ খাঁ, শেখ বারু কি খবর নিয়ে আসে। যদি নিতান্তই কানপুর রওনা হ'তে হয়, তবু আজ রাতটা বিশ্রাম না ক'রে নড়ছে না। কালকের রাত গিয়েছে পথে, আজকার রাত লালকেল্লায়। দেখা যাক, আগামী রাত

আবার কোথায় কাটে। একজন বলল, সিপাহীর আবার ভাবাভাবি কি যেখানে রাত, সেখানে কাত।

॥ ৫ ॥

বাঘের পিঠে সওয়ার

মুখুজ্জে মশায় হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, কিছুতেই ওদের থামাতে পারছেন না। গোড়াতে বসে থেকে শুধু মুখের কথায় শান্ত করবার চেষ্টা করছিলেন, তখন ওরাও বসে ছিল। কিন্তু তারপরে ওরা যখন আস্তিন গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালো আর মুখের কথার সঙ্গে হাতের ভঙ্গী জুড়ে দিয়ে পরস্পরকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করতে শুরু করলো, তখন অগত্যা মুখুজ্জে মশায়কেও উঠে দাঁড়াতে হ'ল। তবু তিনি ছাড়েন নি হুঁকোটা। বাঁ হাতে মাটির গুড়গুড়ি, মাঝে মাঝে টান দিয়ে আগুনটা জীইয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন। যদিচ আগুন অনেকক্ষণ নিবে গিয়েছে—তবু হুঁশ নেই, তাতেই বুঝতে পারা যায় তাঁর মনের উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা। আর ডান হাতে একবার এর হাত ধরছেন, থামো বাবা। আর একবার ওর হাত ধরছেন, থামো বাবা।

একবার এইভাবে একজনের হাত ধরতে গিয়ে চমকে উঠে ব্যথিতভাবে বললেন, আহা লাগলো বুঝি?

স্বরূপরামের মুখে ক্লেশের রেখা ফুটে উঠলেও বলল, না, এমন কিছু লাগে নি।

তা বাবা, তুমি বাধা দিতে চেষ্টা না ক'রলেই ভালো হ'ত, যে গোঁয়ার ওরা!

স্বরূপরাম বলে, না, বাধা দেবো না! ফুল দিয়ে পুজো করবো!

রাগ করো কেন বাবা? ফুল দিয়ে পুজো করতে কে বলেছে? সবাই যা করেছে, তুমিও তাই করলে পারতে। পালালেই হ'ত।

সবাই যারা পালিয়েছে তারা যেন প্রাণে বেঁচেছে!

মুখুজ্জে মশাই শিউরে উঠে বললেন, যা বলেছ। এইটুকু পথ আসতে চার-পাঁচটা মৃতদেহ দেখলাম। চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে, এখনো পড়ে আছে।

তারপরে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, সরাবে কবে?

স্বরূপরাম বলে উঠল, জিজ্ঞাসা করুন নয়নচাঁদকে, এখন ওরাই তো শহরের কর্তা।

নয়নচাঁদ প্রত্যুত্তরে বলল, ছাখো স্বরূপ, যা বয় সয় তাই বলো। তুমি আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণে এসেছ, বেশী বলতে চাইনে।

কমটাই বা কি বলেছ? আমি বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতে সম্বোধন ক'রে উঠলে, এতগুলো লোকের সম্মুখে, এই যে চিড়েতনের গোলাম, এসো এসো। তোমার চিড়িয়া বাবারা গেল কোথায়? তোমার ডগলাস, ফ্রেজার, হাচিনসন, মেটকাফ বাবারা কোথায়?

নয়নচাঁদ বলে, তুমিও তো ছাড়ো নি। তুমি বললে, এবারে বুঝি সেপাইদের সভা বসিয়ে বোনকে স্বয়ংবরা করবে?

অনেকক্ষণ আগেকার উক্তির পুনরুক্তিতে আবার ক্ষেপে ওঠে দুইজন, আর হাতে আক্রমণের ভঙ্গী করে।

নয়নচাঁদ বলে, দেবো তোমার বাকি হাতখানা ভেঙে।

তা দেবে বৈকি। সেপাই ভগ্নীপতিদের বাকি কাজটুকু শ্যালকে করবে, এই তো স্বাভাবিক।

মুখ সামলে স্বরূপ। বারে বারে আমার বোন তুলে কথা ব'লো না।

ইস, খুব যে দরদ! বোনের জন্য দয়ামায়া থাকলে এতদিন তাকে আইবুড়ো ক'রে রাখতে না। মোটা দেখে দাঁও মারবার মতলবে আছ। মনে মনে কাকে আঁচ ক'রে রেখেছ? মীর্জা মুঘল, না খোদ বাদশা?

স্বরূপরামের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে খোঁচা-খাওয়া বাঘের মতো মরীয়া হয়ে উঠল নয়নচাঁদ, তবে রে হারামজাদা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

এবারে আসরে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তবে তোমরা ইতরামি করো, আমরা চললাম। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে আচ্ছা ফৈজতে পড়লাম যা হোক।

বৃদ্ধ রায়বাবু বললেন, এ যে দেখছি উভয় সঙ্কট! বাইরে বের হ'লে সিপাইরা তেড়ে আসে—মার ডালো শালা নঙ্গাশির বাঙ্গালীকো। আবার ঘরের মধ্যেও এই বালী-সুগ্রীবের পালা। এখন যাই কোথায় হা!—বলে এদিক ওদিক তাকিয়ে শুধোলেন, তা পণ্ডিতজী গেলেন কোথায়?

তিনি ব্যাপার দেখে অনেকক্ষণ অন্দরমহলের দিকে সরে পড়েছেন।

চমৎকার আতিথ্য! বলে ওঠেন রায়বাবু। যাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলাম তিনি পড়লেন সরে, আর তাঁর ছেলে আসরের মধ্যে পালোয়ানী শুরু করে দিল।

মুখুজ্জে মশায় সুখানন্দ পণ্ডিতের অনেক দিনের বন্ধু। তিনি বললেন,

সুখানন্দ আর কী করবে বলো? আজকালকার ছেলেরা কি আর বাপ-মায়ের কথা শোনে?

রায়বাবুর ছেলেটি একটি মুসলমান রমণীকে বিয়ে করেছিল, রায়বাবু ভাবলেন তাঁকেই খোঁচা মারা হ'ল। তাই বলে উঠলেন, মুখুজ্জে, আমি ভুশুণ্ডির কাক, দিল্লি শহরের কোন্ বাঙালীর কেচ্ছা না আমার জানা আছে! আমাকে বেশি ঘাঁটিয়ো না বাপু।

মুখুজ্জে বললেন, আমি তাই কাউকে উদ্দেশ ক'রে বলি নি।

নাঃ, তুমি অমনি নমঃ শিবায় বলে শূন্যে ফুল নিক্ষেপ করেছ, এখন থামো।

কিছুক্ষণের জন্য আসর নীরব হ'ল, খুব সম্ভব পক্ষগণের ক্লান্তিই তার কারণ। এমন সময়ে অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এলেন সুখানন্দ পণ্ডিত, নিমন্ত্রিতদের দিকে তাকিয়ে গলবস্ত্র হয়ে বললেন, অনেক অপরাধ হয়ে গিয়েছে, ক্ষমা করুন।

রায়বাবু ও মুখুজ্জে সমস্বরে বললেন, তোমার কি দোষ ভায়া, কাল থেকে যে হাঙ্গামা চলছে, কারো কি মাথার ঠিক আছে? নাও, বসো।—বলে সুখানন্দকে হাতে ধরে বসালেন। অন্যরা আগেই বসে পড়েছিল। মুখে যতই বলুক না কেন, অকালে নিমন্ত্রণ-সভা পরিত্যাগ করা বাঙালীর স্বভাব নয়।

বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় প্রত্যেক বছর সুখানন্দ পণ্ডিত সমারোহের সঙ্গে সত্যনারায়ণ পুজো ক'রে থাকেন। এ বছরেও নিয়মিত সময়ে সকলকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সকলকে মানে বাঙালী হিন্দুদের আর অবাঙালী হিন্দুদের মধ্যে যাদের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। এই উপলক্ষে পঞ্চাশ-ষাটজন লোক সমবেত হয়, কোন কোন বছরে শতাধিক লোক হয়ে থাকে। পাঁচ-সাত দিন আগে যখন নিমন্ত্রণ হয় বাঙালীরা বলেছিল, যেমন অন্যবারে বলে থাকে, নিশ্চয় যাবো; এ তো শুধু প্রসাদ পাওয়ায় উপলক্ষ নয়, বাঙালীদের মধ্যে মেলামেশার একটা সুযোগ। বলেছিল, দিল্লি শহরে এমন সুযোগ তো দুটি, কালীবাড়িতে কালীপুজো আর সুখানন্দ পণ্ডিতের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো। আকাশ ভেঙে পড়লেও যাবো।

আকাশ যে এমন অপ্রত্যাশিত নিদারুণভাবে ভেঙে পড়বে তখন কেউ ভাবে নি। এগারোই মে দিল্লি শহর ওলটপালট হয়ে গেল। বারোই মে সত্যনারায়ণ-পুজো। দরিয়াগঞ্জের বাঙালীপাড়ায় সামান্য কিছু হামলা হ'ল বটে তবে কেউ প্রাণে মরে নি। অনেকেই কালীবাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিল। তাদের ধারণা—সিপাহীদের মধ্যে যখন পুরবীয়া হিন্দু আছে, কালীবাড়িতে

ঢুকে অন্তত মারধোর করবে না। অনেকে পরিচিত হিন্দুস্থানী বা দিল্লি-ওয়ালাদের বাড়িতে আশ্রয় নিল। কেউ নিহত হয় নি বটে, তবে দু'চারজন আহত হয়েছিল। স্বরূপরাম কোম্পানীর প্রেসের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার, সে আহত হ'ল সিপাহীদের তাণ্ডবে বাধা দিতে গিয়ে, আর সকলে আহত হ'ল পালাতে গিয়ে। বারোই তারিখেও সমান তেজে লুটপাট চলল, তবে বেশির ভাগই কোম্পানীর সম্পত্তি আর আমীর-ওমরাদের বাড়ি।

নিমন্ত্রিতদের অধিকাংশই এলো না। যাদের বাড়ি দূরে তাদের ভয়—ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেলে বিপদ অনিবার্য। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। ফুলকিমণ্ডির কাছে যাদের বাড়ি তাদের মধ্যেই পাঁচ-সাতজন মাত্র এসেছে। আর এসেছিল স্বরূপরাম। তার বাড়ি যদিচ কাছে নয়, তবু সবাই জানতো সে আসবেই। তুলসীর প্রতি তার অনুরাগ অজানা ছিল না। ছেলে-ছোকরার দল ঠাট্টা ক'রে তাকে বলতে শুরু করেছিল, তুলসীবনের বাঘ। সুখানন্দ পুত্রকে বলেছিল, দেখিস নয়ন, নিমন্ত্রণের আসরে স্বরূপকে যেন অপমান করিসনে। অতিথি দেবতা।

নয়ন বলেছিল, তার উপরে আবার জামাতা দশমো গ্রহঃ।

সুখানন্দ বলে, তা মন্দ কি, ওর মতো জামাই যদি পাওয়া যায়।

না, মন্দ আর কি! তুলসীর সব জ্বালা জুড়োয়।

তারপরে একটু থেমে বলে, তার চেয়ে এক কাজ করো না, তুলসীর হাত-পা বেঁধে বাড়ির ইঁদারাটার মধ্যে ফেলে দাও না কেন! বাড়ির মেয়ে বাড়িতেই থাকবে আবার তোমার কন্যাদায়ও মিটবে।

এবারে বাপ যুক্তির ক্ষেত্রে নেমে এসে বলে, আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল তো স্বরূপের কি দোষ!

দোষ তো একটা নয়।

বেশ, ফর্দমাফিক শুনি না হয়!

ওর চালচুলো নেই।

চালও আছে, চুলোও আছে; নইলে থাকেই বা কোথায় আর খায়ই বা কি?

ও থাকাও নয়, খাওয়াও নয়। ভিখিরীও থাকে খায়, আমাদের সরাব ঝিএরাও থাকে খায়।

আচ্ছা, আর কী দোষ?

ওর কুলশীল জাতগোত্র কিছুই জানি না।

আমি জানি ওরা হুগলী জেলার চন্দনপুরের মিত্তির। বাংলা দেশে থাকলে ওদের ঘরে মেয়ে দেওয়াকে সৌভাগ্য মনে করতাম।

এই বলে বাপ থামে। ভাবটা—আর কি দোষ?

ও কোম্পানীর গোলাম।

সুখানন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বাবা নয়ন, এই হিন্দুস্থানে কোম্পানীর গোলাম কে নয় শুনি? সবাই গোলাম, নামে না হোক—কাজে।

ও নামে কাজে দুই-ই।

সে তো ভালই। স্পষ্ট ব্যবহার। এমনি ঢাকঢাক গুড়গুড় ক'রেই যে দেশটা গেল। এদিকে কোম্পানীর তন্খা না হ'লে পেট চলে না, ওদিকে বলতে হবে হিন্দুস্থানের বাদশা।

কথাটা বলে ফেলেই মনে হ'ল, বলা ঠিক হয় নি। তখন প্রসঙ্গ গুটিয়ে নেবার ইচ্ছায় বললো, বাড়িতে ওকে অপমান ক'রো না—এই আমার ইচ্ছা।

বেশ ভুলবো না। কিন্তু ও যদি অপমান ক'রে কথা বলে, তবে ছেড়ে কথা বলবো না।

এই বলে সে দ্রুত চলে যায় অন্দরমহলের দিকে। সামনেই পড়ে তুলসী।

চকমিলানো বাড়ি, নিচু ছাদ, পুরু দেয়াল, ছোট জানলা, চারদিকে মিলিয়ে এক ঘের বারান্দা, দিল্লির প্রচণ্ড রোদকে ঠেকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। রান্নাঘরের সম্মুখে বারান্দায় বসে ভুতি বুড়ী তরকারি কুটছিল, তুলসী পাশে বসে ছোট একখানি পাখা দিয়ে তাপ ও মাছি নিবারণ করছিল।

নয়নচাঁদ বলল, তুলসী, আজ সকাল বেলাতেই দেখছি তোর গরম লাগলো।

তুলসী পাখাখানা আরও দ্রুত সঞ্চালন ক'রে বলল, না লেগে উপায় কি? তুমি যে সকাল বেলাতেই গরম হয়ে উঠেছ।

তাতে তোর গরম লাগবে কেন?

জলন্ত উনুনের পাশে বসলে যে জন্যে গরম লাগে। তোমার মধ্যে গন্‌গন্ করছে আঙার, তাপে আমরা ঘেমে উঠছি।

কেন রাগি তা কি জানিস না?

জানি বৈকি—তোমার স্বভাব। এই তো ভুতি বুড়ী বলছিল, দাদাবাবু আজ সকাল বেলাতেই রেগে গিয়েছে।

বলেছে! দেখো বঁটি দিয়ে ওর নাক কেটে।

ওর লম্বা নাক, কাটলেও অনেকটা থাকবে।

তবে আবার কাটবো।

হ্যাঁ দাদাবাবু, যার নাক আগে তাকে একবার জিজ্ঞেস করবা না? বলল বুড়ী।

তার বাড়ি নাকি যশোর জেলায় ছিল। অদৃষ্টের হাতে ঘুরতে ঘুরতে অনেক কাল দিল্লিতে এসে পড়েছে, তবু তার কথায় যশুরে টান সম্পূর্ণ যায় নি। অনেক কাল থেকে বিপত্নীক সুখানন্দ পণ্ডিতের পরিবারভুক্ত, শৈশব থেকে মানুষ করেছে নয়নচাঁদ আর তুলসীকে। দাসী ও গৃহকর্ত্রীর মাঝখানে যে অনির্দিষ্ট অন্তরীক্ষ, ভূতি বুড়ী সেই রাজ্যের অধিশ্বরী।

ব্যঙ্গের সুরে নয়ন বলে, জিজ্ঞেসা করবা না? এতকাল দিল্লিতে থেকেও যশুরে টান গেল না বুড়ীর।

যশুরে টান কি বেঁচি থাকতি যাবে, ও যে আমার শ্বশুরবাড়ির দেশ!

যাবে যেদিন তোর নাক কাটবো।

আমার নাকটার উপর তোমার এতো রাগ কেন দাদাবাবু? মনে নাই তোমার যখন দাঁত ওঠে নি—আমার নাকটা মুখের মধ্যি পুরি দিয়ে কামড়াতে!

তখন বুদ্ধি হ'লে কামড়ে ছোট ক'রে দিতাম। যাক, যখন কাটবো তোর হুকুম নিয়ে কাটবো না।

তুমি আবার কারো হুকুমের তোয়াক্কা করো নাকি?

করিই তো না!

এবারে তুলসী বলে, এই তো বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এলে—বললে, স্বরূপ-দাদা এলে তার ঠ্যাঙ ভেঙে দেবে!

শুনেছিস?

না শুনে উপায় কি। গলায় যে তোমার ঢাক বাজছে।

হ্যাঁ, ঢাক বাজিয়েই বলছি, বাবা যদি ঐ বাউণ্ডুলেটার সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চায় তবে তার ঠ্যাঙ ভেঙে দেবো।

তুলসী মুখ টিপে হেসে বলল, কেন খোঁড়া লোকের কি বিয়ে হয় না? ঐ যে কাহাইরা আমাদের জল তুলে দেয়, ওর যেমন এক ঠ্যাঙ নেই তেমনি ঘরে তিন তিনটে জরু।

তবে তোর নাক কেটে দেবো।

চমৎকার! লোকে তোমাকে দেখিয়ে বলবে—নাককাটি তুলসীর দাদা!

খুব যে কথা শিখেছিস!

এখন খুব দুঃখ হচ্ছে যে, তোমার মতো লাঠি চালাতে শিখি নি।

তারপরে একটু থেমে বলে, তা সত্যনারায়ণ পুজোর দিনেই কি বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধটা হয়ে যাবে নাকি? আগে জানতে পারলে পাড়াপড়শীকে খবর দিয়ে রাখবো, অনেক দিন লড়াই দেখে নি।

কথায় কোনকালেই পেরে ওঠে না নয়ন ঐ তুলসীর সঙ্গে। মেয়েটা কিছুতেই রাগে না। তাতেই বিব্রত বোধ করে, অবশেষে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয় নয়ন। আজ দেখলো যে, পরিহাসের লঘু কৌমুদীতে কাজ হবে না, তাই গাম্ভীর্যের মহাভাষ্য শুরু করে দিল। বলল, তুলসী এখন ঠাট্টা থাকুক।

বলো কি দাদা, নাক কাটা, ঠ্যাঙ ভাঙার কথা কি ঠাট্টা হ'ল! অন্তত যার নাক, যার ঠ্যাঙ তার পক্ষে কিছুতেই তো নয়ই।

শোন্, ঐ স্বরূপের সঙ্গে কিছুতেই তোর বিয়ে হবে না।

কে বলছে হবে?

আমি ভালো বর জুটিয়ে আনবো।

সেই ভরসাতেই আছি যে, দিল্লিওলা বা পুরবীয়া পালোয়ান জুটিয়ে আনবে। ভগ্নীপতি ও দারোয়ান দুই কাজই চলবে।

তারপরে বলে, ভাখো দাদা, তোমাদের নিয়ে বেশ আছি, বিয়ের কথা মনেই হয় না। কিন্তু তুমিই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথাটা মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছ।

এই কড়া অভিযোগের উত্তর সম্ভব নয়, তাই আবার প্রসঙ্গ বদলে বলে, জানিস, মা থাকলে এতদিন কবে তোর বিয়ে হয়ে যেতো।

খুব ভালো হ'ত দাদা—নাক কাটা, ঠ্যাঙ ভাঙার দায় থেকে তুমিও অব্যাহতি পেতে।

নয়ন কোণঠাসা হয়েছে, এখন তার মুক্তির একমাত্র পথ পলায়ন। তাই হঠাৎ অনির্দিষ্ট ব্যক্তির উপরে অনিশ্চিত কারণে রেগে উঠল, কাউকে আর বুঝতে বাকি নেই,—সকলেই একজাট্টা। দেখে নেবো, দেখে নেবো—বলতে বলতে দ্রুত প্রস্থান করে।

তুলসী ডাক দিয়ে বলে, দাদা আর যাই করো, সত্যনারায়ণ পুজোর দিনটায় দেখে নিয়ো না—অনেক লোক আসবে, মারামারি ক'রে বাবার মুখ হাসিয়ো না।

নয়ন চলে গেলে ভুতি বুড়ী বলে, দাদাবাবুর মনটা ভালো, মেজাজটা খারাপ।

অনেকটা যেন নিজের মনেই বলে উঠল তুলসী, সংসারে মনের খবর আর

কয়জনে রাখে। বেজ্যাজ দিয়েই বিদায় করে সকলে।

শৈশবে মাতৃহীন হওয়ার পর থেকেই তুলসী নিঃসঙ্গ। নয়ন মাত্র দু'-তিন বছরের বড় হ'লেও সে মিশতো না তুলসীর সঙ্গে। বাপ আর ভূতি বুড়ী বয়সে এত বড় যে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা সম্ভব নয়। তাই সে প্রায় জন্মনিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতায় মানুষের মন আর জনসমষ্টির উপর ঘর্ষণে তার চরিত্র পরিণত হয়ে ওঠে।

নিমন্ত্রণের আসরে স্বরূপ প্রবেশ করতেই মুখুজ্জে মশায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার হাতে আবার কি হ'ল হে?

ঠিক কোন্ উত্তরটি দেবে ভাবছে, এমন সময়ে চোখে পড়লো নয়নকে। বলে উঠল, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না।

নয়ন অবশ্যই বুঝতে পেরেছিল। সেইজন্যেই অধিকতর রূঢ়ভাবে বলল, তুমি কি বলতে চাও যে, তোমার হাতখানা ভেঙেছি আমি?

তুমি নিজ হাতে ভাঙো নি বটে, তবে ভেঙেছে তোমার সেপাই বেরাদাররা।

গর্জে ওঠে নয়ন, আমার সেপাই বেরাদার?

মুখুজ্জে মশায় বলেন, এ তোমার অন্যায় হ'ল স্বরূপ।

আজ্ঞে, কিছু অন্যায় নয়। শহরের সব দরজা বন্ধ ছিল, তবে সিপাহীরা ঢুকলো কোথা দিয়ে?

মুখুজ্জে বলেন, এখন তো শুনতে পাচ্ছি, রাজঘাটের দরজা দিয়ে।

ভুল শোনেন নি। সেই রাজঘাটের দরজা যারা খুলে দিয়েছে, তারা কি শহরে লুটপাট, খুন-জখমের জন্যে দায়ী নয়?

কিছু না বুঝতে পেরে একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে তাকান মুখুজ্জে এবং আর সকলে।

ধরা পড়তে আর দেরি নেই দেখে নয়ন সদম্ভে বলে ওঠে, বেশ করেছি দরজা খুলে দিয়েছি। লুঠপাট, খুন-জখম কোন কাজটাই খারাপ হয় নি।

মুখুজ্জে মশায়, রায়বাবু প্রভৃতি বজ্রসন্তানগণ সমস্বরে বলে ওঠেন—নয়ন, থামো, থামো। এসব যে রাজদ্রোহের কথা।

কাকাবাবু, রাজা এখন বদলে গিয়েছে, তাই আর রাজদ্রোহ নয়, বরঞ্চ উল্টো হ'লেই রাজদ্রোহ হ'ত।

একজন বলে, তুমি কি বলতে চাও যে, কোম্পানীরাজ খতম হয়ে গিয়েছে?

নয়ন সগর্বে বলে, বিলকুল খতম, ফতে হয়ে গিয়েছে লড়াই।

স্বরূপ বলে, লড়াই ফতে হওয়া দূরে থাক, লড়াই আরম্ভই হয় নি।

কিছুই খবর রাখো না স্বরূপ, কেবল গোলামী করতেই শিখেছ। মীরাট, কানপুর, লখনৌ, ঝাঁসি, এলাহাবাদ, পাটনা সব ছুটে গিয়েছে কোম্পানীর হাত থেকে।

স্বরূপ বলে, যতক্ষণ না কলকাতা আর পাঞ্জাব ছুটছে, ততক্ষণ কিছু ছুটে যায় নি—ধরে রাখো।

নয়নের বিশ্লেষণে এতগুলি বঙ্গসন্তান অতলে তলিয়ে গিয়েছিল, এবারে স্বরূপের ব্যাখ্যায় অপ্রত্যাশিতভাবে পায়ের তলায় শক্ত মাটির স্পর্শ পেলো তারা। বলে উঠল, তাই বলো।

রায়বাবু এই অতি-সংক্ষিপ্ত ভরসার ভাষ্য ক'রে বললেন, বাপুহে, জাহাজ ভাসে বলেই চড়নদার ভাসে। কোম্পানী আছে বলেই আমরা বাঙালীরা আছি। কোম্পানীর আমলের আগে কে পুছতো আমাদের, বলো!

এই বলে চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করে তিনি তাকালেন সকলের দিকে।

সময়োচিত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে নয়ন বলল, একেই তো বলে গোলামী!

স্বরূপ বলে ওঠে, আর নবাবী আমলে খুব স্বাধীন ছিলে, না?

তখন এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিলাম না।

তার মানে, খাঁচাটা একটু বড় ছিল।

তা হ'লে আর কি, যাও, কোম্পানীর অদৃশ্য শ্রীচরণে গিয়ে মাথা পেতে দিয়ে বলো গে, দেহিপদপল্লবমুদারম্।

তোমার সিপাহীদের অত্যন্ত দৃশ্য শ্রীচরণ খুঁজতে হয় না, আপনি মাথার উপর এসে পড়ে, বলে, গৃহান পদপল্লবমুদারম্।

তখন মুখুজ্জে আর রায়বাবু দাঁড়িয়ে উঠে স্বরূপ আর নয়নের হাত ধরে কাছে বসান, বলেন, তোমরা অনেক বলেছো, এবার আমাদের দুটো কথা শোন। বলো হে মুখুজ্জে, তুমিই বলো, বক্তৃতা আমার আবার তেমন আসে না।

সুখানন্দ পণ্ডিত ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখে যে, আসর শান্ত হয়েছে অনেকটা, নিশ্চিন্তভাবে ভিতরে অন্তর্হিত হয়। তখন রায়বাবুর অনুরোধে মুখুজ্জে আরম্ভ করেন—ভাখো বাপু, আমরা বাঙালী, তেলে-জলে, দুধে-ভাতে আমাদের শরীর। লড়াইয়ের আমরা কি ধার ধারি! ওসব পুরবীয়া, তেলিঙ্গি, শিখ, জাঠ, পাঠানের কাজ। কি বলো হে ভায়া!

এই বলে তাকান রায়বাবুর দিকে। রায়বাবুর মুখে যে ভাব প্রকট হয়, তাহার তার ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, তা আর বলতে!

তারপর শোন, আরম্ভ করেন মুখুজ্জে, যতক্ষণ লড়াই চলবে দূরে থাকবে। লড়াই থামুক, ছাখো কে রাজা হয়, তারপরে ধীরেসুস্থে গিয়ে সেলাম বাজিয়ে বলবে—হুজুর, হিসেব রাখতে, কমিশেরিয়েটের কাজ করতে আমাদের জুড়ি নেই। সেই সব কাজে আমাদের বহাল করতে আজ্ঞা হয়।

বাঃ বাঃ, বেশ বলেছ মুখুজ্জে।—সোৎসাহ-বাক্য উচ্চারণ ক'রে রায়বাবু যোগ ক'রে দেন, চণ্ডীমঙ্গল পালাগানে আমলা হাঁড়ার দত্ত ভাঁড়ুর অভিনয় দেখ নি!

তারপরে মনে পড়ে, ছেলেরা তো জন্মকাল থেকেই বাংলার বাইরে মানুষ, তাই বলে, না দেখেছ, শুনেছ তো, পড়েছ তো। তবেই হ'ল। আমরা বাঙালীরা সেই আমলা হাঁড়ার দত্ত। ফৌজ ফৈজতে আমাদের দরকার কি বাপু!

কিন্তু স্পষ্টই দেখা গেল, স্বরূপ আর নয়নে সিপাহী হাঙ্গামা সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক, এক বিষয়ে তাদের মত অভিন্ন, মুখুজ্জে ও রায়বাবুর ব্যাখ্যা তারা মানতে রাজী নয়।

দুজনেই একসঙ্গে গর্জে উঠল, ও কথা মানতে রাজী নই কাকাবাবু।

মুখুজ্জে এতক্ষণ কল্কের নির্বাপিত আগুনটাকে মুখের জোরে উদ্দীপিত করবার চেষ্টায় ছিলেন, বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে বলে উঠলেন, তবু ভালো যে অন্তত একটা বিষয়ে তোমরা একমত হয়েছ।

দুজনে আবার দাঁড়িয়ে উঠেছে। আসর শান্ত হয়েছে ভেবে সুখানন্দ প্রবেশ করলো। অমনি স্বরূপ বললো, কাকাবাবু, আপনার গুণধর পুত্রটিকে এখন যদি না সামলান, তবে বিষম বিপদে পড়বে, হয়তো বা—

বাক্যটা সম্পূর্ণ ক'রে দেয় নয়ন, হয়তো বা প্রাণে মারা পড়বে। এই তো?

বুঝতেই পারছ, বলে স্বরূপ।

শোন স্বরূপ, আরো কিছু বুঝেছি—তুমি একটি পয়লা নম্বরের বিশ্বাসঘাতক। আমি যদি মরি, তুমিও প্রাণে বাঁচবে না, আমাদের লোকেরও চোখ আছে তোমার উপরে।

এবারে সুখানন্দ কথা বলে। নয়ন, আমাদের তোমাদের এইসব ভেদাভেদের কথা ছেড়ে দাও। বিপদকালে এখন আমরা সবাই বাঙালী, সবাই এক। তা ছাড়া, এবারে গলা খাটো ক'রে বলে, এখানে নিজেদের মধ্যে আর বলতে

আপত্তি কি, কে যে কোন্ দলে, তা এখনো তো ঠিক হয় নি। এই ধরো না কেন, খোদ বাদশা যে কোন্ দলে, তা কি কেউ জানে?

সকলেই কথাটা যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করে। সুখানন্দ পণ্ডিত বাদশার নিত্য সঙ্গী। সকলেই—কিন্তু নয়ন নয়। সে বলে, বাদশা যদি সিপাহীর দলে না হন, তবে তাঁকে মরতে হবে।

তার স্পষ্ট ইঙ্গিতে সকলে শিউরে উঠে বলে, কি সর্বনাশ!

সর্বনাশ আবার কোথায় দেখলেন? বাদশা একটা পদ। একজন গেলে আর-একজন এসে বসবে। এমন কি আগে হয় নি?

হেসে উঠে বলে স্বরূপ, এ যে কালনেমির লঙ্কাভাগ হচ্ছে। আগে কোম্পানী-রাজ বরবাদ করো, তারপরে বাদশা বদলিয়ো।

তবে রে বিশ্বাসঘাতক! বলে নয়ন লাফিয়ে পড়তে চায় স্বরূপের ঘাড়ে।

সুখানন্দ চট করে স্বরূপকে সরিয়ে নেয় আর তারপরে তাকে নিয়ে চলে যায় অন্দরমহলে। ভিতরে গিয়ে তার হাত দুটো ধরে মিনতির সঙ্গে বলে, বাবা স্বরূপ, ওটা গোঁয়ার, ওর কথায় কিছু মনে ক'রো না। ও কাউকে মানে না, আমাকেও না।

তারপরে স্বগতভাবে বলেন, মা-মরা ছেলে, কোনদিন শাসন করতে পারি নি, তাই এমনটি হয়েছে। আমারই দোষ।

স্বরূপ বলে, আপনি কিছু মনে করবেন না কাকাবাবু, আমরা দুজনে অনেক কালের বন্ধু, বন্ধুদের মধ্যে এমন বচসা হয়েই থাকে।

এই তো বাবা তোমার মতো কথা। বাবা স্বরূপ, তোমাকে একটা অনুরোধ করছি, ভুল বুঝো না। তুমি ক'দিন এদিকে না-হয় এসো না। হাঙ্গামাটা মিটে গেলে আবার যেমন আসছিলে তেমনি আসবে। তুমি তো বাবা ঘরের ছেলে, বুঝতে তো পারছ সব।

ছাদের উপরে পাশাপাশি চারখানা চারপাই পড়েছে। গ্রীষ্মকালে ভিতরে ঘুমোবার উপায় নেই। সুখানন্দ, তুলসী, ভূতি বুড়ী শুয়ে পড়েছে, নয়নের চারপাই খালি, তার শুতে দেরি হয়। সকলেই জেগে আছে। সুখানন্দ ভাবছে, হাঙ্গামা বাধবার আগে তুলসীর বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো। হয়েও যেতো, যদি নয়নটা না বাধা দিত। সে ভাবে, এই হাঙ্গামা যদি বেড়ে চলে, তবে কে বাঁচবে, কে মরবে স্থির নেই। আর হাঙ্গামা না হলেই বা কি, তার বয়স সতেরো পেরিয়েছে। মনে পড়ে যায়, গালিব

সাহেবের একটি বয়েৎ—মরবার কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই বলেই সব সময়ে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। প্রস্তুত সে আছে, কেবল দুশ্চিন্তা ঐ মেয়েটার জন্যে। নয়নটা টালবাহানা না করলে এতদিন কবে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে তার। না জানি অদৃষ্টের হাত আরো কি অভাবিত চাল দেবে মেয়েটার জীবনে।

তুলসীর মতো তুলসী ভাবতে থাকে। পলায়মান জন্মনার পিছু পিছু ছুটোছুটি করাতেই তার নিঃসঙ্গ জীবনের প্রধান আনন্দ। স্বরূপকে শৈশব থেকে দেখছে, দাদা বলে, আত্মীয় না হয়েও আত্মীয় হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে যে বিয়ের কথা উঠতে পারে, কখনো ভাবে নি। এখন সে কথা উঠতে স্বরূপকে মনের চোখে নূতনভাবে দেখবার চেষ্টা করে। না, না, মেলে না। বরের যে মানসমূর্তি তার মনে আছে—সব মেয়ের মনেই থাকে—না, না, তার সঙ্গে মেলে না স্বরূপের। সে যেন অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত কাছে, রঙীন কল্পনার চেলি নিক্ষেপ করে নি মায়ামাধুরী তার মুখে।

ভূতি বুড়ী ছাড়া কারো ঘুম আসে না। ঘুমোবার উপায় কি? আগুনের আভা, সিপাহীদের হল্লা, বন্দুকের আওয়াজ। কখনো পাহাড়গঞ্জের দিক থেকে, কখনো খুব কাছে দরিয়াগঞ্জের দিক থেকে, কখনো বা কাশ্মীর দরবাজার দিক থেকে।

রাতের অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না, কোথায় কত লোক, গুরুত্ব কতখানি। তারপরে কখন্ পড়ে তারা ঘুমিয়ে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় সুখানন্দর। দেখে নয়নের বিছানা খালি। চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করে, নয়ন এখনো আসে নি?

বাপের কণ্ঠস্বরে জেগে ওঠে তুলসী, বলে, তাই তো, দাদার বিছানা খালি দেখছি।

কোথায় গেল জানিস্?

না।

তোকে কিছু বলে নি?

না।

তবে?

তবে আর কি, বাবা! দাদা বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছে, এখন ভালোয় ভালোয় নামতে পারলে হয়।

দুশ্চিন্তার তরঙ্গে আহত-প্রত্যাহত হ'তে হ'তে আবার ঘুমিয়ে পড়ে তারা।

|| ৬ ||

খুন বড় লাল

খুরশিদ জানের প্রশস্ত কক্ষে অনেকগুলি লোক সন্নিবিষ্ট। শাস্ত্রে যাই বলুক, বাঈজীর গৃহ ষড়যন্ত্র করবার প্রশস্ততম স্থান। ছয় কানের বেশী ছড়ালে নাকি মন্ত্রগুপ্তি ফাঁস হয়ে যায়। এখানে ছয় কানের চেয়ে অনেক বেশী। তা হোক, ক্ষতি নেই। কেননা, ষড়যন্ত্র এখন প্রকাশ্য বিদ্রোহ। কিন্তু কার বিরুদ্ধে?

গতকল্য দেওয়ানী খাসে মীরাটী ফৌজের নেতা কুলিজ খাঁ ও শেখ বান্নুকে মীর্জা মুঘল আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, নিয়ে গিয়ে বুঝিয়েছিল, খাঁ সাহেব, তোমরা নানা মহারাজ বা ঝাঁসির দরবারে যেয়ো না। আবার কি তোমরা মারাঠা হিন্দুরাজ কায়েম করতে চাও?

শেখ বান্নু লোকটা সাড়ে ষোল আনা জঙ্গী, যেমন গোঁয়ার, তেমনি বুদ্ধি কম। কাজেই কুলিজ খাঁকেই উত্তর-প্রত্যুত্তর করতে হচ্ছিল। সে বলল, আমরা হিন্দুরাজ চাই নে, চাই বাদশাহীরাজ। সেইজন্যই তো আর কোথাও না গিয়ে দিল্লি চলে এসেছি।

মীর্জা মুঘল উৎসাহ দিয়ে বলে, এ তোমাদের মতোই কাজ হয়েছে।

কিন্তু বাদশা যদি বাদশার মতো কাজ না করেন? তাঁর কথা শুনে মনে হ'ল, তিনি এ পথে এগোতে রাজী নন। তিনি ভাবছেন "পানী মে রহ্‌কর মগর সে বৈর", কোম্পানীর রাজত্বে থেকে কোম্পানীর সঙ্গে লড়াই চলে না। এদিকে আমরা যে মাঝ-দরিয়ায়।

মীর্জা মুঘল বলে, খাঁ সাহেব, বাদশা তো একটা নাম। বাদশাকে না পাই তাঁর নামটা তো পাবো, তা হ'লেই হ'ল।

আমরা এদিকে কোম্পানীরাজ খতম করছি আর ওদিকে তিনি যদি কোন রকমে ছটকে কোম্পানীর কাছে গিয়ে হাজির হন, তবে তো চার দিন কী চাঁদনী —ফির অন্ধেরী রাত।

আহা-হা, তা হ'তে পারবে কেন? তোমরা আছ কেন?

এহি তো বড়া তাজ্জব কী বাত। এক দফা কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গে লড়বো, আবার বাদশার ফৌজের সঙ্গেও?

বাদশার আবার ফৌজ কোথায়?

এদের মধ্যে যখন কথা হচ্ছিল নীরব শেখ বান্নু মাঝে মাঝে নাক দিয়ে

ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করছিল। তার যদি কিছু সাঙ্কেতিক তাৎপর্য থাকে তবে তা অপরের দুর্বোধ্য।

বাদশাকে কি গ্রেপ্তার করতে হবে? শুধোয় কুলিজ খাঁ, তারপরে নিজেই উত্তর দেয়, সে হবে না আমাদের দিয়ে।

আমরা আছি কেন? বলে মীর্জা মুঘল। বলে, এমন অনেকবার হয়েছে তৈমুরের বংশে।

এবারে ছবিটা স্পষ্ট হয় কুলিজ খাঁর চোখে, চোখ জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে। বলে, সোহি বাৎ কহিয়ে, জহাঁ চাহ্ বঁহা রাহ্।

সেই থেকে মীর্জা মুঘল ওদের হাতছাড়া করে নি, খাইয়েছে, বাদশার নাম ক'রে খিলাৎ দিয়েছে, ওদের মুখ দিয়ে ফৌজকে দিল্লি ত্যাগ করতে নিষেধ করেছে আর অবশেষে ওদের নিয়ে খুরশিদ জানের ঘরে পৌঁচেছে।

খুরশিদ জানের ঘরে আজ আরও তিনজন বাঈজী—আমীর জান, উমরাও জান, সুলতানী জান। চারজনে এক দিকে মসলন্দের উপর বসেছে। আর তিন দিকে—মীর্জা মুঘল, কুলিজ খাঁ, শেখ বান্নু, আলি খাঁ, নয়নচাঁদ, আর হরষপ্রসাদ। সরাব মিঞার জায়গাটি শূন্য। শূন্য ও অর্ধশূন্য মদের বোতল দেখে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, আসর অনেকক্ষণ হ'ল আরম্ভ হয়েছে। নয়নচাঁদ নিমন্ত্রণের আসর থেকে বেরিয়েই সোজা চলে এসেছে। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে সুখানন্দ যখন তার শূন্য শয্যা দেখলো তখন সে পূর্ণ ক'রে বসে রয়েছে খুরশিদ জানের মসলন্দের খানিকটা জায়গা। সকলেই প্রয়োজনমতো কথা বলছে, এক শেখ বান্নু ছাড়া। কয়েক বোতল বার্গণ্ডি গলাধঃকরণ ক'রে 'খুদানে কেয়া চীজ পয়দা কিয়া' বলে সেই যে শয্যাগ্রহণ করেছিল, তারপর থেকে সে নিশ্চুপ।

কালকে থেকে যে কথাটিকে সবচেয়ে ভয় করছিল মীর্জা মুঘল, অবশেষে সেই কথাটিই বের হ'ল কুলিজ খাঁর মুখ থেকে।

শাহ্‌জাদা সাহেব, আমাদের তহবিল বিলকুল ফুরিয়ে গিয়েছে, সিপাহী আটা-ডাল কিনতে পারছে না।

সে কি কথা খাঁ সাহেব! কাল তবে যে বাদশার কাছে বললে, তনখা তোমাদের চাইনে, কেবল ইমানের জন্য লড়তে এসেছ!

ইমানের জন্য লড়তে গেলেও যে ভুখ পায়। আর তা ছাড়া গোড়াতেই তনখার কথা তুললে বাদশা নারাজ হ'তে পারেন।

বেশ তো, লড়াই করো, বাদশাহী ফিরে এলে টাকার অভাব কি!

বাপ রে বাপ! দুধ বিলয়া রাম বিলয়া। লড়াই ফতে হয়ে গেলে কি সিপাহীর কথা মনে থাকে? তা ছাড়া বাদশাহী কায়েম হওয়া তো এক দিনের কথা নয়—অথচ দিনে দু'বার খানা দরকার।

তাই তো, টাকা-পয়সা! বলে শূন্যের দিকে তাকিয়ে শূন্য টাকার থলি স্মরণ করে মীর্জা মুঘল।

এবারে কথা বলে আলি খাঁ। এতক্ষণ সবাই নীরব ছিল। আলি খাঁ বলে, টাকার ভাবনা কি খাঁ সাহেব? শহরে অনেক শালা বজ্জাত আছে যারা মনে মনে ইংরেজের দিকে, তাদের বাড়ি লুট করলেই তোমাদের ডাল-রোটির পয়সা মিলবে।

সকলেই তারিফ করে আলি খাঁর বুদ্ধির। সবচেয়ে উঁচু গলা সুরয-প্রসাদের। আজ দুই দিন অশেষ অধ্যবসায়ে বাড়ির দেয়াল ভেঙে গর্ত ক'রে তার "অশ্‌শি হাজার আকবরী মোহর" গেঁথে ফেলেছে সে। তাই আলি খাঁর প্রস্তাব সমর্থন ক'রে বলল, লুটের টাকা তো সিপাহীর ভোগের টাকা, ওতে কোন দোষ নেই।

সে কথা ঠিক। থলিতে টাকা নিয়ে কে আর লড়াই করতে নামে? নাদির শা, আহমদ শা আবদালী কত টাকা নিয়ে লড়াই-এ নেমেছিল? আর কোম্পানী? হিন্দুস্থান জয় করলো কয় টাকায়? বলে নয়নচাঁদ।

সুরযপ্রসাদ বলে, লড়াই চলবার সময়ে যার নাম লুট, লড়াই ফতে হয়ে গেলে তাকেই বলে খাজনা। টাকার অভাব কি খাঁ সাহেব?

কিন্তু কে কোম্পানীর দিকে আর কে নয় বোঝা যাবে কি ক'রে? শুধায় মীর্জা মুঘল।

এ আর এমন শক্ত কি! যে বাধা দেবে সে কোম্পানীর লোক।

মীর্জা মুঘল বলে, আগে কোম্পানীর লোক না হ'লেও লুটপাটের পরে সত্যিই কোম্পানীর লোক হবে। তা ছাড়া বাদশা আবার লোকের উপরে জুলুম পছন্দ করেন না। তিনি না শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসেন।

সেইজন্যেই বলছি মীর্জা সাহেব, হুকুম দিন, আমরা নানা মহারাজের বরাবর চলে যাই। আর যে বাদশা একটা চিড়িয়ার জন্যে দরবার ছেড়ে চলে যান, লুঠতরাজ খুন-খারাপ দেখলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের ছেড়ে কোম্পানীর দিকে চলে যাবেন।

সেইটেই তো বন্ধ করতে হবে খাঁ সাহেব।

কি উপায়ে?

বাদশা বৃদ্ধ হ'লেও, দুর্বল হ'লেও পুত্তলিকাসম হ'লেও তিনি বাদশা; নামের মধ্যেই তাঁর প্রতাপ। তাঁকে অভীষ্ট পথে আনা তো সহজ নয়। সকলেই নীরবে বিষণ্ণ মনে ভাবে, কি উপায়? এদিকে সবাই এগিয়ে গেল আর ওদিকে বাদশা যদি পিছিয়ে যান তবেই তো বিপাক। ফিরবার পথ বন্ধ ক'রে বাদশাকে সঙ্গী করার কি উপায়?

জাঁহা মুশকিল
তাঁহা আসান
মেরে খুরশিদ জান।

সকলে চকিত হয়ে ওঠে, আরে, এ না সরাব মিঞার গলা! কিন্তু লোকটা কোথায়? সকলের বিস্ময়ের অবসান ঘটিয়ে পালঙ্কের তলা থেকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে আসে ছিন্নবেশ মলিন-মূর্তি সরাব মিঞা।

খুরশিদ ব্যাকুলভাবে বলে ওঠে, সরাব, তুমি পালঙ্কের তলায় ছিলে?

ছিলাম বৈকি জান। তোমার পালঙ্কে অনেকদিন শুয়েছি, এবারে তলায় শুয়ে দেখলাম।

কি দেখলে, শুধোয় আমীর জান।

উপরের চেয়ে তলা ভালো, অনেক বেশী আরাম।

কেন?

কেন কি? উপরে শুয়ে থাকলে খুরশিদ বারে বারে এসে বিরক্ত করতো, গোসল করবে না? খানা খাবে না? আর কিছু না হোক, না-হ'ক পাঁচটা চুমো খেতো। তলায় কোনো ঝামেলা নেই।

খুরশিদ শুধোয়, ঢুকলে কখন? সারাদিন তো ঘরেই আছি।

ঐ তো মুশকিলে ফেললে! পীরিত, চোর আর বিল্লি কখন যে ঘরে ঢোকে কেউ বলতে পারে না।

দুরন্ত শুধোয়, তুমি ভাই এ তিনের মধ্যে কি?

বিল্লি—বলে ম্যাও ম্যাও শব্দে বিড়ালের ডাকের অনুকরণ ক'রে ওঠে সরাব। তার পরে বলে, কাল সারাদিন বড় ঝামেলা গিয়েছে।

নয়নচাঁদ বলে, তোমার আবার ঝামেলা কি? চাল নেই, চুলো নেই। তা বলে কি দিল আর কলিজা নেই!

বেশ, আছে তো আছে। কি হ'ল তাতে?

সেই কথাই তো বলছি। মিছে ঝামেলা না করে শুনে যাও।

এই বলে সে আরম্ভ করে, কাল বেলা পাঁচ ঘড়ির সময়ে দরিয়াগঞ্জের খয়রাতি

গলি দিয়ে আসছি এমন সময়ে একটা বাড়ির দোতলা থেকে মানুষের কাতরান শুনতে পেলাম। ভাবলাম আজ যে কাণ্ড হয়ে গেল, না জানি কার এন্তেকাল উপস্থিত। ভাবলাম দেখেই আসি, ফিরিঙ্গি হয় তো সাবড়ে দেবো। দোতলায় উঠে ঘরে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়লো, এক মেমসাহেব তার ছোট ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছে। তবে কাতরায় কে? এমন সময়ে চোখে পড়লো, ঘরের কোণে একটা সাহেব দুমড়ে পড়ে রয়েছে, তার বুকে বেঁধানো ছুরি, রক্ত গড়াচ্ছে। তখনো জ্ঞান ছিল, পায়ের শব্দ শুনে বলল, বন্ধু হ'লে একটু জল দাও, শত্রু হ'লে ছুরিটা আর একটু ঢুকিয়ে দাও।

বললাম, মেমসাহেবকে জাগাও নি কেন?

ওরা কি আর জাগবে! থ্যাঙ্ক গড, কাছে বিষ ছিল, প্যাণ্ডেরা ঘরে ঢুকতেই নিজ হাতে ওদের বিষ দিয়েছি। তাই না এমন আরামে ঘুমোচ্ছে!

এই বলে সে থামলো, হাঁপিয়ে গিয়েছিল।

ঘরে জল আছে কি?

সে বলল, তোমাকে দেখে শত্রুপক্ষের লোক মনে হচ্ছে, তোমার দেওয়া জল পান করবো না।

বুঝলাম, মুমূর্ষুর কঠিন পণ টলবে না। তাই প্রসঙ্গ পালটে বললাম, তুমি বিষ খেলে না কেন?

বিষ খাবো? গর্জে উঠল, নড়ে উঠল সেই মৃতপ্রায় দেহ। একটাকে না নিয়ে বিষ খাবো? দুটো এসেছিল, একটাকে নিকেশ করলাম, দ্বিতীয়টা নিকেশ করলো আমাকে। আর তুমি জিজ্ঞাসা করছো, বিষ খাই নি কেন? গায়ে যদি জোর থাকতো, বুকের এই ছুরি খুলে তোমার বুকে বসিয়ে দিতাম —বলে সত্যি সত্যি টানতে লাগলো ছুরিখানা। দরদর বেগে রক্ত পড়তে লাগলো, অবশেষে যেমন ছুরি খসলো, প্রাণও বের হ'ল। কি করি স্থির করতে না পেরে রুমাল দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরলাম।...কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? এই ছাখো।

জেব থেকে টেনে বার করলো ঘন লাল রুমালখানা, ছুঁড়ে ফেলে দিলো আসরের মধ্যে। জলন্ত অঙ্গারখণ্ড বোধে সবাই ছিটকে সরে বসলো। হো হো শব্দে হেসে উঠলো সরাব, ভয় পেয়ে গেলে? এতেই ভয় পেয়ে গেলে? তবু তো দেখ নি সেই মুমূর্ষুর মুখ।

তারপর নিজের মনেই যেন বলতে লাগলো, খুন যে এত লাল, খুন যে এত গরম জানতাম না। হাতে কামড়ে ধরে, হাত পুড়ে যায়।

তারপরে খুরশিদের হাত ধরে খুব ক'ষে ঝাঁকুনি দিয়ে শুধোয়, ফিরিঙ্গি দুশমনকে বাঁচাতে চেষ্টা করলাম কেন, বলতে পারো? পারো না? তা পারবে কি ক'রে? কেবল মাইকেল করতেই শিখেছ। শয়তানী।

এই বলে সবলে ধাক্কা মারে খুরশিদকে। পড়ে গিয়ে পালঙ্কের কোণা মাথায় লেগে রক্ত গড়াতে থাকে। সকলে চেঁচিয়ে ওঠে।

আজ তোমার বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

মেয়েটা যদি মরতো?

তুমি একটি আস্ত গুণ্ডা।

খুরশিদ উঠে বসে ওড়নার প্রান্ত দিয়ে মাথা চেপে ধরে বলে, না, না, ওকে তোমরা কিছু ব'লো না। ওর মনটা আজ ভালো নাই।

সরাব কাছে টেনে নেয় খুরশিদকে, বলে, ও কিছু নয়, একটু জল দিয়ে ধুলেই সেরে যাবে। ক' ফোঁটা রক্ত আর পড়েছে!

তারপরে আবার ভয়াবহ স্মৃতিটা মনে পড়ে, বলে, দেখতে যদি ফিরিঙ্গিটার রক্তের তেজ, ঝলকে ঝলকে পড়ে, শেষ হতে চায় না।

এতক্ষণে বোধ করি মীর্জা মুঘলকে স্পষ্টভাবে চিনতে পারে, তাই কুর্নিশ ক'রে বলে, আপনারা চিন্তা করছিলেন বাদশার ফিরবার পথ বন্ধ করবার কি উপায়?

মীর্জা মুঘল মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

উপায় খুব সহজ। খুন দিয়ে রাঙিয়ে দিন বাদশার দুই হাত, খুন দিয়ে গণ্ডী টেনে দিন চারদিকে। ফিরবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

ধুলেই রক্ত উঠে যাবে, শুকোলেই গণ্ডী মুছে যাবে, বলে নয়ন।

ফিরিঙ্গির খুন না যাবে ধুলে, না মুছবে শুকালে। নয়ন ভাই, সাত দরিয়ার পানি দিয়ে ধুলেও ফিরিঙ্গির খুনের দাগ উঠবে না। আর ফিরিঙ্গির খুনের দাগ যার হাতে, সে বাদশা হোক আর ধুন্ধুপন্থ হোক, ইংরেজ তাকে ক্ষমা করবে না।

বুঝলাম, বলে নয়ন, কিন্তু এত খুন মেলে কোথায়?

কেন, কাল অনেকগুলো সাহেব-মেম ধরা পড়েছে দরিয়াগঞ্জে, খুঁজলে আরো মিলবে শহরে।

সুরয বলে ওঠে, কি সর্বনেশে কথা!

এখন সর্বনাশ বললে চলবে কেন? লড়াই করতে নেমেছ।

এবারে আলি খাঁ শুরু করে, লড়াইয়ে মানুষ মরে, কে না জানে! সে ভয় করি না। কিন্তু সাহেব-মেমগুলোকে হাতে রাখতে চাই, hostage বা জামিন হিসাবে—

বাধা দিয়ে সরাব বলে, তার মানে তুমি ফিরবার পথ খোলা রাখতে চাও?

তবে কি চিরকাল লড়াই চলবে?

এক পক্ষ মরে নিঃশেষ না হওয়া অবধি চলবে বৈকি!

খুরশিদ বলল, সরাব ভাই, এই তো এখনি বললে যে খুন বড় লাল, তবে আর ও শলাহ্ দিচ্ছ কেন?

সেইজন্যই তো দিচ্ছি। ঐ লাল রশ্‌শি দিয়ে বাদশাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দাও, যাতে পালাতে না পারেন, আর তাঁকে সম্মুখে রেখে লড়াই ক'রে যাও।

তুমি আস্ত শয়তান।

রাখো তোমার শয়তানী বুদ্ধি।

সেই ভালো, তোমরা ফুলফল দিয়ে লড়াই করো, দেখো কি হয়। আমি চললাম।

দরজার কাছে গিয়ে ফিরে এসে খুরশিদের ক্ষতস্থানে আঙুল দেয়, আঙুলটা চোখের কাছে নিয়ে নিজের মনে বলে ওঠে, নাঃ, এতটুকু ফারাক নেই।

কিসে হে? বলে একজন।

ফিরিঙ্গির খুনে আর হিন্দুস্থানীর খুনে। সমান লাল, সমান গরম।

বলে ছুটে বেরিয়ে যায়।

কেবল খুরশিদ ভাবে, শয়তান যদি, তবে খুনে এত ভয় কেন? আবার ভাবে, দেবদূত যদি তবে খুন করবার পরামর্শ দেয় কেন?

শয়তানকে লোকে ভয় করে, ধিক্কার দেয়, এড়িয়ে চলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার পরামর্শটাই গ্রহণ করে। ঐখানেই তার জিত।

প্রথমে সরাব মিঞার পরামর্শটা যত মারাত্মক বলে মনে হোক না কেন, বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমে ক্রমে আসতে লাগলো তার মারাত্মকতা। তারপর কিছুক্ষণ বাদে যখন সভা ভঙ্গ ক'রে সবাই উঠে গেল, ঐ পরামর্শ টাই একমাত্র পন্থা বলে অনুভূত হ'তে লাগলো। এখনো সম্মুখে অনেকটা রাত, মারাত্মকতার রঙ আরো ফিকে হয়ে আসবার যথেষ্ট অবসর আছে।

সকলে চলে গেলে ঐ রক্তে রাঙা রুমালখানার দিকে একাকী মূঢ়ের মতো তাকিয়ে বসে রইলো খুরশিদ, মনে পড়ছিল তার সরাব মিঞার অভিজ্ঞতা, খুন বড় লাল। খুরশিদের এমনি মুহ্যমান অবস্থা যে, রুমালখানা সরিয়ে ফেলবার উদ্যমটুকুও হ'ল না।

॥ ৭ ॥

"বেদনায় যে বান ডেকেছে"

তেরোই মে সকাল থেকে অরাজকতা রুদ্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করলো শাহ্‌জাহানাবাদে। কিংবা বলা উচিত যে, আস্ত শাহ্‌জাহানাবাদ শহরটাকে হাত-পা বেঁধে অরাজকতার কাছে সমর্পণ করা হ'ল। অবশ্য এগারই-বারোই তারিখেও খুন-জখম লুটপাট হয়েছে, কিন্তু সে খুন-জখম কোম্পানীর লোকজন, অধিকাংশই ইংরেজ; সে লুটপাট কোম্পানীর মাল—দরিয়ামে ডাল। তেরোই তারিখের খুন-জখমে, যে যাকে মারে; তেরোই তারিখের লুটপাটে যে যারটা কাড়ে; শত্রুমিত্র সাদা-কালো আত্মপর ভেদ ঘুচে গেল। হিংসার স্বভাবটাই নির্বিচার।

কোথা থেকে কিভাবে কার হুকুমে শুরু হয়ে গেল কেউ জানে না। সবার মুখেই এক কথা, হুকুম হো গিয়া, হুকুম হো গিয়া। কে হুকুম দিল? না, হুকুম হো গিয়া। দলে দলে ফৌজ লুট করতে বেরিয়ে পড়লো। প্রথমে মীরাটী ফৌজ, তারপরে দিল্লির বাদশাহী ফৌজ, সবশেষে শহরের পাকা ও উঠতি গুণ্ডার দল। লালকেল্লা থেকে শুরু ক'রে চাঁদনী চকের দক্ষিণ দিকে শহরের যে অংশ সেখানেই অত্যাচার লুটপাট বেশী হ'ল। চাঁদনী চকের উত্তর দিকেই কোম্পানীর সম্পত্তি বেশী। আগে দু' দিন লুটপাট হওয়ার পরে সেখানে তেমন আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না।

শেঠীরা গদি বন্ধ করলো, বেনিয়া দোকান বন্ধ করলো, ফিরিওয়ালার দল সওদা লুকিয়ে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো, ধনীরা দেয়ালে গর্ত ক'রে ধনরত্ন গেঁথে ফেললো, অনেকে উঠানে পুঁতলো, অনেকে জল-অচল বাক্সে ভ'রে বাড়ির ইঁদারার মধ্যে ফেলে দিলো; যারা পারলো শহর ছেড়ে গাঁয়ের দিকে চলে গেলো। যাদের সে উপায় ছিল না তারা বাড়ির সদর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে আত্মগোপন করলো। ও:ই মধ্যে যাদের সাহস আর কৌতূহল কিছু বেশী তারা ছাদের উপরে উঠে আলসের আড়াল থেকে দেখতে লাগলো, রাস্তা দিয়ে কাতারে কাতারে লোক চলেছে, কারো মাথায়, কারো হাতে, কারো ঠেলাগাড়িতে ঝাড়লণ্ঠন, খাট, পালঙ্ক, গদি-বিছানা, বাক্স-সিন্দুক, কাঁচের কাঁসার রূপোর তৈজসপত্র—সব লুটের মাল। দর্শকরা বুঝতে পারে, লুটের মধ্যে বেশ হিসাব আছে—এক একটা মহল্লা ধরছে আর লুটে শেষ ক'রে দিচ্ছে। লুটপাট শেষ

হয়ে গেলে আর কিছু লুটবার রইলো না দুঃখে কচি গুণ্ডার দল চিল ছুঁড়ে দরজা-জানলা জখম ক'রে দিচ্ছে, বাড়ির হাতার মধ্যে ফুলের গাছ থাকলে সেগুলো কেটে ফেলছে। তারপরে এ পালাও যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন বাড়ির দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে মালিক সম্বন্ধে নানা রকম মন্তব্য লিখে দিচ্ছে।

অরাজকতার স্বভাব এই যে, নিতান্ত নিরীহ মানুষকেও পাষণ্ড ক'রে তোলে। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হ'ল না। দেনদার পাওনাদারের বাড়িতে গিয়ে খতখানা ফেরত চাইলো, জানালো অবিলম্বে ফেরত না দিলে ফিরিঙ্গি লুকিয়ে রেখেছে বলে চীৎকার করবে। বাকিটুকু বলার প্রয়োজন হয় না— অঢেল দৃষ্টান্ত আশেপাশে ছড়ানো। পাওনাদার ভালো মানুষের মতো খতখানা ফিরিয়ে দিয়ে বলে, ভাইয়া, শালা কোম্পানীর রাজত্ব বলেই খত নিতে হয়েছিল, এখন তো কোম্পানীর রাজত্ব গিয়েছে, খতের আর কি প্রয়োজন, নিয়ে যাও। দরিদ্র প্রতিবেশী এসে ধনীকে জানায়, ভাইসাহেব, মায়ের ব্যায়ামের খবর এসেছে গাঁও থেকে, যেতে হবে, এখনি দু'শো টাকার দরকার, ফিরে এসেই টাকাটা ফেরত—

ধনী শেষ করতে দেয় না বাক্যটা, বলে ওঠে, আরে তোমার মা তো আমার বহিন, তুমি আমার ভাগ্নে, আমি তোমার বাপের শালা, আমার টাকা তো তোমারই, তবে সব শালা সিপাহী লুটে নিয়ে গিয়েছে, বাজার খরচের জন্যে মাত্র তিরিশটা টাকা আছে, তাই নিয়ে যাও।

হাতে টাকাটা গুঁজে দিতে দিতে বলে, আর কাউকে যেন বলো না, আমার কিছু থাকলে আমার মৃত্যুর পরে তুমিই তো পাবে, তুমি কিনা আমার ভাগনে।

ভাগনে জিভ কেটে বলে, রাম রাম। অবশেষে সেলাম বাজিয়ে প্রস্থান করে। তারপর সারাদিন, আধ ঘণ্টা পর পর ভাগনের দল আবির্ভূত হয়ে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বহিনের সংখ্যা অধিক হ'লে অনেক লোকের শ্যালক হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। সন্ধ্যাবেলায় সার্বজনীন মাতুলের মাতুলত্ব ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

কোন বাড়িতে ইংরেজ নরনারী পাওয়া গেলে গৃহস্থের দুরবস্থার একশেষ হচ্ছে। শুধু ইংরেজটিকে সমর্পণ ক'রেই নিষ্কৃতি নেই, এহেন গর্হিত কার্যের মোটা জরিমানা যোগাতে হচ্ছে। ওরই মধ্যে আবার কেউ কেউ ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষকে দেশী পোশাকে আচ্ছাদিত ক'রে আত্মীয়স্বজন বলে চালাতে চেষ্টা করে। তার ফল হয় এই যে কোন বাড়িতে তুষারবর্ণের ছেলেমেয়ে আবিষ্কৃত

হ'য়ে তাকে নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। অবশেষে ছেলেমেয়েরা হিন্দুস্থানী বলে প্রমাণিত হ'লেও সেটা গেরস্তর অপরাধ গণ্য হয়—তখন অর্থদণ্ড দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে হয়। অর্থশোক অপগত হতে-না-হতে গলির মোড়ে নাকাড়া বেজে ওঠে, আর তারপরেই নকীব হাঁকে—

খাল্ক্-ই-খুদা
মুল্ক-ই-বাদশা
হুকুম-ই-সিপাহী-ই-ই।

দিল্লিবাসী গৃহস্থ নরনারী মনে মনে অভিশাপ দিতে দিতে মুখে বলে, সিপাহীরাজ জিন্দাবাদ!

এগারোই বারোই দু' দিন লুটপাট, খুন-জখমের পরে শহরের অবস্থা খানিকটা শান্ত হয়েছিল, আততায়ীর ক্লান্তিই প্রধান কারণ। শহরের লোকে যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার উপক্রম করছে, তখন তেরোই ভোরবেলা থেকে নরকাগ্নি আবার দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠল। সুখানন্দ পণ্ডিত এ দু' দিন বাড়ি থেকে বের হয় নি। কিন্তু বরাবর বাড়ি বসে থাকলে চলবে কেন। আর কোন কারণে না হোক বাজার করবার জন্যেও বাড়ির বাইরে যেতে হয়। তেরোই তারিখে ভোরবেলা যখন বাড়ির বার হয়েছে, তখনো শহরের অবস্থা শান্ত, অন্তত সেদিকটায়। বাড়ির কাছেই ফুলকিমণ্ডীতে ছোট একটা বাজার ছিল। সুখানন্দ পণ্ডিত সেখানে পৌঁছে দেখল, বাজার একেবারে খালি, মাছি উড়ছে। কাজেই মীর খাঁর বাজার ছাড়া গত্যন্তর নাই। সে বাজারটা ফুলকিমণ্ডীর পশ্চিমে, আধ মাইলটাক দূরে। সেখানে গিয়ে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তুমুল কলরব শুনতে পেলো সুখানন্দ। দু' দিন পরে বাজারের সামান্য যে দু-দশখানা দোকান দরজা খুলেছিল, মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেলো। লছমিনারায়ণ নামে একজন মুদী উদ্‌ভ্রান্ত সুখানন্দের হাত ধরে দোকানের মধ্যে টেনে নিয়ে দরজায় হুড়কো এঁটে দিলো। শুধালো, আজ এমন দিনে পথে বার হয়েছেন কেন?

সুখানন্দ বলল, কেমন ক'রে জানবো ভাই যে দিন খারাপ! সকাল বেলাতে সব তো শান্ত ছিল।

লছমিনারায়ণ বলল, পণ্ডিতজী, শহর এখন সান্নিপাতিক রোগী, কখনো ভালো, কখনো মন্দ চলবে, না মরা পর্যন্ত শান্ত হবে না।

তারপরে শুধালো, এত ভোরে বের হয়েছিলেন কেন?

আজ ক'দিন বাজার করা হয় নি, খাওয়া-দাওয়া আছে তো!

পণ্ডিতজী জিউ থাকলে তো থানা। তা ছাড়া দোকান-পাট খোলা পাবেন কেন?

এই তো তোমার দোকান খোলা পেলাম। দাও কিছু চাল-ডাল।

মুদি চাল-ডাল ওজন করছে, এমন সময়ে একদল সিপাহী মার-মার রব করতে করতে চকের মধ্যে ঢুকলো।

ওরা দুইজন দরজার ফাঁকে চোখ রেখে দেখলো, অনেকের হাতেই খোলা তলোয়ার বা বন্দুক, অনেকের হাতে লাঠি, বল্লম, শড়কি, আরো দেখলো যে, অনেকেরই তলোয়ার রক্তে লাল।

লছমিনারায়ণ ফিসফিস করে বলল, পণ্ডিতজী, আজ বুঝি এখানেই থাকতে হয়।

বাড়িতে যে মেয়েটা একলা থাকলো।

তবু তো বাড়িতে আছে। পথে বের হ'লেই অপঘাত নিশ্চয়।

রকম তো তাই মনে হচ্ছে।—বলে সুখানন্দ।

না, না, পণ্ডিতজী, বার হওয়ার চিন্তা ছাড়ুন। তা ছাড়া আমিই বা যেতে দিয়ে নরহত্যার ভাগী হবো কেন?

অগত্যা সুখানন্দকে যাওয়ার কল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়, তখনো চকের মধ্যে গুণ্ডাদের উন্মাদ তাণ্ডব চলছে।

স্বরূপরাম যখন সুখানন্দ পণ্ডিতের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে ফিরে এলো, তখন অনেক রাত। সারাদিনের নিদারুণ অভিজ্ঞতায় ঘুম আসতে চায় না। ঘুম সুখের পায়রা, দুঃখীর কাছে আসতে চায় না। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে বেশ একটু দেরি হ'ল। ঘুম ভেঙে শুনতে পেলো, শহরে সমুদ্রমন্থনের কলরব চলছে। মোটেই সে বিস্মিত হ'ল না। এই ব্যাপারের নায়কদের অনেককেই সে জানে, তাদের মতিগতিও অজানা নয়, কাজেই এর নিদারুণতা সম্বন্ধে তার ভুল ধারণা ছিল না। সে ভাবলো, যা হয় হোক গে, বাড়ির বার না হ'লেই হ'ল। স্বরূপ আদৌ ভীরু প্রকৃতির লোক নয়, আর সেইজন্যই জানে যে, জনতার অন্ধ আক্রমণের সম্মুখে বীরত্বের স্থান নেই। বীর হ'লেই যে নির্বোধ হ'তে হবে, এমন কি কথা! তা ছাড়া সে সিপাহী পক্ষের চিহ্নিত লোক, তার মাথাটার উপরে ওদের রোখ আছে, নয়নের কথায় অর্থ বুঝতে তার ভুল হয় নি। আলমারি থেকে স্কটের একখানা উপন্যাস টেনে নিয়ে আরাম করে যখন শুতে যাবে, তখন হঠাৎ মনে পড়ল, তুলসীদের একবার

খোঁজ

খবর নেওয়া উচিত। সে নিশ্চয় জানতো, নয়নচাঁদ বাড়িতে বসে নেই। অবশ্য নয়নচাঁদ সিপাহী পক্ষের লোক। কিন্তু এ ক'দিনের অভিজ্ঞতায় সে বুঝে নিয়েছে যে, সিপাহীদের কাছে পক্ষাপক্ষ নেই। তখনি আবার মনে হ'ল, বাড়িতে নয়নচাঁদ না থাক, সুখানন্দ পণ্ডিত আছেন। সুখানন্দের কথা মনে পড়তেই চমকে উঠল, সর্বনাশ, সে যে সিপাহী পক্ষের সংশয়-ভাজন। একবার বাড়িতে গুণ্ডারা ঢুকে পড়লে তুলসীর চরম লাঞ্ছনা হবে জানতো সে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ উঠে দাঁড়ালো স্বরূপরাম। সবলে নিক্ষেপ করলো Red Gauntlet-খানা অদৃশ্য সিপাহী ফৌজের দিকে আর তখনি বেরিয়ে পড়লো সুখানন্দ পণ্ডিতের বাড়ির দিকে।

দরিয়াগঞ্জের দক্ষিণ দিকে কাগজী মহল্লায় স্বরূপরামের বাসা। বাড়ির বাইরে এসে দেখলো যে, সমস্ত মহল্লা নির্জন ও পরিত্যক্ত। তারপরে খয়রাতি গলি দিয়ে ফৈজবাজার রাস্তায় পড়ে দেখলো যে, দশ হাত পর পর শস্ত্রধারী সিপাহীর দল পাহারা দিচ্ছে, কাছে আসতেই গর্জে উঠে, হুকুমদার। বুঝলো যে, এভাবে এগোনো বিপজ্জনক, কেউ চিনে ফেললে প্রাণ হারাতে হবে। খয়রাতি গলির মোড় থেকে ফুলকিমণ্ডী বেশী দূরে নয়। তবু সোজা পথে এগোনো যখন সম্ভব নয়, বাধ্য হয়ে ঘুরপথ অবলম্বন করলো সে। বিপদের দিনে রাজপথের মতো অরাজক আর কিছুই নয়। গলিপথে যাওয়াটাই নিরাপদ বিবেচনা করে কুচা দখিনীরাও গলি দিয়ে এসে পড়লো কুচা কালা মহলে, সেখান থেকে পড়লো কুচা পলাদ খাঁর গলিতে, তারপরে মহল্লা চিৎলী কবর হয়ে উল্টো দিক দিয়ে ঢুকলো ফুলকিমণ্ডীতে। দু' রশি জায়গা আসতে তাকে দু' মাইল ঘুরতে হয়েছে। ফুলকিমণ্ডীর কোন বাড়ির দরজা খোলা নেই। বলা বাহুল্য, সুখানন্দ পণ্ডিতের বাড়ির সদর দরজাটাও বন্ধ। অনেক ঠেলাঠেলির পরেও যখন দরজা খুলল না বা ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিল না, তখন সে কোনক্রমে প্রাচীর বেয়ে ছাদের উপরে উঠে ভিতরের আঙিনায় লাফিয়ে পড়তেই দুটি অসহায় নারীকণ্ঠ থেকে আর্তরব উঠল, রাম রাম।

প্রত্যুত্তরে তারা শুনতে পেলো, রাম বলে রাম, একেবারে স্বরূপরাম।

তুলসীর কচি গলা বলে উঠল, তাই বলো—স্বরূপদাদা।

ভুতি বুড়ী বলল, আমি ভাবলাম একটা হনু হবে।

তা হ'লেও খুব ভুল হয় নি, রাম না হয় রামের বাহন। কিন্তু পণ্ডিতজী কোথায় রে?

বাবা সকালে বাজার করতে বেরিয়েছিলেন, এখনো ফেরেন নি।

একটু ভেবে স্বরূপ বলল, কোথাও আশ্রয় নিয়ে থাকবেন, ভয়ের কারণ নেই।

নয়নের কথা কোন পক্ষ থেকেই উঠল না, কোন পক্ষই তার সম্বন্ধে আশা পোষণ করে না।

স্বরূপ যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, তুলসীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা ছিল না তার মনে। তার পরে বেরিয়ে যা দেখল, প্রতিবেশীর কাছে যা শুনলো, আর দেখা-শেনোর সঙ্গে অনুমান মিলিয়ে নিয়ে যা বুঝলো, তাতে স্থির করলো যে, তুলসীকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কোন নিরাপদ স্থানে রাখা আবশ্যক। সে শুনেছিল যে, সিপাহীরা এখন বাড়ি-বাড়ি মেমসাহেব খুঁজে বেড়াচ্ছে। অনেক গৃহস্থ দয়াপরবশ হয়ে মেমসাহেবদের লুকিয়ে রেখেছে। দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা ফরসা রঙের হিন্দুস্থানী মেয়ে দেখলে বলছে মেমসাহেব। দেশী পোশাক বা দেশী ভাষার সাক্ষ্য মানছে না। বলছে পোশাক বদলাতে কতক্ষণ, আর বেটারা আয়া-চাপরাসীর সঙ্গে কথা বলে বলে হিন্দুস্থানী শিখে নিয়েছে। বলছে, এখন তো নিয়ে চললাম লালকেল্লায়, তারপর শাহ্‌জাদারা বুঝবে ফিরিঙ্গী কি হিন্দুস্থানী। স্বরূপ ভাবে, তুলসীর যেমন রঙ তেমনি সুঠাম দেহ, ওকে পেলে ছাড়বে না সিপাহীরা। ওকে সরাতেই হবে। কিন্তু কোথায়? তখনই মনে পড়ে, কাছেই গালিব সাহেবের বাড়ি। গালিব সাহেব স্বরূপকেও চেনে, তুলসীকেও চেনে। সেখানে রাখা যেতে পারে তুলসীকে। মীর্জা গালিব সম্ভ্রান্ত নাগরিক, সকলের শ্রদ্ধাভাজন, তার বাড়িতে সিপাহীরা নিশ্চয়ই হামলা করবে না। তুলসীর বাড়িতে যখন এসে পৌঁছলো, এই রকম একটা পরিকল্পনা গ'ড়ে উঠেছে তার মনে। কিন্তু কথাটা বলতে মুখে বাধলো। সঙ্কট যতই কঠিন হোক, বাপকে না জানিয়ে মেয়েকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া—নাঃ, মন সরতে চায় না স্বরূপের। তা ছাড়া নয়নের আদিখ্যেতায় একটা সঙ্কোচের ছায়া নেমে পড়েছে দুজনের মধ্যে। কিন্তু সব সমস্যার সমাধান ক'রে দিল তুলসী নিজে। সে বলে উঠল, স্বরূপদাদা, তুমি এসেছ বাঁচলাম, এতক্ষণ আমরা ভয়ে মরছিলাম।

স্বরূপ বলে, এবারে তো নির্ভয় হলি, ভবে আর কি!

তুলসী বলে, নির্ভয় হলাম তো বলি নি, বলেছি বাঁচলাম।

স্বরূপ কি বলবে ভেবে পায় না।

তখন তুলসী বলে, স্বরূপদাদা, আমাকে কোন নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাও।

স্বরূপেরও তাই ইচ্ছা, তবু বলে, বাড়িঘর ছেড়ে যাবি ?

আর একটা সিপাহী এসে টেনে নিয়ে গেলে বাড়িঘর আগলাবে কে ?

টেনে নিয়ে না রে, মেমসাহেব ভেবে তাঞ্জামে তুলে নিয়ে যাবে।

তবেই ত্থাখো কি বিপদ !

কিন্তু পণ্ডিতজী নেই, নয়ন নেই, কাউকে না বলে যাবি ?

ঐ তো ভূতি বুড়ী থাকলো, ওরা ফিরলে বলবে।

ও দাদাবাবু, আমি কনে থাকব ? চেঁচিয়ে ওঠে ভূতি বুড়ী !

তুই গেলে বাড়ি আগলাবে কে ? বলে তুলসী।

সিপাহীরা ধরি নিয়ে গেলি বাড়ি আগলাবো কেমন ক'রে ?

কানা সিপাইটাও তোকে মেমসাহেব মনে করবে না।

কেন দিদি, মেমসাহেব কি বুড়ো হয় না ?

রঙটা ত্থাথ গিয়ে, একেবারে মেমসাহেব !

তারপরে স্বরূপের দিকে ফিরে বলে, চলো স্বরূপদাদা, শীগ্‌গির নিয়ে চলো।

পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্তে স্বরূপ শুধায়, কোথায় যাবি ঠিক করেছিস্‌ ?

তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, আমি ঠিক করতে যাবো কেন ? সে ভাবনা তুমি ভাববে।

মেয়েরা যখন পুরুষের সঙ্গে বার হয়, সব ভাবনা তুলে দেয় তার হাতে।

গালিব সাহেবের বাড়ি যাবি ?

খুব ভালো হবে। বেগমসাহেবারা খুব ভালবাসেন আমাকে। তা ছাড়া, মীর্জা সাহেবের বাড়িতে সিপাহীর ট্যাঁ-ফু চলবে না, বাবা। মীর্জা সাহেব বাদশার দোস্ত !

স্বরূপ মনে মনে ভাবে, আজকার ত্বঃসময়ে কে যে কার দোস্ত !...অরাজকতার দিনে সিংহাসনের ছায়া নিরাপদ নয়।

তবে চল।

কাপড়চোপড় ?

স্বরূপ বলে, না, না, সঙ্গে জিনিসপত্র নেওয়া চলবে না। লুটের মাল ভেবে গুণ্ডারা বখরা চাইবে।

ওদের যেতে উদ্যত দেখে হাউমাউ ক'রে কেঁদে ওঠে ভূতি বুড়ী।

থাম, বলে ওঠে তুলসী।

স্বরূপ বলে, ভূতি বুড়ী, তোর চীৎকার শুনে সিপাহীরা এদিকে এসে পড়বে। বলে, তুই এখন চুপ ক'রে থাক, সন্ধ্যাবেলায় এসে তোর খোঁজ নিয়ে যাবো।

ভূতি বুড়ী তবু কাঁদতে থাকে। স্বরূপ সান্ত্বনা ও তুলসী গঞ্জনা দেয়। তারপরে দুইজনে বলে যে, ভূতি বুড়ী উঠে দরজা বন্ধ কর। কর্তব্যের অনুরোধে ভূতি বুড়ী ওঠে। এক বস্ত্রে বেরিয়ে পড়ে তুলসী।

॥ ৮ ॥

"রোদনে যায় ভেসে গো"

স্বরূপরাম একটু ভুল করেছিল। মীর্জা গালিবের বাড়িতে গুণ্ডারা উপদ্রব করবে না বলে তার ধারণা সত্য নয়। এ কথা ঠিক যে, তাঁর লিখিত গজল লোকের মুখে মুখে ফিরতো; বাদশা থেকে বদমাইশ অবধি সবাই গাইতো গালিবের গজল; পথে-ঘাটে দেখা পেলে সেলাম জানিয়ে বলতো মীর্জা সাহেব; আর খোদ বাদশার সে তো নিত্যকার সঙ্গী। শায়ের জোক অবশ্য ছিল বাদশার কাব্যগুরু, তাঁর মৃত্যুর পরে গালিব গুরুর আসনে বসবার সুযোগ না পেলেও সুহৃদের আসনে বসেছে, এ কথা কারো অবিদিত ছিল না। এত মান-সম্মান সত্ত্বেও গালিবের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। কে টাকা যোগাবে? বাদশা? তিনি নিজেই অন্তভক্ষ্যধনুর্গুণঃ। তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল রামপুরের নবাবের দত্ত বার্ষিক সাড়ে সাত শত টাকা পেন্সন। সেই পেন্সন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তাঁর আর্থিক টানাটানির সূত্রপাত। বড়লাট রামপুরের নবাবকে চাপ দিলে পেন্সনটা ফিরে পাওয়া যেতে পারে ভরসায় পাটনা, মুর্শিদাবাদ হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন গালিব। সে অনেক দিন আগেকার কথা। ১৮২৫ সালে। সেই সময়ে বছর তিনেক ছিলেন কলকাতায়, সিমলা-বাজারে মীর্জা আলীর হাভেলীতে। পেন্সন উদ্ধার হয় নি, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে কলকাতা শহর দেখে কোম্পানীর রাজশী সম্বন্ধে তাঁর ধারণা হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে, শাহ্‌জাহানাবাদ ও দিল্লির মধ্যে কেবল পাঁচশ' ক্রোশের ব্যবধান নয়, দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন যুগের ব্যবধান। সবচেয়ে বেশি ক'রে তাঁর চোখে পড়েছিল, কোম্পানীর শাসনে সবই সচল, সবই ক্ষিপ্র। কোম্পানীর ধোঁয়া-কলের জাহাজ চলে, ফৌজ চলে, আজকে হুকুম বের হ'লে আগামী কাল গিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছয়। তুলনায় বাদশাহী শাসন স্থাণু, স্থাবর, জরাগ্রস্ত। তাই পেন্সন উদ্ধার সম্ভব না হ'লেও একেবারে শূন্য হাতে তিনি ফেরেন নি, সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন নূতন যুগের স্মৃতি। তাই গদর বা বিদ্রোহ যখন বেধে উঠল, অনেকের মতো তিনিও জানতেন, এর শেষ পরিণাম কী। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বর্তমানের মূর্তিভিক্ষ পেয়েই

সুখী। অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনুমান করতে চেষ্টা করে ভবিষ্যতের ঝুলিটাতে না জানি কী আছে! তার আর দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। মীর্জা গালিব সেই দুশ্চিন্তাগ্রস্তদের অন্যতম, ঘোটানার স্রোতে ভাসমান অসহায় তৃণখণ্ড। পুরাতন যুগের অন্নে তিনি মানুষ, নূতন যুগের আভাসে তিনি মুগ্ধ; একই সঙ্গে তিনি বাদশাহ ভক্ত, কোম্পানীর গুণগ্রাহী। এমন মানুষ সুখী হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করে না। কোন পক্ষই বিশ্বাস করে না তাকে। বিদ্রোহের কালে সিপাহী পক্ষ ও কোম্পানী পক্ষ সমান অবিশ্বাস করেছে তাঁকে, বারে বারে উদ্যত হয়েছে অস্ত্র তাঁকে লক্ষ্য ক'রে। নিরপেক্ষ উভয় পক্ষের অস্ত্রের লক্ষ্য।

অভাবের মধ্যে দিন কাটে গালিবের। পত্নী উমরা বেগম বড়ঘরের মেয়ে, অসহ্য হয়ে ওঠে দারিদ্র্য আর অভাব, স্বামীকে এসে বলে, বসে বসে ঐসব হিজিবিজি না লিখে কাজকর্মের চেষ্টা করো।

গালিব কাগজ থেকে মুখ তুলে বলে, "ইশকনে গালিবকো নিকম্মা বনায়া, বর্না হামভি আদমি থে ইক কামকি।"

তারপরে ব্যাখ্যা ক'রে বলে, প্রেমে গালিবকে অকর্মা বানিয়েছে, নইলে সে-ও কাজের লোক।

ব্যাখ্যা শেষে পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে হাসে, ভাঁটার পঙ্কিল জলে প্রতি-বিম্বিত জ্যোৎস্নার মতো সে হাসি বড় ম্লান।

জলে ওঠে উমরা বেগম।

প্রেমে অকর্মা হয়েছেন! হেন দুষ্কর্ম নেই, যা প্রেমের জন্যে করেন নি, কেবল রোজগার করতে বললেই নিকম্মা বনায়া।

উমরা বেগম বর্তুলাকার একটি জীব। সামান্য দু'-চার কথা বললেই হাঁফিয়ে পড়ে, আশ মিটিয়ে ঝগড়া করতে পারে না, বিধাতার বিরুদ্ধে এটি তার একটি অকথিত অভিযোগ। তবে চেষ্টার ত্রুটি নেই। এক শ্রেণীর পটকা যেমন কিছুক্ষণ বাদে বাদে প্রচণ্ড আওয়াজ ক'রে নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, বেগম সাহেবের টেকনিক অনেকটা সেই রকম। দ্বিতীয় দফায় সে আরম্ভ করলো—আর কিছু না পারো, জুয়ো খেললেও তো দু' পয়সা আসে, ঐ ক'রে কতজন বাড়িঘর করলো।

গালিব বললেন, একবার তো গিয়েছিলাম, ধরা পড়ে ছ' মাস কোম্পানীর ফাটকে কাটালাম।

উত্তরটা অতিশয় নির্মম। কেননা, পত্নীর পরোক্ষ প্ররোচনাতেই এগোতে

হয়েছিল গালিবকে। রাগে ফুলতে থাকে পত্নী। একে রঙ তুষারের মতো সাদা, তার আবার অত্যন্ত সুন্দরী, তার উপরে যখন রাগে ফুলে ওঠে, গালিব বলে, বেগম, তোমাকে খুবসুরৎ দেখাচ্ছে. বেগমের মুখে অন্তর্নিহিত হাসির রেখাটি ঠিক যখন ফুটে উঠবার মুখে, গালিব যোগ ক'রে দেয়—হাকিম আসাদুল্লার কাবুলী বেড়ালটার মতো।

কাবুলী' বেড়ালটার মতোই ফ্যাঁ—স্ ক'রে ওঠে উমরা বেগম। কিন্তু আর অধিক ফুলে ওঠবার উপায় নেই, স্ফীতির শেষ প্রান্তে অনেকক্ষণ পৌঁছে গিয়েছে, তাই ক্রোধের প্রেরণা ঠেলে অন্দরমহলের দিকে, নিজের নসিবকে ধিক্কার দিতে দিতে সবেগে চলে যায় সে। ভাবে, লোকটা এমন পাষণ্ড যে একটু রাগ করে না; এমন শঠ যে একটু ঝগড়া করে না। স্বামী জীবিত থাকতেও যে স্ত্রীকে একতরফা ঝগড়া করতে হয়, তার মতো হতভাগ্য আর কে! স্বামীর ঐ তো শেষ সার্থকতা। পত্নী চলে গেলে বাঁ হাতে তাল ঠুকতে ঠুকতে আবার লিখতে থাকে—যেন মাঝখানে কিছুই ঘটে নি।

লোকে কিন্তু বিশ্বাস করে না মীর্জা সাহেবের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা। তিনি যখন পথে বের হন, লোকে দেখে, শীতকালে গায়ে দামী পশমী পোশাক, গ্রীষ্ম-কালে দামী রেশমী পোশাক, নিত্য বাদশাহের সঙ্গে ভেট—দারিদ্র্য ওঁর কৃপণতার ছদ্মবেশ। ধনী লোকেই তো কৃপণ হয়। পাওনাদার তাগিদ দিতে এলে মীর্জা সাহেব নূতন গজল শোনান। লোকে মুগ্ধ হয়ে ফিরে যায় —টাকা আর আদায় করা হয় না। পাওনাদার যখন অনুযোগের সুরে বলে, মীর্জা সাহেব, আপনার এত টাকা, আমার মতো গরিবের টাকা ক'টা ফেলে দিলেই হয়।

গালিব হেসে বলেন, পাওনা চুকিয়ে দিলেই তো আর আমার গরিবখানায় তোমার দেখা পাওয়া যাবে না।

ভূয়োদর্শীদের উপদেশ এই যে, সব অপবাদের প্রতিবাদ করবে, একমাত্র ব্যতিক্রম ধনাপবাদ। লোকের বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে এই যে, মীর্জা গালিব সাহেব একজন ধনী ব্যক্তি।

এইখানেই ভুল হয়েছিল স্বরূপের, সে ভেবেছিল, মীর্জা সাহেবের মতো সম্ভ্রান্ত নাগরিকের বাড়িতে কেউ হামলা করতে সাহস করবে না। কিন্তু সে কি ক'রে জানবে যে, ভোর বেলাতেই দুবার গুণ্ডারা এসে দরজা ধাক্কিয়ে টাকা দাবি করেছিল। গালিব অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের বিদায় ক'রে দিয়েছিল। তৃতীয়বার যখন দরজায় ধাক্কা পড়লো, গালিব ভাবলো, নাঃ,

আজ আর রক্ষা নেই। দরজা খুলতেই হবে, নইলে দরজা ভেঙে ফেলবে।
এবারে দরজা খুলে সে অবাক হয়ে গেল। এ কী, স্বরূপরাম আর তুলসী যে!
বলে উঠল, স্বরূপজী, তুলসীমাঈ, কি ব্যাপার? এসো, এসো, ভিতরে এসো।

স্বরূপ বলল, মীর্জা সাহেব, বিপদে পড়ে আপনার আশ্রয়ে তুলসীকে নিয়ে এলাম।

এই বলে তুলসীকে আনবার কারণ সবিস্তারে বর্ণনা করলো। বলল, বাড়িতে কেউ নেই, পণ্ডিতজী আর নয়ন কোথাও গিয়ে নিশ্চয় আটকা পড়েছেন, গুণ্ডারা ঢুকে অত্যাচার করতে কতক্ষণ!

গালিব সব শুনে বলল, খুব ভালো করেছ, এখানে বেগম সাহেবার সঙ্গে নিরাপদে থাকবে, কোন অসুবিধা হবে না।

এখানেও যে গুণ্ডারা হানা দিয়ে গিয়েছে, সে কথাটা আর বলল না।

তারপরে স্বরূপকে বলল, তুমি এখানে বসো, তুলসীমাঈকে আমি বেগম সাহেবের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।

তুলসীর দিকে তাকিয়ে বলল, চলো মাঈ, আমার গরিবখানা দেখবে চলো।

দুইজনে ভিতরে চলে গেলো। যাওয়ার আগে তুলসী বলল, স্বরূপদাদা, আমাকে কখন নিয়ে যাবে?

শহরের অবস্থা একটু শান্ত হ'লেই সন্ধ্যার দিকে এসে নিয়ে যাবো।

বেশী দেরি ক'রো না। বাড়ি ফিরে আমাকে না দেখলে বাবা দুশ্চিন্তা করবেন, দাদা রাগারাগি করবেন।

কোন ভয় নেই রে, আমি সব বুঝিয়ে বলবো।

ওরা চলে যায়। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসে গালিব।

স্বরূপ উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ক'রে বলল, এখন যাই সাহেব, সন্ধ্যার দিকে আবার আসবো।

অবশ্যই আসবে, তুলসীর জন্তে দুশ্চিন্তা ক'রো না।

আপনার বাড়ির চেয়ে নিরাপদ স্থান আর কোথায় পাবে ও! চললাম এখন সাহেব।

আর এক দফা সেলাম ক'রে চলে যায় স্বরূপ। গালিব ভাবে, স্বরূপের বিশ্বাস সত্য হোক, আমার বাড়ি নিরাপদ হোক তুলসীর পক্ষে।

বিকালের দিকে আবার দরজায় ঘা পড়ে। গালিব দরজা খুলে দেখে, অনেক ক'টি লোক, হাতে লাঠি, বল্লম, সড়কি, গোটা-দুই বন্দুকও আছে। গালিব

বোঝে, আবার টাকার খোঁজে এসেছে। বলে, বাপু হে, আমি গরিব শায়ের মানুষ, টাকাকড়ি কোথায় আমার ঘরে ?

দলের একজন বলে ওঠে, আপনার কোঠিতে মেমসাহেব লুকিয়ে আছে, খবর পেয়েছি।

হো-হো শব্দে হেসে ওঠে গালিব।

মেমসাহেব লুকিয়ে আছে আমার কোঠিতে, তা এ খবর কে দিল ?

দলের পাণ্ডা জব্বর খাঁ। সে লাঠি ঠুকে বলে, আমরা কি নিমকহারামি করবো তার নাম বলে ? আমরা আপনার কোঠি তালাশ করবো।

সে তো তোমাদের মতোই কাজ। কিন্তু আমার বিবি যে পর্দানশিন !

গদরের সময়ে পর্দা বেপর্দা হয়ে গিয়েছে। বিবি বাইরে না এলে আমরা ভিতরে যাবো, বলে জব্বর খাঁ।

তোমাদের কষ্ট করতে হবে না, আমিই আনছি। ভিতরে গিয়ে নিয়ে আসেন উমরা বেগম আর তুলসীবাঈকে।

তুলসীর দুধে-আলতায় রঙ আর সুঠাম দেহ দেখে সকলে বিস্ময়ে একবাক্যে চীৎকার ক'রে ওঠে, এহি তো মেমসাহেব হায় !

এবারে বিস্মিত হওয়ার পালা গালিবের। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটলে বলেন, মেমসাহেব বুঝলে কি ক'রে ?

গায়ের রঙ।

কেন বাপু, আমার বিবির রঙটাও তো মন্দ নয়। তবে ?

আপনার বিবিকে তো আমরা জানি।

একেও জানো। তুলসীবাঈ, সুখানন্দ পণ্ডিতের মেয়ে।

তার তো প্রমাণ নেই।

প্রমাণ আছে বৈকি। মেমসাহেব কি ঘাগরা পরে ?

লুকোতে হ'লে ঘাগরা না পরে উপায় কি ?

গালিব বলেন, তুলসীবাঈ, একবার কথা বলো তো ?

তুলসী বলে ওঠে, তোমরা গালিব সাহেবের মতো রইস আদমির বাড়িতে কেন মিছে হল্লা করছ ?

গালিব বলেন, মেমসাহেব কি এমন হিন্দুস্থানী বলতে পারে ?

ওরা আর্দালী শাসিয়ে হিন্দুস্থানী শিখে নেয় তারা।

আর একজন বলে ওঠে, ইংরাজী যে জানে না তা প্রমাণ হ'ল না তো।

জব্বর খাঁ বলে ওঠে, মেমসাহেব না হ'লে কোন ভয় নেই, ছেড়ে দেবো

আমরা। এখন আমাদের উপরে হুকুম, মেমসাহেব বলে সন্দেহ হ'লেই পাকড়ে নিয়ে আসতে হবে।

কার হুকুম? শুধায় গালিব।

সিপাহ্‌সালার সাহেবের।

সিপাহ্‌সালার আবার কে হ'ল?

শাহ্‌জাদা মীর্জা মুঘল সাহেব।

কি হুকুম?

শহরের সব সাহেব মেম গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে জড়ো করতে হবে লালকেল্লায়।

যখন গালিব আর জব্বর খাঁর মধ্যে প্রশ্নোত্তর চলছিল, দলের অন্য লোক নিষ্ক্রিয় ছিল না। ঘরের মধ্যে সামান্য যে দু'চারখানা আসবাব ছিল, তারা সংগ্রহ ক'রে নিচ্ছিল। তুলসী বুঝলো, এরকম অসহায়ভাবে ঘটনাকে আর গড়াতে দেওয়া উচিত হবে না। শেষ পর্যন্ত তাকে তো যেতেই হবে, গালিবেরও যথাসর্বস্ব যাবে। তাই সে স্পষ্ট আদেশের স্বরে বলে উঠল, মেমসাহেব কি হেঁটে যাবে নাকি? যাও, শীগ্‌গীর তাঞ্জাম নিয়ে এসো উল্লু।

একজন বলে উঠল, নাঃ, মেমসাহেব না হয়ে যায় না।

কি ক'রে বুঝলে ভাই লকড় সিং?

দেখলে না, কেমন গাল দিয়ে কথা বলল! ওদের কাছে অনেক দিন কাজ করেছি কিনা। সাহেবরা দেয় লাথি, মেমসাহেবরা দেয় গাল আর মিসিবাবারা-দেয় চিমটি। নাঃ, এ মেমসাহেব নিশ্চয়ই।

সত্য সত্যই একখানা তাঞ্জাম যোগাড় ক'রে আনে দলের লোক।

তুলসীবাঈ বলে, আমার জন্যে ভাববেন না মীর্জাসাহেব। এই বদমাশদের সাধ্য কি, আমার গায়ে হাত দেয়। আর যত তাড়াতাড়ি পারেন আমার বাড়িতে একটা খবর পাঠাবেন, সেই সঙ্গে স্বরূপদাদাকেও। সেলাম বেগম-সাহেবা, সেলাম মীর্জা সাহেব।

এই বলে সপ্রতিভ ভাবে এগিয়ে গিয়ে তাঞ্জামে চেপে বসে, তারপরে হুকুম করে, নে, ওঠা উল্লু।

উমরা বেগম এতক্ষণ একটিও কথা বলে নি, এখনো কথা বলল না, ধীরপদে অন্দরের দিকে চলে গেল। মীর্জা সাহেব মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলো; দুঃখে ও বিস্ময়ে তার মন ভারাক্রান্ত। দুঃখ—আশ্রিতকে রক্ষা করতে পারলো না; বিস্ময়—তুষারপুত্তলী তুলসী এত তেজ পেলো কোথায়? গালিবের মতো কবির জানা উচিত, অতল সমুদ্রে অগ্নি, কোমল মেঘে বজ্র, শীতল তুষারে তাপ,

কঠিন কিরীচে নমনীয়তা—প্রকৃতির বিচিত্র বিধান।

কখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে জানতেও পারে নি গালিব, আলো জালবার কথা কারো মনে হয় নি। বাড়ির চাকরটা হয়তো লুটেরার দলে যোগ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গালিব সম্বিৎ পেলেন স্বরূপের কণ্ঠস্বরে—এ কি, ঘর যে অন্ধকার!

সত্যিই আজ আমার ঘর আঁধার। বলে কপাল চাপড়ে ডুকরে ওঠে বৃদ্ধ মীর্জা সাহেব।

অজানা আতঙ্কে কেঁপে ওঠে স্বরূপের বুক। অসুখবিসুখ, না আর কিছু?

কী হ'ল সাহেব?

তখন কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে গালিব আত্মন্ত বর্ণনা করে। সমস্ত বলা শেষ হয়ে গেলে আবার কেঁদে ওঠে, আমি না-লায়েক, আমি তুলসীমায়ীকে রক্ষা করতে পারলাম না।

স্বরূপ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, মিছে দুঃখ করবেন না মীর্জা সাহেব। আজকের এই গদরের দিনে কে কাকে রক্ষা করবে! খোদ বাদশা আজ না-লায়েক, অসহায়।

আচ্ছা, চললাম। বলে উঠে দাঁড়ায় স্বরূপ।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খবরটা পৌঁছে দিয়ো পণ্ডিতজীর বাড়িতে—

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই স্বরূপ বেরিয়ে চলে যায়।

॥ ৯ ॥

বিবি ভারি তেজী

পূর্বোক্ত ঘটনার পরের দিনের কথা। লালকেল্লার ছাত্তা বাজার (Covered Bazar) আর নৌবৎখানার মধ্যে দীঘির উত্তর দিকে যে প্রকাণ্ড পিপল গাছ আছে তার তলাতে হাসান আকসারি তার সুপরিচিত আঁকা-বাঁকা লাঠিখানা মাথার উপরে ঘোরাতে ঘোরাতে উদ্দণ্ড নৃত্য করছে, মাথার লম্বা টুপিটা লটপট করছে, দরবেশী আলখাল্লা নাচের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে বারে বারে দুই পায়ে জড়িয়ে ধরছে—আর চত্বরের মধ্যে জমায়েত জনতা ভয়ে ও কৌতূহলে শুনতে পাচ্ছে আকসারির চেরা কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত—অয়ে বচ্চে, বরম-পিশাচকো খুন পিলাও, অয়ে বচ্চে বরম-পিশাচকো খুন পিলাও।

সকালবেলা থেকেই এই উদ্দণ্ড নৃত্য শুরু হয়েছে, তখনো একটিও প্রাণী

জাগে নি নৌবৎখানায়। বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে, তার কণ্ঠস্বরেই প্রথমে লোকজন জেগে উঠলো, তারপরে একে একে এসে সমবেত হ'ল লালদীঘির চত্বরে। জনতার মধ্যে যারা আকসারির মূর্ছার ইতিহাস জানতো তারা অন্যদের বোঝাতে শুরু করলো, এই গাছে আছে এক বরম-দেও বা বরম-পিশাচ, আকসারিকে মূর্ছাকালে হুকুম করেছে, খুন দিয়ে তার তিয়াস মেটাতে হবে। নতুবা—। নতুবা কি হবে কেউ শুনতে চায় না, কেননা তৃষিত বরম-পিচাশের অসাধ্য বা অকরণীয় কিছুই নাই। বক্তাও স্বস্তি পায়, কেননা, নতুবা কি হবে, সেদিন আকসারি খুলে বলে নি। এ পর্যন্ত বক্তায় ও শ্রোতায় মিলে যায়, তারপরেই দেখা দেয় সমস্যা, এতখানি খুন মিলবে কোথায়? সামান্য এক গণ্ডুষ রক্তে তো বরম-পিশাচের তিয়াস মিটবার নয়।

করিম খাঁ বাদশার পিলখানার হেড মাহুত, সে বলল, ভাই, আজ তিন দিন শহরে এত খুনজখম হ'ল, তাতেও তিয়াস মিটল না বরম-পিশাচের! এ কি রকম তিয়াস? একটু নড়ে-চড়ে খেলেই তো পেট ফুলে ঢোল হয়ে যেতো।

তরকিলাল খাঁটি কনৌজী ব্রাহ্মণ। কাজেই নিজে ও ব্রহ্মপিশাচ এক বর্গের অন্তর্গত, জীবিত ও মৃতে যে সামান্য প্রভেদ তা অবশ্যই একদিন লোপ পাবে। তবে ব্রহ্ম-পিশাচের মতিগতি তার যেমন জানবার কথা এসব আর কারো নয়। অভিজ্ঞমনোচিত মর্মজ্ঞ হাসি হেসে বলল, এসব হিন্দুশাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব, তোমরা কিছুই জানো না।

তারপরে গলা খাটো ক'রে বলল, তোমরা যাকে বরম-পিশাচ বলছ, শাস্ত্রে তার নাম ব্রহ্মদৈত্য। উনি বড় মানী প্রেত, নড়ে-চড়ে খাওয়া ওঁর অভ্যাস নয়। ওঁর যেখানে বাস সেখানে তিয়াস, সেখানেই তিয়াস মেটাতে হবে। আর যদি স্বেচ্ছায় না মেটাও তবে উনি নিজে—

করিম উপস্থিত অনেকের মুখপাত্ররূপে বলে উঠল, উনি নিশ্চয় মুসলমানের খুন ছোঁবেন না?

তরকিলাল বলে, বমর-পিশাচের কাছে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই।

করিম খাঁ কথায় পটু, বলে, ব্রাহ্মণের কাছে তো আছে।

তরকিলাল নাকি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, সেও কম যায় না, সে বলে ওঠে, বরম-পিশাচ হ'লে এ সামান্য ভেদবুদ্ধি আর থাকে না।

উপস্থিত হিন্দু-মুসলমান সকলেই শঙ্কা অনুভব করে। তখন একজন বলে ওঠে, আর কিরিস্তীর খুন?

শাস্ত্রজ্ঞ তরকিলাল বলে, ও ভি আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা। এমন সময় জন-দুই

চীৎকার ক'রে ওঠে, ঐ ত্যাখো—

ক্রমে নিদারুণ সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। নৌবৎখানার দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে সশস্ত্র প্রহরাধীন কোমরে-দড়ি হাত-বাঁধা অবস্থায় একদল ইংরেজ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, শিশু। অনাহারে ক্ষীণ, অত্যাচারে জীর্ণ, প্রাণভয়ে মলিন, ছিন্ন বেশ, রুক্ষ কেশ, বিপর্যস্ত কোম্পানীর বিদলিত প্রতিনিধিগণ। সবশেষে ঢুকলো ঐ একই অবস্থায় তুলসীবাঈ। এদেরই আজ ক'দিন ধরে মহল্লায় মহল্লায় তল্লাশি ক'রে সংগ্রহ করেছে সিপাহীরা। আর নেই, তাই আজ সব জুটিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে কয়েদখানা থেকে।

বন্দীদের আসতে দেখেই দ্বিগুণ উৎসাহে চেঁচিয়ে ওঠে আকসারি। বরম-পিশাচকো খুন পিলাও, বচ্চে, বরম-পিশাচকো খুন পিলাও।

তারপর গাছের দিকে তাকিয়ে অদৃশ্য সত্তার সঙ্গে কথা বলে। অদৃশ্য সত্তার অশ্রুত উত্তর আকসারির কথা থেকেই অনায়াসে বুঝে নেওয়া যায়। মিলেগা, মিলেগা, বহুৎ খুন মিলেগা, তাজা খুন, গরম খুন। কোইভি বাঁচেগা নেহি। মর্দানা জেনানা লেড়কী লেড়কা সব তুম্হারা ওয়াস্তে।

সকলে বোঝে, আকসারি মস্ত জান। সকলে, কেবল বন্দীরা ছাড়া। দীঘির ধারে পৌঁছেই তারা বসে পড়ে। এতক্ষণে তারা বুঝতে পেরেছে তাদের নিদারুণ পরিণাম। তাদের যখন গ্রেপ্তার ক'রে লালকেল্লায় নিয়ে আসা হয়, বোঝানো হয়েছিল যে, ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই নিরাপদ স্থানে তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, খোদ বাদশার এইরকম হুকুম। কথাটা কারো অবিশ্বাস হয় নি। সকলেরই মনে বিশ্বাস ছিল, বাদশা এইসব খুনজখম লুটতরাজের মধ্যে নেই, এ গুণ্ডাদের কাজ। সহজেই তারা রাজী হয়েছিল, ভেবেছিল, লালকেল্লায় বাদশাহের হেপাজতে এসে প্রাণে বেঁচে যাবে। কেল্লার মধ্যে একটা অন্ধকার নোংরা গুদামঘরে তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, খাদ্য নামে মাত্র। কেউ আপত্তি তুললে অন্যরা তাদের বুঝিয়েছিল, এ নিয়ে গোলযোগ করা উচিত হবে না, অরাজকতার সময়ে এমন হয়েই থাকে। তা ছাড়া, নিচু স্বরে বলতো, তা ছাড়া বাদশা এত পারবেনই বা কোথায়? তাঁর অবস্থা তো আগের মতো নেই। মোট কথা, আশা ছিল বলেই কালো মেঘে সোনার পাড় দেখছিল। আজ সকালে যখন তাদের বেঁধে সারবন্দীভাবে নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন কুহকিনী আশা পাখা মেলে দিলো, আর যখন তারা এসে পৌঁছল দীঘির ধারে তখন অনেকক্ষণ কুহকিনীর শেষ চিহ্নটুকু মিলিয়ে গিয়েছে আকাশের প্রান্তে। প্রাণের আশা যতক্ষণ থাকে

ততক্ষণ প্রাণের ভয়। আশা যেতেই ভয় গেল, ভয় যেতেই সব মরীয়া হয়ে উঠল।

জোন্‌স্ ম্যাজিস্ট্রেটের পার্সোনাল অ্যাসিস্টাণ্ট ছিল, প্রকাণ্ড চেহারার সবল পুরুষ। সে লাফিয়ে উঠে বলল, আমি বাদশার সঙ্গে ভেট করতে চাই।

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল মীর্জা মুঘল। সে বলল, আমি বাদশার সিপাহ্‌সালার, যা বলবার আমাকে বলো।

কথা ইংরেজীতেই হচ্ছিল। মীর্জা মুঘল ইংরাজী জানতো, শাহ্‌জাদাদের অনেকেই ইংরেজী জানতো।

জোন্‌স্ বলল, বেশ, তবে তুমিই শোন। আমাদের এভাবে কয়েদ ক'রে রাখবার কী অধিকার তোমাদের আছে?

মীর্জা মুঘল বলল, কয়েদ করা হয় নি, ক্ষিপ্ত জনতার ক্রোধ থেকে তোমাদের রক্ষা করা হয়েছে।

ক্ষিপ্ত জনতা! তোমরাই তো জনতাকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছ!

জনতাকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছে কোম্পানীর শয়তানি।

এসব বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে তকরার করতে চাই না। এখন আমাদের মুক্তি দাও।

জনতা যদি আক্রমণ করে?

জোন্‌স্ বলে, আমরা আত্মরক্ষা করতে জানি।

এত লোকের সঙ্গে পারবে কি?

বেশ পারবো জানো, তাই হাত-পা বেঁধে অসহায় ক'রে রেখেছ।

মীর্জা মুঘলের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মীর্জা আবুবকর্, বাদশার নাতি। সে ফার্সীতে বলল, শাহ্‌জাদা, ফিরিঙ্গীর সঙ্গে তর্ক ক'রো না, পেরে উঠবে না, আমি অনেকবার ঠকে গিয়েছি।

জোন্‌স্ বলল, যা বলবার ইংরেজিতে বলো না। বন্দীকে এত ভয় কিসের?

চোপ্ রও হারামজাদা! বলে আবুবকর্, হাতের ছড়ি দিয়ে এক ঘা মারলো জোন্‌সের পিঠে।

আঃ, কি করছ!—বলে মীর্জা মুঘল তাকে টেনে নিয়ে গেল অন্যত্র।

তা বটে, যা করবার জনতা করুক, আমরা নেই এর মধ্যে। বলতে বলতে আবুবকর্ চলল মীর্জা মুঘলের সঙ্গে।

মীর্জা মুঘল তাকে ফার্সীতে বোঝাতে লাগলো, আবুবকর্, তুমি একটি আস্ত গোঁয়ার। বন্দীকে শাহজাদারা কখনো নিজ হাতে আঘাত করে?

ওতে তাদেরই অপমান।

আবুবকর্ বলে, ঠিক কথা বলেছ, আমাদের হাত-পা সৈন্যসামন্ত।

নিশ্চয়। আর এখানে যত লোক দেখছ সমস্তই শাহী সিপাহী। উর্দি পোশাক খুলে নিয়ে তাদের জনতার বেশ দেওয়া হয়েছে। এখন তারা যদি একটা কিছু ক'রে বসে সেজন্যে কি দায়ী সিপাহীরা? না সিপাহ্‌সালার?

বাদশা যদি গোসা হন?

বাদশার চোখকান আমরা—শাহ্‌জাদারা। যা বোঝাবো, তিনি তাই বুঝবেন। তারপরে তিনি দস্তখৎ ক'রেই খালাস।

বন্দীদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী জোন্‌স্‌। তার এই দশা দেখে বন্দীরা বুঝলো আর উচ্চবাচ্য করলে আসন্ন মৃত্যুকে দুর্বহতর ক'রে তুলবে অপমান। ঘাতকের কুঠারের চেয়ে ছড়ির আঘাত অনেক বেশি দুঃসহ। বন্দীদের অনেকে শুয়ে পড়েছিল, অনেকে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা দিয়ে বসে রইলো। নিতান্ত শিশুরা অবধি নিঃশব্দ।

শাহজাদারা ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। একটি বন্দী কিশোরীকে ভালো ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে মীর্জা মুঘল বলল, তোমাকে তো হিন্দুস্থানী বলে মনে হচ্ছে।

তুলসীবাঈ দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম ক'রে বলল, শাহজাদার চোখ ভুল করে নি, আমি সুখানন্দ পণ্ডিতের মেয়ে। গালিব সাহেবের বাড়ি থেকে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে।

সেখানে গিয়েছিলে কেন?

সিপাহীদের ভয়ে লুকিয়েছিলাম।

আবুবকর্ বলে ওঠে, আশমানের চাঁদ কি শায়েরের পোঁথির মধ্যে লুকনো যায়?

তোমাকে আনলো কেন?

যারা এনেছে তাদের জিজ্ঞাসা করুন। আমি কি ক'রে জানবো?

আবুবকর্ বলে ওঠে, বিবির যে খুবসুরৎ চেহারা, মেমসাহেব বলে ভুল ক'রে এনেছে।

তুলসী ঘৃণায় উত্তর দেয় না।

মীর্জা মুঘল বলে, তুমি সুখানন্দ পণ্ডিতের মেয়ে? বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

তা হ'লে আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিন।

কোথায় যাবে?

বাড়িতে।

বাড়ি যদি নিরাপদ তবে লুকোতে গিয়েছিলে কেন ?

তবে গালিব সাহেবের বাড়িতেই পাঠিয়ে দিন।

সেখান থেকেই তো ধরে এনেছিল।

তুলসী বলে, সিপাহীদের বলে দিন, আর যাতে ধরে না আনে।

বিবি, সিপাহী তো একটি আধটি নয়।

তখন আবুবকর্ বলে, অত বখেরায় কাজ কি! বিবি, তুমি আমার গরীবখানায় চলো, বেশ আয়েসে থাকবে।

তুলসী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, তার চেয়ে হাত-পা বেঁধে ঐ তলাওর মধ্যে ফেলে দিন না।

বিস্মিত আবুবকর্ বলে, বিবি ভারি তেজী। বাহবা! বাহবা!

মীর্জা মুঘলও কৌতুকমিশ্রিত বিস্ময় অনুভব করে, এক রত্তি মেয়ে শাহ্‌জাদাদের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলে যাচ্ছে। একে মেমসাহেব বলে ভুল ক'রে অন্যায় করে নি।

মীর্জা মুঘল বলে, বিবি, আমি বলি কি, তুমি ক'দিন এখন বেগম জিনৎ মহল সাহেবার কাছে গিয়ে থাকো, তারপরে হাঙ্গামা মিটে গেলে বাড়ি ফিরে যেয়ো।

তুলসী বলল, বেগমসাহেবা মস্ত লোক, তাঁর কাছে আমার পোষাবে না।

বেশ, বলো কোথায় পোষাবে, সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তুলসী একটু ভেবে বলল, শাহজাদা, আমাকে ইমানী বেগমের বাড়িতে পাঠিয়ে দিন।

তাঁকে চেনো ?

আমি সামান্য লোক, কেমন ক'রে চিনবো ? তবে শুনেছি, গরিব-দুঃখীর উপরে তাঁর নেকনজর আছে।

বেশ, সেই ব্যবস্থাই ক'রে দিচ্ছি। বলে মীর্জা মুঘল একজনকে হুকুম করলেন এই বিবিকে এখনি তাঞ্জামে ক'রে ইমানী বেগমের কোঠিতে পৌঁছে দিয়ে এসো।

মীর্জা মুঘলকে সেলাম ক'রে তুলসী গিয়ে তাঞ্জামে ওঠে। তাঞ্জাম চলতে শুরু করলে হতাশ আবুবকর্ ছড়ি দিয়ে মাটিতে তাল ঠুকতে ঠুকতে গান ধরে—

"বাবুল মোরা নৈহারে ছুট যায়

চায় কাহারবা মোরে তোলিয়া লাজায়
আপনা বেগানা ছুট যায়।”

মীর্জা মুঘল বলল, আবুবকর্, চলো আমরা অন্যত্র যাই। এখানে আর আমাদের দরকার নেই।

বলো কি শাহ্জাদা, আসল ব্যাপারটাই দেখা হ'ল না।

মীর্জা মুঘল উত্তর দেয় না, নৌবৎখানা পেরিয়ে দ্রুত ভিতরে চলে যায়।

করিম খাঁ এসে বন্দীদের বলে, তোমাদের মধ্যে কেউ দীন কবুল করলে খালাস পাবে, বাদশার হুকুম।

একটি ইংরাজ মহিলা অন্তঃসত্বা ছিল, কেবল সে রাজি হ'ল, আর কেউ সম্মত হ'ল না!

বিকালবেলা মুর্দাফরাস এসে লাশ সংগ্রহ ক'রে দশখানা বয়েল গাড়ি বোঝাই করলো। ঘটনা শুনে বাদশাহ রাগে ক্ষোভে লজ্জায় একাকী বসে চুল ছিঁড়তে লাগলেন। কেউ দেখলো না, সবাই গিয়েছিল মৃতদেহের সোনা-দানা লুট করতে। তারপরে বাদশা হুকুম করলেন, লাশ যেন খ্রিস্তানী গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। কেউ শুনলো না, সবাই গিয়েছিল মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখতে। অন্ধকার নির্জন প্রাসাদে নিঃসঙ্গ বাদশা বসে কপাল চাপড়াতে লাগলেন। এসা হায় দুনিয়াদারি।

॥ ১০ ॥

বাদশা ও বেগম

রঙমহলের নিভৃত কক্ষে জরির কাজ করা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বাদশার ছোট বেগম জিনৎমহল মুক্তোর ঝালর-দেওয়া সোনার মুখনলে তামাকু সেবন করছিলেন। জিনৎমহল বেগম, বয়সে সকল বেগমের ছোট বলেই আদরে সকলের উপরে। বয়স ও আদর প্রায় সব ক্ষেত্রেই উল্টো চালে চলে। পাশে বসে একজন বাঁদী সাদির গুলিস্তান পাঠ করছিল। বেগমের সেদিকে মন ছিল না। এমন সময়ে করিমন বিবি কুর্নিশ ক'রে এসে দাঁড়ালো। জিনৎমহল মুখ তুলে চাইলেন। করিমন জানালো, হাকিম সাহেব অপেক্ষা করছেন। বেগম বললেন, নিয়ে এসো। বাঁদী গুলিস্তান নিয়ে উঠে চলে গেল। সোনালি ফুলতোলা মখমলের ভারি পর্দা ঠেলে প্রবেশ করলো হাকিম আসাদুল্লা।

কুর্নিশ ক'রে দাঁড়ালো নতমুখে। বেগম বললেন, বসুন হাকিম সাহেব। তখন হাকিম সাহেব মসনদের উপরে পা-মুড়ে বেগম সাহেবার পায়ের কাছে বসলো। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। ঘটনায় এমন জটিল গ্রন্থি পড়ে গিয়েছে যে কোথা থেকে খেই ধরতে হবে, কেউ বুঝতে পারছে না। অবশেষে কুণ্ঠিত নীরবতা ভঙ্গ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—হাকিম সাহেব, ব্যাপারটা কি হ'ল বলুন দেখি।

আসানুল্লা উত্তর না দিয়ে হাতখানা একবার কপালে ঠেকালো, ঠোঁট দুটো ঈষৎ নড়ল, মনে হ'ল বলল—নসীব।

আসানুল্লার নীরবতায় বেগম খুশী হতে পারলেন না, বললেন, তাও কিনা হ'ল আবার কিল্লা মুবারকের (লালকেল্লার অন্য নাম) মধ্যে। বাদশার অপরাধ অস্বীকার করবার আর পথ রইলো না।

কিছুক্ষণ আগে খোদ বাদশাও ডাকিয়ে এনে হাকিমকে ঠিক ঐ কথাগুলোই বলেছিলেন। বলেছিলেন, এমনভাবে লাল রশি দিয়ে আমাকে অসহায় ভাবে বেঁধে ফেলবার উদ্দেশ্য কি ?

হাকিম সাহেব প্রবীণ দরবারী, কোথায় কি বলতে হয় জানে। বাদশার সঙ্গে বাদানুবাদ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিল, তিনি যা [illegible] ব্যাপারটা সেইরকমই বটে, তবে হাকিম এর কিছুই জানতো না, আর এই খুনজখমের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই।

বাদশা বলেছিলেন, হাকিম সাহেব আপনি দিল্লির কোতোয়াল, আপনার মুখে একথা সাজে না। তাছাড়া বাইরের লোকে তো আপনাকে জানে, না, জানে আমাকে। তারা যে আমাকে দায়ী করবে। বাদশার কিল্লার মধ্যে বাদশার নামে একটা পৈশাচিক কাণ্ড ঘটে গেল, বাদশা কি মরেছে ?

হাকিম মনে মনে ভাবে, তার আর বাকি কি! কিন্তু আসল কথা তো প্রকাশ করা চলে না, আসল কথা প্রকাশ করতে গেলে শাহ্‌জাদাদের নাম করতে হয়। সে জানে শাহ্‌জাদাদের উপরে বাদশা খুশী নন; তাই বলে তাদের নামে অভিযোগেও নিশ্চয় খুশী হবেন না বাদশা। আরও বলতে হয় যে, মীরাটী ফৌজদের হাতে রাখবার জন্যেই কাণ্ডটি ঘটানো হয়েছে। কি বলবে সে! এদিক ওদিক যেদিকেই যাক না কেন সমান বিপদ। তাই সেই মধ্যপন্থা অবলম্বন ক'রে নীরব হয়ে রইলো। অবস্থা-বিশেষে নীরবতাই পারিষদদের শ্রেষ্ঠ সহায়।

কোনরকমে বাদশার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে বাড়িতে এসে পৌঁছবামাত্র

বেগম সাহেবার তুরুক সওয়ার এসে পৌঁছলো—এখনি যেতে হবে। হাকিম এই দু'দিনেই বুঝে নিয়েছে তার প্রাণটাও নিরাপদ নয়, সিপাহীদের—কাজেই শাহ্জাদাদের সন্দেভাজন ব্যক্তি সে। এমন ঘনায়মান সঙ্কটের মধ্যেও তার রসজ্ঞান একেবারে লোপ পায় নি, ভাবলো, সন্দেহের একমাত্র পাত্র সে নিজেই নয়, বাদশা বেগম কোতোয়াল সকলেই। ভাবলো, মন্দ মজা হবে না, এক সঙ্গে মরলে ওপারে গিয়ে আবার দরবার বসানো যাবে, ফ্রেজার, ডগলাসদেরও পাওয়া যাবে। কিন্তু ভাববার সময় বেশি নেই—দরজায় দাঁড়িয়ে বেগমের সওয়ার। আবার না বেগমের সন্দেহের পাত্র হ'তে হয়। হ'লও বুঝি তাই। কেন না বেগম সাহেবাও বাদশার ভাষাতেই প্রশ্ন শুরু করলেন—হাকিম সাহেব, আমাদের জড়িয়ে ফেলে কোম্পানির সঙ্গে আপসের পথ বন্ধ করতে যারা চায়, তাদের নাম আমি জানি।

হাকিম মনে মনে বলে, জানলেও প্রকাশ করবার সাহস নেই। তাই যত তম্বি এই অসহায় গোলামের উপরে।

অনেক ঠেকে ঠেকে হাকিম শিখেছে যে, পুরুষের সঙ্গে তর্ক করা চলে, এমন কি সে পুরুষ যদি খোদ বাদশা হন, তবু চলে। কিন্তু তর্ক চলবে না মেয়েদের সঙ্গে, বেগম দূরে থাক বাঁদীটার সঙ্গেও চলবে না। মেয়েরা যুক্তি-কানা। সে আরও বুঝলো যে, বেগম সাহেবা কিছু আশ্বাস চান। ভালো, আশ্বাসই দেবে সে। তাই প্রকাশ্যে বলল, বেগম সাহেবা, আপনি ভয় করবেন না, এ সব এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে।

আলবোলার নল ফেলে দিয়ে এবারে সোজা হয়ে বসেন জিনৎমহল, বলেন, কার ফুঁয়ে কে উড়ে যাবে বলতে পারেন, হাকিম সাহেব।

তারপরে একটু থেমে আবার বলেন, আর ভয়! আমীর তৈমুরের বংশে ভয় পায় এমন স্ত্রী-পুরুষ এখনো জন্মে নি।

হাকিম ভাবে, হা আল্লা, আজ এ কী বিপাকে ফেললে? স্ত্রীলোকের যুক্তি কাঁকড়ার চালের মতো পাশের দিকে চলে—তার সঙ্গে পেরে উঠবার উপায় কী। কিন্তু আর তো চুপ ক'রে থাকলে চলে না, কিছু বলা আবশ্যক, নতুবা দোষ স্বীকার ক'রে নেওয়ার মতো দেখাবে। তাই হাকিম বলল—কোম্পানীর এক ফুঁয়ে আসমানের মেঘ উড়ে যাবে। বাদশার হুকুমে সব খবর নিয়ে আগ্রায় ছোট লাটের কাছে উটের সওয়ার পাঠানো হয়েছে। কোম্পানীর ফৌজ এসে পড়লো বলে।

আবার বাদশাকে এর মধ্যে জড়ানো হচ্ছে। বলুন না কেন, আপনি

পাঠিয়েছেন।

আমার একটা ঘাড়ে একটিই মাথা। বাদশাকে না জানিয়ে এমন কাজ করতে পারি!

সেই মাথাটিও বোধ হয় আর থাকে না।

হাকিম বোঝে যোটেই অসম্ভব নয়। তৈমুরের বংশে ভয় নেই, ধর্মভয় তন্মধ্যে সর্বাগ্রে।

হাকিম সাহেব, আপনার খেলা যে বুঝতে পারে সে এখনো জন্মায় নি। আপনি আমাকে যুক্তি দেন বড়লাটকে ধরতে, যাতে মীর্জা জবান বখ্‌ত্‌ এর পরে বাদশাহী পায়। আবার মীর্জা ককরুদ্দিন আপনার চেষ্টাতেই বাদশা কবুল হয়েছিল। আপনি একদিন এসে আমাকে জানান যে, কোম্পানীর সঙ্গে ভাব রাখুন, আর একদিন এসে জানান, মীর্জা জবান বখ্‌তকে বাদশা কবুল না করলে সিপাহীদের ক্ষেপিয়ে দিন। আপনি বাদশাকে গিয়ে পরামর্শ দেন খবরদার হুজুর, লালকেল্লা ছেড়ে পুরানা দিল্লিতে যাবেন না, আবার ফ্রেজারকে বলেন, আর কেন, গদি থেকে বুড্‌ঢাকে নামিয়ে দিয়ে আপনারাই বসুন। এতক্ষণে বুঝতে পারছি আপনার ইঙ্গিতেই সিপাহীরা এতগুলো নিরীহ ফিরিঙ্গীর প্রাণ নিলো! বাহবা, বাহবা, হাকিম সাহেব! খোদ শয়তানও আপনার কাছে শয়তানির শিক্ষানবিসী করতে পারে।

হাকিম সাহেবের মুখে উত্তর জোগায় না, কারণ অভিযোগগুলির সমস্তই অর্ধ-সত্য। অর্ধ-সত্য অর্ধ-ভগ্ন ইষ্টক খণ্ড, তর্কের পাল্লায় অধিক দূর গড়ায়। অর্ধ-সত্যে শয়তানের প্রতিভার চরম বিকাশ। এমন সময়ে ঘটনাচক্র উত্তরের দায় থেকে তাকে বাঁচিয়ে দেয়।

পর্দা নড়ে ওঠে, করিমন বিবি কুর্নিশ করে।

কি খবর বাঁদী?

বাদশা!

করিমনের মুখ থেকে ঐ একটিমাত্র শব্দই বের হয়। সে জানে বাদশার অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আগমন গূঢ় ভবিতব্যের ইঙ্গিতে পূর্ণ, তার উপরে যদি আবার অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে হাকিম সাহেব আবিষ্কৃত হয় তবে না জানি কী অঘটন ঘটবে!

বাদশা!

বেগম ও হাকিম দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

জিনৎমহল বলে ওঠেন, হাকিম সাহেব আপনি এখন যান।

কুর্নিশ ক'রে দরজার দিকে অগ্রসর হয় আসাদুল্লা, বাধা দিয়ে করিমন বলে, ও দরজা দিয়ে বের হ'লে বাদশার সম্মুখে পড়বেন।

তবে? একসঙ্গে বলে ওঠে বেগম ও হাকিম।

আপনি ভাববেন না বেগম-সাহেবা, যা-হয় আমি করছি, আসুন আমার সঙ্গে হাকিম সাহেব, বলে ইঙ্গিত করে করিমন বিবি।

নিতান্ত সুবোধ বালকটির মতো প্রবল-প্রতাপ কোতোয়াল বাঁদীকে অনুসরণ ক'রে অন্দর মহলের ভিতরের দিকে চলে যায়।

সম্মুখের দরজার পর্দা ঠেলে প্রবেশ করেন বাহাদুর শা। জিনৎমহল দাঁড়িয়ে উঠে কুর্নিশ ক'রে দেখিয়ে দেয় মখমলে মোড়া একখানা কৌচ। তখন ইংরেজ ব্যবসায়ীর কৃপায় বিলিতি আসবাব প্রবেশ করেছে বাদশার রঙমহলে। ব্যবসায়ীর কাছে অসূর্যম্পশ্য বলে কিছু নেই।

বেগমের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে বাদশা বললেন, ছোটবেগম, একা বসে কি করছিলে?

বেগমের আশঙ্কা হ'ল, বাদশা বুঝি হাকিম সাহেবের আগমন-বার্তা পেয়েছেন —তাই এমন জেরা। যদিবা মচক্কাতে হয় তবু ভাঙলে চলবে না। বলেন, এখনি গুলিস্তান শুনবো তারই আয়োজন করছিলাম। সাকিদা বিবির খুব মিষ্টি গলা, ভালো পড়ে, একটু শুনুন না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাদশা বলেন, ছোটবেগম, রয়ে বসে গুলিস্তান শুনবার অবকাশ ছিল বাদশা জাহাঙ্গীর আর বাদশা শাহ্‌জাহানের। তার আগেও কারো নয়, তার পরেও কারো নয়।

বাদশার কণ্ঠস্বরে ও কথায় জিনৎমহল বুঝলো কিছু গুরুতর প্রয়োজনেই বাদশার আগমন হয়েছে। কিন্তু সেটা যে কত গুরুতর তখনো বুঝতে পারলো না সে।

বাদশা বলেন, ছোটবেগম, আশা করি এখানে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

না, বাদশা, আর কেউ নেই।

তবে শোনো, এই বলে গলার স্বর নামিয়ে এনে বলেন, তবে শোনো, আজ রাতেই কিল্লা মুবারক ছেড়ে আমি চলে যাবো পুরানা কিল্লায় (পুরাতন দিল্লি)।

এমন প্রস্তাবের জন্তে প্রস্তুত ছিল না জিনৎমহল, তাই শুধালো কেন বাদশা?

কেন, তুমিই বলো।

কি বলবে ভেবে না পেয়ে জিনৎমহল নীরব হয়ে থাকে।

বাদশা বলতে শুরু করেন।

কিল্লা মুবারক এখন কিল্লা দুশমনি, সিপাহীরা এখন এর মালিক।

সে কি কথা, চমকে উঠে বেগম।

সেই কথাই তো বলতে এসেছি। বাদশা এখন সিপাহীর হাতে বন্দী। না, এখনো সরাসরি বন্দী হয় নি, এখনো পর্যন্ত ইশারায় বন্দী, কিন্তু কাজে বন্দী হতে কতক্ষণ!

এত সাহস কার বাদশা!

যারা ঐ অসহায় নরনারীগুলো খুন করলো তাদের!

ও তো গাঁওয়ার সিপাহীদের কাজ।

গাঁওয়ার সিপাহীদের পিছনে আছে শাহ্‌জাদার দল।

যথার্থ বিস্ময়ে বেগম বলে ওঠেন, বাদশা, সত্যি কি শাহ্‌জাদারা আছে এর মধ্যে!

বাদশা বলেন, তলোয়ারে আঘাত করতে পারে কেন? পিছনে আছে বলিষ্ঠ বাহু। তারপরে একটু থেমে বলেন, তারও পিছনে আছে আততায়ীর ইচ্ছা। ছোটবেগম, সেই তো আমার ভয়। কোম্পানী ভাববে, তামাম হিন্দুস্তান ভাববে, এই দোজখী ব্যাপারের পিছনে আছে বাদশার ইঙ্গিত। আমার কিল্লার মধ্যে এমন কাণ্ড ঘটলো আর আমি এর মধ্যে নেই—এ কথা বিশ্বাস করবে এমন বুদ্ধু নেই হিন্দুস্তানে।

শাহ্‌জাদাদের ডেকে এনে শাসন ক'রে দিন।

ছোটবেগম, তারা এখন শাসনের অতীত। ডাকিয়েছিলাম তাদের। লম্বা লম্বা কুর্নিশ ক'রে তারা জানালো, তারা কিছু জানে না। ফিরিঙ্গীদের আচরণে লোকে ক্ষেপে উঠে খুন করেছে।

তোমরা রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলে? তারা আবার এক দফা কুর্নিশ করে জানায়, সাধ্য কি শাহেন শা, লোকের এমন গোসা হয়েছে নিষেধ করতে গেলে আমাদেরই খুন করতো।

তখন শুধোই, কোথায় ছিল তোমার ফৌজ, তুমি না সিপাহ্‌সালার হয়েছ

মীর্জা মুঘল বলে, আফসোসের কথা কি বলবো খোদাবন্দ্! সিপাহীরা আমার হুকুমের চাকর! কিন্তু গায়ে যতক্ষণ উর্দি-কুর্তি ততক্ষণই তারা সিপাহী। আমার হুকুম শুনে উর্দি-কুর্তি খুলে ফেলে সেলাম করে বলল, হুজুর, এখন আমরা

বেগানা আদমী—এই বলে ছুটলো লাঠিসোটা নিয়ে।

তা যেন হ'ল। আমি যে হুকুম দিয়েছিলাম, লাসগুলো খ্রীস্টানের গোরস্থানে কবর দিতে হবে। তা হ'ল না কেন ?

মীর্জা মুঘল বলল, জাঁহাপনা, হিন্দুরা বলল, যমুনায় ফেলে দিই, ভাসতে ভাসতে গঙ্গায় গিয়ে পড়লে সোজা বেহস্তে চলে যাবে।

তার পরে একটু থেমে বেগমের উদ্দেশ্যে বলেন, এমনভাবে শাহ্‌জাদারা কথা বলতে সাহস করতো বাদশা আলমগীরের সঙ্গে ! ছোটবেগম, এখন আমি নামেই বাদশা—ঐ নামটুকুও ঘুচিয়ে দেবো স্থির করেছি।

পুরানা কিল্লাতে গেলেই কি সে নাম ঘুচবে বাদশা ! ও কেল্লাও তো বাদশা হুমায়ুনের তৈরি !

আমি কি নূতন কিল্লা থেকে পুরানা কিল্লায় যাওয়ার জন্যেই শুধু প্রস্তুত হয়েছি ?

তবে ?

সেখান থেকে যাবো আজমীর, সেখান থেকে মক্কাশরিফ।

জাঁহাপনা, দিল্লির বাদশারা তো কখনো মক্কাশরিফ যান না !

দিল্লির বাদশা ! দিল্লির বাদশা কাকে বলছ ছোট বেগম। দিল্লির বাদশা এতদিন ছিল কোম্পানীর চাকর, এখন সে শাহ্‌জাদাদের নোকর আর সিপাহীর নফর !

এ ছাড়া কি পথ নেই। একবার হাকিম সাহেবের পরামর্শ নিলে হয় না !

তাকেও ডাকিয়েছিলাম।

কি বলল ?

ওকে বলবো ভেবেই ডেকেছিলাম, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মতি পরিবর্তন করলাম। ওকে পুরো বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না।

কারো সঙ্গে তো পরামর্শ করতে হবে।

তার কাছেই তো এসেছি। আর শুধু পরামর্শই তো নয়। তুমিও যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হও। বসন্ত আলী খাঁকে শাহী বয়েল-গাড়ি তৈরি করতে হুকুম দিয়েছি।

বাদশার প্রস্তাবে খাসমহলের ছাদ ভেঙে পড়লো বেগমের মাথায়। তাকে যেতে হবে ! খাসমহল ছেড়ে, দিল্লি ছেড়ে, জবান বখৎকে বাদশাহ করবার আশা ছেড়ে। এমনভাবে পলায়ন করলে তাকে যে কোম্পানী পক্ষ, সিপাহী

পক্ষ দুই পক্ষেরই অবিশ্বাসভাজন হ'তে হবে। দু' পক্ষের ভরসা পরিত্যাগ ক'রে শূন্যে ঝাঁপ দেওয়ার মতো অরক্ষণীয় অবস্থা সত্যই কি হয়েছে? বুঝতে পারে না। আবার অন্যদিকে বৃদ্ধ বিপন্ন অসহায় বাদশার মিনতি। কি করবে ভাবতে থাকে সে। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার সময় পাওয়া যায় না। ভারী পর্দাখানা নড়ে ওঠে।

কি খবর বাঁদী?

বাঁদী কুর্নিশ ক'রে বলে, বসন্ত আলী খাঁ।

বসন্ত আলী খাঁ প্রবেশ করে। প্রথমে বাদশা পরে বেগমকে সেলাম ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাদশা শুধোন, সব তৈয়ারি বসন্ত?

শাহান শা এ-দিকে সব তৈরি, তবে ও-দিকে—

ও-দিকে আবার কি?

কিল্লার সব দরবাজায় সিপাহী ফৌজ মোতায়েন হয়েছে।

কেন, শাহী ফৌজ নেই?

একজনকেও দেখলাম না শাহেন শা।

তার মানে, এখন থেকে কাজেও বন্দী হলাম। দেখলে ছোটবেগম, কি সুখের আশায় বাদশাহী! ভালো, তাই হোক।—তার পরে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে ব'সে থেকে নিরুপায় অদৃষ্টের বন্দী ধীর মন্থর-পদে নত লজ্জিত মস্তকে খোয়াবগা প্রাসাদের দিকে ফিরে চলেন।

॥ ১১ ॥

উজীরের লাশ বহন

করিমন বিবি আসাদুল্লাকে নিয়ে খাসমহল থেকে বের হতেই দেখা পেলো করিম খাঁর। করিম খাঁ বাদশাহী বয়েল-গাড়ির জিম্মাদার। এত রাত্রে হাকিম সাহেবকে নিয়ে প্রাসাদ থেকে বের হ'তে দেখে অবাক হয়ে যায় করিম খাঁ। করিম তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে শুধোয়, ব্যাপার কি?

করিমন বলে, ব্যাপার পরে বলবো, আগে হাকিম সাহেবকে কিল্লা থেকে বের ক'রে দিই।

করিম বলে, সে চেষ্টা আর না-ই করলে বিবি।

কেন বলো দেখি।

কিল্লার সব দরজায় এখন সিপাহী ফৌজ খাড়া।

তুমি জানলে কি ক'রে ?

ঘুরে ঘুরে দেখে এসেছি কিনা।

তোমার হঠাৎ গমন কি প্রয়োজন পড়লো যে দেখতে গেলে।

ঐ তো মেয়েছেলের সঙ্গে কথা বলার বিপদ! আঁঠি ভেঙে শাঁস না দেওয়া অবধি নিস্তার নেই।

বিরক্ত হয়ে করিমন বলে, এর মধ্যে আঁঠি শাঁস—এত বাজে কথা আসে কি ক'রে ? বলি বাদশার কিল্লায় সিপাপী পল্টন খাড়া হয় কেন ?

সে কথা অবসর-মতো না হয় শুধিয়ো সিপাহী ফৌজকে। এখন যা বলি শোনো, দুই কান ক'রো না। বাদশা হুকুম দিয়েছেন, আজ রাতেই পুরানা কিল্লায় যাবেন। গাড়ি ঠিক ক'রে দরজা খোলা আছে কি না দেখতে গেলাম।

সঙিন চড়িয়ে সিপাহী ফৌজ পাহারা দিচ্ছে। আমাকে সঙিনের খোঁচা মারে আর কি! আমি বললাম, আমার উপরে এত নেকনজর কেন মিঞা সাহেব, আমি তো ফিরিঙ্গী নই। শুনে দুশমন বলে কি না—ফিরিঙ্গী বাদশা দুই-ই সমান।

তা যেন বুঝলাম, কিন্তু এই মাঝ রাতে তোমরা সঙিন নিয়ে দাঁড়ালে কেন ? শহরের ফিরিঙ্গী তো নিকেশ করেছ, তবে এত ভয় কাকে ?

ভয় আবার কাকে ? আমরা সব মীরাটী ফোজ, দুশমন আমাদের দেখে ভয় করে, আমরা আবার ভয় করবো কাকে।

তবে এত পাহারা কেন ?

বুঢ্‌ঢা শালা ভাগবার মতলবে আছে তাই পাহারার হুকুম হয়েছে। শালা এক নম্বর হারামী।

গতিক মন্দ দেখে স'রে পড়লাম। তারপরে সব ক'টা দরবাজা ঘুরে দেখলাম —একই অবস্থা।

তখন করিমন বিবি গলা খাটো ক'রে শুধলো, বাদশা কি পুরানা কিল্লায় যাবেন পালাবার মতলবে ?

এত খোঁজে তোমার দরকার কি বিবি—এই বলে করিমনের গাল টিপে দেয় সে। তারপরে বলে, এখন তোমার কি চাই বলো।

হাকিম সাহেবকে কিল্লার বাইরে নিয়ে যাওয়ার উপায় করো।

তবেই তো মুশকিল করলে। বাদশা যেতে পারেন না, কোতোয়াল যাবে

কি ক'রে ?

তারপরে একটু ভেবে নিয়ে বলল, এক উপায় বোধ করি আছে। যমুনার খিড়কি দরজায় এমন কড়াকড়ি নেই।

কেন ?

লাশগুলো যমুনায় নিয়ে ফেলছে ঐ দরজা দিয়ে। হাকিম সাহেব যদি দলের সঙ্গে মিশে লাশ নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে তবে বোধ করি একটা উপায় হয়।

তিনি কি রাজী হবেন ?

রাজী না হ'লে লাশ হয়ে বেরিয়ে যেতে হবে।

দেখি।—বলে করিমন গিয়ে সব অবস্থা বোঝায় হাকিম সাহেবকে, বলে, এ ছাড়া বের হওয়ার উপায় নাই।

আসাদুল্লা নির্বোধ নয়, বোঝে যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা, নইলে চরম দুরবস্থা। কিন্তু হাকিমী পোশাকে তো লাশ বওয়া চলে না।

করিমন বলে, তার আর ভাবনা কি !

তখন আসাদুল্লা ও করিম খাঁ পোশাক বদল করে। পোশাকের পরিবর্তনে হাকিমকে গাঁওয়ার আর করিম খাঁকে বাদশার দরবারী মনে হয়। বসনের আবিষ্কারের সঙ্গেই মানুষে মানুষে পার্থক্যের সূত্রপাত। শিশু সন্ন্যাসী শব সর্বত্র সমান।

করিম খাঁর সঙ্গে আসাদুল্লা দীঘির ধারে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তখনো অনেকগুলো বস্তাবন্দী শব পড়ে ছিল। একটা বস্তা ঘাড়ে তুলে নিল আসাদুল্লা, কেউ প্রশ্ন করলো না।

যতই অবস্থান্তর হোক না কেন, আসাদুল্লার রসজ্ঞান কখনো লোপ পায় না। ভাবে, অনেক মানুষ লাশ বনেছে আমার হুকুমে, কিন্তু কখনো লাশ বইতে হবে তা ভাবি নি। এ যে হিন্দুদের উল্টা বুঝিলি রাম।

লালকেল্লার পুব-দক্ষিণ কোণে ছোট যমুনার খিড়কি দরজা। লাশ নিয়ে অনায়াসে বেরিয়ে গেল আসাদুল্লা, কেউ বাধা দিল না। দুটো জায়গাই অন্ধকার। খুনকে মানুষের বড় ভয়, আলো জেলে তা দেখবার সাহস নেই তার।

আসাদুল্লা দেখলো যমুনার মধ্যে ঝপাঝপ বস্তা ফেলছে লোকে। সে একটু দূরে গিয়ে ঘাড় থেকে বস্তাটা জলের মধ্যে ফেলে দিল। তারপরে 'হা আল্লা' বলে বালুর উপরে একেবারে শুয়ে পড়লো। অনেকটা রাস্তা, বস্তাটাও ভারি, তার উপরে ভয় ও গ্লানি, ভেঙে পড়বার অবস্থাই বটে।

সে-রাত্রে যমুনার চরের দৃশ্য বড় ভয়ানক। লালকেল্লার পূবে প্রকাণ্ড যমুনার চর, উত্তরে নিগমবোধ ঘাট থেকে দক্ষিণে রাজঘাট অবধি বিস্তৃত। বর্ষাকালে জল এসে লালকেল্লার প্রাচীরে ধাক্কা দেয়, গ্রীষ্মকালে সরে যায় অনেক দূর। এখন গ্রীষ্মকাল। চরের উপরে ইতস্তত জেগেছে বুনো ঝাউ, আর এখানে ওখানে ছড়ানো জীর্ণ কতকগুলো নৌকা। কেল্লা থেকে বস্তাবন্দী লাস এনে এখানে ফেলা হচ্ছিল। কতক বস্তা জলে পড়লো, কতক ডাঙার উপরে। মড়ার গন্ধ পেয়ে শিয়াল-কুকুরের দল জুটে গেল। যে-সব বস্তা অল্প জলে পড়েছিল সেগুলোকে তারা ডাঙায় টেনে তুলল, ডাঙার গুলো তো ছিলই। শহরের যত কুকুর আর আশেপাশের যত শিয়াল সেগুলো নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ি শুরু ক'রে দিল। তখন পচা মাংসের গন্ধের সঙ্গে লুব্ধ শিয়াল-কুকুরের তারস্বর মিলে গিয়ে সৃষ্টি করলো এক নারকীয় অধ্যায়। তারই এক প্রান্তে একান্তে শুয়ে পড়লো হাকিম আসাদুল্লা। শোবামাত্র ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। ক্লান্ত ব্যক্তি শয্যার ইতরবিশেষ মানে না, তার কাছে নিদ্রাই দুগ্ধফেননিভ শয্যা। হঠাৎ কেউ দেখলে তাকে অন্যতম মৃতদেহ মনে করতো। যখন সে ঘুমোচ্ছিল তখন আর এক ব্যক্তি তার পাশে এসে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ বসে থেকে শুয়ে পড়লো সেও। ঘনান্ধকারে তার চোখে পড়লো না আসাদুল্লা; পড়লেও মৃতদেহ মনে করতো, সরতো না; জীবন ও মৃত্যু তার কাছে আজ সমমূল্য, নতুবা এমন সময়ে এমন স্থানে কেউ শখ ক'রে আসে না। সে লোকটিও চরম ক্লান্ত হয়েছিল, শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লো। অনেক মৃতের শ্মশানে দুটি জীবিত ব্যক্তি যে নিদ্রাগত তা কেউ জানলো না। সব মৃতদেহ যমুনায় ফেলা হয়ে গেলে কেল্লার লোক ফিরে গেল, বন্ধ হয়ে গেল খিড়কির পানি-দরবাজা।

শেষরাতে দুজনের এক সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। তখন রাত্রিশেষের ফিকে অন্ধকারে চরাচরের অস্পষ্ট খসড়া প্রকাশিত হয়েছে; আকাশের তারাগুলো বিদায়ের ঘণ্টা শুনতে পেয়েছে, তবু এখনো বিদায় হয় নি; যমুনার নীল জল তখনো কৃষ্ণাভ, ঠাহর ক'রে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় ভোরের হাওয়ায় ঝলমল অমসৃণ। সেটুকু আলোয় মানুষ দেখা যায়, চেনা যায় না। দুজনে জেগে উঠে পরস্পরকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল, মৃতের শয্যায় জীবন্ত মানুষ যে! কিন্তু তাদের বিস্ময় চরমে উঠল ঘুমের ঘোর কেটে যাওয়ার সঙ্গে যখন তারা পরস্পরকে চিনতে পারলো। দুজনে যুগপৎ পরস্পরের নাম উচ্চারণ ক'রে উঠল—

হাকিম সাহেব!

স্বরূপরাম!

হাকিম আসাদুল্লাকে স্বরূপরাম ভালো ক'রেই চিনতো, শহর কোতোয়ালকে না চেনে কে। স্বরূপরামও আসাদুল্লার পরিচিত, সুখানন্দ পণ্ডিতের বাড়িতে অনেকবার দেখেছে, আরও জানতো যে সে কোম্পানীর ছাপাখানার এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার। কিন্তু এখানে এমনভাবে জীবনমৃত্যুর সীমান্তে পরস্পরকে দেখবে আগে কখনো ভাবে নি তারা।

স্বরূপরাম বলল, হাকিমসাহেব, আপনাকে এখানে এমন অবস্থায় দেখবো ভাবি নি।

তারপর তার সামান্য পোশাক লক্ষ্য ক'রে বলল—এ অবস্থা হ'ল কি ক'রে?

এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ্য পড়ে নি আসাদুল্লার, স্বরূপের কথায় নিজের পোশাক দেখে বলে উঠল, কিভাবে এখানে এলাম, কি ক'রে এ পোশাক হ'ল জানতে চাও? 'চৌবে গয়ে ছব্বে বননে দুবে বনকে আয়ে।' বুঝলে না ভাই, চোর ধরতে গিয়ে চোর বনেছি।

শরীর তাজা হওয়ার সঙ্গে আসাদুল্লার রসজ্ঞান ফিরে আসছিল। বলল, বাদশার দরবারীর দশ দশা, ও নিয়ে বেশি জেরা ক'রো না। এইটুকু জেনে রেখো যে, কাল রাতে লাশ বয়েছি। কিন্তু তুমি এখানে এমন সময়ে কেন? তুমি তো দরবারী নও, শহর কোতোয়ালও নও। তবে তোমার এমন হাল কেন?

কেন, বলে মাথায় হাত দিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে স্বরূপরাম, কথা খুঁজে পায় না। তুলসীকে বাড়ি থেকে নিয়ে মীর্জা গালিবের কাছে রাখবার পরে দুটো রাত্রি অতিবাহিত হয় নি, কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যে তার মনের উপরে যে অভিজ্ঞতার দুঃসহ ভার চেপেছে তা দুটো রাত্রি কেন, দুটো জন্মের পক্ষেও যথেষ্ট। সে যে পাগল হয়ে যায় নি এই তো যথেষ্ট। ঘটনাগুলোকে যথাক্রমে গুছিয়ে অনেকবার মনে আনবার চেষ্টা করেছে, পারে নি; সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। জটিল ঘটনার সাত মহলা অট্টালিকা যেন প্রবল ভূমিকম্পে নাড়া খেয়ে বেঁকে চুরে গিয়েছে। কোথা দিয়ে ঢুকবে? সিঁড়ি আছে তো দরজা নেই, দরজা আছে তো ছাদ ভগ্ন, অধিকাংশ ঘরেই দেয়াল-গুলো বাহু তুলে শূন্যতার জয়ধ্বনি করছে। কোথায় তুলসী! ভালো করতে গিয়ে একি অঘটন আজ ঘটালো সে! নিরাপদে রাখতে গিয়ে চিরতরে হারালো! সিপাহীদের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে সিপাহীদের

হাতেই তুলে দিল! না, আর এগোবার উপায় নেই, সম্মুখে দুস্তর দুর্ভেদ্য জলস্তূপ!

স্বরূপকে নিরুত্তর দেখে আসাদুল্লা বোঝে যে, ওর উপর দিয়েও একটা বড় রকমের ঝাপটা গিয়েছে। খুবই স্বাভাবিক। তাই স্নেহের সঙ্গে বলে, কি হয়েছে বলো না। দেখি যদি কিছু প্রতিকার থাকে।

স্বরূপ বলে, হাকিম সাহেব, আপনি খুব ক্ষমতাশালী লোক, কিন্তু আমার সমস্যা বুঝি প্রতিকারের অতীত।

তবু শুনি কি হয়েছে?

সব খুলে বলবার আগে ঘটনাপুঞ্জকে একবার মনে মনে সাজিয়ে নেয় স্বরূপরাম।

তুলসীকে গালিব সাহেবের বাড়িতে রেখে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলো স্বরূপ, ভাবলো একবার ঘুরে দেখে আসি শহরের কি অবস্থা। ফুলকিমণ্ডী থেকে পশ্চিম দিকে এগিয়ে মীর খাঁর বাজার পর্যন্ত গিয়ে দেখলো অবস্থা অতি ভয়ানক। অরাজকতার এমন উৎকট মূর্তি কল্পনাও করে নি সে। সিপাহীরা শহর লুট করছে বললে যথেষ্ট হয় না, যে যাকে পারে লুট করছে, 'জোর যার মুল্লুক তার' প্রবাদ মাথায় পাগড়ি বেঁধে হাতে লাঠিসোটা নিয়ে সহস্র মূর্তিতে শহরে অবতীর্ণ। সে ভাবলো খুব বাঁচিয়েছি তুলসীকে, একাকী বাড়িতে থাকলে না জানি কী হেনস্তা হ'ত! কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার সময় পাওয়া যায় না, এক সঙ্গে দুজন গুণ্ডা এসে পাকড়াও করে। কি আছে দাও। বেগতিক দেখে মিত্রভেদ নীতি অবলম্বন ক'রে বলে, এই ছাখো সঙ্গে পাঁচটা টাকা আছে, কাকে কত দেবো বলো। টাকা বের করতেই একজন খপ ক'রে নিয়ে নেয়, অমনি দুজনে লাঠালাঠি মাথা-ফাটাফাটি শুরু হয়ে যায়। সেই সুযোগে সরে পড়ে স্বরূপ। ভাবে, আর শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে কাজ নেই। কিন্তু যে পথে এসেছে সে পথে ফিরতে সাহস হয় না, ভাবে কুচা কালানপুরের পথ হয়ে তুর্কোমান দরবাজা দিয়ে শহরের বাইরে যাওয়া যাক, সেখানকার অবস্থা নিশ্চয় শান্ত, তার পরে আবার দিল্লি দরবাজা দিয়ে ঢুকে কৈরবাজার দিয়ে বাড়ি ফিরলেই হবে। কিন্তু একটু এগোতেই পরিচিত এক সব্জীওয়ালার সঙ্গে দেখা হ'ল, তার কাছে শুনলো শুধু তুর্কোমান দরবাজা নয়, শহরের সব দরবাজা বন্ধ। স্বরূপ বলে, এমন তো হওয়ার কথা নয়, দরবাজা তো শাহী-পল্টনের হাতে।

শাহীপল্টন আর মীরাটীপল্টন কি আর আলাদা আছে? সব চোর চোর

ধৌলেরে ভাই। এখন সকলে মিলে দরবাজা বন্ধ ক'রে লুট শুরু করেছে।

এই বলে লোকটা দ্রুত প্রস্থান করলো। স্বরূপ ভাবলো আর বীরত্বে কাজ নেই, ফিরে যাওয়া যাক। নিজের বাড়িতে ফিরে এসে স্নানাহার ও বিশ্রাম সেরে নিতে বিকাল হয়ে গেল, তখন ভাবলো একবার তুলসীর খোঁজ নিয়ে আসা যাক—সন্ধ্যা হওয়ার আগেই তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অনেক ঠেলাঠেলির পরে গালিব সাহেবের কুঠির দরজা খুললো। সামনের ঘরেই বসে ছিল গালিব। স্বরূপকে ঢুকতে দেখেই বুড়ো হাউমাউ ক'রে কেঁদে

কি হয়েছে সাহেব, কি খবর ?

স্বরূপ ভাই, তুলসীমাঈকে নিয়ে গিয়েছে। সে ভাবলো নয়নচাঁদ নিয়ে গিয়েছে, স্বরূপের হাতে ফিরিয়ে দিতে পারলো না তাই দুঃখ হয়েছে বুড়ো মানুষটার। আর কিছু যে হ'তে পারে ঘুণাক্ষরেও মনে হয় নি তার।

সে শুধলো, কখন এসেছিল নয়ন।

দ্বিগুণ জোরে কেঁদে উঠে গালিব বলল, নয়ন না, ভাই এসে বোনকে নিয়ে গেলে কাঁদবো কেন ?

এবারে আশঙ্কার ছায়া পড়ে স্বরূপের মনে, শুষ্ক কণ্ঠে শুধোয়, তবে কে এসেছিল ?

সিপাহীলোক, শালা সিপাহীলোক চল্লিশ-পঞ্চাশজন, ছিনিয়ে নিয়ে গেল তুলসীমাঈকে।

স্বরূপের পায়ের তলায় মাটি ফাঁক হয়ে গিয়েছে, টলতে টলতে বসে পড়ে সে। কী বলবে ভেবে পায় না, নীরবে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। ওদিকে বৃদ্ধ কবি গালিব হাউমাউ ক'রে কাঁদতে থাকে। এত বড় যে কবি, তারও মুখে ভাষা যোগায় না। নীরবতা আর অশ্রু এই দুটি মানুষের দুঃখের চূড়ান্ত ভাষা।

কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়ে স্বরূপ, গালিব কাঁদতেই থাকে। কেন উঠল ? বসে থেকেই বা কী ফল, তাই উঠল। তারপরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলল সুখানন্দ পণ্ডিতের বাড়ির দিকে। বেশ জানে সেখানে নেই তুলসী, তবু যে চলল সেটা পুরনো অভ্যাসের টানে। বাসা ভাঙা গাছটার দিকে পাখি ফিরে ফিরে আসে। শহরে তখনো তাণ্ডব চলছে, কিন্তু সে-দিকে দৃক্‌পাত ছিল না স্বরূপের। আশার সঙ্গেই ভয় অন্তর্হিত।

সুখানন্দ পণ্ডিতের বাড়িতে এসে যখন পৌঁছল, সব অন্ধকার, সব নীরব। বুঝলো নয়ন ও সুখানন্দ ফেরে নি, ভুতি বুড়ি হয়তো শুয়ে ক্লান্তিতে নিদ্রামগ্ন, আর তুলসী—। আবার ফিরে চলল। পথে চলতে চলতে যে দু'চারজন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করলো, শহরের সমস্ত শ্বেতাঙ্গ নরনারীকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয়েছে লালকেল্লার কয়েদে। কেউ বলল, সিপাহীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে, কেউ বলল, কোতল করবার মতলবে। বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না বলেই অ শেষে গিয়ে উপস্থিত হ'ল লাহোরী দরবাজায়। প্রকাণ্ড দরবাজা বন্ধ, বাইরে জমেছে অনেক লোক। কেউ বলছে কয়েদ হবে, কেউ বলছে কোতল হচ্ছে তাই দরবাজা বন্ধ।

স্বরূপ শুধলো, শুধু ফিরিঙ্গিদের কোতল করা হবে, না দেশী লোকও কেউ আছে?

উত্তরে শুনলো, হয়তো দু'চারজন দেশী লোকও হবে, কে খোঁজ রাখে।

দেশী লোক কি দোষ করলো?

দোষ আবার কি? আগাছা কাটতে গেলে সঙ্গদোষে দু'চারটে ফুলের গাছ কাটা যায়। কোথাও কোন আশার রশ্মি দেখতে পায় না, অসহায় ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। এমনিভাবে কাটালো চব্বিশ ঘণ্টা, একটা রাত পরের দিনটা সমস্ত। সন্ধ্যাবেলায় শুনতে পেলো কোতল হয়ে গিয়েছে, রাত্রিবেলায় লাস নিয়ে ফেলে দেওয়া হবে যমুনার চরে। দরিয়াগঞ্জে ফিরিঙ্গি পাড়ার পুবে খয়রাতি দরবাজা। সেই দরবাজা দিয়ে বেরিয়ে যখন যমুনার চরে এসে পৌঁছলো তখন রাত্রি গভীর, দু'দিনের দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তিতে তার শরীর অশক্ত। নিজের অগোচরে কখন বসে পড়েছে, তারপরে শুয়ে পড়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে কিছুই জানে না সে। জেগে উঠতেই দেখা হ'ল আর একজন অসহায়ের সঙ্গে।

আসাদুল্লা বলে, কি ভাই চুপ ক'রে রইলে যে?

কী আর বলবো হাকিম সাহেব।

তোমার দুঃখের কথা।

কী লাভ?

মনটা হাল্কা হবে ভাই।

আমার সমস্ত আশা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সাহেব।

আশার কাফন বড় ভারি, একা বইতে পারবে কেন, এসো দুজনে কাঁধ

হিই, অনেকটা সহজ হবে।

তখন খাপছাড়া গুছিয়ে-গাছিয়ে দু' দিনের ঘটনা বিবৃত ক'রে স্বরূপ শুধোয়—আপনার কি মনে হয় হাকিম সাহেব, তুলসীকে কি খুন করেছে।

কেমন ক'রে বলবো ভাই, দেশী লোককে তো মারবার কথা নয়।

দুঃখের দুর্ভেদ্য দেয়ালের ফাঁকে একটুখানি আশার আলো চোখে পড়ে। বলে, আমিও তাই বলি, দেশী লোককে মারতে যাবে কেন?

এতখানি আশা দেয় নি আসাদুল্লা, তাই চুপ ক'রে থাকে।

আপনি তাহলে আশা দিচ্ছেন—তুলসী বেঁচে আছে।

উল্টে প্রশ্ন করে হাকিম সাহেব, তুমি কি নিশ্চয় জানো যে, তাকে লালকেল্লায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তুলসীর তাঞ্জাম কেল্লায় ঢুকতে দেখেছে লোকে।

সাড়া দেয় না আসাদুল্লা।

কি সাহেব, চুপ যে।

স্বরূপ ভাই, মৃত্যুর চেয়ে বেশি দুর্গতি কি আর নেই।

ইঙ্গিতটা বুঝতে না পেরে স্বরূপ শুধোয়, তার মানে?

তাঞ্জামে ক'রে যারা লালকেল্লায় ঢোকে তাদের যেন কেউ ঈর্ষা না করে।

এতক্ষণে ইঙ্গিতটার নগ্ন শোচনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে স্বরূপের চোখে; চীৎকার ক'রে বলে ওঠে, হাকিম সাহেব, তুলসী মরেছে নিশ্চয়। চলুন তার শবটা খুঁজে দেখি।

হাকিম তার হাত ধরে টেনে বসিয়ে বলে, এখানে কোথায় খুঁজে পাবে। কতক জলে পড়েছে, কতক শিয়ালে টেনে নিয়ে গিয়েছে, কতক কবন্ধ। পেলেও চিনতে পারবে না।

তবে!

বলে হতাশ হয়ে আবার বসে পড়ে।

এখন চলো এখান থেকে যাওয়া যাক। সিপাহীরা এসে পড়লে বিপদ হ'তে পারে।

মারবে? এই তো। মরবার সাহস আমার আছে, বলে স্বরূপ।

স্বরূপ ভাই, মরবার চেয়ে বাঁচতে সাহসের দরকার বেশি। এই যে খেলা আরম্ভ হয়েছে, এর শেষ ঢেউ কোথায় পৌঁছবে কেউ জানে না, প্রত্যেক পায়ে পায়ে এখন মৃত্যু, ভয় ক'রেই বা কী ফল। চলো ফিরে যাই।

কোথায় ফিরবে স্বরূপ। চারদিক সমান অন্ধকার। হঠাৎ মনে পড়ে খুরশিদ বাঈয়ের কথা। ঘরের বাতি নিবতেই আকাশের জ্যোৎস্না ঢুকে পড়ে।

হাকিম সাহেবকে একটা সেলাম জানিয়ে হন হন ক'রে চলতে থাকে খুরশিদ বাঈয়ের কুঠির দিকে। অবোধ স্বরূপ জানে না যে, আকাশের জ্যোৎস্না যতই আলো ঢালুক না কেন, ঘরের সব কোণে সে আলো পৌঁছয় না।

॥ ১২ ॥

রাত্রি এক প্রহর অতীত হ'লে নয়নচাঁদ বাড়ি ফিরে এসে ডাকলো, তুলসী। অনেকবার ডাকাডাকির পরেও যখন না দিল কেউ উত্তর, না খুললো কেউ দরজা, ভাবলো, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সুখানন্দও যে অনুপস্থিত, অন্যত্র আটকা পড়েছে,. কি ক'রে জানবে, আগের দিন রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। শহরে লুটপাট, ফিরিঙ্গিদের গ্রেপ্তার প্রভৃতি তাদের পরিকল্পনা মতো হয়েছে, ভারি খুশী ছিল তার মনটা। ভাবলো, আহা ঘুমোক। শহরের লোকে যাতে ফিরিঙ্গি-শাসন মুক্ত হয়ে আরামে ঘুমোতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই তো তাদের এই উদ্যম। কিন্তু বাড়িতে ঢুকবার উপায় কি? ডাকাডাকিতে কেউ জাগলো না, জাগবেও না। তখন সে প্রাচীর ডিঙিয়ে যেভাবে স্বরূপরাম ঢুকেছিল, সেইভাবে বাড়িতে ঢুকলো। সব অন্ধকার। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দেখতে পেলো, বারান্দায় পড়ে ভুতি বুড়ী ঘুমোচ্ছে। নয়নচাঁদ জানতো, ভুতি বুড়ীর ঘুম কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, ডাকাডাকিতে জাগে না।. তাই ধাক্কা মারলো। বেশ গোটাকয়েক ধাক্কা খেয়ে ভুতি বুড়ী জেগে চীৎকার ক'রে উঠল,—ওরে বাবা গো, সেপাইতে ধরলো। নয়ন বলল—চুপ কর, সিপাহী কোথায়!

সিপাহী-ভীতি দূর হওয়ামাত্র ডুকরে কেঁদে উঠল সে।

কি হ'ল আবার? এমন মড়াকান্না কাঁদিস কেন? সবাই যে জেগে উঠবে।

কে জাগবে বাবা? কেউ যে নেই।

তার মানে? বাবা কোথায়?

সকালে বেরিয়েছে আর ফেরে নি।

তুলসী?

আবার তারস্বরে ডুকরে ওঠে ভুতি বুড়ী।

কি হ'ল?

তাকে তো নিয়ে গিয়েচে।

নিয়ে গিয়েছে? কে?

স্বরূপদাদা!

কিছু বুঝতে না পেরে শুধোয়, স্বরূপ নিয়ে যাবে কেন?

তা আমি কেমন ক'রে জানবো বাবা।

তুই জানবি না তো কে জানবে, বাড়িতে আছিস কি করতে?

তখন ভূতি বুড়ী যথাসাধ্য ব্যাপারটা বর্ণনা করলো।

কখন নিয়ে গিয়েছে বল্?

কর্তাবাবু বের হওয়ার পরেই।

বিস্ময়ে ক্ষোভে নয়ন শুধোয়, তুলসী গেল?

না গিয়ে কি করবে বলো? তুমি নাই, কর্তাবাবু নাই, দেখবে কেডা তারে!

কোথায় নিয়ে গিয়েছে জানিস্?

তা কেমন করি জানবো!

বিদ্রূপ ক'রে বলে ওঠে নয়ন, তা কেমন করি জানবো, তবে কি করতে আছ?

আর কিছু বলতে পারে না, ভাবতে পারে না, সেখানেই মাটির উপরে বসে পড়ে।

অনেক রাত হয়েছে, শোও গ্যানে বাবা।

উত্তর দেয় না নয়ন।

অভিভূতের ভাব খানিকটা কাটলে নয়ন ভাবে, বিয়ে করবার মতলবেই স্বরূপ ভেগেছে তুলসীকে নিয়ে। ভাবে, স্বরূপ না-হয় হারামজাদা, কিন্তু তুলসীও শেষে কিনা কাঁদে পা দিল। ভাবে, তুলসী ছেলেমানুষ নয়, বুঝেসুঝেই গিয়েছে। এত বড় নিমকহারাম মেয়েটা। তখন সে স্থির করলো, এমন অসহায়ভাবে বসে থেকে লাভ নেই, একবার চেষ্টা করে দেখা যাক, তুলসীকে উদ্ধার করা যায় কি না। তখনি সে বেরিয়ে পড়লো।

ভূতি শুধোলো, এত রাতে আবার কনে চললে?

তোমার জন্ত দড়ি-কলসী যোগাড় করতে।

নয়নচাঁদ বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সুখানন্দ পণ্ডিত ফিরে এলো। সব শুনে বললো, নয়নটা চিরকালের গোঁয়ার, তলিয়ে ভেবে দেখে না। বাড়িতে কেউ নেই, শহরে ডামাডোল, স্বরূপ ভালো ভেবেই তুলসীকে নিয়ে গিয়ে কোথাও সাবধানে রেখেছে। সুখানন্দ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিল, অল্পক্ষণের

মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো।

নয়ন সোজা চলে গেল কাগজী মহল্লায় স্বরূপের বাড়িতে। দেখলো, বাড়ির দরজা ভেজানো, ভিতরে কেউ নেই, সব খাঁ-খাঁ করছে।

নয়ন ভাবলো, এখানে তুলসীকে রাখবে ভাবা ঠিক হয় নি, অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। ভাবলো, রোসো শয়তান, যেখানেই রাখো খুঁজে বের করবো। ভাবলো, তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি।

কোন্ নির্বোধে না এরূপ ভাবে।

কিংকর্তব্য ভালো ক'রে ভেবে দেখবার উদ্দেশ্যে যখন সে বাড়ির দিকে ফিরছে, গলির মোড়ে দেখা পেলো গালিব সাহেবের।

বিস্ময়ে বলে উঠল, মীর্জা সাহেব, এত রাত্রে পথে যে ?

গালিব বলল, বাবা, যে দিনকাল পড়েছে, এখন বাড়ির চেয়ে পথটাই বেশি নিরাপদ।

তবু······কোথায় চলেছেন ?

তোমাদের বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। পণ্ডিতজী কি ফিরেছেন ?

গালিবের কথায় ও চেহারায় কেমন উদ্বেগ বোধ করলো নয়ন, তবে তার সঙ্গে যে তুলসীর সম্পর্ক থাকতে পারে, তা মনে হয় নি তার। বলল, চলুন।

গালিব ভাবলো, দুঃখের কথা বারে বারে আবৃত্তি করায় দুঃখের তাপ আরো বাড়ে, একেবারে একসঙ্গে পিতা-পুত্রকে সমস্ত অবস্থা জানালেই চলবে, তা ছাড়া এসব কথা পথ চলতে চলতে বলবার নয়।

এত রাত্রে গালিবকে দেখে ভীত বিস্ময় অনুভব করলো সুখানন্দ। বলল, আসুন, আসুন, মীর্জা সাহেব যে, এত রাত্রে! কোন জরুরী কথা আছে ?

আছে।

বসুন।

সকলে বসলে গালিব একে একে ধীরে ধীরে পূর্বাপর রক্ষা ক'রে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো। তুলসীকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য স্বরূপের প্রত্যাবর্তনের কথাও প্রকাশ করলো।

গালিব এখন আর আগের মতো ডুকরে কাঁদছে না সত্য, তবু ঘটনা বিবৃত করবার সময়ে অন্ধকারে দুই চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছিল। সুখানন্দেরও। নয়নচাঁদেরও। কথা শেষ হ'ল, তবু জল শেষ হয় না। তিনজনে নীরবে বসে থাকলো।

অনেকক্ষণ পরে গালিব প্রথমে কথা বললেন, বললেন, বাবা নয়ন, তোমার

সঙ্গে তো সিপাহীদের যোগাযোগ আছে, একবার বলে ক'রে ভাখো না, তুলসীমাঈকৈ ছেড়ে দেয় কি না, ও তো কিরিঙ্গি নয়।

নয়ন বলল, আপনারা দুজনেই তো বাদশার দোস্ত, আপনারা বললে নিশ্চয় ছেড়ে দেবে।

গালিব বললেন, বাবা, বাদশার বাদশাহী তো ছুটে গিয়েছে, এখন তো সিপাহীশাহী।

নয়ন বলল, সিপাহীদের নানা দল। একদল বলছে চলো কানপুর, একদল বলছে চলো ঝাঁসি, একদল বলছে বাদশাহ বরবাদ, একদল বলছে বাদশাহ জিন্দাবাদ। কাকে বলবো?

তবে সিপাহ্‌সালারকে বলো।

তার কাছে আমার পৌঁছবার ক্ষমতা কি? আমি সামান্য লোক।

দেশলাই-এর যে ক্ষুদ্র কাঠিটা দাবানল জ্বালায়, সেটাও পুড়ে ভস্মসাৎ হয় সেই আগুনেই। নয়নের মতো সামান্য লোকের আজ সেই অবস্থা।

যতক্ষণ খুরশিদ জানের ঘরে বসে শলা-পরামর্শ করছিল; আলি খাঁ, মীর্জা মুঘল, কু'লজ খাঁ, শেখ বান্নু'র সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছিল, নিজেকে একটা মস্ত লোক বলে ধারণা হয়েছিল নয়নচাঁদের। ভাসমান নৌকা ভেবেছিল, বৈঠার আঘাতে সে-ই নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করছে নদীস্রোতকে।

নয়নচাঁদ, আলি খাঁ, সরাব মিঞা এরা কে? এমন কি, সিপাহ্‌সালার মীর্জা মুঘল, সে-ই বা কে? খোদ বাদশা-ই বা কে? দাবার ছকের উপরে ব'ড়ে, হাতী, নৌকা, ঘোড়া, রাজা প্রভৃতি চলাফেরা করে, তারা কি নায়ক? তবে কে নায়ক? কার সেই অদৃশ্য হাত? যার টানে সুতো নড়ছে, নড়ছে রাজা হাতী ঘোড়া থেকে আরম্ভ করে সামান্যতম ব'ড়েগুলো!

নয়নচাঁদ বুঝলো, সে কেউ নয়, কিছু নয়, সামান্যতম পদাতিকের চেয়েও অকিঞ্চিৎকর। নিজের বোনকে রক্ষা করবার তার ক্ষমতা নেই—সে কি না হিন্দুস্থানের রক্ষক হ'তে চায়! প্রকাণ্ড নিষ্ফল আক্রোশের ছোবল পড়া উচিত তার নিজের শিরেই, কিন্তু ভ্রংশ বুদ্ধির নিয়মে পড়লো গিয়ে স্বরূপের শিরে। কি প্রয়োজন ছিল তার তুলসীকে নিয়ে যাওয়ার। সে স্থির করলো, তুলসী যদি মরে, তবে স্বরূপও রক্ষা পাবে না।

ও কি, চললে কোথায়?

সুখানন্দের প্রশ্নে ভারকণ্ঠ নয়ন বলল, আপনারা বসে বসে কাঁদুন, আমার অন্য কাজ আছে।

স্বরূপের সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে মারধোর ক'রো না।

না, তাকে ফুল দিয়ে পুজো করবো।

এবারে গালিব বলে, বাবা নয়ন, আমাদের কারো চেয়ে তার দুঃখ কম হয় নি।

তবে আর কি! আমার বোন স্বর্গে চলে গিয়েছে।

সুখানন্দ বলে, খারাপটাই আগে ধরে নিচ্ছ কেন?

সিপাহীদের যে জানি।

গালিব মনে মনে একটা বয়েৎ আউড়ে বলে, সাপুড়ের চেয়ে সাপকে বেশী জানে আর কে?

নয়নচাঁদ বেরিয়ে চলে যায়।

রাত্রির বাকি সময়টা আর পরদিন তৃতীয় প্রহর অবধি পাগলের মতো পথে পথে সে ঘুরলো। লাহোরী দরবাজায় গিয়ে যা শুনলো, তাতে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়—কোথাও এতটুকু প্রতিকারের পথ নেই। তারপরে অপরাহ্নে যখন জানতে পেলো,—লালকেল্লায় যাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের সকলকেই কোতল করা হয়েছে, তখন সে পরিচিত কয়েকজন গুণ্ডাকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছল স্বরূপের বাড়িতে। বলল, কর্‌ লুট।

এমন আদেশ বাহুল্য। আগেই একদফা লুট হয়ে গিয়েছিল, যা ছিল সকলে মিলে লুটে নিল।

তারপরে নয়ন বলল, লাগা আগুন।

স্থাবর সম্পত্তি লুট, অস্থাবরে আগুন—এই হচ্ছে তখনকার আমহুকুম।

স্বরূপের কুঠি দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠল।

নয়ন মনে মনে বলল, এবারে শয়তানটার একবার দেখা পেলে হয়। পকেটে হাত দিয়ে দেখলো, হাঁ, পিস্তলটা ঠিক আছে।

স্বরূপ যমুনার চর থেকে শহরের দিকে রওনা হয়েছে, সহসা এক ঝলকে তার মনের মধ্যে সব পরিষ্কার হয়ে গেলো। সে ভালোবাসে তুলসীকে। যতদিন তুলসী কাছে ছিল, জীবলোকে ছিল, মনের মধ্যে হাতড়িয়ে ফিরেছে, তুলসীর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধটাকে পরিষ্কার ক'রে দেখতে পায় নি। কখনো ভেবেছে আত্মীয়তা, কখনো ভেবেছে প্রতিবেশিত্ব, আবার কখনো বা ভেবেছে অগ্রজোচিত স্নেহ। আজ যখন সে হাতের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে, মৃত্যু'র রহস্য টেনে দিয়েছে দুর্ভেদ্য যবনিকা, তখনি বুঝতে পারলো ওসব কিছুই নয়, নারীর প্রতি পুরুষের আদিম অদম্য আকর্ষণ তার হৃদয়কে চুম্বক শলাকার মতো

উন্মুখ ক'রে রেখেছে তার দিকে। সে ভাবলো, কেন এমন হয়! কাছে থাকলে বুঝতে পারা যায় না, দূরে চলে গেলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেন এমন হয়! সে কি দূরত্বের জাদু? সূর্য-ডুবে-যাওয়া আকাশের মতো তার হৃদয় আজ গোধূলির রঙে রঙীন। সেই তুলসী, তুষারপ্রতিম তুলসীর অস্তিত্ব থেকে যে বাষ্প উদ্গত হচ্ছে, গোধূলির আভায় তাকে কেমন মনোহর ক'রে তুলেছে। এই সাদা কথাটাই এতদিন বুঝতে পারে নি, আর আজ যখন বুঝেও কোন লাভ নেই তখনি সব বিশদ হয়ে গেল! যমুনার পরপারে তখন সূর্যোদয় ঘটেছে, আকাশ অন্তরীক্ষ এবং ভূমণ্ডল সমস্তই করতলগত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ, সমস্তই স্পষ্ট। এসব কথা কখনো ভাবে নি, ভাববার কারণ ঘটে নি, ভালো করে ভেবে দেখবার জন্যে অনেক সূক্ষ্ম পথ ধরে চলল। চলতে চলতে কখন যে সে কাগজী মহল্লায় এসে পড়েছে, হুঁশ ছিল না। হুঁশ হ'ল তখনি—যখন শুনতে পেলো, ম্যানেজার সাব কোথায় যাচ্ছেন?

চমকে উঠে দেখলো, রামলগন। লোকটা তার প্রেসের কম্পোজিটার।

রাম-রাম, রামলগন, সব ভালো তো?

রামলগন বলল, ম্যানেজার সাব, যে হাল পড়েছে ভালো থাকবো কেমন ক'রে। কিন্তু আপনার ভবিষ্যৎ তো ভালো দেখছি না।

ভালো আর থাকি কি ক'রে?

চলেছেন কোথায়?

কুঠিতে যাই একবার।

ম্যানেজার সাব, আপনি বুঝি কাল রাতে কুঠিতে ছিলেন না।

তারপরে উত্তর পাওয়ার আগেই বলল, ঐ দেখুন।

এবারে স্বরূপ সামনে তাকালো আর দেখতে পেলো তার বাড়িটা মস্ত একটা ইটের পাঁজার মতো অঙ্গার হয়ে জ্বলছে।

তেমন বিস্মিত বা দুঃখিত হ'ল না সে, যার মনে আগুন তার সর্বত্রই আগুন। শুধলো, এ কাজ করলো কে? যারা শহরময় এ কাজ ক'রে বেড়াচ্ছে তারাই বুঝি?

স্বরূপ থমকে দাঁড়ালো—এখন কি কর্তব্য? সে ভেবেছিল বাড়িতে গিয়ে স্নানাহার সেরে খুরশিদ জানের বাড়িতে যাবে। এখন বাড়ির তো এই দশা।

রামলগন বলল, ম্যানেজার সাব, দাঁড়িয়ে দেখে আর কি লাভ? কাছেই আমার বাড়ি সেখানে চলুন। স্বরূপ শুধালো, এ কাজ কি সিপাহীদের?

রামলগন বলল, তারা ছাড়া আর এমন বেইমানি কে করবে। তবে—

থামলে কেন?

কি আর বলব সাব, আপনার দোস্ত্ নয়নবাবুজিকে ওদের সঙ্গে দেখলাম।

স্বরূপ বুঝলো ঘটনার বিবরণ আগেই পৌঁচেছে নয়নের কানে, আর পৌঁচেছে কিনা বিকৃত ভাবে। সে ভেবেছিল, তুলসীর বাড়িতে গিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বলে সকলকে সান্ত্বনা দেবে। সে সুযোগ আর হ'ল না। সে বেশ বুঝলো, গালিব সাহেবের সাক্ষ্যেও নয়ন প্রকৃত ঘটনা বিশ্বাস করে নি। ভগ্নীর হত্যার যে কারণ, তার ঘরে ভাইয়ের আগুন লাগানোকে অবিচার না বলে লঘুদণ্ড বলাই উচিত। পর পর দুর্ঘটনার আঘাতে তার মন এমন অসাড় হয়ে গিয়েছিল যে, কিছুতেই রাগ করতে পারলো না নয়নের উপরে। নিতান্ত মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

রামলগন বলল, ম্যানেজার সাব, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কি লাভ? কাছেই আমার বাড়ি, সেখানে চলুন।

স্বরূপের আপত্তি শুনলো না সে। এক রকম জোর ক'রে নিয়ে গেল বাড়িতে।

স্নানাহারের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে বলল—আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন, তারপরে না হয় উঠে আর একটা কুঠি খুঁজে নিয়ে ভাড়া নেবেন।

স্বরূপ কোন আপত্তি করলো না। দুই দিনের অনাহারে, দুই রাত্রির জাগরণে সে ছায়াবৎ দুর্বল ও মলিন হয়ে পড়েছিল। স্নান ও আহার সেরে শুয়ে পড়লো, স্থির করলো একটু জিরিয়ে নিয়ে যাবে খুরশিদ জানের বাড়িতে। যখন তার ঘুম ভাঙলো সন্ধ্যা হয়-হয়। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো। রাস্তায় নেমে দেখতে পেলো যে তিন-চার দিন লুটতরাজের পরে শহরের অবস্থা শান্ত, খুব সম্ভব লুটেরার দল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার মনে হ'ল এ যেন নির্বাপিত-চিতা শ্মশানের শান্তি কিন্তু যে কোন সময়ে নূতন চিতা জ্বলে উঠতে পারে।

স্বরূপ সঙ্কল্প করলো, এই সিপাহী সরকারের কাছে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করা হবে না। গোড়া থেকেই মুখর প্রতিবাদ ছিল তার মনে, এখন তুলসীর মৃত্যুতে সেই প্রতিবাদ দৃঢ় সঙ্কল্পে পরিণত হ'ল। বাছবিচার নেই, নির্বিশেষে হত্যা, এই যেখানে সূচনা—তার পরিণাম না জানি কি ভয়ঙ্কর। নির্দোষ নিষ্পাপ তুষার-পুত্তলীকে যারা অনায়াসে হত্যা করতে পারে তাদের অকরণীয় কিছুই নেই। সে স্থির করলো, যত শীঘ্র সম্ভব দিল্লি পরিত্যাগ ক'রে চলে যাবে। কোথায় যাবে কেন যাবে—ভাববার চেষ্টা করলো না, করলেও মনের মধ্যে থেকে স্পষ্ট জবাব পেতো কিনা সন্দেহ। এখন তার কাছে শাহজাহানাবাদও যা, হিন্দুস্থানের নগণ্যতম গ্রামও তা-ই। কেবল একটা খোঁচা খোঁচা বাড়তে

থাকে—পণ্ডিতজী আর নয়নের না জানি কি হবে। ভাবে, বুড়ো বলে পণ্ডিতজী হয়তো বেঁচে যাবেন কিন্তু নয়নটা যে গোঁয়ার। অবশ্য নয়ন তার উপরে হাড়ে হাড়ে চটা, তবু কিছুতেই নিজের মন প্রতিকূল ক'রে তুলতে পারলো না তার বিরুদ্ধে। নয়ন যে তুলসীর ভাই। সহোদর! একই ছাঁচে দুজনে গড়া। ভাবলো, যাওয়ার আগে একবার দেখা হ'লে, সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলে মন্দ হ'ত না। ভুলের বোঝা মাথায় নিয়ে বিদায় হওয়া উচিত হবে না। কিন্তু এই ডামাডোলের মধ্যে কোথায় সে? ভাবলো, এসব বিষয়ে যথোচিত পরামর্শ যদি কেউ দিতে পারে তবে ঐ খুরশিদ। তার কাছেই না হয় বিদায়-সম্ভাষণ রেখে যাবে নয়নের জন্য। গতিবেগ দ্রুততর ক'রে দেয় সে।

॥ ১৩ ॥

খুরশিদ জান

খুরশিদ জানের কক্ষ আজ নিস্তব্ধ, জলুসহীন। ঝাড় লণ্ঠনের আলো, ছোটবড় আয়নার প্রতিফলন সব তেমনি আছে। তবে কক্ষটিতে যারা উপস্থিত তাদের মনের বিষাদে ঘরটি যেন নিষ্প্রভ। মানুষ নিজের প্রক্ষেপ ছাড়া জগতে আর কীই-বা দেখতে পায়।

খুরশিদ জান নবাব মিঞা আর আলি খাঁ তিনখানি কুর্শিতে উপবিষ্ট আর নয়নচাঁদ অধীরভাবে ঘরময় পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে! ওরা তিনজনেই তাকে বসতে অনুরোধ করেছে, বসে নি; খুরশিদ জান একবার হাত ধরে টেনে পাশে বসাতে সক্ষম হয়েছিল—বেশিক্ষণ বসে থাকে নি, বলেছিল, না না, তোমরা বসতে অনুরোধ ক'রো না, বসে থাকলে মনে হয় পৃথিবীটার মধ্যে ভূমিকম্পনের দোলন চলছে। তখনি লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আবার পায়চারি শুরু করেছিল। কিন্তু এমন মূক অভিনয় তো দীর্ঘকাল চলতে পারে না। কথাবার্তা আরম্ভ করবার যেন একটা সূত্র আবশ্যক।

খুরশিদ বলে, নয়নভাই, কিছু খাও, তাহলে মনটা শান্ত হবে।

নয়ন থামে, তার কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়, তারপরে বলে, মন তো একদিন শান্ত হবেই, চিরদিন কিছু কেঁদে কাটাবে না কিন্তু তার আগে স্বহস্তে হত্যা করবো হারামজাদাটাকে।

আলি খাঁ বলে, নয়ন, তোমার মন নিতান্ত অশান্ত নইলে এতক্ষণে বুঝতে পারতে যে, স্বরূপ তোমার বোনকে অনঙ্গদেবের নিয়ে যায় নি।

নাঃ, ফুল দিয়ে পুজো করবার জন্তে নিয়ে গিয়েছিল।

ফুল দিয়েই বা পুজো করতে যাবে কেন?

তবে বাপ আর বড় ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাকে বাড়ি থেকে বের ক'রে নিয়ে যাবে কেন?

সেই কথাটাই তো একশ' বার বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

একশ' বারেও যখন বোঝাতে পারো নি, তখন আর চেষ্টা না-ই করলে।

চেষ্টা করলেও তুমি বুঝবে না—

তার বাক্য শেষ হওয়ার আগেই নয়ন বলে ওঠে, আর বুঝলেও তুলসী বেঁচে উঠবে না। ব্যস্, থামো।

এবারে সরাব আরম্ভ করে, শহর শাহ্‌জাহানাবাদে এ ক'দিনে যত হত্যাকাণ্ড হয়েছে তাদের সবাই কারো না কারো ভাইবোন পিতামাতা পুত্র-কন্যা।

তাতে আমার কি, গর্জে ওঠে নয়ন।

তাতে তোমার এই যে, তুলসীবাঈ-এর মৃত্যু শোচনীয় হ'লেও আকস্মিক নয়। এই বুঝে সান্ত্বনা লাভ করো।

সান্ত্বনার কথা ব'লো না সরাব মিঞা। নয়নের কণ্ঠস্বর, অঙ্গভঙ্গী ও চক্ষু প্রমাণ ক'রে দেয় যে, সে আর প্রকৃতিস্থ নয়।

সে আবার আরম্ভ করে, সান্ত্বনার কথা বলছ! ঐ শয়তানটার রক্তপাত ছাড়া সান্ত্বনার আর তো উপায় দেখি না।

সরাব মিঞা বলে, নয়ন ভাই, রক্তের প্রকৃতি বড় বিচিত্র। যখন ফিরিঙ্গিদের রক্তপাতের পরামর্শ দিয়েছিলে তখন কি জানতে যে, তাদের রক্ত টেনে আনবে তোমার বহিনের রক্ত!

কথাটার গূঢ়ার্থ নয়ন বোঝে না, বলে, আমার বহিন তো ফিরিঙ্গি নয়, এমন কি ফিরিঙ্গির দলেরও লোক নয়।

সরাব বলে, সেদিন দরিয়াগঞ্জে ফিরিঙ্গিটার রক্তে রুমাল ভিজে যাওয়ার পর থেকে বুঝেছি—সব রক্তই এক, ফিরিঙ্গির রক্ত হিন্দুস্থানীর রক্ত আর মুসলমানের রক্ত সব রক্তই এক, সমান লাল, সমান গরম, সমান গাঢ়। কি বলো খুরশিদ।

এই বলে তাকায় খুরশিদ জানের দিকে, ইঙ্গিতে খুরশিদের মাথা থেকে সেদিনকার রক্তপাতের স্মৃতিকে উস্কে দেয়।

নয়ন বলে ওঠে, কবে থেকে বুঢ্‌ঢা গালিবের চেলাগিরি শুরু করলে—এসব কথা তো সে বলে তার গজলে।

এইখানে আঘাত পড়ে সরাব মিঞার।

কখ্‌খনো না, বলে চেঁচিয়ে উঠে লাফিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

খুরশিদ ও আলি খাঁ দু'জনে দু'হাত ধরে চেপে বসিয়ে রাখে, বলে, তুমিও কি ভাই পাগল হ'লে না কি!

আমি পাগল হ'তে যাবো কেন, পাগল তো হয়েছে ঐ নয়নচাঁদ। আমাকে বলে কি না বুড্‌ঢা গালিবের চেলা! এই ক'দিনের খুনখারাবি দেখে কী লিখেছে বুড্‌ঢা গালিব? কিছু লিখেছে? শুনেছ?

তাকে শান্ত করবার অভিপ্রায়ে আলি খাঁ শুধোয়, তুমি লিখেছ বুঝি!

আলবৎ লিখেছি। শুনবে?

তারপরে সম্মতির অপেক্ষা না ক'রেই দাঁড়িয়ে উঠে আরম্ভ করে—

খুন সায়রে তুফান ভারি, চোখের জলে বৃষ্টি যে
দীর্ঘশ্বাসে কুজ্‌ঝটিকা চলতে নারে দৃষ্টি যে
তল মেলে তো কূল মেলে না আকাশ পাতাল ফেনায় ফেনা
সামাল সামাল রব উঠেছে তলিয়ে যাবে সৃষ্টি যে।

কি, পারে এমন লিখতে তোমাদের মীর্জা গালিব?

খুরশিদের মনে পড়ে সেই প্রথম দিনের স্মৃতি, মনে পড়ে এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পায়।

তাদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে ওঠে নয়ন, বলে, নাও, এই তোমাদের গজল গাইবার সময় হ'ল!—তারপরে বলে, তোমরা বরঞ্চ গজলই গাও, বিদ্রোহ তোমাদের দিয়ে হবে না।

নবাব মিঞা বলে, বিদ্রোহ মানে কি ভাণ্ডাবাজি!

ব্যঙ্গের সুরে বলে নয়ন, না দাগাবাজি। পরের বোনকে ভুলিয়ে বের ক'রে নিয়ে গিয়ে কোতল করা।

এবার বিরক্তির সঙ্গে আলি খাঁ বলে, বাড়াবাড়ি করছ নয়ন। ভুলে যাচ্ছ কেন যে স্বরূপ বিদ্রোহের সমর্থন করে নি, আর কোতলের দায়িত্বও তার নয়।

তুলসীকে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিল কেন?

তার বীরপুরুষ ভাই পালিয়ে আত্মগোপন করেছিল বলে!

আলি খাঁ!

নয়নের মনের অব্যক্ত বিপুল বাষ্পরাশি ঐ একটি মাত্র উদাত্ত ধ্বনিতে প্রকাশিত হয়, পরমুহূর্তেই তা বেরিয়ে আসে দুই চোখের তরল ধারায়। দুই হাতে মুখ ঢেকে সে বসে পড়ে খুরশিদ জানের পায়ের কাছে।

নবাব বলে ওঠে, ওর চোখের জল দেখেই ভুলে গেলে আর আমার

গজলটা কিছু নয়।

আলি খাঁ ও খুরশিদ বোঝে এক থেকে দুই পাগলের পাল্লায় পড়লো; ভাবলো, আগে সরাবকে শান্ত করা দরকার, নইলে সারাটা দিন গজল নিয়ে পিছু পিছু তাড়া করবে।

আলি খাঁ বলল, কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ। সরাব, এমন মিষ্টি গজল গালিবের সাধ্য কি লেখে।

মিষ্টি! ছাই বুঝেছ। মিষ্টি তোমার ঐ গালিবের গজল, মিছরির চাঙড়। আর আমার গজল কি জানো?

কি বলবে ভেবে পায় না ওরা।

অনেকদিন অনেক চোখের জল জমিয়ে লেখা। চোখের জলের কুলপি, এর স্বাদ নোনতা।

এতক্ষণ ব্যর্থ আক্রোশে গজরাচ্ছিল নয়ন। সে বলে উঠল, তবে তাকে গজল না বলে বলো নিমক।

সাবধান নয়ন, মুখ সামলে কথা বলো।

কেন মুখ সামলে কথা বলবো। তুমি, গালিব, সংসারে যেখানে যত গজল-লিখিয়ে আছে সব অধঃপাতে যাক্।

প্রত্যুত্তরে সরাব কি করবে, গজল ছুঁড়বে না ঘুষি চালাবে স্থির ক'রে উঠতে না পেরে নয়নের দিকে কটমট ক'রে চেয়ে রইলো।

এদের দ্বন্দ্ব আরো অনেক দূরে গড়াবে আশঙ্কা ক'রে খুরশিদ জোর ক'রে সরাবকে টেনে নিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে শুইয়ে দিল। কিন্তু শুলেই কি দম ফুরোবে! তুবড়িটা কাত হয়ে পড়ে গেলেও যেমন স্ফুলিঙ্গ উদ্গারণ করতে থাকে তেমনি ভাবে সরাব বলে চলল:

হাঃ হাঃ হাঃ—তুমি ভেবেছিলে পরের ঘরে আগুন লাগিয়ে জলুস দেখবে। আগুন তোমাকে খাতির করবে! হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি ভেবেছিলে লোকের শকুন দুশমনের বাড়িতে গিয়ে বলবে আর তুমি যাবে বেঁচে, এমন হয় না, নয়ন, এমন হয় না।

এ ঘর থেকে নয়ন প্রত্যুত্তরে বলে ওঠে, হয় না তো গজল লেখো গে! তুমি এমন অপদার্থ জানলে কে ডাকতো তোমাকে দলের মধ্যে!

ও ঘর থেকে সরাব বলে, অপদার্থ কে? তুমি, না আমি? বিনা দোষে অরুণের কুটি পুড়িয়ে দিয়েছ, তাকে খুন করবার জন্যে দশ-বিশজন গুণ্ডা বাহাল করেছ, তাতেও শখ মেটে নি—এখন কমলার আঁচলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে

বলেছ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

যুদ্ধ নিয়ে আবার শুরু করে—রক্তের ফোয়ারা খুলে দেওয়া সহজ, একটুখানি ছুরির ঘা দিলেই হ'ল, কিন্তু তার শেষ কোথায় হবে কে বলতে পারে। তোমার বহিন মরেছে তাতেই এত! এই গদরের পালা যখন শেষ হবে দেখবে কেউ থাকবে না। তুমি আমি খুরশিদ আলি খাঁ, মায় খোদ বাদশা—কেউ নয়।

নয়ন বলে, বাপ রে বাপ, দনিশমন্দ্ এলেন আর কি!

দেখতেই পাবে। লড়াই কতে ক'রে রুস্তম সাজবে তুমি, আর মরবে যত সব ওগারহ! এমনটি হয় না। মরবার জন্যে তৈরি হও নয়নচাঁদ, মরবার জন্যে তৈরি হও।

মরবো, বাঁচবার আর আমার ইচ্ছা নেই, কিন্তু তার আগে নিকেশ ক'রে যাবো তোমার মতো বে-ইমানকে।

এই বলে সে লাফিয়ে উঠে ছুটে যেতে চায় পাশের ঘরে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের দরজার দিকে দৃষ্টি পড়ে, আর পড়বামাত্র পাথরের মতো কঠিন ও স্তব্ধ হয়ে যায়।

খুরশিদ ও আলি খাঁরও তদ্রূপ স্তব্ধ কঠিন অবস্থা।

পাশের ঘরের আকস্মিক অস্বাভাবিক অবস্থা হকচকিয়ে দেয় সরাবকে। দরজার কাছে ছুটে এসে এহেন অবস্থার কারণ বুঝতে পারে, হোঃ হোঃ শব্দে হেসে উঠে বলে, বহুৎ আচ্ছা, তামাশা বেশ জমে উঠল দেখছি।

স্বরূপরাম ঘরে প্রবেশ করছে। আলি খাঁ, খুরশিদ খান ও সরাব মিঞা ভাবে নি যে, এই নাটকীয় মুহূর্তে স্বরূপ এসে পড়বে, তাই যখন [illegible] স্বরূপ ও নয়ন মুখোমুখি হ'ল, ক্ষণকালের জন্য তাদের কিংকর্তব্যবুদ্ধি লোপ পেলো। সরাব মিঞা ভুল বলে নি যে, তামাশা বেশ জমে উঠল। জমে উঠল বৈকি। ঘরের মধ্যে পাঁচটি মানুষ পাঁচটি মূর্তির মতো নিশ্চল, তার মধ্যে দুজন পরস্পরের দিকে অগ্নিগর্ভ দৃষ্টিতে নিরীক্ষমান, অবশিষ্ট তিনজন অসহায় ভাবে চেয়ে আছে তাদের দিকে, সকলেরই বাক্‌শক্তি অন্তর্হিত। স্বরূপ ও নয়ন দুজনেরই দৃষ্টি অগ্নিগর্ভ বটে, তবে সে আগুনের জাত আলাদা। স্বরূপ ইটের পাঁজার আগুন, নিজে পুড়ছে; নয়ন হাপরের আগুন, অপরকে পোড়াচ্ছে। স্বরূপের চোখেমুখে সর্বাঙ্গে বিষাদ, নয়ন ক্রোধে আর জিঘাংসায় দেদীপ্যমান। তবু দুজনের এক জায়গায় মিল, দুজনেই বাক্যহত আর স্তব্ধ।

কিন্তু ঘটনার দশকুশি পায়ের ধাপের পিছু পিছু ভাষার ক্রিয়াপদ ছুটতে পারবে কেন? বর্ণনাকে কখন ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছে ঘটনা। মুহূর্তকাল দুজনে

স্বর থেকে প্রায় একসঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠল—

শয়তান!

শয়তান! না নয়ন আমি শয়তান নই, আমি বেওকুফ, বে-ইমান।

স্বরূপের আত্মা-ব্যাখ্যায় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে নয়ন অধিকতর আক্রোশে গর্জন ক'রে উঠল, শয়তান, শয়তান, তুমি একশ' বার শয়তান, হাজার বার শয়তান।

বিষাদ-গদগদ কণ্ঠে স্বরূপ বলে উঠল, শয়তান কি ঠ'কে যায়? শয়তানের থেকে কি ছিনিয়ে নিতে পারে অসহায় নারীকে?

তুমি বোঝাতে চাও যে, সিপাহীরা ছিনিয়ে নিয়েছে তুলসীকে, তুমি কিছুই জানো না!

ঠিক তাই।

ঠিক তাই! ব্যঙ্গের সুরে বলে নয়ন। তারপরে আবার সুর চড়িয়ে বলে, কার হুকুমে তাকে নিয়ে গেলে বাড়ি থেকে?

হুকুম দেওয়ার তো কেউ ছিল না তখন বাড়িতে।

না-ই নিয়ে যেতে।

সিপাহীরা এসে নিয়ে যেতো।

গালিবের বাড়ি থেকেও তো নিয়ে গেল। রক্ষা করতে পারলে কি।

ভাই নয়ন, মানুষে শুধু চেষ্টা করতে পারে, চূড়ান্ত ফল তার হাতধরা নয়।

এ যে গীতা আওড়াতে শুরু করলে! শয়তানের মুখে রাম নাম।

নয়নের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক খাদে নেমে এসেছে দেখে শ্রোতাদের আশা হ'ল এবারে ব্যাপারটা মিটে যেতে পারে। এবারে কথা ফুটলো তাদের মুখে, এতক্ষণ কি বলবে, কাকে বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

খুরশিদ বলল, গীতা আওড়ালেই বা ক্ষতি কি, মানুষকে শোকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যেই তো শাস্ত্রের সৃষ্টি।

তুমি আবার কবে থেকে এত বড় শাস্ত্রী হ'লে খুরশিদ?

যেদিন থেকে নয়ন সিপাহ্‌সালার হয়ে উঠেছে।

কী, ঠাট্টা!

তবু ভালো যে, বুঝবার মতো বুদ্ধিটুকু লোপ পায় নি।

তবে কি আমি নির্বোধ?

শুধু নির্বোধ নয়, ঘমণ্ডী, গাঁওয়ার, ফেরেপবাজ।

নয়ন ও খুরশিদের মধ্যে যখন কথা কাটাকাটি হচ্ছিল, আলি খাঁ ও নবাক

মিঞা চুপ ক'রে শুনছিল, ভাবছিল এ ভালোই হচ্ছে, স্বরূপের আক্রোশটা নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে খুরশিদ। কিন্তু শব্দের একটা নিজস্ব গতিবেগ আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শব্দ ছাড়িয়ে যায় বক্তার অভীষ্ট সীমানাকে। এখানেও তাই ঘটতে যাচ্ছে দেখে আলি খাঁ বলল, আঃ থামো না খুরশিদ, কেন মিছে কথা-কাটাকাটি করছো নয়নচাঁদের সঙ্গে।

সম্পূর্ণ ভুল অর্থে গ্রহণ করলো নয়ন আলি খাঁর বক্তব্য। বলল, ওঃ—আমার সঙ্গে কথা বলতেও অনিচ্ছা! এতই ঘৃণ্য আমি। ভালো চললাম। এক ছাদের তলে আমি থাকতে চাই না ঐ হারামজাদার সঙ্গে।

একতরফা অভিযোগ ও অভিপ্রায় আরোপ এতক্ষণ সহ্য করেছিল স্বরূপ, বোধ হয় তলে তলে সহিষ্ণুতা ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সে গর্জন ক'রে উঠল, মুখ সামলে কথা ব'লো নয়ন, বংশ তুলে কথা ব'লো না।

ব্যঙ্গে এবং ক্রোধে মিলিয়ে নয়ন চীৎকার ক'রে উঠল, পরের মেয়ে ফুসলে নিয়ে উধাও হন, আবার বংশ দেখাচ্ছেন।

সাবধান নয়ন, তুলসী সম্বন্ধে অপমানের কথা ব'লো না।

যদিই বা বলি, তোমার তাতে কি। তুলসী আমার বোন হয়।

স্বরূপ বলে উঠল, এ সংসারে বোনের চেয়েও বড় সম্পর্ক সম্ভব।

ক্রুদ্ধ শ্বাপদের কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হ'ল—বটে! পর-মুহূর্তেই এক কাণ্ড ঘটে গেল।

খুরশিদরা কেউ সন্দেহ করে নি যে, নয়নের পকেটে পিস্তল আছে। কী হচ্ছে ভালো ক'রে কারো ধারণা করবার আগেই নয়ন পকেট থেকে পিস্তল বের ক'রে নিল। খুরশিদ ছিল তার পাশে দাঁড়িয়ে, স্ত্রীলোকসুলভ সহজাত বুদ্ধির বশে বুঝলো নয়নের মতিগতি ভালো নয়। নয়নের পিস্তল বার করা আর স্বরূপকে লক্ষ্য ক'রে গুলী ছোঁড়া এক সঙ্গে হ'ল—ঠিক সেই সঙ্গে, কাকতালীয়বৎ, খুরশিদ হাত দিয়ে পিস্তলের নলটা উপরের দিকে একটু ঠেলে দিল। আগুনের ঝলক। শব্দ। ধোঁয়া। উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত গুলীর আঘাতে প্রজ্বলিত কাঁচের ঝাড়ের উৎকট শব্দে পতন। দেয়াল সংলগ্ন বাতির আলোতে লক্ষ্য ক'রে সকলে চমক উঠল—তির্যকভাবে ছাদের দিকে উৎক্ষিপ্ত রক্তের ঐ তরল তর্জনী এলো কোথা থেকে? পরমুহূর্তেই সমস্ত সন্দেহ নিরসন ক'রে খুরশিদ মূর্ছিত হয়ে পড়লো।

সরাব, আলি খাঁ, স্বরূপ এক সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠল—এ কি ক'রলে নয়ন।

প্রথম বিহ্বলতা কেটে যেতেই তিনজনে ধরাধরি করে মূর্ছিত খুরশিদকে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিল, আর দেখে আশ্বস্ত হ'ল যে, আঘাত মারাত্মক নয়, ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার উপরের দুটো পর্ব উড়ে গিয়েছে। কাজেই

একজন পাশ-করা হিন্দুস্তানী ডাক্তার ছিল, তাকে ডেকে আনা হ'ল। সে পরীক্ষা ক'রে দেখে বলল, ভয় নেই, দু'চার দিনেই সেরে যাবে। ততক্ষণে খুরশিদ জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। ডাক্তারের পরামর্শে গরম দুধের সঙ্গে ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে খাইয়ে দেওয়া হ'ল। ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিয়ে ডাক্তার চলে গেলে সকলে আবিষ্কার করলো নয়ন নেই, এতক্ষণ তার কথা কারো মনেই ছিল না। সবাই ভাবলো এ মন্দের ভালো, থাকলে না জানি আবার কি ক'রে বসতো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খুরশিদ ঘুমিয়ে পড়লো। ওরা তিনজন পালাক্রমে জেগে বসে রইলো।

ভোর রাতে ঘুম ভাঙতে খুরশিদ ইঙ্গিতে স্বরূপকে কাছে ডাকলো। বলল, স্বরূপ ভাই, তুমি আজই অন্ধকার থাকতে থাকতে দিল্লী ছেড়ে চলে যাও।

বিস্মিত স্বরূপ শুধলো, কেন?

কেন! নয়নের পিস্তল আমার রক্ত খেয়ে তৃপ্ত হবে না, তোমার রক্তের জন্যেই ওর আকাঙ্ক্ষা।

হ'লই বা।

না না ভাই, অবুঝের মতো ক'রো না।

খুরশিদ, দু'জন নারীর রক্তের জন্যে আমি জামিন। আমার মৃত্যু না হ'লে তো শান্তি পাবো না।

মরবে কেন স্বরূপ।

বাঁচবো কেন বলতে পারো?

তা বটে। আজ জীবন-মৃত্যু তুলাদণ্ডে সমান ওজনে দুলছে।

তার পরে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, মরবার সুযোগ অনেক পাবে। এখন নয়। আজ পালাও।

স্বরূপকে নীরব দেখে বলল, তুমি জানো না, নয়ন তোমাকে হত্যার জন্যে কত বড় ফাঁদ পেতেছে। শহরের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে গুণ্ডা মোতায়েন হয়েছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্বরূপ বলল, কিন্তু যাবোই বা কোথায়?

দুনিয়াটা মস্ত। দিল্লি ছাড়াও অনেক জায়গা আছে।

আছে সত্য, কিন্তু ভদ্রলোকের জায়গা আর আছে কিনা সন্দেহ।

তারপর ব্যাখ্যা ক'রে বলল, তামাম হিন্দুস্থান সিপাহী আর ফিরিঙ্গিতে ভাগ ক'রে নিয়েছে, আমার মতো নিরীহের পা ফেলবার স্থান আছে কি না সন্দেহ।

আছে কি না তাই না হয় খুঁজে ভাখো। এ জায়গা তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়।

ভালো, তাই যাবো। তোমার কাছে আমার রক্তের ঋণ, তোমার কথা অমান্য করবো না।

যাবো না, এখনি রওনা হও, এখনো যথেষ্ট অন্ধকার আছে।

তারপর—এই নাও, বলে বালিশের তলা থেকে পাঁচটা মোহর বের ক'রে তার হাতে দিলো।

এ কেন?

ঐ যে বললাম দুনিয়াটা মস্ত। আর কোন কারণে না হোক দেখলে আমার কথা মনে পড়বে।

তার জন্যে তো একটাই যথেষ্ট।

না, না, পাগলামি ক'রো না, নাও। এই বলে জোর ক'রে হাতে গুঁজে দিল মোহরগুলো।

তারপরে আলি খাঁ ও সরাব মিঞাকে কাছে ডেকে সমস্ত বলল খুরশিদ।

আলি খাঁ ও সরাব একবাক্যে সমর্থন জানালো, বলল, স্বরূপের আর এখানে থাকা উচিত নয়।

তখন সরাব মিঞা বলল, কিন্তু যাবে কোন্ পথে। সব দরবাজায় সিপাহী পাহারা দিচ্ছে।

আলি খাঁ বলল, সেলিমগড়ের কাছে কল্‌কাত্তা দরবাজায় পাহারা নেই, নৌকার সাঁকো দিয়ে যমুনা পার হয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারবে। তবে আর দেরি হ'লে কি হয় বলা যায় না।

তারপরে স্বরূপের দিকে তাকিয়ে বলল, যেতে হ'লে এখনি প্রস্তুত হওয়া দরকার।

স্বরূপ বলল, আমার আবার প্রস্তুতি কি? একজন নারীকে আহত ক'রে একজনকে নিহত ক'রে নিজের প্রাণ নিয়ে যে পালাচ্ছে, পথের মধ্যে অপঘাতে মরলেই তার যথোচিত দণ্ড হয়।

খুরশিদ বলল—

আঁসু বহানা হায় মানা
বুলবুলোঁ মৎ রো এহাঁ।

স্বরূপ ভাই, চোখের জল ফেলবার সময় এখন নয়, দিল্লির দশা যখন লোকমুখে শুনতে পাবে তখন না হয় ফেলো চোখের জল। এখন এসো, আর দেরি নয়।

অগত্যা আলি খাঁ ও সরাবকে আলিঙ্গন ক'রে, শয্যালগ্ন খুরশিদের কপালে

ওষ্ঠাধর ঠেকিয়ে স্বরূপ ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল খুরশিদ জানের কুঠি থেকে।

তারপরে, অনেক পরে নৌ-সাঁকো পথে যমুনা পার হয়ে যখন তাকালো পশ্চিম দিকে, দেখল, প্রকাণ্ড লালকেল্লা মস্ত একটা টাটকা তাজা ক্ষতস্থানের মতো দগ্‌দগে রক্তাভ।

॥ ১৪ ॥

অগর ফিরদৌস বর রূয়ে জমীন অস্ত্‌
ওয়া হমীনস্ত্‌, ওয়া হমীনস্ত্‌, ওয়া হমীনস্ত্‌॥

স্বরূপ শাহী শড়ক ছেড়ে দিয়ে ডান হাতে মাঠের মধ্যে নেমে পড়লো। শাহী শড়ক ধরেই সিপাহীরা দিল্লি আসছে তাদের সামনে সে পড়তে চায় না; বাঙালী বলে বুঝতে পারলে আর রক্ষা থাকবে না, বাঙালীদের ওরা মোটেই বিশ্বাস করে না। কিছুক্ষণ চলবার পরে পাটপারগঞ্জ নামে এক জায়গায় এসে পৌঁছলো স্বরূপ। সে জানতো যে, এখানে ১৮০৩ সালে লর্ড লেক মারাঠা ফৌজকে হারিয়ে দিয়েছিল। দেখতে পেলো, লাল পাথরের একটি স্তম্ভ সদম্ভে সেই বিজয়বার্তা ঘোষণা করছে। পাশেই প্রকাণ্ড একটা পিপল গাছ আর ইঁদারা। ঐ ছায়াটুকুর ঐ জলটুকুর তার বড় আবশ্যক ছিল। আকণ্ঠ শীতল জল পান ক'রে জিরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে পিপল গাছটা ঠেস দিয়ে বসতেই চোখ পড়লো প্রাচীরে গম্বুজে গম্ভীর লালকেল্লা। কিছুতেই কি বস্তুটা তার সঙ্গ ছাড়বে না। ঐ দগ্‌দগে ক্ষতের স্মৃতি তো অপরিদম্য বেদনায় রয়ে গিয়েছে মনের মধ্যে —চোখের উপরে আবার বস্তুটা কেন? অদৃষ্টের অভিশাপকে এমনিভাবেই কি পিছনে লেগে থাকতে হয়! নাঃ, অদৃষ্টকে সে ফাঁকি দেবে। কিছুতেই তাকাবে না ঐ কেল্লাটার দিকে। দুই চোখ বন্ধ করলো সে।

পরমুহূর্তেই চমকে উঠল। একি, কামানের গর্জন যে! কোথা থেকে আসে! ঐ পশ্চিম দিক থেকেই মনে হচ্ছে। তাকাতেই দেখতে পেলো লালকেল্লার ও সেলিমগড়ের সমস্ত বুরুজগুলো বারুদের ধোঁয়ায় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ক্রমেই অধিকতর অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। গর্জনের আর বিরাম নাই। আগুনের ঝিলিক, ধোঁয়া, গর্জন! আগুনের ঝিলিক, ধোঁয়া, গর্জন! চলতেই থাকে। স্বরূপ ভেবে পায় না উপলক্ষ, লড়াই নিশ্চয় নয়—ফাঁকা আওয়াজ, শূন্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত। যুদ্ধ বা আনন্দোৎসব উপলক্ষেই এমন হয়ে থাকে। সে বুঝতে পারে না, যুদ্ধ জয়ই বা হ'ল কোথায়, আর আনন্দ-উৎসবই বা কেন!

লালকেল্লার দেওয়ানী খাসে বাদশা বাহাদুর শা দরবারে বসেছেন। বাদশা রূপোর সিংহাসনে এসে বসবামাত্র কেল্লার প্রত্যেক বুরুজ থেকে, শাহ্‌জাহানাবাদের প্রত্যেক বুরুজ থেকে শত কামান ঘোর গর্জনে সেই শুভ-সংবাদ হিন্দুস্তানের দিকে দিকে প্রেরণ করলো। শুভ সংবাদ বৈকি! গত পনেরো বছরের মধ্যে বাদশা প্রকাশ্য দরবারে বসেন নি, গত পনেরো বছরের মধ্যে তখ্‌ৎ-এ-তাউসের অনুকরণে গঠিত রূপোর সিংহাসনখানা স্থাপিত হয় নি দেওয়ানী খাসে। আজ তখ্‌ৎ-এ-তাউসে প্রকাশ্য দরবারে বসেছেন আবুল মজফ্‌ফর সিরাজউদ্দিন বাহাদুর শাহ্‌ গাজী, দীন দুনিয়ার মালিক হিন্দুস্তানের বাদশাহ। আর ঐ কামান গর্জনে দীর্ঘকালের স্বপ্ন ভেঙে বিস্ময়ে চোখ কচলে জেগে উঠেছে শাহ্‌জাহান আলমগীরের মধ্যাহ্ন গৌরবের স্মৃতি। বাদশার পাশে সারবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে শাহ্‌জাদার দল, মীর্জা মুঘল, মীর্জা খিজির সুলতান, মীর্জা আবুবকর। তারপরে যার যার স্থানে দণ্ডায়মান উজীর, সিপাহ্‌সালার, সদর-ই-জাহান, মুহ্‌তাসিব, কাজী, মীর বক্সী, মীর আতশ, খান সামান, ঠিক যেমন দাঁড়াতো শাহ্‌জাহান আর আলমগীরের দরবারে। ঠিক তেমন, তবু তেমন নয়। এ সেই দীপ্ত মধ্যাহ্নের ম্লান সায়াহ্ন। ধার-করা পোশাকে বাদশা-বাদশা খেলা।

এ খেলা খেলতে বাদশা রাজী হ'তে চান নি। অবাদশার বাদশা সাজতে লজ্জা না হ'তে পারে, কিন্তু বাদশার বংশে জন্মে বাদশার অভিনয় করতে যাবেন কেন বাহাদুর শা।

বাদশা হয়েই তো আছি, আবার দরবারে কী কাজ? শাহ্‌জাদার দল লম্বা কুর্নিশ ক'রে বলে, সেইজন্যই তো দরবারের আবশ্যক। বাদশা আছেন, দরবারে বসছেন না, লোকে ভাববে কি?

বাদশাহী দরবার তো যে সে ব্যাপার নয়, তার অনেক কায়দাকানুন, অনেক খরচ। ফৌজের তন্‌খাতেই টানাটানি চলছে তার উপরে আবার এ খরচ কেন?

হাসান আকসারি সদর-ই-জাহান সেজেছে, বলল, শাহানশা যা বলছেন তা একশ'বার ঠিক, তবে কিনা বাছুরকে একটু দুধ না খেতে দিলে দুধ বের হবে কেন? টাকা খরচ করলেই টাকা আদায় হবে।

হাসান আকসারি বাদশার প্রীতিভাজন, কাজেই তার কথাগুলোও অবশ্যই মূল্যবান, উপস্থিত সকলে মাথা নেড়ে সমর্থন জ্ঞাপন করলো। প্রধান দরবারীদের পিছনে দীনভাবে দণ্ডায়মান ছিল মীর্জা গালিব আর সুখানন্দ পণ্ডিত। তারা আসতে চায় নি, শেষে ভাবলো—না গেলে সন্দেহ আরো বাড়বে, এমনিতেই

তারা সন্দেহভাজন।

সুখানন্দ বলেছিল, গালিব সাহেব, মরার বাড়া তো গাল নেই, তবে আবার কেন ?

গালিব বলেছিল, আপত্তি ক'রো না পণ্ডিতজী, চলো। সুযোগ পেলে বাদশার কানে কথাটা তুলতে হবে।

লাভ ?

আর কারো মেয়ে ও ভাবে না যায়।

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে সুখানন্দয়, বলে, চলো, তবে কাজ হবে ভরসা নেই।

ভরসা আমারও নেই, বাদশা এখন পুতুল।

এর চেয়ে গজল লেখা অনেক ভালো।

ভালো বৈকি, নইলে কি লিখতাম।

তোমার লেখা আর বাদশার লেখা এক কথা নয়। বাদশা যখন গজল লেখেন তখন এই রকম চলে বাদশাহী।

দুজনে গিয়ে পিছনের সারে দাঁড়ায়। কেউ বাধা দেয় না বটে তেমনি আবার কেউ আপ্যায়নও করে না।

এখন হাসান আকসারির উক্তিতে গালিব ইশারা করে, এমন সময়ে দেখতে পায় একেবারে সামনের সারিতে কোতোয়াল থেকে এক লাফে উজীর পদে উন্নীত হাকিম আসানুল্লাকে। আবার ইশারা করে গালিব—তুলনামূলক বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলে, মানিকজোড়।

বাহাদুর শার বাদশাহী অভিনয়ে আপত্তির অনেক কারণ। লালকেল্লায় বন্দী হওয়ার পর থেকে প্রত্যেকের প্রতি তাঁর অবিশ্বাস, প্রত্যেকের প্রতি তাঁর সন্দেহ। হাকিম আসাহুল্লা বিশ্বাসভাজন বটে, কিন্তু তাকে উজীর পদে নিযুক্ত করাতে সিপাহীপক্ষ তেমন আপত্তি করে নি কেন বুঝতে পারেন না বাহাদুর শা। তবে সেও কি তলে তলে ওদের দলে যোগ দিয়েছে। হবেও বা। দুর্বলের পক্ষে কেউ নয়। সাজা বাদশার পক্ষে ততক্ষণ—যতক্ষণ থাকে সাজপোশাকগুলো। সেগুলোও ধার করা। যেমন ধার করা এই দেওয়ানী খাসের জরির কিংখাব, সোনার ঝালর, রূপোর চামর, ঝাড়লণ্ঠন, বাতিদান সমস্তই। বাদশার দৃষ্টি ধার করা সাজসরঞ্জামের হিসাব করতে করতে হঠাৎ এক জায়গায় বাধা পায়—

অগর ফিরদৌস বর্ রূয়ে জমীন্ অস্ত্,
ওয়া হমীনস্ত্, ওয়া হমীনস্ত্, ওয়া হমীনস্ত্।

তিনি ভাবেন, তা বটে, পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে তা এইখানে

এইখানে, এইখানে। এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পায়, কিন্তু হাসবার উপায় নেই। বন্দীর মুখে হাসি রক্ষীর প্রতি উপহাস। মনের হাসি মনে মিলিয়ে যায়। সম্মুখে যখন লম্বা লম্বা কুর্নিশ, রেশমের রুমালে জোড়া, পাঁচ-জোড়া মোহর পায়ের কাছে নিবেদন, নৌবৎখানায় যখন রাগরাগিণীর আলাপ, মাঝে মাঝে নকীবের ঘোষণা, আর বুরুজে বুরুজে কামানের গর্জন, তখন একে স্বর্গ মনে না করবার আর কি কারণ থাকতে পারে! শাহ্‌জাহান, আলমগীর অবশ্যই স্বর্গ মনে করেছেন একে! কিন্তু তাই বলে কি তাঁর পক্ষেও স্বর্গ! দুর্বলের স্বর্গ নেই। প্রবলের পক্ষে যা স্বর্গ দুর্বলের পক্ষে তাই কারাগার। তখনি মনে পড়ে গত দেড়শ' বছরের ইতিহাস। বড়া তালুকের সৈয়দদের হুকুমে বাদশা ফারুকশিয়রের চোখ সুচিবিদ্ধ হয়েছিল ঠিক এখানেই; বাদশা মহম্মদ শা বিজয়ী নাদির শাকে স্বহস্তে পরিবেশন ক'রে ভোজ দিয়েছিলেন ঠিক এখানেই; পাঠান গোলাম কাদের বৃদ্ধ শাহ আলমকে মাটিতে পেড়ে ফেলে স্বহস্তে চোখে সূচ বিঁধিয়ে দিয়েছিল ঠিক এখানেই। বাহাদুর শা ভাবেন স্বর্গ বৈকি! তবে বাদশার না হোক—সৈয়দদের, নাদির শার, গোলাম কাদেরের স্বর্গ বৈকি। একজনের স্বর্গ হ'লে অপরের নরক হ'তে বাধা নাই। তিনি মনে মনে খুব গোপনে অনুমান করতে চেষ্টা করেন, এবার কার পক্ষে হবে স্বর্গ? মীর্জা মুঘল, শেখ কুলিজ, না কোম্পানী বাহাদুর। শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর জয় হবেই, তখন সাজা-বাদশার না জানি কি পরিণাম!

বাদশার তটস্থ কূটস্থ ভাবে কারো বিচলিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পাওয়ার কথাও নয়। পুত্তলিকা হাত পা নাড়বে কেউ প্রত্যাশা করে না। অবশ্য একটু আধটু নাড়লে তামাশা জমে ভালো, তবে বেশী নয়। দরবারীদের পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে রজব আলী। লোকটা দিল্লী কোতোয়ালীর গোয়েন্দা। লোকটা আকারে ছোট, এক চোখে কানা আর এক পায়ে খোঁড়া। লোকে কানা খোঁড়া বলে ইঙ্গিত করলে রজব আলী বলে, আরে মিঞা, দুটো চোখ আর দুখানা পা যখন ছিল তখনও দেখেছি, হেঁটেছি, এখনো দেখছি হাঁটছি—তফাৎ বুঝি না তো। আর তাছাড়া একটা চোখের, একখানা পায়ের জন্যই লোকে দিতে চায় না, কি কাজ জুটোয়? ইয়া আল্লা! যাই, সময় হ'ল।—লোকে বোঝে রজব আলীর মৌতাতের সময় হয়েছে।

রজব আলী সকলের পিছনে দাঁড়ালেও সকলেও চেয়ে বেশী আগ্রহ নিয়ে দরবারে এসেছে, ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় তার জানা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ইতিমধ্যেই বিশ্বাসী লোক মারফতে দিল্লীর ঘটনা কোম্পানীর হাতে পৌঁছে দিতে আরম্ভ করেছে সে। তার লোক আগ্রা, মীরাট, আম্বালা সব জায়গায় রওনা

হয়ে গিয়েছে। সে বলে, গোয়েন্দার পক্ষে এক চোখের মতো সুবিধে আর নেই, ওতে ভালো ক'রে লক্ষ্য করা যায়। সে দেখে আর বুঝতে পারে, এই দরবার, এই বাদশা, উজীর, বক্শী, খানসামান সমস্তই সাজা পোশাকের পুতুল; বোঝে, এ বাস্তব নয়—অভিনয়। ভাবে, ভাগ্যে গোয়েন্দার স্থান পিছনের সারিতে, তাই নেপথ্য থেকে দেখবার সুযোগ মেলে আল্‌গা দড়িদড়া সব ঝুলছে।

এই নাটের যারা গুরু সেই শাহ্‌জাদার দল, কুলিজ খাঁ, শেখ বান্নু ও হাসান আকসারি বিভিন্ন পদমর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন সারিতে দণ্ডায়মান হ'লেও কাছাকাছি ছিল, আর সানন্দে পর্যবেক্ষণ করছিল যে, ঘটনা পর্যায় তাদের অভিপ্রায় অনুসারেই চলছে। এই ক'দিনের ঘটনার উপরে খাস বাদশাহী পাঞ্জা অঙ্কিত ক'রে দেওয়ার মতলবটা প্রথম মাথায় আসে মীর্জা মুঘলের। ষড়যন্ত্রকারীদের ডেকে কথাটা প্রকাশ করবামাত্র সকলে রাজী হ'ল। তারপরে পালা পদ বণ্টনের। গোড়াতেই মীর্জা মুঘলকে সিপাহ্‌সালার নিযুক্ত করেছিলেন বাদশা। এবারে মীর আতশ, মীর বক্শী, খানসামান প্রভৃতি উচ্চ পদে ষড়যন্ত্রকারীরা নিযুক্ত হ'ল। স্বভাবতই সদর-ই-জাহান পদটা পড়লো হাসান আকসারির ভাগে, দরবেশ ফকির আর মক্তব মাদ্রাসার পড়ুয়াদের মধ্যে অর্থ বিতরণের দায়িত্ব ঐ পদটায়। হাসান আকসারির খুব পছন্দ ঐ পদ। দাতব্য অর্থের হিসাব রাখতে নেই এই হচ্ছে হাসান আকসারির ধারণা। মুশকিল বাধলো উজীর পদটা নিয়ে। ওটাই যাবতীয় বাদশাহী পদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। ওটার জন্যেই চলেছে কত না লড়াই, কত না গুপ্তহত্যা। এখন অবশ্য উজীর পদ শূন্যগর্ভ, তবু পুরানো গৌরবের তাপ এখনো আছে ওর গায়ে। ওটা কাকে দেওয়া যায়? মীর্জা মুঘল প্রস্তাব করলো যে, হাকিম আসাদুল্লা হওয়ার যোগ্যতম লোক। শুনবামাত্র সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল, আসাদুল্লা উজীর! বাদশা পক্ষের লোক, খুব সম্ভব তলে তলে কোম্পানী পক্ষেরও বটে। সে হবে কিনা উজীর।

মীর্জা মুঘল বলল, আরে সেইজন্যই তো তাকে উজীর বানাতে চাই। বাদশা নিজের লোককে উজীর দেখে নিশ্চিন্ত হবেন। আবার ওকে উজীর দেখে কোম্পানীও হাত গুটোবে, ভাববে, ওঃ শয়তান, তলে তলে তুমি বাদশাহের লোক।

হাসান আকসারি বলল, কিন্তু উজীর যদি আমাদের বিরুদ্ধে যায়।

গেলেই হ'ল! যেতে দিচ্ছে কে? তাকে পদ দিচ্ছি বলেই যে অধিকার দিচ্ছি, তা কে বলল?

এতক্ষণে মীর্জা মুঘলের মতলবখানা বুঝতে পেরে সবাই কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ

ক'রে উঠল। শেখ বান্নুর সমর্থন জ্ঞাপিত হ'ল নাসিকা থৎকারে।

কুলিজ খাঁ বলল, একবার বাদশার অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক।

কেন আবশ্যক, জিজ্ঞাসা করে মীর্জা মুঘল। সে বলে, এখন আসল বাদশা হচ্ছে আমাদের এই জমায়েৎ। কাজ করবো আমরা—নাম হবে বাদশার, এখন তিনি তো বন্দী।

হাকিম আসানুল্লার অনুমতিটা অন্তত আবশ্যক।

হাকিম সাহেব নির্বোধ নয়। এ পদ প্রত্যাখ্যান ক'রে আমাদের অপ্রীতিভাজন কথনোই সে হবে না।

হ'লও তাই। প্রস্তাব শুনে আসানুল্লা বলল—এ তো আশাতীত গৌরব। শেষ বয়সে উজীর হবো কে ভেবেছিল।

তখনি সে রাজী হ'ল। ক রাত্রি আগের লাশবহনের স্মৃতি সে ভোলে নি। বুঝলো এই পদ গ্রহণ না করলে সিপাহী পক্ষের দাগী হয়ে থাকবে, আর গ্রহণ করলে হবে বাদশার গোদার কারণ। মীর্জা মুঘল ভুল বলে নি, আসানুল্লা নির্বোধ নয়। মনে মনে বাদশার দিকে থেকে মুখে সিপাহীর দিকে থাকাই স্থির করলো। তারপরে নূতন উজীরের নামেই ফরমান বের হ'ল, আগামী কাল দেওয়ানী খাসে বাদশা দরবারে বসবেন, ছোট বড় প্রধান অপ্রধান সবাই যেন নজরানা ও ভেট নিয়ে অবশ্য অবশ্য উপস্থিত থাকে।

দরবারের কাজ পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে চলছে দেখে ষড়যন্ত্রকারীদের আহ্লাদের সীমা নেই।

এমন সময়ে উজীর, মীর বক্শী ও সিপাহ্‌সালার ছ' পা এগিয়ে এসে কুনিশ ক'রে দাঁড়ালো। বাদশা মুখ তুলে চাইলেন, চোখে জিজ্ঞাসা, কি ব্যাপার?

মীর বক্শী আর একদফা কুনিশ করলো, হাতে একগোছা কাগজ, বলল, শাহানশা, পাতিয়ালার মহারাজা নরেন্দ্র সিং, জয়পুরের রাজা রামসিং আর আলোয়ার, বুঁদি, যোধপুর, কোটার রাজারা চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছেন যে, তাঁরা শীঘ্রই ফৌজ নিয়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য শাহ্‌জাহানাবাদে আসছেন।

দরবারী কানুন অনুযায়ী এসব ঘটনা বিবৃত করবার দায়িত্ব উজীরের। কিন্তু তাকে এ দায়িত্ব দিতে সাহস পায় নি বিদ্রোহী পক্ষ। তারা জানতো, এত বড় একটা মিথ্যা আসানুল্লার চোখ এড়াবে না, আর সেই জন্যেই সে বলতে চাইবে না। অথচ উজীরকে বাদ দিলে দরবারী প্রথা ভঙ্গ হয়, তথন মাঝামাঝি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ল। উজীর সঙ্গে থাকবে, কথাগুলো বলবে মীর বক্শী কুলিজ খাঁ। এ প্রস্তাব স্বীকার করাতে বেশী পীড়াপীড়ি করতে হ'ল না আসানুল্লার উপরে। সে

জানে, পহলে আত্মা পিছে পরমাত্মা, আগে আসাহুল্লা পরে বাহাতুর শা। এখনো সে ঘাড়ের উপরে লাশটার ভার অনুভব করতে পারে।

বাহাতুর শা নির্বোধ নন, বুঝলেন যে কথাটা সর্বৈব মিথ্যা, কিন্তু সংশয় প্রকাশ যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না, তাই গম্ভীরভাবে অনুমোদন ক'রে মাথা নাড়লেন। মনে হ'ল—এ দেওয়ানী খাস ফিরদৌস, এখানে সত্য-মিথ্যায় প্রভেদ নেই, আর থাকলেও সেই সামান্য প্রভেদ নিয়ে আলোচনা নিরাপদ নয়। বাদশার অনুমোদন জানতে পেরে দরবারীগণ আর একবার কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ ধ্বনি করলো।

তারপর মীর বক্‌শী আর এক গোছা কাগজ বের করলো।

আবার বাদশার চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন, এগুলো কি ?

শাহেনশা, ঝঝ্‌ঝরের নবাব আবদুর রহমান খাঁ, পতৌদির নবাব আকবর আলী খাঁ, বল্লভগড়ের রাজা নহর সিং, ফারুকনগরের নবাব আহমদ আলী খাকে শাহী পরওয়ানা পাঠানো হচ্ছে, তাঁরা যেন শীঘ্র ফৌজ নিয়ে লালপর্দা বা বাদশাহী দরবারে এসে হাজির হন।

বাদশা বললেন, বেশ, পরওয়ানাগুলো আমার মীর মুন্সীর হাতে দাও, দুপুরবেলা দেখে মোহর ক'রে দিতে হুকুম দেব।

মীর বক্‌শী অভিবাদন ক'রে বলল, শাহেনশাকে তকলিফ করতে হবে না, পরওয়ানা লেখা ও মোহরসেপ্ত হয়েছে।

বাদশার মুখমণ্ডলে এক লহমার জন্যে উষ্মার ছায়া পড়েছিল, কিন্তু তখনি মনে হ'ল তিনি বন্দী, বন্দীর প্রতিবাদ করবার অধিকার নাই, ভাল হোক, জোচ্চোরি হোক—বন্দীকে সহ্য করতেই হবে। তাঁকে বাদশা সাজিয়ে এরা করতে চায় বাদশাহী। চমৎকার। এ না হ'লে আর ফিরদৌস কেন! তঁরে মনে যা-ই থাক না কেন, মুখে বললেন, আচ্ছা পরওয়ানাগুলো তাহলে পাঠিয়ে দাও।

বাদশার অনুমতি পেয়ে দরবারীগণ একদফা কেয়াবাৎ ধ্বনি ক'রে ওঠে।

অতঃপর দরবার ভঙ্গ জ্ঞাপন ক'রে তোপের আওয়াজ হ'ল, বাদশা উঠতে যাবেন— এমন সময়ে ভিড় ঠেলে সামনে এসে কুর্নিশ ক'রে দাঁড়ালো মীর্জা গালিব আর পণ্ডিত সুখানন্দ। তারা প্রত্যেকে রেশমের রুমালে পাঁচটা ক'রে মোহর রাখলো বাদশার পায়ের কাছে। বাদশা বিস্মিত, দরবারীগণ হতবুদ্ধি, পরিকল্পনায় মধ্যে এ ব্যাপারটা তো ছিল না, কিন্তু তখন আর সামলাবার উপায় নেই, ভাবলো দেখা যাক কতদূর কি হয়, তেমন রসভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিলে শুধরে নিলেই হবে; শোধরাবার অনেক উপায় আছে।

অনেক ক'দিন পরে পরিচিত ইষ্টগোষ্ঠীর মুখ দেখে বাদশার মুখ প্রফুল্ল হয়ে

উঠল। শুধালেন, মীর্জা সাহেব, সব ভালো তো।

গালিব বলল, ভালো আর কই জাহাপনা! ক'দিন আগে সুখানন্দ পণ্ডিতের মেয়েকে সিপাহীরা গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে এসেছিল, ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে তাকে খুন করেছে!

গালিবের পাশে দণ্ডায়মান সুখানন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বাদশা বুঝতে পারলেন, সর্বনাশের ধ্বংসাবশেষ।

এতক্ষণ পরে পুত্তলিকার কণ্ঠে মানব স্বরের মূর্ছনা জাগলো, বাদশা বাবরের শেষ প্রতিনিধি গর্জন ক'রে উঠলেন, সিপাহ্‌সালার, নালিশটা কি সত্য?

মীর্জা মুঘল ধীর কণ্ঠে বলল, না শাহেনশা, সত্য নয়।

তবে মীর্জা সাহেব মিথ্যা নালিশ করছেন?

মীর্জা সাহেবের নালিশ সত্য, তবে নালিশের কারণ সত্য নয়।

কেমন?

সুখানন্দ পণ্ডিতের মেয়ে সুস্থ আছে, সুখে আছে।

যতক্ষণ বাদশায় ও শাহ্‌জাদায় উত্তর প্রত্যুত্তর চলছিল, কথায় না হোক কথার সুরে বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে, তুলসীর মৃত্যু সংবাদটা খুব সম্ভব অতিরঞ্জন। বিষাদখিন্ন মুখমণ্ডলে বর্ষারাতের শেষে আকাশে আলোর রেখার মতো আনন্দের আভা ফুটে উঠছিল সুখানন্দর মুখে কিন্তু যখনি শুনলো যে তুলসী সুস্থ আছে, সুখে আছে, উপচীয়মান আলো ঢাকা পড়ে গেল মেঘের স্তূপে।

বাদশার কানেও বেসুর বাজলো শাহ্‌জাদার কথা।

সুস্থ আছে সুখে আছে, তবে পণ্ডিতজীর বাড়িতে ফিরিয়ে পাঠাও নি কেন? কোথায় আছে?

ইমানী বেগমের কুঠিতে।

সেখানে কেন?

তখন মীর্জা মুঘল একে একে সবিস্তারে সব বর্ণনা করলো—সত্য কথাই বলল। মুখ্য বিষয়ে যারা মিথ্যাবাদী, গৌণ বিষয়ে তাদের সত্যবাদী হ'তে বাধা নেই, বরঞ্চ গৌণ বিষয়ে তারা নৈষ্ঠিক সত্যবাদীই হয়ে থাকে। মানব মনের বিচিত্র লীলার এও এক প্রকাশ।

সমস্ত বিবরণ শুনে বাদশা, গালিব ও সুখানন্দ বুঝলো তুলসী যেমন সাহসী তেমনি বুদ্ধিমতী। আজকার শাহ্‌জাহানাবাদে ইমানী বেগমের কুঠিই অসহায়ের যথার্থ নিরাপদ আশ্রয়—পিতৃগৃহ উপেক্ষা ক'রে সেখানে আশ্রয় প্রার্থনায় বুদ্ধি ও সাহস দুই-ই প্রকাশ পেয়েছে।

বাদশা হুকুম করলেন, সিপাহ্‌সালার, এখনি বায়োজন আহাদি সঙ্গে দিয়ে তাঞ্জাম পাঠিয়ে দাও ইমানী বেগমের কুঠিতে, তুলসীবাঈকে ফিরিয়ে দিয়ে আসুক পণ্ডিতজীর কুঠিতে।

মীর্জা মুঘল জানালো যে, বাদশার হুকুম যথাযথ পালিত হবে।

গালিব ও সুখানন্দ কুর্নিশ ক'রে বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করলো। বাদশার একবার ইচ্ছা হ'ল তাদের আগের মতো আসতে বলেন, তখনি বুঝলেন তাতে উভয় পক্ষেরই বিড়ম্বনা বাড়বে। তাই চুপ ক'রে রইলেন। মানুষ আবার পুতুলে পরিণত হয়েছে।

বাদশা দরবার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবামাত্র বুরুজে বুরুজে কামান গর্জন ক'রে উঠল। বাদশা বিশ্রাম কক্ষের দিকে চললেন।

দরবার ভেঙে যাওয়ামাত্র মীর্জা আবুবকর একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে একান্তে ডেকে নিয়ে কী যেন আদেশ করলেন। দরবারীগণ বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো দেওয়ানী আম বাঁয়ে রেখে নৌবৎখানা হয়ে লাহোর দরবাজার দিকে চলল। বিপুল কামান গর্জনের মধ্যে নিঃসঙ্গ বাদশা আপন মহলের দিকে চলেছেন।

কামানের আওয়াজে জেগে উঠল স্বরূপরাম, একটু জিরিয়ে নেবে বলে শোবামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে ভাবলো কী চলছে ওখানে, কোন্ জলুস, কোন্ তামাশা? ওদিকে তাকাবে না সঙ্কল্প করা সত্ত্বেও অবাধ্য চোখ গিয়ে পড়লো। ধোঁয়ার কুয়াশার মধ্যেও বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ঐ দগদগে রক্তে রাঙা ক্ষতস্থানটা। ওর স্মৃতির হাত থেকে বাঁচবার উপায় যদি না-ই থাকে তবে এত দূরে চলে যেতে হবে, যাতে ঐ বস্তুটা অন্তত আর চোখে না পড়ে। নিমেষমাত্র বিলম্ব না ক'রে সব আলস্য, সব ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে পুবদিকে চলতে আরম্ভ করলো। খুরশিদ বাঈ তো মিথ্যা বলে নি, দুনিয়াটা মস্ত বড়। নাঃ, সে আর পিছে ফিরে তাকাবে না। সম্মুখে আছে খুরশিদ বাঈ নির্দেশিত মস্ত দুনিয়া।

॥ ১৫ ॥

"বাদশা শাহ আলম
দিল্লি সে পালম"

১৮০৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। লালকেল্লার পূর্বদিকের প্রাচীর, বুরুজ, গম্বুজের উপরে শত শত লোক উঠে তাকিয়ে আছে যমুনার ওপারে, চোখের দৃষ্টি শানিয়ে নিয়ে কামানের ধোঁয়া ভেদ ক'রে ঘটনার পরিণাম বুঝবার চেষ্টা করছে—ওখানে

যেমন লড়াই চলছে পেশবার ফৌজে আর কোম্পানীর ফৌজে—তাদের মুখেও তেমনি দ্বন্দ্ব চলছে আশার আর আশঙ্কার। শেষকালে না পেশবার ফৌজ জিতে যায়। পাটপারগঞ্জের লড়াই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কোম্পানীর সেনাপতি লর্ড লেক মারাঠা বাহিনীকে পরাজিত ক'রে দিল্লী দখল করলো অর্থাৎ পেশবার কবলমুক্ত অন্ধ বৃদ্ধ বাদশা শাহআলমকে আপন কুক্ষিগত করলো। ইতিহাসের নিরপেক্ষ দৃষ্টির বিচারে এখানেই আমীর তৈমুরের বংশের বাদশাহীর পরিসমাপ্তি। এই সময়ে কোম্পানীর সঙ্গে বাদশার যে চুক্তিনামা হ'ল, তার ফলে হিন্দুস্থানের বাদশা লালকেল্লার বাদশায় পরিণত হলেন। ঐ প্রাসাদ-দুর্গের বাইরে তাঁর কোন রকম অধিকার রইলো না, প্রাসাদ-দুর্গের মধ্যেও তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বাদশার খাস তালুক শাসনের ভারও চলে গেল কোম্পানীর হাতে, কোম্পানী তাঁকে দিতে প্রতিশ্রুত হলেন বার্ষিক নয় লক্ষ টাকা—ঐ তালুকের আয়। ভবিষ্যতে তালুকের আয় বাড়লে তা পাবেন বাদশা। এখানেই কার্যত বাদশাহীর শেষ বললে অন্যায় হয় না। কিন্তু একটুখানি গোলযোগের সূত্র রয়ে গেল। কার্যত বাদশাহীর ইতি হয়ে গেলেও রয়ে গেল নামটা। কোম্পানী হিসাব ক'রে দেখলো এ মন্দ নয়, ঐ নামটা জীইয়ে রাখতে পারলে, নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করতে পারলে, ঐ বাদশাহী নামের কামধেনু থেকে অনেক দুধ দোহন ক'রে নেওয়া যেতে পারে। কালে কালে আফগানরা করেছে, মারাঠারা করেছে, তারাই বা না করবে কেন! এই হ'ল কোম্পানীর হিসাব। ঘটনার হিসাব দাঁড়ালো অন্যরকম। শেষ পর্যন্ত দুই হিসাবের যোগফলে গরমিল দাঁড়ালো। তখন একটা রোখশোধের পালা উপস্থিত হ'ল—ইতিহাসে ব্যাপারটা সিপাহীবিদ্রোহ নামে পরিজ্ঞাত। এর প্রকৃত পরিচয় হওয়া উচিত—নাম বনাম কাজ, বাদশাহের নামের সঙ্গে কোম্পানীর শাসনের পাঞ্জা-কষাকষি। এ যুদ্ধও নয়, বিদ্রোহও নয়, De jure কি না নামরূপের সঙ্গে De facto বস্তুরূপের দ্বন্দ্ব। অতএব নামরূপের পরিচয়টা জানা আবশ্যক।

১৭০৭ সালে বাদশা আলমগীর যখন দেহরক্ষা করলেন, তখনি হিন্দুস্থানের বাদশাহীর অন্তিম অবস্থা। চক্ষুষ্মানেরা তখনি বুঝেছিল যে, রাজত্ব অন্তঃসারশূন্য। ১৭৩৯ সালে, আলগীরের মৃত্যুর মাত্র বত্রিশ বৎসর পরে নাদির শার হাতে বাদশার শোচনীয় পরাজয় এই কথাটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল তামাম হিন্দুস্থানের লোককে। তবু কাঠামোটা দাঁড়িয়ে রইলো। এই প্রাণহীন কাঠামোটা দখল করবার দ্বন্দ্বে মেতে উঠল উত্তরের আততায়ী আহমদ শা আবদালী, আর দক্ষিণের আততায়ী পেশবা। ১৭৬১ সালের তৃতীয় পানিপথের

যুদ্ধে পেশবার ফৌজ হ'টে গিয়ে বাদশাহীর কাঠামোটা ছেড়ে দিল আহমদ শা আবদালী বা তার প্রতিনিধিদের কবলে। তারপরে উত্থান হ'ল পেশবার সুদক্ষ সেনাপতি মাধজী সিন্ধিয়ার। এবারে বাদশার জিম্মাদার হ'ল পেশবা। বাদশার উজীর প্রকৃতপক্ষে মুরুব্বী হয়ে বসতে পারলে বাদশার নামে সমস্ত হিন্দুস্থানের উপরে শাসন চালানো যায়। আইনত এ ভার দেওয়ার মালিক বাদশা। লর্ড ক্লাইভের বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ এই মালিকানারই স্বীকৃতি। কোম্পানী আরও বেশি দূরে হাত বাড়িয়েছিল। খোদ বাদশাকে কবলস্থ ক'রে কিছুকাল এলাহাবাদে রেখেছিল। শাহআলম এই হীনতা দীর্ঘকাল সহ্য করতে রাজী হলেন না, ইংরেজের প্রভাব কাটিয়ে দিল্লিতে ফিরে এলেন। মারাঠা প্রভাব শুরু হ'ল, সেই সঙ্গে শুরু হ'ল দিল্লির বাদশাহীর শোচনীয়তম পর্ব। বাদশার আহ্বানে ১৮০৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর পাটপার-গঞ্জের যুদ্ধে মারাঠা ফৌজকে হারিয়ে কোম্পানী এবার জিম্মাদার হয়ে বসলো বাদশার—আগেই বলা হয়েছে সে কথা। এতদিন চলছিল কাঠামোখানা নিয়ে কাড়াকাড়ি। এবার সেটাও গেল। লালকেল্লার সীমাবদ্ধ শর্তাধীন মালিক বাদশাও নয়, বাদশার কাঠামোও নয়, বিশুদ্ধ নামরূপ। পরবর্তী চুয়ান্ন বৎসর এই নামরূপের সঙ্গে বস্তুরূপের কখনো লুকোচুরি, কখনো রেষারেষি, কখনো মনের সঙ্গে চোখ ঠারাঠারি—এমনি চলতে চলতে এই অসম্ভব অবাস্তব অবস্থা কার্তুজের চর্বিনিষেক উপলক্ষ্য ক'রে প্রকাণ্ড একটি দাবানল প্রজ্বলিত ক'রে তুলল, নিঃশেষ হয়ে পুড়লো বাদশার নামরূপ, সেই সঙ্গে কোম্পানীরও বটে। বাদশাহীবিমুক্ত হিন্দুস্থানের খোলা আসরে জন কোম্পানীর পরিবর্তে শুরু হ'ল জনবুলের শাসন।

উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে কোম্পানী নামরূপটা ঘুচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছিল। বাদশার নামরূপের আশ্রয়ের আর এ প্রয়োজন ছিল না কোম্পানীর। সে শুধু প্রবলই নয়, একেবারে অনন্যতন্ত্র। কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বি-গণ একে একে সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। টিপু সুলতান পরাজিত ও মৃত। পেশবা বন্দীকৃত ও অন্তরায়িত। অযোধ্যার নবাব কোম্পানীর হাত থেকে King পদবী গ্রহণ ক'রে বশংবদ। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুতে শিখরাজ্য কর্ণধারহীন, শীঘ্রই হবে কুক্ষিগত। কোম্পানী ভাবে আর কি প্রয়োজন ঐ নামরূপটিকে রক্ষা করবার? কিন্তু বিলাতের ডিরেক্টরগণ এতদূর যেতে রাজী হয় না। দূর থেকে বস্তুটা দেখা না গেলেও নামটা শুনতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া ইংরেজি সাহিত্য তৈমুর ও তার বংশধরগণকে অমর কাব্যের বিষয় ক'রে তুলে যে গৌরব

দিয়েছে, তার গুরুতায় অনুভব করে ডিরেক্টরগণ।

এবারে কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে কোম্পানী। বাদশার টাকার অভাব, অনেকবার দরখাস্ত করেছেন বার্ষিক বৃত্তি বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। ১৮৩৭ সালে বাহাদুর শা যখন সিংহাসনে বসলেন কোম্পানীর তরফ থেকে প্রস্তাব এলো তিনি যদি বাদশা পদবী ত্যাগ করেন, লালকেল্লায় বাস উঠিয়ে দিয়ে হুমায়ুন শার কবরের কাছে পুরানো দিল্লিতে গিয়ে অবস্থান করেন, তবে কোম্পানী বৃত্তি বাড়িয়ে দেবে। এমন হীন প্রস্তাব বাদশা গ্রহণ করতে পারেন না। কোম্পানী অপেক্ষা করে, বাহাদুর শা অমর নন, সিংহাসনের পরবর্তী দাবীদারের সঙ্গে ব্যবস্থা করলেই চলবে। ইতিমধ্যে ১৮৪৯ সালে সিংহাসনের পরবর্তী দাবীদারের মৃত্যু হ'ল। এবার দাবীদার শাহ্‌জাদা ফকরুদ্দিন। কোম্পানী তার দাবী স্বীকার ক'রে নিয়ে পূর্বোক্ত শর্তে তাঁকে রাজী করালো। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা গোপন রইলো না। ১৮৫৬ সালে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হ'ল। চুক্তিনামার সঙ্গে মৃত্যুর কারণ জড়িত নয় তো? এবারে সিংহাসনের দাবীদার কে? বাদশার ছোট বেগম জিনৎমহল তাঁর পুত্র জবান বখতের দাবী তোলেন, বাদশা জানান সমর্থন, কোম্পানী রাজী হয় না, অন্য শাহ্‌জাদাগণও নয়। জিনৎমহল হাল ছাড়েন না, গোপন দূত পাঠান কোম্পানীর কাছে। লালকেল্লা ও শাহ্‌জাহানাবাদের ঘটনা যখন ধীর-তালে চলছে কোম্পানী যখন বৃদ্ধ বাদশার অন্তিম প্রহর গণনা করছে, জিনৎমহল যখন গোপন দূত চালাচালি করছেন, তখন বিরাট হিন্দুস্থানের আসরে ঘটনার গতিতে ঝাঁপতাল শুরু হয়ে গেল। এলো ১৮৫৭ সাল, শাহ্‌জাহানাবাদে এগারোই মে। বিধাতাপুরুষ বড় রসিক। তাঁর রসিকতা Irony-র রূপ নিয়ে দেখা দেয়। কোম্পানী বাদশার যে নামরূপটাকে সযত্নে লালন ও পোষণ করছিল এতদিন, তার সঙ্গেই বাধলো কঠিন লড়াই, যার তুলনায় মহীশূর যুদ্ধ, মারাঠা যুদ্ধ, শিখ যুদ্ধ নিতান্ত ছেলেখেলা। পুরাতন রক্তপাতে পুরাতন আসর ধুয়ে নির্মল হয়ে গেল। অতীতনির্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে যে নূতন খেলার পত্তন হ'ল তাকেই বলা হয়ে থাকে নব্য ভারত। সিপাহী যুদ্ধের অন্তিম আর্তনাদে অবসিত-লীলা ভারতের মধ্যযুগ বাস্তবের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে ইতিহাসের বস্তু হয়ে বিরাজ করতে লাগলো। আরম্ভ হ'ল নব্য ভারতের পালা।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

॥ ১ ॥

হুকুমদার

সকালবেলাতে জীবনলাল আর গুরবচন সিং হিন্দু রাও কুঠি থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নামলো পশ্চিম দিকে। পাহাড় থেকে পশ্চিম দিকে নামলেই সব্জিমণ্ডী, সব্জি বাজার। তার মধ্য দিয়ে গিয়েছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, সোজা কর্নাল হয়ে পাঞ্জাবের দিকে। সব্জিমণ্ডীর পশ্চিমে দক্ষিণে বিস্তৃত রোশেনারা বাগ, এখন তার জলুসহীন শেষ অবস্থা, কেবল বড় বড় গাছপালাগুলো অতীত গৌরবের সাক্ষী। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বৃটিশ ফৌজের যাতায়াতের, পাঞ্জাব থেকে আগমন-নির্গমনের একমাত্র পথ, লাইফ লাইন। বৃটিশ ফৌজ পালাক্রমে সেই পথ তদারক করে। আজ সকালবেলায় তদারকিতে বেরিয়েছে ওরা দুইজন।

গুরবচন সিং বয়সে কিছু বড়, অভিজ্ঞতাতেও বেশি। তার বাবা রণজিত সিং-এর-খালসা ফৌজে সৈনিক ছিল, পরে কোম্পানী ফৌজে সুবেদার হয়। গুরবচন সিং বছর দশেক কোম্পানীর রেসালায় (Cavalry) ঢুকেছে, জীবনলাল রেসালাদার মেজর, পদে এক ধাপ উঁচুতে, তবু তাদের মধ্যে রেষারেষি হয় নি, বরঞ্চ বন্ধুত্ব হয়েছে।

গুরবচন বলে, আমরা সব ফৌজ মরতে চলেছি, কে এক ধাপ এগিয়ে, কে এক ধাপ পিছিয়ে তাতে কি আসে যায়, মরবার পরে সকলেই সমান।

জীবনলাল বলে, আসল কাজে তুমি অনেক ধাপ এগিয়ে আছ। তোমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি, আমার অনেক শিখবার আছে।

সেইজন্যই তো ঘোড়া আনতে তোমাকে নিষেধ করলাম।

জীবনলাল বলে, তা বটে, ঘোড়ায় চড়ে বের হ'লে অনেক ঘুরে আসতে হ'ত, এ বেশ পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা নামলাম। তারপর বলে, পাহাড়ের এই জায়গাটাই সবচেয়ে উঁচু আর খাড়া, ঘোড়া নামতে পারতো মনে হয় না।

গুরবচন বলে, শুধু তাই নয় এই জায়গাটাই সব চেয়ে বিপদের। পাহাড়টা দক্ষিণে যেখানে শেষ হয়ে গিয়েছে সেখানে কিষেণগঞ্জ আর পাহাড়পুর, সামনেই প্রাচীর ঘেরা ইদ্গা, পিছনে সব্জিমণ্ডী। দেখে নিয়ো—এই দিক দিয়েই বারে

বারে হামলা হবে, এখানে লুকোবারও যেমন সুবিধে হামলারও তেমনি, তাছাড়া এই সব বস্তির লোক সব শালা সিপাহী।

দেখে তো মনে হয় না।

দেখে কি ক'রে মনে হবে? বন্দুক তলোয়ার নিয়ে কি কেউ মার পেট থেকে পড়ে? এরা পেটে পেটে তলে তলে সব এক। সুযোগ পেলেই তলোয়ার হাতে নিয়ে সিপাহী সাজে, অসুবিধা দেখলেই তলোয়ার লুকিয়ে হাম লাচার, গাঁওয়ার আদমি।

এবার জীবনলাল বলে, তাছাড়া এ জায়গাটা শাহী ফৌজের কামানের পাল্লার মধ্যে।

সে তো আজ ক'দিন ধরেই বুঝতে পারছি। শাহবুরুজ আর মোরি দরবাজার কামানগুলো না থামাতে পারলে শান্তি নেই।

তা কি ক'রে হবে?

প্রাচীর ধ্বসিয়ে দিলেই বুরুজ যাবে, সঙ্গে সঙ্গে কামানগুলোও।

ঐ ভীমের বুকের ছাতির মতো প্রাচীর ধ্বসাবে আমাদের হাল্কা কামান দিয়ে!

অনেক অভিজ্ঞতার হাসি হেসে গুরবচন সিং বলে, ভারি কামান, হাউইটজার কামান সব আসছে। ইংরেজ যখন গর্জন করে—জেনো যে থাবা পড়লো বলে। সাধে কি লোকে ওদের বৃটিশ লায়ন বলে।

বিস্মিত জীবন বলে ওঠে—এই জন্যই তো বলেছিলাম যে, তোমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি।

না হয়ে উপায় কি? এমন যে খালসা ফৌজ ক'দিনের মধ্যে কোম্পানীর ফৌজের সামনে উড়ে পুড়ে গেল। আমরা না জানবো তো জানবে কে?

বুঝতে পারে না জীবন, কেন শিখরা যোগ দিল কোম্পানীর ফৌজে, ওদের যদি এতই রাগ ইংরেজের উপরে। কিন্তু বিষয়টা ঠিক কি ভাবে প্রকাশ করবে ভেবে পায় না। অবশেষে কৌতুহলের ঠেলায় অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলে—তোমাদের তো খুশী হওয়ার কথা নয় ইংরেজের উপরে, তবে তোমরা কেন যোগ দিলে বৃটিশ ফৌজে।

না দিয়ে উপায় ছিল না।

জীবনকে নীরব দেখে বলে যায়, আমাদের মধ্যে একটা পুরানো প্রবাদ আছে যে, শিখেরা লুট করবে দিল্লি শহর। বাদশারা কি সামান্য অত্যাচার করেছে শিখদের উপরে!

তারপরে আশায় আহ্লাদে বলে, এতদিনে বুঝি এলো সেই সুদিন।

কিন্তু তোমরা ক'জন!

ক'জন! সব আসবে। নাভা, ঝিন্দ, পাতিয়ালা, কপূর্থলা সব রাজা মহারাজার ফৌজ আসবে। দিল্লির একখানা পাথর খাড়া থাকবে না।

কথা বলতে বলতে তারা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে পশ্চিম-উত্তরে চলছিল, পুরানো সরাই ছাড়িয়ে যখন তারা ওয়াজির সিং-এর বাগানের কাছাকাছি এসে পড়েছে ঠিক সেই সময় একসঙ্গে দু'তিনটে বন্দুকের গুলীর আওয়াজে চমকে উঠল।

কে গুলী চালাচ্ছে?

সামনে তাকিয়ে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলো—বশি দুই দূরে রাস্তার উপরে নজফগড় খালের পুলটা, সব ফাঁকা—কোথাও জনমনিষ্যি নাই। তবে গুলী ছুঁড়ছে কে। পাহাড়ের দিক থেকেই আওয়াজ এসেছে মনে ক'রে যখন তারা আবার কথা শুরু করতে যাচ্ছে, এমন সময়ে যুগপৎ তাদের কানে প্রবেশ করলো ধাবমান ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ আর বন্দুকের আওয়াজ। অনেকগুলো ক্ষুর, অনেকগুলো বন্দুক।

ব্যাপারটা কি জানা আবশ্যক, সিপাহীর হামলা নয় তো? গাছপালার মধ্যে দৃষ্টি বেশি দূর চলে না। পাশেই ছিল প্রাচীর-ঘেরা এক গোরস্থান। দুজনে সেই প্রাচীরের উপরে উঠে দাঁড়ালো। অমনি সব পরিষ্কার ভাবে চোখে পড়লো। তারা দেখতে পেলো গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বরাবর তিনজন ঘোড়সওয়ার দ্রুতবেগে ছুটে আসছে, একজন একটু আগে আর দুজন পিছনে, মাঝখানে ব্যবধান হবে পঞ্চাশ গজের। দুজনের কাছেই দূরবীন ছিল, চোখে লাগালো। প্রথমে কথা বলল গুরবচন সিং।

পিছনের দুজন তাড়া করেছে সামনের লোকটাকে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে।

পিছনের লোক দুটো সিপাহী।

কি ক'রে বুঝলে?

গায়ে বৃটিশ ফৌজের উর্দি!

লোকটাকে ধরে ফেলল বলে।

এসো গুলী করা যাক।

জীবনলালকে বলে, বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এসেছে কি?

দুটো বন্দুকে একসঙ্গে আওয়াজ হ'ল।

দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল, পড়েছে।

পড়েছে তাতে সন্দেহ নাই। আততায়ীদের মধ্যে সামনের লোকটা ঘোড়া থেকে পড়ে গেল, ঘোড়াটা সালিকরামের বাগানের দিকে ছুটে গেল।

গুরবচন সিং বলল, এসো আর একবার।

কিন্তু ওরা গুলী ছুঁড়বার আগেই বাকী লোকটা ঘোড়া থামিয়ে গুলী করলো, দুই দলের বন্দুক বোধ করি একসঙ্গে ছুটলো। এদের গুলী লাগলো না, সিপাহীর গুলীতে আক্রান্ত লোকটার ঘোড়া আহত হ'ল। যন্ত্রণায় সওয়ার ফেলে দিয়ে ঘোড়া ছুটলো নজফগড়ের খাল ধরে উত্তর দিকে। ওরা তাকিয়ে দেখে—আততায়ী ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিয়ে ছুটছে, অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে বন্দুকের পাল্লার বাইরে।

চলো দেখা যাক লোকটার কি হ'ল।

প্রাচীর থেকে নেমে দুজনে ছুটলো। বাগানের বাইরে এসে দেখতে পেলো—লোকটা খালের পুবের প্রাচীরে ঠেস দিয়ে বসে আছে। একে চরম শ্রান্তি তার উপরে কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল না বুঝতে পারায় হতভম্ব ভাব!

ওরা ততক্ষণে কাছে গিয়ে পড়েছে, একসঙ্গে হাঁকলো, হুকুমদার।

লোকটা কোনরকমে প্রাচীর ধরে উঠে দাঁড়িয়ে দুই শূন্য হাত মাথার উপরে তুলে ধরে জবাব দিল, ফ্রেণ্ড।

তারপরেই আবার ভেঙে বসে পড়লো। এবারে ওরা কাছে গিয়ে পড়েছে। গুরবচন সিং শুধালো, কোন দেশের লোক তুমি?

উত্তর দেওয়ার আগে একবার ওদের পোশাক নিরীক্ষণ ক'রে নিয়ে সে বলল, বাঙালী।

এবারে জীবনলাল শুধলো, কি নাম?

স্বরূপরাম।

কোথা থেকে আসছ? ওরা কারা? কেন তাড়া করেছিল? তুমি কি করো? অনেকগুলো প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হ'ল। স্বরূপ ইঙ্গিতে জানালো, এখন অধিক কথা বলবার ক্ষমতা তার নাই। তার পরে প্রাচীরে ঠেসান দিয়ে চোখ বুজলো।

স্বরূপরাম মূর্ছিতপ্রায়।

॥ ২ ॥

"I wish you joy upon your new career."

—Faust

পরদিন বেলা দশটার সময়ে ওরা দুজনে স্বরূপরামকে নিয়ে কর্নেল ব্রিজম্যানের অফিসে উপস্থিত হ'ল, আগেই জানিয়ে রেখেছিল যে, একজন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী এসেছে, কোম্পানীর ফৌজে কাজ চায়!

ব্রিজম্যান বলেছিল, খুব সুখের বিষয়, এখন আমাদের লোকের দরকার। তবে দেখতেই তো পাচ্ছ—দিনকাল খারাপ, একবার ভালো ক'রে যাচাই না ক'রে নিতে পারি না।

তারপর বলল, তোমরা তো তার সঙ্গে কথা বলে তার সততা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছ?

গুরুবচন বলল, নিশ্চিন্ত না হ'লে আপনার কাছে দরবার করতে আসতাম না।

তোমরা তার জামিন হ'তে রাজী আছ?

দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল, কবুল শির-ও-চশম, শির জামিন!

আচ্ছা বেশ, তবে দশটার সময়ে লোকটাকে নিয়ে এসো।

জীবনলালদের শির জামিন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। মূর্ছিতপ্রায় স্বরূপরামের মাথায় মুখে জল দিয়ে পকেট থেকে বোতল বের ক'রে খানিকটা রাম খাইয়ে তাকে সচেতন ক'রে তুলল। সে একটু সুস্থ হ'লে তাকে নিয়ে এলো হিন্দুরাও কুঠির যে ঘরটায় তারা থাকতো সেখানে। স্বরূপরাম আহার ও বিশ্রামের পরে সতেজ স্বাভাবিক হ'লে ওরা কাছে গিয়ে বসল। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের পালা শেষ হয়ে গেল কাজের কথা শুরু হ'ল। গোড়া থেকেই স্বরূপ বুঝেছিল যে, লোক দুটির তার প্রতি বিশেষ টান। জীবনলালের টানের কারণ দুজনেই বাঙালী, গুরুবচন সিং-এর টানের কারণ লোকটা পুরবীয়া নয়, তার কাছে পুরবীয়া মানেই Pandy, কি না বিদ্রোহী। চেহারা দেখে সহজেই গুরুবচনকে শিখ বলে বুঝেছিল, কিন্তু জীবনলাল যে বাঙালী এ কথা স্বীকার না করা অবধি বুঝতে পারে নি স্বরূপ।

স্বরূপ বলল, তোমরা দুজনে আমাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছ, তোমাদের কাছে অকপটে সমস্ত বলবো।

তারপরে একটু ভেবে নিয়ে বলল, যে দিনকাল পড়েছে তাতে একজন অপরিচিত লোকের কথা কতটা বিশ্বাস করবে জানি না, না করলে দোষ দেবো না, কারণ এই অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় আজ কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে ভরসা পাচ্ছে না।

তখন সে দিল্লির যাবতীয় ঘটনা যথাসাধ্য সবিস্তারে বর্ণনা করলো, পঞ্চাশজন ফিরিঙ্গি নরনারীর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও বলল, কেবল তুলসী বা তুলসীর মৃত্যু, তুলসী সম্পর্কিত কোন কথা প্রকাশ করলো না। কিন্তু ও কথাটা না বললে তার দিল্লি ত্যাগের কারণটা বেশ বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে না, সে বোঝে। ওরাও বুঝল। হঠাৎ লোকটা দিল্লি পরিত্যাগ করতে গেল কেন? সিপাহীদের পক্ষে নয় এমন অনেক লোক তো রয়ে গিয়েছে দিল্লিতে।

গুরবচন শুধোয়, তুমি হঠাৎ দিল্লি ছাড়তে গেলে কেন?

দিল্লি আমার পক্ষে নিরাপদ নয়।

কিন্তু বাইরেও তো আপদ আছে দেখতে পেলে।

পেলাম বৈকি। বাইরে বিপদ যে এমন ঘনিয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারলাম দিল্লি ছাড়বার পরে।

জীবনলাল বলে, দেখছ তো কোম্পানীরাজ টলমল—এর মধ্যে কোম্পানীর ফৌজে যোগ দেবার দুঃসাহস কেন হ'ল?

স্বরূপ বলে, কোম্পানীরাজ টলমল কিনা জানি না, কিন্তু জানি সিপাহীরাজ কি বস্তু।

বেফাঁস মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, সেখানে নিরীহ নারীকে ঘর থেকে টেনে বের ক'রে কুপিয়ে কাটে।

স্বরূপের চোখে তুলসীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছে দেশের ইতিহাস, যেখানে তাকায় রক্তের ছাপ, বাইরে থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে এসে মনের মধ্যে তাকালে সেখানে রক্তের অফুরন্ত উষ্ণ প্রস্রবণ। ওর কাছে আজ ভিতরে বাইরে সমান দুঃসহ।

আচ্ছা, দিল্লি ছাড়বার পরে কি করলে?

জীবনলাল বলে, খুব খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছি বলে মনে কিছু ক'রো না, সমস্ত কথা না জানলে কি ক'রে তোমাকে নিয়ে যাবো কর্নেল সাহেবের কাছে।

কিচ্ছু মনে করবো না, সব বলছি শোনো, যেখানে ফাঁক আছে মনে হয় জেরা ক'রে জেনে নিয়ো, এই বলে সে আরম্ভ করলো।

দিল্লি থেকে বের হয়ে উত্তর দিকে চলতে শুরু করলাম—ইচ্ছা যে কোম্পানীর

ফৌজের দেখা পেলে যেমন তেমন একটা চাকরি জুটে যাবে। বাগপতে যমুনা পার হলাম, কাছেই মীরাট, কিন্তু বুঝলাম মীরাটে গিয়ে লাভ নেই, মীরাটের বিদ্রোহের খবর পেয়েছিলাম, মীরাটি ফৌজ দিল্লি এসেছে। কাজেই মীরাট এড়িয়ে মজঃফরনগর হয়ে সোজা চললাম সাহারানপুরের দিকে।

তারপরে মন্তব্য করে, এই ক'দিনের মধ্যেই যে দেশের এমন লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা হয়েছে আগে ভাবতে পারি নি। তাছাড়া কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। চটিতে আশ্রয় নিলে নানারকম প্রশ্ন করে, কি উত্তর দেবো ভেবে পাইনে, যতদূর সম্ভব শহর এড়িয়ে গ্রামাঞ্চল দিয়ে চলি। অবশেষে আম্বালা। সাবধানে প্রশ্ন ক'রে জানতে পেলাম যে, কয়েকদিন আগে জঙ্গীলাট ফৌজ নিয়ে দিল্লি রওনা হয়ে গিয়েছেন। তখন ভাবলাম, কি করি—পাঞ্জাবের দিকে রওনা হবো, না জঙ্গীলাটের ফৌজের দেখা পাওয়ার ভরসায় দিল্লির দিকে ফিরবো।

গুরবচন সিং প্রশ্ন করে, পাঞ্জাব যাওয়ার কথা মনে হ'ল কেন?

এ তো খুব স্বাভাবিক। শুনেছিলাম যে, পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ঘটে নি, ফৌজ আসে তো পাঞ্জাব থেকেই আসবে, পথের মধ্যে দেখা হলেও হ'তে পারে।

জীবনলাল বলে, কোম্পানীর ফৌজে যদি তোমাকে সিপাহীদের চর বলে মনে করতো?

তাই, খুব সম্ভব তোমরাও তো প্রথমে তাই মনে করেছিলে। বিপদ তো আছেই। দিল্লিতে বসে থেকেও দেখেছি বিপদ। পথে বেরিয়ে বিপদে ডরালে চলবে কেন?

বেশ, তারপরে বলো।

ফিরলাম দিল্লির দিকে। কাছে গোটাকয়েক মোহর ছিল, এখনো দুটো অবশিষ্ট আছে, একটা ঘোড়া কিনে নিলাম, দিন পনেরো ক্রমাগত পথ চলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এবারে চললাম যমুনার পশ্চিম তীর দিয়ে, ক'দিনের মধ্যেই কর্নালে এসে পৌছলাম। এ পর্যন্ত এক রকম নিরাপদে কাটলো। আলিপুরে এসে পৌছেই বিপদের শুরু হ'ল। আলিপুর ছাড়তেই একদল সিপাহী ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে দেখা, তারা চ্যালেঞ্জ করলো। আমার উত্তরে তারা সন্তুষ্ট হ'ল না, দাঁড়াতে বললো, আমি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। অনেক ক'জন সিপাহী পিছু নিয়েছিল, ক্রমে সবাই পিছিয়ে পড়লো, জন-দুই পিছু ছাড়লো না। তারপরে যা হ'ল স্বচক্ষে দেখেছ।

আমাদের গুলীর আওয়াজ শুনে কি ভাবলে?

প্রথম ঝড়ের আওয়াজ শুনতে পাই নি, মরি কি পড়ি ক'রে ছুটেছি।

শেষ বারের আওয়াজ শুনে ভাবলাম—সিপাহীদের বন্দুক।

জীবনলাল বলে, সেটা খুব অন্যায় নয়, কেননা তাদের গুলীটা লেগেছিল তোমার ঘোড়ার গায়ে।

স্বরূপ বলল, আমি সরলভাবে সব বলেছি, তোমাদের বিশ্বাস হয়েছে কিনা তোমরাই জানো।

দুজনেই একসঙ্গে বলল, আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস হয়েছে, আশা করি কর্নেল সাহেবেরও বিশ্বাস হবে। চলো।

কর্নেল ব্রিজমান অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা ক'রে চলেছে স্বরূপকে। একটা কথাকে, একটা বিষয়কে পাঁচ দিকে যাচাই ক'রে নিতে থাকে। জীবন শোনে আর ভাবে তাদের জেরায় আর কর্নেলের জেরায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। তাদের জেরা—বড়শি ফেলে মাছ ধরে, কর্নেলের জেরা জলে ফেলে মাছ ধরে পেট টিপে পরীক্ষা করা। সে অবাক হয়ে দেখে ব্রিজম্যানের দীর্ঘশ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল। তার মনে পড়ে ছোটবড় সেনাপতিদের অনেকেরই মুখ শ্মশ্রুশোভিত। স্যার হেনরি লরেন্স, উট্রাম, হডসন, হ্যারি টুম্‌স, চেম্বারলেন সকলেরই শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ। সব দাড়িই আবার লালচে রঙের, সকলেই যেন মুখের সঙ্গে একখানা ক'রে ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা ঝুলিয়ে রেখেছে। তার আরও বিস্ময় লাগে—যখন মনে হয় যে এই সব প্রচণ্ড জঙ্গী আদমিদের সকলেরই মুখের ভাব নিতান্ত নিরীহ ভালো মানুষের মতো। এমন যে দুর্ধর্ষ হডসন সাহেব—যার নামে বাঘে মানুষে এক ঘাটে জল খায়, উর্দি খুলে নিয়ে তাকে নামাবলী পরিয়ে দিলে পুরুত ঠাকুরটি বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। সে ভারি কৌতুক অনুভব করতে থাকে।

তুমি এমন পাকা ইংরেজি বলতে শিখলে কোথায়?

আমি কিছুদিন দিল্লি কলেজে পড়েছিলাম, কিন্তু অর্থাভাবে বেশি দিন পড়া সম্ভব হয় নি। তারপরে কম্পোজিটার এপ্রেন্টিস হয়ে ঢুকেছিলাম কোম্পানীর প্রেসে। ইংরেজিটা জানতাম বলেই অল্পদিনের মধ্যে অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার হ'তে পেরেছিলাম।

তুমি তো বললে, সে প্রেসটা সিপাহীরা নষ্ট ক'রে ফেলেছে।

শুধু প্রেসটা নয়— বাড়িটা অবধি পুড়িয়ে দিয়েছে, গ'লে গিয়েছে আড়াই মণ টাইপ।

কর্নেল বলে, দুঃখ ক'রো না, শীঘ্রই ফিরে পাবে।

বুঝতে পারে না স্বরূপ।

কর্নেল বুঝিয়ে বলে, শীঘ্রই ছিটে গুলী হয়ে ফিরে আসবে আমাদের ক্যাম্পে।

সকলেই হাসে। কর্নেল সশব্দে, আর সকলে নীরবে।

অবশেষে ব্রিজম্যান বললো, স্বরূপ, তোমার লয়ালটি সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি, আমি বুঝলাম যে তুমি কোম্পানীরাজের প্রতি ক্রেগুলি, সেই জন্যই এসেছ, কোম্পানী ফৌজে চাকরি চাও।

স্বরূপ বলল, আপনি আমার মনের কথা ঠিক বুঝেছেন।

কিন্তু যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাসাধ্য। আমার আশঙ্কা হচ্ছে—সে ট্রেনিং তোমার নেই।

আপনার অনুমান মিথ্যা নয়।

তবে ?

শিখে নিতে পারবো।

অবশ্যই পারবে। কিন্তু সময় কই ? তুমি দেখছ যে প্রতিদিন আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে, এখন নূতন ক'রে শেখাবার সময়ের অভাব।

অন্য কোন কাজ কি জুটতে পারে না ?

অবশ্যই পারে। আমার রেজিমেণ্টের জন্যে একজন সুদক্ষ য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট আবশ্যক। তুমি যখন প্রেসের ম্যানেজারি করেছ, হিসাবকিতাবের কাজ অবশ্যই জানো।

স্বরূপ সংক্ষেপে বলল, জানি।

তোমাকে আমার রেজিমেণ্টের য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট নিযুক্ত করলাম।

তারপরে একটু থেমে বলল, লড়াই করতে পারলে না বলে দুঃখিত হয়ো না। অনেক সময় তাও করতে হ'তে পারে।

কর্নেলের কথার অর্থ বুঝতে পারে না স্বরূপ।

কর্নেল ব্যাখ্যা ক'রে বলে যে, আমাদের ফৌজে সৈন্যসংখ্যা এখনো এত কম যে, সঙ্কটের সময়ে সকলকেই অস্ত্রধারণ করতে হয়। তোমার বন্ধুরা নিশ্চয় আমার কথা সমর্থন করবে। এই বলে কর্নেল তাকায় জীবনলাল ও গুরবচন সিং-এর দিকে।

তারা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

কিছুক্ষণ ইতস্তত ক'রে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, তুমি নিশ্চয় দিল্লির বাদশা বাহাদুর শা-কে দেখেছ ?

দেখেছি তবে দু'একবারের বেশি নয়। আজকাল তিনি লালকেল্লা থেকে বড় বের হ'তেন না। একবার দেখেছিলাম যখন তিনি হুমায়ুন শার কবরে বেড়াতে যাচ্ছিলেন, আর একবার দেখেছিলাম যখন যাচ্ছিলেন হজরৎ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগায়।

দেখতে কি রকম?

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ।

বয়স কত হবে?

আশির উপরে বলে শুনেছি।

তবে তিনি এই হাঙ্গামার মধ্যে গেলেন কেন?

কেমন ক'রে বলবো, তবে শুনেছি—তিনি স্বেচ্ছায় যান নি, তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার মনে হয়—সময়মতো কোম্পানীর ফৌজ এসে পড়লে তিনি যেতেন না।

তবু তো সিপাহীরা তাঁকে নায়ক বলে প্রচার করছে।

তা করছে বটে। তবে তাঁকে নায়ক বলা ঠিক নয়।

কেন?

ক্যান্টনমেন্টের মাঠে গোরা সিপাহীদের ফুটবল খেলতে দেখেছি। সেই ফুটবলটাকে যদি ফুটবল মাঠের নায়ক বলা যায় তবেই বাহাদুর শা মিউটিনির নায়ক।

স্বরূপের বিচক্ষণতায় বিস্ময়বোধ করে ব্রিজম্যান। এবারে প্রসঙ্গ বদলে শুধোয়—শহরের লোকের কি ভাব?

কর্নেল সাহেব, খোদ বাদশা যেখানে যোগ দিতে বাধ্য, সাধারণ লোক দূরে থাকবে কি সাধ্য? তবে ঘোলা জলে মাছ ধরবার আশা যারা রাখে তারাই অগ্রণী।

শাহজাদারা?

তাঁরা তো আশা করছেন—মাছ ধরা হ'লে মুড়োগুলো পাবেন।

আচ্ছা লালকেল্লার মধ্যে ফিরিঙ্গি নরনারীদের হত্যা করা হয়েছিল, শুনেছ?

এবারে স্বরূপের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। এবার ভয় হ'ল মনের কথা মুখ বোধ করি চেপে রাখতে পারবে না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করলো। শুধু বলল, শুনেছি।

কেন এমন নিরর্থক নৃশংসতা করলো বলতে পারো?

আবার প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে বলল, আজ্ঞে না।

তখন কর্নেল বলল, এখন যাও, তোমার বন্ধুদের কাছে থেকে অবসর সময়ে এনফিল্ড বন্দুক চালাবার কৌশল শিখে নিয়ো।

তারপর হেসে বলে, এ সেই কুখ্যাত এনফিল্ড বন্দুক, যা নিয়ে এত কাণ্ড হয়ে গেল। বুঝলে স্বরূপ, কোম্পানীও নয় আর ঐ যে বাহাদুর শা বললে সে-ও নয়, এই এনফিল্ড গানটাই হচ্ছে বর্তমান মিউটিনির নায়ক।

বক্তব্য শেষ ক'রে বলে, আশা করি নূতন চাকুরি তোমার পক্ষে আনন্দদায়ক হবে।

স্বরূপরাম স্যালুট করে।

আচ্ছা এখন যাও।

তিনজন প্রস্থান করতে উদ্যত হ'লে স্বরূপের উদ্দেশে ব্রিজম্যান বলে, তুমি তো দিল্লির লোক, শহরটা নিশ্চয় ভালো ক'রে জানো।

আজ্ঞে হাঁ, দিল্লিতে আমার জন্ম, শহর শাহ্‌জাহানাবাদের কিছুই অজানা নেই আমার।

উত্তম। শাহ্‌জাহানাবাদ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান। তোমার কাছ থেকে জেনে নিতে চাই।

কর্নেল ব্রিজম্যান বোম্বাই আর্মির লোক। চিরকাল তার কেটেছে দাক্ষিণাত্যে। মাত্র অল্প কিছুদিন আগে বেঙ্গল আর্মিতে ট্রান্সফার হয়েছে, দিল্লি অঞ্চলে এই তার প্রথম আগমন।

এবারে ব্রিজম্যান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো Observatory-র ছাদে উঠিগে। ওখানে উঠলে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় সমস্ত শহরটা।

ইঙ্গিতে জীবনলালদেরও আসতে আদেশ ক'রে হিন্দুরাও কুঠি থেকে বের হয়ে ব্রিজম্যান চললো Observatory-র দিকে।

॥ ৩ ॥

অবজারভেটারি টাওয়ার

হিন্দুরাও কুঠি থেকে বেরিয়ে চারজনে অবজারভেটারির দিকে চলল, আগে কর্নেল, পিছনে তিনজনে। হিন্দুরাও কুঠির দু'তিন রশি উত্তরে ষাট ফুট উঁচু স্তম্ভাকৃতি একটা ইমারত অবজারভেটারি নামে পরিচিত। ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলে এদিকে ওদিকে পাঁচ-ছ' ফুট একটা ছাদে পৌঁছনো যায়, যার না আছে কার্নিশ না আছে আলসে। কে তৈরি করেছিল, কি উদ্দেশে তৈরি করেছিল ইমারতটা জানা যায় না। তবে অনুমান হয় যে, হিন্দুরাও কুঠির মালিক মারাঠী সাহেবই তৈরি ক'রে থাকবে। যন্তরমন্তর নামে পরিজ্ঞাত দিল্লির বিখ্যাত

অবজারভেটারির প্রেরণায় এই বস্তু ইমারতটা। মারাঠী শাসনের মৃত্যুর পরে হিন্দুরাও কুঠি ও অবজারভেটারি দুটোই মালিকহীন ও পরিত্যক্ত।

এদিকে আগে কখনো এসেছ স্যারূপ? তার ইংরেজি মুখে স্বরূপ ইতিমধ্যেই স্যারূপ হয়েছে, জীবন তো গোড়া থেকেই গীবন, কেবল গোল বাধে গুরুবচন নামটায়। এক-একবার এক এক রকম উচ্চারণ করে, ভাবে এদের নামগুলো এমন অদ্ভুত কেন!

স্বরূপ বলে, সব্‌জিমণ্ডির বাজারে কখনো এসেছি, পাহাড়ের দিকে আসি নি। দিল্লির লোকের ধারণা—এই পরিত্যক্ত বাড়িগুলোয় ভূতপ্রেত বাস করে।

এবারে আমরা এসেছি ভূত তাড়াতে, কি বলো? কিন্তু কিছু বলবার আগেই সকলে নাকে কাপড় দেয়। কর্নেল বলে ওঠে, How horrible!

পশুর মৃতদেহগুলো সরানোও হবে না, নারকীয় দুর্গন্ধও যাবে না, মাঝে থেকে কলেরা প্রতিদিন তার খাজনা আদায় ক'রে নিচ্ছে।

স্বগত উক্তি করতে করতে বন্ধুর পথে এগিয়ে চলে ব্রিজম্যান।

কতদিন চীফ এঞ্জিনীয়ারকে বলেছি—মৃতদেহগুলো পুঁতে ফেলবার ব্যবস্থা করো, নয়তো দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে এসো যমুনার জলে। বলে লোকাভাব, যে ক'টি লোক আছে পরিখা খুঁড়ছে। আরে এমনভাবে কলেরা চললে লোকাভাব ক্রমে বাড়বে।

হঠাৎ চারজনে একসঙ্গে থমকে দাঁড়ায়, দৃষ্টি পড়ে একটা বীভৎস দৃশ্যে। অবজারভেটারি আর হিন্দুরাও কুঠির মাঝামাঝি জায়গায় পাহাড়ের পূব গায়ে এক রাশ মৃতদেহ। বলদ, ঘোড়া, গোটাকয়েক উটও আছে, আর তার উপরে জুটে গিয়েছে রাজ্যের শকুন। হঠাৎ যেন খুলে গিয়েছে নরকের একটা জানলা। লুব্ধ পাখিগুলো মারামারি কাড়াকাড়ি ক'রে শব নিয়ে টানাটানি করছে, কখনও বেগতিক হয়ে অন্যত্র উড়ে গিয়ে বসছে, লোমলেশহীন সুদীর্ঘ মুখ আর গ্রীবা পেটের মধ্যে চালিয়ে নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করছে, তীক্ষ্ণ কর্কশ চীৎকারে এ ওকে মারছে আঁচড়। দুর্গন্ধ বায়ুমণ্ডলের কণ্ঠ চেপে ধরেছে। কর্নেল ছুটে গিয়ে অবজারভেটারিতে ঢুকে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়। ওরাও ওঠে। ছাদের উপরে গন্ধ অনেকটা কম। নাকের রুমাল সরিয়ে কার্নেল বলে, Now স্যারূপ, আমার কাছে এসো।

স্বরূপ কাছে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু আসল প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার আগেই ব্রিজম্যানের দৃষ্টি পড়ে পাহাড়টার শিরদাঁড়া বরাবর উত্তর-দক্ষিণে। কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ ক'রে বলে ওঠে, এতগুলো পরিখা খোঁড়বার আর বুরুজ তৈরি করবার

লোক কোথা থেকে সংগ্রহ করল এলেক্স টেলর তাই ভাবছি। কাজটা অত্যাবশ্যক। তবে মৃতদেহ না সরালে কলেরা ঠেকানো যাবে না।

এবারে কথার সূত্র পেয়ে জীবন এগিয়ে গিয়ে বলে, স্যার, চীফ এঞ্জিনীয়ারের ওভারসিয়ার সর্দার নেহাল সিংকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম মৃতদেহগুলো পুঁতছ না কেন? সে বলল, এই ন্যাড়া পাহাড়ের উপরে মাটি কোথায় যে পুঁতবো— যত খুঁড়ে যাও কেবলি পাথর। তখন বললাম, তাহলে এগুলো টেনে নিয়ে গিয়ে দূরে ফেলে দাও। সে বলল, মৃতদেহ একটি দুটি নয়, শত শত, তাও আবার ঘোড়া, বলদ, উট প্রভৃতি ভারি জন্তুর। অন্তত তিন মাইল টেনে না নিয়ে গেলে যমুনায় ফেলা যাবে না। গাড়ি কোথায়? লোক কোথায়? সে বলে, দেখতেই তো পাচ্ছ উত্তরে ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার থেকে দক্ষিণে সব্‌জিমণ্ডি, ইদগা পর্যন্ত কামান বসাবার বুরুজ তৈরি হচ্ছে। এগুলো শেষ হ'লেই মোরি দরবাজা আর লাহোর দরবাজার দিকে বুরুজ তৈরিতে হাত দিতে হবে।

তাহ'লে দেখছি এইভাবেই থাকবে ওগুলো, আর বাতাস বিষিয়ে উঠে কলেরা ছড়িয়ে পড়বে।

কর্নেল খুব মন দিয়ে শোনে, বলে, এ বিষয়ে আর কি কথা হয়েছিল বলো।

সর্দার নেহাল সিং বলল, চীফ এঞ্জিনিয়ার নিজেও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, কলেরা হাসপাতালের বুলেটিন দেখলে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। তাঁর প্রথমে ধারণা হয়েছিল ১১৫, ১২০ ডিগ্রি রোদে সব শুকিয়ে গিয়ে নিরাপদ হবে। হ'ল ঠিক উল্টো। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব পচে উঠল।

জীবন বলে যায়, কর্নেল গভীরতর মনোযোগে শোনে।

সর্দারজী বলে, এখন কর্নেল এলেক্স টেলরের ধারণা হয়েছে যে, বৃষ্টি আরম্ভ হ'লে সব washed away হয়ে যাবে। আমি বুঝিয়েছি, ঠিক উল্টো কাণ্ডটি ঘটবে স্যার, পচন বাড়বে, সঙ্গে জুটবে অজস্র মাছি আর পোকা। কলেরা হাসপাতালে জায়গা দিতে পারা যাবে না। অগত্যা কর্নেল টেলর সাহেব বলে, তবে ভারী কামান-গুলো এসে পৌছক। কামানটানা হাতী লাগিয়ে যমুনায় নিয়ে ফেললেই হবে।

ব্রিজম্যান বলে ওঠে, এটা এঞ্জিনিয়ারের মতো কথা বটে। পাঞ্জাব থেকে siege train ভারী কামানের সার কর্নাল পর্যন্ত এসে পৌচেছে। শীঘ্রই এখানে এসে পৌছবে।

অরুণ এতক্ষণ নীরব ছিল, এবারে বলে, তার আগেই শুরু হয়ে যাবে প্রচণ্ড বর্ষা।

Do you think so?

আমি এখানকার অধিবাসী, জানি কিনা।

কর্নেল দুই কাঁধে ফরাসী-জনোচিত ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, Well, can't be helped! তারপরে বলে ওঠে, এখন হাতের কাজটা আরম্ভ হোক।

তখন সকলে পুব মুখ হয়ে দাঁড়াতেই রৌদ্রমার্জিত চোখের সম্মুখে ঝকঝক ক'রে ওঠে শাহ্‌জাহানাবাদ। প্রাকার প্রাচীর কেল্লা বুরুজ সৌধমিনার সমন্বিত প্রবালে গঠিত রহস্যময়ী মহানগরী।

॥ ৪ ॥

অতুল! বিরাট! বিপুল দিল্লি!
শত-সম্রাট-প্রেয়সী অয়ি!
গজমোতি গুঁড়া তব পথধুলা,
মোহিনী! রূপসী! মহিমময়ী!

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

দিল্লি! এই নামটিতে কি দুর্জয় আকর্ষণ, কি স্বপনের মোহ! কোন্ অলৌকিক স্ফুলিঙ্গ কোন্ বিস্মৃত যুগে জ্বালিয়ে তুলেছিল এই মোহাগ্নি বহ্নি! পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কালের যাবতীয় সহজদাহ্য পতঙ্গনিচয় তাকে আবর্তন ক'রে উড়েছে, দগ্ধপক্ষ হয়ে পুড়েছে, আবার ঝাঁকে ঝাঁকে এসে নিশ্চিত মৃত্যুর উমেদারি করেছে। কিসের আকর্ষণ, কিসের মোহ? অগ্নিশিখায়, না এই ভূখণ্ডেই আছে কোন জাদু? পুবে যমুনার প্রবাহ, পশ্চিমে আরাবল্লী পর্বতের অবলুণ্ঠিত উত্তরীয় প্রান্ত, মাঝখানে সঙ্কীর্ণ, রুক্ষ, চিরধূসর একটি ভূখণ্ড হিন্দুস্তানে প্রবেশের, রাজস্থানে গমনের অর্ধনির্গলিত সিংহদ্বার। যুগে যুগে আততায়ী এসে ঐ রন্ধ্রপথে মাথা গলিয়ে দিয়ে কড়া নেড়েছে দরজার, রাজবংশের পরে রাজবংশ ঐ রন্ধ্রপথ আগলে অর্গলিত ক'রে রেখেছে দেউড়ি। দেউড়ি, দেহলী, দেহ্‌লি, দিল্লি। দিল্লি শহর হিন্দুস্তানের অর্ধ-অর্গলিত দেউড়ি। তাই প্রাচীনকাল থেকে রণভূগোলের স্বাভাবিক আকর্ষণে নগরীর পরে নগরীর উত্থান পতন ঘটেছে ঐখানে। রায় পিথৌরার কেল্লা, সিরি, তুগলকাবাদ, জাহানপনা, ফিরুজাবাদ, পুরানা কিল্লা, দীনপনা, শাহ্‌জাহানাবাদ। আরো আছে। মৌর্য সম্রাটগণেরও নজর এড়ায় নি এই ভূখণ্ড, শাহ্‌জাহানাবাদের পশ্চিমে পাহাড়ের উপরকার অশোকস্তম্ভ তার প্রমাণ। আর অর্ধ বিস্মৃতির আবছায়া-যুগের কোন্ রাজা চন্দ্র ভূগর্ভে প্রোথিত করেছিল ঐ লৌহকীলক (কুতুবমিনারের কাছে)। জনশ্রুতি বলে ঐ লৌহকীলক উন্মূলিত হ'লে নাকি অবসান হয়ে যাবে দিল্লির ইতিহাস। ঐ লৌহকীলকের গায়েই উৎকলিত আছে—রাজপুত

তোমর বংশের অনঙ্গ পালের শাসনকীর্তি। অবশেষে চৌহান রাজপুত পৃথ্বীরাজ, মুসলমান ঐতিহাসিকদের রায়পিথৌরা। ভারতের ঐতিহাসিক প্রতিস্মৃতি বলে, পৃথ্বীরাজ রাজী সংযুক্তার সঙ্গে কুতুবমিনারের শিখরে বসে যমুনার শোভা নিরীক্ষণ করতেন! জনশ্রুতি মাত্র? জনশ্রুতি বৈকি। প্রাচীন ইতিহাস মাত্রেই জনশ্রুতি। লৌকিক বিশ্বাসের ভিয়ানে সত্যের যখন পাক হয় তাকেই তো বলে জনশ্রুতি। তবু শেষ হ'ল না। ঐতিহাসিক কালের আগে পৌরাণিক কাল। এখানেই কোথাও ছিল পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ, বিশ্বাস এখনো হাতড়ে মরছে তার ধ্বংসাবশেষ।

কী দুর্নিবার আকর্ষণ আরাবল্লী-যমুনা নিয়ন্ত্রিত এই নিঃস্ববিত্ত ভূখণ্ডের। ইতিহাসের এক ও অমোঘ নিয়মে চৌহান, দাস, খিলজি, তুঘলক, সৈয়দ, লোদী, শূর ও মুঘলগণ যুগে যুগে নগরপত্তন করেছে এখানে। আর ইতিহাসের হাত ক্রমে ক্রমে শহরগুলোকে দাবার বড়ের মতো এগিয়ে দিয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। অবশেষে এক সময়ে বাদশা শাহ্‌জাহানের রাজধানী শাহ্‌জাহানাবাদ এসে ঠেকল যমুনা ও আরাবল্লীর সন্ধিতে। উত্তরে আর এগোবার জায়গা রইলো না। উত্তরকালে নগরস্থাপনেচ্ছু রাজবংশকে এবারে ফিরতে হবে দক্ষিণে, মৃত শহরের শবাসনে চলবে তার রাজনীতির শবসাধনা। আর অদূরে উত্তরে পর পর অনেকগুলি রণস্থলী রাজসাধকের কানে পুরাতন পর্ব শেষ ও নূতন পর্ব সূচনার ঘণ্টাধ্বনি করতে থাকবে—কুরুক্ষেত্র, তিরৌরি, পানিপথ, কর্ণাল—অবিরাম, অবিশ্রাম।

॥ ৫ ॥

কতবার হাসি কত নির্মোক
তাজিলে হেলায় দিল্লিপুরী
কত বেশে আহা কালে কালে তুমি
জগতের মন করিলে চুরি।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বাদশা শাহ্‌জাহান যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে পুরানা কেল্লার উত্তরে নূতন কেল্লা, নূতন শহর গড়ছেন, কেল্লার নাম হবে লালকেল্লা, কিল্লা মুবারক, শহরের নাম শাহ্‌জাহানাবাদ।

ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ক'রে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শহরকেই রাজধানী বলে

াকার ক'রে নিলেন বাবর। হুমায়ুন শা দুই দফাতেই পুরানা কিল্লাকে রাজধানী াকার করলেন। মাঝখানে কয়েক বছরের জন্য এলো শূরবংশ,তাদের রাজধানীও 'ল পুরানা কিল্লা, নূতনের মধ্যে গড়লেন সেলিমগড়, লালকেল্লার উত্তরে ঠিক মুনার উপরে। আকবর মসনদে বসে চলে গেলেন আগ্রায়। তারপরে আগ্রা থেকে গেলেন বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে যেখানে রাণা সঙ্গ পরাজিত হয়েছিল সেই মাঠের াধ্যে, শিকরি গ্রামে বাদশাহী স্বপ্নের মতো গড়ে উঠল ফতেপুর শিকরীর কেল্লা ও নগর। বছর পনেরো সেখানে থাকবার পর কি হ'ল তাঁর মনে, ফিরে এলেন আগ্রা। তিনপুরুষ ধরে গড়া হ'ল আগ্রার দুর্গ, প্রাসাদ, সমাধি-সৌধ তাজমহল। তারপরে হঠাৎ কি হ'ল, পরিত্যক্ত দিল্লির জাদুময় ভূখণ্ড করলো শাহ্‌জাহানকে মাকর্ষণ। গড়া আরম্ভ হ'ল শাহ্‌জাহানাবাদ ও লালকেল্লা, মুঘল শাসনের প্রধান ও শেষ রাজধানী। বছরের পরে বছর ময়দানবের চেলারা গড়ে তোলে নূতন শহর যমুনা আর পাহাড়টার মধ্যে উত্তরে দক্ষিণে লম্বা। দক্ষিণ দিকে দিল্লি দরবাজা পুরানা কিল্লার দিল্লি দরবাজার মুখোমুখি আর পশ্চিম-উত্তর কোণে কাশ্মীরী দরবাজা। ঐ কাশ্মীরী দরবাজা বাদশাকে স্মরণ করিয়ে দেয় সুদূর কাশ্মীরের পাহাড় আর উপত্যকা, ঝরণা আর ঝিলম, বন আর বাগিচা। তৈরি হয় চোদ্দটা দরবাজা আর চোদ্দটা ছোট দরবাজা আর সেই সঙ্গে গাঁথা হয়ে ওঠে লাল পাথরের প্রাচীর, তিন বর্গমাইল শহরকে ঘিরে সাত মাইল যার ব্যাস। কিন্তু শাহ্‌জাহানের দেওয়া প্রাচীর বেশিদিন টেঁকে নি। ১৮০৩ সালে জেনারেল অক্‌টরলোনি পুরানো প্রাচীর ভেঙে ফেলে দিয়ে নূতন প্রাচীর গড়লো, ১৮১১ সালে আর একবার সংস্কার করলো রবার্ট নেপিয়ার। এখন ইংরেজের গড়া প্রাচীর ভাঙতে ইংরেজকে হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছে। ইংরেজ এঞ্জিনীয়ার মজবুত ক'রেই গড়েছিল বটে। আর কী প্রাচীর! মাঝে মাঝে বুরুজ, দশ থেকে পনেরোটা কামান সাজানো চলে। পনেরো ফুট চওড়া, ত্রিশ ফুট উঁচু দেয়ালের নীচ বরাবর পঁচিশ ফুট গভীর গড়খাই। সেকালে এমন কামান ছিল না যা ভাঙতে পারে এই প্রাচীর। ধীরে ধীরে বাদশার নিজের হাতে আঁকা নকশা দেখে কারিগরেরা পত্তন করে যায় শহর। কেল্লার লাহোরী দরবাজা থেকে শহরের লাহোরী দরবাজা পর্যন্ত চাঁদনী চক সড়ক, মাঝখান দিয়ে জলের নহর, তার দুই পাশে ফুলের গাছ, ফলের গাছ, একসঙ্গে দেয় ছায়া সুগন্ধ আর সৌন্দর্য, হার মানিয়ে দেয় ইস্তাম্বুল বোগদাদ সমরকন্দ বোখারার রাজপথকে। আবার কেল্লার পশ্চিম বরাবর ফৈজবাজার সড়ক, তার জলুসও কম নয়। পাশেই ফুলকীমণ্ডী, ফুলের বাজার, দুনিয়ায় এমন ফুল নেই যা পাওয়া যায় না এখানে।

আর রূপের ফুল। হাঁ, তারও সেরা বাজার শাহ্জাহানাবাদ। চাঁদনী চকের উত্তরে বেগমবাগ। তার কাছ ঘেঁষে পশ্চিম দিকে গলি সরবাহু আর কাটরা নিকায় ছনিয়ায় বাগানে ফোটে এমন সমস্ত ফুল পাওয়া যাবে, অস্ফুট কুঁড়ি থেকে ঝরে পড়বার মুখে—সব রকম ফুল। আবার ঐ চাঁদনী চকের সমান্তরালে উত্তর বরাবর বেগমবাগের মাঝখান দিয়ে চলেছে আলি মর্দান খাঁর প্রধান কীর্তি যমুনা খাল। সেলিমগড়ের কাছে যমুনায় এসে পড়েছে। কেল্লার গড়খাই ভরিয়ে দিয়ে যমুনার নীল জল নহর বরাবর শহর ভেদ ক'রে কাবুল দরবাজা দিয়ে ঢুকেছে কিষেণগঞ্জ পেরিয়ে, রোশেনারা বাগ পেরিয়ে অনেক দূর থেকে। আর ঐ যে লালকেল্লার প্রাচীর আর বুরুজ ছাড়িয়ে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে জামি মসজিদের মিনার আর গম্বুজ। জামি মসজিদের পরেই প্রসিদ্ধি চাঁদনী চকের সোনেরি মসজিদের। দারার ছিন্নমুণ্ডবাহী শোভাযাত্রার দর্শক, বাদশা ফারুক-শিয়রের শবযাত্রার সাক্ষী আর স্বকর্ণে শুনেছে নাদির শার কোতলে-আম হুকুম। হায়, মানুষের গড়া শহরের পাথরগুলো যদি কথা বলতে পারতো।

॥ ৬ ॥

তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লির পথের ধুলি-পরে
—রবীন্দ্রনাথ

১০৪৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর শোভাযাত্রা ক'রে বাদশা শাহ্জাহান লালকেল্লায় প্রবেশ করলেন। বাদশার পাটহাতীর উপরে সোনার হাওদা, মুক্তোর ঝালর দেওয়া সোনার ছাতা, হাতীর আগাগোড়া সোনারূপোর কাজ করা কিংখাবের পোশাক। বাদশার পাশে উপবিষ্ট শাহ্জাদা দারাসিকো দুই হাতে ছড়াচ্ছেন মোহর, বুরুজে বুরুজে উৎসব-সূচী কামানের আওয়াজ, নৌবৎখানায় রাগ-রাগিণীর আলাপ, সূচীভেদ্য জনতার কণ্ঠে জয়ধ্বনি। লাহোরী দরবাজা দিয়ে শোভাযাত্রা চলল ছাতা চক পেরিয়ে ভিতরের দিকে, দীঘির জলে হাজার রঙের ছায়া ফেলে শোভাযাত্রা এসে পৌঁছল নৌবৎখানার কাছে, রাগরাগিণী উত্তাল হয়ে ওঠে, অবশেষে বাদশা অবতরণ করলেন দেওয়ানী আমের সম্মুখে। দেওয়ানী আমের সম্মুখের চত্বর রূপোর বেড়া দিয়ে ঘেরা, রূপোর দাঁড়ের উপরে সোনার কাজ করা শামিয়ানা—দৈর্ঘ্যে ৭৫ গজ প্রস্থে ৪০গজ, লাল রঙের কাশ্মীরী

শালে মরবার আগাগোড়া মোড়া। দেওয়ানী আম বাদশাকে প্রথম অভ্যর্থনার যে অলঙ্কার পরেছে তা সংগৃহীত হয়েছে দূর-দূরান্ত থেকে; তুর্কীস্থান, চীন, কাশ্মীর যুগিয়েছে—কার্পেট কিংখাব; গোলকুণ্ডা, পান্না, মহীশূর যুগিয়েছে—হীরা মুক্তা পান্না মরকত।

বাদশা খিলাৎ বিতরণ করছেন। বেগম সাহেবা, শাহ্‌জাদার দল, আমীর উমরাও উজীর সবাই মর্যাদা মতো খিলাৎ পেলো। লালকেল্লার প্রধান এঞ্জিনিয়ার মকরামৎ খাঁ নিযুক্ত হ'ল পাঁচহাজারী মনসবদার।

নয় বছরের পরিশ্রমে আর এক কোটি টাকা ব্যয়ে লালকেল্লা গড়া শেষ হয়েছে। লালকেল্লা নিতান্তই লৌকিক নাম, লাল পাথরে গড়া বলে। কিল্লা-ই-মুবারক, কিল্লা-ই-শাহ্‌জাহানাবাদ, কিল্লা-ই-মুআল্লা অনেক নামে পরিচিত মুঘল সাম্রাজ্যের এই শেষ প্রাসাদ-দুর্গ।

আগ্রার দুর্গ, ফতেপুর শিকরির দুর্গ, লালকেল্লা সবই এক ছাঁচে তৈরি, তবু প্রভেদ আছে। প্রথম দুটো দর্শককে দুর্গের প্রাথমিক কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয় —তখনো অনেক যুদ্ধবিগ্রহ সম্মুখে রয়েছে মুঘল বাদশাদের, তাদের অলঙ্কার-বিরল মল্লোচিত বেশ। শাহ্‌জাহান যখন লালকেল্লা গড়লেন তখন যুদ্ধবিগ্রহের পালা শেষ হয়ে গিয়েছে, হাতে জমে গিয়েছে বিস্তর টাকা, তাই লালকেল্লায় বীরের বিলাস সজ্জা, অর্জুন এখানে বৃহন্নলা।

দেওয়ানী আম ডান দিকে রেখে ভিতরের দিকে গেলে কেল্লার পুব দিকে উত্তর থেকে দক্ষিণ বরাবর শাহ্‌বুরুজ, মোতিমহল, হামাম, দেওয়ানী খাস, খোয়াবগা, রঙমহল, মমতাজমহল প্রভৃতি। দেওয়ানী খাস আর খোয়াবগার মাঝখানে প্রসিদ্ধ ঝরোকা, যেখানে প্রত্যহ প্রভাতে দাঁড়িয়ে বাদ্‌শা দর্শন দিতেন নিচে যমুনার চরে সমবেত প্রজাপুঞ্জকে। দর্শনার্থীর দল বাদশাকে না দেখে জলগ্রহণ করতো না। মোতিমহল আর হামামের সম্মুখে পুবে পশ্চিমে লম্বা হায়াৎবক্স বাগ আর মহতাব বাগ, মাঝখানে শাবন মহল আর ভাদোঁ মহল। মুঘল বাদশারা জলের নহর ভালবাসে আর ভালবাসে বাগান। ও দুটোয় বোধ করি পিতৃভূমির শোভা সৌন্দর্য স্মরণ করিয়ে দেয়। বাগানের মধ্যে জলের নহর, আর মোতিমহল থেকে রঙমহল অবধি নহর-ই-বেহেস্ত, স্বর্গনদী, ঘরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। সেই নহর-ই-বেহেস্তের জলের সঙ্গে মিশেছে শ্বেতপাথরের গড়া হামামে শত শত সোনার ফোয়ারা থেকে উৎসারিত গোলাপ-জল আর আতর। নহর-ই-বেহেস্তের জলে ছায়া ফেলেছে সোনা রূপোয় মোড়া ছাদের হীরে মুক্তোর কারুকার্য। নহর-ই-বেহেস্তে আশমানের ছায়া।

লালকেল্লা অষ্টকোণ গড়, লম্বায় তিন হাজার ফুট প্রস্থে আঠারোশ'। প্রাচীরের ব্যাস দেড় মাইল, নদীর দিকে প্রাচীর ষাট ফুট উঁচু, অন্য দিকগুলোর প্রাচীরের উচ্চতা একশ' দশ ফুট ; পঁচাত্তর ফুট চওড়া, ত্রিশ ফুট গভীর গড়খাই দিয়ে বেষ্টিত, পুব দিক রক্ষা করছে দুরতিক্রম্য যমুনা। কেল্লার দক্ষিণ দিকে লাহোরী দরবাজার অনুরূপ দিল্লি দরবাজা। আওরঙজেব বাদশাহী অধিকার করবার পরে দুই দিকের দরজার বাইরে আরও একটা ক'রে দরজা ও প্রাচীর তুলল। বন্দী বাদশা আগ্রা দুর্গ থেকে ছেলেকে লিখলেন, তুমি দেখছি সিংহদ্বারের উপরে ঘোমটা পরিয়ে দিলে, ব্যাপার কি? বিলাসের সঙ্গে নিরাপত্তার দুর্লভ যোগাযোগ হ'লে তাকেই বুঝি স্বর্গ বলে?

অগর ফিরদৌস বর রুয়ে জমীনঅস্ত্

ওয়া হমীনস্ত্, ওয়া হমীনস্ত্, ওয়া হমীনস্ত্ ॥

॥ ৭ ॥

দিল্লিনামা

স্বরূপ সপ্ত দিল্লির ইতিহাস বর্ণনা ক'রে যায়—শাহ্‌জাহানাবাদকে ধরে সপ্ত দিল্লির ইতিহাস। অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে দেখায় জামি মসজিদ, লালকেল্লা, হুমায়ুন শার কবরের গম্বুজ, দিগন্তের কাছে ইতিহাসের উর্ধ্বোত্থিত তর্জনীর মতো কুতুবমিনার। কতক পড়েছে কতক শুনেছে, দেখেছে সমস্ত, কথার উপরে কথা সাজিয়ে ছবি এঁকে যায় একটার পরে একটা। ব্রিজম্যান, জীবনলাল ও গুরবচনের কাছে সমস্তই নূতন, তারা অবাক হয়ে শোনে।

ব্রিজম্যান বলে, স্বারূপ, তোমার দেখছি সব নখাগ্রে।

স্বরূপ বলে, এখানেই জন্ম এখানেই মানুষ তাই জানবার সুযোগ হয়েছে।

ব্রিজম্যান অনুরোধ করে, শাহ্‌জাহানাবাদের দরবাজাগুলো আর একবার ভালো ক'রে চিনিয়ে দাও তো।

স্বরূপ বলে, দরবাজা তো এখান থেকে দেখবার উপায় নেই, প্রাচীরের সামান্য একটা অংশমাত্র এখান থেকে দৃষ্টিগোচর হয়।

সেইটুকুতে আমাদের দরকার, বাকি অংশ আমাদের আয়ত্তের বাইরে। তিন হাজার সৈন্য নিয়ে এত বড় শহরের সব দিক অবরোধ সম্ভব নয়।

স্বরূপ বলে, উত্তর-পশ্চিম কোণে ঐ কাশ্মীর দরবাজা, ওর পিছন দিকে সেণ্টজেম্‌স্ চার্চ, সরকারী অফিস আর তোপখানা।

সমস্ত বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, শুধায় ব্রিজম্যান।

যতদূর জানি সব নষ্ট ক'রে ফেলেছে সিপাহীরা। সে বলে যায়, আর একটু পশ্চিমে সরে এসে মোরি দরবাজা। ওটা দিল্লির প্রধান দরবাজাগুলোর মধ্যে নয়। তার পরে শাহ্‌বুরুজ।

ব্রিজম্যান বলে, ঐ বুরুজটার সঙ্গে ইতিমধ্যেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। ওর কামানগুলোর পাল্লার মধ্যে আমরা আছি।

তারপরে কাবুল দরবাজা যার পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে যমুনার খাল। তারপরে বার্ণবুরুজ আর লাহোর দরবাজা।

ব্রিজম্যান পুনরায় বলে, লাহোর দরবাজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে, এ পর্যন্ত যত আক্রমণ হয়েছে ঐ দরজা দিয়েই।

ওর পরে আর এখান থেকে দেখবার উপায় নেই।

ছোট্ট একটু ছাদ, বেশি নড়বার উপায় নেই, পা ফস্‌কালে পড়তে হবে ষাট ফুট নিচে পাথরের উপরে, চারজনে কোনরকমে দাঁড়াতে পারে।

হঠাৎ নিচের দিকে তাকিয়ে ব্রিজম্যান বলে ওঠে, ছাখো ছাখো, আমাদের বাবুর্চি, খানসামা, ভিস্তিঅলাদের কাণ্ডটা দেখো।

কাণ্ডটা ওরা অনেকবার দেখেছে।

জীবনলাল বলে, আস্ত গোলা কুড়িয়ে আনতে পারলে গোলা প্রতি দুই আনা বকশিশ পায়।

আরে সে হুকুম তো আমরাই দিয়েছি। আমাদের কামানের গোলা এত কম যে এছাড়া আর উপায় ছিল না। আমি ওদের সাহস দেখে ধন্য মানি। এখন তবু তো গোলা চলছে না, কিন্তু দারুণ গোলাবৃষ্টির মধ্যেও দেখছি ওরা সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে আছে। একটা আস্ত গোলা পড়বামাত্র তিনি-চারজনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

জীবনলাল বলে,- তার ফলে অনেককেই হাসপাতালে যেতে হয়, তপ্ত গোলা হাত পা পুড়িয়ে দেয়।

ব্রিজম্যান বলে, ওরা অকুতোভয়। আর সাবাস বলি ঐ বাবুর্চিদের। গোলা চলছে তার মধ্যে মনিবের খানার ট্রে মাথায় নিয়ে এমন নিশ্চিন্তভাবে চলেছে যেন ডাইনিং রুম ছাড়া আর কিছু নয়। ওদের সকলে ভিক্টোরিয়া ক্রস পাওয়ার যোগ্য।

ক্লায়পরে চোখে দুরবীন লাগিয়ে দেখতে থাকে, দূরে শাহজাহানাবাদ, দক্ষিণে লপ্ত দিল্লির ধ্বংসাবশেষ। কিছুক্ষণ পরে পশ্চিম দিকে দুরবীন কষা চোখ ফেরায় ব্রিজম্যান। ওরা তিনজন ভাবে ওদিকে দেখবার কি আছে, এতক্ষণ ধরে এত তন্ময় হয়ে কর্নেল কি দেখছে।

হঠাৎ ব্রিজম্যান হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, হুর-রা, হুর-রা। জীবন দুরবীন লাগাও।

তিনজন চোখে দুরবীন লাগায়। স্বরূপ অসামরিক হলেও জীবনলালের কৃপায় একটা দুরবীন পেয়েছিল।

দেখতে পাচ্ছ কিছু! গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বরাবর মুবারক বাগের উপর দিয়ে তাকাও।

ওরা কিছু দেখতে পায় না, চুপ ক'রে থাকে।

এখনো দেখতে পাচ্ছ না। এবারে দেখতে পাবে, টিলার উপরে উঠেছে। নিশ্চয় Daly কিম্বা Edwards।

এবারে ওরা দেখতে পায়।

জীবন বলে, এক সার কামানটানা হাতী।

ব্রিজম্যান বলে, Siege train।

গুরবচন বলে, অসংখ্য উট।

ব্রিজম্যান আবার বলে, গোলাবারুদ।

এবারে খালি চোখেও দেখতে পাওয়া যায়। ঘোড়সওয়ার, পদাতিক, হাতী উট বলদে মিলিয়ে সুদীর্ঘ সার, যার শেষের দিকটা এখনো টিলার আড়ালে প্রচ্ছন্ন।

এসব পাঞ্জাব থেকে প্রেরিত। 'থ্রি-চিয়ার্স ফর স্যার জন লরেন্স' বলতে বলতে দ্রুত পদক্ষেপে নেমে যায় কর্নেল ব্রিজম্যান।

ওদের তিনজনেরই এখন অফ্-ডিউটি। জীবনলাল বলল, চলো রাজপুর ক্যান্টনমেণ্টের দিকে যাওয়া যাক, আমরা গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে ওরাও এসে পৌঁছবে।

অবজারভেটারি টাওয়ার থেকে তিনজনে পাহাড়ের উপর দিয়ে রওনা হয়ে যায়।

॥ ৮ ॥

মিস্টার ক্লিফোর্ড অব গুরগাঁও

ওরা তিনজনে সোজা পাহাড়ের উপর দিয়ে ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার পর্যন্ত এসে পাহাড়ের গা বেয়ে পশ্চিমদিকে সদর-বাজারে নেমে এলো। দেখলো

যে, তারা পৌঁছুবার আগেই পাজার রেজিমেন্টের অগ্রণী দল পৌঁছে গিয়েছে। লাইনভুরি গার্ড ও রসদ গার্ডের দল ইতিমধ্যেই নিজেদের নির্দিষ্ট কাযে নিযুক্ত হয়েছে। আর জমাদার দফাদার, উর্দিমেজর, কোত দফাদার, বাবুর্চি, খানসামা', ভিস্তি, মেথর ও ডুলি বাহকেরা কলের মতো যে-যার কাজ করে যাচ্ছে, গোলমাল নেই, বিশৃঙ্খলা নেই। ওরা অবাক হয়ে দেখে যে, লাইন-ভুরি গার্ডের দল ক্ষিপ্র নিপুণ হস্তে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের তাঁবু খাটিয়ে ফেলল, চেয়ার টেবিল আলমারি দিয়ে তাঁবুটি সাজালো, পাশের স্নানাগারের জন্য স্বতন্ত্র আর একটি তাঁবু খাটালো। তারপর পাশাপাশি কর্নেল, লেঃ কর্নেল, মেজর প্রভৃতির তাঁবু খাটিয়ে গেল আর প্রত্যেক তাঁবুর কাছে একটি ক'রে নিশান পুঁতে দিল, যাতে সেনাপতিরা এসেই নিজ নিজ তাঁবু বুঝতে পারে। বাসস্থানের তাঁবু খাটানো শেষ হওয়া মাত্র রান্নার তাঁবু পড়লো। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা খাটিয়ে ডাইনিং হল তৈরী হ'ল, তার মধ্যে মস্ত এক টেবিলের চারধারে পড়লো খান কুড়ি চেয়ার। এ কাজ শেষ হওয়া মাত্রই লাইনভুরি গার্ড ঘোড়া থাকবার স্থান তৈরি করতে লেগে গেল। সারি সারি ঘোড়া থাকবার নিয়ম, কাজেই সারি সারি খোঁটা পুঁতে প্রত্যেক খোঁটায় একগাছা মোটা লম্বা দড়ি বাঁধলো। ঘোড়সওয়ার এসে পৌঁছলেই ঘোড়াগুলো নিয়ে বাঁধবে। ওদিকে রসদ গার্ডের দল রেজিমেন্টের বেনিয়ার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ডাল, আটা, ঘি, নুন সংগ্রহ করলো। ডিম ও গোস্ত হিন্দুস্থানী বেনিয়ারা ছোঁয় না, সেসব যোগাড় করবার ভার মুসলমান বাবুর্চিদের উপরে।

জীবনলালেরা সদর বাজারের রতনলাল হিন্দুস্থানীর পানের দোকানে একখানা বেঞ্চির উপরে বসে সব দেখতে থাকে। জীবন ও গুরবচন সিং অগ্রণীর দলের এসব কাজ দেখতে অভ্যস্ত, বিস্ময়বোধ করে স্বরূপরাম। দিল্লি শহরে দেখেছে সিপাহী পক্ষের আচরণে অব্যবস্থার চরম, দেখেছে সবাই সকলের চেয়ে বড়, তাই কেউ কারো কথা শোনে না। সেখানে গদর শুরু হওয়ার পরে ক'দিনই বা ছিল সে, তখনি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল অরাজকতার কৃষ্ণপক্ষ। আর আজ দেখলো, অবশ্য এ কয়দিনও দেখেছে, তবে আজকের মতো এমন স্পষ্টভাবে দেখে নি, কেমন নিঃশব্দে কলের মতো কাজ হয়ে যাচ্ছে। ভাবে কি চমৎকার বন্দোবস্ত। তার মনের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে গুরবচন বলে ওঠে, ছাখো ভাই জীবনলাল কোম্পানী কেন জিতবে জানো?

কেন তুমিই বলো।

বন্দবস্ত! এই যে বন্দবস্ত দেখছ, শুধু এই জন্যেই জিতবে। নইলে সিপাহী

পক্ষেও বাহাদুর আদমি বড় কম নেই, কিন্তু বন্দ্‌বস্ত বলে তাদের কিছু নেই।

স্বরূপ তার কথায় সমর্থন জানিয়ে দ্বিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে।

ভাখো না কেন, গুরবচন বলে, সাহেবদের ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় খানা চাই, ছোট হাজারি, লাঞ্চ, টিফিন, ডিনার। তাতেও আবার কেমন বন্দ্‌বস্ত। পরিষ্কার কাপড়-পরা খানসামা ধোয়া কাপড়ে ঢাকা ট্রে সাজিয়ে খানা নিয়ে আসবে তা গোলাবৃষ্টিই হোক আর ঝড়বৃষ্টিই হোক। আর আমাদের লোটা মাজতে মাজতে লড়াই কতে হয়ে যায়।

জীবন বলে, সাহস বটে ঐ খানসামা বাবুর্চির।

নিশ্চয়! আমরা তো হাতিয়ার নিয়ে অগ্রসর হই, মরতেও পারি মারতেও পারি। আর ওরা মৃত্যুর পথে নিরস্ত্র এগিয়ে যায় মনিবের খানা নিয়ে, পালাবার উপায় নেই, খানা নষ্ট হওয়া প্রাণ নষ্ট হওয়ার চেয়েও মারাত্মক।

আর সাহস, ঐ যারা কামানের গোলা কুড়িয়ে আনে দু' আনা বকশিশের লোভে, বলে জীবনলাল। দুমদাম চারিদিকে গোলা পড়ছে, ওরা নির্বিকার। তপ্ত গোলা ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই বস্তায় ভরে টেনে নিয়ে আসে।

গোলাগুলোকে ওরা কি নাম দিয়েছে জানো? দিল্লিকা লাড্ডু, বলে ওঠে জীবনলাল।

এমন সময়ে ওরা দেখতে পায় দুজন ইংরেজ তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, একজন সৈনিক, অপরজন অসামরিক ব্যক্তি। ওরা দাঁড়িয়ে উঠে স্যালুট করে।

সৈনিকটি শুধায়, তোমরা কর্নেল ব্রিজম্যানের তাঁবু কোথায় জানো কি?

জীবন বলে, আমরা তাঁরই রেজিমেন্টের রেসালাদার। কর্নেল থাকেন

Very good! ইনি মিঃ ক্লিফোর্ড, গুরগাঁও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, কর্নেল ব্রিজ-ম্যানের বন্ধু। এঁকে তাঁর কাছে এখনি পৌঁছে দাও।

গুড বাই স্টফোর্ড।

গুডবাই ক্লিফোর্ড। হঠকারিতায় কিছু ক'রে ফেলো না।

উত্তর দেয় না ক্লিফোর্ড। ইঙ্গিতে ওদের অনুসরণ করতে বলে ছুটতে থাকে হিন্দুরাও কুঠির দিকে।

জীবনলালেরা ভাবে এত তাড়া কিসের।

ব্রিজম্যানের কামরায় তখন ঘোড়সওয়ার বাহিনীর মেজর রীড আর গোলন্দাজ বাহিনীর মেজর জোন্‌স্ উপস্থিত ছিল, ব্রিজম্যানকে নিয়ে তিনজন। ওদের পিছনে ফেলে রেখে ক্লিফোর্ড ঘরে প্রবেশ করলো, তৎক্ষণে ওরা দরজার

বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা শুনতে পেলো।

হ্যালো ক্লিফোর্ড, গুড মর্নিং।

গুড মর্নিং ব্রিজম্যান।

হঠাৎ কোথা থেকে?

গুরগাঁও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম। সেখানে তুমুল বিদ্রোহ, আর থাকা নিরর্থক, তাই স্টফোর্ডের সঙ্গে চলে এলাম।

বেশ করেছ। এখন দিল্লিতে আমাদের লোকের দরকার। তারপরে শুধালো, আশা করি তোমার পারিবারিক সব কুশল।

আদৌ কুশল নয়, অত্যন্ত দুঃসংবাদ। পরিবারের মধ্যে আমি আর আমার বোন। দিল্লিতে বিদ্রোহ ঘটবার কয়েক দিন আগে মিস ক্লিফোর্ড এসেছিল দিল্লিতে বেড়াতে, ছিল পাদ্রী জেনিংস দম্পতির বাড়িতে। তারপরে—

তারপরে আর বলতে হবে না ক্লিফোর্ড, সব বুঝেছি।

কিছুই বোঝ নি ব্রিজম্যান। মৃত্যুর চেয়েও শোচনীয় কিছু কি নেই?

কি বলতে চাও তুমি।

ক্লিফোর্ড গর্জন করে ওঠে, মারবার আগে তাকে বেইজ্জত করা হয়েছে।

কুণ্ঠিতভাবে ব্রিজম্যান বলে, খবর হয়তো ভুল।

না, না, আমাকে বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ক'রো না, আমার খবর পাকা।

কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পরে ব্রিজম্যান বলল, এসো আমাদের সঙ্গে দিল্লি অধিকারে হাত লাগাও, শান্তি লাভ করবে মিস ক্লিফোর্ডের আত্মা।

দিল্লি অধিকারে শান্তি পাবে মিস ক্লিফোর্ডের আত্মা! ধিক্!

তবে তুমি কি করতে চাও ক্লিফোর্ড?

প্রতিশোধ চাই।

অপরাধী কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে?

অপারাধীকে খুঁজতে হবে কেন? মিস ক্লিফোর্ডের সমবয়সী যে-কোন মেয়েকে দিল্লির প্রকাশ্য রাজপথে বেইজ্জত করতে হবে। তবেই শান্তি পাবে এলিনার আত্মা, তবে শান্তি পাবো আমি। এই হচ্ছে আমার ন্যূনতম প্রতিহিংসা।

কি বলছ তুমি ক্লিফোর্ড! এ কি খ্রীষ্টানের মতো কাজ!

খ্রীষ্টানের মতো কাজ পড়ে পড়ে মার খাওয়া, মেয়েদের বেইজ্জত হ'তে দেখা! কি বলো? আর খ্রীষ্টানীতে কাজ নেই।

আচ্ছা সে-সব পরে চিন্তা করা যাবে, আপাততঃ শান্ত হও, বসো।

শান্ত হবো, বলবো! অবশ্যই শান্ত হবো, বলবো। ব্রিজম্যান, এক এক সময়ে মনে হয়েছে বুঝি পাগল হয়ে যাবো, ইচ্ছা হয়েছে আত্মহত্যা ক'রে সব জ্বালার অবসান ঘটাই। তখনি মনে হয়েছে, না মরা চলবে না, মৃত্যুর পরে এলিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে কী বলবো তাকে। যখন সে শুধোবে অপরাধীর দণ্ড হয়েছে কি—তখন কী বলবো তাকে। না, ব্রিজম্যান, ভয় পেয়ো না, আমি মরবোও না, উন্মাদও হবো না, দিল্লির রাজপথে দিনের প্রখর আলোয় সহস্র চক্ষুর সম্মুখে সেই প্রতিহিংসা অনুষ্ঠিত হবে, সেই ভরসায় সেই বিশ্বাসে সেই আশ্বাসে আজো বেঁচে আছি এবং বেঁচে থাকবো।

এবার ব্রিজম্যান স্নেহের সঙ্গে বলল, আচ্ছা, পরে পরামর্শ করা যাবে, এখন এসো বিশ্রোম করবে।—এই বলে তাকে টেনে নিয়ে গেল পাশের ঘরে।

॥ ৯ ॥

"নিশীথ রাতের বাদল ধারা"

রাত্রে ঘুম আসে না, ক্যান্টনমেন্টের পেটা ঘড়িতে ঘণ্টার পরে ঘণ্টা বেজে যায়, থেকে থেকে পদচারণরত প্রহরীর চ্যালেঞ্জ চমকে চমকে ওঠে, দমকা বাতাসে ভেসে আসে মৃতদেহের পুতিগন্ধ, সেই সঙ্গে আসে শৃগাল আর শকুনের উৎকট কাড়াকাড়ির কর্কশ রব, ঘুম আর আসে না। রাত্রি দশটার পরে আলো না জ্বালতে কড়া নিষেধ, আলো নিভিয়ে দিতেই মশার কামড় তীব্রতর হয়ে ওঠে, মশা তাড়াতে গেলে ঘুম হয় না, আবার নিষ্ক্রিয় থাকলেও সেই একই অবস্থা। পাশাপাশি দু'খানা চারপায়ার উপরে শুয়ে স্বরূপরাম ও জীবনলাল চুপ করে পড়ে থাকে। কখনো অসহ্য হ'লে এপাশ ওপাশ করে, তাতেই বুঝতে পারা যায় দু'জনেই জাগ্রত।

স্বরূপজী, জেগে নাকি?

এর মধ্যে কি ঘুম সম্ভব? তুমি?

আমারও সেই অবস্থা।

এইরকম মাঝে মাঝে দু'জনে প্রশ্নোত্তর চলে, তারপরে আবার সব নীরব।

ঘুম না আসবার আরও কারণ আছে। রিকোর্ডের বিবরণ শুনবার পরে দু'জনের মনেই আলোড়ন শুরু হয়েছে। দিনের বেলায় হাজার কাজের মধ্যে চিন্তাটা চাপা পড়েছিল, রাতের বেলায় ভীষণ ফণা তুলে নাগিনী নির্নিমেষে

তাকিয়ে আছে। দু'জনেরই মন বিহ্বল, দু'জনেই তীব্র চিন্তাস্রোতে ভাসমান, তবে এক রেখায় নয়—সমান্তরাল ধারায়।

অনেক দিন পরে আজ পান্নার কথা মনে পড়েছে জীবনের, সেই চিন্তার কাছে আজ সে আত্মসমর্পণ করেছে। এতদিন পান্নার কথা মনে পড়ে নি বললে অন্যায় হবে, পড়েছে তবে শত কাজের মধ্যে তার স্মৃতি জোনাকির টুকরোর মতো খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখা দিয়েছে, চমকে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছে, আজ হঠাৎ কেন জানি না, মিস ক্লিফোর্ডের দুঃখের শিখায় পান্নার মুখমণ্ডল দীপ্যমান হয়ে চোখে পড়লো। পান্নারও তো এমনটি হ'তে পারতো এই ভাবনাতেই কি? কিংবা সব দুঃখই তলে তলে এক সুতোয় গাঁথা এইরকম কোন সম্ভাবনায়? পান্না ক্লিফোর্ড মিলিত সত্তা অচপল মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে তার সম্মুখে। ঘুম আসবে কি ক'রে? পান্নার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পরে অনেকবার সে মনের মধ্যে হাতড়িয়ে দেখেছে, পান্নার সঙ্গে অগোচরে কি ভালোবাসার সুতো গাঁথা হয়ে গিয়েছে? নতুবা এতবার তাকে মনে পড়ে কেন? সুখে দুঃখে মনে পড়ে কেন? কামানের মুখে আবদ্ধ হয়ে মনে পড়ে কেন? শত্রুসৈন্যকে চার্জ করবার সময়ে মনে পড়ে কেন? স্বপ্নভেদ ক'রে পান্নার স্মৃতি সূচী চালনা করতে থাকে কেন? তার ধারণা হয়ে গিয়েছিল পান্নাকে সে ভালোবাসে। সে যদি নিতান্ত অনভিজ্ঞ না হ'ত, তবে বুঝতে পারতো পান্নার প্রতি তার মনোভাব ভালোবাসার কাছাকাছি হ'লেও ভালবাসা নয়। জীবন ভালোবাসার নদীতীরে এসেছে, কিন্তু এখনো নিজের ঘাটটি খুঁজে পায় নি। নদী পেলেই জলে নামা যায় না, তার জন্যে একটি ঘাটের প্রয়োজন। প্রেমের প্রথম অভিজ্ঞতায় অনেকেরই এমন ভুল হয়ে থাকে। প্রথমে ভুল ঘাটে নেমেও ফিরে আসতে হয়, অনেক ঘাটের জল খেয়ে তবে ফিরে আসতে হয় নিজের ঘাটে। পান্না প্রেমের নদী, প্রেমের ঘাট নয়।

স্বরূপরাম প্রথম পদক্ষেপেই প্রেমের ঘাট পেয়ে গিয়েছে—সে ঐ তুলসীবাঈ। সে ভাবছে এ কি হ'ল, ঘাটে পদক্ষেপ করবামাত্র ঘাট গেল ধসে, সে ভাসলো অতলে। তুলসীর স্মৃতি এক মুহূর্ত তার মন ছাড়ে নি, কিন্তু আজ তা নূতন তেজে ভাস্বর হয়ে উঠল মিস ক্লিফোর্ডের শোচনীয় মৃত্যুর সমিধ্‌ নিক্ষেপে। তার মনে পড়ল সেদিন যমুনার চরে হাকিম আসাদুল্লা বলেছিল, মৃত্যুই তো সবচেয়ে শোচনীয় পরিসমাপ্তি নয়, বলেছিল লালকেল্লায় যারা তাঞ্জাম চেপে যায়, তাদের মতো হতভাগিনী আর কেউ নেই। বলেছিল, তুমি যার জন্যে শোক করছ সে যদি কোতল হয়ে থাকে তবে সে তো বেঁচে গেল। তার মনে

হ'ল বাঁচে নি ঐ মিস ক্লিফোর্ড। তখনি হঠাৎ বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল, তুলসী যে মরেছে তা প্রমাণ হয় নি তো। তাঞ্জামে চেপে লালকেল্লায় প্রবেশ করেছে নিঃসংশয়, খুন হয়েছে এ তো অনুমান মাত্র।

সংশয়ের স্বভাব এই যে, বিন্দুমাত্র রূপে প্রবেশ করলে চক্ষের নিমেষপাতে সব আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সংশয় পরিণত হ'ল প্রতীতিতে। তার ধারণা হয়ে গেলো তুলসী জীবিত আছে আর আছে লালকেল্লার কোন বিলাস কক্ষে। এ ছাড়া আর যে কি সম্ভাবনা আছে তার মনে পড়লো না। সে ভাবলো হায় আমি কিনা এমনি মূঢ় যে সেই পর্যশয্যাবিলাসিনী বিনোদিনীর জন্যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, জীবনটা হাতে নিয়ে সঙ্কট থেকে সঙ্কটের মুখে ভেসে বেড়াচ্ছি। নিজের প্রতি ধিক্কারে তুলসীর প্রতি বিদ্বেষে সে অস্থির হয়ে উঠল, শুয়ে থাকা আর সম্ভব হ'ল না।

স্বরূপজী উঠলে যে।

স্বরূপ কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের বাইরে এসে একখানা পাথরের উপরে বসে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমকে উঠল। কিসের শব্দ? কোন নিশাচর জন্তুর, না বাদুড়ের পাখার। ঘন অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ে না, কোম্পানীর পক্ষের শিবির, শাহ্‌জাহানাবাদের প্রাচীর, উভয় পক্ষের প্রহরারত শান্ত্রী সমস্তই নিরেট অন্ধকারে বিলীন। স্বরূপ ভাবল শব্দটা কানের মরীচিকা। কিন্তু তখনি আর একবার শব্দ শ্রুত হ'ল, স্পষ্ট; দীর্ঘনিঃশ্বাস সন্দেহ নেই। ভাবলো তবে আরো কেউ হতভাগা আছে নাকি, এত রাত্রে যে জাগ্রত। তখনি মনে পড়ল ক্লিফোর্ডের কথা। ক্লিফোর্ড নয় তো? পিছনদিকে মুখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ ঠাহর ক'রে দেখবার পরে বুঝল সামান্য কয়েক হাত দূরে আর একখানা শিলাখণ্ডে কেউ একজন উপবিষ্ট। তার প্রতীতি হ'ল ক্লিফোর্ড ছাড়া আর কেউ নয়। দিনের সহস্র কর্তব্য চাপা দিয়ে রাখে চোখের জল আর দীর্ঘনিঃশ্বাস। রাত্রির যে অন্ধকার প্রচণ্ড দিনমণিকে আচ্ছন্ন করে, সেই অন্ধকারই উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেয় আকাশভরা চোখের জলের ফোঁটা। অন্ধকারই দুঃখের যথার্থ পটভূমি।

স্বরূপ ভাবল সে নগণ্য একজন লোক, আর ঐ মিঃ ক্লিফোর্ড মহামান্য রাজপুরুষ, দুস্তর তাদের মধ্যে ব্যবধান; কি আশ্চর্য, তবু এই রাতের অন্ধকারে চোখের জলের একই ঘাটে দুজনের অভাবিত সাক্ষাৎ। দুখে মানুষে মানুষে

ব্যবধান, দুঃখে মানুষে মানুষে মিল।

স্বরূপ ভাবল তার কর্তব্য কি? এমনি চুপ ক'রে বসে থেকে উঠে চলে যাবে, না একবার খোঁজ নেবে। খোঁজ নেওয়াই স্থির করলো। সে উঠে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, মিঃ ক্লিফোর্ড, শুতে কি অসুবিধা হচ্ছিল? আমি কিছু করতে পারি কি?

স্বরূপরামের সঙ্গে দিনের বেলায় তার পরিচয় ও আলাপ হয়েছিল, বস্তুত ক্লিফোর্ডকে দেখাশোনা করবার ভার তার উপরেই দিয়েছিল কর্নেল, ক্লিফোর্ড বলল, কে, মিঃ রাম নাকি? ভিতরে যেমন গরম তেমনি মশা, এর কী প্রতিকার আর তোমার হাতে আছে।

স্বরূপ বলল, বাস্তবিক এ দুটির কোন প্রতিকার এখনও করা সম্ভব হয় নি। কমাণ্ডার-ইন-চীফ ছাড়া আর কারো তাঁবুতে এখনও টানা-পাখার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি।

ক্লিফোর্ড শুধলো, তুমি এত রাত পর্যন্ত জেগে কেন? তোমার তো এতদিনে মশা ও গরমে অভ্যস্ত হওয়া উচিত।

মিঃ ক্লিফোর্ড, ও দুটো ছাড়াও তো আরও অনেক কিছু মানুষকে জাগিয়ে রাখতে পারে।

পারে বৈকি মিঃ রাম, দুঃখের মতো রাত-জাগানিয়া আর কি আছে!

চুপ করে থাকে স্বরূপ।

কেমন, ঠিক বলেছি কি না?

ঠিক বৈকি। তবে দুঃখ শুধু জাগিয়ে রাখে না, জাগিয়ে তোলে চাপা-পড়া দুঃখের স্মৃতি।

মিঃ রাম, এতক্ষণে বুঝলাম, মশাও নয়, গরমও নয়, চাপা-পড়া কোন দুঃখের স্মৃতি জেগে উঠেছে তোমার মনে, নয়?

মিঃ ক্লিফোর্ড, যদি কিছু মনে না করো তবে বলি, মিস ক্লিফোর্ডের শোচনীয় পরিণতি জাগিয়ে তুলেছে সেই স্মৃতি।

ক্লিফোর্ড জেনেছিল, হিন্দুরাও কুঠির সকলেই জানতে পেরেছে তার বোনের অন্তিম কাহিনী।

মিঃ রাম, আশা করি তোমার কোন আত্মীয়ার এমন শোচনীয় পরিণাম ঘটে নি।

মিঃ ক্লিফোর্ড, আশা রাখবার তো আর কারণ দেখি না।

যদি কৌতূহল অমার্জনীয় মনে না করো তবে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, সেই

হতভাগিনী তোমার কে হ'ত।

স্বরূপ উত্তর দেয় না।

বোন নাকি?

না বোন নয়।

তবে কি পত্নী?

পত্নী নয়, তবে হ'তে পারত।

Poor, poor lady! মিঃ রাম, এখানে বসো, খুলে বলো কি হয়েছে, দেখি তোমার দুঃখে আমার সান্ত্বনা খুঁজে পাই কি না!

শিলাখণ্ডের একপাশে বসে পড়ল স্বরূপ আর আরম্ভ করল তুলসীর জীবনের শেষ অধ্যায়।

দিনের আলোয় এমনটি কখনই ঘটতে পারত না। একজন বিদেশী রাজপুরুষ আর একজন বিজিত জাতির অপরিচিত সামান্য ব্যক্তি। তবু যে সম্ভব হ'ল তার কারণ, যে বর্ণভেদ এক্ষেত্রে দুস্তর বাধা, রাত্রির অন্ধকার আমূল লোপ ক'রে দেয় সেই ব্যবধান।

এতদিন পরে একজন সমবেদনাসম্পন্ন শ্রোতা পেয়ে অনর্গল বেরিয়ে আসে মনের কথা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে ক্লিফোর্ড, কখনও বলে ওঠে, এলিনাও ঠিক এই কথা বলত, ঠিক এই রকম তার স্বভাব ছিল. তোমার তুলসীর মতোই ছিল সে সুন্দরী আর স্নেহশীলা। এলিনার কথা জিজ্ঞাসা করতে হয় না স্বরূপকে, উপযাচক হয়ে বলে যায় ক্লিফোর্ড নিজে। দুজনের চোখে জল গড়ায়, কেউ সাহস করে না হাত তুলে মুছতে, সহৃদয় অন্ধকার ঢেকে রাখে সেই করুণ লজ্জার ধারা।

ওদিকে অনর্গল ভাবে বয়ে যায় রাতের প্রহরের স্রোত, খেয়াল থাকে না তাদের। পুব দিকে যমুনার আকাশে আলোর ঘুম ভাঙে, একবার তাকায় আবার চোখ বোজে, বনের রেখার উপরে স্পষ্টতার তুলি ক্রমে প্রকট হয়ে ওঠে, লালকেল্লার প্রাচীর গম্বুজ ধুসর আলখাল্লা পরে দেখা দিতে থাকে; পাহাড়ের উপরে ইংরেজ শিবিরে প্রহরীর চ্যালেঞ্জের ভাঁজে ভাঁজে শোনা যায় হাজার রকম পাখীর ডাক। মানুষ দেখা যায়, চেনা যায় না সেই প্রদোষের প্রথম আলোয়।

এতক্ষণ দুজনে একমনে নতমুখে কথা বলে যাচ্ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে এই প্রথম দুজন দুজনকে দেখতে পেল। অমনি লজ্জায় ধিক্কারে অনুশোচনায় লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ক্লিফোর্ড। এ কী করছিল সে! একজন অপরিচিত

নেটিভের কাছে বলছিল ব্যক্তিগত সেন্টিমেন্টের কথা। ভূমিকা বা উপসংহার কিছুই না ক'রে চলে যায় সে কুঠির দিকে। আর কিছু বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে যায় স্বরূপ। কী হ'ল! যে আলোয় বর্ণভেদ, সেই আলো যে দেখা দিয়েছে।

॥ ১০ ॥

ক্যালিবান (১)

একদিন সকালবেলা কর্নেল ব্রিজম্যানের কাছে জীবনলালের ডাক পড়লো। ব্রিজম্যান বলল, গীবন, গতকাল সিপাহীদের কামানের গোলা হিন্দুরাও কুঠি পর্যন্ত এসে পৌঁচেছিল।

জীবন বলল, আমি রেসালা (cavalry) নিয়ে সবজিমণ্ডির দিকে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে শুনলাম।

ব্রিজম্যান বলল, অনেকগুলো আস্ত গোলা আজ সকালে আমাদের ভিস্তিঅলা আর খানসামারা সংগ্রহ করেছে। কয়েকটা আস্ত গোলা গড়িয়ে গিয়ে কুঠীর তহ্‌খানায় (underground cellar) নাকি ঢুকেছে।

জীবন বলল, ওদের বলছি ভিতরে ঢুকে কুড়িয়ে নিয়ে আসুক।

পয়সা পাবে বলে ওরা ভিতরে ঢুকেছিল, কিন্তু তখনি ভয় পেয়ে পালিয়ে চলে এসেছে।

ভয়! কিসের ভয়? শুধোয় জীবন।

তা ভালো ক'রে বলতে পারে না। আচ্ছা, ওদের ডাকো তো।

ঘরের বাইরে দীদার বক্স আর হাজী মিঞা অপেক্ষা করছিল। তারা ভিতরে এলে ব্রিজম্যান জিজ্ঞাসা করলো, কি হয়েছিল ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলো তো রেসালাদার সাহেবকে।

দীদার বক্স আর হাজী মিঞা দুজনেই দীর্ঘকাল কোম্পানীর ফৌজে আছে, ব্রিজম্যানের রেজিমেন্টের সঙ্গেই আছে, দীদার বক্স ভিস্তিঅলা, হাজি মিঞা খানসামা। তারা বলে, অনেক লড়াই অনেক গদর অনেক হাঙ্গামা দেখেছে, ভয়ডর তাদের নাকি আর নাই। ব্রিজম্যান বলল, তোমরা ভয় পেলে কেন?

দীদার বক্স বলে, ইয়া আল্লা! ভয়? ভয় কেন পাবো? আমি কত মারাঠা ডাকু, শিখ গাঁওয়ার দেখেছি, ভয়ডর আমার নেই।

হাজী মিঞাও কম যায় না।

রেসালাদার সাহেব, কামানের গোলা ছুটছে, আমি খানা মাথায় নিয়ে সামি হাউস ব্যাটারিতক যাচ্ছি, ছুই নম্বর ট্রেঞ্চ, তিন নম্বর ট্রেঞ্চও যাচ্ছি। ভয়ডর পাবে আমার দুশমন।

দীদার বক্স বলে, হাজী ভাই মনে আছে তো, সেদিন ভিস্তির মুখ খুলে দিয়ে এমন তোড়ে জল ছুটিয়ে দিলাম যে, এক শালা সিপাহী পা পিছলে পড়ে গেল।

আরে সে বুদ্ধি তো আমি দিলাম তোমাকে।

সে তো দিলে, লেকিন কাজটা কোন্ কিয়েছে।

হাজী মিঞা বলে, কাজ তো সবাই করতে পারে, বুদ্ধি দিতে পারে কয়জনে?

উভয়ের এই আপসে বাগ্‌বিতণ্ডার সঙ্গে ব্রিজম্যান পরিচিত। সে বলল, তোমরা দু'জনেই সমান বাহাদুর, এখন বলো কি হয়েছিল।

উভয়ে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আপাতত তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হ'ল, কাজেই আসল ঘটনা বর্ণনায় আর বাধা রইলো না।

ব্রিজম্যানকে লক্ষ্য ক'রে দীদার বক্স শুরু করলো, তহ্‌খানায় আমি পহেলা ঢুকেছি—

হাজী মিঞা বলে, আরে আমি তোমাকে রাস্তা ছেড়ে দিলাম তবে তো পহেলা ঢুকলে—

হাজী ভাই ঝুটা বলো না, তুমি তো আমাকে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলে।

দীদার ভাই, রাস্তা সরু একজনকে তো আগে যেতে হবে, আগে পানি পরে খানা। আমার কি দোষ?

ব্রিজম্যান বলে, তোমাদের কারো দোষ নেই, এখন বলো ভিতরে কি দেখলে?

কুছু না হুজুর।

তবে পালিয়ে এলে কেন?

উভয়ে একসঙ্গে বিস্ময়ে বলে ওঠে, ইয়া আল্লা? ভাগকে আয়া? কভ্‌ভি নো না। ভাগ যাতা মারাঠা ডাকু, শিখ গাঁওয়ার। হাম লোগ কভি ভাগা নেহি।

ছুটে বাইরে তো চলে এলে? তবেই হ'ল।

হুজুর আগে তো বাহার এলো হাজী ভাই।

আরে দীদার ভাই আমি তো পিছাড়ি ছিলাম ভাই আগাড়ি বাহার এলাম।

জীবন তথার, হঠাৎ ভয় পেলে কেন?

ভয়? দু'জনে একসঙ্গে তারস্বরে অস্বীকার করে। ভয় পাবে মারাঠা ডাকু, শিখ গাঁওয়ার, দুশমন সিপাহী। ভয়ডর তারা অনেকদিন বিসর্জন দিয়েছে।

ভিতরে কোন শব্দ শুনলে কি?

এবারে ঠিক বলেছেন হুজুর। এক আবাজ।

দীদার বক্স প্রতিধ্বনি করে বলে, এক আবাজ।

কিছু দেখতে পেলে কি?

বাপরে বাপ। ভিতরে বিলকুল অন্ধেরা।

তবু।

তিন-চার সিপাহী ছিপাকে আছে।

হাজী মিঞা পিছিয়ে থাকবে কেন? বলে, পাঁচটা-ছটা সিপাহী হবে। ইয়া দাড়ি।

ইয়া মুচ!

জীবন বলে, তোমাদের চোখের তো খুব জোর, বিলকুল অন্ধেরার মধ্যে দাড়ি-মুচ দেখতে পেলে।

বিলকুল সফেদ তাই তো নজর হ'ল।

জীবন বলল, বেশ আমি ভিতরে গিয়ে দেখে আসছি, তোমরা এসো আমার সঙ্গে।

দীদার বক্স বলে, হাজী মিঞা, এবারে তোমার যাওয়ার পালা।

হাজী বলে, আমি আগে বাইরে এসেছি, তাই তুমি আগে ভিতরে যাবে।

জীবন বলে, তোমাদের কাউকে আগে যেতে হবে না, আমি যাবো আগে, তোমরা পিছনে পিছনে আসবে। কেমন?

দু'জনে একসঙ্গে বলে ওঠে, বহুত খুব। তারপরে বলে, একটা চেরাগ নিয়ে আসি, ভিতরে বিলকুল অন্ধেরা।

তারপরে উত্তরের অপেক্ষা না রেখে দু'জনে ছুটে চলে যায় বোধ করি চিরাগ আনতেই বা।

জীবনলাল হেসে ওঠে।

ব্রিজম্যান বলে, ওরা আর ফিরবে না।

জীবন বলে, আমি দেখে আসছি ব্যাপারটা কি হয়েছে।

একটা কিছু অস্ত্র নিয়ো।

অস্ত্র নিতে হবে বই কি! এক-আধজন সিপাহীর লুকিয়ে থাকা মোটেই অসম্ভব নয়।

জীবনলালকে তহ্খানায় ঢুকতে উদ্যত দেখে স্বরূপ ও গুরবচন সিং সঙ্গে যেতে রাজী হ'ল। চলো আমরাও যাই।

জীবন বলল, ভিতরে অল্প জায়গা তার উপরে অন্ধকার, তিনজনে ঢুকে শেষে কি নিজেরা মারামারি ক'রে মরবো। তাছাড়া ভিতরে সিপাহী আছে মনে হয় না।

স্বরূপ বলে আমারও তাই মনে হয়। ইংরেজের নামে সিপাহী কাঁপে। সেই সিপাই যে সাধ ক'রে এখানে এসে লুকিয়ে থাকবে বিশ্বাস হয় না।

গুরবচন বলে, সিপাহী না হোক জানোয়ার তো হ'তে পারে।

জীবন হেসে বলে, জানোয়ার না হোক পাখী নিশ্চয় হবে, খুব সম্ভব বাদুড়।

বলো কি, বাদুড় নিয়ে এত কাণ্ড।

হ'তেই হবে স্বরূপজী। ভিতরে ঢুকেছিল কারা ভুললে চলবে না, বলে হেসে ওঠে জীবনলাল।

দীদার বক্স ও হাজী মিঞার কথা মনে পড়ে স্বরূপের, বলে এ দুটি জীবকে আগে তো কখনো দেখি নি।

এর পরেও এদের জুড়ি দেখতে পাবে না।

তা বটে, চেহারা থেকেই আরম্ভ এদের চমৎকারিত্ব। দীদার বক্স যেমন লম্বা তেমনি রোগা তেমনি মিশকালো, আর হাজী মিঞা যেমন মোটা তেমনি বেঁটে রঙটা তেমনি টকটকে লাল।

স্বরূপের কথা শুনে গুরবচন বলে ওঠে, ওরা ফৌজে না এসে পার্শী থিয়েটারে গেলে অনেক বেশি রোজগার করতে পারত।

ইতিমধ্যে জীবন তৈরি হয়ে নিয়েছে। অতটুকু ঘরের মধ্যে বন্দুক ও তলোয়ার চলবে না বলে হাতে নিয়েছে পিস্তল আর কোমরে গুঁজেছে নেপালী কুকরি ছোরা।

স্বরূপ বলল, আমরা দু'জন দরজার কাছেই আছি, দরকার হ'লেই ডাক দিয়ো।

তহ্খানার ভিতরে নামবার সিঁড়িতে আগাছা জন্মে গিয়েছে। দু'হাত দিয়ে আগাছা ঠেলে সরিয়ে সন্তর্পণে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে নেমে গেল জীবনলাল। প্রথম কিছুক্ষণ ক্ষীয়মান আলোতে বিলীয়মান তার মূর্তি দেখা গেল, তারপরে একবার মোড় ঘুরতেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

সশস্ত্র স্বরূপ ও গুরবচন সিঁড়ির মুখের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো কান খাড়া ক'রে। কয়েক মিনিট পরেই দ্রুত পদক্ষেপে বের হয়ে এলো জীবন।

কি ব্যাপার ?

বাদুড়ও নয়, সিপাহীও নয়, খুব সম্ভব একটা নেকড়ে।

নেকড়ে! বলো কি, এলো কোথা থেকে? চমকে ওঠে গুরবচন।

স্বরূপ বলে, মেটকাফ সাহেবের বাড়ির প্রকাণ্ড হাতার মধ্যে একটা চিড়িয়াখানা ছিল। সাহেব পালালে সিপাহীরা সেগুলোকে ছেড়ে দেয়। আমার মনে হচ্ছে তারই একটা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

আরগুলো সব গেল কোথায়?

ঠিকানা দিয়ে যায় নি গুরবচন সিং। তাদের খোঁজ না হয় পরে ক'রো, এখন তোমার হাতের বন্দুকটা দাও।

বন্দুকটা এগিয়ে দিতে দিতে গুরবচন শুধোয়, একাই যাবে?

সঙ্গী নেওয়া চলবে না, জায়গা খুব অল্প, হাতে বন্দুক থাকলে আর ভয় কিসের?

আবার সে ভিতরে চলে যায় বন্দুক নিয়ে।

কয়েক মিনিট পরেই বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পায় ওরা, মাটির নিচে বলে সে আওয়াজ যেন ভীমের হুঙ্কারের মতো গম্ভীর। ওরা যখন আশা করছে জীবনের প্রত্যাবর্তন তখন ভিতর থেকে আর একটা আওয়াজ উঠল যার সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন কিছু তারা কখনো শোনে নি। হিংস্র শ্বাপদের ক্রোধের সঙ্গে মানুষের বুকফাটা হাহাকারকে কালবৈশাখীর মেঘের গর্জনের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে একটা অতিকায় সত্তা দেওয়া যায়, তবে তার তুলনা হ'লেও হ'তে পারে। প্রখর দিনের আলোয় একাধিক ও সশস্ত্র দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও তাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এ ওর দিকে চায়। কি করবে, ভিতরে যাবে! তখনি আবার সেই গর্জন। নৈসর্গিক না অতিপ্রাকৃত, ভিতরে যাওয়া উচিত কিনা প্রভৃতি চিন্তায় যখন তারা ন যযৌ ন তস্থৌ, দেখতে পেলো লম্বা লম্বা পা ফেলে একসঙ্গে তিন-চারটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল জীবনলাল। তার কাপড়ে রক্ত, কপালে ঘাম, মুখমণ্ডল অনিশ্চিত আতঙ্কে মসি-ঢালা।

কিসের শব্দ জীবন ভাই?

'জানি না' বলে বসে পড়লো একখানা পাথরের উপরে।

ওরা দেখল বন্দুক নেই তার হাতে। জীবনের মতো দুর্দান্ত সাহসী পুরুষের হাত থেকে বন্দুক খসে পড়ে যে ভয়ে, তা অনৈসর্গিক না হয়ে যায় না!

জানোয়ার না আর কিছু?

উত্তর দিল না জীবন। সাময়িকভাবে তার কথা বলবার শক্তি লোপ পেয়েছে।

অর্থহীন বিভ্রান্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ ঐ অন্ধকার রহস্যময় গুহামুখে।

জীবন ঘরে চলো, একটু বিশ্রাম করবে।

বিশ্রাম! না বিশ্রাম আমার ভাগ্যে নেই। ঐ অদৃশ্য ভীষণকে জয় না করা অবধি বিশ্রামের অধিকার আমার কোথায়?

জীবন ও স্বরূপের মধ্যে যখন কথা চলছিল সেই সময়ে গুরবচন ঘরে গিয়ে এক বোতল Rum নিয়ে এলো। বেশ খানিকটা Rum খেয়ে নিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠল জীবন। তখন ওরা প্রশ্ন শুরু করলো।

কি হয়েছিল বলো তো।

জীবন শুরু করে। তহ্‌খানায় ঢুকে অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত ক'রে নিতে চেষ্টা করছি, এমন সময়ে বাঁ দিকে শুনতে পেলাম নিঃশ্বাসের শব্দ। ততক্ষণে চোখ সতেজ হয়ে উঠেছে, ঠাহর ক'রে দেখে মনে হ'ল কি একটা জানোয়ার গুঁড়ি মেরে বসে আছে। হয়তো বা নেকড়েই হবে। গুলি ছুঁড়লাম।

সে শব্দ আমরা শুনেছি, বলে স্বরূপ।

তখন ভাবলাম কি করি, আর একটা গুলি করবো না টেনে নিয়ে উপরে যাবো, মরেছে বলেই মনে হ'ল। এমন সময়ে ঘরের ওদিকে অন্ধকার কোণ থেকে উঠল গর্জন যার মতো আগে কখনো শুনি নি।

আমরাও শুনেছি সেই শব্দ।

জীবন বলে, প্রথম মুহূর্তে মনে হ'ল আরো একটি নেকড়ে লুকিয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে দেখি অন্ধকারের মধ্যে ঘনতর অন্ধকারের মস্ত একটা পুঁটুলি। তার পরের মুহূর্তেই মনে হ'ল—না এ তো নেকড়ের আওয়াজ নয়, এমন কি কোন পরিচিত জন্তু-জানোয়ারের গর্জনও নয়। এ কি রকম আওয়াজ! এ যেন শব্দের জলস্তম্ভ, কোন্ পাতাল ভেদ ক'রে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে আকাশের দিকে।

থামে জীবন। আবার একটু পরে আরম্ভ করে, তোমাদের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ভয় পেলাম, জীবনে এই প্রথম ভয়। মা আমাকে চিনেছিল। বলতো তোর যে একেবারে ভয়ডর নেই। সত্যি জানতাম না ভয় কাকে বলে। সেদিন যখন কামানের মুখে বেঁধে রেখেছিল তখনো ভয় পাই নি। আজ আমার এই প্রথম ভয়।

গুরবচন বলে, চলো না তিনজনে মিলে ঢুকি, ভূতপ্রেত নিশ্চয়ই নয়।

স্বরূপ বলে, পাহাড়ে জায়গা, নিশ্চয় কোন জানোয়ার হবে। গুলির আওয়াজে, সঙ্গীর মৃত্যুতে ভয় পেয়ে গর্জে উঠেছে। সেই ভালো, চলো তিনজন একসঙ্গে

যাই।

জীবন বলে, না, তা হয় না, আমাকে একলাই যেতে হবে।

কেন বলো তো?

কেন বুঝলে না? ঐ ভীষণ আওয়াজ চ্যালেঞ্জ করেছে আমার পৌরুষকে। প্রথম দফায় ঘটেছে আমার পরাজয়, ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছি। এই তো যথেষ্ট অপমান। এর পরে তোমাদের নিয়ে যদি অগ্রসর হই তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

এই স্বল্পকালের পরিচয়েই ওরা দুজন চিনেছে জীবনকে, জেনেছে যে যাত্রাদলের বীরত্ব করা ওর স্বভাব নয়। তবু এ কথা তো বলতে পারে না, নিশ্চিত বিপদের মুখে এগিয়ে যাও। তাই চুপ ক'রে থাকে। বিপদের মুখে বন্ধুকে এগিয়ে দেওয়ার ভাষা তারা জানে না। হয়তো সে রকম শব্দও নেই মানুষের অভিধানে। হয়তো সস্নেহ করমর্দন বা আলিঙ্গনই তার একমাত্র ভাষণ।

অবশেষে স্বরূপ বলে, যদি যাওয়াই স্থির ক'রে থাকো তবে ভালো দেখে একটা বন্দুক নিয়ে যাও।

না, বন্দুকে কাজ হবে না, অন্ধকারে লক্ষ্য ফসকে যাবে। তার চেয়ে একখানা তলোয়ারে অনেক বেশি কাজ হবে।

গুরুবচন কোন কথা না বলে নিজের নূতন তলোয়ারখানা এনে তার হাতে দিল। বিপদের মুখে এগিয়ে দেওয়ার শ্রেষ্ঠ সম্ভাষণ উপযুক্ত অস্ত্র।

জীবন উঠে দাঁড়ালো।

ওরা বলল, তুমি বাইরে না আসা অবধি আমরা এখানেই থাকবো। আর তেমন যদি প্রয়োজন বোঝো ডেকো।

সেই অন্ধকার গুহামুখের দিকে তাকিয়ে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে জীবন বললো, ঘণ্টাখানেক পরেও যদি বাইরে না আসি তবে তোমরা লোকজন নিয়ে গিয়ে আমার মৃতদেহ বাইরে নিয়ে এসো। তারপরে ওদের সঙ্গে নিবিড় করমর্দন ক'রে খোলা তলোয়ার হাতে অটল পদক্ষেপে তলিয়ে গেলো অন্ধকারের মধ্যে।

॥ ১১ ॥

ক্যালিবান (২)

তহ্‌খানায় প্রবেশ ক'রে সেই অন্ধকার কোণটির দিকে তাকালো জীবন, যেখান থেকে উঠেছিল ঐ উৎকট আওয়াজ।

কেউ নেই বলেই মনে হচ্ছে। সেবারে অন্ধকারকে যেমন একটু ঘনতর মনে হয়েছিল, এবারে আর তেমন তো মনে হচ্ছে না। আর একটা কোণের দিকে তাকায়। ঘরটা বেশ প্রশস্ত, সে কোণটা আরও দূরে। সেখানেও কিছু চোখে পড়ে না। তবু কেমন যেন তার মনে হয় ঘরটা শূন্য নয়, তাকে ছাড়া আরও কোন একটা সজীব সত্তার উপস্থিতিকে যেন সে অনুভব করতে পারে। কার যেন নিঃশ্বাস, কার যেন বুকের স্পন্দন, কার যেন চোখের দৃষ্টি মনের ইচ্ছা দিয়ে ঘরের অনেকটা যেন পূর্ণ। কিন্তু চোখে তো কিছু পড়ে না। অথচ সেই আওয়াজ, সেই ঘনতর অন্ধকারের বোধ—এ তো মিথ্যা নয়।

হঠাৎ কানে আসে নিঃশ্বাসের শব্দ। বেশ স্পষ্ট। না ভুল হ'তেই পারে না। নিয়মিত ছন্দোযুক্ত স্পন্দন। নিঃশ্বাসজীবী প্রাণীর ঐ তাল সুপরিজ্ঞাত। চোখ দিয়ে আগাগোড়া ঘরটা জরিপ করতে করতে বাধা পায় সেই জায়গায়, যেখানে পড়ে ছিল মৃত জানোয়ারটার দেহ। জীবনের মনে হয় সেখানকার অন্ধকারটা যেন আগের চেয়ে স্ফীততর, আবার নিশ্বাসটাও আসছে সেখান থেকেই। জানোয়ারটা বেঁচে উঠল নাকি, না আদৌ মরে নি? না, তা হ'তেই পারে না; না মরলে আর্তনাদে বুঝতে পারা যেতো। তবে স্ফীততর মনে হচ্ছে কেন? মৃতদেহের কাছে আর একটা জানোয়ার এসে দাঁড়িয়েছে নাকি? এত নিঃশব্দে যে টের পায় নি। ঐ জানোয়ারটাও কি টের পায় নি জীবনের অস্তিত্ব! এই রকম নানা চিন্তার স্রোত দ্রুত ছায়া সঞ্চার ক'রে যেতে লাগলো তার মনের মধ্যে। আবার কি গুলি করবে? না, তার আগে বন্দুকের কুঁদো মেঝেতে ঠুকে দেখা যাক।

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

নাঃ, কোন সাড়া নেই।

আবার সে ঠুকলো, ঠক্ ঠক ঠক্।

এবারে উঠলো আবার সেই পূর্বশ্রুত উৎকট আওয়াজ। জীবনের মনে হ'ল আগের বারের মতো তেমন যেন ভীষণ নয়, তবু বেশ ভয়াবহ। এখনি আক্রান্ত হবে আশঙ্কা ক'রে বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু কেউ এসে পড়লো না তার গায়ের উপর। তার বদলে উঠল আবার সেই করুণে ভৈরবে মিশ্রিত আওয়াজ। তার বিশ্বাস হ'ল আওয়াজ যারই হোক তা অতিপ্রাকৃত কিছু নয়, তারই মতো রক্তমাংসের জীবের। রক্তমাংসের জীব যখন তখন বন্দুক তলোয়ারের ক্ষমতার মধ্যে। নিজেকে বেশ স্বাভাবিক বোধ করল জীবন।

এ কোন্ জাতের জানোয়ার, আওয়াজ করে অথচ আক্রমণ করে না। ঐ মৃত পশুটার বাচ্চা নয় তো! না, এখন আর গুলী চালাবে না, তার আগে একবার আলো জ্বেলে দেখে নেওয়া আবশ্যক।

তিন লাফে সে বাইরে এসে উৎকণ্ঠিত বন্ধুদের কাছে পৌঁছল—মশাল, মশাল, শিগ্‌গির একটা মশাল জ্বেলে হাতে দাও।

কি দেখলে ?

কি মুশকিল, দেখলে আর মশাল চাইব কেন ? শিগ্‌গির দাও।

গুরবচন জ্বলন্ত মশাল এনে দিলো জীবনের হাতে। যেমন তিন লাফে বাইরে এসেছিল তেমনি তিন লাফে সে ভিতরে গিয়ে পৌঁছল। ঘনতর রহস্য-ভারে পীড়িত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো স্বরূপরাম ও গুরবচন সিং।

এবার মশালের আলোতে গুহার সব অন্ধকার দূর হ'ল, তবু সব রহস্য দূর হ'ল না। সে দেখতে পেলো, হাঁ, যা মনে করেছিল তাই, একটা নেকড়ে ম'রে পড়ে আছে, অন্ধকারেও গুলি ব্যর্থ হয় নি, একটা গুলীতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার গায়ের উপরে পড়ে ওটা কি! আর একটা নেকড়ে নাকি ? ওটা মরেছে বলে তো মনে হয় না, নড়ছে যে। এমন সময়ে জীবনের পায়ের শব্দ ও আলোর আভা পেয়ে সেই জানোয়ারটা মুখ তুলে চাইলো তার দিকে। কী মুখ! ভয়ে কেঁপে উঠে দশ পা পিছিয়ে যায় জীবন! এ কি মুখ! কার মুখ! সে ভাবে, এ তো নেকড়ে নয়, অথচ নেকড়ে ছাড়া আর কী বলা যায়। সে আরও খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়, মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকে জীবটার মুখের দিকে, তার মনের মধ্যে একসঙ্গে বিস্ময় জুগুপ্সা ভয় মোচড় দিয়ে ওঠে। সে দেখে আর ভাবে, এ কি বনের জন্তু, না বনমানুষ। মুখখানা গোলপানা, যেন মানুষের একমেটে খসড়া, কপালের একটু অংশ আর নাক ও চোখ বাদে সমস্ত ঘন লোমে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে যখন হাঁ করছে দেখা যাচ্ছে সুঁচলো তীক্ষ্ন দাঁতের সার। জানোয়ার ছাড়া আর কি হবে! অথচ জীবটা যখন তাকায় তার দিকে, তখন চোখের চাহনিতে এমন একটা কিছু প্রকাশ পায়, যা জন্তু-জানোয়ারে সম্ভব নয়। মনুষ্য-সুলভ চৈতন্যের অতি ক্ষুদ্র একটি কণিকা অমেয় করুণাতে সিক্ত হয়ে মাঝে মাঝে চকচক ক'রে ওঠে তার দুই চোখে! জীবটা মৃত নেকড়ের বুকের উপরে দুই থাবা রেখে, থাবা ছাড়া আর কি, দেখা যাচ্ছে তীক্ষ্ন নখ, ও দুটো পা ছাড়া আর কি, পেশল মাংস ঘন লোমে আচ্ছন্ন, একদৃষ্টে চেয়ে থাকে আলোর দিকে, জীবনের দিকে।

একটু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে জীবন ভাবে এখন কি কর্তব্য, উপরে গিয়ে

ওদের ডেকে নিয়ে আসবে, তারপরে সবাই মিলে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে ওটাকে বাইরে। এ ছাড়া আর করবার আছেই বা কী। গুলী ক'রে মারবার কথা ভাবাই যায় না। ওর চোখে যে মানুষের চাহনি। পশু যদি মানুষের মতো তাকাতে পারতো তবে পশু হত্যা করতো কোন্ পাষণ্ড! কিন্তু মানুষ কি মানুষ মারে না! মারে বৈকি। তখন মানুষ যে তাকায় পশুর চাহনি নিয়ে।

জীবন ভাবে, আচ্ছা দেখাই যাক না একবার বন্দুকটা তুলে কি করে ও। বন্দুক তুলতেই জীবটা প্রাণপণ আঁকড়ে ধরে মৃতদেহ। জীবন বোঝে ওর ধারণা হয়েছে একবার যখন নেকড়েটা মারা হয়েছে তখন আবার তাকেই মারা হবে, তাকে ছাড়া আর কাউকে যে মারা যেতে পারে ভাবতে পারে না ঐ অদ্ভুত জীবটি। তখন জীবন আর এক রকমের পরীক্ষা করে। পায়ের কাছে পড়ে ছিল একটা কামানের গোলা, পা দিয়ে সেটাকে ঠেলে দেয় ওদের দিকে, গমগম প্রতিধ্বনি তুলে গড়িয়ে যায় গোলাটা। গড়ন্ত গোলার চেহারায় ও শব্দে আর একটা আক্রমণ ভেবে দুইসারি বড় বড় তীক্ষ্ণ দাঁত, ঘন লাল ও কর্কশ জিহ্বা প্রকট ক'রে বিকট খ্যাঁক খ্যাঁক রবে ডেকে ওঠে ওটা। এ তো মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত রব নয়। কিন্তু তখনি জীবনের দৃষ্টি পড়ে ওর চোখের দিকে। ঐ তো জলজ্বল করছে মনুষ্যজাতির সেই আদিম চাহনি—আজকার মানুষ যা বিস্মৃত। জীবন ভাবে মানুষে পশুতে মিলিয়ে সৃষ্টিকর্তার এ কি অনাসৃষ্টি ব্যাপার। জীবন দেখে যে মশালটা নিবতে শুরু করেছে, সম্পূর্ণ নেববার আগে যা হয় কিছু করা আবশ্যক, কেননা ঐ অদ্ভুতের সঙ্গে আর এক মুহূর্তও সে থাকতে পারবে না অন্ধকারে। তখন সে বাঁ হাতে মশালটা ধরে এগিয়ে গিয়ে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মৃত নেকড়েটাকে মারে এক ঠেলা। অমনি এক কাণ্ড ঘটে। দাঁত মুখ খিচিয়ে বিকট রব তুলে চার হাতপায়ে তেড়ে আসে জীবটা। ভয়ে কৌতূহলে জুগুপ্সায় মশাল ফেলে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বাইরে ছোটে জীবন, পায়ের শব্দে বোঝে জীবটা আসছে তাকে তাড়া করে।

জীবনকে দেখে সবাই এগিয়ে যায় (ততক্ষণে স্বরূপ ও গুরবচন সিং ছাড়াও অন্য লোক জুটে গিয়েছে), শুধোয়, কি হ'ল ?

জীবন উত্তর দেওয়ার আগেই ওরা হাতেনাতে উত্তর পায়, আরে বাপ রে, এ দুটো আবার কি ?

জীবন পিছন ফিরে দেখে, তাই তো—দুটো! দ্বিতীয়টা আবার এলো কোথা থেকে? ক্ষুদেটা এ দুটোর মধ্যেই মিশে ছিল—তাই এতক্ষণ চোখে পড়ে নি, বুঝতে পারে জীবন। জীব দুটোর, বিশেষ বড়টার হিংস্র আক্রমণে ও আওয়াজে তার বলিষ্ঠ চেহারায় সবাই ভয়ে পিছিয়ে যায়—দর্শকদের বৃত্ত ক্রমেই বৃহত্তর হ'তে

থাকে। কেউ বলে গিধ্‌খড়, কেউ বলে শের, কেউ বলে বনমানুষ। যে-যাই নামকরণ করুক—সবাই অবাক হয়ে যায়, পশুর মতো চার পায়ে চলে, দেহ আগাগোড়া ঘন লোমে আচ্ছন্ন, পশুর মতো দাঁত নখ, খর-শান জিহ্বা, তবু ঠিক পশু নয়, কোথায় যেন একটা ক্ষীণ রক্তের সূত্রে যোগ আছে মানুষের সঙ্গে। তবু ভালো ক'রে বুঝতে পারে না ও দুটো কি? মানুষ যা অতীতে ছিল, না যা ভবিষ্যতে হবে!

কোলাহল শুনে কর্নেল ব্রিজম্যান আসে, কি হয়েছে?

কর্নেলকে দেখে সবাই জায়গা ছেড়ে দেয়, জীব দুটোকে একনজরে দেখেই ব্রিজম্যান বলে ওঠে, Wolfboy! কি আশ্চর্য, একেবারে দু'দুটো!

তারপর জীবননের দিকে তাকিয়ে বলে, এ এক বিরল জীব। একবার পুনার কাছে এক পাহাড়ে ধরেছিলাম একটা। অল্পদিন পরেই মরে গেল। মানুষের ঘরে এরা টেঁকে না। যাই হোক, শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো। কিন্তু খুব সাবধান, ওরা যেমন হিংস্র তেমনি ধূর্ত। মানুষের বুদ্ধি পশুর হিংস্রতা দুই পেয়েছে ওরা। খুব সতর্ক হয়ে ওদের handle করবে।

শিকলে বাঁধা পড়ে অদ্ভুত জীব দুটো।

॥ ১২ ॥

"যুদ্ধকে সুখকর করতে গেলেই পরাজয়ের পথ প্রশস্ত হয়"

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত বর্ষা দেখা দিল, বর্ষণ শুরু হ'ল পাহাড়ে প্রান্তরে যমুনার চরে, শাহ্‌জাহানাবাদের প্রাকার প্রাসাদ সৌধ মিনার গম্বুজের শিরে শিরে, পরিত্যক্ত সপ্তদিল্লির শুষ্ক নির্জনতার উপরে। আর সে কি বৃষ্টি! আকাশের ছাদ যেন চৌচির ফেটে গিয়ে মুষলধারে জল পড়ছে। বৃষ্টির ঘন চাদর এমন হয়ে ঝুলে পড়েছে যে, পাহাড় থেকে শাহ্‌জাহানাবাদ অদৃশ্যপ্রায়, কখনো কখনো একটা ঝাপসা খসড়া মাত্র চোখে পড়ে। এতদিনের দারুণ শুষ্ক তাপ একদিনে অন্তর্হিত হ'ল। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা দিল নূতন সমস্যা। তখন আবার মনে হ'তে লাগলো গ্রীষ্মই বোধ করি ভালো ছিল, এত সমস্যা ছিল না। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল হাজার হাজার ছোট-বড় নানা আকারের ব্যাঙ আর তাদের খাদক শত শত সাপ। মানুষের চোখে সব সাপই বিষধর। পশুর মৃতদেহগুলো শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে

গিয়েছিল, এবারে ফুলে ঢোল হয়ে উঠল, জলের স্রোতে তার ক্লেদ আর দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। মশামাছি তো কমলোই না, বরঞ্চ তাদের সংখ্যা স্ফীত ক'রে তুলল হাজার হাজার জ্ঞাত অজ্ঞাত কীট-পতঙ্গ। অবস্থা শেষে এমন হ'ল যে, খানার টেবিলের উপরে মশারি খাটিয়ে খেতে বসতে হ'ত, তাতেও রক্ষা নেই—ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে মাছি, এক হাতে মাছি তাড়াতে তাড়াতে মুখে তুলতে হয় খাদ্যের গ্রাস। তৎসত্বেও কখনো কখনো মুখের মধ্যে চলে যায় মাছি, তখন দৌড়ে বাইরে গিয়ে বমি ক'রে ফেলতে হয়। যারা ঘরে আশ্রয় পেয়েছিল আর যারা তাঁবুর আশ্রয়ে ছিল তাদের অবস্থা প্রায় সমান, ফাটা ছাদ আর ছেঁড়া তাঁবু রুখতে পারে না জলের তোড়। রাত কেটে যায় চারপাই এদিকে ওদিকে টানাটানি ক'রে। ফৌজী লোকের কবিত্বের চোখ থাকলে দেখতে পেতো যে, বর্ষার প্রভাবে কিছু সৌন্দর্যও দেখা দিয়েছে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শ্যামল তৃণাঙ্কুর মাথা তুলল, বাবলা বনের কাঁটা ঢেকে গেল সবুজ পাতায়—সমস্ত পাহাড়টার উপরে রাতারাতি কোমল সবুজের প্রলেপ টানা হয়ে গেল। কিন্তু এত সৌন্দর্য দেখবার, এত কবিত্ব করবার সময় তাদের ছিল না—অবিশ্রান্ত বর্ষণের মতোই অবিশ্রান্ত সিপাহীদের আক্রমণ। দিনে রাতে অষ্টপ্রহর যখন তখন বিনা নোটিশে বিউগ্‌ল্‌ বেজে উঠছে, ঘোড়সওয়ার ছুটছে তড়বড়, কামান ডাকছে কড়কড়, বন্দুকের মুখ উগরে দিচ্ছে রাতের বেলায় আগুনের পিচকারি, দিনের বেলায় ধোঁয়ার ফোয়ারা, যত্রতত্র এসে পড়ছে কামানের গোলা, থেকে থেকে ঘোড়ার হ্রেষা দ্রুত তরঙ্গে ছুটে যায় শব্দের বিদ্যুতের মতো। কখনো খানার টেবিল থেকে ছুটতে হয়, কখনো বা কষ্টার্জিত নিদ্রার সুখশয্যা থেকে। খানার টেবিলে বাঁ পাশে রাখতে হয় ভরা বন্দুক, রাতের বেলায় চারপাইয়ের ডান পাশে রাখতে হয় খোলা তলোয়ার। কী জীবন! যুদ্ধ সুখের নয়। যুদ্ধকে সুখকর করতে গেলেই পরাজয়ের পথ প্রশস্ত হয়।

যুদ্ধ এখন প্রাত্যহিক হয়ে উঠলেও দুটি দিন বিশেষ গুরুতর হয়ে উঠেছিল। ২৩শে জুন পলাশী যুদ্ধের শতবর্ষ পূর্ণ হ'ল। কিছুদিন আগে থেকে মুখে মুখে রটে গিয়েছিল যে, ঐদিন খতম হবে কোম্পানীর রাজত্ব। জ্যোতিষীরাও নক্ষত্রের হালচাল দেখে কথাটা সমর্থন করলো। বাদশা ফৌজকে পেট ভরে মিঠাই খাইয়ে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নক্ষত্রের মন্তব্যের চেয়ে প্রবল হ'ল এনফিল্ড বন্দুক আর ফৌজী শৃঙ্খলা। আবার বকর-ইদের দিনেও প্রবল আক্রমণ চালালো সিপাহী পক্ষ। তারা সবজিমণ্ডি পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিল আর একটু হ'লেই কোম্পানীর ফৌজের পিছনে গিয়ে পড়তো—

তাহ'লেই সংকট দেখা দিত। কিন্তু রীডের ঘোড়সওয়ার ও জোন্সের গোলন্দাজ সঙ্কট উদ্ধার ক'রে দিলো। তারপর কিছুদিন উভয় পক্ষের শিবিরেই অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থা।

কিন্তু মৃত্যুর তো একটা মাত্র দ্বার, নয় হাজার তার দরজা। সিংহদ্বার বন্ধ করলে খিড়কি দিয়ে ঢোকে, খিড়কি বন্ধ করলে ঢোকে জানলা ঘুলঘুলি দিয়ে। কোম্পানী শিবিরের হাসপাতাল সর্বদা পূর্ণ, সর্দিগর্মির রুগী কমতেই কলেরার রুগী বাড়লো, সেই সঙ্গে বাড়ে আহত ও নিহতপ্রায়ের সংখ্যা। ৫ই জুন কলেরায় প্রাণত্যাগ করলো কমাণ্ডার-ইন-চীফ স্যার হেনরি বার্নার্ড। এবার কমাণ্ডার-ইন চীফ হ'ল মেজর জেনারেল রীড (পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তি নয়)। লোকটা একে বৃদ্ধ তায় রুগ্ন, দিন বারো নামে মাত্র কাজ চালিয়ে সিক্ লিভ্ নিয়ে চলে গেল পাহাড়ে। এবারে কমাণ্ডার-ইন্-চীফ ব্রিগেডিয়ার আর্চডেল উইলসন। মীরাটের বিদ্রোহ দমনে তৎপরতা দেখাতে না পারলেও দিল্লি আসবার পথে হিন্দন নদীর যুদ্ধে সিপাহী ফৌজকে পরাজিত ক'রে কিছু মর্যাদা লাভ করেছিল কোম্পানীর ফৌজের চোখে। ওদিকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে ব্রিগেডিয়ার নেভিল চেম্বারলেন। পাঞ্জাব থেকে জন নিকলসন না এসে পৌঁছা অবধি সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সের এই যুবক সৈনিকটিই ছিল কোম্পানী ফৌজের প্রাণ। এ হেন অবস্থায় জীবনলালের রেসালার উপরেভার পড়লো কোম্পানী শিবিরের আগাগোড়া পাহারা দেওয়ার।

স্বরূপরামের হাতে কাজ না থাকলে তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে জীবন আর গুরবচন। এ অঞ্চল স্বরূপের নখদর্পণ। ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন ক'রে জেনে নেয় প্রত্যেকটি কুঠি আর ইমারতের ইতিহাস, জেনে নেয় পাহাড়টার ভূগোল।

স্বরূপ বলে, ভালো ভাবে ঠাহর ক'রে ছাখো, পাহাড় একটা নয় দুটো, মাঝখানে অনেকখানি ছেদ আছে বলে দক্ষিণ দিকেরটা সব সময়ে চোখে পড়ে না। এই ফাঁকটার মধ্যেই পাহাড়পুর, তেলিওয়ারা, কিষেণগঞ্জ, ঐ পশ্চিমে সবজিমণ্ডি আর একটু পশ্চিমে রোশেনারা বাগ। আর এবারে ছাখো সবজিমণ্ডি থেকে আরম্ভ হয়ে দ্বিতীয় পাহাড়টা একটু পুবে হেলে বরাবর চলে গিয়েছে মাইল তিনেক দূরে যমুনা নদী পর্যন্ত।

ওরা মন দিয়ে শোনে, কখনো বা চোখে দুরবীন লাগিয়ে স্বরূপের বর্ণনার আর বাস্তবে মিলিয়ে নেয়। জীবনলাল শুধোয়, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু দিল্লির এই সমতল মাঠের মধ্যে ডাঙায় তোলা তিমি মাছের মতো পাহাড় দুটো নিতান্ত খাপছাড়া নয় কি?

স্বরূপ বলে, খাপছাড়া মনে হ'লেও আসলে খাপছাড়া নয়—এ ছুটো হচ্ছে আরাবল্লী পর্বতের প্রসারিত বাহুর শেষ ছুটো আঙুল।

গুরবচন বলে ওঠে, তাজ্জব কি বাৎ! কোথায় আরাবল্লী পর্বত আর কোথায় দিল্লি।

জীবন শুধোয়, তুমি এত কথা জানালে কি ক'রে?

তোমাদের তো গল্পে গল্পে বলেছি দিল্লি কলেজের ছাত্র আমি, জিওগ্রাফি পড়তে হ'ত। প্রোফেসার লেমিংটন জিওগ্রাফি পড়াতেন, তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলাম আমি। ছুটি পেলেই ঘোড়ায় চড়ে দিল্লির চারদিক দেখবার জন্যে বের হতেন, সঙ্গে নিতেন আমাকে। তোমাদের যা বলছি তাঁর কাছে শেখা।

জীবন বলে, হঠাৎ হাসলে কেন?

স্বরূপ বলে, একটা কথা মনে পড়লো বলে। প্রোফেসার লেমিংটনের ভূগোল বর্ণনা মেনে নিতাম, তিনিও মেনে নিতেন পাহাড়ের উপরকার কুঠিগুলো সম্বন্ধে আমার বর্ণনা। কিন্তু একটা বিষয়ে দুজনে কখনো আর মিল হ'ল না।

কি বলো তো?

হিন্দুরাও কুঠীর দক্ষিণে ঐ যে পাথরের স্তম্ভটা দেখছ, ওটাকে তিনি বলতেন প্রাচীনকালের কোন রাজার বিজয়কীর্তি।

তাছাড়া আর কি হবে?

স্বরূপ বলে, ভীমের গদা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভ করবার পরে ভীমসেন গদাটা এখানে পুঁতে রেখেছেন, তারই কতকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। এ কথা এদিকের সবাই জানে।

তারপর একটু থেমে বলে, লেমিংটন কিছুতেই মানবেন না। শুধু গদাটাকে নয় স্বয়ং ভীমসেনকে অবধি তিনি উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। বলেন, ওসব পৌরাণিক কাহিনী কাল্পনিক।

স্বরূপ শুরু করে, চেয়ে দেখো পাহাড়টার শিরদাঁড়ার উপর দিয়ে সোজা দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গিয়েছে অনেকগুলো ইমারত কুঠি মসজিদ। সব দক্ষিণে ভীমের গদা, তারপরে হিন্দুরাও কুঠি, তারপরে পাশাপাশি পীরগায়েব মসজিদ আর অবজারভেটারি। এবারে প্রায় মাইলখানেক ফাঁকা, তারপরেই ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার। ব্যাস, তারপরে পাহাড়ের উপর দিয়ে যমুনা পর্যন্ত চলে যাও আর কিছু নেই। তবে ঐ ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে যমুনার দিকে তাকালে, আধমাইলটাক দূরে দেখতে পাবে দিল্লীর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট মেটকাফ সাহেবের কুঠি।

এইভাবে কথা বলতে বলতে যখন তারা অবজারভেটারি ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছে এমন সময় সবজিমণ্ডির দিকে বিউগল বেজে ওঠে। সিপাহী আক্রমণ করেছে। আক্রমণের সঙ্কেত বাজলে যে যেখানে থাকুক সকলকেই সাহায্যে যেতে হবে। ছুটলো ওরা তিনজন ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে।

আবার পরদিন রোঁদে বেরিয়ে প্রশ্নোত্তর চলে তিনজনের মধ্যে।

পাহাড় আর শহর মুখোমুখি, মাঝখানে অনেটা ফাঁকা জায়গা, দক্ষিণ দিকে দুয়ের মধ্যে আধ মাইলের ব্যবধান, উত্তর দিকে ব্যবধান তুলনায় অনেক বেশী। কাশ্মীর দরবাজার কাছে Ludlow Castle আর কুদশিয়াবাগ চোখে পড়বার মতো। এ দুটো ছেড়ে দিলে পাহাড় ও শহরের মাঝখানে যে সব ছোটখাটো অফিস বাড়ি আর পুরানো কবর দরগা প্রভৃতি আছে সকলেরই এখন পরিত্যক্ত অবস্থা। সামরিক পরিভাষায় গিরি-পুরীর মধ্যবর্তী এই বেওয়ারিশ জমিটা নো-ম্যান্‌স্‌ল্যাণ্ড। শহর শাহ্‌জাহানাবাদের যমুনার ধার থেকে কাশ্মীর দরবাজা হয়ে শাহ্‌বুরুজতক আবার শাহ্‌-বুরুজ থেকে কাবুল দরবাজা হয়ে লাহোর দরবাজাতক—এই দুটো অংশই পাহাড় আর বৃটিশ শিবিরের মুখোমুখি। ৮ই জুন থেকে এ পর্যন্ত উভয় পক্ষে যত সংঘর্ষ হয়েছে সমস্তই এই জায়গাটার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোম্পানী পক্ষের এত সৈন্য নেই যে ঘুরে গিয়ে শহরের পিছনে আক্রমণ করে, আর সিপাহী পক্ষের এমন রণ-শৃঙ্খলা নেই যে পাহাড়ের পশ্চিমে গিয়ে পিছন থেকে আক্রমণ করে বৃটিশ শিবির। তবে দুই পক্ষেই নিত্য নূতন সৈন্য-সমাগম হচ্ছে—দুই পক্ষই নিশ্বাস রোধ ক'রে চরম পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছে।

এক-একদিন ভোরবেলা বৃটিশ ফৌজ চমকে জেগে উঠে শোনে ব্যাগপাইপে বাজছে অতি প্রসিদ্ধ 'cheer boys, cheer'—সুর। ঐ আসছে আমাদের ফৌজ। কিন্তু তখনি ভুল ভেঙে যায়, ফৌজ আসছে, সেই সুপরিজ্ঞাত গানের সুরও বাজছে তবে তারা সিপাহী ফৌজ, তাদের লক্ষ্য লালকেল্লা। ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার থেকে ওরা দুরবীন লাগিয়ে ওরা দেখতে পায় যমুনার উপরে নৌসেতু দিয়ে সারিবদ্ধভাবে অসংখ্য সৈন্য পার হচ্ছে, পদাতিক, ঘোড়সওয়ার, গোলন্দাজ, তাদের হাতে কোম্পানীর অস্ত্র, গায়ে কোম্পানীর ইউনিফর্ম, ব্যাগপাইপে কোম্পানীর শেখানো গানের সুর 'cheer boys, cheer', আর মুখে তুমুল গর্জন 'বাদশাহ জিন্দাবাদ', 'কোম্পানী মুর্দাবাদ'। মনে মনে সবাই হতাশ হয়ে পড়ে, মুখে প্রকাশ করে না। ওরা নিয়মিত খবর পায়, শাহ্‌জাহানাবাদে আছে রজব আলী—ওদের গুপ্তচর, সে খবর পাঠিয়ে দেয় বৃটিশ ছাউনিতে। জলন্ধর, নসিরাবাদ, নিমচ, কোটা, গোয়ালিয়র, ঝাঁসি, রোহিলাখণ্ড থেকে নূতন নূতন রেজিমেণ্টের

আগমন-বার্তা পৌঁছয় কোম্পানীর গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা কর্নেল হডসনের কাছে। তবে কেবলই যে সিপাহী পক্ষের ফৌজ আসে এমন নয়। কখনো কখনো পাঞ্জাব থেকে গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড দিয়ে কোম্পানীর ফৌজ আসে—মুলতান থেকে, পেশোয়ার থেকে, কাশ্মীর থেকে, দূর থেকে শোনা যায় ব্যাগ পাইপের সুর 'cheer boys, cheer'। তখন পাহাড়ের উপর থেকে খালি চোখে ওরা দেখতে পায় শাহ্‌জাহানাবাদের প্রাচীরের উপরে কাতারে কাতারে সিপাহী পশ্চিমদিকে তাকিয়ে ফৌজের সংখ্যা অনুমান করতে চেষ্টা করছে। তবে দুই ফৌজের আগমনের প্রভেদ বিস্তর। সিপাহী ফৌজ আসে বন্যার তোড়ে, কোম্পানীর ফৌজ আসে ঝিরঝিরে স্রোতে। তবে মন্দর ভালো এই যে, এই ক্ষীণ স্রোতটিকে বন্ধ করতে পারে নি সিপাহী পক্ষ, অবশ্য কোম্পানী পক্ষও পারে নি যমুনার সেতু দখল করতে। বার দুই চেষ্টা হয়েছে আগুনের ভেলা ভাসিয়ে দিয়ে সেতুটাকে পুড়িয়ে দেওয়ার, কিন্তু স্রোতের খেয়ালে ভেলা সেতু পর্যন্ত পৌঁছয় নি, আগেই চড়ায় আটকে গিয়েছে। জীবনলাল ব্রিজম্যানের মুখে অনেকদিন শুনেছে সিপাহী পক্ষ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দখল করতে পারলে পাঞ্জাবে যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে কোম্পানী-ফৌজকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। আরও শুনেছে, সিপাহী পক্ষে সত্যিকার জেনারেল কেউ থাকলে এই পাহাড়টাকে অরক্ষিত রাখতো না। পাহাড়টা না পেলে এত কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বৃটিশ ফৌজ কি এখানে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে পারতো! ব্রিজম্যান বলেছিল,' যেদিন পাহাড়টা অধিকার করলাম সেই-দিনই বুঝলাম আজ হোক বা দু' দিন পরে হোক দিল্লি অধিকার করতে সক্ষম হবোই। ব্রিজম্যান বলেছিল, যতদিন না কানপুর এলাহাবাদ কলকাতা থেকে আরও ফৌজ এসে পৌঁছয় এই পাহাড় আঁকড়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর আমাদের গত্যন্তর নেই।

মেজর জোন্‌স্ ও মেজর রীডকে ব্রিজম্যান বলেছিল যে, শীঘ্রই কানপুর থেকে জেনারেল হুইলার, লখ্‌নৌ থেকে জেনারেল হেনরি লরেন্স আর কলকাতা থেকে এলাহাবাদ কানপুর হয়ে জেনারেল হ্যাভলক ও জেনারেল নীল এসে পৌঁছবে।

জোন্‌স্ আর রীড সাগ্রহে শুধোয়, কতদিন লাগবে?

ব্রিজম্যান বলে, কম্যাণ্ডার-ইন চীফের ধারণা খুব বেশি দেরি হয় তো দিন দশেক।

রীড বলে, কিন্তু পুবদিক থেকে কোন খবরই আসছে না, এটা শুভলক্ষণ নয়।

ব্রিজম্যান বলে, cheero man! No news is good news.

সত্য সত্যই দিন দশেক পরে পুবদিক থেকে খবর আসে ফকিরবেশী গুপ্তচরের

হাতে। লোকটা একটুকরো ভাঁজকরা ময়লা কাগজ দেয় জেনারেল উইলসনের হাতে। ফরাসী ভাষায় লিখিত সংবাদ। চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় উইলসন, তারপর ADC-কে হুকুম করে এখনি বৃটিশ পতাকা অর্ধনমিত করো।

সহসা অর্ধনমিত পতাকা দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয় কোম্পানী ফৌজ। মেজর কর্নেল, বিগেডিয়ার সবাই দ্রুত পদক্ষেপে যায় জেনারেল শিবিরের দিকে, কি হ'ল?

ওদিকে দিল্লি-প্রাকারে শত শত দর্শকের কণ্ঠে ওঠে জয়োল্লাস—কোম্পানী-রাজ মুরদাবাদ, বাদশাহ জিন্দাবাদ।

কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে জীবন, গুরবচন সিং আর স্বরূপরাম দেখতে পায় যে, ব্রিজম্যান, রীড, জোন্‌স্, এডওয়ার্ডস্, নরম্যান, ড্যালি, সিডনি, কটন, হুডসন্ প্রভৃতি দশ-বারোজন জঙ্গী সাহেব সমবেত হয়েছে। নেভিল চেম্বারলেন গুরুতর আহত অবস্থাতেও এসেছে। এঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে আছে এলেক্স টেলর আর বেয়ার্ড স্মিথ আর আছে ফৌজের পাদ্রী মীক সাহেব। সকলকে সমবেত দেখে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে জেনারেল আরম্ভ করলো, বন্ধুগণ, নিদারুণতম সংবাদ বহন ক'রে দূত এসেছে। সে খবর এমনই নিদারুণ যে, অনাবশ্যক ভূমিকা ক'রে তার গুরুত্ব লাঘব করবো না। তাছাড়া ছোট এক টুকরো কাগজে যে সংক্ষিপ্ততম বাক্য ক'টি এসেছে তাতে ভূমিকার স্থান নেই। এত ক্ষুদ্র পত্র এত বড় দুঃসংবাদ বোধ করি আর কখনো বহন ক'রে আনে নি।

মুহূর্তকালের জন্য থামলো উইলসন, আত্মসংবরণ ক'রে নিল, তারপর আবার আরম্ভ করলো, পত্রলেখক মেজর হুবার্ট আমার পূর্বপরিচিত ব্যক্তি, জেনারেল নীলের ফৌজের অন্তর্গত। হুবার্ট লিখছে—লখনৌ-এ বিদ্রোহ হয়েছে, শ্বেতাঙ্গ নরনারী ও কিছু সিপাহী আশ্রয় নিয়েছে রেসিডেন্সিতে, তারা এখন অবরুদ্ধ। কিছুদিন আগে গোলার আঘাতে নিহত হয়েছে স্যার হেনরি লরেন্স। কানপুরের সংবাদ আরো শোচনীয়। জেনারেল হুইলার কিছুদিন যুদ্ধ চালায় নানা সাহেবের ফৌজের সঙ্গে। তারপর নানার ছলনায় যুদ্ধবিরতি ঘটিয়ে জলপথে যাত্রার সময়ে সকলে নিহত হয়। শ্বেতাঙ্গ রমণী ও শিশুদের একটি ঘরে আবদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল। জেনারেল নীলের ফৌজ কাছে এসে পড়ছে জানতে পেরে তাদের সকলকে হত্যা করা হয়েছে। জেনারেল হ্যাভেলক ও জেনারেল উট্রামের সৈন্যবাহিনী দু'এক দিনের মধ্যেই এসে পড়বে। তখন আমাদের সকলকে মিলে লখনৌ গিয়ে অবরুদ্ধ শ্বেতাঙ্গ নরনারীদের উদ্ধার করতে হবে, যাতে কানপুরের শোচনীয় ঘটনার আবার না পুনরাবৃত্তি ঘটে। দিল্লি যাওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হ'ল। এদিক থেকে ফৌজ পাঠাবার আর উপায় নেই দিল্লির দিকে। ভগবান

তোমাদের সহায় হোন। হবার্ট।

এতক্ষণ বিরাট তাঁবু নিঃশব্দ ছিল, এতগুলি লোকের নিঃশ্বাসে যেটুকু শব্দ হওয়া আবশ্যক, তাও হচ্ছিল না। পত্রখানা পড়া শেষ হ'লেও ভঙ্গ হ'ল না গৃহের নিস্তব্ধতা।

তখন আবার উইলসন বলল, পরশু রবিবারে অন্যায়ভাবে নিহত নরনারীর আত্মার জন্য প্রার্থনা হবে।

এই বলে তাকালো রেভারেণ্ড মীকের দিকে। মীক চোখের দৃষ্টিতে সমর্থন জানালো। তখন সকলে নীরবে সারিবদ্ধভাবে বের হয়ে নিজ নিজ শিবিরের দিকে রওনা হ'ল। তখনো উঠছে দিল্লি প্রকারে কামান গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে জনতার জয়োল্লাস, ইতিমধ্যেই তাদের কাছে পৌঁচেছে লখনৌ ও কানপুরের সংবাদ।

॥ ১৩ ॥

কুন্তী তলাও

জীবনলাল পিছন ফিরে চমকে ওঠে, বলে, আরে এটা আবার কখন এসে দাঁড়ালো?

স্বরূপ বলে, তাই তো, ক্যালিবান যে!

দুজনেই দেখতে পায় কখন তাদের অগোচরে সেই Wolfboy বা মানুষ-বাঘাটা এসেছে, তারা কিছুই জানতে পায় নি।

ব্রিজম্যান শেক্সপীয়রের নাটক থেকে ধার ক'রে নিয়ে এই অদ্ভুত জীবটির নামকরণ করেছিল ক্যালিবান। সকলেই এখন ক্যালিবান বলে, যারা ইংরেজি জানে না, বলে কালিবান্থ।

জীবন বলে, এখন একে নিয়ে আমি কি করি বলো তো।

স্বরূপ বলে, কি আর করবে, যেমন আছে থাক না, উপদ্রব তো করে না।

তা অবশ্য করে না, কিন্তু এ যে এক দায় হ'ল। আমি খাওয়ালে তবে খাবে, আমাকে ছাড়া আর সকলকে দেখলেই তেড়ে যাবে।

তোমাকেও তো এক সময় তেড়ে যেত।

যেতো বৈকি, আঁচড় কামড় দিতো।

এখন তো আর দেয় না, তেমনি আর কিছুদিন পরে অক্ষরেরও দেবে না। তবে কি জানো জীবনলাল, এসব জীব মানুষের সংস্পর্শে বেশি দিন বাঁচে না, ছোটটা দু'তিনদিন পরেই মারা গিয়েছে, এ-ও যে দীর্ঘকাল টিকবে মনে হয় না।

স্বরূপ আর জীবন কথা বলতে বলতে চলে, পিছনে পিছনে চারপায়ে ভর দিয়ে নিঃশব্দে চলে ক্যালিবান। হিন্দুরাও কুঠির তহ্‌খানা থেকে দুটো Wolfboy আবিষ্কার করেছিল জীবন, ছোটটা তিন দিনের দিন মারা যায়। বড়টা এখন Caliban নামে পরিচিত হয়ে রয়ে গেল। জীবনের ঘরের দরজার সম্মুখে একখানা চটের উপরে সারাদিন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকতো। প্রথম কিছুদিন কিছুই খায় নি, খাদ্য দিতে গেলে থাবা তুলে দাঁত খিঁচিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দ করতো, নয়তো ভ্রূক্ষেপই করতো না, যেমন খাদ্য তেমনি পড়ে থাকতো। অবশেষে খিদের তাড়নায় একটু আধটু স্পর্শ করতো তাও যখন জীবন স্বহস্তে দিতো, কেবল তখনই। খাদ্য নিয়ে অনেক পরীক্ষা ক'রে জীবন আবিষ্কার করেছিল যে, কাঁচা মাংস ছাড়া আর কিছু সে খায় না। ক্রমে ক্রমে জীবনের ডাকে সাড়া দিতে শিখলো, ক্যালিবান বলে ডাকলে কান খাড়া করে, আর জীবনের ইশারায় চারপায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠে তাকে অনুসরণ ক'রে চলে। তা ছাড়া সারাদিন হাত পা গুটিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, ঘুমোচ্ছে কি জেগে আছে বুঝতে পারা যায় না—অথচ জীবনের সাড়া পেলেই, পায়ের শব্দ কেমন ক'রে বোঝে ওই জানে, কান খাড়া ক'রে জিব বের ক'রে স্বাগত জানায়। জেনারেল উইলসন দেখতে এসে এই অদ্ভুত জীবটিকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। অনেক রকম প্ররোচনাতেও সাড়া দেয় নি। এলেক্স টেলর লাঠি দিয়ে উদ্বেলিত করবার চেষ্টা করতেই এমনভাবে গর্জন ক'রে উঠল যে, চীফ ইঞ্জিনীয়ার বলল, গুড গড, এ যে সিপাইদের চেয়েও ferocious! অথচ জীবনের কাছে যেন অনেকদিনের পোষমানা প্রভুভক্ত কুকুরটি। কাজেই ক্যালিবান রয়ে গেল জীবনের কাছে। ব্রিজম্যান বলল, থাক, ওটা জীবনের adopted brother! গুরবচন স্বগতোক্তিতে বলল, adopted brother-in-law!

স্বরূপ বলল, এখন কুঠিতে গিয়ে কি করবে, চলো একটু ঘুরে আসা যাক।

চলো।

পাহাড়ের উপর দিয়ে উত্তর বরাবর চলে বাঁ হাতে নেমে সদরবাজারে ঢুকলো দুজনে।

স্বরূপ বলে উঠল, আরে ক'দিন আগেও বাজার খালি ছিল, এখন বেশ ভ'রে উঠেছে দেখছি।

চলো না, একবার ঘুরে দেখা যাক, বলে জীবন।

চলতে চলতে দু'দিকের নূতন দোকানগুলোর নাম পড়তে থাকে স্বরূপ, Peake and Allen, Provision and Wine Merchants. Cowasji and Jehangir, General Order Suppliers. সুরজমল জেঠমল হীরাচান্দ সাউ! বুঝলে হে জীবন, কোম্পানীর জয় অবধারিত।

কি ক'রে বুঝলে স্বরূপজী।

এইসব শেঠ বেনিয়া আর মার্চেণ্টদের দেখে। বাজারের তেজীমন্দীর মতো রাজনীতির তেজীমন্দীতেও এরা এক্সপার্ট। দেশের আবহাওয়া থেকে এরা বুঝতে পেয়েছে যে, শেষ জয় হবে কোম্পানীর, নইলে এতদূরে এখানে এসে দোকান খুলতো না।

হডসন বলছিল যে, শাহ্জাহানাবাদ থেকে রজব আলি জানিয়েছে যে, সিপাহীরা তন্খা না পেয়ে ক্ষেপে উঠেছে, বাদশাকে টাকা ধার দেওয়ার জন্যে শহরের সব বেনিয়ার তলব হয়েছিল দেওয়ানী আমে। কেউ টাকা দেয় নি। সুরযপ্রসাদ নামে এক শেঠ জুলুমের ভয়ে একশ' আকবরী মোহর দিয়েছিল। তাতে কি হবে। হাতীর মুখে দুব্বো ঘাস। বাদশা গোসা হয়ে খোয়াবগায় গিয়ে ঢুকেছেন আর বের হন না। সিপাহীরা দোকানপাট লুট করছে, টাকা কোথায় যে দাম দিয়ে কিনবে।

Peake and Allen-এর দোকান থেকে স্বরূপ সিগারেট কিনে নিয়েছিল, দুজনে ধূমপান করতে করতে রাইফেল রেঞ্জ পেরিয়ে কুন্তী তলাও নামে একটা পুরানো দীঘির ধারে এসে বাঁধানো ঘাটের উপরে বসলো। ক্যালিবান ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে জিব দিয়ে চক্চক্ ক'রে জল পান করতে আরম্ভ করলো। ওরা অবাক হয়ে দেখে।

জীবন বলে ওঠে, স্বরূপজী এই প্রাণীটা জন্মেছিল মানুষ হয়ে কিন্তু মনুষ্যত্ব নেই ওর ভাগ্যে, পশু হয়েই রইলো।

স্বরূপ বলে, মানুষ না পশু ওকে কি বলবো জানি না, কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছে যাদের চেয়ে ও অনেক ভালো। মানুষের চামড়া-পরা যে-সব জীব অসহায় নরনারীকে খুন করে তাদের তুলনায় ও দেবতা।

জীবন বলে, কানপুরের যে সংবাদ এইমাত্র শুনলাম তারপরে আর তোমার কথা অবিশ্বাস করি কি ক'রে?

কানপুরের চেয়েও অনেক বেশি শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ঘটে গিয়েছে লালকেল্লায়। শোন নি?

শুনেছি, তোমার কাছেই শুনেছি। কিন্তু একটার চেয়ে আর একটা কেন বেশি শোচনীয় তা বুঝতে পারলাম না।

কানপুরে অসহায় শ্বেতাঙ্গ নারীর সঙ্গে অসহায় দেশী নারীকে হত্যা করা হয় নি।

লালকেল্লায় হয়েছে নাকি? শিউরে উঠে প্রশ্ন করে জীবন, কি তার অপরাধ?

রূপে ছিল শ্বেতাঙ্গীনীর মতো।

শুধু এই অপরাধে?

এ কি কম অপরাধ জীবন? চামড়া দিয়েই তো মানুষে বিচার করে। চামড়ার গুণে মীর্জা মুঘল মানুষ, চামড়ার দোষে ঐ হতভাগ্য জীবটা পশু।

তুমি কি চিনতে তাকে?

চিনতাম কিনা! আমি তাকে চিনতাম কিনা!

স্বরূপের কথা বলবার শক্তি লোপ পায়, হঠাৎ অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হয়ে যায় কণ্ঠ, উচ্ছ্বসিত অশ্রুতে ছলছল ক'রে ওঠে দুই চোখ। তাড়াতাড়ি দুই জানুর মধ্যে লুকিয়ে ফেলে মুখ।

জীবন বোঝে, ঐ হত্যার সঙ্গে স্বরূপের মনের একটা মূল তার জড়িত। অনেক দিন পরে ঝঙ্কার পড়ায় তাই এমন আর্তনাদ ক'রে উঠেছে।

জীবনের মনেও বিক্ষোভ চলছিল। লখনৌ-এ বিদ্রোহ, পরমোপকারী স্যার হেনরি লরেন্সের মৃত্যু, পিতৃস্থানীয় ভৈরব চাটুজ্যের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তার মনে দুঃখ ও উদ্বেগের ঢেউ তুলে দিয়েছিল। তাই যখন স্বরূপ বেড়িয়ে আসতে আহ্বান করলো, খুশী-মনে সে রাজী হয়েছিল। এই সংবাদে বুঝেছিল যে, যে একটা মাত্র রশি দিয়ে ঘাটের সঙ্গে সে বাঁধা ছিল, তা গেল ছিঁড়ে, এখন সে নোঙর-ছেঁড়া নৌকা। হাঁ, মাঝখানে একবার পান্নার মোহময় দ্বীপে ভিড়েছিল বটে, কিন্তু সেটা তো দ্বীপ বৈ নয়, তার চারিদিকেই জল। নিজের সমস্যা নিয়েই বিব্রত, এমন সময়ে বুঝলো হালভাঙা পালছেঁড়া নোঙর-খসা বলে কাকে। ঐ যে ওখানে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে।

বার দুই ডাকলো, সাড়া দিল না স্বরূপ। তখন কি আর সাড়া আছে তার মনে। তুলসীর অপমৃত্যুর দুঃখ, আর তাকে স্বৈরিণী ভাববার দুঃখ তপ্ত সাঁড়াশি দিয়ে তার মনের তন্ত্রগুলোকে টানছে, তপ্ত জল গড়াচ্ছে দুই চোখে। সেই যে সে রাত্রে কোন্ পিশাচের প্রেরণায় তুলসীকে স্বৈরিণী ভেবেছিল, অজ্ঞাত শাহ্‌জাদার

বিলাসশয্যা-বিহারিণী ভেবেছিল, তুষার-নির্মল তুলসীকে এমন ভাবা পিশাচের প্রেরণা ছাড়া হ'তেই পারে না, সেদিনের পর থেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে নি নিজেকে। চোখের জলের গোপন প্রবাহে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে তার। পাপ গিয়েছে, স্মৃতি তো যায় না। সেই স্মৃতির হীরকে আলো পড়তেই কিরণ-অঙ্গুলি মনের মধ্যে নির্দেশ করে যেখানে রক্তসমুদ্রের সাদা ফেনার উপরে নিষ্কলঙ্ক নীহারে গঠিত তুলসী মূর্তি। স্বরূপ এতদিনে বুঝেছে প্রেমের লক্ষণ। মৃত্যুতে যেখানে আকর্ষণ নিবিড়তর, স্মৃতি মধুরতর, রূপ উজ্জ্বলতর হয় সেখানে প্রেমের যথার্থ আশ্রয়। তুলসীর হাসি, তুলসীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা, অন্ধকারের মধ্যে খদ্যোতবর্ষণ করতে থাকে তার মনে। কত বৃথা জল্পনা আঙুল তুলে তাকে শাসায়! কেন পিতৃগৃহ থেকে তাকে নিয়ে গিয়েছিল, আর গেলই যদি বা, কেন রাখলো তাকে মীর্জা গালিবের কুঠিতে, নিজের সঙ্গে রাখলেই বা কী দোষ হ'ত।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুললো স্বরূপ।

কি হয়েছে ভাই, শুধোয় জীবন।

শুনে কি লাভ হবে?

তোমার বোঝাটা হাল্কা হবে।

চুপ ক'রে থাকে স্বরূপ।

স্বরূপজী, দুঃখের কথার ভাগ দাও, মনটা শূন্য হোক।

ভাই জীবন, শূন্য মনের মতো ভারি কি আর কিছু আছে?

বেশ তো ভারি যদি মনে করো, এসো দুজনে বহন করা যাক।

তা বটে।

জীবনের যুক্তিতে নয়, তার আন্তরিকতায় বিচলিত হ'ল স্বরূপ। তখন তুলসীর নাম আর পিতৃ-পরিচয় যদি বাদ দিয়ে সমস্ত ঘটনা ধীরে ধীরে, অতিশয় সন্তর্পণে, কাঁটার পথের পথিক যেমন সতর্কে পা ফেলে তেমনিভাবে, বিবৃত করলো স্বরূপ।

চোখ ছল-ছল ক'রে ওঠে জীবনের, মনে মনে ভাবে সৌভাগ্যবতী নারীই এমন একনিষ্ঠ প্রেমের অধিকারিণী। বুঝতে পারে এ নারী পান্নার ছাঁচে গড়া নয়। পান্নাকে দেখবার পরে তার ধারণা হয়েছিল নারীর একটিই ছাঁচ আছে, সেই ছাঁচটিই তার হৃদয় হরণ করেছিল। এখন বুঝলো আরো ছাঁচ আছে। তার মনে হ'ল পান্না দুপুর বেলাকার হীরক-খণ্ড, আকাশের সমস্ত আলো কুড়িয়ে নিয়ে রশ্মি-রাশি নিক্ষেপ করছে আকাশের দিকে। নিরাবরণতাতেই তার রহস্য। আর এ নারী ঘরের প্রদীপ। দেয়ালের আবরণ, পর্দার আবরণ, ধূমের আবরণ,

আবরণের অন্ত নেই। আর যত আবরণ তত সুন্দর, তত মধুর, তত রহস্যময়। মনে মনে ছবি আঁকতে চেষ্টা করে এই রমণীর।

দু'জনে প্রাণপণে চোখের জল চেপে ব'সে থাকে, পরস্পরের দিকে তাকাতে সাহস পায় না, পাছে একজনের চোখের জল টেনে বের করে আর একজনের চোখের জল। চোখের জল সঙ্গী খোঁজে।

দু'জনে তাকিয়ে থাকে কূলে কূলে ভরা কুন্তি তলাও-এর দিকে। ও-ও যেন কার জলভরা চোখ। পাণ্ডু রাজার মৃত্যু হ'লে কুন্তী এখানে এসে বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, এ রাজ্যের জল স্পর্শ করবেন না এই ছিল তাঁর পণ। তখন দেবরাজ ইন্দ্র পুষ্কর মেঘকে আদেশ করেন স্বর্গের জলে পুষ্করিণী গড়তে। এই সেই কুন্তি তলাও। কুন্তি তলাও-এর জলভরা চোখ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। আর তাকিয়ে আছে ঐ অর্ধ-নর অর্ধ-পশু ক্যালিবানের চোখ। ওর সমস্ত দেহের মধ্যে ঐ চোখ দুটোয় যা কিছু মনুষ্য-গুণ। বোঝা না-বোঝার প্রান্তে কাঁপে ঐ চোখের দ্যুতি আর জিজ্ঞাসা। ঐ চোখ যেন নীরবে শুধায়, ব্যাপার কি বলো তো? প্রিয়জনের অভাব ঘটেছে? আমার দিকে চেয়ে ছাখো না কেন, আমি রাজার ছেলে বনবাসী সেজে আছি, মানুষ হয়ে জন্মে পশুর অভিনয় ক'রে যাচ্ছি, আমার চেয়েও কি দুঃখ তোমাদের বেশী!

বড় বড় নিমগাছের শাখা প্রশাখায় বাতাস মন্ত্র পড়তে থাকে, ঘুঘুর একটানা ডাক রশি নামিয়ে দিয়ে মাপতে চেষ্টা করে অতল-স্পর্শ শূন্যতা, আলোছায়া আপসে তরুতল ভাগ ক'রে নেয়। সমস্ত মিলে একখানি সজীব ছবি। ফিরবার কথা মনে পড়ে না ওদের।

॥ ১৪ ॥

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র

জীবনলাল হিন্দুরাও কুঠিতে পৌঁছতেই এসে উপস্থিত হ'ল ব্রিজম্যানের আরদালি। সেলাম ক'রে বলল যে, কর্নেল সাহেব সেলাম জানিয়েছেন। জীবন নিজের ঘরে না ঢুকেই চলল ব্রিজম্যানের অফিসের দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে দেখতে পেলো যে, বাইরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গিয়েছে। ভিতরে ঢুকে স্যালুট ক'রে দেখলো যে ব্রিজম্যান ব'সে আছে চেয়ারে, পিছনে দাঁড়িয়ে মেজর

জোন্‌স্‌ আর সম্মুখে দণ্ডায়মান একটি মেয়ে। সেই মেয়েটি আর জীবনে চোখোচোখি হ'তেই পূর্ব পরিচয়ের চাহনি বিনিময় হ'ল, তবে সে সংবাদ ব্রিজম্যান ও জোন্‌সের চোখে পড়লো না।

গীবন, এই আওরতকে আমাদের স্কাউটরা ধরে এনেছে, গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করছে, আমি হাউস ব্যাটারির কাছে ঘুরছিল।

মেয়েটি বলে উঠল, সাহেব, আমি তো গোড়াতেই বলেছি দুধ বিক্রি আমার পেশা, না ঘুরলে দুধ বেচবো কি ক'রে?

ব্রিজম্যান বলে, কিন্তু যেখানে আমাদের লোক সেখানে ঘুরছিলে কেন?

যেখানে লোকজন বিক্রি তো হবে সেখানেই। বনের গাছপালা কি দুধ কিনবে?

তার সপ্রতিভ উত্তরে জোন্‌সের ওষ্ঠাধরে অতি সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে, হয়তো ব্রিজম্যানের মুখেও অনুরূপ হাসি ফোটে। কিন্তু দুজনেরই মুখে প্রচুর দাড়ি গোঁফ থাকায় বাইরের লোকে দেখতে পায় না।

সিপাহীদের কাছে বেচো না কেন?

সিপাহীদের কাছে! মেয়েটি বিস্ময়ে চমকে ওঠে, মাথার উপরে টলকে ওঠে দুধের কলসটা।

জীবন বলে, বহিন, তোমার দুধের ভাঁড়টা নামিয়ে রাখো, পড়ে যাবে।

দুধের ভাঁড় মাথা থেকে নামাতে নামাতে সে বলে, দুধ বেচবো সিপাহীদের কাছে! ওরা পারলে কেড়ে খায়!

কেন? শুধায় ব্রিজম্যান।

কেন কি! কোম্পানীরাজ যারা কেড়ে নিতে চায় তারা কিনবে পয়সা দিয়ে আমার দুধ?

ব্রিজম্যান ও জোন্‌স্‌ মনে মনে ভাবে, না! মেয়েটির সঙ্গে কথা বলা দায়। কথার পিঠে এমন অপ্রত্যাশিত কথা ফেলে যে, হাতের তাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালাতে ইচ্ছা করে।

দুধের ভাঁড় নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই তার সতেজ উন্নত মহিমা সুপ্রকট হ'ল। পরনে পাটকিলে রঙের ঘাগরা, যার প্রান্ত ঘিরে মৌমাছি-বসা ফুলের নক্সার ঘের-দেওয়া; গায়ে কমলা রঙের কাঁচুলি, মাপে আর একটু ঢিলে হ'লেও আঁটো মনে হ'ত; ভিতরের উদ্বেল সৌন্দর্য ঠেলে বেরিয়ে আসছে; বুকের উপর দিয়ে হাঁটুর নিচে ঝুলে পড়েছে বেগনী রঙের দোপাট্টা। পাটকিলে, কমলা, বেগনী রঙে মিলে সূর্য ডুবেছে—অথচ চন্দ্র ওঠে নি, এমন

বসন্ত-সন্ধ্যার রহস্য রচনা করেছে মেয়েটির দেহে। ওকে দেখে জীবনের অনেকবার মনে হয়েছে ও যেন কলমে-কাটা চাঁপার গাছ, বয়সের আগেই পুষ্ট হয়ে উঠে ফুল ফুটিয়েছে। আজকে তাকে এই ঘরের মধ্যে দেখে মনে হ'ল শুধু সৌরভ নয়, সৌন্দর্য নয়, অনেক কালবৈশাখীর ঝড় ঘুমিয়ে আছে ওর ডালে ডালে, হঠাৎ জেগে উঠে ঘূর্ণি-ঘোরানো নাচের ছন্দে বুকের মধ্যে ধড়াস ক'রে ধাক্কা দিয়ে রক্তের স্রোতে অরাজকতার বন্যা বইয়ে দিতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। ভয়ঙ্করের মিশেল না হওয়া অবধি নারীর সৌন্দর্য অপূর্ণ থাকে।

অনেকদিন জীবন দেখেছে এই মেয়েটিকে। যখন সে সকালবেলায় টহল দিয়ে ফিরছে নোম্যান্‌স্‌ল্যাণ্ডে (No Man's Land), দগ্ধ অনুর্বর উচ্চাবচ ভূখণ্ড গোলার আঘাতে, ঘোড়ার ক্ষুরের তাড়নায় অস্ত্রাহত দৈত্যের মুখমণ্ডলের মতো বিকৃত, সেই লক্ষ্মীছাড়া ভূমির লক্ষ্মীর মতো দেখতে পেয়েছে ঐ মেয়েটিকে। মাথায় তার দুধের ভাঁড় দুলছে অথচ পড়ছে না, যেমন সমুদ্রের বারি উথলে উঠেও ছাপিয়ে যায় না ভূমণ্ডলের কানা। অসমতল ভূমিতে চলন প্রতি পদক্ষেপে নূতন নূতন ছন্দ দিচ্ছে তার চালে। আর শুনতে পেয়েছে মুখে তার একটি গানের কলি—

"কোন্ ভরি পিচকারি মারি
ম্যায় তো সারি ভিজ গয়ী।"

জীবন শুনেছে আর ভেবেছে, কে মারলো ভরা পিচকারি ভিজে গেল গো আমার সারা দেহ। তার অনভিজ্ঞ মনও বুঝে নিয়েছে যে, এ মেয়েকে পিচকারি মেরে ভিজিয়ে দেওয়া পর্যন্ত চলে, তার বেশি অচল, পিচকারির রঙের ছোঁয়াচ লাগবে না ওর মনে। জীবন ভেবেছে কোন্ সাহসে মেয়েটা আসে এখানে দুধ বেচতে! একদিকে সিপাহী ফৌজ, অন্যদিকে কোম্পানী ফৌজ—দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ। আদিম ক্ষুধায় কালা গোরার ভেদ নেই। মনে মনে অনেক দিন তার সাহসের সাধুবাদ করেছে সে, অবশেষে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, বিবি, এখানে দুধ বেচতে আসো কোন্ সাহসে? একদিকে সিপাহী ফৌজ অন্যদিকে কোম্পানী ফৌজ—ভয় করে না?

মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের পেশীগুলো শক্ত ক'রে মাথায় ভাঁড়ের টাল সামলে নিয়ে মুচকি হেসে বলেছিল, সাহেব, দুই ফৌজ আছে বলেই তো সাহস করি।

কথার ইঙ্গিত না বুঝতে পেরে জীবন শুধায়, সে কি রকম?

বুঝলে না সাহেব, মতলব এই যে, কোন এক পক্ষের ফৌজ জুলুম করতে গেলেই আর এক পক্ষের ফৌজ বাধা দেবে। এ সেই গুটি খেলার কাটাকাটি

আর কি ?

জীবন অবাক হয়ে যায়, বোঝে এ মেয়ে নিজের ভার নিতে পারে, অপরকে বইতে হয় না এর দায়।

কখনো কখনো দেখেছে মেয়েটির সঙ্গে সিপাহীদের রসিকতার শোচনীয় উপসংহার। একদিন এক কোম্পানীর সিপাহী বলেছিল, বিবি, দুধ তো লেড়কা লোকে খায়, আমাকে খোয়া ক্ষীর দাও। আছে তো ?

মেয়েটি অবলীলাক্রমে উত্তর দিল, আছে বই কি, দুই ডেলা উত্তম খোয়া ক্ষীর আছে, দিতে যদি হয় তোমার বাপজীকে দেবো।

সিপাহীটা বোকা বনে চলে যায়। জীবনও কম বোকা বনে নি। মেয়েটির সুকুমার গোলাপী ওষ্ঠাধরে অশোভন উত্তরটাকে মনে হয়েছিল যেন গোলাপের কুঁড়িতে ছোট্ট একটা কালো কীট। কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন সে আবার গুনগুন ক'রে গেয়ে উঠল,

"কোন্ ভরি মারি পিচকারি
ম্যায় তো সারি ভিজ গয়ী"—

মৃদু বাতাসের নিশ্বাসে দুলে উঠল অমল গোলাপের পাপড়ি, কোথায় কীট কোথায় অশোভনতা।

জীবন মন্তব্য সম্বরণ করতে পারে নি, ধিক্কার দিয়ে বলে উঠেছিল, বিবি, তুমি ঐ জানোয়ারটার সঙ্গে অমন একটা রসিকতা করলে, শরম হ'ল না ?

থমকে দাঁড়িয়ে মেয়েটি বলল, জানোয়ারের সঙ্গে শরম ক'রে কি লাভ সাহেব ? আমার একটা পোষা কুকুর আছে তার সম্মুখেই তো আমি ঘাগরা খুলে স্নান করি।

আরে এ তো সত্যিকার জানোয়ার নয়, মানুষ।

না সাহেব ও সত্যিকার জানোয়ার, মানুষ নয়।

তারপরেই হুড়মুড়-দুড় ক'রে শুরু হয়ে গেল গোলাবর্ষণ।

মেয়েটির মুখের একটি রেখাও বদল হ'ল না, কেবল ক্ষিপ্র হরিণীর মতো চঞ্চল হয়ে উঠে বাঁ-হাতে মাথার ভাঁড়টা আলগোছে ধরে একটা টিলার উপরে উঠে দাঁড়ালো, তারপরে বেশ ক'রে পুবে পশ্চিমে দেখে নিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেল টিলার নীচে। এমন তিন চার দিন মেয়েটির দেখা পেয়েছে জীবন নো-ম্যান্‌স্-ল্যাণ্ডের অরাজকতার মধ্যে।

আজ তাকে ব্রিজম্যানের আপিসে দেখে অবাক হয়ে গেলো।

তুমি যদি গোয়েন্দা না হও তবে গাঁয়ের দিকে দুধ বেচতে গেলেই পারো, ফৌজী জমিতে আসো কেন ? বিপদও তো আছে—বলে ব্রিজম্যান।

সাহেব, ঘরে বসে থেকেও দেখেছি বিপদ কম নয়।

কেমন?

সিপাহীরা ক্ষেপে উঠে আমার বাপকে খুন ক'রে ফেলে—সে তো ঘরের মধ্যেই, আবার গোরা আদমি দিল্লি ছেড়ে পাহাড়ের দিকে আসবার সময়ে আমার বাপের মৃতদেহ দেখে এমন ক্ষেপে উঠল যে পুছতাছ না ক'রেই আমার ভাইকে খুন করল, তাকে বাঁচাতে গিয়ে খুন হ'ল আমার মা। এ সমস্তই তো ঘটেছে সাহেব ঘরের মধ্যে। সাহেব, ভূমিকম্পের সময়ে আকাশের তলার চেয়ে ছাদের তলায় বিপদ বেশী বই কম নয়।

মেয়েটি বলে যায়, জোন্স্ আর জীবনলাল বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে শোনে, আর জেরা ক'রে যায় ব্রিজম্যান। সকলেই ভাবে মেয়েটি ক্রমেই অধিকতর রহস্যময় হয়ে উঠছে। পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে যথার্থ রহস্যের রস ক্রমে গাঢ়তর হয়।

সিপাহীরা তোমার বাপকে খুন করতে গেল কেন?

খুন করবে না! কি যে বলো সাহেব, আমার বাপ যে ইংরেজ ছিল!

ইংরেজ ছিল? বিস্মিত হয়ে ওঠে সকলে।

জোন্স্ ভাবে, তাই বলো, ইংরেজের রক্ত না থাকলে কি এমন smart, এমন চটপটে হয়।

আর তোমার ভাই ও মাকে গোরার দল খুন করল কেন?

করতেই হবে। পাল্টা জবাব দেবে না! তারা যে দেশী আদমি। আমার মা ছিল কাশ্মীরের মেয়ে।

জানতে পারি কি, কি ছিল তোমার বাপের নাম?

Mr. Knights.

Very sorry, Miss Knights, I am really sorry.

না সাহেব, আমাকে মিস্ নাইটস ব'লে ডেকে আর মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিয়ো না।

মৃত্যুর পথে এগোবে কেন?

কেন নয়? আমার গায়ে ইংরেজের রক্ত আছে যে! সেটুকু বের না ক'রে দেওয়া পর্যন্ত সিপাহীরাজ কায়েম হয় কি ক'রে?

তোমার উপরেও অত্যাচার হয়েছিল নাকি?

হয় নি? দেখবে?

এই ব'লে সে কাঁচুলির হাতা গুটিয়ে ফেলে চিক্কণ বাহুর উপরে নীলাভ দাগ দেখায়—চাবুকের দাগ।

আরো দেখবে?

এই ব'লে বিনা ভূমিকায় ঘাগরা সরায়, বের হয়ে পড়ে নিটোল সুডোল পৃথুল মাছি-বসলে-পিছলে-পড়ে এমন মসৃণ, হাতীর দাঁতের আভায় আর তুষারের ছটায় জড়িত উরুদেশ। সমস্ত ব্যাপারটা এমন বিনা নোটিসে ঘটল যে, ব্রিজম্যান চেয়ার ছেড়ে উঠে পালাবার সময়টুকু পর্যন্ত পেল না। শিক্ষায় সে ঘোরতর puritan, রুচিবাগীশ, তার উপরে সম্মুখে কিনা অনাবৃত পরনারীর উরু! উপায়ান্তর না দেখে ব্রিজম্যান চক্ষু মুদ্রিত ক'রে ফেলল আর জোন্‌সের উদ্দেশ্যে বলল, জোন্‌স্, will you see for me!

পাশের ঘর থেকে জোন্‌স্ বলল—ব্রিজম্যান, I am safe here!

উভয় সঙ্কটে প'ড়ে ব্রিজম্যান বলে ওঠে, I can not leave my seat of duty, neither can I look at that thing! My God! What a dilemma! (উঠতেও পারি না দেখতেও পারি না, ভগবান এ কি সঙ্কটে ফেললে!)

তখন আবার গৃহান্তরিত জোন্‌সের উদ্দেশ্যে বলে, Jones, please, see for me!

জোন্‌স্ উত্তর দেয়, Sorry, Bridgeman. Mary will be cross.

তবে এখন কি করি পরামর্শ দাও।

জোন্‌স্ বলে, সামরিক প্রয়োজন মনে ক'রে ছাখো।

সামরিক প্রয়োজনে জানু পর্যন্ত দেখতে রাজী আছি—কিন্তু এ যে উরু, তায় আবার অনাবৃত।

হতাশা প্রকাশ পায় ব্রিজম্যানের কণ্ঠস্বরে। জোন্‌স্ বলে, দুঃখিত কিন্তু আমি পারবো না, Mary will be cross!

তখন হঠাৎ মনে প'ড়ে যায় জীবনলালের কথা, নিমজ্জমান ব্যক্তি কাষ্ঠখণ্ড দেখতে পায়।

গীবন, গীবন, save me! তোমরা তো হিণ্ডু, তোমাদের দেবীমূর্তিগুলোর তো প্রায় ঐ রকম বেসামাল পোশাক, তাতে তোমাদের ভক্তির তো অভাব হয় না দেখেছি। Will you see for me!

Gladly will I do, sir, বলে জীবন।

ব্রিজম্যান ব'লে ওঠে, No, no, not gladly, see it only dutifully, only as on order from your superior officer. So do not see it lustfully rather see the thing as painful duty and report.

Yes sir.

কি দেখছ ?

মসৃণ চামড়ার উপরে—

বাধা দিয়ে ব্রিজম্যান বলে, মসৃণ শব্দটা বাদ দাও, ওতে lust, লালসার আভাস আছে, বলো শুধু চামড়ার উপরে—

Yes, sir.

ভুলো না যে সামরিক প্রয়োজনে, কর্নেলের আদেশে পরনারীর উরু দেখতে তুমি বাধ্য হ'চ্ছ।

Yes, sir.

সামরিক প্রয়োজনে এমন অনেক অপ্রিয় কঠোর কাজ করতে হয়, গীবন।

Yes, sir.

ব্রিজম্যান চোখ বুজে আদেশ ক'রে যাচ্ছে—আর সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে এই দুটি যুবক-যুবতীর চোখমুখ ও দেহের সমস্ত মাংসপেশী থেকে নিঃশব্দ কৌতুক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। জোরে হাসবার উপায় নেই, কর্তব্যচ্যুতির ভয়।

বলো, কি দেখছ ?

মনে হচ্ছে লৌহখণ্ড গরম ক'রে চেপে ধ'রে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছিল।

ঠিক কথা সাহেব, বলে মেয়েটি।

কত বড় দাগ, কি রকম দেখতে বর্ণনা করো।

জীবন হাতের কাছে কোন উপায় খুঁজে পায় না, ওদিকে ব্রিজম্যানের তাগিদ, Quick man quick, don't see it for more than what is necessary।

কর্নেলের জোর তাগিদের ফলে অলঙ্কার-শাস্ত্রে অনিপুণ জীবনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, Something like a banana, sir।

How preposterous! My God, my God, ব'লে অশ্রাব্য কথা প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ ক'রে ব্রিজম্যান দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে পালাতে পালাতে চীৎকার করে, This is lust, this is pure lust and not duty! Devil has taken possession of you, গীবন।

ঘরে তখন অবশিষ্ট থাকে দুইজন, জীবন আর মেয়েটি।

জীবন বলে, নাও, ঘাগরা ঠিক করো।

ঘাগরা কাঁচুলি প্রভৃতি সামলাতে সামলাতে জীবনকে উদ্দেশ ক'রে অথচ তার দিকে না তাকিয়ে মেয়েটি গুনগুনিয়ে গান ধরে—

"লালী তেরি আঁখিয়া, এ বাবু,
কালি তেরি কেশ,
কৌন্ লালচ মে আয়া, বাবু
কৌন্ তেরি দেশ।"

কিছুক্ষণ পরে ব্রিজম্যান ও জোন্‌স্ পুনঃপ্রবেশ করে। কিন্তু তার আগে জীবনকে খুঁটিয়ে জেরা ক'রে জেনে নেয় যে, মেয়েটি properly dressed হয়েছে।

ব্রিজম্যান মেয়েটির উদ্দেশ্যে বলে, আমরা তোমার জন্যে কি করতে পারি?

এতক্ষণ পাশের ঘরে ব্রিজম্যান ও জোন্‌স্ আলোচনা ক'রে স্থির করে, যে মেয়েটির বাপ যখন ইংরেজ, আর সে মায়া পড়েছে সিপাহীর হাতে, তখন অবশ্যই একটা দায়িত্ব বর্তেছে কোম্পানীর উপরে।

ব্রিজম্যানের কথায় উত্তরে মেয়েটি বলে, সাহেব আমার কাছে থেকে দুধ কিনো।

দুধ তো শহরেও বেচতে পারো।

পারি বৈকি এবং বেচেও থাকি। কিন্তু আমি পণ করেছি সিপাহীপক্ষ এবং কোম্পানীপক্ষ দুই পক্ষের কাছেই দুধ বেচে আমি পয়সা রোজগার করব।

এ অদ্ভুত পণ কেন বলো তো।

বুঝতে পারবে না সাহেব! দুই পক্ষের অপরাধের ফলেই আজ আমার এই অবস্থা; নইলে দুধ বেচে জীবিকা অর্জন করতে হবে কেন? তাই পণ করেছি, দুই পক্ষ আমাকে পোষণ করবে দুধ কেনা কড়ি দিয়ে।

ব্রিজম্যান, জোন্‌স্, জীবন অবাক হয়ে যায় মেয়েটির বিচারে আর যুক্তিতে। উত্তর খুঁজে পায় না ব্রিজম্যান।

অবশেষে ব্রিজম্যান বলে, তুমি কোম্পানী-ছাউনিতে চলে এসো; তোমার ভরণপোষণের ভার আমরা নিলাম।

অর্ধপথে কথাটার পক্ষ ছিন্ন ক'রে দিয়ে মেয়েটি বলে, না সে সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়?

শুনে লাভ নেই সাহব।

এখানে সুখে থাকতে।

সুখে আমার দরকার নেই।

ব্রিজম্যান বিস্ময়ে বলে ওঠে, সুখ চাও না? কেন?

সুখের আঙুর চেখে দেখছি, বড় খাট্টা। তা ছাড়া আরো কারণ আছে, আমার উপরে আরও দুটো প্রাণী নির্ভর করে।

বেশ, তবে তোমার দুধটাই কিনবো।

ব্রিজম্যান আরদালিকে ডেকে হুকুম ক'রে দেয় আওয়তের কলসীর সবটা দুধ কিনে নাও।

মেয়েটি বলে ওঠে, সবটা নয় অর্ধেক।

বাকী অর্ধেক কি করবে?

সিপাহীদের কাছে বেচবো।

ব্রিজম্যান ও মেয়েটির মধ্যে যখন কথোপকথন চলছিল মন দিয়ে শুনছিল জোন্‌স্‌। এবারে ভাগাভাগি ক'রে দুধ বিক্রির প্রস্তাব শুনে নিজের মনে বলে উঠল, ধর্মনীতিতে অর্থনীতিতে জড়ানো এ এক কিম্ভূত ব্যাপার।

দাম নিয়ে প্রস্থানোদ্যত মেয়েটিকে ব্রিজম্যান বলল, নিয়মিতভাবে তোমার অর্ধেক দুধ এখানে বেচে যেয়ো—কেউ অত্যাচার করবে না তোমার উপরে।

মেয়েটি যখন সেলাম ক'রে বাইরে যাচ্ছে, ব্রিজম্যান বলল, তোমার নামটি কি জানতে পারি? মিস্‌ নাইটস্‌ বলে ডাকতে তো নিষেধ করলে।

মেয়েটি বলল, আমার নাম রুমালী।

অদ্ভুত নাম তো। কে দিল এই অদ্ভুত নাম, তোমার বাপ—না মা? শুধোয় ব্রিজম্যান।

শহরের লোকে, বলে রুমালী।

আরো অদ্ভুত। হঠাৎ তারা এমন নাম দিতে গেল কেন?

তবে শোনো! না থাক।

থাকবে কেন; বলো।

আবার হয়তো তোমরা ঘর ছেড়ে পালাবে সাহেব। তার চেয়ে আমি যাই।

না, না, নামের ইতিহাসে এমন আর কী থাকবে! বলে যাও।

তবে শোন। আমার মা ছিল কাশ্মীরী নর্তকী। লালকেল্লায় শাহ্‌জাদাদের কাছে ছিল তার যাতায়াত। বয়স হ'লে আমিও যেতে শুরু করলাম মার সঙ্গে। আমার বয়সের আরো অনেক মেয়ে যেতো। শাহ্‌জাদাদের যাকে পছন্দ হ'ত তার দিকে ছুঁড়ে দিতো রুমাল। আমার ভাগ্যেই বেশিদিন রুমাল পড়তো। তাই লোকে ডাকে আমাকে রুমালী বলে।

একে ভাগ্য বলছ! এ যে নিতান্ত লজ্জাজনক ব্যবসা!—বলে ব্রিজম্যান।

সাহেব, ফাঁসির আসামীর গলায় যে লোকটা দড়ি পরায় তার ব্যবসার চেয়েও কি লজ্জাজনক?

সে তো অপরের মঙ্গলের জন্য জল্লাদের কাজ করে।

আমি তো আমার ছাড়া কারো অমঙ্গল করি নে।

নিজের আত্মাকে অপবিত্র করছ কেন?

ভোগ করে তো দেহ, আত্মা অপবিত্র হ'তে যাবে কেন?

তোমার তো পয়সার অভাব ছিল না; তবে এ কাজ করতে কেন?

কে বলেছে পয়সার জন্যে করতাম! ভালো লাগে বলে করতাম।

আর কোন উত্তর খুঁজে পায় না ব্রিজম্যান; তাই শুধু বলে, ছিঃ ছিঃ।

ছিঃ ছিঃ কেন সাহেব? এ কাজ সুখের জন্যে করবার চেয়ে পয়সার জন্যে করা বুঝি ভালো?

তুমি তো এখনি বললে, সুখের আঙুর খাট্টা।

তাই বলে কি আঙুরের চাষ কমেছে সংসারে?

নাগরদোলার ঘূর্ণনে নূতন নূতন রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে রুমালীর ব্যক্তিত্বে। রূপ, সাহস, বাক্‌পটুতা; ক্রয়-বিক্রয়-পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম ধর্মনীতি; আর তার সঙ্গে এই নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়পরতা। ক্ষণে ক্ষণে চমকে চমকে ওঠে ব্রিজম্যান ও জোন্‌স্। কঠোর রুচিবাগীশ সৈনিক দুজনে ইন্দ্রিয়পরতার অনুকূলে ওর ওকালতী শুনে হতাশ হয়ে যায়। ইংরেজের রক্ত আছে যার ধমনীতে তার কিনা শেষে এমন মতিগতি! কোম্পানীর রাজত্ব থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? শেষে কিনা নিছক সুখের জন্য ইন্দ্রিয়পরতা? পয়সার জন্যে হ'লেও না হয় বোঝা যেতো। দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতে। পয়সার চেয়ে সুখ তো বড় নয়।

জীবনের মনে প্রতিক্রিয়া হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। লজ্জা নয়, বিস্ময়। এক মেয়ে দেখেছিল পান্না, ভেবেছিল ঐ বুঝি বে-আব্রুর চরম, তখনো অজ্ঞাত ছিল রুমালী। নিষ্ঠাবতী পান্না পাপটাকে পাপ বলেই মনে করে—বিশেষ তার কাছে সেটা কুলাচার, তবু তাকে যথাসম্ভব ঢেকেঢুকেই রাখে! আর এ কী? এই রুমালী? পাপবোধ বলে একটা অনুভূতিই নেই তার মানে। বলে কিনা বাধ্য হয়ে নয়, পয়সার জন্যে নয়, সুখের জন্য যায় শাহ্‌জাদাদের কাছে। এ যে দিনের আকাশের তারা, শত সহস্রের দৃষ্টির সম্মুখে কেমন নির্লজ্জ নির্বিকার। জীবনের যদি ভূয়োদর্শন থাকতো তবে বুঝতে পারতো পাপবোধ নেই যার মনে, লজ্জা পেতে যাবে সে কেন?

রুমালীকে বেরিয়ে যেতে দেখে ব্রিজম্যান বলল, মিস নাইটুস্—

অশুচি ইতিহাসবাহী রুমালী নামটা বের হ'ল না তার মুখ দিয়ে।

মিস্ নাইট্‌স্, যদি কিছু মনে না করো তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—

কর্নেল ব্রিজম্যানের ভাষায় শিষ্টতা বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে—যার ধমনীতে পবিত্র ইংরেজ রক্ত প্রবহমান, তাকে সন্তর্পণে ভদ্রভাবে সম্বোধন করতে হয় বই কি।

রুমালী ফিরে তাকায়।

ব্রিজম্যান সসঙ্কোচে শুধোয়, যদি কিছু মনে না করো—জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, শহরে ইংরেজ নর-নারী কেউ আছে কিনা?

আমি তো গোয়েন্দা নই, কর্নেল।

নিশ্চয়ই নয়। তুমি আমাদের নিজেদের লোক বলেই জিজ্ঞাসা করছি।

রুমালী বলে, আবার ত্যাখো আমার ভাগ্যের কি সব্যসাচী লীলা। ইংলণ্ডের ও হিন্দুস্থানের রক্ত বহন করছি দেহে, আর বাড়িতেও বহন করছি একটি হিন্দুস্থানী ও একটি ইংরেজ মহিলার ভার।

আছে নাকি ইংরেজ মহিলা তোমার বাড়িতে! চমকে ওঠে একসঙ্গে ব্রিজম্যান ও জোন্‌স্। ব্রিজম্যান বলে, আমরা শুনেছিলাম জীবিত কেউ নেই।

মৃত মনে ক'রেই একে রাস্তায় ফেলে গিয়েছিল, বলে রুমালী।

তারপরে?

তারপরে আর কি। অদৃষ্টের লীলা শুরু হ'ল। পথে যেতে চোখে পড়লো, তখনো মরে নি বুঝলাম, ঘরে নিয়ে এসে সেবা ক'রে সুস্থ ক'রে তুললাম।

অনেক ধন্যবাদ! কি তার নাম?

বহু সাধ্য-সাধনা ক'রেও নাম-ধাম জানতে পারি নি। বলে নাম প্রকাশ ক'রে আমার কলঙ্কের ভার চাপাতে চাই না আমার পরিবারের উপরে। আমি তাকে বোঝাই, বহিন, হিন্দুস্থানব্যাপী গদর—কিনা অশান্তি চলছে, ইংরেজ পরিবার সব কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, অনেকেই জীবিত নেই, কাজেই তোমার নাম বললেই যে তোমার আত্মীয়স্বজন জানতে পাবে এমন সম্ভাবনা খুব কম।

সে বলে, তবে আর নামে প্রয়োজন কি?

ডাকতে হবে তো।

বেশ, তবে আমাকে ডেকো মিস্ এলবিয়ন বলে।

জোন্‌স্ বলে ওঠে, মিস নাইটস্, তুমি কি দুধ বেচে রোজগার ক'রে তাকে ভরণপোষণ করো নাকি?

আর কি উপায় আছে, সাহেব?

বৈরিণী নারীর হৃদয়ের বিস্তার দেখে অবাক হয়ে যায় জোন্‌স্, ভাবে

তাজ্জব বটে দুনিয়া।

ব্রিজম্যান শুধায়, মিস্ এলবিয়ন কি কোম্পানীর ছাউনিতে আসবে না?

অনেকবার তাকে বলেছি—বহিন, এই তো পাহাড়টায় ইংরেজ ফৌজ এসেছে, চলো তোমাকে পৌঁছে দিই। আমার সঙ্গে গোয়ালিনী সেজে মাথায় দুধের ভাঁড় নিয়ে যাবে কেউ ধরতে পারবে না।

সে বলে, ঐ অনুরোধটি ক'রো না। তারপরে বলে, যদি তোমার ভার হয়ে থাকি মনে করো তবে বলো শহরের পশ্চিমে না গিয়ে পুবে যাই—যমুনার জল কলঙ্কের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করবে না।

আমি বলি, ছিঃ ছিঃ বহিন, আমি কি তাই বলেছি!

সব বৃত্তান্ত শুনে ব্রিজম্যানের ধারণা হয়, খুব সম্ভব এ মেয়েটি ক্লিফোর্ডের বোন মিস্ এলিনা ক্লিফোর্ড। তবে ধারণাটা নিজের মনেই রাখলো, ঘুণাক্ষরে ক্লিফোর্ডের কানে পৌঁছলে এখনি হয় তো দিল্লি রওনা হয়ে এক অনর্থ বাধাবে।

তখন মিস্ নাইটসের উদ্দেশ্যে বলল, ত্যাখো কথাটা যখন আমার কানে এলো তখন একবার তদন্ত আবশ্যক। আচ্ছা, আমাদের এখান থেকে কারো গিয়ে সব জেনে আসা সম্ভব নয় কি?

অসম্ভব কি? তবে ইংরেজ যাওয়া চলবে না, তখনি কোতল হয়ে যাবে।

তা বটে, বলে ব্রিজম্যান।

তখন জীবনের দিকে তাকিয়ে শুধায়, গুরবচন সিং-কে পাঠালে কেমন হয়?

জীবন উত্তর দেওয়ার আগেই রুমালী বলে, নাম শুনে মনে হচ্ছে শিখ। বাদশাহী ফৌজের শিখের উপরে রাগ ইংরেজের উপরে রাগের চেয়ে কম নয়।

জোন্স্ বলে, এ কথা ঠিক।

তখন ব্রিজম্যান বলে, স্বরূপরামকে কেমন মনে করো জীবন? সে দিল্লির লোক, পথঘাট চেনে।

এবারেও জীবন মুখ খুলবার আগে রুমালী উত্তর দেয়—কাজেই দিল্লির লোকও তাকে চেনে, সে যে কোম্পানীর পক্ষে যোগ দিয়েছে একথাও নিশ্চয় রটে গিয়েছে, কাজেই তাকে পাঠালে মৃত্যুমুখে পাঠানো হবে।

তবে?

জীবন বলতে যাচ্ছিল যে, সে যেতে রাজী আছে, তার আগেই রুমালী বলে উঠল—এই সাহেবকে পাঠান না কেন? জাঁদরেল জঙ্গী আদমি বলেই তো মনে হয়।

এই পর্যন্ত বলে মুখ টিপে হাসে। জীবন বুঝতে পারে না, ব্যঙ্গ না আর কিছু!

ব্রিজম্যান বলে, জীবন যে পথঘাট চেনে না।

পথঘাট চিনে আর কে কবে সংসারে জন্মগ্রহণ করে? বাৎলে দেবো, আর তাছাড়া আমিও তো সঙ্গে থাকবো।

তারপরে জীবনের দিকে চেয়ে বলে, কাবুল দরবাজা দিয়ে ঢুকেই দক্ষিণে গলি অঙ্গাবেগ, একটু সামনে এগিয়ে গেলেই চৌরাহা আর তাছাড়া আমি তো সঙ্গেই আছি। কি সাহেব, রাজী? না ঘরে বসেই তলোয়ার ভাঁজবে বাদশাহের জাঁদরেল কুলিজ খাঁর মতো।

জীবন তাকায় ব্রিজম্যানের দিকে, বলে, I am ready, sir!

এ ছাড়া আর কি উত্তর প্রত্যাশা করবো তোমার কাছে জীবন। তুমি গিয়ে মিস্ এলবিয়নের প্রকৃত পরিচয় জানবার চেষ্টা করবে, তাকে কোম্পানীর ছাউনিতে আনবার চেষ্টা করবে, আর যত শীঘ্র সম্ভব প্রত্যাবর্তন করবে।

Yes, sir.

কখন রওনা হবে?

এখনি, এই মুহূর্তে।

ব্রিজম্যান ও জোন্‌স্ করমর্দন করে জীবনের সঙ্গে।

ব্রিজম্যান জানায়, শত্রুশিবিরে যাচ্ছ মনে রেখো, বিপদ আছে।

সেই জন্যেই আমার এত উৎসাহ।

That's real martial spirit.

জীবন স্যালুট করে।

ব্রিজম্যান ও জোন্‌স্ একসঙ্গে বলে, God be with ye!

বিদায়ের বিস্তারিত ঠাট দেখে মনে মনে হাসে রুমালী, মনের হাসির ছটা ঝলমল ক'রে ওঠে দুই চোখে আর ঠোঁটে। সে ভাবে জঙ্গী আদমীর বিদায়ের পালা বাপের বাড়ি থেকে মেয়ের শ্বশুর ঘরে বিদায়ের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। রুমালী ঘর থেকে বের হয়েছে আর জীবন কেবল দরজা পর্যন্ত এসেছে এমন সময়ে—

॥ ১৫ ॥

"চৌদিকে এবে সমর তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ুসহ
নির্ঘোষে। ভাতিল অসি অগ্নিশিখা সম,
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত। নাদিল কম্বু অম্বুরাশি রবে।"

এমন সময়ে স্কামি হাউস ব্যাটারির দিক থেকে তুমুল রবে বিউগল বেজে উঠল। অতর্কিত সংকেত ধ্বনিতে চমকে ওঠে ব্রিজম্যান জোন্‌স্। জীবন বাইরে এসে দাঁড়ালো; ঘোড়সওয়ার বাহিনীর মেজর রীড ঘোড়া ছুটিয়ে সেদিকে যেতে যেতে টুপি দিয়ে ইশারায় জানিয়ে গেল যে, ব্যাটারি দখল করবার উদ্দেশ্যে সিপাহীরা চড়াও হয়েছে। ব্রিজম্যান ও জোন্‌সের সহিস ঘোড়া নিয়ে উপস্থিত ছিল। জোন্‌স ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল তার ব্যাটারির দিকে, ব্রিজম্যান ঘোড়ায় চেপে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নেবার আশায় পাহাড়ের উঁচু একটু টিলার উপরে উঠলো। জীবন ও গুরবচন ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো স্কামি হাউস ব্যাটারির দিকে, স্বরূপরাম তাদের অনুসরণ করলো।

ইতিমধ্যে মেজর রীড একদল ঘোড়সওয়ার নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল, পিছু পিছু ঘোড়ায় টানা কামান নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল জোন্‌স্। শ'দুই সিপাহী ঘোড়সওয়ার সোজা এসে চড়াও হয়েছে ব্যাটারির কামানগুলোর উপরে, গোলন্দাজদের নিহত ক'রে কামান দখল করতে চায়। ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার মরেছে অনেক, কিন্তু অমিতবিক্রমে বাকীরা গিয়ে চড়াও হয়েছে কামানের বুরুজের উপরে, তলোয়ার দিয়ে কচুকাটা করছে গোলন্দাজদের। সকলে অবাক হয়ে গেল তাদের সাহস দেখে। আর একটু এমনভাবে চললে কামানগুলো হাতছাড়া হ'ত। এমন সময়ে ডান দিক থেকে রীডের ঘোড়সওয়ার চার্জ করলো, বাঁদিক থেকে জোন্‌সের mobile কামানগুলো গর্জন ক'রে উঠল, আর ইতিমধ্যে জীবন ও গুরবচন সিং শ'খানেক রেসালা জড়ো ক'রে পাহাড়ের উপর থেকে তুষার স্খলনের বেগে চার্জ ক'রে নেমে এলো। ফলও ফলল হাতে হাতে। হতাহত সঙ্গীদের ফেলে বাকি সিপাহীরা ছুটলো শহরের দিকে।

বিজয়ীরা যখন নিজেদের অভিনন্দিত করছে এমন সময়ে পাহাড়ের টিলার উপর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে এলো ব্রিজম্যান, বলল, স্তামি হাউস ব্যাটারি আক্রমণ একটা ধোঁয়া মাত্র, সিপাহীদের প্রকাণ্ড একটা রেসালা (cavalry) কিষেণগঞ্জ ঘুরে সবজিমণ্ডি পেরিয়ে মুসলমানী গোরস্থানে গিয়ে পৌছেছে, আর একটু এগোলেই পিছন থেকে আক্রমণ করবে আমাদের শিবির।

কর্নেলের কথা শুনে সকলে বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকালো, শুধু সাহস নয়, রণকৌশলও বেশ আয়ত্ত করেছে ওরা। ভাবনার সময় বেশি ছিল না। জোন্স তার mobile কামানগুলো নিয়ে আর রীড ঘোড়সওয়ার নিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে পাহাড়ের দক্ষিণ গা ঘেঁষে ছুটলো সবজিমণ্ডির দিকে। জীবন ও গুরবচন হিন্দুস্থানী ও শিখ রেসালা নিয়ে স্তামি হাউস আর ইদ্গার মাঝামাঝি দাঁড়ালো শহরে পালাবার পথ বন্ধ করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সিপাহী ফৌজ বুঝতে পারলো গোপনে শিবির আক্রমণের মতলব ব্যর্থ হয়েছে, কোম্পানী ফৌজ তাদের উপস্থিতি জানতে পেরেছে; কাজেই তারা ফিরে চললো। কিন্তু সে পথ বন্ধ ক'রে রীডের ঘোড়সওয়ার আর জোন্সের কামান। তাদের হাত এড়াবার উদ্দেশ্যে সিপাহী ফৌজ ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে সবজিমণ্ডির বসতি পেরিয়ে রোশেনারাবাগের গাছপালার মধ্যে আশ্রয় নিল। সেখানে ছত্রভঙ্গ হয়ে কতক চলে গেল বাহাদুরগড় আর রোহ্তকের দিকে আর কতক লাহোর দরবাজা হয়ে শহরে ঢুকবার আশায় চলল পাহাড়পুরের দিকে।

সিপাহীদের এই ছোট দলটির একজন হঠাৎ এগিয়ে এসে অতর্কিত আক্রমণ করলো গুরবচন সিংকে। গুরবচন তার তলোয়ারের আঘাত সামলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘোড়াটাকে পিছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলো। রাতে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, মাটি পিছল ছিল, ঘোড়ার গেল পা হড়কে, ঠিক সেই মুহূর্তে আততায়ীর তলোয়ার তার মাথার উপরে উদ্যত, গুরবচন ঘোড়া সামলাতে বিব্রত, বিপদ ঘটতই—যদি না একজন শিখ সওয়ার সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে পিস্তল ছুঁড়তো। আততায়ী মরল। ওদিকে ঘোড়া পা সামলাতে না পারায় গুরবচন মাটিতে পড়ে গেল। আততায়ীর সঙ্গী তাকে লক্ষ্য ক'রে পিস্তল তুলেছে দেখতে পেয়ে জীবন আগেই পিস্তল ছুঁড়ে তাকে ধরাশায়ী ক'রে দিলো।

ব্যাপারটা ঘটছিল ইদ্গার পুবদিকে, কয়েকটা কোঠা বাড়ির আড়ালে, কোম্পানীর ফৌজ কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। সঙ্গী দুইজনকে নিহত হ'তে দেখে তৃতীয় একজন সিপাহী জীবনকে লক্ষ্য ক'রে পিস্তল ছুঁড়লো, জীবনকে

লাগলো না বটে তবে সেই গুলী বিঁধলো গিয়ে তার ঘোড়াটার বুকের কাছে। আহত ঘোড়া দারুণ যন্ত্রণায় জীবনকে নিয়ে তীরবেগে ছুটলো শহরের দিকে। কিছুতেই রাশ মানলো না। অবশেষে থামলো যখন—সেই শেষ থামা। একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো গিয়ে যমুনার খালের মধ্যে ঠিক কাবুল দরবাজার নিচে, জীবন ছিটকে পড়লো মাটির উপরে। বোধ করি মুহূর্তকালের জন্য সে হতচৈতন্য হয়ে থাকবে। যখন তার জ্ঞান হ'ল, দেখলো প্রাচীরের উপরে অনেকগুলো বন্দুকের চোখ আর অনেকগুলো বন্দুকের চোঙ তার দিকে তাকিয়ে। ওরা ঠিক বুঝতে পারছে না —শত্রু না মিত্র। জীবন দেখলো দুর্বলতা প্রকাশ পেলেই অনেকগুলো গুলীতে তাকে দেবে ঝাঁঝরা ক'রে। তাই কোন ত্বরা বা ভয় প্রকাশ করলো না তার আচরণে। ধীরে সুস্থে উঠে খালের জলে গায়ের রক্ত ধুয়ে বেশ টান হয়ে একবার দাঁড়ালো তারপরে উচ্চস্বরে গান ধরলো—

"নিমকহারামেঁ মুলুক বিগাড়া
হজরৎ যাতে লণ্ডনকো ভালা।"

অমনি প্রাচীরের উপর থেকে সুবিদিত জনপ্রিয় গানটির দ্বিতীয় কলি গেয়ে উঠল সিপাহীরা—

"ওয়াজেদ আলি শা যুগ যুগ জীয়ো
ম্যায় তো যাতে লণ্ডনকো।"

তখন উভয়পক্ষই নিশ্চিন্ত হ'ল, সিপাহীরা ভাবলো নিজেদের লোক; জীবন ভাবলো আপাতত ছাড়পত্র পাওয়া গেল। পোশাক দেখে বুঝবার উপায় ছিল না, দুইপক্ষের সিপাহীদেরই বৃটিশ ইউনিফর্ম।

তখন জীবন কাবুল দরবাজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করলো। এই দরজা দিয়েই শহরে ঢুকতে হবে জানিয়েছিল রুমালী। কিন্তু কোথায় বা রুমালী আর কোথায় বা তার বাড়ি, ঠিকানাটাও ভালো ক'রে জেনে নেওয়া হয় নি। সশস্ত্র শত্রুপুরীর মধ্যে একক নিরস্ত্র জীবন, যার ভরসায় আসা সে যে কোথায় কে জানে! জিজ্ঞাসা করাতেও বিপদ আছে, ধরা পড়তে কতক্ষণ। জীবনলাল কামানের মুখ থেকে বেঁচে গিয়েছে, তলোয়ার, পিস্তল বন্দুকের পাল্লা থেকে বেঁচে গিয়েছে; কাজেই আশা করবার শক্তিও তার গিয়েছে বেড়ে। ভাবলো দেখাই যাক না কতদূর কি হয়। আর কিছু না হোক শহর শাহজাহানাবাদ তো দেখা হয়ে যাবে।

॥ ১৬ ॥

"সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র।"

ভারতবর্ষের মানচিত্রখানার দিকে একবার ভাবনেত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো; দেখতে পাওয়া যাবে যে, এই ভৌগোলিক ভূখণ্ড দেবতাত্মা, দেখতে পাওয়া যাবে যে, মহাকাশ এখানে তাণ্ডব নৃত্যে নিরত। ঐ সুদূর উত্তরে পামীর গিরিচূড়ায় তাঁর জটার গ্রন্থি, যুগান্তের ঝঞ্ঝায় তাঁর জটাজাল ছড়িয়ে গিয়েছে দিকে দিকে; উত্তরে দুটো, পশ্চিমে দুটো আর পুব দিকে বিস্তৃত যে বৃহৎ জটাজাল, তারই নাম হিমালয় গিরিমালা। ঐ যে তাঁর বাম করে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনার ত্রিশূল আর ঐ যে দক্ষিণ করে পঞ্চসিন্ধুর গর্জনে তাঁর ডমরুর গরগর ধ্বনি। তাঁর এক চরণ দাক্ষিণাত্যে প্রসারিত, অপর চরণ বঙ্গোপসাগরের পূর্বোপকূলে। আর তাঁর কণ্ঠে দোদুল্যমান স্ফটিকের মাল্যনিচয়, গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, গণ্ডক, কুশী। ঐ ত্থাখো তাঁর কটিবন্ধে বিন্ধ্য গিরিমালার বন্ধনী। যুগনৃত্যে নিরত মহাকালের মূর্তি একবার নিরীক্ষণ করো, মৃন্ময়ের চিন্ময়ীকরণ হোক।

মহাকালের পদক্ষেপে রচিত ভারতের ইতিহাস, ছন্দের পরিবর্তনে ইতিহাসের নবাধ্যায়ের সূচনা। ঐ মহাছন্দের তালে তালে কত জাতির উত্থান এই দেশে, তালভঙ্গের ত্রুটিতে কত জাতির বিলয় এই দেশে; এ দেশের ইতিহাস ঐ তাল রক্ষার ইতিহাস, এ দেশের অধঃপতন ঐ তালভঙ্গের অপরাধ।

যুগান্তের প্রান্তে যখন তিনি ধ্যানাসনে বসেন, তখন বিন্ধ্য হিমাদ্রি আরাবলী সহ্যাদ্রি মৌন অটল গম্ভীর; গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা নিস্তরঙ্গ; ইতিহাসের জলতল সুপ্ত শান্ত স্তিমিত। সকলে পরম নিশ্চিন্ত।

এমন সময়ে আরম্ভ হয় তাঁর যুগাবসানের তাণ্ডব, অমনি দিকে দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত—হায় হায় হাহাকার, রক্ষা করো, দেব রক্ষা করো। তখন কাশী কাঞ্চী কৌশাম্বী পাটলিপুত্র অযোধ্যা মথুরা ইন্দ্রপ্রস্থ বিদিশা মগধ উজ্জয়িনী সর্বত্র সমুদ্র-মন্থনের আলোড়ন। ভূমিকম্পে দোলায়িত সপ্ত দিল্লি চঞ্চল অস্থির। তখন তাঁর বিভূতি-ভস্মে আকাশ আচ্ছন্ন, জটাজালে মুহুর্মুহু কম্পন, বিষাণের গর্জনে পুষ্করমেঘ লজ্জিত, আর পিনাকের টঙ্কারে পাতালনিবাসী বাসুকির ফণা স্খলিত।

পৃথিবীর পাষাণে আহত প্রহত সমুদ্রকল্লোলের দোসর আর্ত ইতিহাসের কণ্ঠে অসহায় হা হা ধ্বনি। গেল গেল, সব গেল। কিছুই যায় নি। এ কেবল কালনাগিণীর নির্মোক উন্মোচনের পালা। তখন ঐতিহ্যের কোন্ নিগূঢ় কন্দর অভয়বাণী নিক্ষেপ করে—মাভৈঃ! কিছু যায় নি, ভয় নেই, ভয় নেই। মহা-কাল স্থির আছেন।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

।। প্রথম ভাগ সমাপ্ত ।।

লালকেল্লা

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম খণ্ড

॥ ১ ॥

ক্ষীর চমচম মালাইকারি

কাবুল দরবাজা দিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়লো জীবনলাল। কিন্তু যার জন্যে ঢুকলো সেই রুমালী কোথায়? একবার ভাবলো রুমালী আসতে পেরেছে তো। যে খণ্ড-যুদ্ধ হয়ে গেল, অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হ'লে বা শহরের বাইরে থাকতে বাধ্য হ'লে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তখনি মনে পড়লো রুমালীর চতুর গতিবিধি। এমন খণ্ড-যুদ্ধের মধ্যে তাকে কয়েকবারই দেখেছে, ভীত হয়েছে বা পথ হারিয়েছে মনে হয় নি, এবারেই বা হবে কেন? তখনি আবার একটা সন্দেহের শলা মনের মধ্যে খোঁচা মারলো। রুমালী তো শত্রুপক্ষের চর নয়? ভুলিয়ে ভালিয়ে শত্রুপুরীতে এনে ফেলবার জন্যেই এই কাহিনীর জাল বিস্তার করে নি তো! মনের একটা অংশ প্রশ্ন করতেই আর একটা অংশ হেসে ওঠে। জীবনলাল মস্ত একটা লোক কিনা! তাকে ধরে আনবার জন্যেই এমন কৌশল-জাল বিস্তার। তখনি আবার মনের সন্দেহকারী অংশ কানে কানে ফিসফিস করে বলে, না, এ ফাঁদ পাতা হয়েছিল কোম্পানীর সেনাপতিদের জন্যেই, ফাঁদে পড়তে পড়লো রেসালাদার জীবনলাল। ঈগলের বদলে বাদুড়। বাদুড় পাখীও বটে, জন্তুও বটে, দুই পক্ষেরই।

কিন্তু এমনভাবে মনের মধ্যে কথা কাটাকাটি করবার আর শক্তি ছিল না তার। ক্ষুধা আর তৃষ্ণা দুই-ই চেপে ধরেছে তাকে, তার উপরে ক্লান্তি! জলপানে অবশ্য বাধা ছিল না, সামনেই যমুনার খাল, সেটাও ঢুকেছে জীবনলালের মতোই কাবুল দরবাজা দিয়ে। কিন্তু সে জলপানে তার রুচি হ'ল না. প্রাচীরের বাইরে ঐ খালের মধ্যেই পড়েছিল তার ঘোড়াটা। এমন সময়ে দেখতে পেলো একটা ইঁদারা থেকে একটি মেয়ে জল তুলছে। সে কাছে গিয়ে জানালো, বহিন, বহুৎ তিয়াস।

মেয়েটি একটু হেসে লোটা ক'রে তার হাতে জল ঢেলে দিতে দিতে বলল, তিয়াস সিরিফ পানিসে মিটেঙ্গী জী? আকণ্ঠ সেই শীতল জল পান করতেই সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল জীবনের। জলপান শেষ হ'লে মেয়েটি শুধালো, রাহী

আদমি ?

জীবন সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে জানালো যে, হাঁ, সে পথিক। তবে আর বেশি আলাপের মধ্যে গেল না, প্রকৃত পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ। জীবন এগিয়ে চলল। কিন্তু এদিকে তৃষ্ণা নিবারণ হ'তেই ক্ষুধা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। পাশেই এক হালুইকরের দোকানে পুরী ভাজা চলছিল, জীবন ভাবলো, ওখানে বসে আগে খেয়ে নেওয়া যাক, তারপরে রুমালীর খোঁজ করলেই হবে।

দোকানের ভিতরে ঢুকে পকেটে হাত দিয়ে চমকে উঠল—পকেট খালি। বুঝলো লড়াইয়ের ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে টাকার থলিটা পড়ে গিয়েছে। তখনি বেরিয়ে পড়লো দোকান থেকে, ভাবলো আজ আর কপালে খাদ্য নেই, জল আর হাওয়ার উপরেই নির্ভর করতে হবে রুমালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া অবধি।

একটা মহানিম গাছের তলায় খানিকটা জায়গা উঁচু ক'রে বেদীর মতো বাঁধানো ছিল, সেখানে গিয়ে বসলো জীবন—আর অতঃপর কি করবে ভাবতে চেষ্টা করলো। রুমালীর সন্ধান করবে, না ফিরে যাবে। রুমালীর সন্ধান পাওয়া কঠিন, কিন্তু তারো চেয়ে কঠিন শূন্য হাতে ফিরে যাওয়া। এমন সময়ে সে দেখতে পেলো অদূরে দক্ষিণ দিক থেকে একদল লোক আসছে, অদ্ভুত তাদের পোশাক। কারো পরনে পায়জামা, কারো ধুতি, কারো গায়ে পিরান আছে, কারো নেই, মাথায় বিচিত্রদর্শন টুপি আর পাগড়ী, আর হাতে ঢোল, করতাল, বাঁশী, নানা জাতের বাদ্যযন্ত্র। হোলির সময়ে যেমন সঙ দেখা যায় অনেকটা তেমনি। কিন্তু এখন তো হোলি নয়, কোন পরবও চলছে না। জীবন ভাবতে লাগলো এঁরা কারা। দলটি কাছে এসে পড়লে দেখলো সকলেরই বয়স দশ বারো থেকে ষোল-সতেরোর মধ্যে—সকলেই কিশোর। তার ভারি কৌতূহল বোধ হ'ল, ইচ্ছা হ'ল একবার ডেকে শুধোয় তারা কারা, কেন এমনভাবে বের হয়েছে। কিন্তু সে জিজ্ঞাসা করবার আগেই দলের অগ্রণী ছোকরাটি, তার বয়সটাই বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশি, এগিয়ে এসে শুধালো, তুমি এমন একা বসে আছ কেন ?

জীবন বলল, ভাই, আমি বেগানা আদমি।

ছেলেটি বলল, বহুৎ আচ্ছা, তবে আর বসে কেন ? আমাদের দলে ভিড়ে পড়ো।

তার সরল ব্যবহারে ভারি কৌতুক বোধ করল জীবন, বলল, ভিড়ে তো পড়বো তবে আগে শুনি তোমরা কিসের দল।

ছেলেটি একগাল হেসে বলল, তুমি বুঝি শহর শাহ্‌জাহানাবাদের লোক নও

কি ক'রে বুঝলে, বলে জীবন।

নইলে মহাবীর পল্টনের নাম নিশ্চয় জানতে।

মহাবীর পল্টন কারা?

কেন, এই আমরা।

তুমি বুঝি মহাবীর?

ছেলেটি নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, ইয়ার, তুমি কিছুই জানো না দেখছি। আমি কেন মহাবীর হ'তে যাবো।

তবে মহাবীর কে?

ছেলেটি এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ মহানিম গাছটার উঁচু এক ডালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলে—ঐ দ্যাখো মহাবীরজী।

জীবন দেখতে পায় মস্ত একটা মানুষ, বলে, ওটা তো হনুমান।

ছেলেটি বলে, যে হনুমানজী সে-ই মহাবীরজী, যো আত্মা সো পরমাৎমা।

জীবন বলে, মহাবীর তো বুঝলাম, আর পল্টন?

ছেলেটি সগর্বে বলে, আমি পল্টন।

তুমি একাই পল্টন। তবে ওরা কারা?

আরে ইয়ার, আমি একা থাকি কিম্বা দলবল নিয়ে থাকি আমি সর্বদাই পল্টন, কারণ ওটাই আমার নাম।

চমৎকার। তা মহাবীর পল্টন করে কি, লড়াই করে নাকি?

তুমি কিছুই জানো না দেখছি। মহাবীর লড়বে কার সঙ্গে? একবার রামজীর হয়ে রাবণের সঙ্গে লড়াই করেছিল, তেমন বীর আর একালে কোথায়?

ছেলেটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে চমৎকৃত হয় জীবন। শুধোয়, তাহলে মহাবীর পল্টন এখন করে কি?

মহাবীরজী যা করে মহাবীর পল্টনও তাই করে।

মহাবীর তো সেকালে রামচন্দ্র হয়ে লড়াই করেছিল বলে এখন পেনশন ভোগ করছে, এর ওর জিনিস কেড়ে খায়।

ছেলেটি হঠাৎ জীবনের পিট চাপড়িয়ে দিয়ে বলে, বাহবা ইয়ার, বাহবা। ঠিক সমঝা। মহাবীর পল্টনও ঐ কাজ করে।

জীবনের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, সিপাহীদের মতো।

আরে ঐ গাঁওয়ার আদমিরা সঙিনার খোঁচা মেরে কেড়ে খায়।

আর তোমরা?

জানতে চাও? এই বলে সে ঢোলকে চাঁটি মেরে দলবলের উদ্দেশে বলে

উঠল—ভাইসব, একবার এই রাহী আদমিকে দেখিয়ে দাও তো মহাবীর পল্টন কিভাবে কেড়ে খায়।

তখন একযোগে ঢোল করতাল ভেঁপু বেজে উঠল, আর পল্টনকে অনুসরণ ক'রে সবাই গান ধরলো—

ক্ষীর চমচম মালাইকারি
যার দোকানে যা পাই কাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই কিশোর বাহিনীর উদ্দাম নৃত্য।

কিছুক্ষণ পরে গান থামলে পল্টন শুধালো, এবারে তো দেখলে আমরা কি ভাবে কেড়ে খাই।

তারপরে তার পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে বলে, বেরাদার, সঙিনের গুঁতোয় লোক পালায় আর আমাদের গান শুনে ভিড় জমে যায়।

চমৎকার, বলে ওঠে জীবন, তা এমন সুন্দর গানটা বাঁধলো কে? মহাবীরজী তো গান বাঁধতো না।

মহাবীরজী বাঁধতে যাবে কেন? এ গান বেঁধে দিয়েছে সরাব মিঞা।

সরাব মিঞা, বেড়ে নাম তো, লোকটা বুঝি খুব সরাব খায়।

আরে ইয়ার, এই শহর শহ্‌জাহানাবাদে সরাব কে না খায়? কিন্তু এমন গান বাঁধতে পারে কয়জনে?

তারপরে হঠাৎ জীবনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, মুখ শুকনো কেন? খাওয়া হয় নি বুঝি?

জীবন বলে, আমি তো মহাবীর পল্টন নই যে গান শুনলে দোকানী খেতে দেবে।

পয়সা দিয়ে কিনে খেতে বাধা কি?

জীবন স্বীকারোক্তি করে, টাকাপয়সা সব খোয়া গিয়েছে।

এবারে পল্টন আপন মনে যুক্তির মালা গাঁথে, বলে, রাহী আদমি, পথে আসতে রাহাজানি ক'রে সব কেড়ে নিয়েছে। কেমন?

ঠিক ধরেছ ভাই।

সিপাহী না গাঁওয়ার আদমি?

কেমন ক'রে বুঝবো বলো! পোশাক পরলেই সিপাহী, পোশাক ছাড়লেই গাঁওয়ার।

তা বটে। সব শালা ডাকু এখন সিপাহী বনে গিয়েছে। তা কোত্থেকে আসছ?

আত্মপরিচয় গোপন করবার উদ্দেশ্যে জীবন বলল, ঝাঁসি থেকে?

এখন শাহ্‌জাহানাবাদে গদর (অশান্তি) চলেছে। এখানে আসতে গেলে কেন?

গদর চলেছে বলেই তো এলাম। এখানে আমার এক বহিন থাকে, তারই খোঁজ নেবার জন্মে এসেছি।

কি তোমার বহিনের নাম, শুনি?

ভাই আমার বহিন তো বড়লোক নয়, তার নাম বললে কি তোমরা চিনতে পারবে?

ভাই, তবে তুমি মহাবীর পল্টনকে চিনতে পারো নি। এ শহরে কার ঘরে কোন্ দিন কি রসুই হয় তা পর্যন্ত জানে মহাবীর পল্টন।

তারপরে সে নিজের দলের দিকে তাকিয়ে বলল, লোকটা বলে কি রে! আমরা কার খোঁজ না জানি? ইমানী বেগম থেকে শুরু ক'রে উমরা বেগম, খুরশিদ জান, তুলসীবাঈ, রুমালী বহিন কাকে না জানি? আর রাস্তা থেকে সেই আধমরা কিরিঙ্গি মেয়েটাকে তুলে এনে রুমালী দিদির জিম্মা ক'রে দিয়েছিল কে? আমরা কি না জানি? কাকে না জানি?

জীবন বলে ওঠে, রুমালীকে জানো নাকি?

শোন কথা একবার! রুমালী যে আমাদের দিদি হয়।

তোমাদের দিদি হয়! রুমালী যে আমার বহিন!

উল্লাসের সঙ্গে, বিস্ময়ের সঙ্গে পল্টন বলে ওঠে, তা এতক্ষণে বলো নি কেন ইয়ার।

কেমন ক'রে জানবো যে তোমরা রুমালীকে চেনো।

চিনি বলে চিনি! রুমালী যে আমাদের দিদি।

কিঞ্চিৎ বিস্ময়ে বলে ওঠে, তোমাদের সকলেরই দিদি! বলো কি!

ক্ষতি কি? রুমালী যে আমাদের কহানা (পাতানো) দিদি!

তাই বলো, আপন দিদি নয়!

পল্টন বলে, আপন দিদির চেয়ে কহানা দিদির ঝাঁজ বেশি। হাতের চেয়ে হাতুড়ির আঘাতে জোর অনেক বেশি।

তারপরে দলবলের দিকে তাকিয়ে বলে, ওরে, এই সাহেব রুমালী দিদির ভাই।

এতক্ষণ সবাই উদাসীন ছিল, এবারে সকলে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখে নেয় জীবনকে।

তখন পল্টন বলে, ওকে দেখলে কি ওর পেট ভরবে? সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি; আর একবার গনটা ধরো।

অমনি আবার ঢোল করতাল বেজে উঠে গান শুরু হয়—

ক্ষীর চমচম মালাইকারি

যার দোকানে যা পাই কাড়ি।

পল্টন বলে, ওঠো দাদা।

কোথায় যেতে হবে ভাই ?

চলোই না।

মহাবীর পল্টনের পিছু পিছু জীবন চলতে থাকে। কিছুক্ষণ চলবার পরে বেগমাবাগের পশ্চিমে এক গলির মধ্যে এক হালুইকরের দোকানে সকলে থামে।

পল্টন ডাকে, এ ঘণ্টেওয়ালা ভাই, এ ভাই ঘণ্টেওয়ালা—

কি পল্টন সাহেব, খবর কি ? বলে বেরিয়ে আসে মস্ত একজোড়া গোঁফওয়ালা আধবুড়ো একটা লোক।

পল্টন বলে, ঘণ্টেওয়ালা ভাই, এই সাহেব আমাদের দোস্ত্, একে পেট ভরে খাইয়ে দাও তো।

হালুইকর সসম্ভ্রমে জীবনকে বলে, আসুন সাহেব, ভিতরে আসুন।

জীবন পল্টনের উদ্দেশ্যে বলে, কি, দাম দেবে তো ? না জুলুম ক'রে আদায় করবে ?

তোমার তাতে দরকার কি সাহেব, ভুখ পেয়েছে খেয়ে নাও। তোমাকে না খাইয়ে নিয়ে গেল রুমালী দিদি বকে ভূত ছাড়িয়ে দেবে।

জীবন দেখে তর্ক বৃথা, তা ছাড়া খিদেটাও জোর পেয়েছে। হালুইকরকে অনুসরণ ক'রে সে দোকানে ঢুকে পড়ে। বাইরে চলতে থাকে গান, ক্ষীর চমচম মালাইকারি।

জীবনকে একখানা জলচৌকির উপরে বসিয়ে এক লোটা জল রেখে হালুইকর বলে, সাহেব হাতমুখ ধুয়ে নিন।

তার হাতমুখ ধোয়া হ'লে শালপাতায় বরফি, পেড়া, কলাকন্দ, সমোসা প্রভৃতি অনেক রকমে খাবার সাজিয়ে বলে, সাহেব পেট ভরে খেয়ে নিন।

খেতে খেতে জীবন বলে, লালাজী, এ যে জুলুম হচ্ছে।

হালুইকর বলে, কিছু না। ঐ মহাবীর পল্টন না থাকলে আমাদের ব্যবসা বন্ধ ক'রে জয়পুরের দিকে ফিরে যেতে হ'ত।

তারপরে ব্যাখ্যাচ্ছলে বলে, জয়পুরে আমার ঘর।

জয়পুর ? শুধোয় জীবন।

হাঁ সাহেব, খাস জয়পুর শহরে।

তা ব্যবসা বন্ধ করতে হ'ত কেন ?

ঐ শালা সিপাহী লোকদের জন্তে। যখন-তখন এসে হামলা করে, কখনো বলে বাদশার হুকুম, কখনো বলে বখৎ খাঁর হুকুম, কখনো বলে ঘউস মহম্মদ খাঁর হুকুম।

বাদশা তো বুঝলাম, ও দু'জন আবার কে ?

এখানে দুদিন থাকুন সব বুঝবেন। যা বলছিলাম, মহাবীর পল্টন আমাদের রক্ষা করে, সিপাহী এলে তাড়িয়ে দেয়।

মারপিট করে নাকি ?

বাপ রে বাপ, মারপিট হ'লে চলবে কেন ?

তবে ?

তবে আর কি ? এমন বাজানা বাজায় আর গান ধরে যে, সিপাহী লোক সহ্য করতে না পেরে পালায়, বলে ইয়া আল্লা, এর চেয়ে কামানের আওয়াজ অনেক মিষ্টি।

জীবন হেসে ওঠে, হালুইকরও হাসে। জীবন লক্ষ্য করে যে, হাসলে তার বাঁ গালের বড় আঁচিলটা বেদম নাচতে থাকে। ভাবে, তার চুলের আর গোঁফের রঙে এমন ত্রিশ বৎসরের তফাৎ কেন ? চুল যদি হয় ষাট বছরের বুড়োর, গোঁফ জোড়া ত্রিশ বছরের যুবকের।

হালুইকর তার চোখের চাহনির অর্থ আন্দাজ ক'রে নিয়ে বলে, হাঁ সাহেব ঠিক ধরেছেন, গোঁফ জোড়া তো বয়স হ'লে উঠেছে, তাই ওর রঙটা এখনো কালো।

অপ্রস্তুত হয়ে জীবন বলে ওঠে, না, না, তা ভাবি নি।

আপনি ভাববেন কেন ? আপনি তো রইস আদমী। প্রত্যেক বেওকুফ আদমী ঐরকম ভাবে কি না। তাদের বলি, তোমার লেড়কার চুল আর তোমার চুল কি এক রঙের হবে ? তবে ? আরে সোহন সিং, আর কিছু পেড়া আর কলাকন্দ নিয়ে আয়।

না, না, সাহেব, আর দরকার নেই।

দরকার নেই বললে তো হবে না। এখনো তিন চিজ বাকি আছে, ক্ষীর চমচম আর মালাই। এ-তিন না খেলে পল্টন আমার শির আস্ত রাখবে না। ওদের গান শুনেছেন তো ?

জীবন হেসে উঠে বলে, শুনেছি বৈকি !

জীবনের আবার চোখে পড়ে হালুইকরের বাঁ গালের আঁচিলটা, এত বড়

আঁচিল অল্পই দেখা যায়।

হালুইকর সেটা লক্ষ্য ক'রে বলে ওঠে, হাঁ সাহেব, অবাক হওয়ার কথাই বটে, এত বড় মশা তমাম জয়পুর মুলুকে ছিল না।

অপ্রস্তুত জীবন বলে, না, না, সাহেব আমি তা ভাবি নি।

এবারে হালুইকর মুখ গম্ভীর ক'রে বলে, তবে তো সাহেব গোস্‌সা হবো। আমার গালের এই মশা শহর শাহ্‌জাহাবাদের এক আজব চিজ। না দেখে থাকবার উপায় কি? জয়পুরের মহারাজ সওয়াই মাধো সিং এই মশার জন্তে থাকবার আমাকে খুব পেয়ার করতেন, বলতেন, বড় হ'লে মখ্‌খন লালকে সিপাহী দলে ভর্তি ক'রে নেবো। আর দেখুন সাহেব, কি হাল, কোথায় সিপাহী হয়ে গোলি ছুঁড়বো, না, হালুইকর হয়ে ক্ষীরের গোলি পাকাচ্ছি! গোবিন্দ্‌জীর কি ইচ্ছা।

জীবন বলে, দুঃখ করবেন না, আপনার তো মস্ত ব্যবসা।

হাঁ, মস্ত বৈকি। লোকে বলে মুখ্‌খন লাল-এর পেড়া আর মশার মধ্যে কোন্‌টা বড় ঠিক করা সহজ নয়।

প্রসঙ্গ বদলাবার উদ্দেশ্যে জীবন বলে, অনেক দিনের দোকান আপনাদের।

হাঁ, অনেক দিনের বৈকি। বাদশা শাহ-আলমের আমলের দোকান। এই ঘণ্টেওয়ালার দোকানে মিঠাই কে না খেয়েছে? মহারাজ মাধোজী সিন্ধিয়া থেকে শুরু ক'রে সুবেদার বখৎ খাঁ—সবভি খেয়েছে ঘণ্টেওয়ালার পেড়া আউর—

জীবন বুঝলো, এবার এসে পড়বে আবার পেড়ার চেয়ে বড় আঁচিলটা, তাই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে বলল—আপনাদের এখানে লড়াই চলছে তা মনেই হয় না।

লড়াই কোথায় সাহেব, কেবল লুট আর রাহাজানি। শহর শাহ্‌জাহানাবাদে এখন রূপ আর রূপা দুই-ই বেওয়ারিশ।

বাদশা কিছু বলেন না?

এবারে কণ্ঠস্বর নামিয়ে এনে হালুইকর বলে, বাদশার তো এখন কয়েদ!

কয়েদ? চমকে ওঠে জীবনলাল।

সোনার জিঞ্জিরে বুড়ো বাজপাখির পা এখন বাঁধা।

তবে কাজ চালায় কে?

চান্দ্‌ আর সুরয!

তার মানে?

চান্দ্‌ ওঠে বলে জানি রাত হ'ল, এবারে সুরয ওঠে বলে জানি দিন হ'ল।

তবু?

মীরাটের কুলিজ খাঁ, বেরিলির বখ্‌ৎ খাঁ, আর নিমচের ঘউস মহম্মদ, এখন এরাই কর্তা।

জীবনের মনে পড়ে পান্নার মুখে বখৎ খাঁর নামটা শুনেছিল বটে, শুনেছিল যে সে দিল্লি রওনা হয়েছে। তবে সত্যসত্যই লোকটা দিল্লি এসে পৌঁচেছে দেখছি।

আর শাহ্‌জাদারা ?

তাদের বড় কেউ মানে না। তাদের না আছে ফৌজ, না আছে টাকা। কেন মানবে বলুন ?

তা বটে, মন্তব্য করে জীবন।

হাত-মুখ ধুয়ে উঠে পড়ে জীবন। হালুইকর বলে, আপনি যখন মহাবীর পল্টনের দোস্ত, তখন আমারও দোস্ত। যখন ভুখ লাগবে চলে আসবেন।

এমনভাবে কতদিন চলবে আপনার ব্যবসা, শুধোয় জীবন।

আর বেশিদিন এভাবে চালাবার দরকার হবে না। এর মধ্যেই রঙ বদলানো শুরু হয়ে গিয়েছে।

কেমন ?

অনেক সিপাহী এর মধ্যেই ভাগতে শুরু করেছে।

কেন ?

না ভাগবে কেন ? না পায় দরমাহা, না পায় খোরাক, আর একবার কোম্পানীর ফৌজ ঢুকে পড়লে মরতে মরবে তারাই।

তবে এখন আছে কারা ?

যাদের এ-পার ও-পার সমান পানি। লড়াই করলে কোম্পানীর গোলাতে মরবে, আবার পালালেও কোম্পানীর ফাঁসিকাঠে মরবে। তারাই আছে। আদি বুরা তো অন্ত্‌ বুরা। খারাপ কাজের ফলটাও খারাপ। কি বলেন, সাহেব।

নিশ্চয়, নিশ্চয় !—বলে জীবন।

কি ভাই, হ'ল ? বাইরে থেকে হাঁক দেয় পল্টন।

বাহিরে এসে দাঁড়ায় জীবনলাল।

কি, পেট ভরেছে তো ?

উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে পল্টন বলে ওঠে, ভরতেই হবে পেট, পেড়াতে যদি না ভরে ওর গালের মশার কিস্‌সাতে ভরতে হবে।

জীবন হেসে ওঠে। সেটাকে মস্ত প্রশংসা ব'লে ধরে নেয় মখ্‌খনলাল—সেও হেসে ওঠে। আর তার গালের উপরে গিরি-গোবর্ধনের মতো নাচতে থাকে আঁচিলটা।

চলো, তবে এবার পৌঁছে দিয়ে আসি তোমায় বহিনের কোঠিতে। এর পরে অন্ধকার হয়ে গেলে সিপাহীতে মারবে কি শিয়ালে কামড়াবে, ঠিক নেই।

শহরের মধ্যে শিয়াল আছে নাকি ?

সন্ধ্যা হ'লেই যমুনার চর থেকে, পাহাড়পুরের জঙ্গল থেকে দলে দলে চলে আসে। আরে ইয়ার, লড়াই তো শিয়াল-শকুনকে ভোজ যোগাবার জন্যেই।

গোটা কয়েক গলি পেরিয়ে মহাবীর পল্টনের দল, সেই সঙ্গে জীবন, চৌরাহার ধারে এসে পড়ে। এবারে সকলে ঢুকে পড়ে খুব সরু একটা গলির মধ্যে। এক জায়গায় এসে সকলে দাঁড়ায়। তারপরে খুব সরু আর খুব খাড়া সিঁড়ি বেয়ে পল্টন ওঠে, সঙ্গে নেয় জীবনকে, বাকি সকলে অপেক্ষা করে নিচে। বেশ অনেকগুলো সিঁড়ি উঠে পল্টন ও জীবন পৌঁছয় এক বন্ধ দরজার সম্মুখে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে পল্টন চিৎকার ক'রে বলে, রুমালী দিদি, বাইরে এসো, ছাখো কাকে এনেছি সঙ্গে।

॥ ২ ॥

নিশীথ চিন্তা

দরজায় শব্দ শুনে রুমালী বেরিয়ে আসতেই পল্টন ব'লে উঠল, ছাখো বহিন, কাকে নিয়ে এসেছি। তোমার ভাই বেগানার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল, দেখেই বুঝলাম যে রাহী আদমি, শুধিয়ে জানলাম যে তোমার ভাই, তাই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলাম।

পল্টনের ঐ এক স্বভাব, যা বলবে, তার নাড়ী-নক্ষত্র খুলে বলা চাই। রুমালী জানে তার এই স্বভাব। তাই থামিয়ে দিয়ে বলল, হাঁ, হাঁ, বুঝেছি, তুই খুব বুদ্ধিমান। এখন থাম তো, দাদার কুশলবার্তা আগে নি।

রুমালী ও জীবন বুঝে নিয়েছিল যে, এখন দাদা আর বহিনের ভূমিকাটা স্বীকার ক'রে নেওয়াটাই কর্তব্য।

রুমালী বলল, দাদা, হঠাৎ খবর না দিয়ে এলে যে !

জীবন বলে, আরে, সেই জন্তেই মুশকিলে পড়েছি, তুমি যে এর মধ্যে বাড়ি বদলেছ, তা কেমন ক'রে জানবো ?

বাড়ি কি আর ইচ্ছা ক'রে বদলেছি ? মা, বাবা আর ভাই গত হওয়ার পরে— সে খবর তো আগেই পেয়েছি, সিপাহীরা বাড়িটাও জবরদখল ক'রে নিল, তখন

উঠে এলাম এই বাড়িটাতে। তারপরে তোমার সব ভালো তো?

জীবন বলে, এই গদরের দিনে কার খবর ভালো?

এবারে রুমালী বলে ওঠে, আগে হাত-পা ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করো, তারপরে ধীরে-সুস্থে সব খবর নেওয়া যাবে।

সুযোগ পেয়ে পল্টন কথা কয়ে ওঠে, এতক্ষণ কথা কইবার সুযোগ খুঁজে ছট্‌ফট করছিল, দিদি, কি ভাবো তুমি পল্টনকে, তোমার দাদাকে না খাইয়ে নিয়ে এসেছি, ভাবতে পারলে! মহাবীর পল্টন আছে কি করতে?

তা কি আর জানি নে। পরের দোকানে গিয়ে হামলা করতে। কি দাদা, ক্ষীরচমচম, মালাইকারি খেয়েছ তো?

না খেয়ে উপায় কি? ঘণ্টেওয়ালা ছাড়ে না।

ঘণ্টেওয়ালার দোকানে তোমাকে বুঝি নিয়ে গিয়েছিল? তা হ'লে নিশ্চয় তার গালের মশার কাহিনীও শুনেছ?

শুনেছি বৈকি। লোকটা গল্পও যেমন করতে পারে, খাওয়াতেও পারে তেমনি। খুব খাইয়েছে। এখন বহিন তুমি একখানা চারপাই দাও, শুয়ে পড়ি, রাতে আর কিছু খাবো না।

একটু দাঁড়াও, আগে পল্টনকে বিদায় ক'রে আসি।

তখন পল্টন আর রুমালী সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়ালো, । জীবনের কাছ থেকে সামান্য দূরে। তারা চাপা গলায় কথাবার্তা বলতে লাগলো। জীবন অন্যমনস্ক ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে একটা একটা ক'রে তারা ফুটে ওঠা লক্ষ্য করছিল, এমন সময়ে তার কানে প্রবেশ করলো কয়েকটা পূর্বশ্রুত নাম, কুলিজ খাঁ, ঘউস মহম্মদ। জীবন সচেতন হয়ে ওঠে, ওরা তো বাদশার পক্ষের লোক, কিংবা ঘণ্টেওয়ালার কথা সত্য হ'লে ওরাই এখন বাদশা-পক্ষ। ওদের নাম এদের মুখে কেন? তবে কি তলে তলে যোগাযোগ আছে—তলে তলে এমন কোন সূত্র আছে যা জীবনের সম্মুখে প্রকাশযোগ্য নয়? অবশেষে জীবন কি একটা ফাঁদের মধ্যে পা দিল? রুমালী ও পল্টনের সঙ্গে তার কতক্ষণেরই বা পরিচয়, কতটুকুই বা সে জানে তাদের। কিন্তু যখনি আবার মনে পড়ে, রুমালী ও পল্টনের সরল প্রসন্ন মুখ, দুর্যোগের কুয়াশা দূর হয়ে যায়। ভাবে, তবু, শত্রুপক্ষের ঐ দুই প্রধান সেনাপতির নাম কেন এদের মুখে?

আজকের মতো চলি জীওনলালজী, সেলাম।

ইতিমধ্যে পল্টন ভাইয়ের নামটা জেনে নিয়েছে বহিনের কাছ থেকে।

পল্টনের কথায় চমকে ওঠে জীবন, সেলাম পল্টন, কাল কখন্ আসছ?

এই তো মুশকিলে ফেললে সাহেব। কালকেই যে আসবো আর আজ শেষ রাতে যে আসবো না, তা-ই বা কে বলল।

জীবন আর বেশী খোঁচায় না, পল্টনের সব কথাই রহস্যময়, সব কথাই অফুরন্ত, তাই সংক্ষেপে বলল, আচ্ছা, আজকের মতো এসো।

পল্টন চলে গেলে এবারে ভাই-বোনের বদলে জীবনলাল আর রুমালীতে কথা-বার্তা শুরু হয়। রুমালী জানায় যে, লড়াই শুরু হ'তেই সে সোজা মাঠ পেরিয়ে কাবুল দরবাজা দিয়ে শহরে চলে আসে, আর তার ধারণা হয়েছিল, জীবনলাল আজ আসতে পারবে না, কারণ ঠিকানাটাও ভালো ক'রে বলে আসা হয় নি। রুমালী জানায় যে, সে ভেবেছিল, আবার আগামীকাল গিয়ে ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে আসতে হবে জীবনকে।

জীবন বলে, লড়াইয়ের গতিক অন্যরকম হ'লে আজকে হয়তো তার আসা হ'ত না, কিন্তু তার ঘা-খাওয়া ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে এসে পড়লো কাবুল দরবাজার কাছে, তখন ফিরে যেতে গেলেই কোম্পানীর সৈন্য বলে বুঝতে পেরে মেরে ফেলতো শাহী ফৌজে। তাই ধীরেসুস্থে সে ঢুকে পড়লো শহরে, যেন সে শাহী সিপাহী। তারপরে সে জানায়, রুমালী, আর তো পারছি না, একখানা চারপাই দাও, শুয়ে পড়ি।

রুমালী বলে, ভিতরে চলো। তুমি সম্মুখের এই ঘরটায় শোও, পিছনের ঐ ঘরটায় আমরা তিনজনে থাকি।

তিনজন আবার এলো কোত্থেকে? কথাটা বলে ফেলেই ভুল বুঝতে পারে জীবন। বলে, ওঃ, তুমি, মিস এলবিয়ন আর তুলসীবাঈ।

শেষের নামটা বলল কে?

কেন, তোমার পল্টন ভাই।

তারপরে বলে, ও আরো অনেক নাম শুনিয়েছে, খুরশিদ জান, উমরা বেগম, ইমানী বেগম, নবাব মিঞা, এমন কত কি!

অনেক ইতিহাস বলেছে দেখছি।

ইতিহাস এবং ভূগোল। শহরের অনেক গলি-ঘুঁজিরও বর্ণনা করেছে। যাই বলো রুমালী, পল্টন একাই নবরত্নের পল্টন।

দুজনে যখন এইসব কথা চলছিল, এমন সময়ে হঠাৎ ভিতরের ঘরের দরজা খুলে প্রবেশ করলো তুলসী। ঘরে তখনো আলো জ্বালা হয় নি, তাই সে দেখতে পেলো না দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে। তবে তার ধারণা হয়েছিল, পল্টন ছাড়া আর কেউ নয়, পল্টন ছাড়া আর কেউ আসতো না এখানে।

তুলসী বলল, বহিন, আমি কি লুটের মাল ? যার যখন খুশী লেঠেল নিয়ে এসে লুটে যাবে ? একবার লুটে নিয়ে গেল সিপাহীরা এসে লালবেল্লায়। কোন রকমে ছাড়া পেয়ে এলাম যদি-বা ইমানী বেগমের কুঠিতে, বাদশা তাঞ্জাম পাঠিয়ে দিলেন বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে, পথের মধ্যে আবার লুট হলাম। তখন কোন রকমে পালিয়ে চলে এলাম তোমার কুঠিতে। সন্দেহ হচ্ছে আবার লুটের ষড়যন্ত্র চলছে। কতবার সামলাবে আমাকে ! এরকমভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে আর তো থাকতে পারি নে।

তুলসীর কণ্ঠস্বরে ক্রোধ, ক্ষোভ, বিরক্তি।

রুমালী শান্তভাবে বলল, বহিন, সব কথাই যদি জানো, তবে কার দোষ দিচ্ছ ?

দোষ দি'চ্ছি আমার অদৃষ্টের, আর তোমার অদৃষ্টের।

আমার অদৃষ্টকে বৃথা কেন দুষছো ?

বৃথা কেন ? আমাকে সামলে সামলে বেড়াচ্ছ ? এলবিয়ন বিবিই কি যথেষ্ট নয় ? তার উপরে আবার আমার দায় ঘাড়ে নিয়েছ কেন ?

তা বেশ তো, এখন কি করতে চাও শুনি ?

বাবার কাছে চলে যাবো।

বাবার কাছে যাবে, বলে রুমালী। তারপরে বলে, মনে নেই তিনি এসে নিজমুখে নিষেধ ক'রে গিয়েছেন।

তুলসী বলে, বাবার কাছে যাবো তার আবার নিষেধ কি ? গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তখন রুমালী বলে, কার সঙ্গে যাবে শুনি ?

কেন, ঐ তো পল্টন বসে আছে। ওর সঙ্গেই যাবো।

রুমালী বলল, ও পল্টন নয়, আমার ভাই জীবনলালজী।

রুমালীর নাটকীয় উক্তিতে ক্ষণকালের জন্য তুলসী পাষাণ-পুত্তলীর মতো স্থাণু হয়ে গেল। তারপরে কণ্ঠস্বরের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে বলল, আগে বলো নি কেন ?

বলবার আর সময় দিলে কই, তুলসী।

অভিযোগটা ষোল আনা সত্য। তাই উল্টে অভিযোগ করলো তুলসী, ঘরে আলো জালো নি কেন ?

বেশ তো এবারে আলো জালছি—দেখে নাও আমার ভাইকে।

রুমালীর পিছু পিছু লজ্জিত তুলসী প্রস্থান করলো।

রুমালী শেজের বাতি হাতে ঘরে ফিরে এলো।

জীবন শুধালো, কে এই মেয়েটি?

ব্রিজম্যান সাহেবের কাছে বলেছিলাম দুটি মেয়ের ভার আমার উপরে, একজন এলবিয়ন বিবি, আর এই তুলসী—যাকে এখনি দেখলে।

দেখলাম আর কই, গলার আওয়াজে বীণা বাজিয়ে গেল।

তা কোন্ রাগ বাজলো বীণায়? বেহাগ বা মুলতান নিশ্চয় নয়।

নিশ্চয়ই নয়, বাজলো নিদারুণ রাগ।

তবে বীণা-বাজিয়েকে না-হয় দ্যাখো একবার, মনে খেদ রাখবার কারণ আর থাকে কেন?

না, না, এখন থাক।

রুমালী শুনলো না, বলল, একটু বসো নিয়ে আসি।

তুলসী এলো। গোড়ায় ভেবেছিল যাবে না, কিন্তু তারপরেই তার মনে হ'ল, এখন না গেলে ঐ লজ্জাটাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া হবে। এই দু'মাসে এত উৎপাত, এত অত্যাচার, এত লোকের দৃষ্টিনিক্ষেপ তার উপরে হয়েছে—তাতে লজ্জা পায় নি; আর ওই নিরীহ পুরুষটির, তাতে আবার রুমালীর ভাইয়ের—উপস্থিতিতে লজ্জা পাওয়ায় নিজেই সে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। লজ্জা রমণীর ভূষণ নয়, অস্তিত্ব। ভূষণ হ'লে টানাটানিতে খসে পড়ে যেতো, অস্তিত্ব বলেই সত্তার সঙ্গে আটকে থাকে।

লজ্জাটাকে সমূলে অস্বীকার করবে পণ ক'রে সে প্রবেশ করেছিল। তাই ঢুকেই স্বাভাবিকভাবে বলল, আপনি পৌঁছে দিতে পারবেন আমাকে বাড়িতে?

জীবন উত্তর দেওয়ার আগেই রুমালী উত্তর দিল—জীবনলালজীর পথঘাট চেনা নেই, কি ক'রে পৌঁছে দেবেন?

পথঘাট আমি চিনি, বলে তুলসী।

সঙ্গে সঙ্গে রুমালী বলে ওঠে, আর পথেঘাটে তোমাকেও চেনে। বাড়ি বয়ে এসে আর লুট করতে হবে না।

আর কোন উত্তর না ভেবে পেয়ে তুলসী বলল, পুরুষের মতো কাপড় পরে নেবো।

জীবনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—মনে হবে ঠিক যেন পুরুষবেশী চিত্রাঙ্গদা।

তুলসীর অর্ধসমাপ্ত হাসি থামিয়ে দিয়ে রুমালী বলে উঠল—হাঁ, অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদা।

কেন জানি না, এই লঘু পরিহাসের আঘাতে তুলসী বড় বিব্রত বোধ করলো।

ফুলের আঘাতেই তো প্রাণ হারিয়েছিল ইন্দুমতী।

এই পর্ব থামিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রুমালী বলে উঠল, কে কার সঙ্গে যাবে পরে স্থির করলেই হবে, এখন ওকে ঘুমাতে দাও, তুলসী। জীবনের বড় ধকল গিয়েছে সারাদিন।

এই বলে একরকম জোর ক'রে প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিয়ে তুলসীকে নিয়ে রুমালী ভিতরে চলে গেল।

সে-রাত্রে ঘুম আসে না রুমালীর, ঘুম আসে না তুলসীর, ঘুম আসে না জীবনলালের।.

রুমালীর ভালো লাগে না তুলসী আর জীবনের মধ্যে কথোপকথনের ভাবটা। অর্থাৎ কথোপকথনটা নয়, তার ভাবটা। কথাগুলো নিতান্তই লঘু আর নির্দোষ, কিন্তু তার ভাবটা কেমন যেন। সেগুলো যেন হৃদয়ের তপ্ত বালুখোলায় ভাজা, সেই জন্যেই লঘু, নির্দোষ খই-এর মতো। সে ভাবে, হোক হাল্কা, হোক নির্দোষ, তবু ওরা পেয়েছে হৃদয়ের তাপের স্পর্শ, নইলে এমনভাবে অনায়াস উচ্ছ্বাসে ফুটে উঠতে পারতো কি! এই স্বল্লায়ত জীবনে অনেক রকম কথা সে শুনেছে বলেওছে অনেক রকম কথা। তাদের অনেকগুলোই শিষ্ট সমাজে উচ্চার্য নয়। দেহ সম্বন্ধেও তার কোন সংস্কার নেই, হয়তো কোন সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নি, এই তো কয়েক ঘণ্টা আগেই অনেকগুলো অপরিচিত পুরুষের কাছে জানু অনাবৃত ক'রে দেখিয়েছিল, স্বীকার করেছিল, সুখের জন্তই সে গিয়ে থাকে লালকেল্লায় শাহ্‌জাদাদের মহলে। সমস্তই সত্য। কিন্তু এই যে হৃদয়ের তাপ, যুবক-যুবতীর মধ্যে অনির্বচনীয় বৈদ্যুৎ বিনিময়—এ তার কাছে নূতন। আর নূতন বলেই অস্বস্তিকর, সে যেন এই মুহূর্তে প্রথম বুঝতে পারলো তুলসী ও জীবন আর-এক স্তরের মানুষ, সে নিজে যে পাঁকের মধ্যে আছে সেই পাঁকের পঙ্কজ ওরা। পঙ্কজ রস সংগ্রহ করে পাঁক থেকেই, তবু সে থাকে অনেক উঁচুতে, যেখানে আলো আর বাতাসের অশরীরী লীলা। ওদের উপরে যে তার রাগ হ'ল তা নয়, নিজের উপরেই কেমন জন্মালো ধিক্কারের ভাব। অনেক রহস্যই তবে তার অজ্ঞাত। কি আশ্চর্য! তুলসীকে ভাবতো ছেলেমানুষ, জীবনকে ভাবত নাবালক, কিন্তু এখন দেখতে পেলো, সে-ও কম নাবালিকা নয়। দেহের তাপের কথা সে জানে, তাতে পুড়ে মরে নি, সুবর্ণ বলেই অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু হৃদয়ের তাপ! যাতে ভাব ভাষা পায়, ভাষা ছন্দ পায়, ছন্দ পাখা মেলে দেয় আকাশের চন্দ্র-সূর্যের দিকে! এ কি নূতন, এ কি বিস্ময়!

না-ঘুমানো রাত বিচিত্র শব্দের ফাঁদ পেতে নিদ্রাহরণ করে মানুষের। রূমালীর কানে আসে ভারী জুতোর গটগট আওয়াজ, পাথরে লাঠি ঠুকবার খটখট শব্দ, ভাসমান প্রহরের ভারী বজরা যেন ক্ষণে ক্ষণে পাথরে ঠেকে গিয়ে আওয়াজ তুলছে। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? নিশ্চয় ঘুমিয়েছিল, নইলে স্বপ্ন দেখলো কি ক'রে? স্বপ্ন তাতে আর সন্দেহ কী। দেখলো কৃষ্ণের কাছে রাধা মিনতি ক'রে গাইছে—

পাঁব লাগে করযোড়ি শ্যাম
মুছে ন খেল হোরি।

কৃষ্ণ মিনতি মানছে না, রঙভরা পিচকারি তুলে ধরেছে রাধার দিকে।

তখনি সে-ছবি মিলিয়ে গেল, মেঘে যেমন মিলিয়ে যায়। তখনি আবার নূতন ছবি জেগে উঠল মেঘে, যেমন নূতন মূর্তি জাগে।

বিরহী অর্জুন অন্তরায়িত চিত্রাঙ্গদার উদ্দেশ্যে গাইছে—

করি উজর সিঙার
তু চললু রে বাজার,
তেরি কাজর নয়না
ছাতি তোড়ত হাজার।

পরক্ষণেই কোথায় অর্জুন, কোথায় চিত্রাঙ্গদা, সম্মুখে দাঁড়িয়ে তুলসী আর জীবন।

রূমালী ভাবে, আজ তার এ কি হ'ল। কত নরনারীর লীলাই তো সে দেখেছে, তবে আজ এমন হচ্ছে কেন? স্বপ্নের লীলাতে আজ তার মন বিকল হয়ে যায় কেন। কিশোরী জননী যেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সদ্যোজাত শিশুর দিকে, তেমনি তার অসহায় রহস্য-বিপন্ন অবস্থা!

পথের গটগট খটখট, ও-সব যেন বাস্তবের তাল ঠুকবার আওয়াজ। রূঢ় বাস্তব তাল ঠুকে মল্লযুদ্ধের আহ্বান করছে স্বপ্নকে আর স্বপ্নের সহচর রূমালীর ঐ মনোভাবকে। কিন্তু ঐ তাল ঠোকাই সার। বাস্তবের সাধ্য কি আজ স্বপ্ন সহচরের সঙ্গে পেরে ওঠে। অসহায় রূমালী আত্মসমর্পণ করে স্বপ্ন আর তার সহচরের কাছে। সে পাশ ফিরে শোয়।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায় জীবনলালের, আর ঘুম আসে না। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা আনন্দের আভা, অস্পষ্ট অথচ একান্ত সত্য। শরতের সন্ধ্যাকাশে সূর্য মেঘের তলে চাপা পড়েছে, চোখে দেখা যাচ্ছে না, অথচ অজস্র কিরণ প্লাবনে তার সহস্র প্রমাণ। তেমনি আনন্দের আভা জীবনের মনের মধ্যে অথচ আনন্দের কারণটা স্পষ্ট নয়। অজানা পথে চলতে

চলতে অচেনা গন্ধ চমকে দিয়ে সুখোন্মাদের সৃষ্টি করে, কিন্তু মনে বুঝতে পারে না, কিসের গন্ধ, বনান্তের ফুলের, না জন্মান্তের চুলের। মনটা শুধু চমকে উঠে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকে। মনের এত সূক্ষ্ম গতিবিধি তার অপরিচিত। নূতন দেশে বিভ্রান্ত পথিকের মতো যখন সে দাঁড়িয়ে আছে, তখন নিশীথের কোন্ প্রহরান্ত ঘোষণা ক'রে শিবাধ্বনি ওঠে। প্রথমে বাড়ির কাছে যেন ঐ রাস্তার উপরে, তারপরে বুঝি ঘণ্টেওয়ালার দোকানের কাছে, ক্রমেই তরঙ্গ-বলয় বৃহত্তর বৃত্ত রচনা ক'রে ছড়িয়ে পড়ে দূরে-দূরান্তরে—তার চেয়েও দূরে। এত দূরের ডাকও নাকি শোনা যায়। উত্তরে টিমারপুর ছাড়িয়ে, মেটকাফ সাহেবের কুঠি ছাড়িয়ে, কুস্তিতলাও, মল্লিকপুর ছাড়িয়ে আরও কতদূরে! তরঙ্গবলয় কোন্খান থেকে কোথায় গিয়ে পৌঁছল, অনুমান করতে চেষ্টা পায়। এতক্ষণে বুঝি তরঙ্গবলয়ের পশ্চিমপ্রান্ত স্পর্শ করেছে কোম্পানীর ছাউনি, ব্রিজম্যান, গুরুবচন সিং, স্বরূপরাম, ক্যানিবাল। আর দক্ষিণ দিকের বৃত্তাংশ পাহাড়পুর, পাহাড়গঞ্জ ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে হুমায়ুন শার কবর হয়ে কুতুব-মিনারের দিকে। জীবনের হঠাৎ মনে হ'ল, এ তো শিবাধ্বনি নয়, পরিত্যক্ত সপ্ত দিল্লির হায় হায় হাহাকার। যুগযুগান্তের যে ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, প্রাসাদ পরিখা, কবর-মিনার গম্বুজ-বাগিচার অন্দরে কন্দরে, সেই ক্ষোভ ক্রোধ নৈরাশ্য, সেই অপ্রাপ্তের আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্তের বিনাশ, অন্ধকারের সুযোগে প্রহরে প্রহরে নিঃশ্বসিত হয়ে ওঠে। মহাপ্রান্তরব্যাপী এ কী নিদারুণ ব্যর্থতা। হঠাৎ তার মনে হ'ল ইতিহাসের মস্ত একখানা জাহাজ যেন অতর্কিতে বানচাল হয়ে গিয়েছে মাঝদরিয়ায়, আর সিন্ধু শকুনের উল্লাস কলরবের সঙ্গে মিশে গিয়ে উঠছে নিমজ্জমান শত শত যাত্রীর আর্ত অসহায় প্রার্থনা। কিন্তু তখনি আবার মনো-যোগ ফিরে এলো মনের মধ্যে, সেখানে এ কী অপূর্ব অননুভূতিপূর্ব আনন্দের অঙ্কুর। সে ভাবে, এই আনন্দ আর ঐ ব্যর্থতা এ কি বিচিত্র যোগাযোগ, এ যেন ভাঙা মন্দিরে চিরনবীন বিগ্রহ। সে ভাবে, কার্য তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কারণটা এমন ক'রে ফাঁকি দিয়ে যায় কেন? তখন সে সিদ্ধান্ত করে, আর কিছুই নয়। ঐ পান্নার স্মৃতিই ডুবসাঁতারে তার ঘাটে এসে ভুরভুরি কাটছে, এখনি মাথা তুলবে। কিন্তু যদি সে মনস্তত্ত্বের প্রকৃত বিন্যাস জানতো, বুঝতে পারতো, পান্নার ক্রিয়া অনেকদিন শেষ হয়ে গিয়েছে। পান্না তাকে প্রেমের নদীতে এনে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিয়েছে, এবারে বুঝি প্রেমের ঘাটে এসে পৌঁছতে চলল সে। জীবন চোখ বুজে পান্নার মুখ ভাবতে চেষ্টা করে, কিন্তু কেমন যেন সব ঝাপ্সা হয়ে যায়, যেন তার মুখের উপরে আর কার মুখের ছাপ পড়েছে, দুয়ে মিলে কেমন একটা

মনোরম অস্পষ্টতা। সে অবাক হয়ে যায়। ঐ তো পান্নার ঠোঁট, কিন্তু ও কার চোখ। ঐ তো পান্নার কপোল, কিন্তু ও কার চিবুক। ঐ তো পান্নার হাসি, কিন্তু ও কার লজ্জার আভা। আর ঐ তো পান্নার কণ্ঠস্বর, কিন্তু ও কার কথা। এই দুরূহ রহস্যের কিনারা করতে অক্ষম হয়ে সে ভাবে, দূর হোকগে ছাই, প্রেমের পঙ্কোদ্ধারের চেয়ে লড়াই করা অনেক সহজ। এখানে এসেছে মিস এলবিয়নের খোঁজ নেবার জন্যে, খোঁজ নিয়ে কাল সকালেই ছাউনিতে ফিরে যাব। এই সিদ্ধান্ত করতেই তার ঘুম এসে যায়। সুপ্তি সিদ্ধান্তের সহচরী।

তুলসীও জেগে কাটাচ্ছে। তার মনের মধ্যে কোথা থেকে যেন এক ঝলক আলো এসে পড়েছে, ঝলমল ক'রে উঠেছে সব। কোথা থেকে, কেন, কিছুতেই বুঝতে পারে না সে। অনেকক্ষণ বিনিদ্র শয্যায় এ পাশ ও-পাশ ক'রে অনুভব করেছে তার মনের মধ্যে যেন রঙীন কাঁথায় ফুল তোলা হচ্ছে। কার নিপুণ অদৃশ্য অঙ্গুলি সূক্ষ্ম সোনার সূঁচে আরো সূক্ষ্ম সোনালী সুতো পরিয়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে ফুলের নকশা কাটছে। প্রথমে মনে হ'তে থাকে কিছুই নয়, নিরর্থক আঁকজোঁক মাত্র, কিন্তু তারপরেই দেখতে দেখতে ফুটে ওঠে পদ্মফুল, গোলাপ ফুল, আরো কত কি ফুল, যা কেবল মনের গাছেই ফোটে। তার মনের উপরেই ফুল তোলা হচ্ছে, অথচ তার না আছে হাত না আছে ইচ্ছা-অনিচ্ছা। অসহায় নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র সে। কিন্তু সূঁচ যতই সূক্ষ্ম হোক, সুতো যতই কোমল হোক, ব্যথা না থেকে তো যায় না। ব্যথাও আছে, সুখও আছে, এমন মিশ্র অনুভূতি কোন অভিজ্ঞতায় যদি থাকে, তবে তা তার অজ্ঞাত। এ এক নূতন বেদনা, নূতন আনন্দ তার জীবনে। তুলসী ভাবে, ব্যথাটাই চলছিল একটানা তার জীবনে, হঠাৎ আনন্দ এলো কোন্ পথে? তার মনে পড়ে, স্বরূপ-রামের সঙ্গে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকেই দুঃখের পথে সে পা বাড়িয়েছে। লালকেল্লা, ইমানী বেগমের কুঠি, বাদশার তাঞ্জাম প্রেরণ, অতর্কিত আক্রমণ, উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় পলায়ন, রুমালীর বাড়িতে আত্মগোপন, দুঃখের পদক্ষেপের আর অন্ত নাই। এই মাস দুয়েকের মধ্যে হু-হু ক'রে বেড়ে গিয়েছে সে, অপ্রত্যাশিত জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন বেড়ে যায় পদ্মের নালটা। তবু তো পদ্ম মুখ জাগিয়ে রাখে জলের উপরে। অভিজ্ঞতাতেই বয়োবৃদ্ধি, পৃথিবীর আবর্তনে নয়। দু' মাস আগেকার কিশোরী আজ যুবতী! চমকে ওঠে সে। তবে ঐ সুখময় বেদনার অনুভূতির সঙ্গে এই দুই মাসের অভিজ্ঞতার কোন যোগ আছে নাকি? দুঃখের গুটি থেকেই কি বের হয়েছে এই মনোরম চিত্রিতপক্ষ প্রজাপতি? নূতন অভিজ্ঞতার গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন

চোখে পড়ে ঐ জীবনলালকে, যে কি না রুমালীর ভাই। ঐ জীবনলালকেই দায়ী করে তার ক্লান্তি ও উদ্‌ভ্রান্তির জন্য। লোকটা একদম আদব-কায়দা জানে না। যখন রুমালীর সঙ্গে তার কথা চলছিল, তার উচিত ছিল সরে যাওয়া, অপরিচিত লোক কেন শুনবে অপরের কথা। লোকটা বিলকুল গাঁওয়ার, নিতান্ত বেয়াদব। আবার স্বীকার করলো কিনা পৌঁছে দিয়ে আসবে তাকে বাড়িতে। অবশ্য অনুরোধটা তুলসী নিজেই করেছিল। কিন্তু রাজী হওয়া শিষ্টাচারসম্মত হয় নি। ভদ্রলোক হ'লে সেলাম ক'রে বলতো, এ তো খুব আনন্দের কাজ, কিন্তু বিবিকে তো চিনবার সৌভাগ্য আমার নেই, এমন অবস্থায় তাকে কি ক'রে আমি একাকী সঙ্গে নিয়ে যাই। তার আরও বলা উচিত ছিল, তবে হাঁ, বিবি যদি তাঞ্জামে যান, তবে আমি সঙ্গে লাঠি নিয়ে পাহারাদার হয়ে যেতে গৌরববোধ করবো। সে ভাবে দিল্লি, লখনৌর তুলনায় ঝাঁসি তো একটা গাঁও মাত্র, সেখানকার লোক কি ক'রে জানবে বাদশাহী শহরের আদবকায়দা। তুলসী সিদ্ধান্ত করে, জীবনের রাজী হওয়াটাই অন্যায় হয়েছে। আরও বলে কিনা চিত্রাঙ্গদার মতো দেখাবে। হাঁ, পুরুষবেশ পরবার প্রস্তাবটা তারই, কিন্তু ঐ উপমা দেওয়াটা কি অন্যায় নয়। বেয়াদব, বেয়াদব। আর বোনটিই বা কি কম। চট ক'রে বলে ফেলল কিনা—ভাইকে দেখাবে অর্জুনের মতো। মনে মনে হেসে ওঠে। অর্জুন! মস্ত বীর! তামাম হিন্দুস্থানে ছেলেবুড়ো সবাই আজ লড়াই করছে, হয় কোম্পানী পক্ষে নয় বাদশার পক্ষে। আর অর্জুন কিনা লুকিয়ে এসেছে বহিনের সঙ্গে দেখা করতে। অর্জুনের তো বহিন ছিল না।

॥ ৩ ॥

পল্টনের হস্তক্ষেপ

অদৃষ্টের সঙ্গে তাস খেলতে বসেছে তুলসীবাঈ। অদৃষ্টের মতো পাকা খেলোয়াড় আর কে আছে? মানুষ যতই দক্ষ খেলোয়াড় হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত বাজি জিততে পারে না, হতাশ হয়ে হাতের তাস ফেলে দিয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না তার। আজ শুয়ে শুয়ে সেই সব সুদীর্ঘ ইতিহাস স্মরণ করছিল সে। গত দু'মাসে অনেকগুলি রাত্রির বিনিদ্র প্রহর আর অনেকগুলি দিনের কর্মহীন প্রহর এই চিন্তায় কাটিয়েছে, আজও কাটছে।

সেদিন যখন মীর্জা মুঘলের হুকুমে তাঞ্জাম নিয়ে চলল তাকে ইমানী বেগমের কুঠিতে আর সেখানে যখন সস্নেহ আশ্রয় পেলো, ভাবলো এবারের দানে অন্তত

তার জয়। কিন্তু এক দানেই তো খেলা শেষ হয় না। তখনো তার জানতে বাকি ছিল অনেক।

ইমানী বেগম বাদশা শাহ্ আলমের পুত্রবধূ। বাদশাহজাদী ও বেগম হওয়া সত্ত্বেও তিনি লালকেল্লায় থাকেন না, শ্বশুরের মৃত্যু হ'তেই লালকেল্লা থেকে চলে এসেছেন সীতারাম বাজারের কাছে গুলজারিগঞ্জে। জায়গাটা শাহ্জাহানাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে আজমীর দরবাজার কাছাকাছি। সেখানে মস্ত কুঠিতে স্বাধীন ভাবে থাকেন, নিজ নামে জায়গীর আছে, স্বচ্ছন্দে চলে যায়। লালকেল্লার নারকীয় আবহাওয়া তাঁর অসহ্য, স্বামীর মৃত্যুর পরে বৃদ্ধ শ্বশুরের মুখ চেয়ে কোন মতে ছিলেন লালকেল্লায়। তার পরেই চলে এলেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমান শিষ্টাচারের বশে নিজের বাড়িকে গরীবখানা বলে। ইমানী বেগবের বাড়ি যথার্থই গরীব-খানা। নিজের জন্য সামান্য খরচ ক'রে উদ্বৃত্ত অর্থে তিনি গরিব দুঃখীকে পালন করেন, তাতে হিন্দু মুসলমানের ভেদ নেই। তাঁর সাধুতার খ্যাতি শহরের সবাই জানে। সেই জন্যই তুলসী ইমানী বেগমের আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল।

তুলসীর তাঞ্জাম ইমানি বেগমের কুঠিতে এসে পৌঁছতেই একজন বাঁদী এসে তাকে নিয়ে গেল বেগম সাহেবার কাছে। তিনি তখন তসবি জপছিলেন। তুলসী কুর্নিশ ক'রে সমস্ত নিবেদন করলো। বেগম মন দিয়ে সব শুনলেন, তারপরে বললেন, বেটী, এ কোঠি তোমারও যেমন আমারও তেমনি, তুমি স্বচ্ছন্দে যতদিন খুশি থাকো, এই গদর নেমে গেলেই তোমাকে পাঠিয়ে দেবো তোমার পিতাজীর কাছে।

তারপরে তিনি বাঁদীকে ডেকে বলে দিলেন, তুলসীমায়ীকে হিন্দু মহলে নিয়ে যাও, সেখানে সব বন্দোবস্ত ক'রে দাও গে।

আবার তিনি তসবি জপে মন দিলেন। তুলসী ভাবলো, এক দান সে জিতলো।

তারপরে আবার দু'দিন যেতে না-যেতেই যখন বাদশার তুরুক সওয়ার এসে জানালো যে, বাদশা তাঞ্জাম পাঠিয়েছেন তাকে আপন কুঠিতে পৌঁছে দেবার জন্য, তুলসী আবার ভাবলো আর এক দানে জয় হ'ল তার। সে হাসলো, অদৃষ্টও হাসলো।

বেগম সাহেবাকে কুর্নিশ ক'রে বিদায় প্রার্থনা করলে তিনি সংক্ষেপে বললেন, আল্লা তোমার ভালো করুন বেটী।

তারপরেই আরম্ভ হ'ল অদৃষ্টের খেলা। এতক্ষণ সে নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র ছিল। তাঞ্জাম চলা শুরু করতেই পথের মধ্যে হঠাৎ হল্লা বেধে উঠল। প্রথমে

গালাগালি তারপরে লাঠির ঠকঠক, অবশেষে বন্দুকের গুড়ুম। প্রথমটা তুলসী ভেবেছিল এ হাঙ্গামার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। কিন্তু বন্দুকের শব্দের পরে যখন তাঞ্জাম মাটিতে নামলো, তখন সে উঁকি মারতে বাধ্য হ'ল। সে দেখতে পেলো বাদশার আহেদীদের সঙ্গে আর এক দল আহেদীর মারামারি শুরু হয়ে গিয়েছে, লাঠি থেকে বন্দুকে পৌঁচেছে দুই পক্ষ। দেখলো যে তাঞ্জামের বাহকদের কেউ কেউ পালিয়েছে, কেউ কেউ যোগ দিয়েছে হল্লায়। মূঢ়ের মতো বসে রইলো সে তাঞ্জামের মধ্যে। এমন সময় একটি কচি মুখ তাঞ্জামের মধ্যে ঢুকে বলল, শীগ্‌গির বেরিয়ে এসো।

তুলসী দেখলো, তার বয়সেরই একটি ছেলে, বয়সের সমতায় সাহস পেলো, শুধলো, কেন?

ছেলেটি বলল, বিনা ভূমিকায় তার হাত ধরে টান দিয়ে বলল, কেন পরে হবে, এখন যা বলছি শোন, শীগ্‌গির এসো আমার সঙ্গে।

তুলসী ভাবলো সামনে তো বিপদ দেখছি, পিছনেও না হয় বিপদ হবে, অতএব বেশি ভয়ের আর কি কারণ। সে বের হয়ে ছেলেটির পিছু পিছু ছুটলো। দুই পক্ষ দাঙ্গায় মত্ত, কেউ দেখতে পেলো না।

ছেলেটি যতদূর সম্ভব বড় রাস্তা এড়িয়ে গলিঘুঁজির পথে ছুটছে, তুলসীও ছুটছে পিছনে। মহল্লা খারিকুয়া হয়ে, কুচা চাকিওয়ালা হয়ে, কুচা বেলিওয়ারন হয়ে, গলি রহমান হয়ে, দু'জনে চাঁদনীচকে এসে পড়লো।

এবারে ছেলেটি বলল, আর ছুটবার দরকার নেই।

কেন?

কেন আর কি! ওরা কি আর আমাদের পাত্তা করতে পারবে। কোথা দিয়ে কোথায় এসে পড়েছি দেখলে তো।

তুলসী বলে, তা বটে। এসব গলিঘুঁজি দেখা দূরে থাক কখনো নামও শুনি নি।

ছেলেটি বলে, ঘরের মধ্যে খুকীটি হয়ে বসে থাকলে দেখবে কি ক'রে? গলি-ঘুঁজি কি ঘর বয়ে গিয়ে দেখা দিয়ে আসবে?

তারপর সে মন্তব্য করে, দুনিয়াতে রাজপথ আর কটা? গলিঘুঁজিই তো বেশি।

তুলসী বলে ওঠে, এক রত্তি ছেলে দুনিয়ার কি খবর রাখো তুমি।

এক রত্তি ছেলে! জানো আমার বয়স পনেরো চলছে।

আর আমার পনেরো পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তুমি আমাকে দিদি বলবে।

দিদি না দিদিমা? আমার দিদি একজনই আছে, তার কাছেই নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।

তার নাম কি?

নাম কেন—মানুষটাকেই দেখতে পাবে, চলো না।

তুলসী ছুটবার উদ্যম করে, ছেলেটি বাধা দিয়ে বলে, উহুঁ, ছুটো না, তাহ'লেই লোকে সন্দেহ করবে। বেশ ধীরেসুস্থে গল্প করতে করতে চলো, তাহ'লে কারো সন্দেহ হবে না।

বড়বাজারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে কাটরা তোষাখানা মহল্লায় পৌঁছে তুলসী থমকে দাঁড়ালো।

আবার দাঁড়ালে কেন, শুধালো ছেলেটি।

তুলসী বলল, তোমার দিদির বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছ কেন? তার চেয়ে আমাদের বাড়িতে বাবার কাছে পৌঁছে দাও না কেন?

খুকী আর কাকে বলে!

তুলসী রেগে উঠে বলে, একশ'বার খুকী খুকী ক'রো না। বাবার কাছে পৌঁছে দাও বলছি।

একশ'বার বলবো, দুইশ'বার বলবো, দশ হাজারবার বলবো, খুকী, খুকী, খুকী, হ'ল তো।

তবে আর আমি এগোবো না, এই দাঁড়ালাম।

আবার কি তোমার মীর্জা আবুবকরের হাতে পড়বার ইচ্ছা গিয়েছে নাকি?

সে আবার কে?

শাহ্‌জাদা, বাদশার নাতি।

তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?

তার হাতে পড়লে সম্বন্ধ হবে। বাঁদী হয়ে হারেমে ঢুকবে।

তুমি ভারি অসভ্য।

অসভ্য তো। বেশ। এবারে চলো।

আমাকে বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় কেন নিয়ে যাচ্ছ না শুনলে কিছুতেই এগোব না।

বলে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো তুলসী।

এই সহজ কথাটা বুঝতে এত দেরি হচ্ছে। তবে শোনো। শাহ্‌জাদার পাইক যখন দেখবে তাঞ্জাম খালি, চিড়িয়া পালিয়েছে, তখন ছুটবে তোমার বাড়িতে। এতক্ষণ নিশ্চয় গিয়ে পৌঁচেছে। নাও, এখন যাবে নাকি বাড়ির দিকে।

তুলসী খপ ক'রে ছেলেটির হাত ধরে বলে, কেন মিছামিছি দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছ, চলো না তোমার দিদির বাড়িতে।

তবু ভালো যে, এবারে খুকীর চৈতন্য হয়েছে।

খুকী অভিধায় এবারে আর আপত্তি করে না তুলসী। দু'জনে এগোতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে তুলসী বলে, তোমার দিদিকে তো আগে জানাও নি যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ।

ছেলেটি বলে, সেদিন যে ফিরিঙ্গী মেয়েটাকে নিয়ে গিয়েছিলাম, তখন কি জানিয়েছিলাম?

তারপরে কতকটা যেন নিজের মনেই বলে, তুমি তো হেঁটে যাচ্ছ, তাকে নিতে হয়েছিল কাঁধে ক'রে।

কাঁধে ক'রে কেন? মড়া নাকি?

আধমরা। কাপড়চোপড় ছিঁড়ে গিয়েছে, সারা দেহ থেঁতলানো, রক্ত গড়াচ্ছে।

খুব মেরেছিল বুঝি?

সে কথার উত্তর না দিয়ে ছেলেটি বলে, এই নাও এসে পড়েছি।

খুব সরু একটা গলির মধ্যে দু'জন ঢুকলো, খানিকটা চলতেই কয়েকটা সিঁড়ি উঠে আবার খানিকটা চলে—একটা দোতলা বাড়ির সম্মুখে দাঁড়ালো। তারপরে দুজনে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দরজায় ধাক্কা দিল ছেলেটি। ডাকলো, রুমালীদি, শীগ্‌গির দরজা খোলো। দ্যাখো কাকে নিয়ে এসেছি।

কে রে পল্টন নাকি, বলে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। তুলসী দেখলো মেয়েটি বয়সে তার চেয়ে বড়।

রুমালীদি, দ্যাখো কে এসেছে?

কি তোমার নাম বহিন?

তুলসী।

তুলসী! কি সুন্দর নাম!

এই ব'লে রুমালী এগিয়ে এসে তুলসীর চিবুক ধরে মুখটি উঁচু ক'রে তুললো, তার পরে গুনগুন ক'রে গান ধরলো—

ছোটি ছোটি তুলসী গছিয়া
লম্বী লম্বী পাতিয়া
ফরে ফুলে তুলসী গুহাবন রে থী।

পল্টন বলে উঠল, নাও, এখন গান রাখো, মেয়েটা অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছে,

তার মানে অনেকখানি।

তুলসী বলে, পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা।

কমালী জবাব দেয়, চোদ্দ আনাই যে আশাতীত। ষোল আনার লোভ করতে গেলেই ঠকতে হয়।

প্রসঙ্গ পাল্টে তুলসী বলে, পল্টনকে দিয়ে বাবাকে খবর পাঠাও, নিয়ে যাক।

ইতিমধ্যে একদিন কমালীকে দিয়েছে নিজের পরিচয়, বলেছে এ-ক'দিনের ঘটনা। তখনি কমালী বলেছিল যে, গদর একটু শান্ত হ'লেই পণ্ডিতজীকে খবর পাঠাবে, তিনি এসে নিয়ে যাবেন।

অবশেষে একদিন ফিরিঙ্গী মেয়েটি কথা বলল। প্রথমে যা ছিল অসংলগ্ন প্রলাপ, ক্রমে তা সুসংবদ্ধ বাক্যে পরিণত হ'ল। কিন্তু কিছুতেই পরিচয় দিতে রাজী হ'ল না, বলল, আমার কলঙ্কের কাহিনীর আমাতেই অবসান হোক, আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত তা আর পৌঁছে দরকার নেই।

কমালী বলেছিল, বহিন, হিন্দুস্থানময় অশান্তি, কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, পরিচয় দিলেও তাদের সন্ধান যে পাওয়া যাবে মনে হয় না।

তবে আর প্রয়োজন কি! না, বহিন, ও কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রো না। তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, তোমাকে যদি দিতে হয় প্রাণটাই দেব। কি করবে তুচ্ছ পরিচয় নিয়ে।

কমালী বুঝলো যে, ইংরেজের মেয়ের প্রতিজ্ঞা দু' ফোঁটা চোখের জলে গলবে না। তাই সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে শুধালো, অন্তত নামটা বলো, ডাকবার প্রয়োজন হয় তো।

মেয়েটি বলল, আমাদের দেশের একটা নাম Albion। আমাকে মিস এলবিয়ন বলে ডেকো।

বেশ তাই হবে।

মিস এলবিয়ন ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো আর স্বাস্থ্যের সঙ্গেই ধাপে ধাপে ফিরে পেতে লাগলো দেহ আর ইন্দ্রিয়দের শক্তি। প্রথমে রসনায় স্বাদ এলো, বুঝতে পারলো জল আর দুধে প্রভেদ। তারপর ত্বকে ফিরে এলো স্পর্শক্ষমতা, বললো কমালীদি, বড্ড গরম লাগছে, মোটা চাদরটা সরিয়ে নাও। তারপরে নাসায় ঘ্রাণ এলো, চক্ষুতে সতেজ দৃষ্টি। অবশেষে একদিন বিকালের দিকে সোৎসাহে সজোরে বলে উঠল, কমালীদি, কাছেই কোথাও এসে পড়েছে কোম্পানীর ফৌজ।

কোথায় বহিন, শুধায় কমালী।

শুনতে পাচ্ছ না ঐ যে কামানের গাড়ির গড়গড়, ঐ যে ঘোড়সওয়ারের খট্‌খট, ঐ যে পদাতিক পল্টনের গট্‌গট—ঐ যে খুব স্পষ্ট।

রুমালী বোঝে বিকার। আবার বিকার আরম্ভ হ'ল।

বিশ্বাস হচ্ছে না? ঐ শোনো ব্যাগপাইপে সুর বাজছে—"cheer boys, cheer."

এবারে সত্যিই শুনতে পায় রুমালী। বলে, তাই তো বটে।

তারও মন আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু এই ক'দিনের নিদারুণ অভিজ্ঞতায় আশা করবার সাহস হারিয়ে ফেলেছে সে, বলে—ঐ সুর তো সিপাহী ব্যাগপাইপেও বাজে।

না, না, রুমালীদি, গোড়া পল্টন ছাড়া এমন ক'রে আর কেউ বাজাতেই পারে না ও সুর: cheer boys, cheer.

মিস এলবিয়নের অনুমানই সত্য প্রমাণ হয়। সন্ধ্যাবেলা পল্টন ছুটতে ছুটতে এসে বলে, রুমালীদি কোম্পানীর ফৌজ এসে পড়েছে সব্‌জিমণ্ডির পাহাড়ে।

মিস এলবিয়ন এখন শয্যা ছেড়ে উঠতে পারে, হেঁটে চলে বেড়াতে পারে, তবে ঘরের বাইরে যেতে সাহস পায় না। সারাদিন সারারাত ঐ গোটা-দুই-তিন ঘরের মধ্যে শুয়ে ব'সে কাটে। রুমালী যখন থাকে,—অনেক সময়েই সে থাকে না, রোজগারের জন্য বাইরে যেতে বাধ্য হয়, তখন রুমালীর সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু সে গল্পের পরিধি স্বকৃতনিষেধের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কিছুতেই দেবে না সে আত্মপরিচয়। ঐ একটি বিষয়ে সে অনমনীয়, আর সব বিষয়ে পুতুলের মতো কথা শুনে চলে রুমালীর। তুলসী এসে পড়বার পরে দিবারাত্রির একজন সঙ্গী পেলো সে, কারণ তুলসীরও বাইরেটা নিষিদ্ধ।

বাকি সময়টা কখনো শুয়ে কখনো একাকী বসে দেশের কথা চিন্তা করে। চিন্তা বললে ঠিক হবে না, চিন্তার মধ্যে একটা প্রয়াস আছে। তার নিষ্ক্রিয় মনের উপর দিয়ে ছায়াবাজির ছবির মতো সারাজীবনের ঘটনাস্রোত বয়ে যায়। কেণ্টের ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা গড়ানো প্রান্তরের মধ্যে একটেরে তাদের গ্রাম, পিছনেই আরম্ভ হয়েছে পাইন বন। ঐ পাইন বনের কাছে মৃত্তিকার তরঙ্গ-চূড়ায় উঠে দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যায় নীল সমুদ্রের আভাস আর তার উপরে জাহাজের সাদা পাল। ঐ পাল গণনা একটা শৌখিন খেলা ছিল তাদের—তার আর তার একমাত্র ভাই বিলের। বিল তার চেয়ে কয়েক বছরের বড় সত্য, কিন্তু স্বভাবটা এমনি সরল যে বয়সের ভেদ চোখে পড়তো না। তার উপরে আবার

তার, এলিনার—এলিনা এখন হয়েছে এলবিয়ন ; এত দুঃখের মধ্যেও তাঁর হাসি পায়—তার স্বভাবটা বয়সের তুলনায় এমনি গম্ভীর যে ভাইবোনের মধ্যে ৫।৬ বছরের বয়সের পার্থক্য কমে গিয়ে প্রায় কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল। কি মধুর সেই দিনগুলি। স্মৃতির ভৃঙ্গারে অভিষেক হ'লে তবেই না জীবন মধুর হয়ে ওঠে। তাই অতীতের এত মাধুর্য।

তারপরে এসে পড়লো একে একে করাল আঘাত। মা গেলেন মারা। বিল চলে এলো সিভিল সার্ভিস নিয়ে ইণ্ডিয়ায়। তারপরেই বাবা আবার করলেন বিয়ে। বিল লিখে পাঠালো, এখন আর বিল নয়—মিস্টার উইলিয়াম ক্লিফোর্ড, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট অব্ গুরগাঁও—এলিনা এখানে চলে এসো। ইণ্ডিয়ার সবই নূতন লাগে এলিনার চোখে, মাটি থেকে মানুষ অবধি সবই নূতন। গুরগাঁওয়ের ক্ষুদ্র শ্বেতাঙ্গ সমাজটিও বেশ শিষ্ট। একবার সেখানে বেড়াতে এসেছিল দিল্লির পাদ্রী জেনিংস দম্পতি, মিস্টার ও মিসেস জেনিংস আর কন্যা মিস জেনিংস। মেয়েটি তার সমবয়সী, দুজনের মধ্যে অল্পদিনেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ওরা ফিরে যাওয়ার সময়ে এলিনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে গেল, অবশ্যই যেন দিল্লিতে যায়, বলে গেল দিল্লি ভারতের ললাট। তাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেই সে এসেছিল দিল্লিতে। তারপরে আর সে ভাবে না, ভাবতে পারে না। রূপকথার পুরীর উত্তর দিকের জানলা খোলা নিষেধ। মনের ঐ দিকের জানালাও খুলবে না সে। মনটাকে ঐ দিক থেকে ফিরিয়ে আনতেই চোখের উপরে ভেসে ওঠে পাইনের বন, তরঙ্গিত ঘন সবুজ মাঠ, নীল সমুদ্রের বৃত্তাংশ। কেমন সত্য, কেমন সজীব। আর সেই সঙ্গে নাসায় পায় পাইন বনের স্নিগ্ধ মধুর গন্ধটি। ক্ষণেকের জন্য তার বর্তমানের গ্লানি ভুলিয়ে দেয় অতীতের জাদু। তার মন হু-হু ক'রে ওঠে।

এমন সময়ে শুনতে পায় রুমালীর কণ্ঠস্বর—কি গো এলবিয়ন বিবি, আজ কি লাঞ্চ্ হবে না ?

খানা বললেও চলতো, বলেও তাই, তবে যখন ঠাট্টা করতে ইচ্ছা হয়, রুমালী বলে লাঞ্চ্, তুলসী আর এক পর্দা চড়িয়ে দিয়ে বলে লাঞ্ছনা।

এলিনা বলে, আবার লাঞ্চ্ কেন ? খানা বললে কি চলতো না ?

খানাখন্দ এড়িয়েই তো চলতে চাই, তাই বলি লাঞ্চ্। এসো, ওঠো।

এত তাড়া কেন ?

আজ যে তুলসীর বাবা আসবেন।

বিস্মিত হয় এলিনা। বলে, তুলসীর বাবা! বলো কি—খবর দিলে কি ক'রে ?

আমার পল্টন ভাইয়ের অসাধ্য কি আছে ? খুঁজে খুঁজে ঠিক বের করেছে।

নাও, শীগ্‌গির ওঠো।

তবে আজ শহরের খবর পাওয়া যাবে।

যাবে বৈকি। সেইজন্যই তো বলছি শীগ্‌গির চলো।

তুলসী কোথায়?

সে লাঞ্চের যোগাড় করছে। চলো।

শহরের খবর পাওয়া যাবে। হয়তো কোম্পানীর খবর। হয়তো ক্লিফোর্ডের খবর। আবার আশার সঞ্চার হয় এলিনার মনে। আশা বাদুড়ের মতো—নিম্নমুখে ঝোলে, অন্ধকারে দেখে। অন্ধকার যত গাঢ় তার দৃষ্টি তত প্রখর।

॥ ৫ ॥

পিতাপুত্রী

তুলসীর মনে পড়ে। মনে পড়ে পিতার সঙ্গে অনেকদিন পরে প্রথম সাক্ষাৎ। দেখা হবে আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিল। এমন সময়ে পল্টনের পিছু-পিছু সুখানন্দ পণ্ডিত ঢুকে সম্মুখে তুলসীকে দেখে, 'তুলসী মা', 'তুলসী মা' বলে বুকে জড়িয়ে ধরলো তাকে। তুলসী পিতার বুকের মধ্যে আত্মসমর্পণ ক'রে নীরবে কাঁদতে লাগলো। সুখানন্দর চোখের জল পড়ছে তুলসীর মাথায়, তুলসীর চোখের জল পড়ছে সুখানন্দর গায়ে। এমনি ভাবে চোখের জলে গলে গিয়ে হাল্কা হয়ে এল দুঃসহ দুঃখ, এতদিনের দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ। কিছুক্ষণ পরে সম্বিত হ'লে তুলসী দেখলো ঘরে আর কেউ নেই, বেশ একটু স্বস্তি অনুভব করলো। রুমালীর ইঙ্গিতে সকলে অন্য ঘরে গিয়েছিল।

তুলসী বলল, বাবা বসো।

পাশাপাশি দু'জনে বসলো চারপাইয়ের উপরে। দু'জনেরই মনের মধ্যে অনেক কথা। দু'জনেই ভাবে, তবে মুখে আসে না কেন? চোখের জল চোখ থেকে গিয়েছে বটে, কিন্তু এখনো কণ্ঠরুদ্ধ ক'রে আছে। কথা যদি বা ফোটে তখন আর এক সমস্যা কোথা থেকে আরম্ভ করবে। এতদিনের কত অকথিত বক্তব্য। সকলেই প্রথমে বের হওয়ার উমেদার।

চোখের জলে কণ্ঠ আচ্ছন্ন হ'লেও চোখে তখন হাসি ফুটেছে। বৃষ্টির জলে মাটি সিক্ত, কিন্তু আকাশ প্রসন্ন। ক্রমে দু'একটা ক'রে কুশল প্রশ্ন আর উত্তর আরম্ভ হ'ল, দুর্যোগের রাত্রির অবসানে পাখির কুণ্ঠিত কাকলি।

বাবা, ভূতি বুড়ী কেমন আছে?

সে কি আর আছে মা ? কোন রকমে প্রাণে বেঁচে আছে। এই এক মাসে বয়স দশ বছর বেড়ে গিয়েছে।

ওর বয়স কত হ'ল বাবা ?

কে হিসাব রাখে বলো। কখনো বলে চার কুড়ি, কখনো বলে আড়াই কুড়ি।

আমাকে একবার বলেছিল সাড়ে চার কুড়ি।

বুঝলি না, ভূতি বুড়ী কুড়ির বেশি জানে না। তার আগে কখনো সাড়ে চার, আড়াই, তিন বসিয়ে যাচ্ছে যেমন খুশি।

আর কাহ্নাইয়া কেমন আছে বাবা ?

আরে বাস রে! সে তো সব শুনে তখনি লাঠি নিয়ে বের হয় আর কি, বলে, সব শালা সিপাহীর শির ভাঙবে। আমি আর নয়ন থামাতে পারি নে।

বাবা, দাদা কি বলল শুনে ?

আগে তো শুধু খানিকটা লাফালো স্বরূপ এসে তোকে নিয়ে গিয়েছে শুনে। তার পরে যখন শুনলো যে গালিব সাহেবের বাড়ি থেকে তোকে নিয়ে গিয়েছে সিপাহীরা, তখন থ মেরে গেল।

গালিব সাহেব আর আমি বললাম, বাবা, এদের দলেই শেষে যোগ দিলে! বেটা ভাঙবে তবু মচকাবে না। বলে কিনা, আমার বহিন ব'লে চিনতে পারলে নিয়ে যেত না, বলে কিনা সব নিষেধ করা আছে।

তার পরে কপালে হাত ঠেকিয়ে সুখানন্দ বলে, কে কার নিষেধ শুনছে—যে কাণ্ড চলছে শহরে।

আর স্বরূপদাদার কি খবর ?

গালিব সাহেবের বাড়িতে এসে যখন শুনলো যে তোকে সিপাহীরা ধ'রে নিয়ে গিয়েছে—তখন গুম হয়ে ব'সে থাকলো খানিকক্ষণ, তারপরে সেই যে বের হয়ে গেল আর তার খবর পাই নি।

সাগ্রহে তুলসী শুধোয়, তোমার সঙ্গে কি দেখা হয়েছিল ?

না রে, আমার কাছে আসবে কোন্ মুখে ? এ কথা শুনেছি গালিব সাহেবের কাছে।

দাদার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হয় নি।

না হয়েছে ভালই। তাহ'লে নিশ্চয় একটা খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে যেতো।

তোমরাও খোঁজ করলে না স্বরূপদাদার ? তার যে কেউ নেই, বাবা!

খোঁজ করেছিলাম বইকি। দেখলাম তার বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, শুনলাম সে নাকি কোথায় চলে গিয়েছে, কেউ জানে না।

সুখানন্দ ব'লে চলে, দিল্লি ছেড়ে যদি চলে গিয়ে থাকে ভালই করেছে। দিল্লিতে যে কাণ্ড চলছে।

তুলসী বলে, দিল্লির বাইরেও এমনি কাণ্ড চলছে ব'লে শুনতে পাই।

তবু এদিক ওদিক স'রে থাকবার জায়গা আছে, দুনিয়াটা তো ছোট নয়।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে দিয়ে তুলসী শুধায়, তার পরে কি হ'ল বলো।

তোকে হারিয়ে ভাবলাম এখানেই জীবনের শেষ, তার পরে বলে আর কিছু নেই। এমন সময়ে খবর পাওয়া গেল বাদশা দরবারে বসবেন। গালিব বলল, পণ্ডিতজী চলো, বাদশাকে কথাটা জানিয়ে আসা যাক। আমি বললাম, মীর্জা সাহেব, বাদশা তো আর তুলসীকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেন নি, তিনি কি জানবেন, তিনি কি করবেন?

গালিব বলে, তবু তাঁর কাছে খবরটা পেশ ক'রে রাখা ভালো, বাদশা হচ্ছেন দীন দুনিয়ার মালিক।

তারপরে একে একে ধীরে ধীরে সব ঘটনা বিবৃত ক'রে অবশেষে মন্তব্য করে, তোকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে শাহী তাঞ্জাম রওনা হয়ে গেল দেখে দু জনে— গালিব সাহেব আর আমি বাড়ি ফিরে এলাম, আমাদের আনন্দ ধরে না। এমন সময়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকলো নয়ন। আমাদের হাসি মুখ দেখে আশ্চর্য হয়ে শুধালো, ব্যাপার কি? আমি উত্তর দেওয়ার আগেই গালিব সাহেব একটা বয়েৎ আওড়াল, বলল, আকাশের তারা মেঘে আর কুয়াশায় ঢাকা পড়লেও তারা ছাড়া আর কিছু নয়। বলল, ত্থাখো নয়নচাঁদ, বাদশার আজ দুনিয়া নেই কিন্তু দিল তেমনি আছে। তাঞ্জাম পাঠিয়েছেন তুলসী মাঈকে পৌঁছে দেবার জন্যে।

বুঝলি মা, শুনে তোমার গুণধর ভাই কি বলে জানিস, পাঠাবে না? ওরাই ধরে নিয়ে গিয়েছিল এখন হজম করতে না পেরে দিল্ দেখাচ্ছেন!

হজম না করতে পারবার কি কারণ বাপু!

শুনবে! তবে শোন। তোমরা ভাবছ, তোমাদের আরজিতে তুলসীর মুক্তির হুকুম দিয়েছেন?

তবে আর কিসে?

বাদশা আর শাহ্‌জাদারা বুঝতে পেরেছে যে, তুলসী সিপাহীপক্ষের মেয়ে।

আমরা বলি, সিপাহীপক্ষ আর বাদশাপক্ষ কি আলাদা?

তোমরা কিছুই খোঁজ রাখো না, বলে নয়ন; বলে, বাদশা আর শাহ্‌জাদারা এখন সিপাহীদের হাতের পুতুল, সিপাহীদের হাতে বন্দী।

ছিঃ ছিঃ, এমন কথা বললেও গুণাহ্‌, শুনলেও গুণাহ্‌।

সত্য কথা বলা, সত্য কথা শোনা যে গুণাহ্, তা এই প্রথম শুনলাম।

মীর্জা সাহেব একটি বয়েৎ বলে, মিথ্যা অনেক সময়ে সত্যের বোরখা পরে এসে ভোলাতে চেষ্টা করে, মুখ দেখবার উপায় না থাকলেও পায়ের দিকে তাকালেই স্বরূপ ধরা পড়ে যায়।

তবে তোমরা পায়ের দিকে তাকিয়ে পরীক্ষা করো, আমি চললাম। বলে চলে গেল নয়নচাঁদ।

আমরা ব'সে ব'সে গল্প করছি, কতদিনের কত গল্প—তোর গল্পই বেশি, যখন খুব ছেলেবেলায় পাখীগুলোকে বলতিস ফুল আর ফুলগুলোকে বলতিস পাখি সেই সব গল্প। আমাদের মনে আর আনন্দ ধরে না। গলির মধ্যে মানুষের গলার আওয়াজ, পায়ের শব্দ শুনলেই উঠে উঠে গিয়ে দেখে আসি তাঞ্জাম এলো কি না। এমনি ক'রে দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো। এই আসে, ঐ আসে ক'রে দু'জনে বসে আছি। এমন সময় ঝড়ের মতো ঘরে ঢোকে নয়ন।

কি রে, কি হ'ল?

কি আর হবে! তুলসীকে লুটে নিয়ে গিয়েছে!

সে কি রে?

হাঁ, ইমানী বেগমের কুঠি থেকে আসবার সময়ে জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

সে কি কথা! বাদশার তাঞ্জাম থেকে ধরে নিয়ে যাবে এত সাহস কার?

মীর্জা সাহেব বলে ওঠে, নিশ্চয় সিপাহীদের কাণ্ড!

মিছে দোষ দিয়ো না সিপাহীদের।

যা শুনেছিস সত্যি তো?

নয়ন বলে, তোমাদের কাছে থেকে বের হ'য়ে ইমানী বেগমের কুঠির দিকেই যাচ্ছিলাম। পথে সব খবর শুনলাম। বাদশার তাঞ্জাম যারা আক্রমণ করেছিল, সব চেনা লোক।

আমি বললাম, চেনা হবে বইকি। শহরের কোন্ গুণ্ডা না তোর চেনা।

মিছে দোষ দিয়ো না বাবা, তারা মীর্জা আবুবকরের লোক।

বাদশার নাতি।

যেমন বাদশা তেমনি নাতি, বলে ওঠে নয়ন। তারপরে বলে ওঠে, এই বাদশা-বাদশা করা ছাড়ো তো।

মীর্জা সাহেব তার কথায় কর্ণপাত না ক'রে বলে, ঘটনাটা হাকিম আসাহুল্লা সাহেবকে এখনি জানানো দরকার পণ্ডিতজী।

নয়ন বলে, যাও, তোমরা গিয়ে সেই বেইমানের কাছে সেলাম ঠোক গে। আমি চললাম লাঠির জোরে তুলসীকে উদ্ধার ক'রে আনতে।

এই পর্যন্ত বলে সুখানন্দ মন্তব্য করে, বেটার সমস্তই মুখভারতী। বেটা করবে তোকে লাঠির জোরে উদ্ধার! উদ্ধার করা দূরে থাকুক, আজ এক মাসের মধ্যে খোঁজই পেল না কোথায় আছিস তুই। ভাগ্যিস বুদ্ধি ক'রে পল্টন বাবা গিয়েছিল। বাহাদুর ছোকরা বটে।

এমন কত কথাই না মনে পড়ে তুলসীর। সেই প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে মিলিয়ে পরবর্তী আরও দুই-তিনটি সাক্ষাতের স্মৃতির। সে ভেবেছিল, বাবা এসেছে, আর কি, এবারে সঙ্গে চলে যাবে। কিন্তু প্রস্তাবটা করতেই সুখানন্দ বলে, না, মা, এখনো কিছুদিন এখানে থাক। এখানে থাকলে কাকপক্ষীতেও খোঁজ পাবে না।

সে শুধোয়, খোঁজ পেলেই বা কি?

চমকে ওঠে সুখানন্দ, বলে, কাক নয় রে কাক নয়, বাজ চিল—ছোঁ মারাই যাদের ব্যবসা।

বুঝতে পারে না তুলসী, বলে, কি বলছ, বুঝতে পারছি না।

সব কথা না-ই বুঝলি, শুধু এই বুঝে জেনে রাখ যে, বিপদ এখনো কাটে নি। মীর্জা আবুবকরের লোক এখনো আমাদের গলির মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

বুঝলে কি ক'রে?

ছোঁ মারা যাদের ব্যবসা তাদের দেখলে বুঝতে পারা যায়।

তবে কবে নিয়ে যাবে? অভিমানের সুরে শুধায় মেয়ে।

বাবা বলে, আর কিছুদিন চুপ ক'রে থাক, হাঙ্গামাটা কেটে যাক। শুনেছি কোম্পানীর ফৌজ এসে পড়েছে।

আবার তখনি মনে পড়ে, বাবার সে কণ্ঠস্বর সে কি কখনো ভুলবে?—ও বাবা পল্টন কোথায় গেলি রে?

তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, ঐ ছাখো আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছি, সেই মিঠাইয়ের হাঁড়িটা কোথায় নিয়ে গেলি রে?

এক গাল হাসি নিয়ে পল্টন ঘরে প্রবেশ করে, হাতে মিঠাইয়ের হাঁড়ি।

পণ্ডিতজী বলে, খুব একগাল হাসি যে, ব্যাপার কি?

পল্টন বলে, তবু ভালো যে একগাল মিঠাই নয়।

নয় কেন বাবা, তোরা খাবি বলেই তো আনা, কোথায় নিয়ে গিয়েছিলি?

একটু সামলে রেখেছিলাম।

কেন রে?

পাছে বাপ-বেটিতে মিলে মনের দুঃখে সব খেয়ে বসে থাকো।

মনের দুঃখে আবার খাওয়া আসে নাকি ?

আসে না। কি যে বলো ? নিগমবোধ শ্মশানঘাট থেকে ফিরতি পথে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ঘণ্টেওয়ালার দোকানে বসে যে পরিমাণ মিঠাই খায়, কোন বিয়ে সাদির বাড়িতে তেমন খেতে দেখি নি। সেই দেখেই তো আমি পরামর্শ দিয়েছি—ঘণ্টেওয়ালা ভাই, এ জায়গা ছেড়ো না। পারো তো গোরস্থানের কাছে আর এক দোকান খুলে দাও।

তার কথা শুনে সুখানন্দ নিজ মনে বলে উঠল, বাঃ বাঃ, ছেলেটি বেশ কথা বলে।

এমন সময় রুমালী ঢোকে। পল্টন বলে ওঠে, এই আমাদের রুমালীদি।

রুমালী প্রণাম ক'রে সুখানন্দকে বলে, আগে খবর দিতে পারি নি, আপনার বাড়িটা খুঁজে বের করতে দেরি হ'ল। তাছাড়া যে দুঃসময়, একটু সাবধানে খবরাখবর করতে হয়।

হয় বই কি, মা, খুব হয়।

তারপরে বলে, মা আর জন্মে তুমি আমার মেয়ে ছিলে, নইলে আমার মেয়েকে এত যত্ন ক'রে রক্ষা করবে কেন ?

পল্টন বলে, পণ্ডিতজী, আগের জন্মের কথা উঠিয়ে এবারে এ জন্মের হাঁড়িটাকে ভুলো না।

না রে না, আমি ভুললেও তুই ভুলবি নে।

কেমন ক'রে ভুলবো ? বয়ে এনেছি, এখনো হাত ব্যথা করছে।

রুমালী বলে, পেটে ক'রে বইতে তো দিব্বি পারিস।

যা বলেছ দিদি, পেটে বইতে কোন কষ্ট নাই।

সুখানন্দ বলে, তোমরা সবাই খাও মা, আমি দেখি।

বিদায় নেওয়ার সময়ে সুখানন্দ কয়েকটি টাকা দিতে উদ্যত হন রুমালীর হাতে, খরচপত্র তো আছে, রাখো মা।

রুমালী স্বাভাবিক ভাবেই বলল, দরকার হ'লে চেয়ে নেব। আপনি তো এখন যাতায়াত করবেন।

করবো বই কি, মা।

তখন বিদায় নিয়ে চলে যায়। পিতাপুত্রী দু'জনের চোখেই জল পড়ে।

এলবিয়ন বিবির কথা কেউ তুলল না, কাজেই সুখানন্দ জানতে পারলো না তার অস্তিত্ব।

এই এক মাস কালের সব কথাই সুখানন্দ বলেছিল তুলসীকে, কেবল একটি কথা ছাড়া। সে কথাটি বলে নি কারণ বলা যায় না।

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনতর হয়ে উঠল, তুলসীকে তাঞ্জাম থেকে লুটে নিয়ে গিয়েছে সংবাদে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল বৃদ্ধ কবি গালিব আর নীরবে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলো সুখানন্দ। অনেকক্ষণ কাঁদবার পরে গালিব বলল, পণ্ডিতজী, একটু কাঁদো, বুকটা হাল্কা হোক।

আরও হাল্কা হবে! আর কত হাল্কা হবে মীর্জা সাহেব! তুলসী মা যাওয়াতেই কি চরম হাল্কা হয় নি?

গালিব বলে, এ যেন আবার তাকে হারালাম।

সুখানন্দর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, যাকে আদৌ পাওয়ার কথা নয় তাকে হারানোর দুঃখ কেমন ক'রে বোঝাবো তোমাকে।

কান খাড়া ক'রে শোনে গালিব, তার মনে হয় কি একটা রহস্যবিন্দু আছে সুখানন্দর মনে। জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না।

হঠাৎ সুখানন্দ বলে ওঠে, কলমের ডাল ভাঙলেও সমান কষ্ট হয় গাছের, কি বলো, মীর্জা সাহেব।

পণ্ডিতজী, জুড়ে গেলে কলমের ডাল যে গাছের আপন হয়ে যায়।

তাই তো বলছি, সমান লাগে।

এবারে গালিব সাহস সঞ্চয় ক'রে শুধায়, বুঝতে পারে, সুখানন্দ কিছু বলতেই চায়, কেবল প্রশ্ন করবার অপেক্ষা. শুধায়, পণ্ডিতজী, অনেকদিন তোমার কথা শুনে মনে হয়েছে, তোমার মনের মধ্যে কোথাও একটা খোঁচ আছে।

কি বিষয়ে খোঁচ মীর্জা সাহেব?

তোমার চেয়ে বেশী জানবে কে? তবে বোধ হয় তুলসী মাইকে নিয়ে কিছু একটা হবে।

বলি-কি-না বলি দ্বিধায় কাঁপে সুখানন্দর মন। যে কথা কাউকে বলে নি, কাউকে বলতে হবে ভাবে নি, নিজের মনের মধ্যেও অনেকগুলি বছরের বিস্মৃতি চাপিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছিল আজ সেই কথা বলবে কি? আর বললেই বা কি ক্ষতি? দু'দুবার হাত ফস্‌কে অতল জলে তলিয়ে গেল যে—সে তো চিরকালের জন্যই গিয়েছে।

স্বপ্নে আবৃত্তির মতো সে বলে চলল, মীর্জা সাহেব, তুলসী আমার কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে।

এতখানি রহস্য আছে ভাবতে পারে নি গালিব, অভিভূতের মতো বলে ওঠে,

কুড়িয়ে পাওয়া ?

সুখানন্দ বলে যায়, তিন মাসের একটি মেয়ে মারা যাওয়ার পরে আমার স্ত্রী পাগলের মতো হয়ে উঠল, দাও আমার মেয়ে ফিরিয়ে দাও।

বলে যায় সুখানন্দ, একটি গরীব পরিবারের, তারা আমাদেরই সবর্ণ, একটি ঐ বয়সের মেয়েকে কিছু টাকা দিয়ে নিয়ে নিলাম। কানাঘুষায় বুঝলাম তারাও প্রতিপালনের প্রতিশ্রুতিতে পেয়েছিল মেয়েটিকে, আপন হ'লে টাকার লোভেও দিত না।

এই নাও তোমার মেয়ে, বলে দিলাম স্ত্রীর কোলে। সে বলে উঠল, এই তো আমার মেয়ে, সেই নাক, সেই চোখ, সেই কপাল।

বুঝতে পারে নি কি ?

বুঝতে চায় নি, ভুল বুঝতে চেয়েছিল। আর বুঝুক না বুঝুক কোনদিন ব্যবহারে প্রকাশ পায় নি, তারপরে শ্মশানে গিয়েছে পুড়ে। ভেবেছিলাম, মীর্জা সাহেব, এ কথা প্রকাশের দায়িত্বও চিরকালের জন্য শেষ হয়ে গিয়েছে।

তারপরে, এতক্ষণ পরে বৃদ্ধ সুখানন্দ ডুকরে কেঁদে উঠল, মীর্জা সাহেব, তুলসী আমার আপন মেয়ের চেয়ে অনেক বেশি। মীর্জা সাহেব, আপন মেয়ে জন্ম থেকেই আপন আর আমার এই কুড়িয়ে পাওয়া মাকে পলে পলে দিনে দিনে, বছরের পরে বছরে হাড় পাঁজরের সঙ্গে জুড়ে নিতে হয়েছে, শিরাতন্তুর সঙ্গে জুড়ে নিতে হয়েছে, জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গে জুড়ে নিতে হয়েছে। মীর্জা সাহেব, পথে যাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, পথ আবার তাকে কুড়িয়ে নিয়ে গেল। ওরে মা আমার !

বলে সেই অন্ধকার ঘরে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো বৃদ্ধ পিতা।

গালিব বাধা দিল না, চোখের জলে হাল্কা হোক মন। গুন গুন সুরে বারম্বার একটি গজল আবৃত্তি ক'রে চলল সে—

কুড়িয়ে পেলাম গোলাপকুঁড়ি গাছের তলে
কুড়িয়ে পেলাম মুক্তা অমূল অতল জলে।
আকাশ পথে স্বপন বুড়ী
কুড়িয়ে পেল তারার নুড়ী,
কুড়িয়ে পাওয়া জুড়িয়ে দিল সব গরলে ॥

হঠাৎ দরজায় জোর ধাক্কা পড়ে। স্বপ্নের জাল, চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গিয়ে রুমালী, তুলসী, এলবিয়ন বিবি ও জীবনলাল ধড়ফড় ক'রে জেগে ওঠে। সবাই ভাবে, কি হ'ল ? রুমালী ভাবে, এলো নাকি ? নিচের তলায় কয়েকজন

মীর্জাপুরী মুসলমান ছিল, মসলন্দ বয়ন তাদের ব্যবসা। তারা ডাণ্ডা হাতে বেরিয়ে আসে, বহিনজী, ডরো মৎ, হামলোগ হ্যায়।

রুমালী ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে দেখে—কাকস্য পরিবেদনা, ভোরবেলায় পথে জড়প্রাণী নেই। এবারে সাহস পেয়ে দরজা খোলে, সামনে দাঁড়িয়ে পল্টন।

কি বহিন, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে বুঝি?

যেমন জোরে দরজা ধাক্কাচ্ছিলি, ভয় পাওয়ারই কথা, দরজা ভেঙে যাবে যে।

মীর্জাপুরী মুসলমানদের একজন এগিয়ে এসে শুধায়, পল্টন কোথায়?

আমি একাই পল্টন, দেখতে পাও না?

ফালতু বাত ছোড়ো, সিপাহী লোগ আয়া কি নেহি?

পল্টন ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বলল, আয়া, তারপরে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বলল, নেহি। দুয়ে মিলে দাঁড়ালো আয়া নেহি।

সবাই অবাক হয়ে তাকায়, অর্থ বুঝতে পারে না। তখন পল্টন ব্যাখ্যা করে।

বুঝলে না বহিন, গউস মহম্মদ বলো, কুলিজ খাঁ বলো, আজ কোন শালা লোকের এদিকে হামলা করবার উপায় নেই।

কেন রে?

বখৎ খাঁর হুকুম।

হঠাৎ বখৎ খাঁর এত সুমতি হ'ল কেন?

বখৎ খাঁর এত সুমতি কি সাধে হয়েছে? বখৎ খাঁ খবর পেয়েছে, আজ কোম্পানীর ফৌজ চড়াও হবে শাহবুরুজের উপরে। ওখানকার কামানগুলো দখল না করতে পারলে তারা আর টিকতে পারছে না।

বেশ, তাহলে—

তাহলে আর কি! বখৎ খাঁর কড়া হুকুম সকলকে খাড়া তৈয়ার থাকতে হবে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রুমালী বলে ওঠে, যাক বাঁচা গেল।

বহিন, তুমি তো বাঁচলে, ওরা বাঁচলে হয়।

এমন সময় জীবনলালকে দেখতে পেয়ে পল্টন বলে ওঠে, রাতে নিদ হ'ল?

খুব ঘুমিয়েছি ভাই পল্টন, তার উপরে তুমি যা খাইয়েছিলে!

চলো আর একবার খাইয়ে আনি।

না ভাই, আজ আর সময় হবে না। এখনি ফিরে রওনা হ'তে হবে।

মুহূর্তকাল আগেও সে ভাবে নি যে এত শীঘ্র ফিরবে, কিন্তু যেমনি শুনলো যে, কোম্পানীর ফৌজ আজ শাহবুরুজ আক্রমণ করবে অমনি সে চঞ্চল হয়ে উঠল। এই কয়েকশ' গজ দূরে দুই দলে লড়াই চলবে আর সে নীরব দর্শক-

মাত্র হয়ে বসে থাকবে, এ হ'তেই পারে না। রুমালীর দিকে তাকিয়ে বলে, বহিন, সকালবেলাতেই আমাকে বের হয়ে পড়তে হবে, অনেক দূরের পথ।

রুমালী ছাড়া আর কেউ জানে না যে, জীবন কোম্পানীর রেসালাদার।

রুমালী ও জীবন, দুজনের মনেই একসঙ্গে ভেসে ওঠে, যে জন্যে জীবনের এখানে আগমন তার তো কিছুই হ'ল না। জীবনকে যে আটকানো যাবে না, যুদ্ধের বাজনায় তার ধমনী চঞ্চল হয়ে ওঠে, রুমালী তা জেনেছিল আগের দিনের অতর্কিত যুদ্ধে জীবনের ব্যবহার দেখে। জীবন অবশ্যই রওনা হয়ে যাবে, তার আগে এলবিয়ন বিবির সঙ্গে দেখা ক'রে নিক এই তার ইচ্ছা।

রুমালী বলল, ভাই, পথে তোমার কি কোম্পানীর ছাউনি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ?

কেন বলো তো ?

এলবিয়ন বিবির খবরটা যদি পৌঁছে দাও।

খুব দিতে পারি। তবে তার আগে ওর নামধাম জানা দরকার।

চলো না, এলবিয়ন বিবির সঙ্গে দেখা করবো।

দুজনে এলবিয়ন বিবির ঘরে প্রবেশ করে, রুমালী পরিচয় করিয়ে দেয়, আমার ভাই, কাল এসেছে, আজ দেশে ফিরে যাচ্ছে। আর ইনি এলবিয়ন বিবি।

জীবন বলে, গুড মর্নিং মিস্ এলবিয়ন। আমার পথটা কোম্পানীর ছাউনি হয়ে গিয়েছে। তোমার যদি কোন খবর থাকে তো পৌঁছে দিতে পারলে আনন্দিত হবো।

এলবিয়ন বিবির চোখেমুখে এক লহমার জন্যে ব্যাকুলতার আভা পড়ে, অনাবৃষ্টির ক্ষেতের উপরে চলতি মেঘের ছায়ার মতো, কিন্তু তার পরেই মাংসপেশী কঠিন হয়ে ওঠে। সে প্রবর্তন ও পরিবর্তন এমনি স্পষ্ট যে, এড়ায় না রুমালী ও জীবনের চোখ।

নো, থ্যাঙ্কস, মিস্টার।

যদি তুমি অনুমতি করো তবে তোমার আত্মীয়স্বজনের খবর করতে বলতে পারি। কর্নেল ব্রিজম্যান, মেজর রীড, মেজর স্কট প্রভৃতির সঙ্গে সামান্য পরিচয় আছে আমার।

আবার ব্যাকুলতা ও কঠিনতার স্বতোবিরুদ্ধ তরঙ্গ খেলে যায় মিস এলবিয়নের মুখে।

নো থ্যাঙ্কস্। আই অ্যাম সরি টু রিফিউজ ইওর কাইণ্ড্ অফার।

এবারে সে ঘর ছেড়ে যায়।

জীবন বোঝে, ইংরেজের গোলা ও ইংরেজ নারীর গোঁ সমান। তবে তার ধারণা হয়, এই মেয়েটি মিস্ এলিনা ক্লিফোর্ড ছাড়া আর কেউ নয়। রুমালীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, ভাখো, আমি গিয়ে বলি, দেখি কি ব্যবস্থা ওরা করতে বলে।

সতর্ক ক'রে দিয়ে বলে, ইতিমধ্যে তুমি লক্ষ্য রেখো, ও যেন উধাও হয়ে না চলে যায়।

রুমালী বলে, কোথায় যাবে, আর এতদিন পরে কেনই বা যাবে। শুধায়, জীবন, তুমি আবার কবে ফিরবে?

সৈনিকের গতিবিধি তো তার ইচ্ছাধীন নয়, তবে মনে হয় শীঘ্রই ফিরতে হবে। আবার খবর নিতে পাঠাবে ব্রিজম্যান।

এসো খাবে।

খেতে বসে জীবনের কেবলি মনে হতে থাকে, ঐ তুলসীবাঈ যদি একবার ঘরে ঢুকতো। ভাবে যাওয়ার সময়ে নিশ্চয় আসবে। কিন্তু না, যাওয়ার সময়েও এলো না তুলসীবাঈ। তার মনে গতরাত্রির হঠকারিতা, রুমালীর মনে গত রাত্রির সান্দগ্ধ বিতৃষ্ণা—দুয়ে মিলে আড়ালে রাখলো তুলসীকে। কাজেই দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বিদায় নেয় জীবন।

রুমালী বলে, পল্টন, আমার ভাইকে শহর থেকে বের হওয়ায় ব্যবস্থা করে দে।

এ আর এমন কঠিন কি। কলকাত্তা দরবাজা দিয়ে বের হয়ে যমুনার চর বরাবর সোজা উত্তর দিকে আধ ক্রোশ গিয়ে তারপরে যেদিকে খুশি যাও।

জীবন বলে, এ মন্দ পরামর্শ নয়।

রুমালী বলে, তবে কলকাত্তা দরবাজা পর্যন্ত সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা। দেখিস কেউ যেন সন্দেহ না করে।

সন্দেহ করলেই হ'ল? সঙ্গে পল্টন আছে না।

পল্টন আর জীবন রওনা হয়ে যায়। কতক দূর গিয়ে গলির মোড় ঘুরবার আগে জীবন ফিরে তাকায় বাড়িটার দিকে। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পায় দেয়ালে মানুষপ্রমাণ উঁচুতে ঘুলঘুলির গোল ফ্রেমে বাঁধানো একখানি কচি মুখে অতলস্পর্শ দুখানি চোখ। ভালো ক'রে দেখবার আশায় ঘুরে দাঁড়াতেই ফ্রেমখানা শূন্য হয়ে যায়। হতাশ্বাসে মন ভরে ওঠে।

পল্টন বলে, জলদি চলো ভাই, আজ লড়াই হবে, দরবাজা বন্ধ ক'রে দিতে পারে।

নাঃ, ফ্রেমখানা শূন্য পড়ে আছে। আশাভঙ্গের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলতে

শুরু করে জীবন। কিন্তু তখনি মনে পড়ে চার চোখে মিলেছিল নিশ্চয়—নইলে ক্রেম শূন্য হ'তে গেল কেন? তখনি অব্যক্ত আনন্দে মন ভ'রে ওঠে। জোরে পা চালায় সে।

॥ ৬ ॥

"কাহারে হেরিনু? সে কি সত্য, কিম্বা মায়া?"

জীবন যখন হিন্দুরাও কুঠিতে এসে পৌঁছল তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, শাহবুরুজ আক্রমণে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা তার সফল হয় নি। সে ভেবেছিল যমুনার চর বরাবর চলে এসে মেটকাফ সাহেবের কুঠিতে পৌঁছে পশ্চিমে ফিরে কোম্পানীর ছাউনিতে গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু শহর থেকে বের হয়ে দেখলো যমুনার চর বরাবর সিপাহী পাহারা। বুঝলো যে, কোম্পানী-পক্ষ থেকে আগুনের ভেলা ভাসিয়ে নৌ-সেতু পুড়িয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা হয়েছিল, তারই প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সতর্কতা। তখন সে বাধ্য হয়ে নৌ-সেতু যোগে অপর পারে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তারপরে খানিকটা উজিয়ে গিয়ে খেয়ায় নদী পার হয়ে অনেক ঘুরে কোম্পানীর ছাউনিতে এসে পৌঁছলো।

হিন্দুরাও কুঠিতে আর কেউ জীবনের উপস্থিতি জানবার আগেই জানতে পেলো ক্যালিবান। উল্লাসে কৌতুহলে মেশানো এক বিচিত্র রবে হঠাৎ সে চীৎকার ক'রে উঠল, আর চার হাত পায়ে লাফিয়ে উঠে স্ফীতনাসায় পরিচিত গন্ধ সন্ধান ক'রে এ ঘর ও ঘর করতে লাগল। তারপরে হঠাৎ বাইরে বের হয়ে জীবনকে দেখতে পেয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারস্বরে ডেকে উঠল, সে ডাক কতকটা অভ্যর্থনায়, কতকটা উল্লাসে, কতকটা স্বস্তিতে মেশানো। এই চব্বিশ ঘণ্টাকাল সে অন্নজল ত্যাগ ক'রে নীরবে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল।

তার ডাক শুনে গুরবচন আর স্বরূপ বের হয়ে এলো, ব্যাপার কি? ক্যালিবান ডাকে কেন? এমন সময়ে তাদের চোখে পড়লো জীবনলাল সোজা চলে আসছে কুঠির দিকে।

তাকে দেখে একসঙ্গে গুরবচন আর স্বরূপ আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠল—জীবন ভাই কখন এলে।

এইমাত্র ঘরে ঢুকলাম, এখনো বসতে পারি নি। তারপরে বলল যদি কিছু খাদ্য থাকে দাও, খিদেয় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।

তখনি ওরা চাপাটি লাড্ডু আর এক লোটা জল নিয়ে এলো। আগে হাতমুখ

ধুয়ে খানিকটা জল পান করে নিয়ে খেতে শুরু ক'রে দিলো, বলল, তারপরে এদিকের খবর কি বলো?

গুরবচন বলে, খবর বড় ভালো নয়। শাহ্‌বুরুজের কামান দখল করতে গিয়ে আজ আমাদের বড় ক্ষতি হয়েছে।

জীবন খেতে খেতে বলল, আমাদের কম পাল্লার কামান নিয়ে শাহ্‌বুরুজের কাছে যাওয়া ঠিক হয় নি।

সে তো সবাই জানি, কর্নেল সাহেবও জানে, কিন্তু একেবারে কমাণ্ডার-ইন-চীফের হুকুম, না করবার উপায় নাই।

ক্ষতির পরিমাণ কি রকম?

তা হতাহত শ'দুই।

এভাবে ক্ষতি বেড়ে চললে শেষ পর্যন্ত দিল্লি অধিকার করবার মতো ফৌজের অভাব দেখা দেবে।

অসম্ভব নয়, বলে গুরবচন।

তবে?

তবের মধ্যে এই যে, আজ বিকেলে কর্নেলের কাছে দু'খানা চিঠি এসে পৌঁচেছে, অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো।

জীবন বলে, অন্ধকার তো দেখতেই পাচ্ছি, এবারে আশার আলো কি শুনি?

জেনারেল নিকলসন ভারি কামান আর পেশবারী পল্টন নিয়ে দু'দশ দিনের মধ্যেই পৌঁছবেন।

জীবন স্বীকার করে, হাঁ, এ আশার আলো বটে। জেনারেল নিকলসন একাই একটা পল্টন। আর একখানা চিঠি কার?

কর্নেল ক্রসম্যানের। তিনি নৈনিতাল হয়ে বেরিলি পৌঁছে জানিয়েছেন যে, শীঘ্রই কিছু ফৌজ নিয়ে এসে পৌঁছবেন আর সঙ্গে আনবেন এমন একটা আশ্চর্য অস্ত্র, যার সামনে পড়লে সিপাহী কেন খোদ শয়তান অবধি হার মানবে।

এমন অস্ত্র তো আমার জানা নেই।

কর্নেল সাহেবদেরও জানা নেই, বলে গুরবচন।

তুমি জানলে কি ক'রে?

ব্রিজম্যান, স্কট, রীড আর ক্লিফোর্ড নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে শুনতে পেলাম।

ক্লিফোর্ডের উল্লেখে স্বরূপ বলে ওঠে, এতক্ষণ সে চুপ ক'রে শুনে যাচ্ছিল, সামরিক বিষয়ের মধ্যে কথা বলা সে পছন্দ করে না, বলে ওঠে, যে জন্যে গিয়ে-

ছিলে তার কি হ'ল? সে মেয়েটাকে ক্লিফোর্ডের বোন বলে কি মনে হ'ল?

জীবন উত্তর দেওয়ার আগেই গুরবচন বলে, সত্য কথা বলতে কি ভাই, তোমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম আমরা, কর্নেল সাহেবও।

কেন?

কেন কি! ঐ ক্যাভালরি চার্জের মধ্যে কোথায় যে তুমি গেলে, কোথায় বা গেল তোমার ঘোড়াটা। কি আর ভাববো বলো। কর্নেলের হুকুমে অবজারভেটারি টাওয়ারে উঠে অনেকক্ষণ ধরে দুরবীন কষেও হদিস পেলাম না।

গুরবচন বলে, একবার কর্নেল বললেন, জীবন নিশ্চয় শহরের মধ্যে চলে গিয়েছে।

আমি শুধাই, ঘোড়াটার কি হ'ল তবে?

তাও তো বটে, ঘোড়াটা গেল কোথায়? না, না, জীবন মরতে পারে না, কিছুতেই পারে না।

এবারে স্বরূপ বলে, সে সমস্যার সমাধান তো হয়েছে। সেই মেয়েটার পরিচয় কিছু পেলে?

পরিচয় পেলাম না, কেননা ছিল না, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস মেয়েটি এলিনা ক্লিফোর্ড ছাড়া কেউ নয়।

এখন উপায়?

জীবন বলে, উপায় আর কি? কর্নেল পাঠিয়েছিলেন তাঁকে রিপোর্ট করবো, তারপর যা করবার তিনি করবেন।

গুরবচন বলে, তবে চলো যাই কর্নেলের কাছে।

না ভাই, আজ আর পা চলছে না, কাল সকালে রিপোর্ট করলেই হবে।

ইতিমধ্যে আহার শেষ হয়েছে। পাতে যা বেঁচেছিল ক্যালিবানের সম্মুখে ধরে দিতে সে বারকয়েক শুঁকে দু'এক টুকরো রুটি খেল। জীবন আঙুল দিয়ে বারকয়েক তার মাথাটা চুলকে দিল, ক্যালিবানের মুখ দেখে মনে হ'ল সে ভারি আরাম পাচ্ছে।

এমন সময়ে স্বরূপ শুধালো, দিল্লি কেমন দেখলে জীবন ভাই?

কেমন দেখলাম? এক কথায় তো বলা যাবে না। ও যেন আমার অনেক জন্মের বাসস্থান।

স্বরূপ বলে, নিজ বাসস্থানের এমন প্রশংসা শুনে ভারি আনন্দ হচ্ছে। আর একটু খুলে বলো।

আজ মাপ করো ভাই, কাল বলবো, অবশ্যই বলবো।

এই বলে সে নিজ চারপাইতে গিয়ে শুয়ে পড়লো, পায়ের কাছে মাটিতে

পাতা একখানা চটের উপরে শুয়ে পড়লো ক্যালিবান।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায় জীবনলালের, বিছানায় শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙে গিয়ে মনটা ভারি প্রফুল্ল বোধ করলো, আরামে আনন্দে স্বস্তিতে মেশানো কেমন একরকম ভাব। সারাদিনের ক্লান্তির বোঝা কখন যেন ঘুমের মধ্যে খুলে প'ড়ে গিয়ে শরীরটা পাখির পালকের মতো হাল্‌কা হয়ে গিয়েছে, আর সে যেন বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। এত আরাম এত আনন্দ আগে আর কখনো পায় নি। এই আকস্মিক অভিজ্ঞতার হেতু বুঝতে পারে না, অবাক হয়ে কারণ অনুমান করতে চেষ্টা করে। একদিকে শরীরটা যেমন হাল্‌কা হয়েছে তেমনি আর একদিকে মনের মধ্যে জ্বলে উঠেছে আলো। চারদিক একেবারে আলোয় আলোময়। কোথা থেকে এলো এত আলো, এমন বিমল যার প্রভা।

জীবন যদি বুঝতে পারতো তবে বুঝতো যে, এই আলোর পিচকারি আসছে কোন একটা ঘুলঘুলি থেকে, যেখানে একজোড়া চোখ মুগ্ধ ব্যাকুলতায় তাকিয়ে ছিল বিদায়ক্ষণে, আবার কে বলতে পারে যে সেই চোখ জোড়াই ব্যাকুল প্রত্যাশায় তাকিয়ে নেই পথের মোড়ে, যেখানে যে-কোন মুহূর্তে একটি মূর্তি জেগে উঠতে পারে। না, এত কথা বুঝতে পারে না জীবন। শুধু বোঝে যে, ঘরটা আলোয় আলোময়। যদি আরও বেশি বুঝতো তবে জানতে পারতো যে, আলো আগেও জ্বলেছিল তবে এবারে কিছু বিশেষ আছে। পান্নার সঙ্গে পরিচয়ে জীবনের মনের মধ্যে আলো জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু পান্না সরে যেতেই ঘর আবার তেমনি অন্ধকার। পান্না প্রদীপ, তার শিখায় জীবনের ঘর আলোয় ভ'রে গিয়েছিল। কিন্তু এবারে যে সে নিজেই প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠেছে। এ আলোর আর সরবার ভয় নাই।

অনভিজ্ঞ জীবন জানে না যে, প্রত্যেক মানুষ একটি প্রদীপ, তবে শিখার সঙ্গে সলতের যোগ না হওয়া পর্যন্ত সে নির্বাপিত। এমন হতভাগ্যের অভাব নেই,— না, তাদের সংখ্যাই অধিক, যারা শিখার জ্যোতিষ্কর স্পর্শের অভাবে নির্বাপিত অস্তিত্ব যাপন ক'রে একদিন ভেঙে যায়। কিন্তু কখনো কখনো কারো কারো ভাগ্যে শিখায়-সলতেয় শুভ যোগাযোগ ঘটে, জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে তারা। জানতেও পারে না কখন লেগেছিল শিখার সঙ্গে সলতেটি, অতর্কিতে চমকে ওঠে আলোয় ভরা ঘর দেখে। নির্বাপিত দীপ নিয়ে জীবন ঢুকেছিল দিল্লিতে, ফিরে এসেছে জ্বলন্ত দীপ নিয়ে। কোথায় লাগলো শিখার স্পর্শ? সে কি সেই

ঘুলঘুলির সেই জোড়া চোখের দেউটি? জীবন জানে না। প্রেমিক জানবার আগেই অপরে জানে যে লোকটার দীপ জলে উঠেছে। প্রেম পরস্মৈপদী আর কাম আত্মনেপদী।

এ সময়ে কেউ যদি জীবনকে বলতো যে, তুলসী নামে মেয়েটিকে সে ভালোবাসে, তবে সত্যই বিস্মিত হ'ত জীবন, অস্বীকার করতো সমস্ত ব্যাপারটা। প্রথম দর্শনে প্রেম হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু প্রেমের প্রথম দর্শন যে প্রায়ই জানতে পাওয়া যায় না। কখন কোথায় চোখে চোখে ছোঁয়া লাগে, জ্বলে ওঠে আলো, যাদের চোখ তারা ভাবে বাইরে থেকে এলো আলো, চোখ থেকেও যে আলো ঠিকরে পড়তে পারে, ভাবতে পারে না। অবশেষে অনেক বুঝে অনেক খুঁজে যখন বোঝে তখন হয়তো তেল গিয়েছে ফুরিয়ে, নয়তো সলতে গিয়েছে শেষ হয়ে, কিম্বা হয়তো বা আলোটাই গিয়েছে নিবে, যদিচ গোধূলির আভায় তখনো আকাশ উজ্জ্বল।

এই সব অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার কারণ খুঁজতে খুঁজতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙলো দেখলো গুরবচন সিং দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছে।

কি ব্যাপার ভাই গুরবচন?

তুমি ফিরে এসেছ শুনে কর্নেল সাহেব খুব খুশী হয়েছেন, ডাকছেন।

চলো যাচ্ছি।

ক্যালিবান জেগে ব'সে ছিল। তার মাথাটা একবার নেড়ে দিয়ে জীবন বেরিয়ে পড়লো ব্রিজম্যানের উদ্দেশে।

ব্রিজম্যানের কাছে উপস্থিত হ'লে মামুলী কুশল প্রশ্নোত্তর আদান প্রদানের পরে কর্নেল শুধালো, সেই ইংরেজ মেয়েটিকে দেখে কি মনে হ'ল?

সরাসরি তো কোন উত্তর দেয় না, তবে বয়স ও পরোক্ষ পরিচয় থেকে মিস ক্লিফোর্ড ব'লেই মনে হয়।

আমাদের ছাউনিতে আসতে রাজী হবে কি?

প্রস্তাব করেছিলাম, সংক্ষেপে না করেছিল।

মিস্টার ক্লিফোর্ড গেলে হয়তো রাজী হ'ত।

জীবন ব'লে ওঠে, এমন প্রস্তাব করবেন না। শ্বেতাঙ্গের পক্ষে এখন দিল্লি প্রবেশ অসম্ভব। আর তেমন অসম্ভব সম্ভব হ'লেও চেষ্টা করা উচিত নয়, কেননা যারা সেই মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছে তাদের প্রাণহানি সুনিশ্চিত।

ইউ আর রাইট, জীবন। না, ক্লিফোর্ডকে আদৌ জানানো চলবে না, তাহলে সে এখনই এমন এক কাণ্ড ক'রে বসবে, হয়তো একাই রওনা হয়ে যাবে দিল্লিতে।

অসম্ভব নয়, বলে জীবন।

কিন্তু জীবন, মেয়েটিকে এখানে আনবার কি উপায়?

আর একবার গিয়ে অনুরোধ করতে পারি।

আর একবার যাবে? বিপদ তো আছে!

দেশী লোকের পক্ষে তেমন কিছু নয়, বিশেষ নিরাপদ পথঘাট চিনে এসেছি।

ভেরি গুড। তবে এবারে এক কাজ করো, কমাণ্ডার-ইন-চীফের কাছ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে যাও।

ব্যক্তিবিশেষের উল্লেখ থাকলে আর চিঠি ধরা পড়লে তার প্রাণহানির আশঙ্কা।

ব্যক্তি বিশেষের উল্লেখ থাকবে কেন? এইভাবে থাকবে যে To whom it may concern. পত্রবাহক আমাদের বিশ্বস্ত উচ্চপদস্থ রেসালাদার। যদি কেউ স্বেচ্ছায় কোম্পানির ছাউনিতে আসতে চায় তবে পত্রবাহক তাকে সাহায্য করবে।

এ রকম চিঠিতে কাজ হওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু চিঠিসুদ্ধ ধরা পড়লে যে তোমার বিপদ।

সৈনিকের বিপদ কখন নেই!

কখন রওনা হবে?

বিকেলের দিকে।

তবে তিনটার সময়ে এসে আবার রিপোর্ট ক'রো, ইতিমধ্যে আমি সি-এন-সির কাছে গিয়ে চিঠি নিয়ে আসছি। এখন যাও।

জীবন স্যালুট ক'রে বিদায় নেয়।

॥ ৭ ॥

"The rabble is let loose
It grows uproarious."

—Faust

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে, ইংরেজ সৈন্য পাহাড়ে ছাউনি স্থাপন করবার কয়েক দিন আগে, বেরিলি থেকে বখৎ খাঁ দিল্লি এসে পৌঁছল, সঙ্গে কয়েকশ' ঘোড়সওয়ার আর চার লক্ষ টাকা। বাদশার কাছে হাজির হয়ে রীতিমতো কুর্নিশ ক'রে জানালো যে, সে নিজে আর তার রেসালা বাদশার জন্যে জান কবুল করতে এখানে এসেছে, সেই সঙ্গে জানাতে ভুলল না যে, টাকার জন্যে বাদশাকে চিন্তা করতে হবে না, চার লাখ টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। শূন্য তহবিলের মালিকের কাছে চার লাখ টাকা মস্ত যুক্তি। বাদশা তখনই বখৎ খাঁকে সিপাহ্‌সালার বা

কমাণ্ডার. ইন-চীফ পদ দান করলেন। এতদিন ঐ পদে ছিল শাহ্‌জাদা মীর্জা মুঘল, তাকে এক ধাপ নামিয়ে নিযুক্ত করা হ'ল এডজুট্যাণ্ট জেনারেল। কাজেই মীর্জা খিজির সুলতানকে আর এক ধাপ নেমে কর্নেল পদ নিতে হ'ল। ফলে মীর্জা আবুবকরকে আর এক ধাপ নামতে হ'ল। সেখানে অন্য কোন পদ না থাকায় সে নিরুপাধিক মীর্জা আবুবকর মাত্র রয়ে গেল। এর পরিণাম হ'ল এই যে, শাহ্‌জাদারা বখৎ খাঁর উপরে হাড়ে হাড়ে চটে গেল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এত ঠেলাঠেলি, শাহ্‌জাদাদের অধোগমনে সেটি সফল হ'ল না। বখৎ খাঁ টাকা হাতছাড়া করল না।

খেলাৎ বিতরণ ও পদ নির্ধারণ ক'রে বাদশা বখৎ খাঁকে বললেন, এবারে টাকাটা খাজাঞ্চিখানায় জমা ক'রে দাও।

বখৎ খাঁ দস্তুরমতো কুর্নিশ ক'রে বলল, বহুৎ খুব শাহেনশা, খাজাঞ্চি সাহেব খুব এলেমদার লোক, কিন্তু তিনি লড়াইয়ের কি জানেন। টাকা থাকবে সিপাহ্‌-সালাদের হাতে।

বাদশা বলেন, সে কি কথা! তুমি যে বললে টাকা এনেছ বাদশার জন্যে।

এনেছি বইকি জাঁহাপনা, শুধুই টাকা কেন জানটাও এনেছি।

তবে?

তবে আর কি, লড়াইও বাদশার জন্যে, টাকাও।

বাদশা বোঝেন যে, মীরাটের কুলিজ খাঁ আর বেরিলির বখৎ খাঁ দুজনেই এক গোত্রের মানুষ। তারা নামে নফর হয়ে কাজে মালিক হ'তে চায়। তিনি আর কিছু বললেন না, বললেন, সে-ই ভালো।

বখৎ খাঁ জানে যে, টাকার টানাটানিতেই বাদশার বাদশাহী, নবাবের নবাবী যাওয়ার দাখিল, সেই টাকার জোরেই সে আজ সিপাহ্‌সালার। এখন উক্ত আসল অস্ত্রটি হস্তচ্যুত হলে সিপাহ্‌সালার পদটাও লোপ পাবে।

শাহ্‌জাদারা সোজা কুলিজ খাঁর কাছে গিয়ে বলল, খাঁ সাহেব, এ কি রকম ব্যাপার? তুমি সকলের আগে এসে বাদশার কাছে হাজির হয়েছ, তবে বখৎ খাঁ সিপাহ্‌সালার হয় কোন্ গুণে?

অল্পেই উত্তেজিত হয়ে উঠল কুলিজ খাঁ, বলল, ইয়ে বাৎ ঠিক হ্যায়।

তখন শাহ্‌জাদার দল, কুলিজ খাঁ আর শেখ বান্নু একজোট হয়ে বখৎ খাঁর বিরুদ্ধে লাগলো।

বখৎ খাঁ কোম্পানীর ফৌজে রেসালাদার মেজর ছিল, বিচক্ষণ যোদ্ধা না হয়েও যুদ্ধ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা ছিল তার। সে বুঝল যে, যুদ্ধ তো

পরের কথা, আগে দরকার শহরের মধ্যে শৃঙ্খলা। সেই সঙ্গে দরকার প্রাচীর পরিখা বুরুজ প্রভৃতি মেরামত ক'রে যুদ্ধোপযোগী ক'রে তুলবার জন্যে শিক্ষিত এঞ্জিনীয়ার। মহম্মদ আলি খাঁকে খুঁজে বার করলো, আগেও সামান্য পরিচয় ছিল দুজনের, দুজনেই বেরিলির লোক, তাকে নিযুক্ত করলো চীফ এঞ্জিনীয়র! অনেক দিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবার পরে কিছু কাজ পেয়ে বেঁচে গেল আলি খাঁ।

সন্ধ্যাবেলায় খুরশিদ বাঈয়ের ঘরে গিয়ে সুরযপ্রসাদকে আলি খাঁ বলল, এত-দিনে একটা জঙ্গী আদমী এসেছে, এবারে কাজ হবে।

সুরযপ্রসাদ ফরাসের উপরে গড়াতে গড়াতে বলল, আরে ইয়ার, জঙ্গী আদমীর কি অভাব ছিল? বাদশার তাঞ্জাম থেকে, ইমানী বেগমের কুঠির সামনে থেকে যারা আওরৎ লুট ক'রে নিতে পারে—তারা যে একেবারে জঙ্গ বাহাদুর।

আলি খাঁ বলে, এবারে তাদের বাহাদুরি বের হবে। বখৎ খাঁর কানে কথাটা উঠেছে, নালিশ রুজু করেছে বাদশার দরবারে।

বলি আলি ভাই, লোকটা কে জানো তো?

কে না জানে?

তবে?

এ আর কেউ নয়, সিপাহ্সালার বখৎ খাঁ।

আর সে যে খোদ বাদশার নাতি, পাটহাতী।

হাতী তো পিলখানায় যাক। শহরের মধ্যে শুঁড় নেড়ে বেড়ানো চলবে না।

এবারে তাকিয়াটা জুত ক'রে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সুরযপ্রসাদ বলে, ভাই আলি খাঁ, তোমার মাথায় যে কি ভূত আছে কে জানে? কোম্পানির পাকা চাকরি ছাড়লে, আবার এখন কিনা বলছ বাদশার নাতি সাজা হবে।

দুদিন সবুর ক'রে গ্যাখোই না কি ঘটে।

যা ঘটবে তা দেখতে কি বাকি আছে।

কুচ্ছু হবে না ভাই, কুচ্ছু হবে না। মরতে মরবে আমার মতো গরীব লোক।

তুমি গরীব? তোমার না অস্লি হাজার আকবরী মোহর আছে?

ও সব ফালতু কথা ছেড়ে দাও ভাই। যা ছিল বাদশার কাছে নজরানা দিতেই গিয়েছে।

নজরানা কি বলছ? বাদশার তবিলে ধার দিয়েছ।

আমি তো তোমার মতো পাগল হই নি। বাদশা মেহেরবানী ক'রে ধার বলছে, তাই বলে কি আমিও ধার বলবো।

এমন সময় খুরশিদ জান ঘরে ঢোকে, প্রসঙ্গান্তর শুরু হয়ে যায়।

আলি খাঁ কিছু ভুল বলে নি। তুরসী-হরণ প্রচেষ্টা কিছুকাল আগের ঘটনা হ'লেও বখৎ খাঁর কানে আসবামাত্র বাদশার কাছে নালিশ করলো সে, বলল, শহরের মধ্যে এরকম কাণ্ড ঘটতে থাকলে প্রজার মন বিগড়ে যাবে, লড়াই করা চলবে না।

বাদশা সব শুনে বললেন, সিপাহ্‌সালার, শাহ্‌জাদা বলে কাউকে রেয়াৎ করবে না। এর পরে এমন ঘটনা ঘটলে আসামীকে কয়েদ করবে, হোক সে শাহ্‌জাদা, হোক সে রায়ত।

কথাটা শাহ্‌জাদাদের কানে যেতেই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, বখৎ খাঁকে জব্দ করবার উপায় খুঁজতে থাকে। এমন সময়ে উপায় দেখা দেয় নিমচী ফৌজের আকারে।

নিমচ থেকে এক দল ফৌজ এসে পৌঁছল তাদের রেসালাদার ঘউস মহম্মদের নেতৃত্বে। ঘউস মহম্মদের মতো বিশাল-বপু একটা মানুষ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়ে থাকে তার উদর যখন বঙ্গদেশে মাথাটা তখন গুজরাটে। হাতী ছাড়া অন্য বাহনে তার যাতায়াত সম্ভব নয়। লোকে বলতো এক-হাতী মানুষ। নিমচী ফৌজ দেওয়ানীখাসে উপস্থিত হ'লে বাদশা তাদের সঙ্গে কথা না বলে অপ্রসন্নভাবে খোয়াবগায় চলে গেলেন। ঘউস মহম্মদ ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠল, জান দিতে এসে শেষে কিনা এমন অপমান। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ভিতরের জ্বালা বাইরে ফেটে পড়লো যখন বখৎ খাঁ এই হুকুম করলো।

তুমি কে হে বাপু?

বাদশার সিপাহ্‌সালার।

বাদশার কিনা জানি না তবে তুমি আমার সিপাহীশালা।

বটে, এত বড় আস্পর্ধা!

তখনি দুজনে তলোয়ার খুলে দাঁড়ায়, আও, বেইমান।

নিশ্চয় রক্তপাত পর্যন্ত গড়াতো, মাঝখানে মীর্জা মুঘল ও হাকিম আসানুল্লা এসে পড়ে থামায়। ঘটনার বিবরণ সেই দিনেই শহরময় ছড়িয়ে যায়।

সন্ধ্যাবেলায় নিতান্ত অসন্তুষ্ট ভাবে নয়ন প্রবেশ করে খুরশিদ বাঈয়ের কক্ষে। সরাব মিঞা বাঁয়া-তবলা জোড়া সরিয়ে রেখে শুধোয়, মুখে এমন মেঘ নামিয়েছ কেন, কি হ'ল?

কি হ'ল? শালারা লড়বে কোম্পানির সঙ্গে। নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি ক'রেই মরবে।

সরাব বলে, নয়ন ভাই, আমরা তো জান নই, আগে ঘটনাটা বলো,

তারপরে মন্তব্য করো।

ঘটনার স্বরূপ প্রকাশ করে নয়ন, তারপরে বলে, শুনলে তো? এখন এদের উপরেই ভরসা ক'রে আছি যে কোম্পানিকে হটিয়ে দেবে।

এ তো ভালই, বলে শরাব।

কেমন?

আগে হাত উঠুক ভাই, হাত উঠুক, তারপরে দুই হাত একসঙ্গে উঠবে কোম্পানির বিরুদ্ধে।

খুরশিদ বলে, আজকাল আর আলি খাঁকে বড় দেখা যায় না।

সে যে এখন চীফ এঞ্জিনীয়ার, তার ফুরসৎ কোথায়?

খুরশিদ বিনয়ে ও ভয়ে শুধায়, সে কি লড়াই করবে নাকি?

নয়ন গর্জে ওঠে, লড়াই না ছাই। কেবল সরকারী খরচে Rum টানা।

খুরশিদ বলে, আলি খাঁ তো Rum খায় না।

তবে ব্র্যাণ্ডি খায়, বলে নয়ন।

তুলসীহরণ ব্যাপারে কার উপরে রাগ করা উচিত বুঝতে না পেরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরে চটে গিয়েছিল সে, যাকে তাকে যখন তখন যত্রতত্র আঘাত করতো। তার মতে এখন মানুষমাত্রেই বেইমান, স্বরূপ সব চেয়ে বেইমান; সিপাহীপক্ষ হারামজাদা, কোম্পানী তার চেয়েও হারামজাদা।

রুষ্ট ঘউস মহম্মদকে শাহ্‌জাদারা পক্ষপুটে আশ্রয় দেয়। তারা বলে, বখৎ খাঁ কে? আমরা শাহ্‌জাদা, আমরাই তো সব।

তারপরে শাহ্‌জাদারা একে অন্যের অসাক্ষাতে বোঝায়, এর পরে আমিই তো হবো বাদশা।

ঘউস মহম্মদের দেহের অনুরূপ বুদ্ধি, বুঝতে পারে না তিনজনে একসঙ্গে কেমন ক'রে বাদশা হবে? তবে কি হিন্দুস্থান বাঁটোয়ারা হবে?

একদিন জিজ্ঞাসা ক'রেও বসেছিল মীর্জা মুঘলকে, আচ্ছা, শাহ্‌জাদা, আপনি তো বাদশাহ হবেন, বহুৎ খুব। কিন্তু কোম্পানী মানবে কেন? তাদের সঙ্গে তো এখন ফইজৎ।

আরে, খাঁ সাহেব, তোমার মতো রুস্তম যখন আমাদের পক্ষে, কোম্পানীর হারতে কতক্ষণ?

তা বটে, তা বটে।—বলে দাড়িতে হাত বুলোয় খাঁ সাহেব।

নিমচী ফৌজ আর মীরাটী ফৌজ এখন যত না কোম্পানী-বিরোধী, তার চেয়ে বেশি বখৎ খাঁ-বিরোধী। শাহ্‌জাদারা এই ব্যাপারে প্রশ্রয়দাতা, কিন্তু

তাই বলে মনে করা উচিত হবে না যে, নিমচী ফৌজ আর মীরাটী ফৌজ একককাট্টা। মীরাটী ফৌজ বলে, তারা সব আগে এসেছে, তাদের দাবি সকলের উপরে। নিমচী ফৌজ বলে, সবচেয়ে বেশি দূর থেকে তারা এসেছে, তাদের দাবি সকলের উপরে। এই নিয়ে হয়তো দুই দলে রক্তারক্তি হ'ত, কিন্তু বথৎ খাঁর ভয়ে,—বথৎ খাঁর টাকা বেশি, ফৌজ বেশি, পদমর্যাদা সবচেয়ে ভারি,—তাই তার ভয়ে দুই দলে অস্বস্তিকর মিত্রতা বজায় রেখে চলেছে। শাহ্‌জাদাদের চোখ আছে যাতে এই দুই দলে মিত্রতা না ঘটে, আবার এই দুই দল না মিশে যায় বথৎ খাঁর দলের সঙ্গে। মিত্রভেদ দুর্বলের সহায়। সেই নীতির রসিক শাহ্‌জাদারা। শুধু তা-ই নয়, মীরাটী ফৌজ মীর্জা মুঘলের অনুগত, আর নিমচী ফৌজ অনুগত মীর্জা আবুবকরের।

শহরের লোকের মুখে মুখে একটা রসিকতা চলিত হয়েছিল।

কি হে লড়াইয়ের খবর কি ?

লড়াই তো দুটো চলছে, কোনটার খবর চাও ? ভিতরের, না বাইরের, কোনটার খবর জানতে চাও ?

আগে ভিতরের লড়াইয়ের খবরটাই না হয় শুনি।

কালকে চাঁদনীচকে পুরাণচাঁদ শাহুর দোকানে এক দফা হয়ে গেল !

খুলে বলো।

মীরাটী ফৌজের এক সিপাহী গিয়ে পাগড়ীর কাপড়ের দাম করছে, এমন সময়ে বথৎ খাঁর সিপাহী গিয়ে দেড়া দাম কবুল করল।

এমন অদ্ভুত শখ কেন ?

আরে ওদের যে টাকা বেশি।

তারপরে ?

তারপরে আর কি ? দুই সিপাহীর দুই তলোয়ার বের হয়ে পড়লো। পুরাণচাঁদ দরজা বন্ধ ক'রে প্রাণ বাঁচায়।

প্রাণ বাঁচলো ?

প্রাণ বাঁচলো, কিন্তু মাল বাঁচলো না।

কেমন ?

তখন মীরাটী ফৌজ আর নিমচী ফৌজ মিলে দরজা ভেঙে সব লুট ক'রে নিয়ে গেল।

তাহলে জিতলো ওরা।

দাঁড়াও, এখনি শেষ হয় নি। তখন লুটের ভাগ নিয়ে মীরাটী ফৌজের

আর নিমচী ফৌজের তলোয়ার বের হ'ল।

কিরকম ভাগাভাগি হ'ল?

ভাগাভাগি ঐ লুট করাই সার। এর মধ্যে বখৎ খাঁর দলবল এসে সব মাল মাথায় ক'রে নিয়ে গেল।

তার মানে চোরের উপর বাটপাড়ি।

যা বলো।

এ নিত্যকার ঘটনা। এরকম ঘটনা যাতে ঘটতে না পারে, তার চেষ্টায় ত্রুটি করে নি বখৎ খাঁ। শাহ্‌জাহানাবাদের যে অংশটা কোম্পানী ফৌজের মুখোমুখি সেই অংশটা অর্থাৎ কাশ্মীর দরবাজা থেকে আজমীর দরবাজা পর্যন্ত রেখেছিল নিজের ফৌজের অধীনে। আর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অংশ পাহারার ভার দিয়েছিল মীরাটী ফৌজ আর নিমচী ফৌজকে। নিমচী ফৌজের উপরে ভার ছিল কাশ্মীর দরবাজা থেকে সেলিমগড়ের কাছে কলকাতা দরবাজা অবধি আর লালকেল্লার পূব দিক ও দক্ষিণ দিক পাহারার ভার মীরাটী ফৌজের উপরে। কিন্তু হ'লে কি হয়। চাঁদনীচকের উপরে তিন দল ফৌজেরই লোভ—সেখানে বিপদ কম আর বড় বড় দোকানপাট সব সেইখানেই।

মুষ্টিমেয় শাহী ফৌজ পাহারা দিতো লালকেল্লা। তবে সে ফৌজ যে কার অধীন বলা সহজ নয়। বাদশাহ্‌ শাহজাদার দল সকলেই নিজেকে তার মালিক বলে থাকে। মোটের উপরে বোধ করি, তারা অধীনে স্বাধীন। বহুরাজকতার মতো স্বাধীনতা আর নেই—তার অপর নাম অরাজকতা।

মাঝে মাঝে দেখা হয় রজব আলি আর হাকিম আসানুল্লা খাঁর। তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত থাকলে দু'জনে সেলাম বিনিময় ক'রে বিনা বাক্যব্যয়ে সরে যায়, তৃতীয় পক্ষ না থাকলে দুজনে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে, তখন রজব আলি শুধোয়, তারপরে হাকিম সাহেব, দুনিয়ার হালচাল কেমন?

আসানুল্লা হাসিতে হাসির প্রত্যুত্তর দিয়ে বলে, দুনিয়া চলছে দুনিয়ার নিয়মে, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ কি?

এ কি উজীর সাহেবের মতো কথা হ'ল?

আসানুল্লা বলে, আর এ কি বাদশার হেড গোয়েন্দার মতো প্রশ্ন হ'ল?

তখন দুজনে হেসে ওঠে। দুজনেই কথায় তলোয়ার খেলায় পাকা।

এতক্ষণ উজীর ও গোয়েন্দার অভিনয় চলছিল, এবারে কথা শুরু করে ভিতরকার মানুষ দুটো।

লড়াইয়ের গতিক তো ভালো মনে হচ্ছে না।

আসানুল্লা বলে, ভালো মনে হওয়ার কারণ কি কখনো ছিল, রজব আলি সাহেব!

ভরসার মধ্যে ঐ বখৎ খাঁ।

আর তার চীফ এঞ্জিনীয়ার আলি খাঁ।

আর ঐ হেড গোলন্দাজ কুলি খাঁ। কিন্তু তিনজনে কি করবে?

আসানুল্লা বলে, তিনজনেই যথেষ্ট যদি বাকি সবাই লড়াই ভণ্ডুল না করে।

রজব আলি হেসে ওঠে। কথাটা এমন সত্য যে, উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

এবারে আসানুল্লা আবার শুধায়, কোম্পানীর ফৌজ কত হ'ল?

তা হাজার দশেক হবে।

সত্য সত্যই বিস্মিত হয় আসানুল্লা, দ-শ হা-জা-র। বলো কি?

ঠিক কথাই বলছি।

তবে যে এরা বলে চার-পাঁচ হাজারের বেশি নয়।

এরা মানে তো শাহ্‌জাদারা।

আর কারা।

তারা হচ্ছে আপনে মনে মিঞা মিঠ্‌ঠু। তারা যা শুনতে ভালোবাসে, লোকে তাই এসে বলে, তুম্‌হারে মুঁহমে ঘি শক্কর।

জেনারেল নিকলসন আসছে শুনছিলাম।

ভুল শোন নি, বোধ করি দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই এসে পৌঁছবে।

হঠাৎ বলে ওঠে, আসি হাকিম সাহেব, জরুরী কাজ আছে!

আসানুল্লা তাকিয়ে দেখে লোকজন যাতায়াত শুরু করেছে, তখন তারও মনে পড়ে যায় জরুরী কাজ। সেলাম বিনিময় না ক'রেই দুজনে দুদিকে সরে পড়ে।

লড়াইয়ের গতিক মন্দ দেখে বেগম জিনৎ মহলের পক্ষ থেকে এবং শাহ্‌জাদাদের পক্ষ থেকে চিঠি যেতে শুরু করে কোম্পানীর ছাউনিতে। অনেকগুলো চিঠি যায়, উত্তর আসে না একখানিরও। আসানুল্লা ও রজব আলির হাত দিয়েই যায় চিঠিগুলো, তবে তারাও ঠিক জানে না, কে কোন্ পক্ষের চিঠি পাঠাচ্ছে। গোয়েন্দা সব জানে নিজের ঘরের খবর ছাড়া। প্রদীপের তলে অন্ধকার।

মাঝে মাঝে সুখানন্দ যায় গালিবের বাড়িতে। বাদশার সান্ধ্য মজলিশ ভেঙে যাওয়ার পরে এইটিই তাদের আড্ডা। একদিন সুখানন্দ গিয়ে দেখে যে, গালিব

তক্তপোশের উপরে তাল ঠুকছে আর কি যেন লিখছে।

কি লেখা হচ্ছে মীর্জা সাহেব?

এই যে পণ্ডিতজী, আসুন।

কি লিখছেন, নূতন গজল নাকি?

ঠিক ধরেছেন, গজল লিখে বৃষ্টি কমানো যায় কি না তাই পরীক্ষা করছি।

দেবতারা কি এত বশংবদ হবেন?

মনে তো হয় না। এই ক'দিন এত গজল লিখেছি যে বন্যা হয়ে যাওয়ার কথা।

গালিব পড়ে—

আসমানে মেঘ নাই, দরিয়ায় জল,
আঁখির পানিতে মোছে আঁখির কাজল।

বাকিটুকু পরে শেষ করা যাবে। এখন কি খবর?

তারপরে নিজেই শুধোয়, আর কেন, তুলসী মাঈকে এবারে বাড়িতে নিয়ে আসুন।

না, সাহেব, সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো। আমার কুঠির আছে নিত্য বেকার লোকের আসা-যাওয়া, তাই সাহস পাই নে।

নয়নকে খবরটা বলেছেন।

সর্বনাশ, তাহ'লে কি আর রক্ষা আছে! এখনি গিয়ে নিয়ে আসবে, আর তারপরে আবার নূতন ক'রে সর্বনাশ শুরু হ'তে কতক্ষণ?

তবে এখনো কি তার ধারণা—

হাঁ, সে জানে বাদশার তাঞ্জাম থেকে তুলসীকে লুট ক'রে নিয়ে গিয়েছে।

তবু সে এখনো মনে মনে সিপাহীদের দিকে!

মূর্খের অশেষ দোষ, মীর্জা সাহেব, কি আর বলবো। মনে মনে তার কি ধারণা তার মনই জানে। মুখে বলে, এ ঐ স্বরূপের কীর্তি। তার ধারণা স্বরূপ এখনো শহরে লুকিয়ে রয়েছে, আর লোকজন জুটিয়ে তুলসীকে লুট ক'রে নিয়ে গিয়েছে।

নয়ন কি বোঝে না, এ অসম্ভব।

তবে আর মূর্খ কেন?

থাকুক, তুলসী এখনো কিছুদিন লুকিয়ে থাকুক, সেই ভালো।

তারপরে শুধোয়, হাকিম সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় কি?

দেখা হয়, তবে কথাবার্তা বড় হয় না। হাকিম সাহেব এখন চেনা লোক

এড়িয়ে চলেন, তাই আমিও আর দেখি না।

আমার বাড়িতে একদিন এসেছিলেন।

পণ্ডিত শুধোয়, কিছু কথা হ'ল।

গালিব বলে, তার উপরে সিপাহীদের বড় অবিশ্বাস। উজীর তাই মুখে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু সর্বদা চোখে চোখে রেখেছে। বলল, কোম্পানীর ফৌজকে যে হটাতে পারছে না সে দোষ যেন তারই।

তারপর শুধায়, পণ্ডিতজী, আপনি তো ঘুরে বেড়ান। হাসান আকসারির সঙ্গে দেখা হয় কি?

দেখা হয় নি, তবে দেখলাম।

কি রকম?

সেদিন দেখি চাঁদনীচকে মোতি বাজার চত্বরের মধ্যে আকসারি সাহেব দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের কাছে বসে আছে একটা লোক। পরে শুনলাম তার নাম সাদিক খাঁ, সে নাকি আকসারির চেলা।

তার পরে?

সাদিক খাঁ হিন্দুস্থানী ফার্সি মিলিয়ে বলে যাচ্ছে, তার চোখ দুটো অর্ধেক বোজা, অর্ধেক খোলা—

গালিব মন্তব্য করে, ঐ খোলা অংশ দিয়ে দেখছে পয়সা পড়ছে কি না!

পড়েছে বৈকি, অনেক লোক জুটে গিয়েছে। সে বলছে হানসী জেলায় একটি মেয়ে তিনটি কন্যা-সন্তান প্রসব করে। ভূমিষ্ঠ হয়েই তারা কথা বলতে শুরু করে। একজন বলল, এ বছর বড় দুর্বৎসর, অনেক অঘটন ঘটবে। আর একজন বলল, যারা প্রাণে বেঁচে থাকিবে তারাই সব দেখতে পাবে। তৃতীয়জন বলল, এ বছর হিন্দুরা যদি হোলিতে আগুন জ্বালায় আর মুসলমানেরা যদি ইদ পরবে সাদা রঙের জানোয়ার কোরবানি করে তবে তারা বিপদ থেকে মুক্তি পাবে। শোনবামাত্র ঝপাঝপ পয়সা টাকা পড়তে লাগলো তার চাদরের উপরে।

আর আকসারি?

মাথার উপরে বাঁকা লাঠিগাছা ঘোরাতে ঘোরাতে জিগীর দিয়ে উঠল, অরে বচ্চে লোক, আগ লাগাও, খুন পিলাও।

দুটিতে বেশ জুটেছে।

যত সব বুজরুগ!

বুজরুগেরই তো কাল পড়েছে পণ্ডিতজী—করবেন কি, পচা পুকুরে যখন পঙ্কোদ্ধার হয়, বহুকালের জমা পাঁক ভেসে উঠে জল ঘোলা ক'রে দেয়।

হাসান আকসারি সেই পচা পাঁক।

আর পঙ্কোদ্ধারটা কি ?

এই যা চলছে, গদর। মাঝে মাঝে ইতিহাসে এমন অশান্তি দরকার, নইলে পুকুর সাফ হবে কেমন ক'রে ?

মরতে মরে নিরীহ লোক।

মরবেই। পঙ্কোদ্ধারে প্রথম ঘায়েল হয় পুকুরের মাছ, রুই কাতলা গুগলি শামুক, কিছু বাদ যায় না।

তবে ?

তবে আর কি। এই দুনিয়ার হাল।

সুখানন্দ বিদায় নেয়। গালিব আবার তাল ঠুকে গজলটার বাকি অংশ রচনায় মনোনিবেশ করে।

বাদশা বের হন হাতীর পিঠে চেপে চাঁদনী চক বরাবর, সম্মুখে চলে শাহী পল্টন, তুরী, ভেরী, দামামা বাজে, নকীবে ঘোষণা করে, শেঠ লোক, বেনিয়া লোক, দোকানদার সব, দোকানপাট খোল—দীন দুনিয়ার মালিক হিন্দুস্তানের বাদশার হুকুম।

বন্ধ দোকানের দরজা খুলে যায়। বাদশা চলে যেতেই আবার খোলা দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দোকানীরা বলে, এ-ও তো বড় মজা। দোকান বন্ধ করলে বাদশার হুকুম—খুলতে হবে, নইলে জরিমানা। আবার খুললে সিপাহী লোক লুটে নিয়ে যাবে।

একজন বলল, লুটে তো নেয় না, উধার নিয়ে যায়।

আর ভাই উধার নিলে আর এধার হয় না। ঐ একই কথা হ'ল।

প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলে, এ আরো খারাপ। উধারের হিসেব রাখবার খরচটা যোগায় কে ?

একজন বলে ওঠে, সিপাহী উধারে মাল নিলে আবার হিসেব রাখে নাকি ! বুদ্ধু কোথাকার।

কারবার চলে কি ক'রে ?

আর কারবার চালিয়ে দরকার নেই—প্রাণটা বাঁচিয়ে যাও।

ভাবছি দেশে চলে যাবো। চাচাজী দেশে যাওয়ার সময়ে যেতে বলেছিলেন, এখন দেখছি না গিয়ে ভুল করেছি।

অনেকেই ভুল করে নি, দলে দলে লোক শহর ছেড়ে দেশে চলে যেতে শুরু

করেছে।

প্রথমে রটেছিল যে, পলাশী যুদ্ধের শতবার্ষিকীর তারিখে কোম্পানীর পরাজয় ঘটবে, লোক বিশ্বাস ক'রে অপেক্ষা করছিল। পলাশীর যুদ্ধের তারিখ চলে গেল, কোম্পানীর পরাজয় ঘটলো না। তখন দিল্লি ছেড়ে লোক চলে যেতে শুরু করলো। তবু কিছু ভরসা ছিল। ইদের পরবে কোম্পানীর সুনিশ্চিত পরাজয়। ইদ গেল, কোম্পানীর ফৌজ যেমন ছিল তেমনি রইলো। তখন আর বহির্গামী জনস্রোত আটক করা সম্ভব হ'ল না। কারো দেশে কাজিয়া, কারো লেড়কীর সাদি, কারো চাচাজীর বেমার। নানা অজুহাতে লোক পালাতে শুরু করলো কিল্লাঘাট দরবাজা দিয়ে নিগমবোধ দরবাজা দিয়ে নৌ-সেতু পেরিয়ে যমুনার পরপারে। সেদিকটা নিমচী ফৌজের পাহারাধীন, কাজেই একপ্রকার অরক্ষিত। পাহারাওয়ালা আফিঙ খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে; দিনরাত্রির সমস্ত প্রহরেই মৌতাতের সময়। পাহারাওয়ালার যখন অর্থাভাব হয়, বিশেষ মৌতাতজনিত, তখন তার কর্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হয়ে ওঠে। বহির্গামী বা আগন্তুক যাকে সম্মুখে পায় ধরে তল্লাসীর নামে তার সর্বস্ব কেড়েকুড়ে নেয়। লোকটা বেয়াড়া হ'লে টেনে নিয়ে যায় হাবিলদারের কাছে, নয়তো ঘউস মহম্মদের কাছে, নয়তো সেই একেবারে খোদ মীর্জা আবুবকরের কাছে। নিমচী ফৌজ নামে তার অধীন। নিমচী ফৌজ ভাবে কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ! বেরিলির ফৌজ মরুক লড়াই ক'রে, মীরাটী ফৌজ মরুক দরিয়ার ঢেউ গুণে, আমাদের পোয়া বারো। দুনিয়ায় যদি বেহেস্ত থাকে তবে এইখানে, এইখানে, এইখানে—লালকেল্লার উত্তরে এই কলকত্তা দরবাজার নজদিকে।

॥ ৮ ॥

রজব আলির গোয়েন্দাগিরি

বখৎ খাঁ বাদশার কানে তোলে যে, মীর্জা আবুবকরের লোকজন ইমানী বেগমের কুঠি থেকে একজন আওরতকে লুট ক'রে নিতে চেষ্টা করেছিল; বলেছিল যে, এ সময়ে এমনভাবে প্রজার মন বিগড়ে গেলে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠবে। বাদশা তখনি উজীর হাকিম আসাদুল্লাকে ডাকিয়ে এনে দুইজনকে হুকুম ক'রে দেন যে, এখন থেকে শাহ্‌জাদারাও আইন-মাফিক চলবে, শাহ্‌জাদা বলে তাদের যেন খাতির না করা হয়।

আসাদুল্লা প্রবীণ দরবারী। শাহ্‌জাদাদের উপর বাদশার ক্রোধের ইতিহাস

তার অজানা নয়। সে জানে যে, আজ বাদশার হুকুম অনুসারে কাজ করতে গেলে কাল বাদশা ও শাহ্‌জাদাদের মিলিত অসন্তোষের মুখে পড়তে হবে। এরকম ক্ষেত্রে একমাত্র কর্তব্য মুখে হাঁ বলে কাজে কিছু না করা। কিন্তু বখৎ খাঁ জঙ্গী আদমি, দরবারী রীতিতে অনভ্যস্ত, ঢোল শোহরৎ সহ বাদশার হুকুম প্রচার ক'রে দিলো শহরে। ফলে শাহ্‌জাদার দল তার উপরে হাড়ে হাড়ে চটে গেলেও প্রকাশ্যে কিছু করতে সাহস করলো না। অধিকাংশ সিপাহী ও শহরের লোক বখৎ খাঁর অনুগত—লড়াই করছে সে একা।

এই ঘটনার পরে মীর্জা মুঘল ও মীর্জা আবুবকর লালকেল্লার বাইরে এসে শহরের মধ্যে বাসস্থান নিলো। মীর্জা মুঘল গেল দরিয়াগঞ্জে সোনা মসজিদের কাছে এক বাড়িতে, সে দিকটা তার ফৌজের অধীনে। আর মীর্জা আবুবকর উঠে এলো চাঁদনীচকের উত্তরে লুণ্ঠিত দিল্লি ব্যাঙ্কের কাছে দিল-মঞ্জিল নামে প্রকাণ্ড পুরাতন প্রাসাদে। দেখতে দেখতে দিল-মঞ্জিল বেগম, বাঁদী, বক্‌শী, আহেদি, পাইক, বরকন্দাজ ও নাচওয়ালীতে ভ'রে উঠল।

মীর্জা আবুবকর মীর বক্‌শী গোলাম খাঁকে ডাকিয়ে এনে ধমকালো, তোমরা কোন কাজের নও, একটা আওরতকে নিয়ে আসতে বললাম, পারলে না।

গোলাম খাঁ ডবল কুর্নিশ ক'রে বলল, তোবা, তোবা! শাহ্‌জাদার মেহেরবানীতে আমাদের অসাধ্য কি! বাদশার আহেদি কটাকে মেরে হটিয়ে দিয়েছিলাম।

তবে আওরত পালালো কেমন করে?

ছিপকে চলে গেল। এক নম্বর শয়তানী!

শাহ্‌জাদা রেগে উঠে বলে, ছিপকে চলে গেল। যাবেই তো। সে তো আর স্বেচ্ছায় আসছে না। তোমরা এতগুলো লোক থাকতে ছিপকে যেতে পারলো কেন?

জাদু জানে শাহ্‌জাদা, জাদু জানে।

তোমরা কোন কর্মের নও, বলে আলবোলার নল তুলে নেয় আবুবকর।

গোলাম খাঁ বলে, জাঁহাপনা, ও আওরত যেখানেই থাক, ধরে নিয়ে আসবোই—তবে আমার নাম গোলাম খাঁ, বাপের নাম মেধম খাঁ, দাদার নাম আহেদিল খাঁ, পরদাদার নাম আলাউদ্দিন খাঁ, আমরা সব জাদুগরের বংশ।

সেই কথা যেন মনে থাকে। ঐ আওরত শীগগির না আনতে পারলে তোমার ঘাড়ে মাথা থাকবে না, জাদুগরের বংশ লোপ পাবে।

গোলাম খাঁ মাথায় হাত দিয়ে দেখলো তখনো সেটা যথাস্থানে আছে, ভাবলো

কতক্ষণ থাকে কে জানে, তবে কিনা জাদুগরের বংশ। কুর্নিশ জানিয়ে দ্রুতপদে সে প্রস্থান করলো।

রজব আলি ঘরে প্রবেশ করলো। আবুবকর নাচওয়ালীদের বিদায় ক'রে দিলো, বলল, তোমরা এখন যাও। তারপরে খাস খানসামা চুনী মিয়াকে বলল, এখন যেন কেউ না আসে।

ঘর খালি হয়ে গেলে বলল, তারপর রজব আলি, কিছু খবর আছে?

রজব আলি মাথা নেড়ে বলল, বিলকুল বেখবর।

বলো কি, তিন-তিনখানা চিঠি, একটারও জবাব এলো না!

তাই তো দেখছি।

আবুবকর কর গুণে হিসাব করে আর বলে যায়, পহেলা চিঠি লাটসাহেব লর্ড ক্যানিং সাহেবকে, দোসরা চিঠি জেনারেল উইলসনকে, তেসরা চিঠি কর্নেল হডসনকে—একখানারও জবাব নেই। বড়া তাজ্জব কী বাৎ।...চিঠি নিয়ে যাচ্ছে কে?

সব চিঠি তো একজনকে দিয়ে পাঠাই না।

পৌঁচেছে তো?

না পৌঁছবার কারণ তো দেখি না।

তবে জবাব আসছে না কেন?

হাতের আঙুলে দুর্জ্ঞেয়তার মুদ্রা ক'রে রজব আলি বলে, আল্লা জানেন।

আল্লা জানুন নাই জানুন, কেন যে উত্তর আসছে না, তার কারণ রজব আলি জানে। সে বেশ জানে যে, কোম্পানী আর কোনমতেই বাদশা, বেগম বা শাহ্‌জাদাদের সঙ্গে পত্রালাপ করবে না। যাদের হাতে ইংরেজ নরনারীর রক্তপাত ঘটেছে, তাদের কলমের কালিও ইংরেজের চোখে রক্ত বই নয়। সন্ধি, শর্ত, চুক্তি, করুণাভিক্ষা কিছুতেই ইংরেজের মন ভিজবে না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবুবকর বলে, ইংরেজ কেমনতরো বেয়াদব লোক। ওরা আমাদের সঙ্গে সন্ধি না করতে চায় না-ই করলো, সে মীমাংসা না-হয় লড়াইয়ে হবে, কিন্তু শিষ্টাচার অবধি জানে না। মহারানীর কুশল কামনা ক'রে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম বড়লাটের কাছে, তার উত্তর দেওয়া তো উচিত ছিল।

জবাব দিতে হ'লে অনেকগুলো রূঢ় সত্য বলতে হয়, তাই চুপ ক'রে থাকে রজব আলি।

ভেবে ছাখো না কেন, বাদশা আলমগীরের যখন লড়াই চলছে ভাইদের সঙ্গে,

তখনো তাদের মধ্যে পত্রাপত্রি বন্ধ হয় নি।

রজব আলি ভাবে, তুমি বাদশা আলমগীর হ'লে তোমার সঙ্গেও ইংরেজ পত্রাপত্রি করতো।

আমার আশঙ্কা হচ্ছে কি জানো, কোম্পানী হয়তো মীর্জা মুঘলের সঙ্গে পত্রাপত্রি করছে—এখন বাদশার সে বড়ছেলে কি না।

রজব আলি প্রকাশ করে না যে, মীর্জা মুঘলের চিঠিও যায় তার হাত দিয়ে। তা হ'লে আর ঘাড়ে মাথা থাকবে না। সভাসদের শির সদ্যঃপাতী।

তোমার কি মনে হয়, রজব আলি?

মীর্জা মুঘল পত্রাপত্রি করলে আমার অজানা থাকতো না।

আলবোলার নলে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে আবুবকর বলে ওঠে, যাক, তবু মন্দের ভালো। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

রজব আলি ভাবে, অত নিশ্চিন্ত হয়ো না, শাহ্‌জাদা। প্রত্যাখ্যাত চিঠিগুলো সব সযত্নে রক্ষা করেছি। এই বাদশাহী তামাশা মিটে গেলে আমাকে বাঁচাবার কাজে লাগবে।

আবুবকর ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি স্থির ক'রে নিয়ে বলে, আর-একখানা চিঠি পাঠাতে চাই জেনারেল উইলসনকে!

বহুৎ খুব, বলে রজব আলি।

তাতে জানাতে হবে যে, আমার জান ও জায়গীর রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলে নিমচী ফৌজ নিয়ে আমি কোম্পানীর পক্ষে যোগ দিতে রাজী আছি।

ঘউস মহম্মদ কি রাজী হবে?

রাজী না হয় ডাঙায় তোলা মাছের মতো একা পড়ে থাকবে, আমি ফৌজ নিয়ে চলে যাবো।

এ খুব ভাল শলা, শাহ্‌জাদা।

কিন্তু এবার যে লোক দিয়ে পাঠাবে, তার বুদ্ধিমান হওয়া চাই, বুদ্ধু হ'লে চলবে না।

সেরকম লোক খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

দ্যাখো, দ্যাখো, খুঁজে দ্যাখো, নিশ্চয় মিলবে।

কি খবর চুনীলাল, শুধোয় আবুবকর।

চুনীলাল দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

হাবিলদার সাহেব কোম্পানীর একজন সিপাহীকে পাকড়েছে।

তোমার হাবিলদার সাহেব মস্ত বাহাদুর। কোম্পানীর আট হাজার সিপাহীর

মধ্যে একটাকে পাকড়েছে। খুব করেছে। এখন হাবিলদার সাহেব কি চায়? খিলাৎ নাকি?

না জনাব, শাহ্‌জাদার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ওঃ বুঝেছি, আমার নিজ হাত থেকে খিলাৎ নিতে চায় বুঝি, আচ্ছা নিয়ে এসো।

চুনীলাল চলে যায়। রজব আলির দিকে তাকিয়ে আবুবকর বলে, এই হাবিলদারটি একটি আস্ত বুদ্ধু।

রজব আলি মনে মনে বলে, তুমিও কম নও।

হাবিলদার মুসাহিব খাঁ এসে দাঁড়ায়—প্রকাণ্ড এক চাঙড় মাংসপিণ্ড। কুর্নিশ করে।

কি খবর?

শাহ্‌জাদা, কোম্পানীর একঠো সিপাহীকো পাকড় লিয়েছি।

বেশ করেছ, খিলাৎ মিলবে।

মুসাহিব খাঁর ধারণা হ'ল ঐ সিপাহীকেই বুঝি খিলাত দেবে শাহ্‌জাদা। সে শঙ্কিত হয়ে বলে ওঠে, লোকটা কোম্পানীর গোয়েন্দা।

এই বললে সিপাহী, এখন বলছ গোয়েন্দা।

হাঁ জাঁহাপনা, সিপাহী লেকিন গোয়েন্দা সেজেছে।

গোয়েন্দার আবার সাজ-পোশাক আছে নাকি?—বলে আবুবকর তাকায় রজব আলির দিকে—ভাবটা, এ-সব তোমার জানবার কথা বটে।

এবারে রজব আলি জেরা আরম্ভ করে:

কোথায় পাকড়ালে লোকটাকে?

ঐ যে দরিয়া আছে না, যাকে হিন্দুরা যমুনা বলে—

আবুবকর বাধা দিয়ে বলে, এতও জানো খাঁ সাহেব।

প্রশংসা মনে ক'রে একজোড়া দন্তপংক্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ে মুসাহিব খাঁর, সে কুর্নিশ ক'রে বলে, জী হুজুর, জানি বৈকি। আমার বহুৎ হিন্দু দোস্ত্ আছে, তারা হোলির পরবে গান করে "যমুনাকি তীরে গাও চরাওয়ে। মিঠী তান শুনাওয়ে।" আরও ভি জানি।

আচ্ছা, এখন গান থাক, তারপরে কি হ'ল, বলে আবুবকর।

ঐখানে সাঁঝের নমাজ সেরে যখন উঠেছি, দেখি যে, একটা কুর্তা-উর্তা পরা কোম্পানীর সিপাহী ছিপকে ছিপকে আসছে—

বাপরে বাপ, ব'লে ওঠে শাহ্‌জাদা, সিপাহী দেখেই বুঝলে কোম্পানীর!

কেন নিমচী সিপাহী কি নেই।

আছে বৈকি হুজুর। তবু বোঝা যায়।

কি ক'রে?

নিমচবালার ফাটা কুর্তি থোড়া ফুর্তি আর কোম্পানীর আঁটা কুর্তি বহুৎ ফুর্তি।

তারপরে?

আমি গিয়ে পাকড়ালাম।

লোকটা পালালো না?

প্রশ্নকর্তা রজব আলি হ'লেও শাহ্‌জাদার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল মুসাহিব খাঁ। সে উচ্চবংশের লোক, বাদশা ও শাহ্‌জাদার নিচের ধাপের লোকের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

সে বলল, পালাবে কি সাধ্য? রুস্তম যেমন ক'রে সোরাবকে পাকড়েছিল, তেমনি ক'রে পাকড়ে নিলাম।

তখন সোরাব কি বলল? শুধোয় শাহ্‌জাদা।

শালা বলে কি না—

রজব আলি ধমক দেয়, শাহজাদার সামনে শালা বলছ, বেয়াদব।

মুসাহিব খাঁ দুই কান স্পর্শ ক'রে বলে, কসুর হয়েছে। তখন সেই লোকটা —আমার জরুর ভাই—

ওর চেয়ে শালাটাই ভালো, বলো কি বলল?

বলল, আমি শাহী সিপাহী।

আমি বললাম, আমার সঙ্গে ধোঁকাবাজি চলবে না। শাহী সিপাহী তো এমন নয়া কুর্তি, এমন জলুসদার কোমরবন্ধ মিললো কেমন ক'রে?

তখন?

তখন তাকে তল্লাসী শুরু করলাম আর অমনি জেব থেকে বেরিয়ে পড়লো—

কি পিস্তল?

ছোরা?

টাকা পয়সা? উঁহু, ওটা বের হ'লে আর এদিকে আসতে না।

না, হুজুর এক চিঠি।

এই ব'লে সগর্বে জেব থেকে বের করে থামে বন্ধ সিলমোহর করা একখানা চিঠি।

বিরক্ত হয়ে আবুবকর ব'লে ওঠে, এই কথাটা বলতে এতক্ষণ সময় লাগালে, তাড়াতাড়ি সারলেই হ'ত!

মুসাহিব খাঁ বিজ্ঞ লোক, বলে—হুজুর, "জলদি কা কাম শয়তান কা।"

রজব আলি চিঠিখানা নেয়।

শাহ্‌জাদা শুধোয়—তোমার সোরাব কোথায়?

নিচে পাহারাদারের জিম্মায় আছে।

আচ্ছা, তুমি এখন নিচে যাও, দরকার হ'লে ডাকবো।

মুসাহিব খাঁ চলে গেলে আবুবকর বলে, রজব আলি পড়ে ছাখো তো ব্যাপার কি? রাইকো পর্বত বনায়া—না সত্যই কিছু আছে!

রজব আলি সিল ভেঙে খাম খুলে পড়ে, তারপরে দেয় আবুবকরের হাতে। ছুজনেই ইংরেজি জানে। চিঠিখানা পড়ে সে মন্তব্য করে, যারা কোম্পানী পক্ষে যোগদান করতে চায় তাদের আহ্বান জানিয়েছে খোদ জেনারেল উইলসন।

রজব আলি গম্ভীর ভাবে বলে, এমন বেইমান নিশ্চয় কেউ নেই শহর শাহ্‌জাহানাবাদে।

এ যে অতি স্পষ্ট ধিক্কার বুঝতে পারে না শাহ্‌জাদা।

আবুবকর বলে, পত্রবাহক লোকটা নিশ্চয় সাধারণ সিপাহী নয়, বড় কোন অফিসার হবে, নইলে জেনারেল সাহেব তার হাতে দিয়ে এমন জরুরী চিঠি পাঠাতো না।

তাই তো মনে হয়, বলে রজব আলি।

তখন দুইজনে প্রায় একসঙ্গে ব'লে ওঠে, এই লোকটাকে দিয়ে আমাদের চিঠিখানা পাঠালে হয় না জেনারেল উইলসনের কাছে?

ত্রুজনের বুদ্ধি এক খাতে বইছে দেখে পরস্পরকে তারিফ করে তারা। শয়তানে শয়তানে বুদ্ধিতে মিল, দেবতায় দেবতায় গরমিল। তাই তো দেবতা কখনো পেরে ওঠে না শয়তানের সঙ্গে।

কিন্তু লোকটা কি রাজী হবে?

সে ভার আমার উপর ছেড়ে দিন, শাহ্‌জাদা।

বেশ, তবে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আজকের রাতটায় লোকটাকে আয়েসে রাখবার ব্যবস্থা ক'রে দাও। কাল সকালে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো।

রজব আলি সম্মতি জানিয়ে বিদায় নেয়।

সকাল বেলায় হাবিলদারের সঙ্গে বন্দী সিপাহী এসে দাঁড়ায়, শাহ্‌জাদাকে কুর্নিশ করে।

আবুবকর তার দিকে তাকিয়ে ভাবে—এ তো নিতান্ত গাঁওয়ার সিপাহী নয়, পোশাকে চেহারায় একে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়।

সিপাহী মনে মনে ভাবে, জেনারেল উইলসনের চিঠিখানাই যত নষ্টের মূল। সেখানা না থাকলে সন্ধ্যাতেই রুমালীর বাড়িতে যেতো আর মিস এলবিয়নের খবর নিয়ে এতক্ষণ ফিরতে পারতো ছাউনিতে। কিছুতেই সে নিজের কাছে স্বীকার করে না,—না, নিজের কাছেও নয়, কেবল জেনারেলের আদেশে নয়, কর্তব্যের অনুরোধে নয়, এখানে আসবার অন্য কারণ ছিল তার।

এই চিঠিখানা সঙ্গে ছিল তোমার?—চিঠিখানা দেখিয়ে জেরা করে আবুবকর।

হাঁ, শাহ্‌জাদা।

. জানো এ কাজ ঘোরতর বে-আইনী।

লড়াই ব্যাপারটাই তো বে-আইনী।

এবারে রজব আলি বলে, গোপনে চিঠি নিয়ে আসা গোয়েন্দার কাজ। লড়াইয়ের সময়েও এ কাজ বে-আইনী, স্বীকার করো কি না?

রজব আলির মুখে গোয়েন্দাগিরির নিন্দায় কৌতুক অনুভব করে আবুবকর।

স্বীকার করি।

তবে কেন এনেছিলে?

সেনাপতির হুকুমে।

বিপদ আছে জেনেও?

হাঁ, বিপদ আছে জেনেও।

জানো তোমাকে গুলি ক'রে মারতে পারি।

যুদ্ধক্ষেত্রেও তা ঘটতে পারতো।

রজব আলি জেরা ক'রে যায়, আবুবকর শ্রোতা।—সিপাহীর কাজ আর গোয়েন্দার কাজ আলাদা।

সিপাহীর বিচার করবার অধিকার নাই।

তোমার নাম কি?

জীবনলাল।

কি পদ?

রেসালাদার মেজর।

রজব আলি ও আবুবকর এবার নিশ্চিত বোঝে লোকটা সাধারণ সিপাহী নয়, হয়তো বা কোন রঈস আদমি হবে, নইলে দেশী লোকের প্রাপ্য যে উচ্চতম পদ তা নিশ্চয় পেতো না। হাঁ, একে দিয়েই কাজ হবে।

আবুবকর বলে, মুসাহিব খাঁ তুমি এবারে যাও।

মুসাহিব খাঁ গেলে বলে, তোমাকে মুক্তি দিতে পারি।

শাহ্জাদার সে ক্ষমতা আছে জানি।

কিন্তু কেবল এক শর্তে।

কি শর্ত ?

তার আগে বলো জেনারেল উইলসনের কাছে তোমার যাওয়ার অধিকার আছে কি না ?

আছে। এই চিঠিই তার প্রমাণ।

আমাদের একখানা চিঠি পৌঁছে দিতে হবে জেনারেলের কাছে।

চিঠিতে কি আছে না জানলে পারি না।

হঠাৎ প্রসঙ্গ উল্‌টে আবুবকর শুধায়, কাল রাতে খানাপিনার বন্দোবস্ত ভালো হয়েছিল তো ?

হাঁ শাহ্জাদা।

নিচের ঘরগুলোয় বড় মচ্ছর।

মচ্ছরদানি মিলেছিল, আয়েসে ছিলাম। শাহ্জাদার খুব মেহেরবানি।

তাহ'লে রাজী আছ আমাদের চিঠি নিয়ে যেতে।

কি আছে জানলে।

এবারে রজব আলি বলে, কী আর এমন থাকবে ? দুটো কুশল সম্ভাষণ।

আর কিছু নয় ?

আর যা থাকবে দেখতেই পাবে।

শাহ্জাদা শুধোয়, কখন ফিরে যাবে ?

আমার বহিন থাকে শহরে, তার সঙ্গে দেখা ক'রে।

চিঠি বেহাত হবে না ?

শাহ্জাদা বিশ্বাস করতে পারেন।

ঠিক জায়গায় পৌঁছবে ?

জীবনলাল আবার বলে, শাহাজাদা বিশ্বাস করতে পারেন।

কখন জবাব নিয়ে আসবে ?

তিন দিনের মধ্যে।

তারপরে একটু ভেবে বলে, যদি জবাব দেন।

না দেবেন কেন ?

জেনারেলের মনের কথা কেমন ক'রে বলবো।

তাহলে তিন দিনের মধ্যে আসছ ?

নিশ্চয়, যদি না শাহ্জাদার সিপাহীরা বাধা দেয়।

বাধা দিলেও এখানে ধরে নিয়ে আসবে।

যদি না শাহী গোলার ঘায়ে মারা যাই।

কোম্পানীর ছাউনিতে এখন সিপাহী সংখ্যা কত?

নিশ্চয় জানি না, আর জানলেও বলতাম না।

আবুবকর বলে, হাঁ, তুমি বিশ্বাসভাজন বটে। আচ্ছা, এখন তুমি নিচে গিয়ে আরাম করো, চিঠি তৈরি হ'লে তোমাকে ডেকে পাঠাবো।

ঘণ্টা দুই পরে চিঠি লিখিত হ'লে জীবনলাল উপরে আসে। চিঠি পড়ে জানায় এ চিঠি নিয়ে যেতে তার আপত্তি নেই। তখন চিঠি লেফাফাদোরস্ত ও সিলমোহরসেপ্ত হ'লে জীবনলালের হাতে দেয় আবুবকর। জীবনলাল বিদায় নিতে উদ্যত হ'লে শাহ্‌জাদা বলে, তাহলে তিন দিন পরে নিশ্চয় আসছ?

হাঁ শাহ্‌জাদা।

জবাব নিয়ে।

যদি জবাব দেন।

তোমার কি মনে হয়?

সৈনিকের পক্ষে জেনারেলের মনোভাব অনুমান করবার চেষ্টা উচিত নয়।

শাহ্‌জাদা বোঝে, এ খাঁটি সোনা, পেশাদার গুপ্তচর নয়। নিশ্চয় চিঠি পৌঁছে দেবে ঠিকানায়। আশ্বাস পায় মনে।

কুর্নিশ ক'রে বিদায় নেয় জীবনলাল।

॥ ৯ ॥

"বাণীবনের হংসমিথুন মেলেছে আজ পাখা"

জীবনলাল যখন তুলসীর বাসায় এসে উপস্থিত হ'ল তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হওয়ার মুখে। সে দোতলায় উঠে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা বন্ধ। দু'তিন-বার ধাক্কা দিয়ে দরজা যখন খুললো না, তখন রুমালীর নাম ধরে ডাকলো। এবারে দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এলো তুলসী।

একি আপনি!

হাঁ, আমিই। বহিন কোথায়?

রুমালীদি বেরিয়েছেন।

সন্ধ্যা হওয়ার মুখে?

না, সকাল বেলাতেই বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেন নি।

এমন কি প্রত্যেক দিন হয়?

না, আজকে বিশেষ কারণ আছে।

কি হয়েছে খুলে বলো।

তারপরে বলে, কিছু মনে ক'রো না, তোমাকে তুমি বলেই বলি।

আপনি রুমালীদির ভাই, আমি তার চেয়ে বয়সে অনেক কম, আমাকে আপনি বললে যে হাসি পেতো।

তবু ভালো যে, রাগ করো নি। কি হয়েছে ব্যাপার বলো তো।

এলবিয়ন বিবিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

চমকে ওঠে জীবনলাল, বলে, কখন থেকে?

তুলসী বলে যায়, ভোরবেলা উঠে দেখা গেল যে, তার বিছানা খালি। তখনি সন্দেহ হ'ল। এলবিয়ন বিবি তো কখনো বাড়ির বাইরে যায় না। তবে কোথায় গেল? কিছুক্ষণ পরে সব সন্দেহ নিরসন ক'রে বালিশের তলা থেকে চিঠি বের হ'ল। তার নিজ হাতে লেখা। লিখেছে, আমার দেশের লোক কাছে এসে পড়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই নিশ্চয় তারা দিল্লি দখল করবে। তাদের কাছে আমার কলঙ্কিত মুখ দেখাতে পারবো না। চললাম। আমাকে সন্ধান ক'রো না। করলেও পাবে না। তোমার সেবা ও ভালোবাসার ঋণ আমার জীবনের শেষ সম্বল। ধন্যবাদ দিয়ে তাকে লঘু করতে চাই না। তোমার হতভাগ্য বোন এলবিয়ন বিবি।

জীবন বলে, তোমার যে মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছে।

হবে না! সকাল থেকে অন্তত পঞ্চাশবার পড়েছি।

চিঠিখানা কোথায়?

রুমালীদি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছে।

পুরাতন অভ্যাসবশে জীবন ব'লে উঠে, কোতোয়ালীতে বুঝি?

তারপরে সেটা অসম্ভব বুঝে সংশোধন ক'রে নেয়। ব'লে, না, তা তো সম্ভব নয়।

তুলসী বলে, যমুনার দিকে গিয়েছে রুমালীদিরা।

আর কে?

রুমালীদি, পল্টন আর তার দলবল। তাদের সকলেরই ধারণা এলবিয়ন বিবি যমুনায় ঝাঁপ দিয়েছে।

জীবনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, অসম্ভব নয়। যমুনা তো এই জন্যেই

আছে সেই অনাদি কাল থেকে।

তারপরে ভাবে কাল সন্ধ্যায় হাবিলদারের হাতে গ্রেপ্তার না হ'লে হয়তো বাঁচাতে পারতো মিস এলবিয়নকে। তখনি মনে হয়, না, তাতেও রক্ষা করা সম্ভব হ'ত না তাকে। কলঙ্কিত জীবন নিয়ে কিছুতেই উপস্থিত হ'ত না সে দেশের লোকের সম্মুখে। কলঙ্কের কালো যমুনার কালোয় ডুবিয়ে দিয়েছে সে। এমন অনেক কলঙ্কের কালিমা গ্রাস ক'রেই যমুনা কালো।

যখন সে চিন্তা করছিল তুলসী ভিতরে চলে গিয়েছিল, এবারে থালায় কয়েকটা পেড়া আর কিছু দই নিয়ে এসে বলল, অনেকক্ষণ খাওয়া হয় নি নিশ্চয়, খেয়ে নিন।

জীবন বলে, খাওয়া হয়েছে বৈকি। একেবারে রাজভোগ।

সে আবার কি রকম?

সে কথা না হয় পরে শুনো।

তবে এখন খেয়ে নিন।

জীবন খেতে খেতে বলে, এ মনে হচ্ছে ঘণ্টেওয়ালার দোকানের মিষ্টি।

ঠিক ধরেছেন। কাল বাবা এসেছিলেন, নিয়ে এসেছেন।

তিনি প্রায়ই আসেন বুঝি?

মাঝে মাঝেই।

নিয়ে যেতে চান না?

খুব বেশি আগ্রহ করেন না। বলেন, গদর মিটে যাক। রুমালীদিও আপত্তি করেন। সবচেয়ে বেশি আপত্তি পল্টনের।

সে আবার আপত্তি করে কেন?

সে বলে একবার তোমাকে লুটে নিয়ে যাচ্ছিল, টেনে নিয়ে এসেছি। এখন বাড়ি গেলে আবার যদি কেউ লুটে নিয়ে যায় আমি আর রক্ষা করতে পারবো না।

জীবন বলে, লুট করবার মতো জিনিস হ'লে লোকে লুট করবেই।

তুলসী ব'লে ওঠে, আপনি আদব কায়দা কিছুই জানেন না দেখছি, একেবারে গাঁওয়ার লোক।

জীবন বুঝতে পারে না কথাটা সত্য না কৃত্রিম, বলে, সিপাহী গাঁওয়ার ছাড়া আর কি হবে?

আপনি কি সিপাহী নাকি? কোন পক্ষে? বাদশাহী না কোম্পানী?

এতদিন ঠিক করতে পারি নি—এইমাত্র ঠিক হ'ল।

কি ঠিক হ'ল ?

তোমার পক্ষে ?

কেমন ?

পল্টন যদি রক্ষা না করে আমাকেই রক্ষা করবার ভার নিতে হবে।

মস্ত বীর দেখছি।

ছিলাম না, এখন দায়ে পড়ে হ'তে হবে।

যেচে দায় ঘাড়ে নেওয়ার শখ কেন ?

ওটা কারো কারো ঘাড়ের বদ অভ্যাস।

বইতে পারবার মতো ঘাড়ের জোর আছে কি ?

সেটা নির্ভর করে অপর পক্ষের ঘাড়ে চাপবার ইচ্ছায় উপরে।

দুজনের কথায় কথায় ঠোকাঠুকি লেগে ফুলকি ছড়াতে থাকে। অবাক হয়ে যায় দুজনে। তুলসী কিছু বেশী। অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এমনভাবে সমানে কথা বলে যেতে পারে কখনো ভাবে নি। দু তিন মাস আগে এ ছিল তার ধারণার অতীত। এই সময়ের মধ্যে দুর্ভাগ্যের প্রচণ্ড আলোড়নে ঠেলা খেয়ে ভিতরের রত্নরাশি উপরে চলে এসেছে, চোখে পড়ে অবাক ক'রে দেয়।

জীবনের বিস্ময়ের কারণ আলাদা। এই সামান্য সময়ের মধ্যে অনেক কিছু দেখলো সে, অনেক রকম ঘটনা, অনেক রকম লোক, অনেক ক'টি নারী। প্রথমে পান্না, তারপরে রুমালী, এখন তুলসী। তিনজনে তিনরকম, তবে বিস্ময়ের রসে তিনজনেই সমান! সমান আবার সমান নয়। পান্না পান্নার টুকরোর মতোই, অন্ধকারেও জ্বলে। রুমালী চৈত্রমাসের গোধূলি আলোর মদের ছিটে, দর্শকের চোখে নেশা ধরিয়ে দেয়। আর তুলসী! উপমা খুঁজে পায় না সে, ভাবে গালিব বা জোকের মতো শায়ের হ'লে হয়তো তুলসীর উপমা মনে পড়তো।

আর দুটো পেড়া দেবো ?

রক্ষককে বুঝি আগাম বেতন দিয়ে রাখছ ?

এমন বাজে খরচ করবে কে ?

কেন ?

রক্ষকের বীরত্ব না জেনেই বেতন দেওয়া বাজে খরচ নয় ? এই নিন, খেয়ে ফেলুন।

আর গোটাকয়েক পেড়া পড়ে জীবনের পাতে।

রক্ষকের বীরত্ব সম্বন্ধে বোধ করি নিঃসন্দেহ হয়েছ ?

মারামারির সময়ে কাজে লাগবে ভেবেই লোকে হেল মাথায় লাঠিতে।

তবে বাধুক লাঠালাঠি, তখন না হয় পরীক্ষা হবে। কিন্তু ভাবছি এমন সৈরিন্ধ্রী সেজে আর কতকাল থাকবে?

অজ্ঞাতবাসের পর্ব শেষ না হওয়া অবধি।

তুলসী, এমন কথা বলা শিখলে কি ক'রে?

হাঁস সাঁতার শেখে কেমন ক'রে? জন্ম থেকেই। বাবা আমাকে ছেলেবেলায় ডাকতেন হরবোলা ব'লে।

এখন বুঝি বুড়ো হয়ে পড়েছ?

আপনার বুদ্ধির সঙ্গে তুলনা ক'রে তা-ই মনে হচ্ছে।

দু'জনের মনের মধ্যে যখন আলোড়িত হচ্ছে অগ্নিগর্ভ বাণী, তখন মুখে যত সব তুচ্ছ কথা। আগ্নেয়গিরির শিখরে নামগোত্রহীন ফুল। দু'জনেই ভাবে মনের কথা মুখে বলা যায় না কেন? আর বললেও তা এমন অকিঞ্চিৎকর হাস্যকর শোনায় কেন? আকাশভরা যে বাষ্প ইন্দ্রধনু রচনা করে, কেন তার পরিণাম একবিন্দু শিশিরকণা? হায়রে, বাণীবনের হংসমিথুন। গগনবিহার ছেড়ে মাটিতে নেমে এলে কতই না অসহায় তারা।

জীবনের খাওয়া শেষ হয়েছে এমন সময় রুমালী আর পল্টন ফিরে এলো। জীবন তখন মুখ ধুচ্ছিল, রুমালী বলল, জীবন ভাই, কখন এলে?

তারপরেই কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, আতিথ্যেরও অভাব হয় নি দেখছি।

কেন হবে, তুমি তো শামুকের মতো বাড়িটা পিঠে বয়ে নিয়ে যাও নি, বলে জীবন।

তারপরেই আসল প্রসঙ্গে আসে, শুধোয়, এলবিয়ন বিবির সন্ধান মিলল?

রুমালী বুঝল, সকল কথাই শুনেছে তুলসীর কাছে, তখন সে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যে ভেঙে বসে পড়তে পড়তে বলল, সন্ধান পাওয়ার আর কি আছে! যা হওয়ার তাই হয়েছে।

ভালো ক'রে খুঁজেছিলে? শুধোয় জীবন। এবারে পল্টন উত্তর দেয়— খুঁজতে বাকি রাখি নি জীওন ভাই। উত্তরে তোপখানা দক্ষিণে খয়রাতি দরবাজা পর্যন্ত চষে ফেলেছি।

কারো চোখে পড়ে নি?

চোখে পড়লে কি আর রক্ষা ছিল, ফিরিঙ্গি মেয়ে যে।

রুমালী বলে, আমার বিশ্বাস সেই ভয়েই ভোর রাতে অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ এমন করতে গেল কেন ?

খুব হঠাৎ করে নি জীবন, তুমি আসবার আগেও মাঝে মাঝে বলতো, বাঁচবার ইচ্ছা নাই। তারপরে তুমি এলে বুঝলো যে, তার দেশের লোকে তার সন্ধান পেয়েছে—এবারে হয়তো আত্মীয়স্বজনে পাবে।

তুলসী বলে ওঠে, তাই বলে মরতে যাবে।

মরাটাকে এত কঠিন ভাবো কেন তুলসী ?

কঠিন নয়! কী যে বলো রুমালীদি।

কঠিন ভেবে ভেবেই লোকে কঠিন ক'রে তুলেছে। প্রতিদিন সকালে উঠে যদি লোক ভাবে যে আজ মরতে হবে, তবে দেখে নিয়ো—মরাটা সহজ হয়ে আসবে।

প্রসঙ্গ পাল্‌টে তুলসী বলে, নাও দিদি, এখন হাত-মুখ ধোও। সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি তোমাদের।

সে রাতে বাড়িতে আর হাঁড়ি চড়লো না। পল্টন গিয়ে ঘণ্টেওয়ালার দোকান থেকে কিছু পুরী মিঠাই কিনে নিয়ে এলো, তাই খেয়ে চারজনে শুয়ে পড়লো।

শোওয়ার আগে জীবন বলল, কাল ফিরে গিয়ে কি বলবো তাই ভাবছি।

রুমালী বলল, কালকের দিনটা থেকে যাও, পরশু যেয়ো।

দেখা যাবে, বলে জীবন শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে সে স্থির করলো যে, আবুবকর সম্পর্কিত ঘটনাটা এদের কাছে প্রকাশ করবে না, এমনিতেই এদের জীবন জটিল, তার উপরে আর নূতন সমস্যার ভার চাপানো উচিত হবে না বলেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো সে।

তুলসী ঘুমিয়ে পড়েছিল, তারপরে মাঝরাতে জেগে উঠতেই আজ দিনের বেলাকার নিজের আচরণে সে বিস্মিত হয়ে গেল। সে ভেবে পায় না জীবনলালকে দেখলে, জীবনলালের কথা শুনতে পেলে এমন কি তার বিষয় চিন্তা করলে তার মনে এমন অদ্ভুত একটা ভাবের উদয় হয় কেন ? আর শুধুই কি মনে, দেহেও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। সে ভেবে পায় না ব্যাপারটা কি, আর কেন ? এই ক'মাস দুর্ভাগ্যের পাঠশালায় অনেক শিক্ষা পেয়েছে সে। ফুলকিমতীর এই সেদিনকার ছোট্ট মেয়েটি এক দমকায় বেড়ে উঠেছে। আগে যে মেয়েটি অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কখনো কথা বলে নি বললেও অন্যায় হয় না, দুঃসময়ের বাদলায় সিপাহীদের হুকুম ক'রে কথা বলেছে সে, দু'দুজন শাহ্‌জাদাকে কথার ঘায়ে ঘায়েল ক'রে মুক্তি আদায় ক'রে নিয়েছে সে, ইমানী বেগমের বাড়ি থেকে যাওয়ার সময়ে আক্রান্ত হয়ে বিভ্রান্ত হয় নি, পল্টনের হাত

ধরে পালিয়ে এসেছে সে। কম শিক্ষা তো হয় নি তার, আর সেই অনুপাতে সাহসটাও কিনা গিয়েছে বেড়ে। সে এখন আর আগের সেই খুকীটি নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, এই লোকটির সম্মুখে পড়লে হঠাৎ এমন জড়বস্তুতে পরিণত হয়ে যায় কেন সে? ছিঃ ছিঃ, জীবনলাল না জানি কি ভাবে! হয়তো খুকী ভাবে, হয়তো বোকা ভাবে, হয়তো একটা মূর্খ গাঁওয়ার মেয়ে ভাবে! কি ক'রে সে নিজের পরিচয় দেবে! সে যে লেখাপড়া জানে, গান করতে পারে, নাচতে পারে, এমন কি উল বুনতে পারে, সুঁচ-সুতো দিয়ে নক্‌শা তুলতে পারে, দাদার আপত্তি সত্ত্বেও শেষের কাজ দুটো শিখেছিল মিস্ মাটিনডেল নামে এক পাদ্রীবুড়ীর কাছে। এত সব জানা সত্ত্বেও কিছুই কাজে আসে না। জীবনলালকে দেখলেই তার পা ভারি হয়ে ওঠে, চোখ নত হয়ে পড়ে, গলার স্বর খাদে নেমে যায়, আর বুকের ভিতরে অবাধ্য হৃৎপিণ্ডটা মাথা কুটতে শুরু ক'রে দেয়। তবু যখন দুজনে আলাদা থাকে তখন একরকম চলে। নানারকম প্রশ্নোত্তরের টুক্‌রো পাথর দিয়ে প্রাচীর তুলে নিজেকে আড়াল করা যায়, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকলেই অসহায় হয়ে পড়ে। তখন রুমালীদি কেমন চটপট কথা বলে যায়, হাসি ঠাট্টা উত্তর প্রত্যুত্তরের ফিন্‌কি ছোটে, আর সে কিনা জড়োসড়ো দাঁড়িয়ে থাকে। কেন এমন হয় বুঝতে পারে না সে।

তুলসী ভাবে, স্বরূপদাদাও তো অনাত্মীয় পুরুষ, কিন্তু কই তার কাছে থাকলে তো এমন বৈকল্য উপস্থিত হয় না তার। কাউকে না জানিয়ে অসঙ্কোচে চলে গিয়েছিল স্বরূপদাদার সঙ্গে সে। জীবনলালও অনাত্মীয়—তবে দু'য়ে এমন প্রভেদ ঘটায় কেন? এখন যদি জীবনলাল প্রস্তাব করে যে, চলো তুলসী, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি—তবে কি তার সঙ্গে যেতে পারে সে? না, কিছুতেই সম্ভব নয়। যদিচ সেদিন রাত্রে ঝোঁকের মাথায় এইরকম একটা প্রস্তাব নিজেই ক'রে বসেছিল। না, কিছুতেই যেতে পারবে না সে, এমন কি রুমালীদি হুকুম করলেও নয়।

কিন্তু রুমালীদি যে কী! কেবলই মাঝখানে এসে পড়ে দুই সংখ্যাকে তিনে পরিণত করে। কেমন যেন স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। আড়ালে গেলে দেখতে ইচ্ছা করে, সম্মুখে এলে পালাতে পথ পায় না, পালালে ফিরে আসতে ইচ্ছা হয়। ফিরে এলেই মনে হয়, পালাই, পালাই, চোখে চোখে পড়তেই অবাধ্য চক্ষুতারকা অন্যমনস্কতার ভান করে। সে ভাবে ভাগ্যে কান ছিল, তার ভান করতে হয় না, উৎকর্ণ হয়ে থাকলেও বুঝতে পারে না অপরে। জীবনলাল যেন তপ্ত মানিক, হাতে ধরে রাখা কঠিন, ফেলে দেওয়া আরও কঠিন! কেবলি এ হাত ও হাত

করতে হয়। এ কি অস্বস্তি, এ কি আরাম! এ কি জ্বালা, এ কি মাধুর্য! ঘুম আসে না।

এমন সময়ে শুনতে পায় কোন্ নিদ্রিতের নিয়মিত নিঃশ্বাসের ছন্দ! কার? পল্টনের? না, পল্টন তো সন্ধ্যাবেলাতেই চলে গিয়েছে। রুমালীদির? না, তার চারপায়া তো বাঁদিকে। ও শব্দ ডানদিকে, আর আসছে পাশের ঘর থেকে। আর সন্দেহ থাকে না। দীর্ঘ লয়ে উচ্ছ্বসিত নিয়মিত নিঃশ্বাস প্রমাণ করে সুখ-সুপ্তির আরাম। তখনি তার মনে হয় লোকটা তো ভারি স্বার্থপর। যার কথা ভেবে তার ঘুম নেই সে কিনা আরামে ঘুমোচ্ছে। এতটুকু লজ্জা নেই, বিবেচনা নেই লোকটার। না, এমন ক'রে নির্বিঘ্নে কিছুতেই তাকে ঘুমোতে দেওয়া যেতে পারে না। আচ্ছা, চুপি চুপি উঠে গিয়ে চারপায়ায় ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে কেমন হয়? আচমকা জেগে হাউমাউ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠবে। সে ভারি মজা হবে। ভাবতেই তার হাসি পায়। রুমালীদি আবার না জানতে পায়। না, সে খুব ঘুমোচ্ছে।

তখন তুলসী ধীরে ধীরে চারপায়ার উপরে উঠে বসে। কোথাও জাগরণের এতটুকু লক্ষণ নাই। চমৎকার, সে পা টিপে টিপে এগোয় জীবনের ঘরের দিকে, ঢোকে জীবনের ঘরে, তারপরে সবলে চারপায়ায় দেয় গোটা দুই ঝাঁকুনি। তুলসী পালিয়ে আসবে ভেবেছিল, রওনাও হয়েছিল, কিন্তু মুহূর্ত-মধ্যে এক কাণ্ড ঘটে গেল। জীবন লাফিয়ে উঠে 'চোর চোর' ক'রে তুলসীকে সজোরে জাপ্‌টে ধরলো।

চোর, চোর!

চীৎকার শুনে জেগে উঠল রুমালী; ঘুমের ঘোরে বুঝতে পারলো না কোথা থেকে আসছে 'চোর চোর' আওয়াজ, দরজা খুলে বাইরে গিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল, 'চোর চোর'। নিচের তলার মসলন্দ কারিগর মুসলমানেরা রুমালীর গলা শুনে 'চোর চোর' রব করতে করতে উপরে উঠে এল।

কোথায় চোর, বহিন?

কি জানি কোথায়?

বাইরের দরজা বন্ধ, কাজেই ভিতরেই হবে। সকলে একসঙ্গে ঢুকে পড়ে। হঠাৎ এতগুলো লোক একসঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়ায় হকচকিয়ে গেল জীবন। সেই সুযোগে তার বাহুপাশ মুক্ত হয়ে তুলসী এসে শুয়ে পড়লো বিছানায়। এত কাণ্ড ঘটে গেল এক নিমেষে।

কোথায় চোর—পরস্পরকে সবাই শুধোয়। কেউ কেউ চোরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে।

জীবন ব'লে ওঠে, না, না, চোর নিশ্চয়। আমার চারপায়া নাড়া দিয়েছিল। মতলব ভালো ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেছিলাম।

তবে গেল কোথায় ?

জীবন ব্যাখ্যা দেয়, তোমরা সবাই একসঙ্গে ঢুকতেই হকচকিয়ে গিয়েছি, সেই সুযোগে আল্‌গা পেয়ে পালিয়েছে।

কি হয়েছে রুমালীদি, ঘুমভাঙা কণ্ঠে শুধোয় তুলসী।

ধন্যি মেয়ের ঘুম! পাড়া জেগে গেল আওয়াজে আর এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, কি হয়েছে রুমালীদি।

তবু তো বললে না, কি হয়েছে ?

কি আর হবে। চোর এসেছিল।

চোর আসতে যাবে কেন ?

তবে তোমার বর এসেছিল। হ'ল তো ?

কি আছে যে, সেই লোভে চোর আসবে ?

সেইজন্যই তো বললাম তোমার বর এসেছিল, তোমাকে চুরি ক'রে নিয়ে যাওয়ার মতলবে।

একজন ব'লে ওঠে, ভাগ্যে জীবনলালজী ছিল, নইলে কী হ'ত কে জানে।

ইতিমধ্যে বাতি জ্বালা হয়েছে। না, চোর কোথাও নেই। তুলসী বালিশে মুখ গুঁজে হাসিতে ফুলে ফুলে ওঠে। শব্দ শুনে রুমালী ভাবে সে কাঁদছে, হয়তো চোরের ভয়ে, নয়তো এইমাত্র যে ঠাট্টা করলো তারই ফলে।

সান্ত্বনা দিয়ে রুমালী ব'লে ওঠে, ভয় নেই রে ভয় নেই, চোর এসে থাকলেও পালিয়েছে। আর এলেই বা কি, এতগুলো লোক আছে।

যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবে তুলসী বলে, নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে, ভালো ক'রে ছাখো।

আবার একবার ভালো ক'রে দেখা হয়। না, কোথাও নেই।

কিছু কি নিয়েছে ?

কিছু নিয়েছে ব'লে তো মনে হয় না।

মসলন্দ কারিগরেরা চলে যায়। ওরা আবার দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ে।

জীবন বলে, রুমালী, চোরটা নিতান্তই ছেলেমানুষ।

কি ক'রে বুঝলে ?

বুকে চেপে ধরেছিলাম কিনা, এখনো গোঁফদাড়ি ওঠে নি।

তুলসী বলে, সেটাও কি পরীক্ষা করেছিলেন নাকি ?

তার ঠাট্টা কেউ ধরতে পারে না। রুমালী বলে, তোমার কথা সত্য হ'তে পারে। শুনেছি ছোট ছোট ছেলেদের আগে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় চোরের দল।

তাই বলো, ব'লে ওঠে জীবন।

তুলসী বলে, দিদি, আমি শুনেছি যে, চোরের দল অনেক সময়ে আগে মেয়ে-ছেলেকে ঢুকিয়ে দেয়।

অসম্ভব নয় তুলসী বিবি, বলে জীবন। বলে, বুকের মধ্যে চেপে ধরেছিলাম, কেমন নরম ঠেকলো।

ওঃ, নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে নিয়েছেন দেখছি। মনে হচ্ছে আপনি খুব হুঁশিয়ার পাহারাওয়ালা।

এতে আবার পরীক্ষা করার কি আছে! একটা লোককে বুকে জড়িয়ে ধরলে বোঝা যাবে না?

বুকে জড়িয়ে ধরেই বুঝতে পারেন চোর কি সাধু?

অন্তত স্ত্রী কি পুরুষ বুঝতে পারা যাবে তো।

তবু ভালো যে বুদ্ধিটুকু লোপ পায় নি। তবে কি মনে হয় জানেন, চোরটা পুরুষই ছিল।

কি ক'রে বুঝলে?

স্ত্রীলোক হ'লে কি আপনার আলিঙ্গন থেকে পালাতে পারতো?

কি বকছ তুলসী, এখন ঘুমোও, আর ভাইয়াকেও ঘুমোতে দাও।

আমি ঘুমোচ্ছি, কিন্তু তোমার ভাইয়ের যে আর ঘুম হবে মনে হয় না।

কেন ঘুম হবে না?

ঐ বুক থেকে ফস্‌কে-যাওয়া চুরনীর শোকে।

তারপর জীবনের উদ্দেশ্যে বলে, আক্ষেপ করবেন না জীবনলালজী। এসব চোর একদিন এসেই ক্ষান্ত হয় না, আবার আসবে।

এবারে জীবন নিশ্চয় বোঝে এতক্ষণ ঠাট্টা করছিল তুলসী। হেসে উঠে বলে, তাহলে রাতের বেলায় দরজা খুলে রাখতে হবে।

কোন প্রয়োজন নেই। আজ কি দরজা খুলে রেখেছিলেন? এসব চোর যাতায়াতের গোপন পথ জানে।

রুমালীর ভালো লাগে না এই রহস্যালাপ। তাড়া দিয়ে ওঠে, নাও, এখন ঘুমোও।

বিরক্তির আঁচ পায় তার কণ্ঠস্বরে তুলসী, তাই চুপ করে।

সে বলেছিল বটে যে জীবনের ঘুম আসবে না কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল ঠিক

বিপরীত। অল্পক্ষণের মধ্যেই জীবনের নাসাগর্জন শুনতে পাওয়া যায়, আর কিছুতেই ঘুম আসে না তার নিজের। সে ভাবে, কি করতে কি হয়ে গেল। যাক্, ভালোই হয়েছে। এমন কাণ্ড ঘটে যাবে ভাবতে পারে নি সে। হঠাৎ যদি কেউ আলো নিয়ে ঢুকতো। যদি হাত ফস্কে পালাতে না পারতো। এমন অনেকগুলো 'যদি' ফণা মেলে উদ্যত হয়ে ওঠে তার দিকে। কিন্তু এ কি, প্রত্যেকটি ফণা যে মণিভূষণা। ঐ পুরুষ বাহুর কঠিন আলিঙ্গন এখনো অনুভব করে তার দেহের প্রতি অণু পরমাণু, দেহের প্রতি অন্ত্র তন্ত্র শিরা ধমনী রক্তমজ্জা। আর দেহের সীমা উপচে সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতার দুরন্ত ঢেউ, অমাবস্যার সমুদ্রের তরঙ্গের মতো পৌছয় গিয়ে তার মর্মের গভীরতম স্থলে। কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে সে, যেমন কেঁপে কেঁপে ওঠে তরঙ্গ-তাড়নাহত সমুদ্রের তীরভূমি। সে ভাবে চোরজ্ঞানে বাহুর নিষ্পেষ যদি এমন মধুর হয় তবে কান্তাজ্ঞ নে নিষ্পেষ না জানি কি দুঃসহ মাধুর্যময় হবে! এ কি কাণ্ড! অভাবনীয়তার এক ধাক্কা তাকে এনে ফেলে দিল দয়িতের বুকের উপরে। আমের বোলের ভারে আচমকা ভেঙে পড়তে দেখেছিল এক প্রকাণ্ড শাখাকে এমনি ভাবে। ভূতি বুড়ীর মুখে শোনা বাংলা প্রবাদ তার মনে পড়লো, জোলায় চুরি করে নলি নলি খোদায় চুরি করে তাঁত। সচেতন চিন্তা যখন তাকে পায়ে পায়ে এগিয়ে দিচ্ছে, অকস্মাতের বাহু তাকে এক ধাক্কায় পার করে দিল সঙ্কোচের গণ্ডিটা। তার মনে পড়ে, একবার যেন হাতখানা লেগেছিল গালের উপরে; একবার যেন চিবুকের স্পর্শ লেগেছিল কপালে; হাতের মাংসপেশীগুলো নির্দয় কঠিন; এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ছিল পিঠ—আর এক হাত দিয়ে কোমর; নাঃ, পালাবার এতটুকু উপায় ছিল না; রাতের অন্ধকার আর ঘরের অন্ধকার মেলানো ঘোরতর অন্ধকারে, যখন সে একা একমাত্র আছে আর নেই জগৎ চরাচর, তখন নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করে, পালাবার ইচ্ছাও তার ছিল না; এমনি থাকতো দুজনে অনন্তকাল!

তুলসী জানে না যে নদী আর প্রেম মসৃণ বেগে চলতে চলতে মাঝে মাঝে প্রপাতের সাহায্যে নিজেকে দুর্বার ক'রে তোলে। এমন না ঘটলে নদীও পারতো না সমুদ্রে পৌছতে, প্রেমও পারতো না সার্থকতায় পৌছতে। ঐ প্রপাতগুলোকে নিয়মের ব্যতিক্রম মনে হ'লেও নিয়মের অঙ্গ বই নয়। এমন ঘটতে হবেই। তবে এই প্রপাতিক প্রেরণা কোন্ ক্ষেত্রে কোথা থেকে কিভাবে আসবে কেউ বলতে পারে না। তুলসীর ক্ষেত্রে এলো স্বকৃত হঠকারিতা থেকে। ভালোই হয়েছে। সুভদ্রার মতো ধারণ করেছে সে দুর্দাম ঘটনার বল্গা।

সকাল বেলায় উঠে জীবন বলল, রুমালী আর বসে থেকে লাভ কি! চলে

যাই।

জীবন ভেবেছিল রুমালী আপত্তি করবে, রাতের বেলায় বলেছিল আর একদিন থেকে যেতে। কিন্তু এখন সবিস্ময়ে দেখল যে, রুমালী সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

সত্যিই তো, আর বসে থেকে কি লাভ? যা হওয়ার তা তো হয়েই গিয়েছে। এলবিয়ন বিবি তো আর ফিরবে না।

পাশে বসেছিল তুলসী। সে বলে উঠল, কে বলতে পারে রুমালীদি। ফিরে আসতেও তো পারে এলবিয়ন বিবি।

যমুনার অতল থেকে?—কিঞ্চিৎ বিরক্তির সঙ্গে বলে রুমালী।

যমুনায় সে ডুবছে তা কি প্রমাণ হয়েছে?

আর কি ক'রে প্রমাণ হবে? তার চিঠিখানাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়?

মোটেই নয়—বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দেয় তুলসী।

সে বলে, অমন চিঠি অনেকেই লিখে আবার শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করে।

মত পরিবর্তনের আশায় কতদিন বসে থাকবে জীবনলাল? আমার ভাই তো বেকার নয়।

বেকার কি সাকার জানিনে, যা মনে হ'ল বললাম।

তুলসী ও রুমালী দুজনেই অবাক হয়ে যায় নিজেদের প্রত্যুত্তরে। জীবনলালও। এই প্রথম তাদের মধ্যে ঝাঁঝালো প্রশ্নোত্তর। রুমালী উঠে ঘরে চলে যায়, সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখে তুলসী কি করলো, জীবনের কাছেই বসে থাকলো না উঠে গেল। না, তুলসী উঠে চলে গেল।

রুমালী একা বসে নিজের মনটাকে মেলে দিয়ে বিচার করে। কেন এমন হ'ল? সে ভাবে, আর লুকিয়ে লাভ নেই; জীবনের প্রতি তুলসীর মনোভাবটা সে পছন্দ করে নি। ভাবে, না হয় তুলসী ভালোই বাসলো জীবনকে। তার ক্ষতি কি? দেহ-ব্যবসায়ে নামবার পরে হাজার বার সে নিজেকে বুঝিয়েছে পীরিত-ভালোবাসার ব্যাপারী সে নয়, তার দোকানে একমাত্র মাল দেহটা। এখন অপরের দোকানে তদতিরিক্ত যদি কিছু থাকে তবে তার তো আপত্তি করা উচিত নয়। কিম্বা এমন হওয়া কি অসম্ভব যে, তার দোকানে অন্য মালও ছিল, এতদিন চোখে পড়ে নি দেহ-চাপ ছিল বলে। তখনি মনে মনে বলে ওঠে, দূর দূর দূর! অন্য মাল! পীরিত ভালোবাসা!—মনে মনে হেসে ওঠে।

যখন রুমালী এইরকম চিন্তা করছিল তুলসী অন্য ঘরে গিয়ে বসলো জানলার ধারে। সেখানে এক টুকরো আলো তির্যকভাবে এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে, আর

বাইরে অশথ গাছের পাতার আগায় আগায় দুলছে আলোর বিন্দু। মস্ত অশথ গাছটা যেন এই মাত্র ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে, এখনো আড়মোড়া ভেঙে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে তার কাণ্ড আর ডালপালা। হাজার হাজার পাতায় কাঁপন লেগে শিরশির ঝিরঝির রব উঠছে। ভারি ভালো লাগলো তার। এমনভাবে প্রকৃতির দিকে কখনো তাকায় নি সে, মুগ্ধ হয়ে সে বসে রইলো। এই অশথ গাছটা কতবার না সে দেখেছে, কই কখনো তো এমন সুন্দর মনে হয় নি।

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো কুলুঙ্গির উপরে একখানা আয়নার দিকে, কি ভেবে তুলে নিয়ে তাকালো আয়নার মধ্যে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে পুলকে কৌতূহলে চমকে উঠল। কে এই নারী? আশ্চর্য সুন্দরী তো। কাচের সরোবরে যেন পদ্ম ফুটেছে। অবাক হয়ে যায় তুলসী। কতবার এই আয়নাখানা সামনে ধরেই সে মুখ দেখছে, চুল বেঁধেছে। চলনসই রকম সুন্দরী বলে তার ধারণা ছিল। কিন্তু এ যে আলাদা। আজ যেন আকাশের সব আলো এসে পড়েছে তার মুখের উপরে, আর যে আলো চোখে দেখা যায় না, মনের মধ্যে যার ঝরণা, সেই আলোটিও যেন মিশ্রিত হয়েছে আকাশের ঐ আলোর সঙ্গে। তার চোখের পলক পড়তে চায় না। তখনি মনে হ'ল এমন ক'রে আগে কখনো তাকায় নি নিজের দিকে, যেমন আগে তাকায় নি এমন ক'রে অশথ গাছটার দিকে। আয়না হাতে ক'রে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সে।

তুলসী নিতান্ত অবোধ না হ'লে বুঝতে পারতো, মাঝে মাঝে দুর্লভ অমৃতযোগ আসে মানুষের জীবনে, তখনি সৌন্দর্যের আরোপ হয়ে বস্তু হয়ে ওঠে সুন্দর। চার চোখের দেখা সেই অমৃতযোগ। দু-চোখের দেখায় পৃথিবী বাস্তব, চার চোখের দেখায় সুন্দর। তুলসী জানে না যে, তার চোখের সঙ্গে জীবনের চোখ মিলিত হয়ে আজ তাকিয়েছে তার মুখের দিকে।

দুর্লভ গুপ্তধনের মতো আয়নাখানা লুকিয়ে রেখে সে উঠে চলে গেল রূপালীর ডাকে। সারাটা দিন ঐ আয়নার স্মৃতি, ঐ আয়নায় তাকানোর আকাঙ্ক্ষা তাকে ভিতরে ভিতরে খোঁচাতে লাগলো। বিকাল বেলায় গোপনে আয়নাখানা বের করতে গিয়ে দেখলো সেখানা শত খণ্ড হয়ে পড়ে আছে।

তুলসী চমকে ওঠে, আয়না ভাঙলো কি ক'রে? একটা বিল্লি অবশ্য যাতায়াত করে, কিন্তু সে এমন টুকরো টুকরো ক'রে ভাঙতে যাবে কেন?

রূপালীদি, আয়নাখানা ভাঙলো কে?

কেমন ক'রে জানবো, কালকে রাতে চোরের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে গিয়ে

হয়তো ভেঙেছে।

কথাগুলো বলবার সময়ে রুমালীর মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে। তুলসী দেখতে পায় না, ছুজনে ছু-ঘরে।

বাঃ, তা কি ক'রে হবে। আজ সকালবেলায় আমি মুখ দেখেছি।

হঠাৎ এত মুখ দেখবার ধুম পড়লো কেন রে?

চুলগুলো আঁচড়াতে হবে না?

তার জন্যে তো কাঁকইখানাই যথেষ্ট। আয়নায় কি হবে?

কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না তুলসী, চুপ ক'রে থাকে। তারপরে খুঁটে খুঁটে কুড়োতে থাকে ভাঙা টুকরোগুলো।

কি হচ্ছে তুলসী, বলে ঘরে ঢোকে রুমালী।

এ কি, ভাঙা টুকরোগুলো কুড়োচ্ছ কেন? জোড়া দিয়ে আস্ত করবে নাকি?

তুলসী কুড়োতে কুড়োতে মন্তব্য করে, জোড়া দিলেই কি জোড়া লাগে?

তবে এমন পণ্ডশ্রম কেন? আর এই কথাটা বুঝলেই তো অনেক হাঙ্গামা মিটে যায়।

মিটে তো যায় দিদি, কিন্তু মন বোঝে কই?

ব্যঙ্গের হাসি ঠোঁটে নিয়ে রুমালী চলে যায়। ভাঙা টুকরো নিয়ে ছু-হাতের অঙ্গুলিতে ধরে নিষ্পলক চেয়ে থাকে তুলসী। ছোট বড় কত আকারের টুকরো! একখানা আয়না যেন একশ' চোখ মেলে দেখছে তুলসীকে। ক্রমে রাগে ক্ষোভে অব্যক্ত বেদনায় তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে—ঝাপ্‌সা হয়ে আসে কাঁচের টুকরোগুলো।

রুমালী অবশ্য যাওয়ার সময়ে ব'লেছিল আর একখানা আয়না কিনে আনলেই হবে, ফেলে দাও ঐ টুকরোগুলো।

তুলসী ভাবে পয়সা দিলেই আয়না পাওয়া যাবে সত্য, কিন্তু সে আয়না কি এ আয়না হবে! এই আয়নায় যে মুখ দেখেছিল জীবন। তার চোখের চাওয়ায় ছেয়ে ছিল আয়নাখানা। তাই তো তুলসী নিজেকে দেখতে পেয়েছিল এমন সুন্দর। সে সৌন্দর্য জীবনের দৃষ্টিতে আবিষ্কৃত। অন্য আয়নায় কী দেখবে সে? তাতে তো হয় নি জীবনের দৃষ্টির অভিষেক।

ওর মনে পড়ে, জীবন বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময়ে কথা বলছিল বটে রুমালীর সঙ্গে কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তার অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল ওর চোখের দিকে, কালবৈশাখীর বিদ্যুৎ যেমন ফাঁস পরাতে চেষ্টা করে শঙ্কিত পলায়নপর পাখিটার পায়ে। মনে পড়ে ওর জীবনের হাসি। একদিনের দেখাতেই বুঝেছে জীবনের

মুদ্রাদোষ ঐ হাসি—যখন তখন কারণে অকারণে হাসি। একবার শুধিয়েছিল, জীবনলালজী, এত হাসি পান কি ক'রে? হাসি কি এতই সুলভ?

জীবন বলেছিল, কুবেরের রাজত্বে হীরে মাণিক মুক্তো পথে পড়ে থাকে—সুলভ বই কি!

এ কি কুবেরের রাজত্ব? আর আপনার হাসি কি হীরে মাণিক মুক্তো!

যে মনে করে তার কাছে বইকি।

এমন কোন লোক পেলেন কি?

পাবো আশাতেই ছড়িয়ে যাচ্ছি। কেউ কুড়োতে লাগলেই পাকড়াও করবো।

তবে সারা জন্ম ছড়িয়েই যেতে হবে। কুড়োবার মতো নির্বোধ পাবেন মনে হয় না।

তুলসীর আবার অবাক লাগে কি ক'রে এমন কথার পিঠে কথা যোগায় তার মুখে। অথচ তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত থাকলেই কথা হারিয়ে যায়, গলা ভারি হয়ে আসে, চোখ নত হয়ে পড়ে। জীবনের বিদায়ের সময়ে উপস্থিত ছিল রুমালী, কথা হ'তে পারে নি। সেই সব অকথিত কথা আজ মনের অন্ধকার কক্ষে কক্ষে অন্ধ বাদুড়ের মতো দেয়ালে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে উড়ে বেড়াচ্ছে।

এই দুটি তরুণীর অচিরযুক্ত সংসারের মধ্যে শাণিত চিক্কণ তরবারির মতো প্রবেশ করেছে জীবন; সূক্ষ্ম বিচ্ছেদের রেখা দেখতে দেখতে স্থূলতর হয়ে উঠল। দুজনে পাশাপাশি শুয়ে বিনিদ্র রাত্রি চিন্তায় কাটায়।

রুমালী সঙ্কল্প করেছে জীবনকে তার চাই, কিছুতেই তার অধিকার ছেড়ে দেবে না অপরকে। তার ভালবাসা ক্ষিপ্র বজ্রের মতো, মুহূর্তের মধ্যে আকাশে সঞ্চিত হয়ে উঠে অমোঘ তীব্রতায় পড়ে লক্ষ্যের উপরে। আর তুলসীর প্রেম নবাঙ্কুরিত বনস্পতি, তার গতি ধীর, তার বৃদ্ধি মন্থর, সে প্রেম সার্থকতার জন্যে অপেক্ষা করতে জানে। রুমালী ভাবে জীবনকে আমার চাই-ই। তুলসী ভাবে জীবন কি আমাকে কখনো নেবে? রুমালীর প্রেম পাহাড়ী বন্যা, ভাসিয়ে নিতে চায়। তুলসীর প্রেম পাহাড়তলীর সরোবর, ভরিয়ে দিতে চায়। রুমালীর প্রেমে তৃষ্ণা বাড়ে, তুলসীর প্রেমে তৃষ্ণার নিবারণ। রুমালীর কেড়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রকাণ্ড দরবারে আপন রমণীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবারিত ক'রে দেখিয়েছে, অসঙ্কোচে আপন বিলাসব্যসনের কাহিনী বিবৃত করেছে, স্বীকার করেছে যে, বাধ্য হয়ে নয়, অর্থাভাবে নয়, সুখের আশাতেই শাহজাদাদের শয্যাসঙ্গিনী সে। এ সমস্তর সাক্ষীই যে জীবন। স্বেচ্ছায় কখনো ধরা দেবে না সেই সাক্ষী—সবলে তাকে ছিনিয়ে নিতে হবে, মত্তহস্তিনী যেমন সমূলে ছিন্ন ক'রে

নেয় সরোবরের সনাল মৃণাল পদ্মকে। অপেক্ষা ইতস্তত কুণ্ঠা—তার জন্যে নয়।

রুমালীদি আর কতদিন এখানে ব'সে থাকবো, শহরের অবস্থা এখন শান্ত ব'লেই তো মনে হয়। এবারে বাড়ি চলে যাই—কি বলো ?

মন্দ কি। কিন্তু যাবে কার সঙ্গে ?

রুমালী ভাবলো দেখা যাক কি বলে, জীবনের নাম বলে কি না। জীবন যাওয়ার সময়ে জানিয়ে গিয়েছিল সে দু'তিন দিনের মধ্যেই ফিরবে। কিন্তু সেদিক দিয়ে গেল না তুলসী। সে বলল, বাবা সেদিন এসে ব'লে গিয়েছিলেন ক'দিনের মধ্যেই আসবেন। এলেই যাবো ভাবছি।

আচ্ছা আসুন, তখন দেখা যাবে।

উভয়ের এই পর্যন্ত কথায় বোঝা গেল যে, যেতে বা যেতে দিতে আপত্তি নেই কোন পক্ষের।

রুমালী ভাবলো ভালই হয়, তুলসী গেলে একক অধিকার পাওয়া যাবে জীবনের। তুলসী ভাবলো বাড়ি গেলে জীবনকেও নিয়ে যেতে পারবে সেখানে। পাশাপাশি শুয়ে দু'জনেই নিজ মনের কূলে ঘটনার স্রোতকে বওয়াতে লাগলো। দু'জনেরই অভিমান ঘটনাকে নিজের অনুকূলে বওয়াতে তারা সক্ষম।

॥ ১০ ॥

স্বরূপ-জীবনলাল সংবাদ

জীবনলাল গিয়ে স্যালুট ক'রে দাঁড়ালো কর্নেল ব্রিজম্যানের কাছে। কর্নেল তাকে দেখে খুশী হ'ল, শুধালো, জীবন, কি খবর খুলে বলো।

জীবন বলল, স্যার, খবর ভালো নয়।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে ব্রিজম্যান শুধালো, কি ব্যাপার ?

সেই মেয়েটি, যাকে ওরা মিস এলবিয়ন বলে ডাকতো, বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে।

কবে ?

পরশু শেষ রাতে।

কেন গেল কিছু জানা গিয়েছে কি ?

এই চিঠিখানা ছাড়া আর কিছুই জানা যায় নি।

এই বলে সে এগিয়ে দিল মিস এলবিয়ন লিখিত চিঠিখানা। রুমালী আসবার সময়ে জীবনের হাতে দিয়েছিল, বলেছিল, নিয়ে যাও, আমরা রেখে আর কি করবো? ওর আত্মীয় স্বজন দেখলে হাতের লেখা চিনতে পারে।

ব্রিজম্যান চিঠিখানা ধীরভাবে বারকয়েক পড়ে গম্ভীর হয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরে বলল, কোথায় গেল, ওরা কি অনুমান করে?

যমুনায় ডুবে মরেছে আশঙ্কা ক'রে নদীর ধারে ধারে অনেক অনুসন্ধান করেছে।

অনুসন্ধানের ফল কি?

কিছুই নয় স্যার, কোন হদিস পাওয়া যায় নি।

ব্রিজম্যান বলে, I am afraid the worst has happened.

ওদেরও তাই ধারণা।

মেয়েটি মিস ক্লিফোর্ড বলেই মনে হয়, কি বলো?

জীবন উত্তর দিল না, পকেট থেকে কাগজের মোড়ক বের ক'রে এগিয়ে দিল ব্রিজম্যানের দিকে।

কি আছে এর মধ্যে—বলতে বলতে খুলে ফেলল ব্রিজম্যান, বের হয়ে পড়লো ছোট একখানা লেডিজ রুমাল, এখানে ওখানে রক্তের ছোপ-লাগা। রুমালী এই রুমালখানাও দিয়ে দিয়েছিল জীবনের হাতে, বলেছিল ওর আর সব কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে—আছে এই রুমালখানা, নিয়ে যাও, যদি কিনারা হয় কিছু।

ব্রিজম্যান বলে, মেয়েদের রুমাল, রক্তের দাগ-লাগা। এ কি, এই কোণে যে নামের আদ্যক্ষর E C!—তারপরে আবেগের সঙ্গে বলে ওঠে, এলিনা ক্লিফোর্ড। সমস্ত সংশয়ের নিরসন ঘটলো।

আদ্যক্ষর দুটো দেখে আমারও তাই মনে হয়েছে।

ওদের কিছু বলেছ?

না।

ভালই করেছ।

রুমালখানা মিস্টার ক্লিফোর্ডকে দেবেন না?

দেবো, তবে এখন নয়। দিল্লি আক্রমণের ঠিক আগে দেবো, এখন দিলে হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে।

একটু থেমে থেকে বলে, থ্যাঙ্ক ইউ জীবন, তোমার বিচক্ষণতা ও সাহসের জন্যেই একটা সমস্যার সমাধান হ'ল, যদিচ সমাধানটা সমস্যাটার চেয়েও অধিকতর

শোকাবহ। এখন যেতে পারো।

জীবন যাওয়ার উদ্যম করে না, দাঁড়িয়ে থাকে দেখে ব্রিজম্যান শুধোয়, আর কিছু বলবার আছে?

জীবন বলে, এবারে দিল্লি শহরে ঢোকবার পথে এক সিপাহী হাবিলদারের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলাম।

কৌতূহলী হয়ে উঠে ব্রিজম্যান শুধোয়, ওয়েল, তার পরে।

জেনারেল উইলসনের চিঠিখানা ছিল বলেই ধরা পড়লাম, নইলে বুঝতে পারতো না, আগেও তো গিয়েছি।

তারপরে, তারপরে?

আমাকে নিয়ে গেল শাহ্‌জাদা মীর্জা আবুবকরের কাছে।

হাঁ, লোকটার নাম জানি।

তখন জীবন আদ্যন্ত ঘটনা বিবৃত ক'রে শাহ্‌জাদার চিঠিখানা বের ক'রে এগিয়ে দেয় কর্নেলের দিকে, কিন্তু কর্নেল নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে না। উল্‌টে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ?

আমি কোন প্রতিশ্রুতিই দিই নি, বলেছি, চিঠি পড়ে যদি নির্দোষ মনে হয় তবে নিয়ে যেতে পারি, তবে গ্রহণ করা বা উত্তর দেওয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে খোদ জেনারেল সাহেবের উপরে।

জীবন, এরকম ক্ষেত্রে যা বলা উচিত তাই বলেছ, তবে নিশ্চয় জেনো যে, জেনারেল এরকম চিঠির উত্তর দেবেন না।

জীবন আরও কিছু উত্তর প্রত্যাশা করে, যদিচ মুখে কিছু বলে না। সেটা অনুমান ক'রে নিয়ে ব্রিজম্যান বলে—কিছুদিন থেকে এই রকম সব চিঠি আসতে শুরু করেছে শাহ্‌জাদাদের কাছ থেকে, এমন কি বেগম সাহেবের খান-দুই চিঠিও এসেছে। কিন্তু গভর্নমেণ্টের পলিসি হচ্ছে এ সব চিঠি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা। জীবন, যাদের হাত ইংরেজ নরনারীর রক্তে কলঙ্কিত তাদের সঙ্গে কিছুতেই, কোন শর্তেই আপস সম্ভব নয়।

এই রকমটিই আশঙ্কা করেছিল জীবন, তাই বলল, এ চিঠিখানা আমি কি করবো?

তোমার কাছেই থাকুক। ও কিছুতেই ফরওয়ার্ড করতে পারি না জেনারেলের কাছে। তুমিই রাখো, যুদ্ধ শেষে যুদ্ধের স্মারক হিসাবে রয়ে যাবে তোমার কাছে।

স্যার, শাহ্‌জাদাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে চিঠির কি গতি হয় তাঁকে

জানিয়ে আসবো।

কিছুক্ষণ ভেবে ব্রিজম্যান বলল, আচ্ছা, যাও। আর কিছু না হোক গভর্নমেণ্টের মনোভাব জানতে পারলে ঐ ভদ্রলোকেরা ঘন ঘন চিঠি লেখার ঝামেলা থেকে অব্যাহতি পাবেন। যাওয়াই ভালো, তবে চটপট ফিরে এসো।

জীবন বিদায় নিয়ে বের হয়ে আসে। বাইরে এসে দেখে যে দরজার কাছে অপেক্ষা করছে ক্যালিবান। দু'জনে ফিরে আসে হিন্দুরাও কুঠিতে।

অনেকদিন পরে বৃষ্টিবাদল মেঘ কেটে গিয়ে নির্মল আকাশে চন্দ্রোদয় হয়েছে, অন্তরীক্ষ পৃথিবী চারিদিক নিস্তব্ধ। পাহাড়, পাহাড়ের উপরকার কুঠি, ঐ দূরে শাহ্জাহানাবাদের প্রাচীর বুরুজ, সমস্তই কেমন অপার্থিব দেখাচ্ছে। দিনের বেলাতে যে খণ্ডযুদ্ধ চলেছিল, যুদ্ধের শত সহস্র আয়োজন জ্যোৎস্নার সর্বজনীন নেশায় যেন আত্মবিস্মৃত। এমন রাত বুঝি ঘুমিয়ে কাটাবার জন্যে সৃষ্টি হয় নি। ঘুম আসে না জীবনের চোখে। সে উঠে বসলো, দেখলো যে স্বরূপ তখনো জেগে।

জীবন বলল, স্বরূপ ভাই, চলো না একটু বাইরে ঘুরে আসা যাক।

স্বরূপ সংক্ষেপে উত্তর দিলো, চলো।

দু'জন বাইরে এসে দাঁড়ালো, সঙ্গে উঠে এসে দাঁড়ালো ক্যালিবান। ওরা খানিকটা হেঁটে দাঁড়ালো। জীবন বলল, চলো বসা যাক।

ওরা একখানা পাথরের উপরে পাশাপাশি বসলো, পাশে মাটির উপরে বসলো ক্যালিবান।

জীবনের সমস্ত মন এই ক'দিনের সুখকর অভিজ্ঞতায় এমন কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে যে এখন বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। কোন বশংবদ কানে এই অভিজ্ঞতা না ঢালতে পারলে তার স্বস্তি নেই। সুখী সঙ্গী চায়, দুঃখী নিঃসঙ্গতা।

মনের গভীর গোপন কথা, সুকুমার অনুভূতি প্রকাশ তো সহজ নয়, দিনের নিষ্ঠুর আলোয় বুঝি একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু জ্যোৎস্না যখন অকৃপণ হাতে সোমরস ঢালছে তখন নিতান্ত সাদাসিধে মানুষেও কবির ভাষা পায়—এক রকম ক'রে প্রকাশ করতে পারে আপনাকে। কিন্তু ঠিক কোথা থেকে আরম্ভ করবে ভেবে পায় না জীবন। উসখুস করতে থাকে।

স্বরূপ অনুমান করে যে জীবন কিছু বলতে চায়, বোঝে তার মনে এমন একটা কিছু আছে যা ব'লে না ফেলতে পারলে, সমবেদনার কানে ঢালতে না পারলে স্বস্তি নাই। সুখের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করলে বাড়ে, দুঃখের অভিজ্ঞতা কমে। এ পর্যন্ত জীবন অবশ্য কিছু বলে নি, কিন্তু সেই প্রথমবার দিল্লি থেকে ফিরে আসবার পরে তার মুখ দেখে স্বরূপ অনুমান করেছিল, কোথাও একটা মস্ত পরিবর্তন

ঘটেছে তার মনের মধ্যে। এবারে সেটা আরও বেড়েছে সে লক্ষ্য করেছে। কী জানে না, তবে অপূর্ব আভায় তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। মেঘ চাপা চাঁদ দেখা না গেলেও জ্যোৎস্নাই তার প্রমাণ।

কিছুক্ষণ পরে জীবন হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে যে, কথাটা কখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। স্বরূপ নিঃশব্দ সমর্থনে গ্রহণ করছে সব। সংসারে সমবেদনার কান দুর্লভ।

স্বরূপ বলে, মেয়েদের মন সহজে জয় করতে সক্ষম যে পুরুষ, ইংরেজিতে তাকে বলে Lucky dog।

জীবন বলে, জয় করতে যে পেরেছি কেমন করে জানবো? আমার মনের কথা জানি। কিন্তু তার মনের কথা!

ছাখো জীবন, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত অল্প, তারপরে শাস্ত্রে বলে, মেয়েদের মনের কথা দেবতারাও জানতে পারেন না।

তবে? শুধোয় জীবন।

তবু তো সংসারে মন জানাজানি, মন দেওয়া-নেওয়ার বিরাম নেই।

তবে কেমন ক'রে জানবো যে মেয়েটি ভালোবাসে আমাকে?

তার শেষ বিচারক মন।

সেই মনটাই যে সংশয়ে কণ্টকিত।—দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে জীবন।

ওতেই অনুমান হয় যে মেয়েটির মন তোমার প্রতি বিমুখ নয়—যদিচ ওটা প্রমাণ নয়।

জীবন স্বগতোক্তি করে, শেষে কিনা এমন জায়গায় মন বাঁধা পড়লো যেখানে সব অবস্থাই প্রতিকূল।

প্রতিকূল কেন বলছো?

প্রতিকূল নয়! শত্রুপুরীর মধ্যে তার অবস্থান। এখনো সম্মুখে দীর্ঘ অনিশ্চিত সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত কি হবে কেউ জানে না।

স্বরূপ বলে, অনুকূল অবস্থার মধ্যেই কি সব সময়ে মন পাওয়া সুলভ?

কেন এমন বলছ, স্বরূপ?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে, মনটাকে রাজী করিয়ে নিয়ে স্বরূপ বলে, ছাখো জীবন, আমার ব্যক্তিগত দুঃখের কথা এ পর্যন্ত কাউকে বলি নি। আমার মৃতদেহের ভার বয়ে আমি ক্লান্ত। আজ না হয় তোমার কাছেই সে ভার নামাই।

নামাও ভাই নামাও, মনটা হাল্‌কা হোক।

স্বরূপ বলে, আমিও ভালো বেসেছিলাম একটি মেয়েকে।

জীবন শুধায়, সে ?

সে? ঐ তোমার কথারই প্রতিধ্বনি করতে হয়। নিজের মনের কথা জানি, কেমন ক'রে জানবো তার মনের কথা।

মুখে কখনো বলে মেয়েরা? চোখে, আচারে, ব্যবহারে, পোশাকে পরিচ্ছদে সব রকমেই বলে—কেবল মুখে ছাড়া।

সে কি লজ্জায় ?

লজ্জায়? হবেও বা! কিন্তু আমার মনে হয় কি জানো, ইচ্ছা ক'রেই ঐ একটুখানি ফাঁক রেখে দেয় তারা, ঐখানেই জমে লীলার আসর। ঐ ফাঁকা জায়গাটুকুতে হাঁসফাঁস ক'রে মরে অবোধ পুরুষ। ক্লান্ত না হওয়া অবধি তো সে ধরা দেবে না।

অধীর আগ্রহে জীবন শুধায়, তারপরে বলো কি হ'ল ?

আগে আগের কথা শোন। দীর্ঘকালের ছিল আমাদের পরিচয়, সে যখন বালিকা, আমি যখন কিশোর।

তখন থেকেই— ?

না, পরিচয়ের দীর্ঘতাই প্রেম নয়। দীর্ঘ সলতের আগাটুকু শুধু জলে, বাকি পনেরো আনা অংশ তো শুধু তেল আর ন্যাকড়া।

জীবন বলে, একদিন বুঝি জলে উঠল সলতের আগাটুকু? কিন্তু ভাই স্বরূপ, আমার পরিচয় তো দীর্ঘ নয়।

না-ই হ'ল। দীর্ঘ পরিচয় হ'তেই হবে এমন কথা নেই। আমি সলতের নিচের দিক থেকে উঠেছি, অনেকটা সময় লেগেছে। তুমি গোড়াতেই শিখার দিকে এসে পৌঁচেছ। সেই জন্যই তোমাকে বললাম, Lucky dog !

শিখার দিকে পৌঁচেছি বলেই বুঝি এত জ্বালা।

হ'তেই হবে। কিন্তু শুধুই কি জ্বালা ?

না ভাই, আনন্দও আছে।

তবে ?

সেই কথাই তো ভাবছি। এ রকমটি আগে কখনো ঘটে নি জীবনে।

পরেও আর ঘটবে না।

বিস্ময়ের সঙ্গে শুধায় জীবন, কেন ?

প্রথম প্রেম যে বজ্রাগ্নি, তেমনি মনোহর, তেমনি অতর্কিত, তেমনি দৈবপ্রেরিত।

জীবনের কাছে এসব কথা একেবারেই নূতন, তার কৌতুহলের অন্ত থাকে না।

শুধায়—কিন্তু প্রথম তো শেষ প্রেম না হ'তেও পারে।

কে বলল হ'তে পারে। পরেও মানুষে পড়তে পারে প্রেমে, কিন্তু তাতে প্রথম প্রেমের অপূর্ব মাধুর্য নেই। তখন পথঘাট যে অনেকটা পরিচিত হয়ে গিয়েছে।

ছাখো স্বরূপ ভাই, এখন বুঝতে পারছি এই প্রথম ভালবাসলাম। কিন্তু কিছুকাল আগেকার এক অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছিল বুঝি ভালবেসেছি তাকে।

খুলে বলো।

এখানে আসবার পথে বেরিলি শহরে পান্না নামে এক বাঈজীর ঘরে কিছুকাল লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল তার প্রতি আমার যে মনোভাব তা বুঝি ভালবাসা।

সেটা ভালবাসা নয়, ভালবাসার দেয়ালা। শিশুরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসে কাঁদে দেখেছ? সে হাসি-কান্না পূর্বজন্মের সুখ-দুঃখের জের। তখনো যে লেগে আছে সেই সব স্মৃতির রেশ তার মনে।

আবার স্বগতোক্তি ক'রে যায় জীবন, জানি না কাকে ভাল বাসলাম, কী তার পরিচয়!

সব মেয়েরই এক পরিচয়।

কি সেটা?

সর্বনাশের ভিয়ানে মাধুর্যের পাক।

বুঝতে পারে না জীবন। তাই প্রসঙ্গ পাল্‌টে নিয়ে শুধোয়, আচ্ছা স্বরূপ, কি হ'ল সেই মেয়েটির যাকে তুমি ভালবাসতে?

অপ্রিয় সত্যটা যত সত্বর সম্ভব চুকিয়ে দেওয়ার ইচ্ছায় এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল, সিপাহীদের হাতে মারা গিয়েছে।

চমকে উঠে জীবন শুধায়, কেন?

মেম সাহেব মনে করেছিল।

জীবন কিছু বলতে উদ্যত হয়েছিল, বাধা দিয়ে স্বরূপ বলল, আর প্রশ্ন ক'রো না।

এমন সময়ে একটা বাদুড় পাখা ঝাপ্‌টে চলে যায় ঠিক মাথার উপর দিয়ে, চটকা ভেঙে যায় সকলের, সবচেয়ে বেশি সজাগ হয়ে ওঠে ক্যালিবান। অস্পষ্ট গর্জনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে সে বাদুড়টাকে।

জীবন তার মাথায় বার কয়েক থাবা দিয়ে বলে, ব'স, ব'স, ভয় নেই।

ক্যালিবান চোখ তুলে তাকায় জীবনের দিকে, সেই জ্যোৎস্নার আলোতেও

জ্বল-জ্বল ক'রে ওঠে চোখ দুটো।

স্বরূপ বলে, ওর যদি সুখ-দুঃখের কথা বলবার ক্ষমতা থাকতো তবে বুঝি মানুষের সুখ-দুঃখ ফিকে হয়ে যেতো তার কাছে। মানুষ হয়ে জন্মেও পশুজীবন যাপন, এ কি নিদারুণ পরিহাস বিধাতার।

কেমন ক'রে হ'ল তাই ভাবছি।

স্বরূপ বলে, এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সবাই বাইরে শোয়, তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে প্রায়ই নিয়ে যায় নেকড়েতে।

ওকেও নিয়েছিল তা হ'লে?

নিশ্চয়।

তখনি জীবনের মনে পড়ে পান্নার সেই গল্প, বলে, সেই যে মেয়েটির কথা এইমাত্র বললাম, তাদের বাড়িতেও ঘটেছিল এমনি ঘটনা। ওদের এক ভাইকে শিশুবেলায় নিয়ে গিয়েছিল নেকড়েতে।

স্বরূপ বলে, আমিও এমন তিন-চারটি পরিবার জানি দিল্লির, যাদের বাড়িতেও এমন কাণ্ড ঘটেছে। ঘরে ঘরে দুঃখ, কাঁটা বাঁচিয়ে পা ফেলাই মুশকিল।

তখন জীবন পান্নাদের পরিবারের সেই শিশু-কন্যা বদলের কাহিনী বলে, বলে, সে মেয়েকে যারা নিয়েছিল টাকার লোভে বেচে দিয়েছিল তারা। অবশ্য তারা বলে যে মারা গিয়েছে, তবে সে কথা পান্নারা কেউ বিশ্বাস করে না।

তবেই ছাখো অদৃষ্টের কি লীলা। ছেলেও গেল মেয়েও গেল, কে কোথায় গেল কেউ জানে না। এ যেন রঙ অনুসারে সুসজ্জিত তাস খেলুড়ির হাতে ফাটানোয় সব ওলট-পালট হয়ে গেল।

বড় বড় দুটো চোখ মেলে অবাক হয়ে শোনে ক্যালিবান।

জীবন বলে, ও কি বুঝতে পারছে আমাদের কথা।

এমন সময়ে স্বরূপের চোখ পড়ে শাহ্‌জাহানাবাদের প্রাচীরের দিকে। জ্যোৎস্নার আলোয় দিনের বেলাকার প্রবালের প্রাচীর এখন চুনীর আভার মতো জ্বলছে। অব্যক্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে।

কি হ'ল ভাই?

আমি তাকাতে পারি নে ঐ শহরটার দিকে।

জীবন বোঝে স্বরূপের কোম্পানী-পক্ষে যোগ দেওয়ার কারণ।

স্বরূপ উঠে দাঁড়ায়, বলে, নাও ওঠা যাক, কাল আবার তোমাকে দিল্লিতে যেতে হবে।

দুজনে হিন্দুরাও কুঠির দিকে রওনা হয়, পিছনে পিছনে চলে ক্যালিবান।

॥ ১১ ॥

অনুপ সিং-এর প্রতিজ্ঞা

যেদিন সকালবেলা জীবনলাল দিল্লিতে এলো মীর্জা আবুবকরের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে, সেদিন বিকেলে ঘণ্টেওয়ালায় মিঠাই-এর দোকানে এসে উপস্থিত হ'ল সুখানন্দ পণ্ডিত। রুমালীর বাড়িতে যাবে তুলসীকে দেখতে, কিছু মিঠাই কিনে নিয়ে যেতে চায়। তখন দোকানে মালিক মথ্‌খনলাল, একজন কারিগর ছাড়া আর একজন প্রৌঢ় লোক উপস্থিত ছিল। তার কাঁচাপাকা দুদিকে ফেরানো দাড়ি, মাথায় জয়পুরী ধরনে বাঁধা মলমলের পাগড়ী, হাতে বাঁশের পাকা লাঠি। লোকটির নাম অনুপ সিং, মথ্‌খনলালের দেশের লোক। দিল্লিতে এলে মথ্‌খনলালের দোকানে থাকে, এবারে অনেকদিন পরে এসেছে। দু'জনে ব'সে দেশের গল্প করছিল। এমন সময়ে প্রবেশ করলো সুখানন্দ পণ্ডিত।

তাকে দেখে হালুইকর অভ্যর্থনা ক'রে বলল, রাম রাম পণ্ডিতজী, আসুন। তারপরে, তবিয়ৎ ভালো তো?

পণ্ডিত হওয়ার জন্যে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না, বেশভূষা ও প্রকাণ্ড পাগড়ীটাই যথেষ্ট। পাগড়ীর বোঝাতেই পাণ্ডিত্য বোঝা যায়।

ক'বার যাতায়াতে ও প্রচুর মিঠাই খরিদে দু'জনের মধ্যে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল।

সুখানন্দ বলল, যে দিনকাল পড়েছে, তবিয়ৎ ভালো থাকলেও মেজাজ ভালো থাকে কই।

মথ্‌খনলাল বলল, ও সব হাঙ্গামায় আমাদের দরকার কি। আপ ভলা তো জগ ভলা। আমি মিঠাই তৈরি করি, আপনি তুলসদাসজীর রামচরিত মানস পড়ুন। আমরা সিপাহীর দিকেও নই, কোম্পানীর দিকেও নই, যে জিতবে তার দিকে।

এই ক'দিনের পরিচয়ে হালুইকর বুঝেছিল যে, সুখানন্দ সিপাহীদের প্রতি অনুরক্ত নয়—তাই সাহস ক'রে কথাগুলো বলল।

তা বটে। দাও, ভালো মিনাই কি আছে, সের-দুই দাও।

এই বলে সুখানন্দ জেব থেকে টাকা বের করলো।

এতক্ষণ অনুপ সিং উদাসীন ছিল, এবারে সুখানন্দ পণ্ডিতের হাতের দিকে চেয়ে সচেতন হয়ে উঠল, পণ্ডিতজী, আঙুল কাটলো কি ক'রে ?

সুখানন্দও সচেতন হয়ে ওঠে, হাতটা সরিয়ে নিতে নিতে একটু হেসে বলে, বয়সকালে জঙ্গী আদমি ছিলাম, ওটা তারই চিহ্ন।

তা বটে, বলে গম্ভীর হয় অনুপ সিং। মখ্‌খনলাল বলে, পণ্ডিতজী একটু বসুন, এই পাকটা নামলেই আপনাকে দেবো—আচ্ছা মিঠাই বনছে।

তখন হালুইকর ও সুখানন্দ গল্পগাছা শুরু ক'রে দেয়—শহরের হালচাল, দিল্লির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথাবার্তা হ'তে থাকে তাদের মধ্যে। অনুপ সিং যোগ দেয় না সে আলোচনায়, অন্যের অগোচরে এক মনে সে দেখতে থাকে সুখানন্দকে। কিছুক্ষণ পরে সে আপন মনে গুন গুন ক'রে গান ধরে—

কোম্পানী বাহাদুর বড়া জুলুম কিয়া
মেরা মাল মুলুক সব ছিন লিয়া।

ঘুরে ঘুরে ঐ দুটো ছত্র গুনগুনিয়ে গান ক'রে যায় অনুপ সিং।

হঠাৎ অনুপ সিং-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে সুখানন্দ ব'লে ওঠে, গানের কথাগুলো ঠিক হচ্ছে না।

উৎসাহ প্রকাশ ক'রে অনুপ সিং বলে, আপনি কি অন্য রকম জানেন নাকি ?

আমি তো এই রকম জানি—বলে সুখানন্দ গুন গুন স্বরে আরম্ভ করে—

কোম্পানী বাহাদুর বড়া জুলুম কিয়া
লখনউ নগরী মেরি ছোড়ায় লিয়া।

মখ্‌খনলাল বলে, পণ্ডিতজীর গানের কথাগুলোই ঠিক মনে হয়, লখনউ নগরী মেরি ছোড়ায় লিয়া।

হাঁ জী, এ গজল তো খাস ওয়াজেদ আলি শার রচনা, তাই তিনি লিখেছেন, লখনউ নগরী মেরি ছোড়ায় লিয়া—বলে সুখানন্দ।

অনুপ সিং এই রকম একটা সিদ্ধান্তের দিকেই ঠেলছিল আলোচনাকে, তাই এবারে বলল, তা হবে, আপনার কথাগুলোই হয় তো ঠিক।

তারপরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো, আপনি বুঝি লখনউ-এ ছিলেন ?

ছিলাম বই কি, অনেকদিন ছিলাম।

অনুপ সিং-এর মুখের মাংসপেশীর রেখাগুলো কঠিন হয়ে ওঠে, অবশ্য কেউ লক্ষ্য করে না।

আচ্ছা পণ্ডিতজী, আপনি কি অমর সিং-কে জানতেন ? শুধায় অনুপ সিং।

সুখানন্দ বলে, সাহেব, লখনউ শহরে তিন লাখ লোকের বাস, কে কার খবর

রাখে।

নবাবের তহশীলদার অমর সিং একজনই ছিল।

এবারে যেন মনের মধ্যে ধাক্কা খায় সুখানন্দ, সচকিত ভাবে বলে ওঠে, আমি লেখাপড়া নিয়ে থাকি, তহশীলদারের খোঁজ কি রাখি।

অনুপ সিং ছাড়ে না, বলে, এক সময়ে তো জঙ্গী আদমি ছিলেন, আঙুল কাটা গিয়েছে।

তা বটে, তা বটে—বলে হাতখানা লুকোয় সুখানন্দ।

হালুইকর হেসে ওঠে, এই দুই বৃত্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন ক'রে দেয়, বলে, নৌ শৌ চুহা খাকে বিল্লি চলী হজকো।

তারপরে ব্যাখ্যা ক'রে বলে, জোয়ান বয়সে সবাই জঙ্গী, বুড়ো হ'লেই কেতাব আর তসবী নিয়ে পড়ে।

সুখানন্দ কিছু অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করে হালুইকরকে, তবে অনুপ সিং-এর মনে লাগে না যেন কথাটা। তার চোখে আগুনের জ্বালা ফুটে ওঠে।

কারিগরের উদ্দেশ্যে সুখানন্দ বলে ওঠে, দাও, দাও, যা হয়েছে বেঁধে-ছেঁদে দাও, অনেক দেরি হয়েছে, আর বসতে পারি না।

দাম চুকিয়ে দিয়ে মিঠাই এর ঝুড়ি নিয়ে তাড়াতাড়ি বের হয়ে পড়ে সুখানন্দ।

অনুপ সিং শুধায়, পণ্ডিতজী কোথায় থাকেন জানো?

মখ্খনলাল বলে, না, আগে তো পরিচয় ছিল না। মাস দুই হ'ল পরিচয় হয়েছে, মাঝে মাঝে আসেন, মিঠাই নিয়ে যান। কাছেই বোধ হয় কুটুম-সাক্ষাৎ কেউ থাকে।

তারপরে উল্টে শুধোয়, কেন বলো তো? কুষ্টি দেখাবে নাকি? তা যদি হয় এমন এলেমদার লোক আর পাবে না। ভবিষ্যৎ গুনতে অতীত গুণতে পণ্ডিতজীর জুড়ি নেই।

তেমন উৎসাহ প্রকাশ করে না অনুপ সিং, কেবল সংক্ষেপে বলে, অতীতের একটা রহস্য গণনা করাতে চাই।

তবে একদিন দেখা করো না কেন?

সেই জন্যই তো বাড়ির ঠিকানা খোঁজ করছিলাম, বলে অনুপ সিং।

সুখানন্দ পথে বের হ'তেই জীবনলালের দেখা পেলো, যদিচ দু'জনেই একই পথের, একই লক্ষ্যের পথিক—তবু কেউ কাউকে চেনে না, তাই নীরবে কখনো পাশাপাশি কখনো আগু-পিছু তারা চলতে লাগলো। জীবনলাল অন্যমনস্ক ছিল

নতুবা ঘণ্টেওয়ালার দোকান থেকে কিছু মিঠাই কিনে নিয়ে যেতো। শাহ্‌জাদার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতা সে মনে মনে পুনরাবৃত্তি করছিল। সে ভাবছিল, লোকটা খুব হতাশ হয়ে পড়েছে। সে গিয়ে কুর্নিশ ক'রে দাঁড়াতেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল মীর্জা আবুবকর, বলল, তুমি খুব সাচ্চা আদমি, তোমার কথায় কাজে এক, কী জবাব দিল জেনারেল সাহেব? কিন্তু যখনি শুনলো যে জবাব দূরে থাক, চিঠিখানা অবধি গ্রহণ করে নি, তখনি এক ফুঁয়ে উৎসাহের বাতি নিবে গেল তার মুখে। ব্রিজম্যান বলে দিয়েছিল যে, শাহ্‌জাদাকে যেন জানায় যে কোন শর্তেই কোম্পানী আর ক্ষমা করবে না শাহ্‌জাদাদের। ঐ নিষ্প্রভ মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলতে তার মন সরলো না—অথচ কিছু না বললেও নয়। তাই হত-ইতি-গজঃ ক'রে জানালো যে, কোম্পানীকে আর চিঠি লিখে লাভ নেই, লিখলেও উত্তর দেবে না কোম্পানী পক্ষ। মুষড়ে পড়লো লোকটা। অনেকক্ষণ কথা বের হ'ল না তার মুখে। অবশেষে বলল, তুমি আর কি করবে? তোমার কথা রক্ষা করেছ, তোমাকে আমি কিছু বকশিশ দিতে চাই। সে বলেছিল শাহ্‌জাদার বহুৎ মেহেরবানি, তবে বকশিশ নিতে পারবো না, তবে যদি তিনি খুশী হয়ে থাকেন তবে পাহারাওয়ালাদের যেন হুকুম ক'রে দেন, আমার বহিনকে দেখতে আসবার সময়ে যেন ধড়পাকড় না করে। মীর্জা আবুবকর তখনি সে রকম হুকুম দিয়ে দিল। বিদায় নিয়ে কুর্নিশ ক'রে চলে এলো জীবনলাল। এখন পথে চলতে চলতে এই সব কথাই উল্‌টে পাল্‌টে চিন্তা করছিল সে।

মনের মধ্যে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে যায় জীবনলাল. ঐ শাহ্‌জাদার জন্যে এত করুণা কোথায় সঞ্চিত ছিল তার হৃদয়ে? শাহ্‌জাদাদের ইতিহাস কারো অজ্ঞাত নয়, বিশেষ বিদ্রোহ উপলক্ষে তারা যে নারকীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা আজ কে না জানে! হত্যা, লুঠতরাজ কি না করেছে তারা। তা ছাড়া ক'দিনেরই বা পরিচয় মীর্জা আবুবকরের সঙ্গে তার। জীবনের কাছে সে একটি নাম বই তো নয়। তবে? আর এমন কীই বা দুঃসংবাদ বহন ক'রে গিয়েছে? কোম্পানী পক্ষ তার চিঠির জবাব দেবে না। এ আর এমন কি গুরুতর সংবাদ। অথচ সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না শাহ্‌জাদার বিস্ময়-খিন্ন মুখমণ্ডল। "কোম্পানী বাহাদুর কোন চিঠির জবাব দেবে না! এমন কি চিঠি গ্রহণ করতেও, পাঠ করতেও রাজী নয়! হা, আল্লা।" ঐ সখেদ আল্লা উচ্চারণ প্রচণ্ড মোচড় দেয় জীবনের মনে। পাপী যখন দুঃখে পড়ে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে তখন তার আন্তরিকতায় সন্দেহ করা উচিত নয়। মানুষ বুঝুক না-ই বুঝুক— ভগবান বোঝেন, সরলহৃদয় ব্যক্তির মন দিয়ে তিনি বোঝেন।

জীবন বুঝল। মনের মধ্যে এক রাশ অন্ধকার নিয়ে সে চলতে লাগলো।

হঠাৎ কোথা হ'তে এক ঝলক আলো এসে পড়লো, জীবন তাকিয়ে দেখে মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। তুলসী সেই চাঁদ। অল্প বয়সের দুঃখ বানের চলতি জল, যেমন আসে তেমনি যায়, যেমন মাটি ধুয়ে নিয়ে যায় তেমনি নূতন মাটির পলি ফেলে রেখে যায়, হরণে পূরণে মোটের উপরে লাভ। হ'লও তাই। শাহ্‌জাদার দুঃখের পটে তুলসীর জ্যোৎস্না ফুটলো উজ্জ্বলতর। মেঘ যত কালো বিদ্যুৎ তত উজ্জ্বল। তুলসী এখন কি ভাবছে? তাকে দেখে নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবে, "এরই মধ্যে এলেন?" যার মুখে 'তুমি' শব্দটাই শোভনতম, তার মুখে 'আপনি' বড় বিচিত্র মধুর ঠেকে; বুঝতে বাধে না যে 'তুমি'ই এসেছে 'আপনি'র মুখোশ পরে। ঐ ন্যূনতম ব্যবধানটি কত মাধুর্যে, কত রহস্যে পূর্ণ। এ যেন বাসর শয্যার বরবধূর সংকোচের ব্যবধান। "কেন, তুমি কি ভেবেছিলে আসবো না। বেশ, তাই যদি ইচ্ছা হয়, তবে এর পরে আর না এলেই চলবে।" কিন্তু কতক্ষণ এমন কৃত্রিম অভিনয় চলে, যখন দু'জনেরই মনে চাপা ভালোবাসা, দু'জনেরই মুখে চাপা হাসি! "আপনি মানুষটি বড় ভালো নন।" "কেন বলো তো?" "আপনার চেখে দুটো বড় বেয়াড়া।" "হতেই হবে, চকোর যে চাঁদ দেখতে পেয়েছে।" এমনভাবে মনে মনে উতোর চাপান চলতে থাকে। প্রিয়জনের সঙ্গে মনে মনে ঝগড়া করা ভালোবাসার একটি প্রধান সুখ।

হঠাৎ সম্বিত হয়, এসে পড়েছে রুমালীর বাসার সম্মুখে। কিন্তু এ কি, প্রকাণ্ড পাগড়ী-পরা এই লোকটা কেন? সে-ও কি এখানে যাবে নাকি? বাদশার চর নয় তো? সুখানন্দ ভাবে, এ ছোকরা কে? তুলসীর উপরে চোখ নেই তো? দু'জনেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় পরস্পরের দিকে।

জীবন বলে, আমি রুমালীর দাদা।

সুখানন্দ বলে, আমি তুলসীর পিতাজী।

জীবন নত হয়ে সুখানন্দর পায়ের ধুলো নেয়।

॥ ১২ ॥

"Have you not led this life for long?"

—Faust.

'বাবা' বলে এসে তুলসী জড়িয়ে ধরলো সুখানন্দকে। হাতের ভাঁড়টা নামিয়ে মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সে বলতে লাগলো, তুলসী মা, তুলসী মা।

তুলসী অভিমানের সুরে শুধোয়, আর কতদিন এখানে ফেলে রাখবে বাবা ?

আর বেশিদিন এখানে থাকেতে হবে মনে হয় না। কোম্পানীর ফৌজ এসে পড়েছে, লড়াইটা চুকে গেলেই নিয়ে যাবো তোকে।

তারপরে মন্তব্য করে, তুই না থাকায় বাড়ি আমার অন্ধকার।

স্নেহবাক্যে তুলসী আরো বেশি ক'রে জড়িয়ে ধরে বাপকে, কিন্তু মুখে বলে, অন্ধকার না ছাই, আমি না থাকায় আরামে আছো।

পাগলি, পাগলি, বলে শিরচুম্বন করে পিতা।

জীবন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিতাপুত্রীর স্নেহাভিমানের ভূমিকা দেখে। সে জানতো যে সিপাহীদের অত্যাচারের আশঙ্কাতেই এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তুলসীকে। লালকেল্লার ও ইমানী বেগমের কুঠীর বৃত্তান্ত সে জানতো না। কেউ বলে নি তাকে, বলবার উপলক্ষ্য ঘটে নি বলেই বলে নি।

এতক্ষণ পরে তুলসী কথা বলে জীবনের সঙ্গে, বলে, আপনিও এসেছেন দেখছি।

সেই আগ্রহশূন্য নিরাসক্ত বাক্যে জীবনের মন দমে গেল। এতক্ষণ যে আশা উল্লাস আকাঙ্ক্ষা তাকে প্রেমের সপ্তম স্বর্গে তুলেছিল, এক ঝটকায় সেখান থেকে নেমে পড়লো নৈরাশ্যের ভূতলে। ভাবলো, না আসলেই হ'ত; ভাবলো, শাহ্‌জাদার কাজটা চুকিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেই হ'ত। ভাবলো, ছাউনির আর সকলে দিনরাত্রি লড়াই ক'রে চলেছে, আর সে কিনা একটা অপরিচিত মেয়ের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে মরছে। ছিঃ ছিঃ। স্থির করলো এখনি ফিরে যাবে কিন্তু পা উঠতে চাইলো না। সে অবাক হয়ে যায় ভালোবাসার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ছিল এই নিদারুণ নৈরাশ্য। অনভিজ্ঞ জীবন তো জানো না যে, ভালোবাসার দশ দশা, মধুর রসের মধ্যেই সব রসের বাস।

সে ফিরবে ফিরবে ভাবছে, এমন সময়ে তুলসী একখানা খাটুলী এগিয়ে দিয়ে বলল, বসুন, রুমালীদি এখনি আসবে।

এই কথায় তার মন আরও মুষড়ে গেল। তুলসীর কি ধারণা যে, সে রুমালীর জন্যেই এখানে আসে? সে কি অন্ধ না অজ্ঞ, সে কি জানে না কার জন্যে জীবন এখানে ঘুরে ঘুরে আসে। না, সে অন্ধও নয় অজ্ঞও নয়, আসল কথা জীবনকে ভালোবাসে না সে। ঐ একটা কথা স্বীকার ক'রে নিলেই আর সব কথায় ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ একটা কথা স্বীকার করতে যে চায় না জীবনের মন, ঐ কথাটার বনেদের উপরে অনেক কথা সাজিয়ে তুলে মস্ত ইমারত খাড়া ক'রে তুলেছে সে। প্রকাণ্ড ইমারতের ভারে বনেদ শক্ত হয়ে বসে গিয়েছে

মাটির মধ্যে। এখন তার সাধ্য কি যে নাড়া দেয় তাকে। কিন্তু তখনি আবার মনে পড়ে তুলসীর আগ্রহহীন আচরণ, চোখে পড়ে তার নির্বিকার মুখ। না, না, এ কখনোই প্রণয়িনীর যোগ্য নয়। কী ভুলই না সে করেছে। তার ইচ্ছে হ'ল পালিয়ে যায়, নয় মিলিয়ে যায়। এ কী কাঙালপনায় পেয়েছে তাকে।

বাবা, তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও, খেতে দিচ্ছি। সুখানন্দ হাতমুখ ধুতে গৃহান্তরে যায়।

আপনি অমন মুখে মেঘ ঘনিয়ে ব'সে রইলেন কেন?

জীবন তাকিয়ে দেখতে পায়, যে-মুখ মুহূর্তকাল আগেও সম্পূর্ণ নির্বিকার ও নিরাসক্ত ছিল, সেই মুখে বর্ষার মেঘ কেটে গিয়ে শরতের রোদ ঝলমল করছে। সে ভাবে—এ আবার কী? ভাবে, ঐ মেঘ আর এই রোদের মধ্যে কোনটা সত্য? বেশি ভাববার সময় পায় না, সমস্ত সংশয় এককালে ঘুচিয়ে দিয়ে তুলসী বলে, সকাল বেলাতেই আপনি আসবেন আশা করেছিলাম, কিন্তু তখন না এসে ভালোই করেছেন।

কেন?

কুমারীদি থাকলে আপনার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পাওয়া যায় না, আর কেন?

জীবনের গাম্ভীর্য তখনো সম্পূর্ণ দূর হয় নি, সে বলল, আমার সঙ্গে যে তোমার কথা বলতে ইচ্ছা হয়, তা এই প্রথম জানলাম।

জানা-না-জানা বুদ্ধির উপর নির্ভর করে।

তার মানে? তুমি বলতে চাও আমি নির্বোধ?

আমাকে কেন, নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন না।

সাধারণ মানের বুদ্ধি আমার আছে বলেই তো জানি।

তা যদি জানেন, তবে বাবার সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম ওরকম গম্ভীর হয়ে ব'সে ছিলেন কেন?

হাতের মাথায় জুৎসই উত্তর না পেয়ে জীবন বলে ওঠে, তাতে তোমার দরকার কি?

কিছু দরকার নেই, তবে জেনে রাখুন, কাউকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা যায়, কাউকে যায় না।

বুঝলাম না তোমার ধাঁধা।

এর পরে আর নিজেকে বুদ্ধিমান ফলাবেন না।

তুলসী, তোমার কোন্ কথাটা যে সত্য ভেবে পাই নে।

আশা ছাড়বেন না, ভাবুন, একদিন না একদিন বুঝতে পারবেন।

তারপর বলে, যাকগে—এখন হাত-পা ধুয়ে নিন, খেতে হবে।

আমি খাবো না।

তুলসী হেসে ওঠে, বলে, বাপ রে, পৌরুষ জেগে উঠল, খাবো না। কেন খাবেন না শুনি ?

জীবনের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে বলে ওঠে, আলবৎ খাবেন।

জোর নাকি ?

হাঁ, জোর।

কে দিল এ অধিকার তোমাকে ?

অধিকার কেউ দেয় না, আদায় ক'রে নিতে হয়। নিন, এখন উঠুন।

সুখানন্দ ও জীবন পাশাপাশি খেতে বসে। কিন্তু খেতে বসে সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পায় না জীবন। সে ত্যাথে যে পিতাকে কতবার কত রকমে অনুরোধ করে তুলসী, জীবনকে কিছুই বলে না, তবু মিষ্টান্নের বৃষ্টিটা তার পাতেই কিছু বেশি হয়। সে ভাবে, তুলসী নিশ্চয় গাঁওয়ার আদমি ভেবে তাকে বেশি ক'রে দিচ্ছে, ভাবছে এ সব শহুরে মিঠাই তো গাঁয়ে পাওয়া যায় না, খেয়ে নিক পেট ভরে। খাওয়াবার নামে এ কেমন অপমান।

হঠাৎ সে হাত গুটিয়ে বলে, আমার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে।

আমার মিঠাই তো শেষ হয় নি—পাঁচ-সাতটা মিঠাই পড়ে জীবনের পাতে।

সুখানন্দ হাসে, বলে, খেয়ে নাও, জীবনলালজী, কামানের গোলার চেয়ে ক্ষীরের গোলা অনেক ভালো।

ও কথা ব'লো না বাবা, জীবনলালজী জঙ্গী আদমি, ক্ষীরের গোলায় ওঁদের পেট ভরে না।

সুখানন্দ হো হো শব্দে হেসে ওঠে।

জীবনলালজী, আমার বেটির ঐ রকম সব কথা। ওর কথার দাপটে ওর দাদা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

দাদাকে পেলে জীবনলালজীর সঙ্গে জুটিয়ে দিতাম, দু'জনেই সমান গোঁয়ার।

প্রসঙ্গ পাল্টাবার আশায় জীবন বলে, একদিন নিয়ে আসুন না তাকে।

তার দেখা পাওয়াই কঠিন।

কেন ?

কেন কি, সে বেটা সিপাহীপক্ষের লোক, কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, বেঘোরে না মরে।

নিষেধ করেন না কেন ?

বাস রে, আমার মতো সামান্য লোকের কথায় সে কর্ণপাত করবে কেন ? গালিব সাহেবকেই গ্রাহ্য করে না।

জীবন শুধোয়, গালিব সাহেব কে ? মীর্জা গালিব, শায়ের ? তাঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় আছে নাকি ?

এবারে তুলসী উত্তর দেয়, বিশেষ পরিচয়, নিত্য আসা-যাওয়া আমাদের বাড়িতে।

তারপরে পিতৃগৌরব বৃদ্ধির আশায় সে বলে, আর শুধু গালিব সাহেব কেন, হাকিম আসানুল্লা, বাদশার দোস্ত্, এখন বুঝি আবার উজীর হয়েছেন, তাঁর সঙ্গেও বাবার খুব দোস্তি।

বলো কি ?

আর খোদ বাদশার কাছে বাবার নিত্য যাতায়াত, গদর বেধে উঠে এখন অবশ্য বন্ধ আছে।

সত্যই বিস্মিত হয় জীবন, বোঝে যে তুলসীরা সম্ভ্রান্ত ঘর। সেদিন যে সৈরিন্ধ্রীর অজ্ঞাতবাসের উপমা দিয়েছিল সেটা তবে নিতান্ত মিথ্যা নয়।

কি পণ্ডিতজী, কখন এলেন—ব'লে প্রবেশ করে রুমালী, দুধের শূন্য কলসীটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে, দাদাও এসেছ দেখছি।

সুখানন্দ শুধায়, কোথায় গিয়েছিলে, মা ?

দুধের কলসীটা দেখিয়ে রুমালী বলে, দুধ বেচে কড়ি আনলাম।

তোমায় দুধ বেচতে হবে কেন, মা ! আমার কাছে থেকে নিতে কি অপমান বোধ করো ?

জিব কেটে রুমালী বলে, এ কি কথা চাচাজী। দরকার হ'লেই নেবো।

আর কবে দরকার হবে ? তুমি এই দাঙ্গার সময়ে গাঁয়ে গাঁয়ে দুধ বেচে বেড়াও, কী-ই বা পাও।

আপনাদের আশীর্বাদে যা পাই তাতেই চলে যায়, আমাদের দুটো পেট, এলবিয়ন বিবি ম'রে একটা পেট কমিয়ে গিয়েছে।

না বেটি, এর পরে আমার কাছ থেকেই নিয়ো।

কতদিন আর নেবো ? আপনি তো তুলসীকে নিয়ে যাবেন।

সুখানন্দ বলে, একদিন তো নিয়ে যেতেই হবে।

তুলসী ব'লে ওঠে, আর একদিন নয়, বাবা, আজই নিয়ে চলো।

রুমালী বলে, আজ এই ভর সন্ধ্যায় যাওয়া চলবে না।

তার কথার অর্থ দাঁড়ায়, কাল সকাল বেলায় ছেড়ে দিতে তার আপত্তি নেই।

বাধা দিয়ে সুখানন্দ বলে, আর ক'টা দিন রাখো মা, দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

রুমালী বলে, আমার রাখতে বাধা কি চাচাজী, তুলসীই বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ব্যস্ত কেন না হবো দিদি, কতদিন বাড়ি-ছাড়া ভেবে দেখো না।

তুমি কি বলো জীবনলালজী, বলে জীবনকে সালিস মানে সুখানন্দ।

জীবনলাল হাঁ না কোন জবাব দেয় না, চুপ ক'রে থাকে, ভেবে পায় না তুলসী বাড়ি গেলে তার সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা হবে, না অসুবিধা হবে। কিন্তু আসল কারণ পুরুষ দু'জনে বুঝতে পারে না। তুলসী বাড়ি যেতে চায়, তার ধারণা বাড়ি গেলে নিঃসপত্নভাবে জীবনকে পাবে, আবার রুমালীও এখন মনে মনে চায়, তুলসী বাড়ি যাক—তাহ'লে একাধিপত্য হবে জীবনের উপরে।

তখন উপায়ান্তর না দেখে সুখানন্দ রুমালীকে বলে, তুলসীকে আর দু'তিন দিন রাখো, নয়নকে তৈরি ক'রে নিই, সে তো জানে না মাঝখানে এত কাণ্ড ঘটে গিয়েছে।

রুমালী বলে, আপনার যখন খুশি ওকে নিয়ে যাবেন, বাধা দেওয়ার আমি কে?

কথাটা সেদিনের মতো ওখানেই মিটে যায়, কিছুক্ষণ পরে বিদায় নিয়ে চলে যায় সুখানন্দ পণ্ডিত।

রুমালী বলে, দাদা হঠাৎ তুমি আসবে ভাবতে পারি নি।

তুলসী মনে মনে ভাবে, তাহ'লে নিশ্চয় বাসায় আমাকে একা রেখে যেতে সাহস করতে না।

জীবনের কানে কথাটা অভিযোগের মতো শোনায়, কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। মীর্জা আবুবকর সংক্রান্ত খবর আগেও যখন বলে নি এখনো না বলাই কর্তব্য। কারণ বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়, কিছু সাময়িক রহস্যও প্রকাশ করতে হয়। তার পরিচয় রুমালীর ভাই, তার মুখে এসব কথা সন্দেহজনক লাগবে তুলসীর কানে। আর তুলসী সংক্রান্ত কথা তো বলাই চলবে না। তাই অগত্যা মৃদু মিথ্যার শরণাপন্ন হয়। মিথ্যা কথা বলতে বুদ্ধির দরকার হয়, যেমন সত্য কথা বলতে দরকার হয় সাহসের।

জীবন বলে, ঘণ্টেওয়ালার দোকানে কিছু দেনা ছিল, শোধ ক'রে দিয়ে গেলাম।

সেটা কি আমার কাছ থেকে নিয়ে শোধ করতে পারতে না, ভাই ?

জীবন উত্তর দেওয়ার আগেই তুলসী বলে ওঠে, ঝাঁসি থেকে দিল্লি শহর তো অনেক দূর, পলকে আপনি যাতায়াত করছেন কি ভাবে ?

জীবনের হয়ে রুমালী উত্তর দেয়, আমার ভাইয়ের বাড়ী ঝাঁসি সত্যি, কিন্তু এখন কিছুদিন হ'ল আছে পাটপারগঞ্জে, সেখানেই সাদি করেছে কিনা।

কথাটা অতর্কিতে বের হয়ে গেল রুমালীর মুখ দিয়ে কিন্তু পরমুহূর্তেই তুলসীর ও জীবনের মুখে তার প্রতিক্রিয়া দেখে গভীর করুণায় ভরে গেল তার হৃদয়, ভাবলো এতটা ভালো হয় নি। তখনি শুধরে নেওয়ার ইচ্ছায় বলে উঠল, কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত হয় নি ভাই।

তারপর তুলসীর দিকে তাকিয়ে বলে, বিয়ের পরে বছর দুই যেতে না যেতেই বউটি মারা গেল !

তুলসীর মুখের কালো কেটে যায়।

না, অতটা ভালো নয় ভাবে রুমালী। বলে, ছোট্ট একটি ফুটফুটে মেয়ে রেখে গিয়েছে।

তারপরে জীবনের দিকে তাকিয়ে বলে, যাই বলো দাদা, মেয়ে যতই সুন্দরী হোক, মায়ের মতো হয় নি।

কথা বলবার সময়ে আড়চোখে তাকায় তুলসীর দিকে, নাঃ, আরও একটু ঘা দেওয়া আবশ্যক।

বুঝলে না ভাই তুলসী, দাদা ঠিক করেছে, এবারে দিল্লিবালী মেয়ে বিয়ে করবে। তাই দিল্লিতে এত ঘন-ঘন যাতায়াত, এবারে বুঝলে তো ?

না, তুলসী বুঝলো মনে হয় না, কেননা সে তখনি স্থানত্যাগ ক'রে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। রুমালী উঁকি মেরে দেখলো, তুলসী গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে। বহুত খুব।

জীবন বলে, থামোকা তুলসীর মনে কষ্ট দিলে কেন।

আমার ভাই বিয়ে করবে সংবাদে কেউ যদি কষ্ট পায়, সে কি আমার দোষ !

থতমত খেয়ে জীবন বলে ওঠে, না, না, বিয়ের সংবাদে কষ্ট পাবে কেন। তবে কিনা ঐ যে বউ মরবার কথা বলেছিলে কিনা !

সে সংবাদে তো মুখে আলো জ্বলেই উঠেছিল, পুরুষের চোখে কিছুই দেখতে পায় না, কেবল রঙ দেখেই ভোলে।

পুরুষ বর্ণান্ধ।

তারপরে আর কথা জমল না, তিনজনে নিজ নিজ কক্ষপথে চলতে শুরু

করলো। তবে তিনজনের ভাবনা এক নয়।

জীবন ভাবে প্রথম সুযোগেই তুলসীকে বুঝিয়ে বলতে হবে, সমস্তটাই একটা জঘন্য ঠাট্টা, তবে সে ভেবে পায় না কখন কিভাবে আসবে সেই সুযোগ। রুমালীর পাহারা বড় কড়া।

তুলসী ভাবে, পুরুষমাত্রেই প্রবঞ্চক। গাছেরটা ঠিক ক'রে রেখে তলারটা কুড়োতে বের হয়।

রুমালী ভাবে, জীবন আর তুলসীর দ্বিধাকে আর জুড়োতে দেওয়া নয়। এই সুযোগে আজকার রাতে নিজের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলবে সে।

তুলসী পাশে এসে বসেছে, বিষাদঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। প্রথমটা দেখতে পায় নি জীবন, তারপরে তাকে দেখতে পেয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়, ধরা দেয় না তুলসী। জীবন বলে, কাছে এসো না। কথা না বলে ঠায় বসে থাকে তুলসী।

কি ভাবছ তুলসী ?

উত্তর দেয় না। তখন জীবনের দৃষ্টি পড়ে তার চোখের দিকে, চমকে ওঠে, এ কি অতলস্পর্শ বিষাদ।

কি হয়েছে ?

কি আবার হবে ?

মনে হচ্ছে যেন দুঃখ পেয়েছ ?

দুঃখ পেতে যাবো কেন ? বিয়ে করবে, মেয়ে খুঁজছ—ভাবছি, তোমার যোগ্য মেয়ে কি আছে দিল্লি শহরে।

কোথাও যদি থাকে, তবে দিল্লি শহরেই আছে।

কৃত্রিম আনন্দে তুলসী বলে, শুনে সুখী হলাম, তার নামটা কি শুনতে পাই না।

অবশ্যই শুনতে পাবে। কিন্তু কি লাভ ?

দেখতাম তোমার যোগ্য কি না।

শুনলে দেখতে পেতে আমিই তার যোগ্য নই।

এমন রূপসী ?

কেন, হ'তে কি নেই ? দিল্লি বাদশার রাজধানী, সেখানে রূপের অভাব হ'তে যাবে কেন ?

আমার তো চোখে পড়ে না।

পড়বার কথাও নয়।

কেন ?

কেন আর কি !

তবু নামটা শুনি।

নিতান্তই শুনবে ?

নিশ্চয়।

তুলসী, তুলসীবাঈ।

চমকে উঠে তুলসী শুধায়, কে সে ?

এই জন্যেই তো বলতে চাই নি। সুখানন্দ পণ্ডিতের মেয়ে।

ঠাট্টা ক'রো না জীবন।

তুলসীর মুখে নাম ও তুমি সম্বোধন বড় মধুর লাগে জীবনের।

না তুলসী, ঠাট্টা নয়। আমি সত্যিই তোমাকে ভালোবাসি।

তবে যে রুমালীদি বলছিল, তুমি মেয়ে খুঁজতে এসেছ।

ঠাট্টা। আগে একবার বিয়ে করেছিলাম, বউ মরেছে—সমস্তই ঠাট্টা।

তাই বলো।

মেঘ কেটে যায়, তুলসীর মুখের শ্বেত-চন্দনের মতো রঙটি প্রেমের আভায় ঝলমল করতে থাকে।

জীবন বলে, হ'ল তো, এবারে কাছে এসো। এই বলে হাত বাড়িয়ে ধরে তুলসীর কোমল ঈষদুষ্ণ হাতখানি।···

একটা সুখদায়ক নিবিড় স্পর্শে জীবনের ঘুম ভেঙে যায়। তবে তো সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু তখনি ভাবে, স্বপ্ন যদি তবে এ কার উষ্ণ সুরভিত নিবিড় কোমল স্পর্শ ঘরের ঘনান্ধকারকে ঘনতর ক'রে তুলেছে! তার বুকের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা অরাজকতা ঘনিয়ে ওঠে। হাত দিয়ে অনুভব করে একটা নগ্ন নারীদেহ আলিঙ্গনে জড়িয়ে তার পাশে শায়িত। একই সঙ্গে উৎকট উল্লাস ও প্রবল প্রতিবাদ জাগ্রত হয় তার দেহে মনে। কিছুক্ষণ পরে, ঠিক কতক্ষণ ঠাহর করতে পারে না, তিমিরাভিসারিকা ঘর ছেড়ে চলে যায়। আর ঘুম আসে না জীবনের। সে ভাবে অবশেষে তুলসীর এই কাজ! ঘরণী শেষে কিনা স্বৈরিণী হয়ে দেখা দিল। সমস্ত দেহ-মন ঘৃণায় ধিক্কারে জুগুপ্সায় ভ'রে ওঠে। সে স্থির করে ভোরবেলাতেই চলে যাবে—আর আসবে না এ বাড়িতে, আর খোঁজ নেবে না তুলসীর। সেই তুষারময়ীর বিসর্জন হয়ে গিয়েছে অতলস্পর্শ কামনার কালীয়দহে।

জীবন ভাবে এর চেয়ে অনেক ভালো রুমালী, যে আপন মুখে বিলাসের বিবরণ বিবৃত করে, স্বীকার করে সুখের জন্যই যায় শাহ্‌জাদাদের মহলে; পরপুরুষের কাছে দিনের আলোয় উরু অনাবৃত করতে যে লজ্জা পায় না। তার ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড স্রোতে পাপ জমে উঠে কলুষিত করতে পারে না আবহাওয়াকে। অনেক ভালো সেই মেয়ে। তুলসীর মন পাপের বীজাণুতে পঙ্কিল দীঘির জল, চার তীরের বাধায় চিরস্থায়ী ক'রে রেখেছে পাপকে। না, না, এমন দীঘির চেয়ে অনেক ভালো স্রোতস্বিনী। তবে তার স্রোতস্বিনীতেও দরকার নেই, দীঘিতেও না। লড়াই করতে এসেছে লড়াই করবে। কি বিপাকেই না পড়েছিল! মুক্তি পেয়ে এবারে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

ভোরবেলা বিদায়ের সময়ে জীবন কথাই বলল না তুলসীর সঙ্গে, যা কিছু কথাবার্তা সব হ'ল রুমালীর সঙ্গে।

আবার কবে আসছ দাদা?

এখন আর শীগ্‌গীর আসছি না।

বলো কি, আমাদের খোঁজ-খবর নেবে কে?

কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গে সে বলে উঠল, তোমরা তো নাবালক নও, তা ছাড়া পণ্টন আছে, পণ্ডিতজী আছেন।

কথাটা শেষ করতে দেয় না রুমালী, বলে, ঘউস মহম্মদ আছে, শাহ্‌জাদারা আছে—আমাদের দেখবার লোকের অভাব কি?

কী আর এমন বেশি করবে ঘউস মহম্মদ আর শাহ্‌জাদারা।

জীবন ভাবে কথাটার ইঙ্গিত নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে তুলসী। খুব একটা আঘাত দিল ভেবে মনে মনে খুশী হয় জীবন।

তবে এসো, কাউকে আটকে রাখি এমন তো শক্তি নেই।

রুমালীর মুখের দিকে তাকিয়ে জীবন ভাবে, কি সুন্দর! সৌন্দর্যে, পবিত্রতায়, তৃপ্তিতে সে মুখ শরতের সন্ধ্যার মতো ঝলমল করছে। ভাবে, হায়, একেই কিনা লোকে স্বৈরিণী, বিলাসশয্যাচারিণী বলে। সে স্থির করেছিল যে, তুলসীর দিকে তাকাবে না, তবু শেষ মুহূর্তে এক পলকের জন্য না তাকিয়ে পারলো না। দুঃখে দুশ্চিন্তায় রাত্রি জাগরণে মলিন সেই মুখচ্ছবি তার অপরাধের অব্যর্থ দলিলরূপে প্রকট হ'ল জীবনের চোখে। ধিক, ধিক, ধিক! এই পাপকুণ্ড থেকে নিজেকে সবলে ছিনিয়ে নিয়ে সে রওনা হয়ে পড়লো। মৌখিক শিষ্টাচার অবধি করলো না। মনের মধ্যে সে আবৃত্তি করতে থাকে অনেক হয়েছে, আর নয়, আর নয়, এ জীবন আর নয়!

॥ ১৩ ॥

"Would I never had been born."

—Faust.

তিক্ত, তিক্ত, জগৎ সংসার জীবনের কাছে আজ তিক্ত। পিত্তরোগীর মুখে সুখাদ্যও তিক্ত। গুরবচন ও স্বরূপের প্রিয় সঙ্গও আজ তিক্তস্বাদ জীবনের কাছে। সকলকে এড়িয়ে চলে সে, ভাবে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে বসে থাকলেই রাজ্যের দুশ্চিন্তা ও গ্লানি এসে চেপে ধরবে। তার চেয়ে রেসালা নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। কিন্তু ঠিক এই সময়টাতেই লড়াইয়ের কেমন বিরতি। মৃত্যু হতভাগ্যকে এড়িয়ে চলে।

তার গম্ভীর ভাব, বিষণ্ণ মুখ দেখে স্বরূপ আর গুরবচন জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিল, কি হ'ল ভাই, তবিয়ৎ ভালো তো? স্বরূপ জানতো, জীবন নিজেই জানিয়েছিল, তার হৃদয়ঘটিত ব্যাপার, সে শুধায়, কি ভাই রাগারাগি ক'রে এসেছ বুঝি! তারপরে হেসে বলে, এমন হয়ে থাকে, কিছু ভেবো না, যাও, আর একবার দেখা ক'রে এসো।

এমন সহৃদয় প্রশ্নের সম্মুখে একেবারে নিরুত্তর থাকা সম্ভব নয়, তাই দায়-সারা একটা উত্তর দিতে হয়, তাই যাবো ভাবছি।

যাও, যাও, আর দেরি ক'রো না। আর ছাখো, যাওয়ার সময় কিছু ফুল হাতে ক'রে নিয়ে যেও।

জীবন অন্যমনস্কভাবে শুনছিল তাই কথাটার অর্থ বুঝতে পারে না। শুধায়, কেন বল তো?

কেন বুঝলে না, মান ভাঙাতে এমন জিনিস আর দুটি নেই।

গম্ভীরভাবে জীবন বলে, তা বটে।

তা বটে কি? পড়ো নি দ্রৌপদীকে খুশী করবার উদ্দেশ্যে পাণ্ডবরা নীলপদ্ম আনতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিল! জীবন ভাই, টিলার ঐদিকে মেলা রক্তকরবী ফুল ফুটে আছে, নিয়ে যেয়ো।

অবশেষে গুরবচনও অনুমান করে যে, জীবনের দুঃখের কারণ প্রেমঘটিত ব্যাপার। তবে তার ব্যবস্থা স্বরূপের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে বলে, একটা আওরতের কথায় মুখ ভার ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তুমি কেমন মরদ? যাও, চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে এসো। একা না পারো, চলো আমরাও যাচ্ছি।

তারপরে মন্তব্য করে, মেয়েরা একটা হামলা চায়, ফুল দিয়ে পূজো করতে গেলেই ওরা পেয়ে বসে।

এত দুঃখের মধ্যে দুজনের ব্যবস্থাপত্রের বৈচিত্র্যে ভারি মজা অনুভব করে জীবন। বলে, স্বরূপ ভাই তো বলছিল রক্তকরবীর ফুল নিয়ে যেতে।

ওদিক দিয়ে যেও না ভাই, তার চেয়ে রক্তকরবী গাছের ছড়ি কেটে নিয়ে যাও, তাতে অনেক তাড়াতাড়ি অনেক বেশি ফল পাবে।

পরীক্ষা ক'রে দেখেছ নাকি?

নিশ্চয়, নইলে এমন জোর দিয়ে বলছি কোন্ ভরসায়?···আমাদের গাঁয়ের কাছে রাভি নদী। আমি রোজ সকালে মাছ ধরতে যেতাম আর রোজ সকালে জল আনতে যেতো চন্দ্রিমা। দু'চারদিন পরে দেখা হ'তেই দুজনের কাজ ঘুচে গেল, আমার মাছ ধরা—ওর জল ভরা। আরে ইয়ার চন্দ্রিমার কেমন চলন, কেমন বলন, কেমন নয়ন। এমন আর হয় নি আর হবেও না।

তারপরে? শুধোয় স্বরূপ।

চন্দ্রিমা আমাকে দেখলেই হাসে, গান করে কিন্তু এমনভাবে, যেন আমাকে কোনকালেই দেখে নি। কথা বলতে গেলে এমন গম্ভীর হয়ে যায় যে, দেখলে ভয় করে। তা দেখে আমি যদি গম্ভীর হয়ে পড়ি তখনি হাসতে শুরু ক'রে দেয়। আবার আমি যদি হাসতে শুরু করি, তখনি সে কি গাম্ভীর্য তার! এদিকে ভাই আমার আঁখির নিদ আর পেটের ভুখ গেল।

তখন কি করলে?

একদিন তার কলসী টেনে ফেলে দিয়ে চুলের ঝুঁটি ধরে নিয়ে আসলাম তাকে ঘরে।

তার পরে?

তার পরে আর নেই। এখন সে আমার জরু।

বাহবা, বাহবা, তুমি খুব বাহাদুর।—বলে স্বরূপ।

তারপর শুধোয়, ভাই গুরবচন, এখন তার চলন বলন নয়ন কেমন লাগছে?

যা বলেছ ভায়া, আগের মতো সুন্দর নয়। তবে ভাই সব পুষিয়ে দেয়, চন্দ্রিমা রসুই করে ভালো। মাংসের যে কাবাব রাঁধে, কি আর বলব!

গুরবচনের মুখের ভাব দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় চন্দ্রিমার রাঁধা অদৃশ্য কাবাবের স্বাদ সে অনুভব করছে।

হঠাৎ সুর নেমে পড়ে প্রেম থেকে কাবাবে। সমস্ত অধিকতর তিক্ত মনে

হয় জীবনের কাছে। তার কেমন যেন সন্দেহ হয় প্রেম ও কাবাবের মধ্যে নিগূঢ় আর অনিবার্য যোগ আছে। তবে দুটোই কি মাংসের বিকার? তার সন্দেহকে সমর্থন করে গতরাত্রির অভিজ্ঞতা। তুলসীর ঐ কাজ আর চন্দ্রিমার কাবাবের মধ্যে প্রভেদ কতটুকু? কলহের মতো প্রেমেও দু'পক্ষের আবশ্যক হয়। একেবারে নিজেকে নির্দোষ মনে করতে পারে না জীবন। ইচ্ছা করলে তুলসীকে বিদায় করে দিতে পারতো, ইচ্ছা করলে নিজেও বিদায় নিয়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যেতে পারতো। দুটোর কোনটাই করে নি। বরঞ্চ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহযোগিতা করেছিল। তাতেই আরো বেশি গ্লানি অনুভব করতে থাকে। সে শুনেছিল মেয়েরাই এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়, ঘটনায় দেখলো ঠিক উলটো। অবশ্য একথাও শুনেছিল স্বৈরিণী নারীদের চরিত্র ঠিক সাধারণ নিয়মের মধ্যে পড়ে না। তবে কি তুলসী স্বৈরিণী? তবে কি তুলসীর সঙ্গে রুমালীর ভেদ নেই? চমকে ওঠে সে, কী আগুনেই না হাত দিতে উদ্যত হয়েছিল সে! ছুটে চলে যায় মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে নির্জনে।

অনেকক্ষণ হাতের মধ্যে মাথা রেখে বসেছিল, যখন মাথা তুলল, দেখলো পায়ের কাছে বসে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ক্যালিবান। স্বরূপের মতো তার চোখে প্রশ্ন নেই, জিজ্ঞাসা নেই—আছে বেদনা আর সমবেদনা। ও জানতে চায় না, ও যেন আগে থেকেই সব জানে। সকলের সব সমস্যার সমবেদনার প্রত্যুত্তর আছে ওর বেদনার মধ্যে। আজ ওর সঙ্গই জীবনের একমাত্র সঙ্গ।

ক্যালিবানের মাথার ঝাঁকড়া চুল আর ঘাড়ের রোঁয়ার মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে জীবন, ক্যালিবানের ভাব দেখে মনে হয় সে ভারি আরাম পাচ্ছে। মুঠি ক'রে চুল টেনে তার মুখখানা তোলে উপরের দিকে—চার চোখ মিলিত হয়। তার চোখের মধ্যে দিয়ে তার মনের মধ্যে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে জীবন, গভীর কূপের মধ্যে তাকিয়ে এ যেন রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা। কী আছে সেখানে। জল তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—কী আছে ঐ জলের নিচে!

কি রে, কি ভাবছিস? বল না, বলতে পারিস না কেন। এই তো আমি বলছি—এমনি ক'রে বল। অন্তত চেষ্টা কর না। পারবি নে? কেন পারবি নে? খুব পারবি।

এইভাবে একতরফা কথা বলে যায় জীবন। দো-তরফা হওয়ার আদৌ আশা নেই—তবু আশা ছাড়ে না সে।

মানুষ হয়েই তো মানুষের ঘরে জন্মেছিলি। সত্যিই কি সব ভুলে গিয়েছিস?

চেষ্টা ক'রে ছাখ না, কিছু কিছু মনে পড়ে কি না, কি বোকা ছেলে গো।

ক্যালিবান বড় বড় দুই গভীর চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তার ভাবটা যেন—বুঝি সব, কিন্তু বলতে পারিনে, কি করবো বলো। ভগবান যে মেরেছেন।

আচ্ছা, তবে আমার কথা শোন—এই বলে সে আরম্ভ করে।

ওর কাছে দুঃখের কথা বলতে লজ্জা নেই জীবনের, যেমন লজ্জা নেই শিশুর কাছে, যেমন লজ্জা নেই ভগবানের কাছে। একজন অবোধ, একজন পূর্ণ-বুদ্ধি, ও আছে মাঝামাঝি, অবোধ নয় অবোলা।

আচ্ছা, তুলসী এমন কেন করলো বলতে পারিস? তুলসী তো জানে আমি তাকে ভালবাসি, যা তার নিজস্ব তা লুট ক'রে নিতে এগিয়ে এলো কেন? আচ্ছা, বলতে পারিস, সে-ও আমার মতো দুঃখ পাচ্ছে কিনা? নিশ্চয় পাচ্ছে, বল্ বল্।

এই বলে তার চুলে ঝাঁকুনি দিয়ে সম্মতিসূচক ভাবে মাথাটা নড়িয়ে দেয়।

লুট ক'রে নিলেই কি আপন হয়? লুট করা ধন যে চোরাই মাল।

কিন্তু এমনভাবে একতরফা কথা তো বেশিক্ষণ চলতে পারে না, মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে, তখন মনের মধ্যে ডুব দেয় জীবন। সারাটা দিন আজ গ্লানির ভারে সে পীড়িত হয়েছে। কিন্তু এখন যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে, আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে পাখীর ঝাঁক যমুনার দিক থেকে দলে দলে উড়ে চলেছে, এই পাহাড়, ঐ সবজিমণ্ডির বাজার, ঐ রোশেনারা বাগের গাছপালা, ঘনান্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে রেখামাত্র সার হয়ে শেষ অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছে, আর একে একে ধীরপদে বের হয়ে আসছে গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা, গুপ্ত স্মৃতির দল, নিয়মের দৃঢ়দৃষ্টি আল্‌গা ক'রে দিয়ে দেখা দিচ্ছে স্ফুটমান তারকারাজির ন্যায় গোপন অভিলাষ আর অভিলষিত বস্তু, তখন জীবন যেন অনুভব করলো, সে অনুভূতি একটা উপচ্ছায়া মাত্র, কোথায় মনের কোন্ গহন গভীরে মুখ তুলে দেখা দিয়েছে সঙ্কোচে সশঙ্কে ছোট্ট একটুখানি অস্ফুট আনন্দের কুঁড়ি। তার রঙটি অরুণোদয়ের আগের আকাশের মতো কচি কোমল স্বচ্ছ লাল, তার আকৃতিটি সদ্যোজাত অপ্সরী-কন্যার ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র তপ্ত তুলতুলে মুষ্টিবদ্ধ পাণির মতো একান্ত অসহায়, বাতাসের নিঃশ্বাসে সে কাঁপে, জলের প্রশ্বাসে সে কাঁদে, মৌমাছির পাখার বাতাসে সে কাঁপে। সে অসহায়, কোমল, ভীরু—তবু তো সে মিথ্যা নয়।

জীবন চমকে ওঠে। এই আনন্দের কুঁড়ি এলো কোথা থেকে? সারা

দিনের গ্লানির তলে কোথায় লুকিয়ে ছিল এই আনন্দ ? আকাশ ভরা আলোর তলে কোথায় লুকিয়ে থাকে নক্ষত্র ! আনন্দের স্বীকৃতি ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্ত ক'রে তোলে জীবনকে। যতক্ষণ গ্লানি অনুভব করছিল সব দোষ চাপাতে পেরেছিল তুলসীর উপরে, কিন্তু আনন্দের স্বীকৃতিতে যে নিজের উপরেও দায় আসে। সেই দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলবার ইচ্ছাতেই সে যেন এক লাফে উঠে দাঁড়ায়।

চল্ বাড়ি ফিরে যাই, বলে আহ্বান করে ক্যালিবানকে।

দিনের আলোয় বেশ ছিলাম, রাতের অন্ধকারে সব কেমন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। চল্।

দুইজনে রওনা হয় হিন্দুরাও কুঠির দিকে। সে ভাবতে ভাবতে চলে এই নিরন্তর আত্মগ্লানির চেয়ে মৃত্যু ভালো। ভাবে, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর সুযোগের অভাব হবে কেন ?

॥ ১৪ ॥

"চিন্তার নরক চেয়ে কায ভালো!"

হিন্দুরাও কুঠিতে ঢুকতেই জীবনের ডাক পড়ল কর্নেল ব্রিজম্যানের অফিসে। সে তখনি অফিসে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সারিবন্ধ মোমবাতির আলোয় দেখতে পেলো শুধু ব্রিজম্যান নয়, চীফ এঞ্জিনীয়ার এলেক্স টেলর, এসিস্ট্যাণ্ট এঞ্জিনীয়ার বেয়ার্ড স্মিথ উপস্থিত। তাহাদের পাশে আর একজন অপরিচিত জঙ্গী সাহেব যার লম্বা দাড়ি প্রায় পেট পর্যন্ত নেমেছে।

জীবন স্যালুট ক'রে দাঁড়ালো।

ব্রিজম্যান বলল, কর্নেল ক্রসম্যান, এই ব্যক্তি রেসালাদার মেজর জীবনলাল, আমার থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের তৃতীয় ব্যক্তি।

জীবন ঘরে ঢুকেই স্বরূপ ও গুরবচন সিং-কে দেখেছিল।

ক্রসম্যান বলল, খুব সাহসী আর কর্মঠ বলে মনে হচ্ছে।

ব্রিজম্যান বলল, তিনজনেই, যদিচ স্যারূপ নবাগত ও বেসামরিক ব্যক্তি সে আমার রেজিমেন্টের য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট।

I hope he is giving good account of himself, বলল ক্রসম্যান।

He is. জবাব দিল ব্রিজম্যান।

আমার একটা থিওরি আছে যে, মানুষ মাত্রেই সামরিক গুণসম্পন্ন। তাকে উল্টো শিক্ষা দিয়ে তার স্বভাব নষ্ট না করে ফেললে স্বভাবতই সে ফৌজী আদমি হবে।

থিওরি বিশ্লেষণ ক'রে প্রতিক্রিয়া দেখবার আশায় ক্রসম্যান তাকায় অন্যদের মুখে, উৎসাহজনক চিহ্ন দেখতে পায় না।

এবারে এলেক্স টেলর কথা শুরু করে, বলে, কর্নেল ক্রসম্যান, তোমার থিওরির ব্যাখ্যা না হয় পরে শুনবো, এবারে কাজের কথা হোক।

বেশ, তবে তাই হোক। সম্মতি জানায় ক্রসম্যান।

এবারে ব্রিজম্যান আনুষ্ঠানিকভাবে ওদের তিনজনকে সুপারিশ ক'রে বলে, এরা তিনজন আমার রেজিমেণ্টের সবচেয়ে বিশ্বস্ত, সাহসী আর কর্মকুশল ব্যক্তি। দুঃসাহসিক কাজে এদের উৎসাহ ও দক্ষতার অন্ত নেই। আমি এদের সুপারিশ করছি চীফ এঞ্জিনীয়ার।

এলেক্স টেলর বলে, অতিশয় দুঃসাহসিক একটি কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার ভলাণ্টিয়ার হিসাবে তোমাদের আহ্বান করছি।

তিনজনে একসঙ্গে বলে ওঠে, আমরা রাজী আছি।

এলেক্স টেলর বলে, এ কাজ তোমাদের duty-র অন্তর্গত নয়, ইচ্ছা করলে আইন লঙ্ঘন না ক'রেও তোমরা অস্বীকার করতে পারো।

ওরা আবার তিনজনে একসঙ্গে বলে, আমরা রাজী আছি।

কিন্তু রাজী হওয়ার আগে কাজটা কী, তা-ও কি শুনবে না?

জীবন বলে ওঠে, বড় জোর মৃত্যু হবে, তার বেশি তো কিছু নয়।

সে স্থির করে, বহু প্রতীক্ষিত মৃত্যু যখন অযাচিতভাবে উপস্থিত, তখন কিছুতেই তাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে না।

তোমরা ভেবো না যে নিজেরা নিরাপদে থেকে গুরুতর বিপদের মধ্যে তোমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। তা নয়। এ কাজ একাধিক দিন—rather রাত আমরা করেছি, বেয়ার্ড স্মিথ, টমসন আর আমি।

জীবন বলে, কর্নেল, ব্যাখ্যায় আমাদের প্রয়োজন নেই, কাজটা আমরা শুনতে চাই।

এই তো সামরিক মনোভাব, বলে ওঠে ক্রসম্যান। তারপরে বলে, তোমরা ফিরে এলে বাঈজীর এমন গান শোনাবো যার তুলনা নেই সারা হিন্দুস্থানে।

ব্রিজম্যান বলে, তুমি এসে পৌঁছবার পর থেকে হাজার বার শুনলাম প্রশংসা, তার চেয়ে একবার গান শুনতে পারলে যে হ'ত!

অবশ্যই শুনতে পাবে। বড় তোপ ঘন ঘন চলে না।

ওঃ, এই বুঝি তোমার পত্রে উল্লিখিত সেই মারাত্মক অস্ত্র—যার সম্মুখে বাদশাহী ফৌজ দাঁড়াতে পারবে না!—বলে ব্রিজম্যান।

বেয়ার্ড স্মিথ বলে, তার চেয়ে দিল্লির দেওয়াল ধ্বসে পড়লে যে অনেক বেশি সুবিধা হ'ত।

সেটাও অসম্ভব নয়। মনে রেখো যে—জেরিকো শহরের দেওয়াল ধ্বসে পড়েছিল গানের সুরে।

যখন সাহেবদের মধ্যে এইসব কথা হচ্ছিল, জীবন ভাবছিল, গান শোনাবার কষ্ট আর করতে হবে না তোমার। কাজটাও কঠিন, আমিও ফিরছি না।

শোনো, বলে আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যায় এলেক্স টেলর। বলে, আগে প্ল্যান বলি, তারপর তোমাদের কর্তব্য কি জানতে পারবে।

দিল্লি আক্রমণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা স্থির হয়ে গিয়েছে। প্রথম ও প্রধান বাধা শহরের দেওয়াল। দুই ভাবে শহরে প্রবেশ সম্ভব। মই দিয়ে দেওয়াল টপকে কিম্বা কামানের গোলায় দেওয়াল ধ্বসিয়ে দিয়ে। শেষের উপায়টাই অবলম্বন করা হবে স্থির হয়েছে। এতদিন আমরা আক্রমণ চালিয়েছি দেওয়ালের পশ্চিম দিকে বা উত্তর-ঘেঁষা পশ্চিম দিকে। মোরি দরবাজা ও শাহী বুরুজের উপর। কাজেই বাদশাহী ফৌজ আশা করবে যে, চূড়ান্ত আক্রমণটা আসবে ঐ জায়গাতেই। কিন্তু তা আসবে না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে শহরের উত্তর দিকে—নদী আর কাশ্মীরী দরবাজার মাঝখানের দেওয়াল ধ্বসিয়ে দিয়ে আমরা ঢুকে পড়বো।

টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ে নক্সায় অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল এলেক্স টেলর, আর সকলে নিবিষ্টমনে শুনছিল—জীবনরা তিনজন ঈষৎ নত হয়ে একাগ্রভাবে শুনছিল ও দেখছিল।

কোথাও অস্পষ্ট লাগলে শুধিয়ো।

জীবনরা কথা বলে না, আবার আরম্ভ করে এলেক্স টেলর।

উত্তরদিকে দেওয়াল ধ্বসিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভারি কামানের ব্যাটারি তৈরি করতে হবে। এই ব্যাটারি আড়াল ক'রে রেখে আমাদের গোলন্দাজ সৈন্যদের নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারে এমন কোন ইমারত বা দেওয়াল ওখানে আছে কিনা জানা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

জীবনরা তিনজন সচেতন হয়ে ওঠে, বোঝে এটাই তাদের কর্তব্য।

তাঁদের সপ্রতিভ সচেতন ভাব দেখে চীফ এঞ্জিনীয়ার বুঝতে পারে যে, কর্তব্যের ইঙ্গিত ওরা পেয়েছে। তবু জিজ্ঞাসা করে—জীবন, তোমাদের কর্তব্য বুঝতে পেরেছ কি ?

ইয়েস, স্যার।

আরও কিছু প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত তোমাদের দিই। কাশ্মীরী দরবাজা থেকে Ludlow Castle-এর দূরত্ব প্রায় পঁচিশ গজ। এখানে সিপাহীরা ঘাঁটি বসিয়েছে, সারাদিন বিশেষ ক'রে রাতের বেলায় পাহারা থাকে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, পাহারা বদলের সময়ে কিছুক্ষণ বাড়িটা অরক্ষিত থাকে। তখনি তোমাদের সুযোগ। ঐ সময়ে জায়গাটা অতিক্রম ক'রে ঢুকে পড়বে কুদশিয়াবাগে। এ জায়গায় কখনো পাহারা থাকে না। এখান থেকে উত্তর দেওয়ালের দূরত্ব পঞ্চাশ গজও হবে না। এখানে কোন বড গাছের উপরে উঠে কিম্বা কোন দেওয়াল বা ভাঙা ইমারত পেলে তার উপরে উঠে ভারি কামানের ব্যাটারির আশ্রয় পাওয়া যায় কিনা লক্ষ্য করবে। কিন্তু আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, কাজটা খুব বিপজ্জনক।

এলেক্স টেলর তাকিয়ে লক্ষ্য করে—এতটুকু ভাব বিপর্যয় ঘটে নি তাদের মুখে। মনে মনে খুশী হয়, ভাবে এরা পারবে, মুখে শুধু বলে, বেশ।

তারপরে আবার—

বেশিক্ষণ থাকবে না। থাকবার প্রয়োজনও নেই, দেখবার মতো কিছু থাকলে দু'চার মুহূর্তের বেশি লাগবার কথা নয়। আরও কিছু শুনে রাখো। সঙ্গে পিস্তল নেবে, তবে আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া চালাবে না। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ যে, পাহাড়টা আর দেওয়ালের মাঝখানে একটা নালা আছে, বৃষ্টির জল নেমে গেলেই শুকনো, এখন শুকনো। এই নালার মধ্যে দিয়ে চলে যাবে, কেউ দেখতে পাবে না। গিয়ে পৌছতে আধ ঘণ্টা সময়ও লাগবে না। এখন আকাশ অন্ধকার, চাঁদ উঠবে রাত বারোটার পরে। একটু চাঁদের আলো দরকার লক্ষ্য করবার জন্যে, কিন্তু সেই আলোয় সিপাহী সৈন্যও তোমাদের লক্ষ্য করবে মনে থাকে যেন। কাল সকালে ফিরে এসে কর্নেল ব্রিজম্যানের কাছে রিপোর্ট করবে। আচ্ছা, এখন যেতে পারো, ভগবান তোমাদের সহায় হোন।

তিনজনে বিদায় নিতে উদ্যত, এমন সময়ে এলেক্স টেলর বলে উঠল, by the bye, আশা করি তোমরা তিনজনেই অবিবাহিত।

জীবন ও স্বরূপ বলে, আজ্ঞে হাঁ।

নিরুত্তর গুরবচনের দিকে তাকিয়ে শুধায়, তুমি ?

গুরবচন ভাবে কেন মরতে সে চন্দ্রিমার কাবাবের গল্প করতে গিয়েছিল, নইলে তো এমন অভিযানের মজা থেকে বঞ্চিত হ'ত না।

গুরবচনকে নিরুত্তর দেখে চীফ এঞ্জিনীয়ার বোঝে সে বিবাহিত, বলে, না, তোমার যাওয়া চলবে না। আমি দুঃখিত কিন্তু জেনারেলের অর্ডারে আমার হাত নেই।

এবারে জীবন কথা বলে, কিন্তু দু'জন কেন? একজনেই তো পারে কাজটা।

একজন নিহত হ'লে আর একজনে নিয়ে আসতে পারবে খবরটা—এই আশাতেই দু'জন। আগেই বলেছি বিপজ্জনক অভিযান। গীবন ভেবে ত্থাখো, এখনো পিছোবার সময় আছে।

তদুত্তরে জীবন বলে, এগারোটার সময় আমরা রওনা হবো, তাহলেই চাঁদ উঠবার সময়ে Ludlow Castle-এ গিয়ে পৌছতে পারবো।

তিনজনে স্যালুট ক'রে বিদায় নেওয়ার সময়ে কর্নেল ক্রসম্যান বলে ওঠে, কাল সন্ধ্যাবেলায় তরফা নাচে তোমাদের নিমন্ত্রণ রইলো।

পাছে গুরবচন বাদ পড়ে যায়, তার দিকেও তাকিয়ে বলল, তোমারও।

জীবন ও স্বরূপ ভাবতে ভাবতে বিদায় নেয়, যদি ফিরে আসি। দু'জনেরই এক ভাবনা—ফিরে আসায় কোম্পানীর প্রয়োজন, তাদেব প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে।

নালার মধ্যে বন্ধুর পথ, পথই নয়, জল নেমে যাওয়ার রাস্তা। যে পথে সহজে জল যেতে পারে মানুষের পক্ষে তা দুর্গম হ'তে বাধা নেই। ঘোর অন্ধকার, তখনো চাঁদ উঠতে দেরি আছে, দুজনে কোনমতে চলছে, কখনো ছোট পাথরে হোঁচট খেয়ে, কখনো বড় পাথর ডিঙিয়ে। জীবন আগে আগে স্বরূপ পিছনে, পাশাপাশি দু'জনের যাওয়ার জায়গা নেই। তবে সুবিধার মধ্যে এই যে নিশ্চিন্তে চলেছে তারা, সিপাহীরা দেখতে পাবে এমন আশঙ্কা নেই। তারা নীরবে চলেছে বটে, মুখে শব্দটি নেই কিন্তু তাদের মনের মধ্যে দ্রুত আবর্তিত হচ্ছে চিন্তার চাকা, দুজনের চাকাতে একই ছন্দ।

স্বরূপ ভাবছে মববার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। জীবন ভাবছে এত শীঘ্র মরবার উপায় আসবে ভাবতে পারি নি। স্বরূপ ভাবছে, তুলসীর মৃত্যুর কারণ হয়ে এখন বেঁচে থাকাটাই পাপ, মরণে প্রায়শ্চিত্ত

হ'লেও হ'তে পারে। জীবন ভাবছে যাকে ঘরণী করবো ভেবেছিলাম সে কিনা দেখা দিল স্বৈরিণী রূপে। ভাবছে সে নারী এমন অসঙ্কোচে আসতে পারলো আমার শয্যায়—এই যে তার প্রথম, এই কেমন ক'রে বিশ্বাস করি। এ নারী যদি রুমালী হ'ত তবে এমন আত্মগ্লানি হ'ত না, কারণ কোন পুরুষ তাঁকে ঘরণী করবার সঙ্কল্প করবে না। এই কদিনেই তুলসীগত প্রাণ হয়েছিল—এখন সেই তুলসী গেল অতলে তলিয়ে—সেই সঙ্গে গিয়েছে তলিয়ে তার অনেকখানি। এখন বেঁচে থাকায় আর কি সার্থকতা।

হোঁচট খেয়েছি স্বরূপ ভাই, সাবধানে।

টাল সামলাতে সামলাতে স্বরূপ বলে, আমিও খেয়েছি হোঁচট।

জীবন বলে, খেতেই হবে, দু'জনের একই পথ কি না।

আর এত সাবধান হয়ে চলেই বা কি লাভ? চলেছি তো মরতে।

তবু কাজটা উদ্ধার ক'রে দিয়ে মরা ভালো।

তা বটে, সংক্ষেপে মন্তব্য করে স্বরূপ।

তারপরে আবার নীরবতা, কিন্তু মনের চাকা ঘুরতে থাকে একই ছন্দে।

জীবন ভাবতে থাকে, তুলসী এখন কি করছে? আসবার সময়ে একটা কথাও বলল না। না-ই বলল। কোন মুখেই বা বলবে। চোখে মুখে রাত্রির বিলাস-শিখার কজ্জলী। তখনি আবার সে উল্টে নিজেকে প্রশ্ন করে—কি করছে?

জানতে চাও? তেমনি অসঙ্কোচে আর কোন পুরুষের শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে কিনা? সে বাড়িতে কোথায় আর অন্য পুরুষ? নারী যখন পুরুষ কামনা করে স্বয়ং শয়তানে যুগিয়ে দেয়। ধিক, ধিক, ধিক! কাকে ধিক্কার দেয় ঠিক বুঝতে পারে না জীবন।

স্বরূপ ভাবে, রাজ্যব্যাপী এই বিক্ষোভের মধ্যে একমাত্র সুখী তুলসা। মরে শান্তি পেয়েছে সে, কিন্তু তেমনি সকলের শান্তি হরণ ক'রে নিয়েছে। সুখানন্দ, নয়ন, ভূতিবুড়ী, গালিব সাহেব—সকলের, আর সকলের চেয়ে বেশি তার নিজের। আচ্ছা, আজ যদি সে মরে তবে কি দেখা হবে না তুলসীর সঙ্গে? সেখানেও কি স্বর্গ নরকের—পাপী পবিত্রের মধ্যে পর্দা আছে? একটি বার মাত্র যদি সে সুযোগ পেতো—বুঝিয়ে বলতো তার দোষ নেই, সে রক্ষা করতে গিয়েছিল। সেই অনিচ্ছাকৃত পাপে এখন পুড়ছে শোকানলে। সে ভাবে তুলসীর স্বর্গ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় জানাবে তুলসী, তোমাকে ভালোবাসতাম, এমন ভালোবাসা কোন পুরুষ কোন নারীকে বাসে নি। ঐ

কথাটি বার বার মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে একটুখানি হাল্কা হয় মনটা, নিরেট অন্ধকার ফিকে হয়ে ওঠে।

স্বরূপ ভাই, আলো দেখতে পাচ্ছ?

চমকে উঠে স্বরূপ শুধোয়, কোথায়?

জীবন হেসে উঠে বলে, মনের মধ্যে নয়, আকাশের দিকে তাকাও।

চাঁদ উঠল বুঝি।

কাজেই সাবধান। বিপদের সময়ে চাঁদের আলো বন্ধু নয়।

কিন্তু জীবন, ঐ আলোটুকু না পেলে কুদশিয়া বাগ থেকে লক্ষ্য করবো কি ক'রে?

আর লক্ষ্য না করলে আগামীকাল তরফা নাচের আসরে যোগদান করবো কি ক'রে?

স্বরূপ বলে, আরে ভাই তুমিও যেমন। সাহেবরা রাজ্য জয় করবে তাদের মনে আনন্দ আছে, নাচ-গান শুনতে পারে। তোমার আবার এত আনন্দ কোথায়?

জীবন বলে, কেন আমার আনন্দের কি অভাব দেখলে?

এই তো এখনি বললে, আমাদের দু'জনের এক পথ। আমার কাছে লুকোতে চেষ্টা ক'রো না। কী হয়েছে বলো তো? সেই দিল্লিবাসী মেয়েটির সঙ্গে ঝগড়া করেছ বুঝি?

উত্তর দেয় না জীবন।

স্বরূপ বলে, ভাই প্রেমের পথ আর এই নালার পথ এক রকম, যেমন উঁচু-নিচু খানা-খন্দ তেমনি অন্ধকার।

আকাশের দিকে ইঙ্গিত ক'রে জীবন বলে, মাঝে মাঝে চাঁদ ওঠে।

ওঠে বৈকি ভাই, তবে গভীর রাতে। সেই খণ্ড চাঁদের ম্লান আলোয় কাজ চলে না।

স্বরূপ বলে, প্রেম কি কাজ?

জীবন শুধোয়, তবে এমন অকাজের মধ্যে মানুষ যায় কেন?

মানুষের স্বভাব।

ফলে দুঃখ।

ওটা মানুষের ভাগ্যলিপি।

গুড়ুম, গুড়ুম দুম। খুব এক পশলা গুলী চলে

জীবন শুধোয়, টের পেল নাকি?

না, Ludlow Castle-এ পাহারা বদলের গুলী।

তাই তো, এসে পড়েছি। নালাটাও শেষ হয়েছে মনে হচ্ছে। চলো ওঠা যাক।

না, আর একটু অপেক্ষা করো। আগে ওরা চলে যাক, বলে স্বরূপ।

কিছুক্ষণ পরেই ওরা শুনতে পায় শুকনো ঘাসপাতার উপরে অনেকগুলো ভারি জুতোর গট গট খট খট আওয়াজ। ওরা নিশ্বাস রুদ্ধ ক'রে নালার মধ্যে গুঁড়ি মেরে বসে থাকে।

নালা থেকে ওঠবার আগেই চাঁদ উঠেছিল?

হাঁ, কর্নেল।

বেশ, তারপরে তোমরা কি করলে?

Ludlow Castle-এর পাহারা বদল হ'লে জানতে পেরেছিলাম।

কি ক'রে?

ফৌজী ভারি জুতোর গট গট শব্দে।

পরবর্তী পাহারার দল যে আসে নি কি ক'রে বুঝলে?

আপনিই তো বলেছিলেন পাহারা বদলের মধ্যে খানিকটা অবকাশ পাওয়া যায়। তা ছাড়া নূতন পাহারার দল এলে জুতোর শব্দে টের পাওয়া যেতো।

ঠিক কথা। তার পরে বলে যাও।

Ludlow Castle খালি জেনেও সেখানে গেলাম না। আমাদের লক্ষ্য কুদশিয়া বাগ, Castle-এ গিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই নি।

উত্তম।

তখন দু'জনে কুদশিয়া বাগে ঢুকে পড়লাম—সমস্ত জনশূন্য।

তখন?

সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে বাগিচার যে প্রাচীরটা শহরের দিকে তার উপরে উঠলাম।

দু'জনে?

না, স্বরূপ ভাই নিচে পাহারায় রইলো।

তুমি?

প্রাচীরের উপরে শুয়ে পড়ে তাকালাম শহরের প্রাচীরের দিকে।

কি দেখলে?

দুই প্রাচীরের মধ্যে সামান্য ব্যবধান। দেখলাম শহরের প্রাচীরের উপরে একদল সিপাহী পাহারা দিচ্ছে।

তোমাকে দেখতে পেয়েছিল কি?

দেখতে পেলে নিশ্চয় গুলী চালাতো। ওখানে যে আমরা আসতে পারি এমন সন্দেহ তারা করে নি। তাই তারা নিশ্চিন্ত, আমরাও।

পরদিন প্রাতঃকালে এলেক্স টেলরের তাঁবুতে জীবন ও স্বরূপ গতরাত্রির ঘটনা বিবৃত করছে। চেয়ারে উপবিষ্ট চীফ এঞ্জিনীয়ার, বেয়ার্ড স্মিথ আর কর্নেল ক্রসম্যান। পাশেই ক্রসম্যানের তাঁবু। টেবিলের অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান জীবন, স্বরূপরাম আর গুরবচন সিং। গুরবচন যেতে পায় নি, তার মুখটা নিতান্ত অপ্রসন্ন।

এবারে বলো, কামানের ব্যাটারি আড়াল করতে পারে এমন কোন আশ্রয় দেখলে কি?

জীবন বলে, কাস্টম হাউসের ছাদ ধ্বসে পড়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু তার দেয়ালগুলো অক্ষত দাঁড়িয়ে। তার আড়ালে ব্যাটারি বসালে কাজ চলতে পারে।

এমন মনে করবার হেতু কি?

প্রথম তো শহরের উত্তর দিকের দেওয়ালের কাছে, তারপরে কাস্টম হাউসের দেওয়ালগুলো দুর্ভেদ্য, ব্যাটারির আশ্রয় যথাসম্ভব নিরাপদ।

বেশ, তারপর কি করলে বলো।

দেওয়াল থেকে নামলাম আর দু'জনে এগিয়ে চললাম নালার দিকে। এমন সময়ে এক ঝাঁক গুলীর শব্দ।

এলেক্স টেলর পার্শ্বস্থ বেয়ার্ড স্মিথের দিকে তাকিয়ে বলে, আমাদের অভিজ্ঞতার অনুরূপ।

তখন আমরা দু'জনে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম—আর ঐ ভাবেই হামাগুড়ি দিয়ে এসে নেমে পড়লাম নালার মধ্যে। তারপরে আর ভয়ের কোন আশঙ্কা ছিল না।

এলেক্স টেলর এবার বলে ওঠে, তোমাদের অভিযান সফল হয়েছে, আমিও খুশী হয়েছি।

জীবন স্যালুট ক'রে বলে, আমরা যেতে পারি কি?

না, কখনো নয়।

তখন চীফ এঞ্জিনীয়ার তাকায় কর্নেল ক্রসম্যানের দিকে, বলে, এবার

তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো। নিমন্ত্রণ করো ওদের তয়ফা নাচে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, বলে ওঠে ক্রসম্যান। বলে, আমি অপেক্ষা করছিলাম তোমার জেরা শেষ হওয়ার জন্যে।

তারপরে সে জীবনদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমাদের তিন-জনেরই নিমন্ত্রণ রইলো। আজ সন্ধ্যাবেলায় অবশ্য আসবে, আমার তাঁবুর পাশেই পড়েছে বাঈজীর তাঁবু, দেখলেই বুঝতে পারবে।

সন্ধ্যাবেলায় তিনজনে বাঈজীর তাঁবুতে প্রবেশ করে। তারা দেখতে পায় মস্ত আসর—লাল মুখে, টাক মাথায়, কটা মুখে, কালো দাড়িতে গম গম করছে। আর আসরের মধ্যে—ডুগি-তব্‌লা, সারেঙ্গীওয়ালা, খঞ্জনীওয়ালার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গীতে লাস্য লাবণ্য নিক্ষেপ করে নৃত্য করছে বাঈজী। জীবন চেনে, পান্না।

॥ ১৫ ॥

"চম্পা মে তিন গুণ
রূপ রঙ অওর বাস,
ইক অবগুণ হ্যায়
কোই ভঁওরা আযে না পাশ।"

পান্না, আবার তোমার দেখা পাবো ভাবি নি।

কেন পান্নাকে কি একেবারে খরচের খাতায় লিখে রেখেছিলে নাকি ?

তা কেন, নিজেই খরচের খাতায় লিখিত হয়েছিলাম, একবার নয় অনেকবার।

কি রকম শুনি না।

শুনলে শুধু কষ্ট পাবে, মোটের উপরে তো দেখতেই পাচ্ছ যে বেঁচে আছি।

বেঁচে থাকবেই আমি জানতাম।

কেমন ক'রে জানতে ?

বাঃ, জানবো না! তোমার জন্যে প্রত্যেক দিন যে আমি মহাদেবের মাথায় বেলপাতা দিতাম।

তবু ভালো। আমি ভেবেছিলাম পান্না ভুলেই গিয়েছে আমাকে।

যার যেমন স্বভাব, চিন্তা করে। যাকগে, কথা কাটাকাটি হ'লে আর

শেষ হবে না। বেরিলি ছাড়বার পরে কেমন ছিলে বলো, শুনি।

শুনে কি লাভ? কেবল ভয় পাবে, দুঃখ পাবে।

ভয় না পাই, দুঃখ পাবোই।

শখ ক'রে দুঃখ পেতে যাবে কেন?

শখ ক'রে লোকে বাঘের খেলা দেখতে যায় কেন? বাঘ তো ভয়ঙ্কর।

তবে শোনো।

এই ব'লে জীবন বেরিলি ত্যাগের পরে যা যা ঘটেছিল আনুপূর্বিক বিবরণ বলে যায়। পান্না কখনো জেরা ক'রে ঘটনার গ্রন্থি খুলে নেয়, কখনো অবাক হয়ে শোনে, কখনো ছলছল ক'রে ওঠে তার চোখ। জীবন সব বলে। রুমালীর পরিচয়, এলবিয়ন বিবির কথা, এমন কি খসড়ায় তুলসীর কথাও বলে। তারপরে বলে, কর্নেল ক্রসম্যানের নিমন্ত্রণে তাঁবুতে ঢোকবার আগে পর্যন্ত স্বপ্নেও ভাবি নি তোমাকে দেখতে পাবো।

দেখে কি মনে হ'ল? দুঃস্বপ্ন নাকি?

জীবন সংক্ষেপে বলে, পান্নার আর এক পরিচয় পেলাম।

এ পরিচয়ে মনে ঈর্ষা হ'ল না? সত্যি ক'রে বলো।

জীবন উত্তর দেয় না। হয়তো সত্যিই তার ঈর্ষা হ'ত, কিন্তু এর মধ্যে যে তুলসীর আবির্ভাব ঘটেছে তার জীবনে। আকাশে চাঁদ উঠে কি ঘরের প্রদীপের কথা ভুলিয়ে দেয় না। এই দুদিনের মধ্যে বারে বারে সে তুলসীকে বিসর্জন দিয়েছে, এমন কি নিজের প্রাণটা বিসর্জন দেওয়ার ইচ্ছাতেই কুদশিয়া বাগে গিয়েছিল, কিন্তু এখন পান্নাকে দেখে বুঝতে পারলো তুলসীর প্রতি ক্রোধ প্রেমের বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মনের মধ্যে পান্না যেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল আজ সেই কুলুঙ্গিতে তুলসী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। তাই কাল প্রকাশ্য দরবারে পান্নাকে নাচতে দেখে ঈর্ষা বোধ করে নি সে—যদিচ জানতো ওটা তার পেশা।

পান্না শুধোয়, জীবন, তুমি কি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে?

না, ভোলে নি সে। ক্ষত সারলেও ক্ষতচিহ্ন থেকে যায়।

জীবন বলে, ভুলি নি বললে কি বিশ্বাস করবে?

কেন করবো না।

আমি তো নিত্য মহাদেবের মাথায় বেলপাতা দিই নি।

পান্না হেসে বলে, দিলেই পারতে।

সিপাহীর সে সুযোগ কোথায়? তার বদলে সিপাহীর মাথা লক্ষ্য ক'রে

গুলী ছুঁড়েছি।

আর একটাও মরে নি।

ঠিক ধরেছ, সব পালিয়েছে।

কতক ঠাট্টায় কতক সংশয়ে পান্না বলে ওঠে, সেদিনের সেই খোকাবাবু আজ মস্ত বাহাদুর।

সত্যি পান্না, নিত্য খুন-জখম দেখতে দেখতে মনটা শক্ত হয়ে গিয়েছে

তা তো বুঝতেই পারছি।

পাথরে কি দাগ পড়ে?

কিন্তু একবার দাগ পড়লে যে ওঠে না ভাই।

দাগ কি পড়েছে?

মনে মনে চিনি খেয়ে কি লাভ ভাই? যার মূর্তি দাগা হয়েছে সে বুঝুক।

তবে তাই বুঝুক। আপাতত আমার গোড়াকার প্রশ্নের উত্তর দাও। হঠাৎ এখানে আসতে গেলে কেন?

তোমার দেখা পাবো বলে।

তুমি কি জান নাকি? কি ক'রে জানলে যে, আমি এখানে আসবো।

বেরিলিতেই বলেছিলাম, তুমিও বলেছিলে; রওনা হওয়ার সময়েও দিল্লির পথ বাতলে দিল দাদাভাই। কেমন মনে পড়ে?

জীবন দেখে যে, কোন কথাই ভোলে নি পান্না। প্রেমের উৎস স্মৃতি। জীবন দেখে যে অত্যন্ত তুচ্ছ কথাও মনে ক'রে রেখেছে পান্না। তুচ্ছ কথার নুড়ির উপর দিয়ে প্রেমের ঝরনার যাত্রা শুরু হয়।

জীবন বলে, এখন ঠাট্টা রেখে বলো হঠাৎ দিল্লি আসতে গেলে কেন?

তোমাকে দেখতে এসেছি এই স্বীকারোক্তিকে বলো ঠাট্টা! জানো এ রাজ্যে এমন অনেক লোক আছে যারা ঐ কথাটি শোনবার জন্যে প্রাণ দিতে পারে।

জীবন বলে, আর কিছু নেই ব'লে।

পান্না দেখে যে এই ক'মাসে জীবনের অনেক বদল হয়েছে, অনেক শক্ত হয়েছে সে, এখন সে ঠাট্টার জবাবে ঠাট্টা করতে পারে। পাথর কঠিন বলেই স্ফুলিঙ্গ বের হয়।

জীবন বলে, বেশ স্বীকার ক'রে নিলাম যে, তুমি আমাকে দেখতেই এখানে এসেছ। তারপরে?

তোমাকে দেখতে এসেছি, তা ছাড়া অন্য কারণও আছে।

জীবনের মনে বেশ একটু আঘাত লাগে। ওঃ, অন্য কারণও আছে?

প্রকাশ্যে শুধায়, কী সেই অন্য কারণটা শুনতে পারি কী?

প্রাণভয়।

প্রাণভয়? কেন আমি আসবার সময়ে তো দেখে এলাম যে, বেরিলি শহর ছেড়ে সিপাহী ফৌজ পালিয়েছে।

যখন তারা দেখলো যে গোরা ফৌজ আসে নি, তখন পাঁচ সাত দশ দিন গা-ঢাকা দিয়ে থেকে ফিরে এলো, আর আরম্ভ হয়ে গেল ঘোর অত্যাচার।

কে তখন শাসনকর্তা? বখৎ খাঁ তো আগেই দিল্লি রওনা হয়ে গিয়েছিল।

কে শাসনকর্তা নয়? আজ সফি খাঁ, কাল খাঁ বাহাদুর খাঁ, পরশু চুন্না মিঞা।

এত রাজা?

নইলে আর অরাজকতা বলেছে কেন?

তখন?

তখন আরম্ভ হ'ল আমার বিপদ।

কেন?

রটে গিয়েছিল যে, আমার ঘরে এক বাঙালী আশ্রয় নিয়েছিল। আমি যত বলি মিথ্যা কথা, তত বাড়ে তাদের অবিশ্বাস। আজ সফি খাঁ জরিমানা করলো একশ টাকা, তার পরদিন খাঁ বাহাদুর খাঁ জরিমানা করল পঞ্চাশ মোহর। তার পরদিন চুন্না মিঞার রাজগী। লোকটা সোনাদানায় খুশী নয়, হুকুম হ'ল রাতের বেলা সশরীরে তার দৌলতখানায় হাজির হয়ে জরিমানা দিয়ে আসতে হবে। কাতরভাবে মহাদেবকে ডাকি, মহাদেব মা পার্বতী রক্ষা করো, আমরা তোমার সেবিকা। এমন সময়ে দুপরবেলায় খবর রটে গেল যে, কর্নেল ক্রসম্যান রেসালা নিয়ে ধোপেশ্বরের মন্দিরের কাছে এসে তাঁবু ফেলেছেন।

তখন?

তখন আর কি! এক ঘণ্টার মধ্যে বেরিলি শহরে সিপাহীরাজ খতম হয়ে গেল, কে কোথায় পালালো তার ঠিক নেই।

তারপরে?

তখন আমি কর্নেল ক্রসম্যানের কাছে গিয়ে সব নিবেদন করলাম। তাঁর সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল, অনেকবার তাঁর দরবারে গিয়ে গান শুনিয়ে এসেছি, আমার গান তাঁর বড় ভালো লাগত। তিনিই সাহেব মহলে রটিয়েছিলেন যে, পান্নার একটি হাসির দাম নগদ দশ হাজার মোহর।

বাদশাহী মোহর, না কোম্পানীর মোহর—খুলে বলেছেন কি না। এবারে না হয় জিজ্ঞাসা ক'রে নেবো। তোমার কি মনে হয়?

কিঞ্চিৎ ঝাঁঝের সঙ্গে জীবন বলে, দশ হাজার খোলামকুচি।

তার চেয়ে দশ হাজার মোহর সংগ্রহ অনেক সহজ।

চাপা ক্রোধে জীবন বলে, কারো কারো পক্ষে বটে। তোমার কর্নেল সাহেব ছাড়া অন্য লোকেরও চোখ আছে।

কি বলে তাদের চোখ?

রূপের চেয়ে গুণের মূল্য অনেক বেশী।

তেমন মেয়ের দেখা মিলেছে বুঝি।

বাধা কি? সংসারে কি এক পান্না ছাড়া কিছু নেই?

কি যে বলো? হীরে আছে, চুনি আছে, নীলা আছে, মুক্তো আছে। তা এদের মধ্যে কোনটির দেখা পেলে?

না, পাথর বড় শক্ত।

এতদিনে হুঁশ হয়েছে, বেশ। তবে এবারে কি গাছপালার লীলা আরম্ভ হ'ল নাকি? কি শুনতে পাই কি? গোলাপ, বেল, জুঁই, হেনা—কোন্‌টি?

ও সব কিছুই নয়।

তবে?

তুলসী।

অসম্ভব বোধে হেসে ওঠে পান্না। বলে, বেশ, বেশ, অতি পবিত্র বস্তু, শুনলেই ভক্তিতে মাথা নত হয়ে আসে। তা এখানেই থামবে, না আরও অগ্রসর হবে।

এরপরে আর কি সম্ভব?

কেন বিছুটি।

হোঃ হোঃ শব্দে হেসে ওঠে জীবন।

না, না, হাসির কথা নয় জীবন, এমন মেয়ে আছে যাকে ছুঁলে ছট্‌ফট ক'রে মরতে হয়।

এমন মেয়ে নয়, পান্না, সব মেয়েই। মেয়ে জাতটাই বিছুটি গাছ, ছট্‌ফট করিয়ে ছাড়ে পুরুষকে।

তবু তো শিক্ষা হয় না পুরুষের, সন্ধ্যাবেলা তাঁবু খুঁজে খুঁজে ঠিক এসে হাজির হয়।

দু'জনে হেসে ওঠে একসঙ্গে। হাসির তোড়ে গ্লানির ময়লা ভেসে যায়।

জীবন শুধোয়, তারপরে কি হ'ল বলো।

তারপরে তো আর বেশি নেই। ক্রসম্যানের সঙ্গে চলে এলাম দিল্লি, তাঁবু পড়লো পাহাড়ের পশ্চিমে। কাল তুমি এলে তরফা নাচের আসরে। আর আজ দু'জনে সন্ধ্যাবেলা হরিতকী গাছের ছায়ায় পাথরের উপরে পাশাপশি বসে গল্প করছি।*

সত্যই দু'জনে অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসে গল্প করছে। আগের দিন রাতে জীবন দেখেছিল পান্নাকে, দেখে যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছিল, ভেবেছিল, তার সঙ্কট সমুদ্রের বাতিঘররূপে দেখা দিল পান্না। সেদিন আর কথা বলা সম্ভব ছিল না। নাচের আসর থেকে ফিরবার সময়ে স্থির করেছিল পরদিন গিয়ে দেখা করবে পান্নার সঙ্গে। পরদিন সন্ধ্যায় পান্নার তাঁবুতে উপস্থিত হ'তেই বেরিয়ে এল পান্না, বলল, আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

কেমন ক'রে জানলে যে আমি এখানে আছি?

তুমি নিজেই তো কতবার বলেছ যে আমি জাদু জানি। তা ছাড়া কাল যে দেখলাম তোমাকে।

কিন্তু আমি যে আবার আসবো তা কি ক'রে জানলে?

বেশ! চুম্বকের টানে লোহা কি স্থির থাকতে পারে।

চুম্বক ভেবে গরিমা করা হচ্ছে।

না গো না, চুম্বক তুমি, যার টানে বেরিলি থেকে এতদূর এসেছি। চলো কোথাও গিয়ে বসি।

কাছেই গোটাকতক হরিতকী আর মহানিম গাছ ছিল। তারই তলায় পাথরের উপরে পাশাপাশি বসলো দুজন। প্রথমে কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরবে থাকলো, নীরব—তবে নিষ্ক্রিয় নয়। মন থেকে মনে অদৃশ্য বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত ক'রে দু'জনের চোখ কান মুখ তপ্ত ক'রে তুলল।

জীবন ভেবেছিল যে, তুলসী সম্পর্কিত কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করবে। কিন্তু পারলো না, মুখে বেধে গেল। এতদিন পরে দেখা, আর প্রথমেই কিনা জানারে

* পান্নার অর্থাৎ একটি মেয়ের বৃটিশ ছাউনিতে আগমন এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। সত্য সত্য একটি ইংরেজ মেয়ে, একজন গোরা সৈন্যের স্ত্রী, বৃটিশ ছাউনিতে এসেছিল। এখানে তার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। কোম্পানীর ফৌজ স্বপক্ষের সংখ্যাবৃদ্ধিকে সুলক্ষণ মনে করেছিল। শিশুটির নামকরণ হয়েছিল **Stanley Delhi Force**, কাজেই পান্নার বৃটিশ ছাউনিতে আশ্রয়লাভ অসম্ভব কল্পনা নয়।

—তাকে নয় অপর একটি মেয়েকে ভালোবাসে, আর কিনা এসেছে সেই ভালোবাসার সঙ্কটত্রাণ আশা ক'রে। না, কিছুতেই সে কথা বের হ'ল না মুখ দিয়ে। তার উপরে আবার পান্নার আঁচলের স্পর্শ, চুলের গন্ধ, নিঃশ্বাসের ছন্দ, তার সজীব সান্নিধ্য এমন একটা মোহময় স্বপ্নময় বিলাসবিভ্রমময় জাদুর সৃষ্টি করলো যে, ক্ষণকালের জন্য তুলসী তলিয়ে গেল অতলে। সে ভাবলো তবে কি সে তুলসীকে ভালোবাসে না! কিন্তু ভালো যদি না বাসে তবে আঘাত এমন গুরুতর কেন? সেদিন রাতে তার ঘরে তুলসী না এসে যদি রুমালী আসতো তবে কি সে আঘাত পেতো। তখনি ভাবে তুলসীকে যদি ভালোবাসে তবে পান্না এমন মোহাবেশ সৃষ্টি করে কেন, এমন প্রগাঢ় তন্ময়তা এনে দেয় কেন? বেচারা কি ক'রে জানবে যে, আকাশে যেমন গ্রহ-উপগ্রহ আছে তেমনি আছে পলাতক জ্যোতিষ্ক—যার টানে আগুনের জোয়ার জেগে ওঠে প্রাণে। তবু তা ক্ষণিক, চিরন্তন ঐ স্থির-কক্ষ গ্রহ আর উপগ্রহ। তুলসী কখন তার উপগ্রহে পরিণত হয়েছে আর পান্না সেই পলাতক তারা, অদৃশ্য টানে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে আগুনের তুফান তোলা যার একমাত্র বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য।

কি গো, কি ভাবছ?

আচ্ছা পান্না, তুমি কখনো কাউকে ভালোবেসেছ? হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসে জীবন।

ভেবেছিল প্রশ্নটা উড়িয়ে দেবে পরিহাসের দক্ষিণ হাওয়ায়। কিন্তু কই, প্রশ্ন শুনে যে হাওয়া বইলো তার মধ্যে আষাঢ়ের নববর্ষার শীকর সঞ্চিত।

শুনতে চাও, জীবন?

জীবন ভয়ে ভয়ে বলল, ক্ষতি কি?

সে ভাবে, যদি পান্না বলে ফেলে ভালোবাসে তাকে—তবে যে সত্যই অতলে তলিয়ে যাবে তুলসী। তার সাধ্য নেই পান্নার আকর্ষণ অগ্রাহ্য ক'রে দূরে যায়।

তবে শোন, বলে আবৃত্তি করে—

"চম্পা মে তিন গুণ
রূপ রঙ অওর বাস,
ইক অবগুণ হ্যায়
কোই ভঁওরা আয়ে ন পাশ।"

বুঝলে, না ব্যাখ্যা করতে হবে?

বুঝেছি।

আশ্বস্ত বোধ করে জীবন, কিন্তু সেই সঙ্গেই কেমন যেন আশাভঙ্গের খোঁচা লাগে তার মনে।

দূর ছাই, এর চেয়ে রেসালা নিয়ে আক্রমণ অনেক সহজ।

প্রথম সান্নিধ্যের মোহ ফিকে হ'তেই দু'জনের মন ধীরে ধীরে উচ্চগ্রাম থেকে নেমে আসে। ক্রমে কথাবার্তায় তাপ কমে আসে, তার বদলে দেখা দেয় দ্যুতি। হাসি-পরিহাসে কথা-কাটাকাটিতে অনেকক্ষণ কাটে। অবশেষে পড়ে আবার ছেদ। দু'জনে তখন আবার নীরব। কিন্তু দু'বারের নীরবতায় কিছু প্রভেদ আছে। প্রথম নীরবতা অশ্রুগর্ভ আষাঢ়ের মেঘ, দ্বিতীয় বারের নীরবতা শরতের দায়িত্বশূন্য সেই মেঘ যা চুকিয়ে দিয়েছে তার সব অশ্রু, সব বজ্র, সব বিদ্যুৎ।

ওমা ওটা কি গো ?—বলে হঠাৎ চীৎকার ক'রে ওঠে পান্না।

ওমা ওটা কি, রাক্ষস না ভূত—বলে কাঁপতে কাঁপতে সবলে জড়িয়ে ধরে জীবনকে।

জীবন প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ ভয় পেলো কেন পান্না, এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে পায় না কিছু। সিপাহী-টিপাহী এলো নাকি ?

কি হয়েছে পান্না, কি হয়েছে ?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে দেখায় একটা ঝোপের দিকে। এবারে দেখতে পায় জীবন আর দেখতে পায় বলেই হোঃ হোঃ শব্দে হেসে ওঠে।

ভয় নেই পান্না, ও আমাদের ক্যালিবান, পোষমানা, কিছু বলে না।

কতকটা আশ্বস্ত হয়, তবু একেবারে ভয় যায় না তার, বলে, কি বললে ?

ক্যালিবান।

সে আবার কি জন্তু ?

মানুষ-বাঘা।

মানুষবাঘা ! ওরে বাবা রে, বলে আবার জোরে জড়িয়ে ধরে জীবনকে।

জীবন পান্নাকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করে, মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, ওটা আমার পোষা প্রাণী, এমন নিরীহ জন্তু আর নেই।

তারপরে ক্যালিবানের দিকে তাকিয়ে বলে, ক্যালিবান, আয় কাছে আয়।

চার পায়ে ভর ক'রে এগিয়ে আসে জন্তুটা। জীবনের কাছে এসে রোঁয়ায় ঢাকা বিকৃত মুখের আর্ত করুণ চোখ দুটো তুলে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

ছাখো, ছাখো পান্না, কেমন নিরীহ শান্ত প্রাণী।

পান্না একনজর দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, বলে, উঃ, কী বীভৎস চেহারা। জীবন ভাই, বিদেয় ক'রে দাও, আমার গা ঘিনঘিন করছে।

বিদায় করবো কি ক'রে? আমি যেখানে যাবো সেখানে যাবে, আমি খাইয়ে দিলে খাবে, আমার ঘরের দরজা ছাড়া শোবে না!

এ আপদ আবার কোত্থেকে জোটালে তুমি।

সে অনেক কথা, পরে বলব। এই ক্যালিবান, এদিকে আয়।

জীবনের ডাক শুনে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসে। জীবন তার চুলের ঝুঁটি ধ'রে ঝাঁকানি দেয় তারপরে তার মাথাটা পান্নার পায়ের কাছে নত ক'রে ধরে, বলে, প্রণাম কর, তোর দিদি হয়।

পান্না পা সরিয়ে নিয়ে বলে, দেখিস, পা ছুঁসনে যেন পোড়ারমুখো।

আহা অমন করে কি কথা বলে, ও বড় অসহায়। নাও আশীর্বাদ করো, বলে তার হাতখানা নিয়ে ক্যালিবানের চুলের ঝুঁটি ধরিয়ে দেয়।

এই রে, সন্ধ্যাবেলায় আবার আমাকে স্নান করালে।

স্নানই যদি করবে তবে একবার ভালো করে মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।

পান্নার হাত নিয়ে চেপে ধরে ক্যালিবানের মাথায়।

জীবন বলে, কার ঘরে না জানি মানুষ হয়ে জন্মেছিল, সেই শৈশবের পরে আর পায় নি মা বোনের স্পর্শ। বনে বনে ঘুরছে পশু হয়ে।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে পান্না হাতখানা রেখেছিল ক্যালিবানের মাথার উপরে, হঠাৎ সে ছিটকে সরে গিয়ে বসলো।

কি হ'ল আবার?

আমার কেমন যেন গা গুলোচ্ছে—এই বলেই মাথা নিচু ক'রে বার-দুই বমি করে ফেল্‌ল।

জীবন অপ্রস্তুত। আর ক্যালিবানও বোধ করি অপ্রস্তুত। সে হয়তো ভাবছিল, কি লজ্জা! আমি সত্যিই তাহলে জুগুপ্সাজনক। কিন্তু আমার কি দোষ বলো। আমি তোমাদের মতোই মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম। আজ যে আমি. পশু সে কি আমার দোষ? না না, আমি পশুরও অধম, পশুকে দেখলে ভয় পায় আর আমাকে দেখলে পায় বমি।

পান্না দাঁড়িয়ে উঠে বলে, আজ আমি যাই ভাই, স্নান ক'রে শুয়ে পড়বো।

কিন্তু তোমার সঙ্গে যে জরুরী কথা ছিল।

কালকে সন্ধ্যাবেলা এসো জীবন। আজ আমার গা-মাথা ঠিক নেই।

বেশ, তবে তাই হবে।

ঠিক আসবে তো ?

নিশ্চয়। বিশেষ দরকার।

কিন্তু ঐ জন্তুটা ?

দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

আচ্ছা তবে এসো।

এই বলে পান্না তাঁবুর দিকে যায়, জীবন হিন্দুরাও কুঠির দিকে

॥ ১৬ ॥

লুটের মাহাল

জীবন বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পরে সকাল বেলায় তুলসী বলল, দিদি, আমি ভাবছি কালকে বাড়ি চলে যাবো।

হঠাৎ কি হ'ল তোমার তুলসী ?

হঠাৎ হ'তে যাবে কেন দিদি, অনেক দিন তো হ'ল।

তা যেন হ'ল, কিন্তু তোমার বাবা যে বলে গিয়েছেন নিজে এসে নিয়ে যাবেন।

তাঁর কথা ছেড়ে দাও, বুড়ো হয়ে পড়েছেন, সব কথা কি মনে থাকে ?

একমাত্র মেয়ের কথাও মনে থাকে না! আচ্ছা, আগামী কাল যা হয় ক'রো, আজ তো থাকো।

রুমালী ও তুলসীর মধ্যে আগেকার সেই সরল প্রাণখোলা প্রণয় আর নেই, জীবনের আগমনের পরে ধীরে ধীরে কোথায় যেন কি পরিবর্তন ঘটেছে। আগেও তুলসী বাড়ি যেতে চেয়েছে, রুমালী নিষেধ করেছে; আজও নিষেধ করলো—তবে দু'য়ে অনেক প্রভেদ। সেদিন কাছে রাখতে চেয়েছিল তুলসীর প্রয়োজনে, আর আজ কাছে রাখতে চায় নিজের প্রয়োজনে। আজ তার সত্যই বড় প্রয়োজন তুলসীকে। তাকে ধ্বজদণ্ডরূপে ব্যবহার ক'রে তার মাথায় উড়িয়ে দিতে চায় নিজের বিজয় নিশান।

জীবনকে নিয়ে এতদিন দুই যুবতীর মধ্যে টানাটানি চলছিল, জীবন যখন তুলসীর দিকে কাত হওয়ার মতো, তখন মরীয়া সৈন্যের মতো নিজের দেহটাকে নিক্ষেপ ক'রে তার গতি রুদ্ধ ক'রে ফেলল রুমলী। প্রেমের বেসাতিতে দেহ ছাড়া আর কিছু জানে না সে। তার ধারণা প্রেমের

উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় দেহকে অবলম্বন ক'রে। এই ভাবেই দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে, আজকেই-বা অন্যথা হবে কেন? সে যখন দেখলো তুলসী ও জীবন শনৈঃ শনৈঃ কাছাকাছি এসে পড়ছে, বর্ষার বেগে স্ফীতকায় নদ-নদীর মধ্যেকার ব্যবধান যেমন ক্রমে লোপ পেয়ে আসে তেমনি ভাবে—তখন আর উপায়ন্তর না দেখে, মরীয়া জুয়াড়ী যে-ভাবে শেষ কড়িটি নিক্ষেপ করে সেই ভাবে, নিক্ষেপ করলো নিজের দেহটা। তার ধারণা সে জিতলো। কিন্তু শুধু জয়ে তো তৃপ্তি নেই, জয়চিহ্ন যদি না দেখানো যায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে। সেই জন্যেই তুলসীর উপস্থিতিতে আজ তার প্রয়োজন।

জীবন চলে গেলে তুলসীর কালী-ঢালা মুখের দিকে চেয়ে যে-আনন্দ অনুভব করলো রুমালী তা নিষ্ঠুরতা বা স্বার্থপরতা নয়, দেহ দিয়ে দেহ জয়ের উল্লাসের অপরিহার্য পরিণাম। রুমালী ভাবলো তুলসী ও সে দু'জনেই দান ফেলেছিল, তবে যে রুমালীর জয় হ'ল সে কি রুমালীর দোষ! প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলে হার স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। তুলসী হেরেছে, কিন্তু তাকে চলে যেতে দেওয়া হবে না, তাতে যে জয়ের আসল আনন্দটাই মাটি। বারে বারে তাকে দেখবে, বারে বারে পরাজিতের ম্লানমুখ দেখে জয়গৌরব নূতন ক'রে অনুভব করবে। না, কিছুতেই তাকে যেতে দেওয়া হবে না।

যেতেই হবে তুলসীকে, সে কিছুতেই থাকবে না এখানে। রুমালীর যে চরম জয় ঘটেছে এ কথা অবশ্য সে জানে না, তবে জানে যে চরম জয়ের পথেই চলেছে সে। সে জানে যে, এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার পরাজয় অনিবার্য। তবে আর এই ভাঙনধরা কূলে কিসের প্রতীক্ষায় বসে থাকা। হাঁ, মনের খনি থেকে দামী পাথর তুলে এখানে প্রাসাদ গড়তে শুরু করেছিল বটে কিন্তু তখন তো জানতো না যে তলে তলে ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন সেই পাথরগুলো সরিয়ে নিতেও উৎসাহ বোধ করলো না, থাক্ প'ড়ে, যাক্ তলিয়ে, কি কাজে লাগবে ওগুলো। যাবেই সে, অবশ্যই যাবে। ইচ্ছা থাকলে যে পথের অভাব হয় না, সে দৃষ্টান্ত তো দেখিয়ে গিয়েছে এলবিয়ন বিবি।

কি বলো দিদি?

না, না, এখন কিছুতেই যাওয়া হ'তে পারে না।

আর কতদিন এমন লুকিয়ে থাকবো।

আর বেশিদিন নয়, তুলসী, শীগ্‌গীরই শেষ লড়াই আরম্ভ হবে।

তাতে কোম্পানীরই যে জয় হবে তার ঠিক কি?

সিপাহীর জয় হ'লেও বাড়ি যেতে বাধা থাকবে না। কিন্তু—

কিন্তু আবার কি দিদি ?

তোমার বাড়ির উপরে এখনো মীর্জা আবুবকরের দৃষ্টি আছে কি না কে জানে ?

থাকলেই বা কি করা যায়, তুমি আর আপত্তি ক'রো না, কাল পরশুর মধ্যেই চলে যাবো।

আচ্ছা, আজ তো আর যাচ্ছ না, তাহলেই হ'ল।

পরদিন বেলা বারোটার মধ্যেই রুমালী দুধ বেচে ফিরে এলো, অন্য দিন ফিরতে দুটো বেজে যায়। প্রথমেই বিস্ময় বোধ করলো বাড়ির সদর দরজা খোলা দেখে,—তুলসী অত্যন্ত সাবধানী, রুমালী বের হয়ে গেলে দরজা বন্ধ ক'রে ভিতরে থাকে। দরজা খোলা কেন ? দরজা খুলল কে ? তুলসী কি এত অসাবধান হবে ?—প্রভৃতি নানা রকম চিন্তা করতে করতে সে ঢুকলো। এ কি, বাড়ি যেন লণ্ডভণ্ড, জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ে আছে, ব্যাপার কি ?

তুলসী, ও তুলসী, কোথায় তুমি, দরজা খুলে ঘুমিয়ে পড়েছ, বাড়ির এমন হাল করলো কে ?

কেউ উত্তর দিল না।

তবে কি মেয়েটা সত্যি সত্যিই বাড়ি চলে গেল নাকি ? এত বড় নিমকহারাম, যাওয়ার আগে একবার বলেও গেল না ! আর গেল কি না সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে ওলট-পালট ক'রে দিয়ে। এমনিভাবেই দানের প্রতিদান দিতে হয় ! কিন্তু তখনো পুরো বিশ্বাস হয় না যে, সত্যিই তুলসী চলে গিয়েছে। গলার স্বর আরও একটু উঁচু করে ডাক দেয়, তুলসী।

এবারে নিচে থেকে সাড়া আসে, কে বহিন নাকি ? সদর দরজার কাছে এসে উঁকি মেরে নিচে তাকিয়ে রুমালী বলে ওঠে, কে রে, আব্দুল ?

তারপরে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে বলে যায়, সদর দরজা খোলা কেন ? তুলসী গেল কোথায় ?

আব্দুল উপরে আসে না, নিচে থেকেই বলে, তুলসী বহিনকে লুট ক'রে নিয়ে গিয়েছে।

লুট ক'রে নিয়ে গিয়েছে ! কি বলিস ?

সাচ বাৎ বহিন।

কারা নিয়ে গেল ?

যাদের নজর ছিল তার উপরে।

ঘউস মহম্মদের লোক ?

হাঁ বহিন, ঘউস মহম্মদের লোক, কিন্তু নিয়ে গেল···

থাক, থাক, আর বলতে হবে না বুঝেছি। তা তোরা কি করছিলি ?

আব্দুল নীরবে মাথায় হাত দেয়।

রুমালী বলে ওঠে, মরদ হয়ে নসিব দেখাচ্ছিস।

নসিব নয় বহিন, লোহু।

এবারে রুমালী তার কাছে এসে দাঁড়ায়, তার মাথার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, ইস, মাথা যে ফেটে গিয়েছে।

তবে কি তুমি ভেবেছিলে আব্দুলের মাথা আস্ত থাকবে—আর তুলসী বহিনকে লুটে নিয়ে যাবে।

করিম খাঁ গেল কোথায় ?

ঐ যে, বলে ঘরের অন্ধকার একটা কোণ দেখিয়ে দেয় আব্দুল।

পড়ে ঘুমোচ্ছে।

ও ঘুম আর ভাঙবে না।

খুন হয়েছে, ম'রে গিয়েছে !

একদম, বিলকুল, বলে আব্দুল।

আর ওরা সব গেল কোথায় ?

ওরা থাকলে কি পারতো ঘউস মহম্মদের ফৌজ। ওরা আজ সকালে মথুরায় রওনা হয়ে গিয়েছে মসলন্দ বেচতে।

রুমালী শুধায়, কখন এসেছিল ?

তখন দশ ঘড়ি হবে।

গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রুমালী, কথা বলে না, কী-ই বা আর বলবার আছে।

এই তো আজ তিনদিন তুলসীর সঙ্গে তার মন-কষাকষি চলছিল, মনে মনে দু'জনে দু'জনের শত্রু হ'য়ে উঠেছিল, সেই তুলসী—তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী যদি অপসারিত হয় তবে তার তো দুঃখিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কেন জানি দুঃখে করুণায় তার মন আকণ্ঠ পূর্ণ হয়ে উঠল। তুলসী উদ্ধারের উপায় সে চিন্তা করতে লাগলো। মানুষের চরিত্র যদি সাদা-কালোর মোটা তুলিতে চিত্রিত হ'ত তবে সংসার বুঝি এমন জটিল হ'ত না। কিন্তু তা তো হয় নি। মানুষের চরিত্র হাসি আর চোখের জলের পটো রামধনুর সাত রঙে চিত্রিত, চোখে না পড়লেও সাতটা বর্ণই আছে, একটাও কম নয়।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে মন স্থির ক'রে ফেলল, আর তখনই সেই অবস্থাতেই রওনা হয়ে গেল।

আব্দুল শুধালো, বহিন কোথায় চললে।

উত্তর পেল না আব্দুল। তখন তার চোখে মুখে মনে মাথায় আগুন জ্বলছে, খুব সম্ভব আব্দুলের প্রশ্ন তার কানেই ঢোকে নি।

॥ ১৭ ॥

"কাল রাত্রে কিছু নাহি
মনে ছিল দেব। সুখ স্বর্গ এত কাছে
দিয়েছিল ধরা, পেয়েছি কি না পেয়েছি
করিনি গণনা, আত্মবিস্মরণ সুখে।
আজ প্রাতে উঠে, নৈরাশ্যধিক্কারবেগে
অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়।"

অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় বেলা তিন ঘড়ির সময়ে রুমালী যখন গিয়ে বৃটিশ ছাউনিতে পৌঁছল তখন ক্রোধে পরিশ্রমে রৌদ্রের তেজে তার সমস্ত মুখ দুপুর বেলাকার স্থলপদ্মের মতো ক্লান্ত ও রক্তাভ। তাকে কেউ বাধা দিল না, অনেকেই চিনতো, সে সোজা গিয়ে হিন্দুরাও কুঠিতে উঠল। সৌভাগ্যবশত দরজার কাছেই দেখা পেল জীবনের। জীবন তাকে সেই সময়ে সেই অবস্থায় দেখে বিস্মিত হয়ে গেল, বুঝলো একটা গুরুতর কিছু হয়ে গিয়েছে। শুধালো, কি হয়েছে রুমালী?

জীবন ভাই, তোমাকে এখনি আমার সঙ্গে যেতে হবে।

অধিকতর বিস্ময়ে জীবন শুধায়—এখনি? কোথায়? কেন?

এখনি এবং শাহ্‌জাহানাবাদে। কেন না হয় পরে শুনো।

সেটাই তো আগে জানা দরকার।

তবে শোনো। আজ সকালে আমি যখন বের হয়ে গিয়েছি তখন এসে লুটে নিয়ে গিয়েছে তুলসীকে।

লুটে নিয়ে গিয়েছে! তুলসীকে! কি বলছ?

যা ঘটেছে তাই বলছি। একটা কহানি বলবার জন্যে কি এই রোদের মধ্যে এসেছি।

না, তা কেন। কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

মোটেই অবিশ্বাস্য নয়। অনেক দিন থেকে ওর উপরে চোখ ছিল।

কার তা তো বললে না।

সব বলবো, বলবো বলেই এসেছি। বাকিটুকু পথে যেতে যেতে বলবো, নাও এখন রওনা হও।

দাঁড়াও আসছি, বলে সে একেবার ভিতরে গেল। ভিতরে গিয়ে সম্মুখে পেলো গুরবচন সিংকে। তাকে বলল, আমি শাহ্‌জাহানাবাদে চললাম, আজকে না ফিরতেও পারি।

তারপরে বেরিয়ে এসে রুমালীকে বলল, এবারে চলো।

কিছু দূর এসে জীবন বলল, এবারে খুলে বলো ব্যাপারটা। কে নিয়ে গিয়েছে তুলসীকে লুটে।

শাহ্‌জাদা মীর্জা আবুবকরের লোক।

কেন ?

কিঞ্চিত বিরক্তির সঙ্গে রুমালী বলে উঠল, কেন আবার কি ? যুবতী মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় আবার কেন ?

এ কাজ তো করে গাঁওয়ার লোকে। এ কি বাদশাজাদার উপযুক্ত কাজ !

কাজটা তো বাদশাজাদা করেন না, তিনি করেন ফলটা উপভোগ।

অন্য কোন উত্তর না পেয়ে জীবন বলে, বলো কী ?

গরীবের কুঁড়ে ঘর থেকে তহশিলদারের আদায়ীকৃত পয়সা বাদশার সম্মুখে যখন গিয়ে উপস্থিত হয় তখন মোহর। জীবন, তুলসীহরণ গাঁওয়ারের যোগ্য, তুলসী উপভোগ বাদশাহী ব্যাপার।

তা যেন বুঝলাম, হঠাৎ এমন হ'তে গেল কেন ?

হঠাৎ কোথায় ? আগেই তো বললাম যে—অনেক দিন থেকেই ওর উপরে নজর ছিল।

খুলে বলো।

তখন দুজনে কখনো পাশাপাশি, কখনো আগুপিছু চলতে চলতে কথা হ'তে থাকে। তুলসী সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনা, লালকেল্লার বিবরণ, ইমানী বেগমের কুঠির বিবরণ সমস্ত বিবৃত করে রুমালী। তুলসীর কাছেই সব কথা শুনেছিল তবে তুলসী কখনো স্বরূপের হস্তক্ষেপের উল্লেখ করে নি, তাই স্বরূপের নাম এ প্রসঙ্গে কোন পক্ষ থেকেই হ'ল না। সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বিবৃত ক'রে রুমালী বলল, এবারে সব শুনলে তো।

জীবন বলে, শুনলাম কিন্তু বুঝলাম না আমি কি করবো। একদিকে মীর্জা নিম্‌চী পল্টন, র একদিকে চাকী অবস্থায় আমি একা কি করতে পারি?

তবে ঘোমটা মাথায় দিয়ে বসে বসে কাঁদো।

কাঁদতেই বা যাবো কেন?

ভালোবাসার পাত্রের অপমানে পুরুষে রক্তপাত আর মেয়েরা অশ্রুপাত করে। তুমি যখন পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেছ, চোখের জল ছাড়া আর কি তোমার হাতে রইলো?

কিন্তু এখানে ভালোবাসা কোথায় দেখলে?

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায় রুমালী, দুই চোখ জীবনের দুই চোখের উপরে স্থাপিত ক'রে বলে, দ্যাখো জীবন, মেয়েদের নজর এড়িয়ে ভালোবাসা যায় না।

তার মানে তুমি বলতে চাও তুলসীকে আমি ভালোবাসি?

শুধু আমি কেন, আমার বাড়ির প্রত্যেকখানা পাথর ঐ কথাই বলে।

রুমালী ক্ষেপে উঠেছিল, জীবনেরও ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থা।

সে চীৎকার ক'রে বলে উঠল, তুমি বলতে চাও আমি ভালবাসি ঐ স্বৈরিণী মেয়েটাকে!

মনের মধ্যে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে রুমালী বলে ওঠে, স্বৈরিণী? কাকে বলছ স্বৈরিণী।

তুলসীকে।

তুলসী স্বৈরিণী! কি বলছ জীবন?

যে নারী বিনা আহ্বানে পরপুরুষের শয্যায় যায়, স্বৈরিণী ছাড়া সে আর কী?

পরশু রাতের কথা বলছ? শুধোয় রুমালী।

তুমি জানলে কি ক'রে? দেখেছিলে?

সে তুলসী নয় জীবন, সে আমি!

সে তুমি?…তুমি! তুমি!

পাথরের মতো স্থাণু হয়ে গিয়েছে জীবন।

কি ভাবছ?

কি ভাবছে জীবন? সে কি নিজেও জানে কি ভাবছে? সেই রাত্রির পর থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত তার চিন্তাস্রোত এক খাতে চলছিল আর তার

পরেই অগ্নিগর্ভ ভূমিকম্পের ধাক্কায় তা মুহূর্ত-মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলল অন্য খাতে। এই চলাচলের উপরে তার কোন হাত নাই, সে অসহায় দ্রষ্টা মাত্র।

কি গো, বিস্ময়ের চমক কাটলো?

জীবন তাকিয়ে দেখে যে, রূমালীর দুই চোখে কৌতুকের খদ্যোত।

আর কিছু বলবার না পেয়ে জীবনের মুখ দিয়ে বের হয়, তুমি যেতে গেলে কেন?

কেন না যাবো?

তুমিই তো বললে, আমি তুলসীকে ভালোবাসি।

বাসোই তো। কিন্তু ভালোবাসার সঙ্গে শয্যাবিলাসের কি সম্পর্ক? ওটা তো নিছক দেহের ব্যাপার।

তুমি বলতে চাও দেহের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক নেই?

নেই মনে করলে যদি দুঃখ পাও তবে ধরে নাও যে আছে।

কেমন?

যেমন দেহের সঙ্গে দেহের ছায়ার সম্পর্ক। দেহ না থাকলে ছায়া থাকে না, তাই বলে দেহটা ছায়া নয়।

এসব কথা, এ জাতীয় দৃষ্টি জীবনের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সে কেবল এইটুকু বোঝে যে সে নিতান্তই নাবালক।

কি যাবে, না এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে?

জীবন বলে, রূমালী, তুমি কি দেহটা ছাড়া আর কিছুই বোঝ না?

দেহটাই কি ছাই সব বুঝি? তবে এইটুকু বুঝি যে-দেহের জন্ম অনেক কষ্ট, অনেক শ্রম স্বীকার করতে হয়—সেই দেহ থেকে যদি কিছু সুখ আদায় ক'রে নেওয়া সম্ভব হয় তবে ক্ষতি কি?

তাই বলে যাবে বিনা আহ্বানে?

দুর্ভিক্ষের ক্ষুধায় তো আহ্বানের অপেক্ষা করলে চলে না।

কিন্তু এ যে পরপুরুষ!

ক্ষুধার সঙ্গে খাদ্যের যে নিত্য সম্বন্ধ!

এসব কথার কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না জীবন, অথচ চুপ ক'রে থাকাও চলে না। তাই বলল, তুমি গিয়েছিলে—আমি ভেবেছিলাম তুলসী।

তুলসী ভেবে আনন্দ পেয়েছিলে, এখন আমি জানায় অনুশোচনা হচ্ছে, কি বলো?

জীবন বলে, অনুশোচনা তখনো হয়েছিল, এখনো হচ্ছে। তুলসীর উপরে

আমি অবিচার করেছি।

আর আমার উপরে খুব সুবিচার হয়েছে, না?

তুমি তো ভালোবাসা চাও নি?

আরে দেহের দামটাই কোন্ দিলে?

ভালবাসা ছাড়া দেহের সম্পর্কে আমি বিশ্বাস করি না।

জীবন, তোমার বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে সংসার চলে না। অনেকের এখনো বিশ্বাস পৃথিবী তিন-কোণা। তাতে কী আসে যায় বলো। তোমার এখনো অনেক শিক্ষা বাকি।

তোমারও।

আবার দুজনে চলতে থাকে, দুজনের চলার পথ এক, কিন্তু চিন্তার পথ আলাদা।

তুলসী সম্বন্ধে অমূলক ধারণা পোষণ ক'রে তার উপরে অবিচার করেছিল এই বোধটি স্পষ্ট হয়ে উঠবামাত্র জীবনের মন অনুশোচনায় ভরে গেল। অনুশোচনা থেকে এল প্রায়শ্চিত্তের আকাঙ্ক্ষা, প্রায়শ্চিত্তের আকাঙ্ক্ষা থেকে এলো করুণা, করুণা থেকে প্রেম। তখন মনের শিখরে শিখরে জমাট প্রেম নেমে এলো সমস্ত বাধা-বন্ধ ডিঙিয়ে প্রচণ্ড বন্যায়। জীবন সংকল্প করলো, যেমন ক'রেই হোক তুলসীকে রক্ষা করবে। কিন্তু কি ক'রে? সে একাকী আর একদিকে প্রবল শাহ্‌জাদা। হঠাৎ তার সম্মুখের অন্ধকার বিদ্যুৎ-চমকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুক্তির উপায় পড়লো তার চোখে। প্রেমে সাহস, প্রেমে বল, প্রেমে কৌশল।

তুলসীর প্রতি করুণায় তাকে উদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ করেছিল রুমালী। কিন্তু এখন যখন জানতে পেলো তুলসীবোধে জীবন তাকে গ্রহণ করেছিল, যা কিছু আনন্দ পেয়েছিল তুলসীবোধে—তখন মুহূর্তের মধ্যে নিদারুণ হিংসায় তার মন ভরে গেল। ওঃ, সে কেউ নয়, তার দেহটাও কিছু নয়—সবই তুলসীময় জীবনের কাছে। তাই তার এত আগ্রহ তুলসীকে উদ্ধারে। বুঝলো যে তুলসী উদ্ধার পেলে চিরকালের জন্য তাকে বিদায় নিতে হবে জীবনের মন থেকে। তুলসী, তুলসী, তুলসী! সে ভেবে পায় না কি আছে ঐ প্যানপেনে ঘ্যানঘেনে বরফের মতো ঠাণ্ডা মেয়েটায়। মরুক তুলসী, কিছুতেই সে যেতে দেবে না জীবনকে তুলসী উদ্ধারে।

রুমালী বলল, জীবন, তুমি না-ই গেলে।

কেন?

তুমি একা।

তা জেনে-শুনেই এসেছি।

তুমি নিরস্ত্র।

একেবারে নই, আছে পিস্তলটা। ভালো, তুমি এক কাজ করো, পিস্তলটা নিয়ে যাও।

কেন?

যদি সংবাদ পাও যে আমি মারা গিয়েছি তবে ঐ পিস্তলটা দেখলে মাঝে মাঝে আমাকে মনে পড়বে।

এমন কঠিন সঙ্কটের মধ্যে না-ই গেলে জীবন।

জীবন সে কথার উত্তর না দিয়ে পিস্তলটা খুলে রুমালীর হাতে দিলো।

একা কি করবে?

পাঁচ হাজার লোক নিয়েও তো কোম্পানী এখনো জয় করতে পারলো না দিল্লি।

তবে কেন এমন কাজে যাচ্ছ?

জীবন কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, নসিব।

তুলসী তোমার কে?

সে কথার উত্তর দিল না জীবন, কেবল একবার তাকালো রুমালীর দিকে। সেই চাহনিতেই উত্তর লিখিত ছিল, কিন্তু পড়বার মতো মনের অবস্থা ছিল না তার।

জীবন দিলমঞ্জিল প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল। রুমালী দাঁড়িয়ে রইলো পাথরের মূর্তির মতো। তারপরে জীবন পথের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলে সে এক দৌড়ে বাড়িতে ফিরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো। তার সম্পূর্ণ পরাজয় হয়েছে, নিশ্ছিদ্র নিরেট পরাজয়, কোথাও এতটুকু আশার রশ্মি নেই। চিরহাস্যময়ী অবাক হয়ে গেল, এত চোখের জলও সঞ্চিত ছিল তার মনের মধ্যে!

॥ ১৮ ॥

"None but the brave,
None but the brave,
None but the brave
deserves the Fair."

জীবনলাল সহজেই দিলমঞ্জিল প্রাসাদে ঢুকে পড়লো, সদর দরজার পাহারা-অলারা তাকে চিনতো তাই বাধা দিলো না। দোতলায় উঠবার মুখে তার দেখা হ'ল শাহ্‌জাদার খাস-খানসামা চুনিলালের সঙ্গে। সে জানতো যে, জীবনলালের গোপন যাতায়াত আছে শাহ্‌জাদার কাছে, তাই সে-ও বাধা দেওয়ার কথা চিন্তা করলো না। সে দোতলার হলঘরটাতে ঢুকে দেখতে পেলো যে মীর্জা আবুবকর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ঝিমোচ্ছে, পাশে একজন সেতারী ব'সে সেতার বাজাচ্ছে কিন্তু স্পষ্টতঃ সেদিকে কারো মন নেই, না বাদকের না শ্রোতার। তখন সবে ঝাড়ে আলো জ্বালা হয়েছে, আর কিছুক্ষণ পরে জ্বাললেও ক্ষতি ছিল না, দিনের আলো তখনো মিলিয়ে যায় নি।

জীবন কুর্নিশ ক'রে বলল, শাহ্‌জাদা।

জীবনের কণ্ঠস্বরে তন্দ্রা ভেঙে জেগে উঠল মীর্জা আবুবকর, ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখে নিয়ে জীবনকে চিনলো। বলল, কোম্পানীর রেসালাদার! কি খবর?

জীবন বিনা ভূমিকায় বলল, তুলসীবাঈকে ছেড়ে দেওয়ার হুকুম দিন।

বাদশাহীর এমন দুঃসময়েও এমন আদেশাত্মক অনুরোধ শুনতে অভ্যস্ত নয় শাহ্‌জাদার কান।

মীর্জা আবুবকর হকচকিয়ে গেল, লোকটা বলে কি! তখনি বুঝলো লোকটা যাই বলুক ঐ সাড়ে ছ'ফুট খাড়াই জঙ্গী মানুষটাকে অস্বীকার করবার তো উপায় নেই। তাই শুধালো, কি বলছ?

বলছি যে তুলসীবাঈকে ছেড়ে দেওয়ার হুকুম দিন।

মনে মনে চমকে ওঠে শাহ্‌জাদা, এ লোকটার সঙ্গে কি সম্বন্ধ তার? মুখে বলে, কে তুলসীবাঈ, আমি চিনি না তাকে।

খুব চেনেন শাহ্‌জাদা। তুলসীবাঈ সুখানন্দ পণ্ডিতের মেয়ে। আজ দুপুরবেলা যাকে আপনার ফৌজ গিয়ে লুটে নিয়ে এসেছে।

লুটে নিয়ে এসেছে থেকেই বোঝা উচিত যে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে আনে নি।

সেই জন্যেই তো এসেছি ছেড়ে দেওয়ার আরজি নিয়ে।

তুমি তো বড় বেয়াদব হে।

তারপরে একটু থেমে বলে, তোমাকে তো দেখছি একা, সঙ্গে একটা হাতিয়ারও নেই, তবে কিসের জোরে এসেছ তার মুক্তির দাবী নিয়ে!

তারপরে ব্যঙ্গের সুরে বলে, ওঃ বুঝেছি, জেনারেল উইলসন পাঠিয়েছে তোমাকে, তুলসীকে নিয়ে যেতে হবে তাঁর তাবুতে। তাকে ব'লো, শাহ্‌জাদার চাখা হয়ে গেলে আওরতটাকে পাঠিয়ে দেব কোম্পানীর ছাইনিতে।

জীবন গর্জে ওঠে, সাবধানে কথা বলবেন শাহ্‌জাদা।

এবার সোজা হয়ে বসে আবুবকর, বলে, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়। কোন্ সাহসে, কোন্ বলে এসেছ তুলসীবাঈ-এর মুক্তির দাবী নিয়ে, শুনতে পাই কি?

অবশ্যই পাবেন শাহ্‌জাদা। শাহ্‌জাদার নিশ্চয় মনে আছে যে কোম্পানীর জেনারেলের কাছে শাহ্‌জাদা চিঠি পাঠিয়েছিলেন আমার হাত দিয়ে।

তাতে কি হয়েছে?

এখনো শেষ করি নি আমার বক্তব্য। সে চিঠিখানা এখনো আমার কাছে রয়েছে।

বেশ, তাতে কি হ'ল?

হ'ল এই যে, সে চিঠি বখৎ খাঁর হাতে পৌছে দিতে পারি।

এবারে নিদারুণ সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আবুবকরের কাছে। কিন্তু ভাঙে তবু মচকায় না, বলে, তাতে কি হবে?

সে কথা আমার চেয়ে বেশি জানেন শাহ্‌জাদা। বখৎ খাঁর ফৌজ যখন জানবে, দিল্লিবালা ফৌজ যখন জানবে, তামাম হিন্দুস্থানের সিপাহী ফৌজ যখন জানবে শাহ্‌জাদা বেইমানী করছে, তলে তলে কোম্পানীর সঙ্গে আপস করছে তখন,—তখন কি হবে শাহ্‌জাদা নিজেই বলুন।

মীর্জা আবুবকর আগেই সন্দেহ করেছিল এখন স্পষ্ট বুঝতে পারলো ঐ চিঠিখানার সূত্রে সে অসহায়ভাবে করায়ত্ত ঐ রেসালাদারটার। কিন্তু তবু মচকাতে চায় না, বলে, জানো চিঠিখানা কেড়ে নিতে পারি।

শাহ্‌জাদা কি আমাকে এমন নির্বোধ ভেবেছেন যে, চিঠিখানা সঙ্গে নিয়ে আমি এসেছি এখানে?

জানো, তোমাকে গ্রেপ্তার করতে পারি।

তবু চিঠিখানা রয়ে যাবে আমাদের হাতেই !

জানো, তোমাকে খুন করতে পারি।

সে সম্ভাবনা বিবেচনা ক'রেই ব্যবস্থা ক'রে এসেছি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমি না ফিরলে চিঠিখানা যেন পৌঁছয় বখৎ খাঁর হাতে।

অতঃপর কি বলবে ভেবে পায় না আবুবকর।

তখন জীবন বলে ওঠে, খুনের বেশি আর কিছু তো করতে পারেন না। তবে এখন মেহেরবানি করে তুলসীবাঈকে মুক্তির হুকুম দিন।

চুপ ক'রে থাকে আবুবকর।

তখন জীবন বলে, শাহ্‌জাদার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে, রাত বারো-টার মধ্যে আমি বৃটিশ ছাউনিতে না ফিরে গেলে চিঠিখানা রওনা হয়ে যাবে বখৎ খাঁর শিবিরে।

রুমালীর কথা শুনে তুলসীর উদ্ধার কার্যে আবুবকরের চিঠিখানার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল জীবন। তাই পিস্তলটা খুলে দিয়ে দিয়েছিল রুমালীর হাতে। আবুবকরের সঙ্গে তার পরবর্তী কথাবার্তা তার উপস্থিত বুদ্ধির ফল।

রাগে লজ্জায় ক্ষোভে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল আবুবকরের। তবু প্রকৃত মনোভাব চেপে শুধালো, তবে এখন কি করতে হবে বলো।

বহুৎ মেহেরবানি শাহ্‌জাদার। আগে এখানে এখনি নিয়ে আসতে বলুন তুলসীবাঈকে।

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল চুনিলাল, শাহ্‌জাদা ইঙ্গিতে তাকে হুকুম করলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দীনবেশিনী তুলসী এসে দাঁড়ালো। জীবনকে দেখে অবাক হয়ে গেল, ভাবলো, এ আবার কোন্ দুঃস্বপ্ন !

এবারে জীবন বলল, শাহ্‌জাদা, এবারে তুলসীবাঈ-এর জন্যে তাঞ্জাম আর আমার জন্যে ঘোড়ার হুকুম ক'রে দিন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চুনিলাল ফিরে এসে জানালো, দু-ই প্রস্তুত।

তুলসী চলো, ব'লে শাহ্‌জাদাকে কুর্নিশ করলো জীবন। তারপরে দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, শাহ্‌জাদা, দিল্লি শহরে কারো যদি তুলসীবাঈয়ের কেশাগ্রস্পর্শ করবার দুরাকাঙ্ক্ষা থাকে তবে তাকে মনে করিয়ে দেবেন যে, একখানা চিঠি আছে আমার কাছে। আর এখন আমাদের পথে যদি কোন বাধাবিঘ্ন আসে তবে যথাসময়ে সেই চিঠি পৌঁছে যাবে বখৎ খাঁর কাছে।

এই ব'লে সে আর একবার সেলাম ক'রে তুলসীকে হাতে ধরে নিয়ে বের হয়ে গেল। কিছুক্ষণ অবধি ব্যর্থ আক্রোশে সেদিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মীর্জা আবুবকর ব'লে উঠল, শয়তান, শয়তান, বিলকুল শয়তান।

নিচতলায় এসে জীবন বলল, চুনিলাল ভাই, সঙ্গে একজন আহেদি দাও।

চুনিলাল ডাকলো, অনুপসিং।

একজন প্রৌঢ় রাজপুত কাছে এসে বলল, কি হুকুম।

এই তাঞ্জামের সঙ্গে তুমি যাও, কেউ যেন হাঙ্গামা না বাধায় দেখো।

অনুপসিং শুধোয়, কোথায় যেতে হবে ?

চুনিলাল বলে, সুখানন্দ পণ্ডিতের কুঠীতে।

জলজল ক'রে ওঠে অনুপসিং-এর চোখ, শুধোয় কোথায় তার বাড়ি ?

তুলসীর কাছে থেকে জেনে নিয়ে চুনিলাল বলে, ফুলকা-মণ্ডী।

তাঞ্জামের সঙ্গে দুই ঘোড়ায় জীবন ও অনুপসিং রওনা হয়ে যায়।

॥ ১৯ ॥

প্রত্যাবর্তন

তুলসীর তাঞ্জাম বাড়িতে পৌঁছবামাত্র অপ্রত্যাশিত আনন্দের আতিশয্যে ভূতিবুড়ী ডুকরে কেঁদে উঠল। গলি দিয়ে জন দুই লোক যাচ্ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে বলে উঠল, আহা কে যেন মারা গেল। গভীর আনন্দ ও গভীর দুঃখের অভিব্যক্তি প্রায় অভিন্ন। অবশ্য তাঞ্জাম পৌঁছবার সময়ে প্রথমে দু'এক মুহূর্ত তার কেটেছিল অভিভূতভাবে। যাকে মৃত ব'লে বিশ্বাস ক'রে কান্নাকাটি শেষ ক'রে শান্ত হয়েছে এমন সময়ে তার অকস্মাৎ সুস্থ শরীরে প্রত্যাবর্তন। ভূতি বুড়ী তুলসীকে বুকে জুড়িয়ে ধরে তারস্বরে ডুকরে উঠল, কর্তাবাবু, ও দাদাবাবু, তোমরা এসে গ্যাখো, কে এসেছে। কোন রকমে তার হাত থেকে তুলসী মুক্তিলাভ করতেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভূতি বুড়ী বাড়ির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিল।

ইতিমধ্যে জীবন তাঞ্জাম ঘোড়া ও অনুপসিংকে বিদায় ক'রে দিয়ে বাইরের ঘরে বসে ছিল। তুলসী বলল, বুড়ী অত চেঁচাস নে, বাইরের ঘরে ভদ্রলোক আছে।

ভদ্রলোক ! বুড়ী চমকে ওঠে। শুধোয়, ভদ্রলোক আবার সঙ্গে কে এলো ?

তবে কি আমি একা আসবো?

বুড়ী কণ্ঠ খাটো ক'রে শুধোয়, সিপাহীদের লোক তো নয়।

সিপাহীদের লোক নয়, খাস সিপাহী।

খাস সিপাহী শুনবামাত্র সে আর এক দফা ডুকরে ওঠে।

তুলসী ধমক দেয়, থাম্‌। তারপরে জিজ্ঞাসা করে, বাবা কোথায়?

সেই যে দুপুরবেলা বের হয়েছে এখানো ফেরে নি।

দাদা?

দাদাবাবু তো আজ দুদিন বাড়ি ছাড়া।

খাবার কিছু আছে, না-তা-ও বাড়ি ছাড়া!

এতক্ষণে বুড়ীর হুঁশ হ'ল যে খেতে দেওয়া আবশ্যক, তাই আপাতত আনন্দের কান্না সংযত ক'রে ভাঁড়ার ঘরের দিকে ছুটলো।

দুজনের মতো আনিস।

আর একজন কে?

ঐ যে বাইরের ঘরে বসে আছে। না রে ভয় নেই, সিপাহী নয়।

তবে কে?

সত্যই তো কে! কি পরিচয় দেবে ভেবে পায় না তুলসী—অথচ কিছু না বললেও নয়। তাই-ব'লে উঠল, আমার এক রকম দাদা।

আবার দাদা! ডুকরে ওঠে ভূতি বুড়ী।

কাঁদিস কেন?

কাঁদবো না! এক স্বরূপ দাদা এই কাণ্ডটি ক'রেছিল আবার সেই দাদা। স্বরূপ দাদা নিয়ে গিয়েছিল আর এক দাদা ফিরিয়ে আনলো।

তারপর শুধোয়, হ্যাঁ রে, স্বরূপ দাদার খবর কি?

সে কি আর আছে? সিপাহীরা তাকে কোতল ক'রে ফেলেছে।

কোতল ক'রে ফেলেছে, বলিস কি?

তাছাড়া আর কি হবে? বেঁচে থাকলে নিশ্চয় আসতো এ বাড়ি।

সুখানন্দর কাছে তুলসী শুনেছিল যে, স্বরূপ দিল্লি ছেড়ে চলে গিয়েছে, এখন শুনলো যে সিপাহীরা তাকে কোতল ক'রে ফেলেছে। অবশ্য সুখানন্দের কথার মূল্যই বেশি, তবু অশুভ সংবাদের আশঙ্কা কাটতে চায় না।

দুজনে অন্দরমহলে কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময়ে সুখানন্দ পণ্ডিত বাড়িতে প্রবেশ করলো। বাইরের ঘরের আলো-আঁধারিতে উপবিষ্ট জীবনকে প্রথমটায় সে চিনতে পারল না, বলল, কে?

চিনতে পারছেন না পণ্ডিতজী, আমি জীবনলাল!

তাই বলো, জীবনলাল, রুমালীর ভাই। তা হঠাৎ কি খবর বাবা?

ভিতরে যান, তুলসীকে এনেছি।

হঠাৎ আনতে গেলে?

সে অনেক কথা, পরে শুনবেন, আগে একবার দেখা দিয়ে আসুন।

সে-ই ভালো, তুমি ব'সো, আমার দেরি হবে না।

স্থখানন্দ অনেকদিন থেকে মন ঠিক করছিল তুলসী সম্পর্কিত প্রকৃত বিবরণ বলবে নয়নকে। কিন্তু বলা হয়ে ওঠে নি। প্রথম কথাটা কিভাবে আরম্ভ করবে ভেবে পায় নি। তাছাড়া নয়ন বাড়িতে বড় থাকতো না। ভূতি বুড়ীকে আগে বলবার কথা ভাবতেই পারা যায় না। কাজেই কথাটা মনের মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল। অবশ্য গালিব সাহেবকে সব কথা খুলে বলেছিল। দুইজনে পরামর্শ করে স্থির করেছিল যে, এখন যেমন চলছে চলুক, পরে ক্ষেত্রে কর্ম বিধিয়তে। কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ এসে পড়লো তুলসী। স্থখানন্দ ভাবলো, গালিব সাহেবকে খবরটা দিয়ে আসা যাক, অমনি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে—তুলসীকে বাড়িতেই রাখা উচিত, না আর কোথাও লুকিয়ে রাখা আবশ্যক। তুলসীকে অপেক্ষা করতে বলে, ভূতি বুড়ীকে ভালো করে রান্না করবার আদেশ দিয়ে স্থখানন্দ রওনা হয়ে গেল গালিবের বাড়ির দিকে।

স্থখানন্দ নেই, ভূতি বুড়ী রান্নাঘরে—এই স্থযোগে তুলসী প্রবেশ করলো বাইরের ঘরে, যেখানে বসে ছিল জীবন। সেখানে গিয়ে বিনা ভূমিকায় শুধালো—আচ্ছা, রুমালী তোমার কি রকম বোন?

এই প্রথম তুলসীর মুখে 'তুমি' সম্বোধন। মরুভূমির বৃষ্টিকণার মতো ঐ দুটি অক্ষর বর্ষিত হ'ল জীবনের মনের মধ্যে। তার দেহের শিরায় শিরায় আনন্দের দৌত্য শুরু হয়ে গেল। 'তুমি', 'তুমি', 'তুমি'!! এতদিন যারা সন্তর্পণে শিষ্ট দূরত্ব রক্ষা ক'রে আসছিল, সঙ্কটের ধাক্কায় আজ তারা অকস্মাৎ কাছাকাছি এসে পড়েছে—তাই আপনির কুঁড়ি ভেদ ক'রে ফুটে উঠেছে 'তুমি'র প্রস্ফুট গোলাপ। 'আপনি' আত্মীয়তার বৈঠকখানা, 'তুমি' আত্মীয়তার অন্দরমহল।

কি, উত্তর দিচ্ছ না যে।

চমকে ওঠে জীবন। সত্যিই তো, সে উত্তর দেয় নি তুলসীর প্রশ্নের। নূতন অভিজ্ঞতার স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছিল এতক্ষণ, ভালো ক'রে শোনে নি প্রশ্নটা।

তাই শুধালো, কি বলছিলে ?

রুমালী তোমার কি রকম বোন ?

আদম আর হবার সম্পর্কে বোন।

বুঝতে পারে না তুলসী, শুধোয়, সে আবার কি ?

বুঝলে না ? আদিম নরনারী আদম আর হবার গল্প শুনেছ তো।

শুনেছি।

বেশ, তাদেরই সন্তান পরবর্তী যাবতীয় নরনারী, কাজেই তারা ভাইবোন ছাড়া আর কি। রুমালী সেই সম্পর্কে বোন। বুঝলে এবারে !

তুলসী বলে, তার মানে বোন নয়, কেউ নয়। ওর বাড়ি আর তুমি যেতে পাবে না।

এমন একটা অনুশাসন যে তুলসীর মনে উদ্যত বুঝতে পারে নি জীবন, তাই অকৃত্রিম বিস্ময়ে শুধালো, কেন বলো তো ?

রুমালী ভালো মেয়ে নয়।

এবারে বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়ে জীবনের। অবশ্য রুমালী যে সামাজিক বিচারে ভালো মেয়ে নয়, জীবনের চেয়ে কেউ বেশি জানে না। কিন্তু তাকে খারাপ বলতে বাধে। খারাপ লোকে কি এলবিয়ন বিবি আর তুলসীকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দেয় ? খারাপ লোকে কি তুলসীকে উদ্ধার করবার জন্যে এমন উদ্যম করে।

জীবনকে নীরব দেখে তুলসী বলে, মনে থাকবে তো ?

কিন্তু তুমি ওকে খারাপ বলছ কেন ?

ভালো নয় বলেই বলছি।

তোমার জন্যে যা করেছে, এলবিয়ন বিবির জন্যে যা করেছে, তার পরেও বলছ ?

তারপরেও বলছি আর চিরকাল বলবো।

জীবন দেখলো এ তর্কের শেষ হবে না, তাই বলল, আচ্ছা দেখা যাবে।

সে রাত্রে জীবন ও তুলসী দুজনেই বিঘ্নিতনিদ্রা। মাঝে মাঝে জেগে উঠতেই জীবনের মনে পড়ে ঐ 'তুমি' সম্বোধন। নূতন পরিহিত রত্নহারের অপ্রত্যাশিত স্পর্শে চমকে চমকে ওঠে মনটা। আর বারে বারে জেগে জেগে ওঠে তুলসী, কেবলি মনে পড়ে রুমালীর ভাই নয় জীবন। এতদিন ওদের ভাই-বোন ভেবেছিল তাই কতকটা সহ্য হয়েছিল, কিন্তু এখন যখন জানে

যে ওদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক নেই, মনের মধ্যে কত রকম সন্দেহ ফণা তুলতে থাকে। সে বোঝে যে জীবনের নিশ্চয় টান আছে তুলসীর উপরে, নতুবা গুরুতর বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে যেতো না তাকে উদ্ধার করতে। রাস্তায় যখন তাঞ্জাম আর ঘোড়া পাশাপাশি চলছিল তখন তাকে উদ্ধার করতে আসবার কতক সংবাদ প্রশ্ন ক'রে শুনে নিয়েছিল তুলসী। ভেবেছিল, পরে এক সময়ে ধীরেসুস্থে সব শুনে নেবে। কিন্তু তখনো সবচেয়ে মারাত্মক সন্দেহটা জাগে নি তার মনে। বাড়িতে পৌছতেই কেন জানি তার মনে সন্দেহটা প্রশ্নের আকারে দেখা দিল—জীবন সত্যি রুমালীর ভাই তো? না, না, সব ভালো ক'রে শুনে নিতে হবে।

ভোরবেলা উঠতেই সুখানন্দ বলল, মা, জীবনলালজী অন্ধকার থাকতেই রওনা হয়ে গিয়েছে, বলে গিয়েছে দিনের আলোয় তার পক্ষে চলাচল এখন নিরাপদ নয়।

কোথায় গিয়েছে?

জীবন কিছু বলে নি, সুখানন্দও জিজ্ঞাসা করে নি। তবু তার মনে হয় দিল্লি শহরে বোনের বাড়ি ছাড়া আর কোথায় তার নিরাপদ আশ্রয় আছে। তাই সুখানন্দ বলল, রুমালীর বাড়িতে।

নির্জীবের মতো আবৃত্তি করে তুলসী, রুমালীর বাড়িতে।

তারপরে আর কোন কথা না বলে তখনি আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় ভাগের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ ১ ॥

"মোরে হিন্দুস্থান
বার বার করেছ আহ্বান
কোন্ শিশুকাল হতে পশ্চিম দিগন্তপানে
ভারতের ভাগ্য যেথা নৃত্যলীলা করেছে শ্মশানে,
কালে কালে
তাণ্ডবের তালে তালে
দিল্লিতে আগ্রাতে।"

সমস্ত হিন্দুস্থান নিশ্বাস রোধ ক'রে দিল্লির দিকে তাকিয়ে আছে—কি হয়, কি হয়।

এদিকে দিল্লি শহরের পশ্চিম দিকের পাহাড়টার উপরে, কালবৈশাখীর আকাশে যেমন ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষিতে মেঘ জমে উঠতে থাকে, দূর দূরান্ত থেকে আগত ছোট বড় সৈন্যবাহিনী এসে জমায়েত হচ্ছে। মুলতান, পেশবার, রাবলপিণ্ডি, কাশ্মীর, জম্মু, পাঞ্জাব, ঝিন্দ, নাভা, পাতিয়ালা, কপূর্রতলা—কত দেশ দেশান্ত থেকে; বালুচ, পেশবারী, কাশ্মীরী, শিখ, জাঠ, গুর্খা, গোরা বিভিন্ন জাতের; পদাতিক, ঘোড়সওয়ার, গোলন্দাজ, পেশাদার, অপেশাদার বিচিত্র শ্রেণীর; ঘোড়া, হাতী, উট, বলদ বিবিধ বর্ণের। অবশেষে এক সময়ে আগস্ট মাসের শেষার্ধে মেঘের ব্যূহ রচনা প্রায় সমাপ্ত হয়ে এলো পাহাড়টাকে অবলম্বন ক'রে। আর ওদিকে কলকাতা থেকে পেশবার অবধি, বোম্বাঈ থেকে সিমলা অবধি সমস্ত হিন্দুস্থান—গোরা এবং দেশী সবাই উৎকণ্ঠায় চেয়ে রইলো দিল্লির দিকে, কি হয়, কি হয়।

দিল্লি জরাগ্রস্ত শহর, তার সামরিক মূল্য বেশি নয়, কিন্তু তার নৈতিক মূল্যের সীমা পরিসীমা নেই। এ যেন জরাকাতর মুমূর্ষু বৃদ্ধ বাদশা আলমগীর, তখন যৌবনের তলোয়ারখানা নাড়বার শক্তিও তাঁর অন্তর্হিত, তবু কি হিন্দুস্থানের ভাগ্য নির্ভর করে নি এমনিভাবেই, হিন্দুস্থান কি নিঃশ্বাস রোধ ক'রে থাকে নি তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাস পতনের অপেক্ষায়! দিল্লি বিধাতৃ-নির্দিষ্ট ভারতের সিংহাসন, দিল্লীশ্বর ভারতেশ্বর। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ

কোম্পানীর মুঠোয়; পেশবার, রাবলপিণ্ডি, লাহোর কোম্পানীর কব্জাগত; কানপুর বারে বারে হাত বদলাচ্ছে; লখনৌ সিপাহী সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত। সামরিক গুরুত্ব বিচারে শেষ দুটি শহরের মূল্য সমধিক, ঐ দুই জায়গাতেই কোম্পানীকে সবচেয়ে বেশি লড়তে হয়েছে। কিন্তু হ'লে কি হয়, দিল্লির কাছে কেউ নয়। দিল্লির পতনেই সিপাহী যুদ্ধের মীমাংসা হবে— যদিচ শেষ লড়াইটা তখনো শেষ না হ'তে পারে, আর হয়তো বা তা হবে অন্য কোনো রণক্ষেত্রে—একথা কোম্পানী, সিপাহী; গোরা, কালা, সবাই নিশ্চিতরূপে জানতো।

তাই নববিজিত পাঞ্জাব ও সীমান্তকে প্রায় অরক্ষিত রাখবার ঝুঁকি নিয়েও ঝেঁটিয়ে সৈন্যদল পাঠিয়ে দিলো স্যার জন লরেন্স। পাঞ্জাব থেকে বিচক্ষণ সেনাপতিরা আগেই এসে পৌঁচেছিল দিল্লিতে, এবার শেষ অধ্যায়ে রওনা হ'ল, চব্বিশ পাউণ্ডার ভারি কামান-শ্রেণী নিয়ে, পাঞ্জাবের সেনাপতিদের মধ্যে বিচক্ষণতম জন নিকলসন।

পাঞ্জাবের চীফ কমিশনার স্যার জন লরেন্স চিঠি লিখে দিল্লি ফৌজের প্রধান সেনাপতি আর্চডেল উইলসনকে জানালো যে, পাঞ্জাব অরক্ষিত রেখে শেষ সৈন্যদল পাঠালাম, আর পাঠানো সম্ভব নয়। এই দিয়েই দিল্লি অধিকার করতে হবে। দিল্লি অধিকার করতে অক্ষম হ'লে বা বিলম্ব ঘটলে যে-কোন মুহূর্তে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটতে পারে, তার ফলে পাঞ্জাব যাবে, দিল্লি যাবে, সমস্ত হিন্দুস্থান আবার নূতন ভাবে জয় করতে হবে। স্যার জন লরেন্স ঐতিহাসিক নজীর উদ্ধার ক'রে অভয় দিলো— সৈন্যসংখ্যা মুষ্টিমেয় ভেবে শঙ্কার কারণ নেই। এর চেয়েও অনেক কম সৈন্য নিয়ে ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধ জয় ক'রে কোম্পানীর সাম্রাজ্য পত্তন করেছিল। পত্রের শেষে স্যার জন লরেন্স জানালো, ভারী কামান-শ্রেণী নিয়ে চলল জন নিকলসন, তার নামের মূল্য একটা ফৌজের মূল্যের সমান। এই চিঠি যখন পৌঁছবে ততদিনে নিকলসন পৌঁছে যাবে আম্বালায়। সর্বশেষ পত্রের মর্ম একটি সুভাষিত আকারে লিপিবদ্ধ—উদ্যমে অসম্ভব সম্ভব হয়, নিষ্ক্রিয়তাই সঙ্কট।

চিঠি পড়ে আর্চডেল উইলসন মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। হায়, সে-ও ক্লাইভ নয়, আর সিপাহী ফৌজও আফিঙখোর মীরজাফরের ভাড়াটে পল্টন নয়।

॥ ২ ॥

অনুপ সিংএর পরিক্রমা

তুলসীকে বাড়িতে পৌছে দিয়ে অনেক রাত্রে ফিরে এলো অনুপ সিং। ফিরে এসেই শুনলো যে, শাহ্‌জাদার কাছে তলব হয়েছে। সে গিয়ে কুর্নিশ ক'রে দাঁড়ালো, দেখতে পেলো নির্বাপিত-প্রায় ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় শাহ্‌জাদা তেমনি ব'সে আছে, যেমনটি দেখেছিল যাওয়ার আগে। শাহ্‌জাদা প্রথমটা তাকে দেখতে পায় নি, সামনের দেওয়ালে সে নিবদ্ধদৃষ্টি। অনুপ সিং কি করবে না করবে ভাবছে এমন সময়ে শাহ্‌জাদা ফিরে চাইলো, বলল, ও তুমি এসেছ।

জী জনাব।

কুঠিতে পৌছে দিয়েছ।

অনুপ সিং মাথা নাড়িয়ে জানালো, হাঁ।

কুঠির পথ চেনা হয়ে গিয়েছে?

হাঁ হুজুর।

জীবনলালকে চিনতে পারবে?

হাঁ হুজুর।

সে কোথায় রইলো?

ঐ কুঠিতেই রইলো।

যাও, এখনি গিয়ে কুঠির কাছে দাঁড়িয়ে থাকো, বের হওয়ামাত্র তাকে খুন করবে।

এই বলে গলা থেকে খুলে একছড়া মুক্তার হার তার দিকে ছুঁড়ে দিল আবুবকর।

শির নিয়ে আসলে আরও ইনাম মিলবে, যাও এখন।

কুর্নিশ ক'রে ধীর পদে বেরিয়ে এলো অনুপ সিং। কিন্তু নিজের ঘরে সে গেল না, বের হয়ে পড়লো কুঠির হাতা ছেড়ে। মন্ত্রচালিতের মতো পথ চলতে চলতে হঠাৎ সে হাঃ-হাঃ শব্দে হেসে উঠল। সেই হাসির শব্দে চটকা ভেঙে জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করলো, হাসে কে?

না, সে নিজেই হেসেছে। তখনি মনে পড়লো হাসবার কারণও আছে বটে। এমন অদ্ভুত হুকুম জীবনে শোনে নি। খামোকা একটা লোককে খুন ক'রে আসতে হবে। 'এই নাও ইনাম, আরও মিলবে।' তাজ্জব বটে দুনিয়া।

অথচ এমন ভাববার কথা নয় অনুপ সিং-এর, কারণ আজ ত্রিশ বছর ধরে মনের মধ্যে ছুরি শানাচ্ছে সে।

তখন তার বয়স পনেরো বছর। সন্ধ্যাবেলায় কেবলি বাড়ি ফিরে এসেছে শিকার সেরে, এমন সময়ে দেখতে পেলো অন্ধকারে মুখ অন্ধকার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে রাজীব সিং।

বিস্ময়ে বলে উঠল, চাচাজী, কখন এলেন ?

আজ সকালে জয়পুরে পৌচেছি, তারপরে চলে আসছি এখানে।

অনুপ সিংদের বাড়ি জয়পুরের পুরাতন রাজধানী অম্বরে বা আমেরে।

অনুপ সিং-এর কেমন সন্দেহ হয়, কোথায় যেন একটা গোল ঘটে গিয়েছে।

আপনি একা এলেন আর ভাইসাহেব এলেন না, তাঁর সব কুশল তো।

উত্তর দেয় না রাজীব সিং।

কি চাচাজী, উত্তর দিচ্ছ না কেন ?

নীরব থাকলেই কি দুঃসংবাদকে চাপা দেওয়া যায়—বরঞ্চ তাতেই যে আরও মুখর হয়ে ওঠে। নীরবতা দুঃসংবাদের ভাষা।

রাজীব সিং ব'সে পড়ে। হাতের বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অনুপ সিং তার পায়ের কাছে এসে বসে—বলুন কেমন আছে ভাই সাহেব।

তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে রাজীব সিং বলে, বাচ্চা, অমর সিং আর নেই।

নেই ? চমকে ওঠে অনুপ সিং।—কি বীমার হয়েছিল ?

বীমার নয়, খুন।

খুন ? ক্রোধে বিস্ময়ে দুঃখে গর্জন ক'রে ওঠে সেই কিশোর বীর।

আমার ভাই ভীমের মতো বীর, অর্জুনের মতো যোদ্ধা—কে খুন করলো আমার সেই ভাইকে। বলুন চাচাজী, কার এমন সাহস !

বাচ্চা, লখনৌ শহর নরক, সব কথা বড় হয়ে শুনবে, এখন দরকার নেই। তবে যেটুকু না বললে নয় তাই বলছি। গাজিউদ্দিন শার পরে নবাব হলেন নাসিরউদ্দিন শা। তখন নরকের সবগুলো দরজা খুলে গেল। কী কাণ্ড যে শুরু হ'ল তা বোঝাতে পারবো না। নবাব তো থাকেন গাঁজা গুলি মদ ভাঙ নাচওয়ালী আর ইয়ার-বক্সি নিয়ে, নবাবী করে উজীররা—আগা মীর, ফজল আলি, হাকিম মেহেদি। হাকিম মেহেদির সময়ে অনাচার চূড়ান্তে উঠল।

রাজীব সিং বলে যায়, উৎকট আগ্রহে শোনে অনুপ সিং।

তোমার ভাই অমর সিং-এর উপরে দুটো তালুকের আদায়ী ভার ছিল। হাকিম মেহেদি চায় সেই তালুক দুটো নিয়ে নিজের পেয়ারের লোককে দিতে। তা অমর সিং ছাড়বে কেন? তখন হাকিম মেহেদি চেষ্টায় থাকলো সুযোগ পেলেই খুন করবে। সুযোগ আর মেলে না। অমর সিং সাবধান হয়ে গিয়েছে। অবশেষে অনেকদিন পরে মিললো সুযোগ। শেরবাজার বলে একটা জায়গায় অমর সিং গিয়েছে আদায় করতে। সন্ধ্যাবেলায় তাঁবু খাটিয়ে ব'সে আছে, লোকজনকে পাঠিয়েছে বাজারে সওদা করতে। এমন সময়ে হাকিম মেহেদির লোক এসে তাঁবু ঘেরাও ক'রে ফেলে তাকে আক্রমণ করলো।

শিউরে ওঠে অনুপ সিং।

পাঁচ-ছ'জনে মিলে গলা টিপে শ্বাসরোধ ক'রে তাকে খুন ক'রে ফেলে।

অনুপ সিং-এর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল পড়ে। মরুভূমির জল।

তারপরে?

নবাব সরকার রটিয়ে দিল যে অমর সরকারী তহবিল তছরূপ ক'রেছিল, নিকাশের ভয়ে আত্মহত্যা করেছে। এই বলে লাস দিয়ে দিলো আমাদের হাতে। মৃতদেহ চিতায় তুলে দিয়ে মুখে গঙ্গাজল দেওয়ার জন্যে মুখ ফাঁক করতে গিয়ে দেখি যে ভিতরে—

কী?

কার হাতের আঙুলের দুটো পর্ব।

কার হাতের?

নিশ্চয়ই আততায়ীদের একজনের। মরণ-কামড় দিয়ে ছিঁড়ে নিয়েছে দুটো আঙুলের ডগা।

ওতেই তো সনাক্ত হওয়া উচিত আসামী।

বাবা, সনাক্ত করবে কে? যারা করবে তারাই তো করিয়েছে খুন।

তার মানে আসামী ধড়া পড়ে নি।

ধরবার চেষ্টাই হয় নি। যে রক্ষক সেই তো ভক্ষক।

তা হ'লে ঐ ছিন্ন আঙুল দেখে খুঁজে বের করা যায় আসামী?

হয়তো যায়। কিন্তু করছে কে? তা ছাড়া এত বড় হিন্দুস্থানে কোথায় গিয়েছে সে কে জানে।

আমি খুঁজে বের করবো।

ততদিনে হয় তো বা মরেই যাবে।

চাচাজী, ঐ শয়তানের মরণ আমার হাতে হবে, তার আগে নয়।

সেই দিনের সেই মুহূর্ত থেকে অনুপ সিং-এর ধ্যানজ্ঞান কর্ম চেষ্টা হ'ল প্রতিহিংসা। অবিমিশ্র, একাগ্র, বিশুদ্ধ প্রতিহিংসা।

অমর সিংএর যখন ত্রিশ বৎসর বয়স তখন অনুজ অনুপ সিংএর জন্ম। তার জন্মের কিছুদিন পরেই অল্প দিনের ব্যবধানে পিতামাতার মৃত্যু হ'ল। অমর সিংএর বিয়ে আগেই হয়েছিল, তবে সন্তান হয় নি। অল্প বয়সেই তার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলো। অমর সিং আর বিয়ে করলো না। অনুপ সিংকে একাধারে ভাই আর পুত্র ক'রে পালন করতে লাগলো, আবার অনুপ সিংও জানতো অমর সিং একসঙ্গে ভাইসাহেব আর পিতাজী। আমেরের লোকে বলতো ওরা একালের মানুষ নয়, সেকালের রাম লক্ষ্মণ নাম বদলে জন্ম নিয়েছে। এমন ভাইয়ে ভাইয়ে মিল রামায়ণ মহাভারতের বাইরে তারা কেউ দেখে নি।

অনুপ সিং দেশে থাকে, অমর সিং থাকে অবধ রাজ্যে। অনুপ সিং বলে পাঠায়, ভাইসাহেব, আর পরিশ্রম ক'রে কি লাভ? আমাদের কোন্ অভাবটা আছে? এবারে বাড়ি এসে ব'সো।

অমর সিং বলে পাঠায়, একটা অভাব আছে, তোমার বহু এখনো আসে নি। এবারে দেশে গিয়ে তোমার বিয়ে-সাদি দিয়ে স্থির হয়ে বসবো। আর বিদেশে প'ড়ে থাকবো না।

এমন সময়ে রাজীব সিংএর মুখে এই নিদারুণ সংবাদ। প্রথমে তাকে দেখে ভেবেছিল, ভাইজী বোধ করি আসছে, চাচাজী দুদিন আগে এসে পৌঁচেছে।

তখন থেকে অনুপ সিং-এর জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল। বাড়িঘর জমি-জিরাতের বন্দোবস্ত ক'রে একাকী সে বেরিয়ে পড়লো কর্তিত-অঙ্গুলি সেই আততায়ীর সন্ধানে।

প্রথমে সে লখনৌ এলো। সেখানে এসে দেখলো যে রাজপুত সমাজের অবস্থা অতিশয় অসহায়। রাজপুতদের মাথা যারা, অমর সিং-এর সন্দেহজনক মৃত্যুতে তাদের অনেকে গা-ঢাকা দিয়েছে, অনেকে পালিয়েছে; যারা আছে তারা মুখ খোলে না, হয় ভয়ে, নয় জানে না বলে। একজন জয়পুরবাসী তাকে বলল, আর যাই করো অমর সিং-এর ভাই বলে পরিচয় দিয়ো না, বেঘোরে মারা পড়বে। বছর খানেক কাটালো সে লখনৌ, ফৈজাবাদ, সীতাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। না, কেউ জানে না আততায়ীর সন্ধান, অমর

সিংকেও লোকে ভুলতে বসেছে।

অনুপ সিং বাজারে বাজারে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরে, দৃষ্টি লোকের হাতের দিকে, কর্তিত আঙুল দেখা যায় কিনা। অবশেষে এক বুড়ো রাজপুত, দয়াপরবশ হয়ে জানালো, বাচ্চা, এখানে মিছে খুঁজে মরছো, চিড়িয়া পালিয়েছে।

আপনি চিনতেন তাকে ?

চিনতাম না, দু'চার বার দেখেছি।

নাম কি ?

জানি না। তাছাড়া নাম বদলাতে কতক্ষণ।

কি রকম দেখতে ?

লম্বা চওড়া, গৌরবর্ণ, সুপুরুষ।

মুসলমান ?

না, হিন্দু।

রাজপুত ?

না, শুনেছি বাঙালী।

কোনদিকে গেল জানেন ?

বঙ্গাল মুল্লুকের দিকেই হবে।

সেলাম জানিয়ে বিদায় নেয় অনুপ সিং।

তখন আরম্ভ হয় অনুপ সিং-এর ভ্রমণের রামায়ণ। উত্তর-পশ্চিমে যে সব শহরে বাঙালীর বড় বড় উপনিবেশ ছিল,—বৃন্দাবন, মথুরা, আম্বালা, দিল্লি, কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, পাটনা—সমস্ত জায়গায় যায়, খোঁজ করে লম্বা চওড়া গৌরবর্ণ সুপুরুষের—যার আঙুলের দুটো ডগা নেই। অবশেষে এসে পৌঁছায় কলকাতায়। মস্ত শহর, লখনৌর পরেই। কোথাও মেলে না সন্ধান। আবার ফিরে চলে উত্তর-পশ্চিমে। মাঝে মাঝে দেশ থেকে লোকমুখে সংবাদ পায়—বিষয় সম্পত্তি সব যায় যে, জ্ঞাতি কুটুম্বরা ভাগাভাগি ক'রে নিচ্ছে, শীগগির ফিরে এসো। যারা ভাগ পায় না তারাই জানায়। অনুপ সিং ভাবে জ্ঞাতি-কুটম্ব তো ঐ জন্যেই আছে। সেই তখনকার দিন—যখন রেল গাড়ি ছিল না, এক ক্রোশ পথ যখন দশ ক্রোশের সামিল ছিল, এক দিন সময় যখন দশ দিনের সামিল ছিল—তখন পথে পথে ঘুরে কোথা দিয়ে বছরের পর বছর যায় বুঝতে পারে না হতভাগ্য অনুপ সিং। কেউ তাকে বলে দেয় নি, নিজেও তাকায় নি ফিরে নিজের দিকে। ইতিমধ্যে তার অজ্ঞাতসারে কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে কিশোর হয়েছে যুবক, যুবক হয়েছে

প্রৌঢ়। প্রৌঢ় অনুপ সিং এতদিনে ছেড়ে দিয়েছে আততায়ীকে খুঁজে পাওয়ার আশা। দেশে ফিরে যাওয়া নিরর্থক, জ্ঞাতি-কুটুম্বরা সব ভাগাভাগি ক'রে নিয়েছে। অথচ দিন তো চলা চাই। তাই চাকরি নিল দিলমঞ্জিলে, মীর্জা আবুবকরের কাছে। মাঝে মাঝে সে যেতো ঘণ্টেওয়ালার দোকানে, মখ্খনলাল জয়পুরের লোক।

এমন সময় হঠাৎ দেখতে পায় লম্বা চওড়া গৌরবর্ণ সুপুরুষ একটি লোককে, যার হাতের দুটো আঙুলের ডগা নেই। চমকে ওঠে সে। মনে মনে হিসাব ক'রে দেখে বয়সেও মেলে। কথার সুরে ও শব্দে লখনৌ-এর দরবারী টান।

শুধায়, আপনি কি লখনৌ-বালা ?

হাঁ হাঁ, এক সময়ে ছিলাম বটে লখনৌ শহরে।

আঙুল গেল কি ক'রে ?

হাতখানা সরিয়ে নিতে নিতে বলে, এক সময়ে জঙ্গী আদমি ছিলাম কিনা, অনেক মেরেছি। তেমনি আবার কিছু খোয়াও গিয়েছে। এখন বুড়ো হয়েছি জ্যোতিষ করি।

তারপরে মন্তব্য করে, ভাই, মানুষের হাতে কিছুই নয়—সব ঐ গ্রহ-নক্ষত্রের মুঠোয়।

অনুপ সিং লক্ষ্য করে বক্তার মুখে কেমন যেন অপরাধের ছায়া। ভীত কুণ্ঠিত ভাব।

লোকটা হঠাৎ উঠে বিদায় নিয়ে যায়।

মখ্খনলাল ভাই, লোকটার নাম কি ?

সুখানন্দ পণ্ডিত।

বাড়ি কোথায় ?

এত বড় শহরে কার কোথায় বাড়ি কেমন ক'রে বলবো। আর আমার দরকারটাই বা কি ? আসে, নগদ দাম দিয়ে জিনিস কেনে, ব্যস মিটে গেল। তাই, আমার দরকার খদ্দেরের টাকায়, তার কুঠির পাত্তায় নয়।

অনুপ সিং ভাবে আর ভয় নেই। হিন্দুস্থান জোড়া ফাঁদ গুটিয়ে এসে এখন শাহ্জাহানাবাদে পাতা হয়েছে। এবারে চিড়িয়া ধরা না পড়ে যায় কোথায় ?

বিধাতা যখন খুশী হন তখন একেবারে দরাজ হাতে দান করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই মীর্জা আবুবকরের হুকুমে তুলসীকে পৌঁছে দিতে গিয়ে সুখানন্দ পণ্ডিত আর তার কুঠি, দুয়েরই দেখা মিলে যায়। ব্যস, এখন কেবল একটামাত্র সুযোগের অপেক্ষা। ত্রিশ বৎসরের ভার হাল্‌কা হয়ে যায় তার

ঘাড় থেকে। মনের আনন্দে দ্রুতপদে ফিরে আসে দিলমঞ্জিলে।

এমন সময়ে তার ডাক পড়ে উপরে,‌ শাহ্‌জাদা মুক্তোর হার তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, খুন ক'রে এসো জীবনলালকে, আরও ইনাম মিলবে।

তাজ্জব হয়ে যায় হুকুম শুনে। এইমাত্র সে ভাবছিল মা অম্বরেশ্বরীর কি লীলা, বেটিকে দিয়ে কিনা শেষে দেখিয়ে দিলো বাপের ঘরের পথ। তারপরে শাহ্‌জাদার হুকুম শুনে ভাবল, এ আবার কি লীলা! সুখানন্দকে নয়, ঐ নিরীহ লোকটাকে খুন করতে হবে। পথে বের হয়ে দুই খুনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত ব্যবধান স্মরণ ক'রে সে হোঃ-হোঃ শব্দে হেসে ওঠে। ভাগ্যে তখন পথে লোক ছিল না, নইলে কি ভাবতো।

তারপরে মনের মধ্যে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়—দুই খুনের মধ্যে কত প্রভেদ! এতদিনের সঙ্কল্পে অমর সিং-এর হত্যাকারীকে খুন করা কত অনায়াস হয়ে এসেছিল। খুনের বারো আনাই সে ক'রে ফেলেছে মনে মনে, বাকীটুকু সামান্য দৈহিক ক্রিয়া মাত্র। এই খুন তার কাছে ধর্ম। আবার খুনের আর এক পাইকারী চেহারা দেখতে পেয়েছে সিপাহীর সঙ্গে কোম্পানীর ফৌজের লড়াইয়ের মধ্যে। নিত্য এ ওকে খুন করছে, ব্যক্তিগত কারণের বালাই নেই। এই খুন লোকের কাছে বীরত্ব। দুই-ই সহজ। কিন্তু হঠাৎ যে খুনের হুকুম ক'রে বসে মীর্জা আবুবকর, তা না-ধর্ম না-বীরত্ব, তা নির্যস মনিবের হুকুম তামিল। খুনের এই নির্লজ্জ উলঙ্গ রূপ তাকে ভীত ক'রে তোলে। সে ভাবে, একেই বোধ করি পাপ বলে। সে স্থির করে এ খুন সে করবে না, সম্ভব হ'লে বাধা দেবে। তবে সে গোড়ায় রাজী হয়েছিল তার কারণ মনিবের আদেশ পালনের অভ্যাস। না, খুন সে করতে পারবে না। কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার স্থির করলো স্পষ্টত অস্বীকারও করবে না, কেননা তা হ'লেই হুকুমটা পড়বে আর কারো উপরে, সে নিশ্চয় অনায়াসে হুকুম তামিল ক'রে বসবে। হুকুমটা নিজের হাতেই রাখবে, তা হ'লে হয়তো লোকটা বেঁচে গেলেও যেতে পারে।

কিন্তু কোথায় গেলে পাওয়া যাবে জীবনলালের সাক্ষাৎ। সে যে এখনো সুখানন্দের কুঠিতে আছে তার নিশ্চয়তা কি, আর থাকলেই বা এত রাত্রে তার দেখা পাওয়া যাবে কেন? কিংকর্তব্য আলোচনা করতে করতে সে এগিয়ে চললো ঘণ্টেওয়ালার দোকানের দিকে। রাতে মিঠাই পাকাবার সময়, নিশ্চয় এখনো জেগে আছে মখ্‌খনলাল। কয়েক ধাপ যেতেই দেখতে পেলো একটি মেয়ে হন হন ক'রে এগিয়ে আসছে। মেয়েটি কাছে এসে

পড়তেই সেই অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে পারলো মেয়েটি যে-ই হোক—যুবতী এবং অসামান্যা সুন্দরী।

মেয়েটিই আগে প্রশ্ন করলো, ভাইসাহেব, দিলমঞ্জিল কত দূরে ?

অনুপ সিং বলল, সামনেই, বেশী দূরে নয়। কিন্তু কেন বলো তো ?

সেখানে যেতে হবে আমাকে।

বহিন, তোমার মতো মেয়ের রাতের বেলায় যাওয়ার জায়গা তো সেটা নয়।

তবু যেতে হবে।

কেন বলো তো ?

আমার ভাই গিয়েছে সেখানে, বোধ হয় আটক হয়েছে।

আমি সেখানে কাজ করি। কি তার নাম ?

জীবনলাল।

চমকে ওঠে অনুপ সিং—জীবনলাল ! তবু শুধায়, কি নাম বললে ?

মেয়েটি আবার বলে, জীবনলাল।

মেয়েটি রুমালী।

৩

অন্য যুদ্ধ ভয়াময়া

জীবনলাল দিলমঞ্জিলের দিকে চলে গেল। যতক্ষণ তাকে দেখা গেল দাঁড়িয়ে রইলো রুমালী। তারপরে যখন অন্ধকারের মধ্যে তার পিরানের সাদা নিঃশেষে তলিয়ে গেল তখন সম্বিৎ পেয়ে নিজের দিকে ফিরে তাকালো। হাতে এটা কি ? পিস্তল যে। পিস্তল এলো কোথা থেকে। তাই তো, জীবনলাল দিয়ে গিয়েছিল, জীবনলালের শেষ দান। তখনি জিভ কামড়ে ভাবে বালাই ষাট, শেষ দান হ'তে যাবে কেন ? এখনি সে ফিরে আসবে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে ঠিক কি কথা বলেছিল তার মনে পড়ে না। তবে যে ভাবলো এখনি ফিরে আসবে, তার কারণ জীবনলাল কখনো আসবে না এমন কথা ভাবতেই পারে না সে।

জীবনের অপেক্ষায় পথের ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সে, পথের লোক-চলাচলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। এমন ভাবে কতক্ষণ গিয়েছে জানে না,

হঠাৎ যখন তন্ময়ভাব কাটলো দেখলো যে পথ নির্জন আর আকাশ তারায় পূর্ণ। ওঃ, অনেক রাত হয়েছে দেখছি। তার মনে হ'ল জীবন নিশ্চয় অন্য কোন পথ ধ'রে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। তাই তো, সে কী নির্বোধ, এখানে পথের ধারে দাঁড়িয়ে বৃথা অপেক্ষা করছে। তখনি তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে রওনা হ'ল। বাড়ি পৌঁছে দেখল যে ঘর শূন্য। শূন্য ঘরের মতো দুঃসহ বস্তু অল্পই আছে। তখন সে পিস্তলটা বুকের মধ্যে সজোরে চেপে ধরে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো—ঐ পিস্তলে আছে জীবনের হাতের স্পর্শ, তপ্ত এবং শীতল, কঠিন এবং কোমল, করুণ এবং রূঢ়। তার ইচ্ছা করছিল অস্ত্রটাকে আমূল ঢুকিয়ে দেয় বুকের মধ্যে, পাঁজর ভেদ ক'রে যাতে পৌঁছয় হৃদপিণ্ডের কাছে, দেখে আসুক সেখানে কী কাণ্ডটা ঘটছে। না, পিস্তল তো যায় না। তাই অবশেষে মুখের কাছে টেনে নিয়ে এসে সহস্র চুম্বনে তাকে তপ্ত ক'রে তোলে, চুম্বনে এবং চোখের জলে। তার দুই চোখে আষাঢ়ের বন্যা। তা'হলে রুমালীও কাঁদে।

ছেলেবেলায় সে অত্যন্ত দুরন্ত ছিল। মা কত মারতো। কিন্তু কখনো কিছুতেই এক ফোঁটা জল পড়ে নি চোখে। সেটা অবাধ্য তার লক্ষণ মনে ক'রে প্রহারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিত মা, বলতো, কী পাথুরে শয়তান মেয়েটা, এত যে মারছি তবু চোখে এক ফোঁটা জল পড়ে না। সেই রুমালীর চোখে আজ বাঁধ ভেঙেছে। সংসারে সকলকেই কাঁদতে হবে, তবে কে যে কোন্ আঘাতে কাঁদবে তার হিসাব একমাত্র বিধাতাই জানেন।

রুমালী বারে বারে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো, তুলসী বন্দী হয়েছে এ খবর কেন সে দিতে গেল জীবনকে! কেন, কি প্রয়োজন ছিল তার! সে কি তুলসীর অভিভাবক, না রক্ষাকর্তা। কিম্বা ঐ খবরদান উপলক্ষে আর একবার দেখা পাবে জীবনের, এই আশাটাই প্রচ্ছন্ন ছিল মনের মধ্যে? অথবা ভেবেছিল—না, ভাবতে সাহস হয় নি, তবু কোন্ নির্বন্ধে মনের মধ্যে সংলগ্ন ছিল, বোঁটা থেকে খসে গিয়েও যেমন কোন কোন ফল লেগে থাকে গাছে, তেমনি ভাবে মনের মধ্যে সংলগ্ন ছিল একটা দুর্বার আশা—এই উপলক্ষে পরীক্ষা হয়ে যাবে জীবনের টান আছে কিনা তুলসীর প্রতি। জীবন হয়তো সব শুনে বলবে, তা আমি কি করবো বলো? শাহ্‌জাদা আবুবকর যাকে লুটে নিয়ে গিয়েছে আমি একক তাকে উদ্ধার করবো কি ক'রে? কিন্তু না, সমস্ত ব্যাপার শুনবামাত্র সে বলল, চলো দেখা যাক কি করতে পারি। তখনই কি প্রমাণ হয় নি যে, তার প্রকৃত টান তুলসীর দিকে। সব কথা একে

একে মনে পড়ে রুমালীর। আরও মনে পড়ে যখন সে একক, নিরস্ত্র, পিস্তলটাও দিয়ে গেল রুমালীকে, নির্ভয়ে এগিয়ে গেল দিলমঞ্জিলের দিকে, বলে গেল আর যদি ফিরে না আসে তবে ঐ পিস্তলটা দেখে মাঝে মাঝে তাকে মনে পড়বে রুমালীর—তখনি আরও জোরে পিস্তলটা চেপে ধরে বুকের মধ্যে।

হঠাৎ সে উঠে বসে। না, এমন অসহায় ভাবে কেঁদে কেঁদে দুঃখের পালা শোধ ক'রে দেওয়া তার স্বভাব নয়। দুঃখের ভূমিকম্পে সে বেঁকে যেতে পারে, ভূমিসাৎ হবে না কখনো। এই ক'মাসে কত আঘাত না গিয়েছে তার উপর দিয়ে। এক সপ্তাহের মধ্যে বাপ-মা-ভাই নিহত হ'ল তার সম্মুখেই নিতান্ত নৃশংসভাবে। তার পরে লোহার শলা গরম ক'রে তার সর্বাঙ্গে ছ্যাঁকা দেওয়া হ'ল—কই, তবু তো সে ভেঙে পড়ে নি। এখনই কেন বা পড়বে। প্রবলবেগে সমস্ত দুঃখের ভার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে বেরিয়ে এল পথে, চলল এগিয়ে দিলমঞ্জিলের দিকে।

এমন সময়ে তার দেখা অনুপ সিং-এর সঙ্গে। দিলমঞ্জিলে এত রাতে যুবতী নারীর যাওয়া উচিত নয় শুনে মনে মনে হাসে রুমালী। মনে পড়ে ঐ আবুবকর কত দিন, কত রাত সরাব খেয়ে তার পায়ের কাছে গড়িয়েছে। দিলমঞ্জিলকে তার ভয় নেই। সে এগিয়ে যায়।

অনুপ সিং বলে, শোন বহিন, দিলমঞ্জিলে গিয়ে পাবে না তোমার ভাইকে।

অশুভ আশঙ্কায় চমকে উঠে রুমালী শুধোয়, কেন?

সেখানে সে নেই।

কোথায় গিয়েছে?

একটা আওরংকে নিয়ে সুখানন্দ পণ্ডিতের কুঠিতে।

কি ক'রে জানলে?

শাহ্‌জাদার হুকুমে আমি নিজে তাদের পৌছে দিয়েছি।

আর সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নেই। এবারে বুঝি সত্যসত্যই সে ভেঙে পড়বে।

শাহ্‌জাদা আওরংকে ছেড়ে দিল? কেন?

বহিন, কেমন ক'রে বলবো কেন ছেড়ে দিল? ছেড়ে দেওয়া তো শাহ্‌জাদাদের স্বভাব নয়। তবে বোধ করি কোন জরুরী কারণ ছিল।

কতক্ষণ গিয়েছে?

তা অনেকক্ষণ হবে। ও কি, কোথায় চললে?

বাড়ি। আমার মনে হচ্ছে ভাই বাড়ি ফিরে এসেছে।

তা অসম্ভব নয়।

অনুপ সিং যায় ঘণ্টেওয়ালার দোকানের দিকে, আর রুমালী নিজ বাড়ির দিকে। কুহকিনী আশা তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে।

বাড়ি ফিরে এসে দেখে কেউ কোথাও নেই। তবে কোথায় গেল জীবনলাল। এত রাতে কোম্পানীর ছাউনিতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে কি রাত কাটাচ্ছে তুলসীর বাড়িতে? এই সম্ভাবনা অগ্নিশূল চালিয়ে দেয় তার বুকের মধ্যে। এক মুহূর্তে তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব ফনিমনসার গাছে কণ্টকিত হয়ে ওঠে, তার কাঁটায় কাঁটায় ফুলের আরক্ত ক্রোধ। দেখে নেবে কেমন মেয়ে তুলসী। এই জন্মেই বুঝি তাকে রক্ষা ক'রে এসেছে রুমালী!

যখন সে রওনা হ'ল সুখানন্দ পণ্ডিতের বাড়ির দিকে তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সুখানন্দর বাড়িতে আগে কখনো যায় নি, তবে পল্টন, তুলসী আর সুখানন্দর কাছ থেকে যে বিবরণ সংগ্রহ করেছিল, তাতে রুমালীর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে বাড়ি খুঁজে বের করা আদৌ কঠিন নয়।

রুমালীর বাড়ি অর্থাৎ চৌরাহা থেকে ফুলকি মণ্ডীতে সুখানন্দর বাড়ি পৌছনোর সোজা পথ বড়বাজার হয়ে মহল্লা লালকুয়াঁ আর সীতারাম বাজারের সড়ক। এগুলো বড় রাস্তা, কাজেই সিপাহীদের পাহারার অধীন। তাই এসব পথ এড়িয়ে গলিখুঁজি ঘুরে ঘুরে যখন সে সুখানন্দ পণ্ডিতের বাড়ি এসে পৌছলো তখন বেশ আলো হয়েছে।

বাইরের ঘরে বসে সুখানন্দ ও নয়নচাঁদ কথা বলছিল। কথা বলতে একটাই কথা, তুলসীর অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন। নয়নের ধারণা হয়েছিল যে, তুলসীর মৃত্যু হয়েছে। সুখানন্দ কিছুই জানায় নি তাকে, বলি-বলি ক'রে বলা হয়ে ওঠে নি। কাল গভীর রাতে ফিরে তুলসীর ঘরে আলো দেখে চমকে উঠল সে। তারপরে সুখানন্দ ও তুলসীতে মিলে যত সংক্ষেপে সম্ভব সব কথা বিবৃত করলো। তার ফলে রুমালী ও জীবনলালের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা যেমন প্রবল হয়ে উঠল, তেমনি বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রবলতর হয়ে উঠল স্বরূপরামের উপরে। সে যে দায়ী নয়, ভালোর জন্যই তুলসীকে সরিয়ে নিয়েছিল, সুখানন্দ ও তুলসীর একথা স্বীকার করতে আদৌ সে রাজী নয়। তখনি সেই গভীর রাতে জীবনকে জাগায় আর কি। সুখানন্দর বাধা দানে তা আর হয়ে ওঠে নি। ভোররাতে বিদায় নেওয়ায় সময়ে জীবনের কাছ

থেকে কথা আদায় ক'রে নিয়েছে যে, শীঘ্রই, দুই এক দিনের মধ্যেই সে ফিরবে। জীবন বিদায় হয়ে গেলে পিতাপুত্রে বসে গত তিন মাসের ঘটনার নাগরদোলার বিচিত্র ঘূর্ণন সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। এমন সময়ে দরজার কাছে রুমালীর আবির্ভাব।

তাকে দেখে সুখানন্দ সোল্লাসে বলে উঠল, এসো মা, রুমালী এসো।

তারপরে পুত্রের উদ্দেশ্যে বলল, এই রুমালী, যার কথা এতক্ষণ বলছিলাম।

এই আমার ছোট্ট মা না থাকলে তুলসীকে ফিরে পেতাম না।

রুমালী মনে মনে বলল, তা বটে। ওকে রক্ষা করতে গিয়েই নিজে মরেছি।

এসো, এসো, তা এত সকালে কি মনে ক'রে ?

আমার ভাইয়ের খোঁজে, সারা রাতের মধ্যে ফেরে নি, দিনকাল খারাপ, ভাবলাম একবার খোঁজ নিয়ে আসি।

এবারে নয়নচাঁদ কথা বলে, তুলসীর কাছে থেকে সব শুনেছি, জীবন কাল ঠিক সময়ে দিলমঞ্জিলে না গিয়ে পড়লে তুলসী চরম বে-ইজ্জত হ'ত। তোমরা-ভাইবোনে মিলে ওকে বারে বারে বিপদের মুখ থেকে রক্ষা করেছ।

রুমালী বলে, আমি আর কি করেছি? যা করেছে আমার ভাই জীবনলাল।

কে তোমার ভাই ?

সবাই চমকে উঠে ছাখে যে, তুলসী এসে উপস্থিত হয়েছে।

তুলসীর মূর্তি দেখে, কণ্ঠস্বর শুনে আর কেউ না বুঝুক রুমালী বুঝলো যে আজ তুলসীর রণং-দেহি ভাব। ভাবলো, আমিও কম খেলোয়াড় নই, দেখা যাক না, কার হাতে কি অস্ত্র আছে। সেই ভালো। অন্থ যুদ্ধ ত্বয়াময়া।

তুলসী আবার বলল, আমি সব শুনেছি, জীবনলাল তোমার ভাই নয়।

রুমালী মনে মনে বলল, নিমকহারাম আর কাকে বলে, আমি দু'দুবার রক্ষা না করলে এতদিনে শাহ্‌জাদাদের পাতে পড়ে কাবাব হয়ে যেতিস। এত দাপট থাকতো কোথায় ?

রাগে হিংসায় তুলসীর মুখ রক্তাভ হয়ে উঠেছিল, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ কর্কশ—জীবনলাল কোনকালেই তোমার ভাই নয়, পাতানো সম্বন্ধ, আমার কিছু শুনতে বাকী নাই।

রুমালীরও রাগ কম হয় নি, কিন্তু তা প্রকাশ পেলো না তার মুখের আভায় বা কথায়, বরঞ্চ একটি হাসির ছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল কথাগুলো, যদিচ সে হাসি শুষ্ক ও নির্মল।

কিছু শুনতে বাকি আছে তুলসীবাঈ। জীবনলাল আমার ভাই নয়, সত্য কথাই শুনেছ। কিন্তু যা শোন নি তা হচ্ছে যে—জীবনলাল কোম্পানীর রেশালাদার।

সুখানন্দ ও তুলসীর কাছ থেকে রুমালী শুনেছিল যে, নয়নচাঁদ সিপাহীপক্ষের লোক আর ঘোরতর কোম্পানী-বিদ্বেষী। কোম্পানী পক্ষের লোককে কিছুতেই সহ্য করবে না নয়নচাঁদ, বেশ জানতো—তাই একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলো—জীবনলাল কোম্পানীর রেসালাদার।

এ সংবাদের জন্য প্রস্তুত ছিল না তুলসী, সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে ভাবলো না জানি আরও কি অস্ত্র আছে ঐ ডাইনীর হাতে। তার আশঙ্কা মিথ্যা নয়।

হাসির মধুর সঙ্গে বিষ মিশিয়ে অমৃতগরল হাসি হেসে বলে, ভাই না হওয়া তো ভালই, অনেক রকম সম্ভাবনার দরজা খোলা থাকে। কি বলো তুলসীবাঈ। অবশ্য তোমারও ভাই নয়, কিন্তু কোম্পানীর রেসালাদার যে। নয়নচাঁদজী কি তাকে ঘরে ঢুকতে দেবেন?

তারপরে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে, যেন আপন মনেই, আসলে তুলসীকে শোনাবার উদ্দেশ্যে বলল, যাই, এতক্ষণ আমার পাতানো ভাই হয়তো কুঠিতে ফিরে আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে।

তুলসী দেখল তার হাতেও একটি অস্ত্র আছে—বলল, যাও, তবে সেখানে সে যায় নি।

কেন?

জীবনলাল বলে গিয়েছে তোমার বাড়িতে আর যাবে না।

তা'হলে আমাকেই যেতে হবে দেখছি কোম্পনীর ছাউনিতে—এই বলে চোখের চাহনিতে, মুখের ভাবে, আঙুলের ইশারায় দেহের ভঙ্গীতে ও ওড়নার আন্দোলনে ছোটখাটো সমুদ্র মন্থন ঘটিয়ে, আর একবার তুলসীর দিকে শ্লেষবিদ্বেষব্যঙ্গধিক্কারপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে গৌরবে গরবে প্রস্থান করলো রুমালী।

নয়নচাঁদ ও সুখানন্দ বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কি ঘটে গেল? এরা কি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, না নিদারুণ শত্রু? বুঝতে পারবার কথাও নয়। বিশ্বচরাচরে সকলেই নারীর প্রতিদ্বন্দ্বী। নারী অজাতবান্ধব।

॥ ৪ ॥

জীবনলাল গ্রেপ্তার

পান্না, অনেকদিন তোমার গান শুনি নি, একটা গান করো।

কি গাইব বলো, জীবন।

এইমাত্র তো তুমি বললে যে, মানুষের মুখ দেখে মনের কথা বুঝতে পারো।

কোন কোন মানুষের পারি বৈকি।

সকলের নয়?

সকলের কি পারা যায়?

তবে কাদের পারো খুলে বলো।

যে-পাত্রের মুখে ঢাকনি দেওয়া নেই, তার দিকে তাকালে বুঝতে পারা যায় ভিতরে কি আছে—জল না দুধ।

আমি বুঝি মুখখোলা পাত্র?

তা বই কি জীবন?

ভিতরে কি দেখলে? দুধ না জল?

ওসব কিছুই নয়।

তবে কি শূন্য?

না, আকণ্ঠ তুলসী-মধুতে পূর্ণ।

হো হো ক'রে হেসে ওঠে জীবন। তারপরে বলে, তুলসী-মধু তো কখনো শুনি নি।

ফুল থাকলেই মধু থাকবে।

কিন্তু কোথায় সেই মৌমাছি যে সংগ্রহ করতে পারে সে মধু?

এই যে আমার সম্মুখে বসে—এই বলে পান্না স্পর্শ করলো জীবনের চিবুক।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় জীবন। লক্ষ্য ক'রে পান্না শুধোয়, আবার কি হ'ল?

আচ্ছা পান্না, তোমার কি মনে হয় তুলসী সত্যি ভালোবাসে আমাকে?

কৃত্রিম গাম্ভীর্যে পান্না বলে, আমার তো মনে হয় না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জীবন বলে, যা বলেছ, আমারও তাই মনে হয়।

তারপরে কিছুক্ষণ নীরবে থেকে শুধোয়, কিন্তু বলতে পারো কেন ভালোবাসে না?

তুলসী তো জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।

রুখে উঠে জীবন বলে, কিন্তু ভালোবাসবে না কেন শুনতে চাই।

হেসে উঠে পান্না বলে, সেটা তুলসীর কাছে থেকেই শুনো।

ভালো না বাসলে তার কাছে আর যাবো কেন?

অন্ততঃ কারণটা শুনে নেওয়ার জন্যে যাওয়া আবশ্যক।

না, পান্না, তুমি ঠাট্টা করছ, তুলসী সত্যি ভালোবাসে আমাকে।

বাস্তবিক, কি বুদ্ধি তোমার জীবন। এই কথাটা বুঝতে তোমার এতক্ষণ লাগল!

আমিও তাই ভাবছি, কেন এতক্ষণ লাগলো।

তবে শোন, কেন লাগলো। শিষ্টাচারের খাল হ'লে সোজা পথে চলতো, সময় লাগতো না। এ যে ভালোবাসার নদী। একে অনেক বাঁক ঘুরতে হয়, অনেক পাথর ডিঙোতে হয়, সময় কিছু তো বেশী লাগবেই ভাই।

পান্নার বহুদর্শিতায় অবাক হয়ে যায় জীবন। শুধোয়, তুমি জানলে কি ক'রে?

নদীতে নামি নি বলেই নদীর গতি দেখতে পেয়েছি।

এবারে জীবন হঠাৎ শুধিয়ে বসে, আচ্ছা, পান্না, তুমি কখনো কাউকে কি ভালোবাসো নি?

আখো জীবন, ঢুলি বাড়ি-বাড়ি ঢোল বাজিয়ে বিয়ে দিয়ে বেড়ায়। তার বিয়ে হয়েছে কি না, এ প্রশ্ন অবান্তর। কি, চুপ ক'রে থাকলে কেন?

জীবন বলে, ভাবছি, মেয়েরা অবোলা—এমন মিথ্যেটা রটালে কে?

মিথ্যা বৈকি! বিধাতা আমাদের বাহুতে বল দেন নি, তাই মুখে ধার দিয়েছেন।

তাই তো দেখছি, রুমালী, তুলসী, পান্না সবাই একই কথার ছাঁচে ঢালা।

এ কথা শুনলে তুলসীমঞ্জরী খুশী হবে না।

কেন, নিন্দা তো নয়।

প্রশংসাও নয়।

প্রশংসা নয়? কি বলো?

পাঁচজনের সঙ্গে সমান ওজনে প্রশংসা প্রেমিকের কাছে নিন্দার সমতুল।

কেন?

কেন কি, প্রণয়ের জগৎ নির্জন, সেখানের দু'টির বেশি প্রাণীর জায়গা নেই।

অকৃত্রিম বিস্ময়ে জীবন বলে ওঠে, পান্না, তোমাকে যতই দেখছি ততই

অপরিচিত লাগছে।

আর তোমাকে দেখবার আগেই আমি চিনে ফেলেছি।

কেমন ক'রে ?

আগেও এমন দু'-চারটি দেখেছি কি না। তোমরা চিরকালের খোকা।

'চিরকালের খোকা' সম্বোধনে রাগ করে জীবন। তা লক্ষ্য ক'রে পান্না বলে, রাগ ক'রো না জীবন, পুরুষ মাত্রেই খোকা নারী মাত্রের কাছে।

ক্ষণেক নীরব থেকে জীবন বলে, কি উত্তর দেবো তোমার কথায় ভেবে পাই নে।

আর ভেবে কাজ নেই, তার বদলে একটা গান শোনো।

কোলের উপরে তম্বুরা তুলে নিয়ে পান্না আরম্ভ করে—

রুম ঝুম রুম ঝুম আয়ে বাদ্‌রা ;
ঘর নাহি আযে শ্যাম, ঘর নাহি আয়ে।
ঘির ঘির ঘির ঘির আয়ে বাদরা
শোবতে রহে হুঁ সপন ইক দেখা হুঁ, পিয়া ঘর আয়া হো পিয়া ঘর আয়া,
খুল গয়ে নিন্দিয়া, খুল গয়ে নিন্দিয়া,
ঢলক রহে কাজরা।

পান্না যখন গান করে, তখন সে যেন আর-এক মানুষ, অনেক দূরের মানুষ, তখন সে যেন মনুষ্য-সম্বন্ধের অতীত।

গান থামিয়ে তম্বুরা রেখে দিয়ে শুধোয়, কি, মনের মতো গান হ'ল ?

মনের মতো হ'ল, তবে ঠিক মনের কথাটি হ'ল না।

কেন ?

জ্যোৎস্না রাতে বাদলের গান, মিলনের দিনে বিরহের গান। এ কি মনের কথা ?

ভাই, আমি অনেক দেখেছি, তাই জ্যোৎস্না দেখলেই মেঘের আশঙ্কা করি, মিলন দেখলেই বিরহের আশঙ্কা করি। যে-বাঘটা ধরতে আসছে, আগ বাড়িয়ে গিয়ে তার কাছে ধরা দিই।

পালাও না কেন ?

বনের বাঘ হ'লে চেষ্টা করতাম, এ যে মনের বাঘ।

তারপর হেসে বলে, যেদিন আবার তোমার সঙ্গে তুলসীর ঝগড়া হবে, তখন মিলনের গান গাইবো।

ঝগড়া হ'তে যাবে কেন ?

কি বলো, ঝগড়া হবে না? ভালোবাসো যে। আচ্ছা জীবন, আমার এই ছোট বহিনটির সঙ্গে একবার দেখা হয় না?

হয়তো হবে, এমন অসম্ভব কি। জানো পান্না, তোমার ঐ বহিন শব্দটা শুনে অনেক দিন আগের তোমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। বলেছিলে, তোমার ছোট বহিন থাকলে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমাকে আটকে রাখতে।

তা আর হয়ে উঠল কই। কিন্তু আমার মনে হয় কি জানো, ঐ রুমালী মেয়েটিও তোমাকে ভালোবাসে।

না, না, না। তীব্র প্রতিবাদ করে জীবন।

কেন?

ও মেয়ে ভালো নয়।

তোমার পান্নাও তো ভালো নয়।

ছাখো পান্না, মেঘের ছায়া পড়ে দীঘির জল কালো হয় আবার পাঁক জমেও কালো হয়। তবু দুই এক নয়। তুমি মেঘের ছায়া-পড়া দীঘির জল, আর রুমালী হচ্ছে পাঁকে-কালো দীঘির জল।

ভাই, পাঁক আছে বলেই তো পঙ্কজ ফুটেছে, আর আমি চিরকাল শূন্যের দিকে চেয়ে রইলাম শূন্য হৃদয়ে।

জীবন বলে, তাই বলে কি পাঁক ভালো?

অন্তত এই পাথরগুলোর চেয়ে ভালো। বাপ রে বাপ, কে আনলো এই গন্ধমাদনের টুক্‌রোগুলো।

জীবন বলে ওঠে, পল্টনের গলা শুনি যেন। কে রে, পল্টন নাকি?

মহাবীর পল্টন, তা ছাড়া আর কে ডিঙোবে এই গন্ধমাদন।

তাঁবুর দরজার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয় পল্টন। দরজার কাছেই বসে ছিল জীবন, একটু ভিতরের দিকে পান্না। বাতির ক্ষীণ আলোয় হঠাৎ তাকে চোখে পড়ে না।

জীবন বলে, পল্টন হঠাৎ কোথা থেকে ভাই?

আর কোথা থেকে! কিন্তু তুমি হঠাৎ এমন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ কেন বলো তো?

লুকোলাম কোথায়?

লুকোলে না? রুমালীদি বলেছিল তোমাকে পাবো হিন্দুরাও কুঠিতে। সেখানে গিয়ে পৌঁছতে না পৌঁছতে এক বেটা সিপাই বলে কিনা, গুলী ক'রে মারবে। আমি বলি, তা মারবে বৈকি! তিন মাস পাহাড়ের উপরে বসে

কোম্পানীর ডালরুটির সর্বনাশ করছ, দিল্লির একখানা পাথর খসাতে পারলে না, মারতে পারবে দোস্ত্‌কে।

তারপরে?

তারপরে আর কি! অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাতে খানিকটা সিদ্ধির পাতা গুঁজে দিয়ে, তাকে খুশী ক'রে তোমার খবর জিজ্ঞাসা করলাম।

তখন?

তখন আর কি? সিদ্ধির পাতাগুলো খৈনীর মতো মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলল, কাছেই কোথাও আছে, খুঁজে গ্যাখো। ভাবলাম, সিদ্ধির পাতা-গুলো অমনি গেল।

এখানে আছি—খোঁজ পেলি কি ক'রে?

খোঁজ তো পাই নি, ফিরেই যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে এখানে আলো দেখতে পেয়ে ভাবলাম একবার দেখে যাই।

এখন তো পেলি, বল্ খবর কি? এত রাতে হঠাৎ কেন?

জীবনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে এবারে তার চোখে পড়লো পান্নাকে, শুধালো, এটিকে আবার যোগাড় করলে কোথা থেকে?

জীবন বলল, কি বলছিস, এটি আমার দিদি।

পল্টন বিশ্বাস করে না, বলে, দিদি দিয়েই তো আরম্ভ হয়, তারপরে কখন বউদিদি হয়ে যায়।

বাজে বকিস না, প্রণাম কর আমার পান্নাদিকে।

পান্নাদিদি! তা নামটা মন্দ নয়।

এমন সময়ে পান্না উঠে তার কাছে এসে বলল, পল্টন কিছু খাবে?

এই তো মুশকিলে ফেললে পান্নাদি। খাওয়ার কথায় আমাদের কখনো না বলতে নেই। ওটা 'মহাবীর পল্টনে'র নিয়ম নয়।

পান্না হেসে উঠল, তারপরে গোটা দুই লাড্ডু এনে দিল তার হাতে। পল্টন বিনা ভূমিকায় শুরু করলো খেতে।

জীবন বলল, এবারে বল্ হঠাৎ আমার খোঁজে কেন?

রুমালীদির অসুখ করেছে, তোমাকে একবার খবর দিতে বলল।

জীবন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে শুধোয়, কি অসুখ রে? এই তো কালকে রাতে দেখলাম ভালো আছে।

কালকে ভালো থাকলে কি আজ অসুখ হতে পারে না?

কেন পারবে না? তবু খুলে বল্।

পল্টন আরম্ভ করে, আজ দুপুরবেলা রুমালীদির বাড়ি গিয়ে দেখি যে, দিদি বিছানায় শুয়ে আছে। আমি শুধাই, কি হ'ল 'দিদি? সে বলে পল্টন ভাই, আমি বুঝি আর বাঁচবো না, বলে কাঁদতে লাগলো। চোখের জল কাকে বলে জানি না, তবু আমার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। বুঝলে না জীবনলালজী, শালা চোখের জল বড় বেইমান, রুমালীদি কাঁদছে তাই বলে আমি কাঁদতে যাবো কেন? বললাম, দিদি বৈদ্য ডেকে আনি। সে বলল, তার চেয়ে একবার জীবনলালজীকে খবর দিতে পারিস তো হয়। আমি বললাম, এ আর কি কথা, এখনি যাচ্ছি। তখন দিদি হাত ধরে বারণ করে, বলে, যাস নে ভাই, কোম্পানীর গুলীতে মারা পড়বি। আমি বলি, দিদি কোম্পানীর বাপেরও সাধ্য নেই মারে আমাকে। তবু হাত ছাড়ে না দিদি। তখন বললাম, সন্ধ্যা হোক, অন্ধকারে লুকিয়ে গিয়ে খবর দিয়ে আসবো—তুমি কিছু ভাবনা ক'রো না। এমন কত কি বলে তবে ছাড়া পাই।

তখন জীবনের মনে পড়ে গত রাত্রের ঘটনা। রুমালীকে দিলমঞ্জিলের কাছে চৌমাথায় দাঁড় করিয়ে চলে যাওয়ার পর আর কোন খোঁজ পায় নি তার। ভোর রাতে তুলসীর বাড়ি থেকে রওনা হয়ে আসবার সময়ে একবার বটে মনে হয়েছিল, রুমালীর সঙ্গে দেখা করবার কথা, কিন্তু ইতিমধ্যে বেশ আলো হয়ে যাওয়ায় আর সাহস করে নি। সে বুঝেছিল, আবুবকর তাকে সহজে ছাড়বে না। তাই সোজা চলে এসেছিল ছাউনিতে। সে ভাবলো, এ কয়দিন অনেক ঘোরাঘুরি করেছে রুমালী, অসুখ হবে তা আর বিচিত্র কি? কিন্তু কেমন ক'রে জানবে সে রুমালীর মনের কথা।

সারারাত ঘোরাঘুরি ক'রে রুমালী সকালবেলায় বাড়ি এসে শুয়ে পড়লো, তার সব আনন্দ তলিয়ে গিয়েছে অতলে। সে নিশ্চিত বুঝলো, জীবনের মন বাঁধা পড়েছে তুলসীর আঁচলে। ঐ ঘ্যানঘেনে, প্যানপেনে, ছিঁচকাঁদুনে মেয়েটারই শেষে জিত হ'ল। না, না, এ হতেই পারে না। আনন্দ যায়, যাক তো আশা যায় না। শেষ বোঝাপড়া একবার সে করবে। হতাশ জুয়াড়ী যেমন সর্বস্ব পণ ক'রে শেষ দান নিক্ষেপ করে, তেমনিভাবে একবার অন্তিম চেষ্টা করবে। কিন্তু তাকে এখানে আনবার উপায় কি? নিশ্চয়ই সে তুলসীর বাড়িতে বসে নেই, এতক্ষণে নিশ্চয়ই গিয়েছে ফিরে ছাউনিতে। সেখানে যায় কে?

এমন সময়ে এসে উপস্থিত হ'ল পল্টন।

কি হয়েছে দিদি?

খুব বীমার, বোধ হয় আর বাঁচবো না।

পল্টন যেতে রাজী হয়, সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে গিয়ে খবর দেবে জীবনকে।

পল্টন চলে যায়। রুমালী ভাবে, আসবে তো জীবন? মনের মধ্যে থেকে কে যেন বলে, অবশ্যই আসবে। রুমালী ভাবে, আর যদি না-ই আসে, তবু হয়ে যাবে চরম পরীক্ষা। সেটাও জানা আবশ্যক।

অস্নাত অভুক্ত দুঃখিনী নারী শয্যায় এ-পাশ ও-পাশ ক'রে প্রহর গুণতে থাকে। দুঃখের গতি বড় মন্থর।

জীবন বলে, পল্টন ভাই, তুই এগিয়ে যা। আমি আসছি।

একবার পান্নার দিকে তাকিয়ে পল্টন বলে, যাবে তো?

ছেলেটির সপ্রতিভ ভাব দেখে পান্না মুচকি হাসে।

জীবন বলে, যাবো না, কি যে বলিস। তুই এগো। দু'জন একসঙ্গে গেলে ধরা পড়বার ভয় বেশি। তাছাড়া ছাউনি ছাড়তে হ'লে আমাদের হুকুম নিতে হয়। তাতেও একটু দেরি হবে।

তবে সেই কথাই রইলো, আমি গিয়ে খবর দিইগে রুমালীদিকে।

একটু এগিয়ে গিয়ে ফিরে আসে, বলে, পান্না দিদি, লাড্ডু থাকলে গোটা দুই দাও, হাতে ক'রে যাই।

কেন রে, পেট ভরে নি?

পেটের একটা বদ অভ্যাস কি জানো দিদি, এখন ভরলেও কিছুক্ষণ পরেই আবার খালি হয়ে যায়। বেটা একেবারে নিমকহারাম। তবে সেজন্যে না।

লাড্ডু আবার তবে কি জন্যে?

বুঝলে না, পথের মধ্যে যদি কোন বেটা সিপাহী বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়ায়, তবে এমন জোরে ছুঁড়ে মারবো লাড্ডু, বেটা বুঝবে দিল্লীকা লাড্ডু বলে কাকে।

পান্না হেসে গোটাকয়েক লাড্ডু দিতে দিতে বলে, আমার লাড্ডুর যে এমন তেজ তো আগে কে জানতো।

ততক্ষণে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে পল্টন।

জীবন উঠে দাঁড়ায়, বলে, কি অসুখ আবার না জানি হ'ল রুমালীর।

বুঝতে পারো নি? মনের অসুখ। ও বুঝতে পেরেছে যে তুমি ভালোবাসো তুলসীকে।

এরকম অবস্থায় আমি গিয়ে কি করবো?

না গেলে আরও বেশি দুঃখ পাবে।

গেলেও পাবে।

পান্না বলে, সেটুকু অনিবার্য তার বেশি যেন দিয়ো না।

যাই, দেখি কি হয়, বলে চিন্তিতভাবে হিন্দুরাও কুঠির দিকে রওনা হয় জীবনলাল।

পান্না আবার কুশিতে এসে বসে। হঠাৎ একটি রসাতলভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে তার। সে বুঝতে পারে, রুমালীর চেয়েও সে বেশি দুঃখী। হতাশ প্রেমের সান্ত্বনাটুকুও নেই তার হাতে।

জীবনলাল যখন কলকত্তা দরবাজার কাছে এসে পৌঁছল, তখন রাত দুই ঘড়ি। সে দেখতে পেল যে দরজা খোলা, ভাগ্য ভালো ভেবে যেমনি সে ঢুকতে যাবে, অমনি পিছন থেকে কে তাকে জড়িয়ে ধরলো। চমকে উঠে সে তাকালো, কৌন হ্যায় ?

আরে তুম্ কৌন হ্যায়, বোলো।

কণ্ঠস্বরে ও বপুর বিশালতায় জীবন চিনতে পারে লোকটা কে, হাবিলদার দিল মহম্মদ।

আরে ইয়ার, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না ?

হাবিলদার বলে, না।

সে কি কথা! কতবার আগে দেখেছ আমাকে শাহ্‌জাদার কুঠিতে ইয়াদ ক'রে ত্থাখো, খুব চিনতে পারবে।

হাবিলদার বলে, তখন চিনতাম বইকি, কারণ তখন মনিব চিনতো।

আর এখন ?

এখন মনিব চেনে না, তাই আমিও চিনি না।

মনিব চেনে না কি ক'রে জানলে ?

নইলে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দেবে কেন ?

গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিয়েছে ? বিশ্বাস করতে পারে না জীবন।

তারপরে বলে, বেশ তাই হোক, নিয়ে চলো মনিবের কাছে।

সেখানে নিয়ে যাওয়ার হুকুম নেই।

তবে কোথায় নিয়ে যাবে ?

উজীর হাকিম আসামুল্লার কুঠিতে।

বেশ, তবে তাই নিয়ে চলো।

চারজন সিপাহীর পাহারায় জীবনলাল রওনা হয়ে যায়

॥ ৫ ॥

শাহ্‌জাদার প্রতিহিংসা

জীবন যখন তুলসীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল মীর্জা আবুবকরের কুঠি থেকে, তখন নির্বাপিতপ্রায় দীপালোকে বসে শাহ্‌জাদার মনে হ'ল তামাম দুনিয়া তাকে ব্যঙ্গ করছে, সকলেরই চোখে-মুখে ধিক্কারের চাপা হাসি। সেতারীর দিকে তাকিয়ে বলল, হাসছ যে! তামাশা পেয়েছ নাকি?

লোকটা কুর্নিশ ক'রে কিছু বলতে যাচ্ছিল, আবুবকর ব'লে উঠল, যাও ভাগো।

সেতার নিয়ে উঠে বেরিয়ে গেল সেতারী।

এবারে ঝাড়ের আলোর দিকে চোখ পড়লো শাহ্‌জাদার, পাঁচশো আলো চার দিকের আয়নায়, তসবিরে পাঁচ হাজার হয়ে হাসছে।

চুনিলাল!

শাহ্‌জাদা।

বাতি নিবিয়ে দাও।

ঘরের বাতি নেবালেও আকাশের তারা তো নেবানো যায় না। জানলা দিয়ে যে-কটি তারা চোখে পড়ছে সব ক'টিই হাসছে।

চুনিলাল!

শাহ্‌জাদা।

তাঞ্জাম তৈরী করতে বলো।

কারো সঙ্গে পরামর্শ করা আবশ্যক। এ অপমানের প্রতিকার না হ'লে শাহ্‌জাদাগিরি বৃথা। কার সঙ্গে পরামর্শ করবে ভাবে আবুবকর।

মীর্জা মুঘলের সঙ্গে সম্প্রীতি নেই, তাছাড়া লোকটা সত্যি যুদ্ধ করতে চায়; এখন এই ব্যক্তিগত মান-অপমানের কথা তার কাছে বলা চলবে না। বখৎ খাঁ শক্তিশালী বটে কিন্তু একবার তুলসীকে লুটতে গিয়ে তার কাছে শাসিত হয়েছে। না, সেখানে আর যাওয়া চলবে না। মীরাটের কুলিজ খাঁ আর নিমচের ঘউস মহম্মদ দুটোই উল্লুক, শুনলে বলবে, একটা আওরৎ গিয়েছে আর একটাকে পাকড়ে নিন, দুনিয়ায় আওরতের অভাব কি? হ্যাঁ, এই দুঃখের কথা শোনবার একমাত্র লোক মীর্জা খিজির সুলতান। দুজনেই

শাহ্‌জাদা, দুজনেই অপমানিত ও উপেক্ষিত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবুবকরের তাঞ্জাম এসে পৌঁছল মীর্জা খিজির সুলতানের কুঠিতে। সে থাকে লালকেল্লার দক্ষিণে সোনেরী দরগার কাছে।

খিজির সুলতান শুধোয়, কি শাহ্‌জাদা, এত রাতে কি মনে ক'রে?

মনমেজাজ খারাপ।

এই গদরের সময়ে মনমেজাজ কার ভালো? কিন্তু সে কথা জানাতে কেউ তো রাত বারো ঘড়িতে আসে না। আসল ব্যাপার কি শুনি।

তখন আবুবকর আসল ব্যাপার খুলে বলে, কোন কথা গোপন করে না, এমন কি জীবনলালের হাতে কোম্পানীর জেনারেলের নামে চিঠি আছে, তাও প্রকাশ ক'রে বলে।

সব কথা শুনে খিজির সুলতান বলে, ছাখো শাহ্‌জাদা, এখন বাদশাহের বাদশাহী নিয়ে টান পড়েছে, হিন্দু মুসলমান মিলে কোম্পানীকে ঠেকাবার চেষ্টা হচ্ছে, এ সময়ে তুমি শাহ্‌জাদা হয়ে হিন্দুর মেয়ের উপরে জুলুম করলে সব বরবাদ হয়ে যাবে। ও পথ ছেড়ে দাও।

আবুবকর বলে, আওরতের কথা ভাবছি না, ভাবছি অপমানের শোধ নেওয়া যায় কিভাবে? জীবনলালকে কয়েদ করতে হবে, কোতল করতে হবে।

কিন্তু তাকে পাচ্ছ কোথায়? সে থাকে কোম্পানীর ছাউনিতে।

মাঝে মাঝে শহরে আসে, এখানে ওর বহিন না কে যেন আছে। আমার ফৌজের উপরে হুকুম দেবো তাকে দেখলেই যেন পাকড়াও করে।

বেশ, তারপরে?

কোতল করবো।

কোতল করবার অধিকার সিপাহ্‌সালার বখৎ খাঁর আর উজীর হাকিম আসাহুল্লার।

বেশ, গ্রেপ্তার ক'রে পাঠিয়ে দেব বখৎ খাঁর কাছে, বলে পাঠাবো কোম্পানীর গোয়েন্দা।

খুব ভালো। তবে সে যখন প্রকাশ করবে তোমার লেখা চিঠির কথা?

বিসমিল্লা! একথা তো ভাবি নি।

এবারে তো ভাবলে, এখন কি করবে।

তবে পাঠাবো হাকিম সাহেবের কাছে। তার কাছে চিঠির কথা প্রকাশ করলেও শাহ্‌জাদাদের সে দায়ী করতে পারবে না। তা ছাড়া শুনেছি সে নিজেই চিঠি চালাচালি করে।

বেশ, কোতল হ'ল লোকটা। তোমার কি লাভ ?

বদলা।

খিজির সুলতান বলে, তা বটে, আজ সারা হিন্দুস্থানে বদলা চলছে। তুমিই বা বাদ পড়বে কেন। বেশ তবে তাই হোক। কিন্তু লোকটা গ্রেপ্তার হ'লে তবে তো।

গ্রেপ্তার হ'তেই হবে, পায়ে জিঞ্জির আছে যে।

সে আবার কি রকম ?

ঐ যে বললাম, শহরে কোন আওরৎ আছে লোকটার।

সে তো বহিন বললে।

আরে চাচা, আদাম-হবার সম্পর্কে দুনিয়ার তামাম স্ত্রী পুরুষ ভাই-বহিন।

বেশ। তাই হোক, তবে নিজে জড়িয়ে পড়ো না দেখো।

মনটা হাল্‌কা হয়ে যায় আবুবকরের, ফিরে এসে হাবিলদার দিল মহম্মদকে হুকুম ক'রে দেয়, জীবনলালকে দেখবামাত্র গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাবে হাকিম আসানুল্লার কুঠিতে।

গ্রেপ্তার হয়ে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল জীবন, কিন্তু তারপরেই ফিরে এলো তার রসবোধ আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

বলি ইয়ার, হাকিম সাহেব কোথায় থাকে।

মসজিদের কাছে।

আরে, হাকিম যে মসজিদের কাছে থাকবে সবাই জানে, কিন্তু শহর শাহ্‌জাহানাবাদে তো মসজিদ একটা নয়।

একটা বৈকি। মস্‌জিদ বলতে জামি মসজিদ আর সব মসজিদ নাম নাম, যেমন সোনেরি মসজিদ, সোনেরি দরগা, ফতেপুরী মসজিদ, জিনৎমহল মসজিদ।

ব্যস ব্যস, খুব হয়েছে। তা ছাখো, আমি একজন রঈস আদমি, শাহ্‌জাদার কাছে আমার যাতায়াত, আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে ? একটা তাঞ্জাম আনালে পারতে।

দিল মহম্মদের দিলটা ভারি খুশী ছিল। জন্মে এই প্রথম একটা লোককে সে গ্রেপ্তার করেছে—বলল, এখন হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেও ফিরবার পথে তাঞ্জামে ক'রে নিয়ে যাবো। মরা মানুষ তো হাঁটে না।

জীবন কৌতুক বোধ করে, বলে, একেবারে মারবে বলেই ঠিক করেছ।

বিচারের আগে রায়! তা আমার দোষটা কি?

সেটা খুঁজে বার করবার ভার উজীর সাহেবের উপরে।

দোষ যখন এখনো খুঁজে বার করা হয় নি, তবে গ্রেপ্তার করলে কেন?

মনিবের হুকুম।

তা তোমাকে তো মনিবের ইয়ার বললেই হয়, বলো তো ভাই মনিবের গোসার কারণ কি?

সবই তো জানো ভাই, কাল রাতে মনিবের পিয়ারের আওরৎ ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছো। এর চেয়ে বড় কসুর আর কি হ'তে পারে। গোসা হবে না।

এই বলে সে হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

হাসির কি হ'ল? শুধোয় জীবনলাল।

হাসির নয়! পরশু পঞ্চাশ আদমি গিয়ে যাকে লুটে নিয়ে এলাম তাকে একলা তুমি নিয়ে গেলে ছিনিয়ে। তাও কি না আবার শেরের মুখ থেকে।

জীবন বলে, সেরের চেয়ে মণের ওজন অনেক বেশি।

এত সূক্ষ্ম শ্লেষ বোঝে না দিল মহম্মদ। সে বলে ওঠে, মন! মন ক্যা হ্যায়?

একটু চিন্তা ক'রে বলে ওঠে, আভি সমঝ গিয়া। মন তো গুমন।

তারপরেই তান লয় সহযোগে শুরু ক'রে দেয়—

"মুর লিয়া কাহে গুমন ভরি,
ন তু চাঁদি, ন তু সোনে,
তব কাহে গুমন ভরি?"

গান শেষ ক'রে জীবনলালের মুখ-চোখ থেকে প্রচ্ছন্ন প্রশংসা কেড়ে নিয়ে বলে, হাম একঠো তানসেন হ্যায়।

জীবনলাল বলে, তানসেন কেন ইয়ার, তুমি তানসেনের লেড়কার মামা হ্যায়।

এই তো সামনে উজীর সাহেবের কুঠি।

জামি মসজিদের পশ্চিমে চৌরি বাজারে উজীর হাকিম আসাদুল্লার কুঠি।

সেখানে তখন রাত নিষুতি। অনেক ডাকাডাকিতে দারোয়ান উঠে শাহ্‌জাদার হাবিলদার শুনে দরজা খুলে দিলো।

দিল মহম্মদ বলল, এই লোকটা কোম্পানীর গোয়েন্দা, শাহ্‌জাদা মীর্জা আবুবকর একে পাঠিয়ে দিয়েছেন উজীর সাহেবের কাছে।

দারোয়ান গিয়ে ডেকে আনলো বক্‌শীকে। বক্‌শী বলল, এত রাতে উজীর

সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না।

তবে আসামীর কি হবে?

বক্‌শী বলল, থাকুক গারদে, কাল সকালে উজীর সাহেবকে জানালেই হবে।

তখন জীবনলালকে উজীর সাহেবের বক্‌শীর হাওলা ক'রে দিয়ে দিল মহম্মদ বিদায় নিলো।

জীবন গারদে বন্দী হ'ল। সেকালে আমীর ওমরাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই একটা নিজস্ব গারদ থাকতো।

॥ ৬ ॥

"কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্বশী সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।"

সে রাত্রে শহর শাহ্‌জাহানাবাদের দুই প্রান্তে দুই বিনিদ্র শয্যায় দুই নারীর বিরহপ্রহর অস্বস্তিতে কাটে। বিরহের শম্বুকগতি, প্রতিটি দণ্ড-পল পায়ের চিহ্ন রেখে যায় স্মৃতিতে; মিলনের বিদ্যুৎগতি, আলো দেখবার আগেই মিলিয়ে যায়।

পল্টনকে সংবাদ দিতে পাঠাবার পরে রুমালীর মনটা বেশ হাল্‌কা হয়ে গেল। অসুখের সংবাদ পেলে জীবন না এসে পারবে না পল্টন বলে গিয়েছিল, দাঁড়াও না—এখুনি ফিরে আসছি, আর সেই সঙ্গে নিয়ে আসছি জীবনলালজীকে। পল্টনের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হবে না জানতো সে। তারপরে যখন সন্ধ্যা হয়ে আসতে না আসতে যমুনার উপরে মস্ত একখানা চাঁদ উঠল, উঠে পড়লো রুমালী। স্নান করতে হবে, চুল বাঁধতে হবে,

প্রসাধন ও পোশাক করতে হবে, অনেক কাজ বাকী। আজ দু'দিনের মধ্যে নিজের দিকে তাকাবার অবকাশ পায় নি সে। অস্নাত, অভুক্ত, খিন্নমলিন মূর্তিতে বের হওয়া চলবে না জীবনের সম্মুখে। সে সঙ্কল্প করলো আজ তাকে ধরতে হবে, তুলসীর মায়াপাশ ছিন্ন ক'রে নিজের নাগপাশে আটকাতে হবে। তার নারীসত্তার অন্তরতম কুহর থেকে কে যেন কানে কানে বলল, ওরে অবোধ রমণী, শুধু ভালোবাসাটাই যথেষ্ট নয়, তাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে সম্মুখে উপস্থিত করতে হয়। শাখায় ফুল সুন্দর কিন্তু তোড়া বাঁধতে গেলে তাকে সাজাতে হয়, রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ঢঙের সঙ্গে ঢঙ মিলিয়ে তবে তাকে এনে উপস্থিত করতে হয়। মনের ভালোবাসা যখন শাড়ীতে ঘাগরায় কাঁচুলিতে দোপাট্টায় প্রকট হয়ে ওঠে, আলতায় কুমকুমে অনুরাগের দৃষ্টি মেলে তাকায়, তখনি ভালোবাসা বলে বুঝতে পারে লোকে। নতুবা নির্গুণ প্রেম তো অপ্রেমের সামিল।

স্নান সেরে এসে নিজেকে একবার দেখতে ইচ্ছা গেল রুমালীর। কিন্তু তেমন মানুষ-প্রমাণ আয়না কোথায়? তখন চোখে পড়ল জানলার কাঁচের শার্সিটা, ওটাকে তো ব্যবহার করা যেতে পারে। না, ছায়া তো পড়ে না। তখন তার পিছনে ঝুলিয়ে দিল মোটা চাদর। হাঁ, এবারে বটে ছায়া পড়েছে, মানুষপ্রমাণ শার্সিতে মানুষপ্রমাণ ছায়া। বিলিতি কাঁচের আয়না হ'লে ছায়া আরও সজীব আরও নিটোল আরও স্পষ্ট হয়ে প্রায় কায়ার শামিল হয়ে উঠত। কিন্তু না, এই বোধ করি ভালো, আলোতে ছায়াতে জোড় মেলানো, এ যেন দেহের কানে কানে কথা বলা মিলন রাতের গদ্‌গদ্ বাণী। অস্ফুটতার মধ্যেই যার রমণীয়তা। তবু মন আরও একটু প্রকটতা চায়। একটু প্রকট না হ'লে পুরুষের চোখ ভুলবে কি! ও যে আজ জীবনের চোখ দিয়ে দেখছে নিজেকে। তখন দুটো মোমবাতি জালিয়ে রাখে দুদিকে। হ্যাঁ, এবারে ঠিক হয়েছে, এবারে ছায়ার সঙ্গে রঙটাও ধরা পড়েছে। সে জানে তার রঙে আছে একটা ফিকে গোলাপী আভা। শ্বেতদ্বীপের তুষারে আর কাশ্মীরের জাফরানে ষড়যন্ত্র ক'রে রঙের এই ফাঁদটি পেতেছে, পুরুষের চোখে ধরা না পড়ে যায় না। তারপরে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঠিকরে পড়ে জীবনের কামনাময় প্রশংসা, লালসাময় আগ্রহ। নিজেকে আজ সম্পূর্ণ প্রক্ষেপ করেছে জীবনের মধ্যে, কান্তের চোখে কান্তার চলছে সম্ভোগ।

এমন সময়ে হঠাৎ তার ধমনীতে কাশ্মীরী নর্তকীমাতার রক্তপ্রবাহ উদ্দাম

হয়ে উঠল। কতজনকে বৃথা নাচ দেখিয়ে মরেছে, সে কিন্তু জীবনকে তো দেখানো হয় নি। এখনি দেখাবে তাকে নাচ। না, না, আরও বেশি, আজকে নাচবে দুজনে একসঙ্গে, জীবন যে আজ তার অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছে। তখনি ঘুঙুর জোড়া বের ক'রে এনে পায়ে পরে নাচ শুরু করে রুমালী, সেই দীপমাত্র সহায়, সেই দর্পণমাত্র সাক্ষী, সেই রভস-লালসা সেই প্রণয়-পীড়ন বাসনা-কামনা জড়িত আলো-অন্ধকারে, নিঃসঙ্গ নর্তকীর নিঃশেষ বেদনা, নৃত্য আর সেই সঙ্গে গান,

বল্‌মা, ন জাঁউ পরদেশ,

তুমসো হামারি আরজ

এহি হ্যায় বল্‌মা ন জাঁউ পরদেশ।

কওন বন জাউ,

কওন বন ঢুঁঢ়ু

ধর জোগন কো বেশ।

হঠাৎ তার মনে হ'ল সে একা নয়, ঐ তারায় তারায় মন্দিরা বাজছে, জ্যোৎস্নার রসুনচৌকি থেকে সুর ছাপিয়ে পড়ে পূর্ণ ক'রে দিচ্ছে আকাশকে, আর দিগন্তের নীবীবন্ধ খুলে ফেলে দিয়ে নৃত্যরতা ঐ নক্তনটিনী, স্খলিত অঞ্চল পূর্ণচন্দ্রে যার বাম পয়োধর, রুমালীর রক্ততরঙ্গে যার নূপুরের রুম রুম, ঝুম ঝুম, রুমালীর ধমনীতে ধ্বনিত যার কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-কেয়ূর-কাঞ্চীর শিঞ্জিত রিণ রিণ ঝিন ঝিন। না, সে একাকী নয়, এতদিন পরে আজ সে সঙ্গিনী পেয়েছে, পেতেই হবে, আজ তার নৃত্য যে দয়িতের আসনের সম্মুখে। আসন শূন্য? সেই তো আনন্দ। আসন ছেড়ে উঠে এসে কান্ত আজ মিলে গিয়েছে কান্তিতে। এই কথা মনে হতেই নাচের তাল উত্তাল হয়ে ওঠে, বুকের বাসনা উদ্বেল হয়ে ওঠে, বহুভঙ্গী লাবণ্য-কুসুম নিক্ষেপ করতে থাকে, নর্মদা-মর্মরে রচিত উরুর নিটোল ভাস্বরতা দিকে দিকে কামনার ঢেউ তুলে দেয় আর স্বেদমসৃণ হীরক-কঠিন যুগ্ম পয়োধর ঘরের সব আলোটুকু কুড়িয়ে নিয়ে এসে কুচি কুচি ক'রে শূন্যময় ছড়িয়ে দেয় ইন্দ্রচাপচুর।

"কওন বন জাউ

কওন বন ঢুঁঢ়ু

ধর জোগন কো বেশ।"

প্রত্যহের নির্মোক খসে গিয়ে এ কোন্ রুমালী আজ নৃত্য করছে।

শ্যামসুন্দরের মূর্তির সম্মুখে মন্দিরা বাজিয়ে নাচতে নাচতে গান করছে—

প্যারে দরশন দীজ্যে আয়,
তুম বিন রহ্যো না জায় ॥
জল বিন কঁবল, চন্দ্ বিন রজনী,
ঐসে তুম দেখ্যা বিন সজনী।
আকুল ব্যাকুল ফিরুঁ রৈণ দিন,
বিরহ কলেজো খায় ॥

চোখ দুটি নিমীলিত, যেন শ্যামসুন্দরের প্রেমের গভীরতায় নিমগ্ন, মন্দিরা-ধ্বনিত বাহু দুটির নমনীয় আন্দোলন, যেন বারে বারে শ্যামসুন্দরের কণ্ঠে লাবণ্য-মল্লিকার মালা নিক্ষেপে নিযুক্ত; ভক্তিপ্রণোদিত আনত মস্তকের দেহভঙ্গী, যেন শ্যামসুন্দরের চরণে সর্বস্বসমর্পণপ্রণতি: আর কণ্ঠস্বরের মধুর সুর লয় উচ্ছ্বাস, সে যে একই সঙ্গে স্বগত ও বহির্গত, শ্যামসুন্দর যে একই সঙ্গে অন্তরে ও বাহিরে।

দিবস ন ভুখ্ নী'দ নহি রৈণা,
মুখসূঁ কথন ন আটে বৈণা।
কহাঁ কহুঁ কুছ কহত না আবে
মিলকর তপত বুঝায়।
কুঁতর সাঝে আন্তরজামী,
আয় মিলো কিরপা কর স্বামী।
মীরা দাসী জনম জনমকী
পড়ী তুম্হারে পায় ॥

গান আর শেষ হয় না, গান আর নাচ। ও দুই যেন আজ মিলে মিশে এক হয়ে গিয়ে আধার-আধেয়ের শেষ বিন্দু রস নিবেদন করবে দেবতার পায়ে, এক-বিন্দু হাতে থাকা পর্যন্ত সমস্ত নিবেদন অসার্থক।

মীরা দাসী জনম জনমকী
পড়ী তুম্হারে পায় ॥

ঐ দুটি ছত্রে সুর মাথা কুটে কুটে মরছে শ্যামসুন্দরের পায়ে, পাথরের উপরে চন্দ্রাকৃষ্ট সমুদ্রের তরঙ্গ অভিঘাতের মতো,

মীরা দাসী জনম জনমকী
পড়ী তুম্হারে পায়ে ॥

ধূপের সুরভি, ফুলের সুগন্ধি, ক্ষৌমবস্ত্রের আন্দোলন, আলুলায়িত কেশের বিক্ষেপ—তারাও এ পূজানিবেদনের উপচার।

অবশেষে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করে, সে প্রণতিও বটে—চরম আত্মনিবেদনও বটে।

রুমালী যখন তীক্ষ্ণ কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়ে বলে গেল যে জীবন তার ভাই না হ'তে পারে কিন্তু সে হচ্ছে কোম্পানীর রেসালাদার, তখন তার এই আশা ছিল যে তেমন লোক প্রশ্রয় পাবে না নয়নচাঁদের কাছে, তুলসীরও ছিল এই আশঙ্কা। তখনি সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, হে শ্যামসুন্দর, তুমি রক্ষা করো এই সঙ্কট থেকে, সারারাত আজ তোমার আরতি করব, নৃত্যে আর গীতে।

শ্যামসুন্দর সুখানন্দ পণ্ডিতের গৃহদেবতা। বাল্যকাল থেকে তুলসীর স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল শ্যামসুন্দরের দিকে। যখন একটু বড় হ'ল সন্ধ্যাবেলায় আরতির ভার পড়লো তার উপরে। সুখানন্দ করত সকালে আর দুপুরে পূজা, বিকালটা কাটতো তার বাদশাহের দরবারে, তাই সন্ধ্যা-আরতির ভার পড়েছিল তুলসীর উপরে। নয়নচাঁদ ঠাকুরঘরের দিকে বড় ঘেঁষত না। এই ক'মাস তুলসীর বাইরে বাইরে কেটেছে, ফিরে এসেই প্রথমে গিয়েছিল শ্যামসুন্দরের ঘরে প্রণাম করতে। তারপরে এখন।

রুমালী চলে যেতেই নয়নচাঁদ বলে উঠল, কোম্পানীর রেসালাদার তার কি হয়েছে? কাজটা তো সে ভালই করেছে।

সুখানন্দ আশ্বস্ত হয়, তুলসী মনে মনে বলে, জয় শ্যামসুন্দর, তোমার আমি দাসী।

নয়নচাঁদ বলে যায়, ভালো মন্দ দুই দিকেই আছে, সিপাহী পক্ষে যেমন বখৎ খাঁ আছে, কোম্পানীর পক্ষে তেমনি জীবনলাল, আবার সিপাহী পক্ষে যেমন আবুবকর আছে, কোম্পানী-পক্ষে তেমনি স্বরূপরাম। পক্ষ দিয়ে ভাল-মন্দ হয় না। লোক দিয়ে ভাল-মন্দ।

সুখানন্দ মন্তব্য করতে ভয় পায়, কি জানি কথার খোঁচায় কোন্ সাপ বেরিয়ে পড়ে, তবে মনে মনে ভাবে, এই ক'মাসের কাণ্ড দেখে বেটার কিছু আক্কেল হয়েছে দেখছি। ভাবে, দেখি কত দূর গড়ায়।

কিন্তু ঐ বেটা স্বরপোটাকে আমি ছাড়ছি নে, সকল দুর্গতির ঐ মূল গায়েন।

পিতা-পুত্রী কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না, কি জানি স্বরূপের

অপরাধ না জীবনের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে।

কিন্তু বাবা, আমাদের এমন উপকারী লোক, যার কৃপায় তুলসীর মান-ইজ্জৎ বাঁচলো, প্রাণ বাঁচলো, তুলসীকে ফিরে পেলাম, তাকে ছেড়ে দিলে! একটা দিন অন্তত রাখতে পারতে।

তুলসী মনে মনে বলে, জয় শ্যামসুন্দর।

সুখানন্দ বলে, আরে সে যে কোম্পানীর অফিসার, ফিরতে দেরি হ'লে কোর্ট মার্শাল ক'রে দেবে না।

ফিরে আসতেও তো বলতে পারতে।

তারপরে তুলসীর দিকে তাকিয়ে বলে, তোরই বা কি রকম ব্যবহার, লোকটাকে একবার আসতেও বললি না।

তুলসী বলে, তোমরা উপস্থিত থাকতে আমি বলবার কে?

কেউ নোস? বটে। তবে স্বরূপের সঙ্গে চলে গিয়েছিলি কেন?

তখন তোমরা ছিলে না।

সুখানন্দ দেখল, আবার না গোলমাল বেধে ওঠে। মূর্খ পুত্রকে পিতার বড় ভয়। সে বলল, ও সব পুরনো কথা এখন থাক।

তখনকার মতো এখানেই চুকে যায়। তুলসী সোজা গিয়ে শ্যামসুন্দরের পায়ের কাছে প্রণাম করে। তারপরে সন্ধ্যাবেলায় শ্যামসুন্দরের আরতি শুরু করে, আগেই ভূতি বুড়ীকে বলে রেখেছিল, আমাকে মিছে ডাকাডাকি করিস নে, আমার আজ দেরি হবে।

জল বিন কঁবল, চন্দ্ বিন রজনী,
ঐসে তুম দেখ্যা বিন সজনী।
আকুল ব্যাকুল ফিরা রৈণ দিন,
বিরহ কলেজো খায়॥

কিন্তু মন যে অবাধ্য, একাগ্র তো হয় না; শ্যামসুন্দরের মুখের পিছনে ছায়ার মতো আর একখানা মুখ দেখা যায় কেন? না, না, শ্যামসুন্দর ছাড়া আজ আর কেউ স্থান পাবে না তার মনে। তখনি দুই হাত দিয়ে অপর চিন্তা মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শুরু করে—

মীরা দাসী জনম জনম কী
পড়ী তুম্হারে পায়॥

দরজায় ধাক্কা পড়ে।

কে রে ?

আমি পল্টন।

কি খবর !

জীবনলালজী আসছে, অনেকক্ষণ রওনা হয়েছে, এসে পৌছল বলে।

বাহাদুর ছেলে তুই, এখন যা, আমার শরীরটা বড় ভালো নেই।

অপস্রিয়মাণ পদশব্দে বুঝতে পারা যায় পল্টন চলে গেল।

রুমালী এসে দাঁড়ায় খোলা জানলার কাছে। বাইরে আকাশ, পৃথিবী চরাচর জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। আসবে, আসতেই হবে, না এসেও যে পারে, এমন কখনোই সম্ভব নয়। নিজের মন বিশ্লেষণ ক'রে দেখে, এমন সম্ভাবনা কি কখনও মনে দেখা দিয়েছিল ? কই, মনে তো পড়ে না। আর যদিই বা কখনও দেখা দিয়ে থাকে তবে তা শয়তানের হাতছানি। এখন হাসি পায় সে কথা মনে পড়লে। আসতেই হবে। রুমালীর অসুখ শুনে কি জীবন কখনও না এসে পারে ? জীবন তারই, তারই আবিষ্কার, তারই নিতান্ত আপনার ধন। তুলসী কে ? তুলসী কে ? তুলসী কে ?

জীবনেব আসন্ন আগমন সম্ভাবনায় মনটা শান্ত হয়, তা ছাড়া ক্লান্ত হয়েও পড়েছিল। দু'হাতে জানলার শিক ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখ কান সবই খোলা, কিন্তু মনটা ঘুমিয়ে পড়েছে তাই বাইরের জগৎ-বোধ তার নেই। সদ্যনির্মিত পাষাণমূর্তির মতো জগৎ-নিরপেক্ষভাবে সে দণ্ডায়মান।

এমনভাবে কতক্ষণ ছিল জানে না, হঠাৎ তার মনে হ'ল বাইরে কার পায়ের শব্দ, তাড়াতাড়ি দোপাট্টাখানা গায়ের উপরে টেনে নিয়ে দরজা খুলল। না কেউ নেই। পাহাড় থেকে রুমালীর বাড়ী তো কম দূর নয়, আসতে হবে আবার অনেক ঘুরে, রাত্রিও অনেক বেশি। আসবে, আসবে, অবশ্যই আসবে।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার আলোয় পরিচিত দৃশ্যগুলো, মিনার মসজিদ অট্টালিকাগুলো খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঠিক ঠাহর করতে পারে না। সেণ্ট জেমস গীর্জা, স্কীনার সাহেবের কুঠি, কিল্লা ঘাট দরবাজা, সব কেমন মিলেমিশে যায়। দেখা যায় অথচ বোঝা যায় না। প্রেমের দৃষ্টি জ্ঞানের দৃষ্টি নয়, এতে সব দেখেও সব বুঝতে পারা যায়।

অবশেষে বিছানায় এসে বসে; একটুখানি গড়িয়ে নেবে ভেবে শুতেই ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

তুলসী বলেছিল, ভূতি বুড়ী, তোমার খাওয়া হ'লে শুয়ে পড়ো, ঠাকুরঘর থেকে বের হ'তে আমার দেরি হ'তে পারে।

দেরি যেন হবে, তা খাবে কখন?

আমার খাবার ঢেকে রেখে তুমি শুয়ে প'ড়ো।

আজ ঠাকুরঘরে কি হবে গো?

ঠাকুরঘরে আবার কি হয়ে থাকে।

আরতি নৃত্য শেষ ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলো। প্রণাম আর শেষ হয় না। প্রার্থনার শেষ নেই বলে প্রণামেরও শেষ নেই। বাপ, ভাই, ভূতি বুড়ী সকলের মঙ্গল কামনা করে, সবশেষে বোধ হয় জীবনের নামে। লোভী শিশু যেমন মিষ্টান্নটি মুখে দেওয়ার আগে চোখ দিয়ে দেখে তৃপ্তি অনুভব করে, তারপরে চেখে তৃপ্তি অনুভব করে, অবশেষে একবার মুখে দেয় আবার বের ক'রে হাত দিয়ে তার স্পর্শ অনুভব করে, তেমনি ভাবে বার বার জীবনের নামটা নিয়ে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে খেলা শুরু করলো। চোখে ভেসে ওঠে তার বীরমূর্তি, কানে শোনে তার মধুরগম্ভীর কণ্ঠস্বর; জীবন ঘরে ঢুকতেই একটি দূর বনান্তের গন্ধ যেন সঙ্গে ঢুকত—নাসায় পায় সেই সুগন্ধ; আর দুটো ইন্দ্রিয় এখনো উপবাসী, কল্পনায় পূরণ হয় তাদের সাক্ষ্যের অভাব। হঠাৎ জপমন্ত্রের মতো তার মুখে উচ্চারিত হ'তে থাকে—জীবন তারই, জীবন তারই, জীবন তারই, রুমালী কে? একটা দুঃস্বপ্ন বৈ তো নয়। না, না, জীবন তারই। তাকেই রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে প্রাণ বিপন্ন ক'রে কতবার শহরে এসেছে—আর একাকী গিয়ে উদ্ধার ক'রে এনেছে শাহ্‌জাদার কবল থেকে? বীর আমার, প্রভু আমার—হঠাৎ মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়,—স্বামী আমার—

তখনি চমকে উঠে জিভ কাটে। কিন্তু তখনি যাবতীয় পূর্ব সংস্কার ঠেলে দিয়ে সবেগে বলে ওঠে, নয় কেন? কোন্‌ কুমারী না নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করবে জীবনের মতো স্বামী পেলে? কোন্‌ কুমারী না আকাঙ্ক্ষা করবে জীবনের মতো স্বামী পেতে। তবে নয় কেন?

তিন মাস আগে হ'লে এই বিদ্রোহের সুর শুনে ভীত হয়ে পড়ত তুলসী, কিন্তু আজ একেই স্বাভাবিক বলে মনে হ'ল। তিন মাস আগে সে ছিল শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী গৃহস্থ কুমারী, অভাবিত দুর্ভাগ্যের হস্তক্ষেপে আজ স্বপ্রতিষ্ঠ স্বাধীনা; চতুষ্কলে বেষ্টিত উপত্যকার শান্ত হ্রদে কখন ভেঙে পড়ল গিরিশিখর,

ছুটে বেরিয়ে এল জলপ্রবাহ, বৃহৎ জগৎ যার কাছে আজ আদৌ অপরিচিত নয়। এই ক'মাসে দুর্ভাগ্যের পাষাণতটে আহত প্রহৃত হ'তে হ'তে একদিকে সে যেমন সংসারের রূপ বুঝেছে তেমনি নিজেকেও আবিষ্কার করেছে। বুঝেছে যে মানুষ আর যাই হোক জড়পদার্থ নয়, ইচ্ছা থাকলে নৈতিক পতনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে।

তার পরিবর্তন সুখানন্দের চোখে না পড়লেও নয়নচাঁদের চোখ এড়ায় নি। তুলসীকে দেখে তার কথা শুনে সে বলে উঠেছিল, তুলসী, এই তিন মাসে যে তিন বছর বয়স বেড়ে গিয়েছে তোর।

তিন বছর নয় দাদা, তিরিশ বছর।

বলিস কি রে? এ কেমন ক'রে হ'ল?

আত্মরক্ষার তাগিদে। দ্যাখো নি বানের জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাতারাতি বেড়ে ওঠে পদ্মের নাল।

এ তো সেই তিন মাস আগেকার তুলসীমণির কথা বলে মনে হয় না।

কেমন ক'রে হবে দাদা, আমি যে তুলসী বুড়ী।

তাই তো দেখছি।

কালের বয়স আমার যাই হোক, অভিজ্ঞতার বয়স আমার ভূতি বুড়ীর চেয়েও বেশি।

উত্তর দেয় না নয়নচাঁদ, শুধু বলে, এ কয় মাস খুব দুঃখ পেয়েছিস। অবশ্য আমরাও কম দুঃখ পাই নি।

তারপরে বলে, কোন্ কুক্ষণে যে তুই স্বরূপের সঙ্গে বের হয়ে গিয়েছিলি?

বাড়ি বসে থাকলে আমার কি অবস্থা হ'ত ভেবে দ্যাখো। বাড়ি বাড়ি কি হয়েছে দেখছ তো।

তা দেখছি বটে। আচ্ছা তুলসী, তুই বিয়ে করবি নে?

এবারে হেসে ওঠে তুলসী, বলে, দাদা আর কিছু কি বলবার পেলে না। হিন্দুস্থানময় তোলপাড়—এর মধ্যে বিয়ে।

অবশ্য সেই সঙ্গেই মনে মনে বলে, ঠিক সে অর্থে বলে না—তবু ঐ রকম বলাই হ'ল, জীবন কখন ফিরে আসবে?

নয়ন শুধোয়, হ্যাঁ রে জীবনলালজী কবে ফিরবে কিছু বলে গিয়েছে কি?

আমার সঙ্গে কথা হয় নি, বলে তুলসী।

নয়ন নিজেই ব্যাখ্যা দেয়। বলে, জঙ্গী আদমী তো, ইচ্ছা করলেই ফিরতে পারে না, তবে ফিরবে জানি।

তোমার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল ?

না, যাওয়ার সময়ে নাকি বাবাকে বলে গিয়েছে, শীঘ্রই ফিরবে।

শ্যামসুন্দরের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বারে বারে তুলসী বলে, ফিরবে ফিরবে, অবশ্যই ফিরবে, শীঘ্র তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো ঠাকুর।

বলে, মানুষের কাছে যা বলতে মুখে বাধে, নিজের কাছে বলতেও জিভ সরে না, তা যদি তোমার কাছে বলতে না পারলাম তবে আর তুমি দেবতা কেন, অন্তর্যামী কেন! ঠাকুর সে-ই আমার স্বামী।

সুখ-সঙ্কল্পের ঘোরে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে শ্যামসুন্দরের পায়ের কাছে।

বহিন, বহিন, শীগ্‌গির দরজা খোলো।

দরজায় ধাক্কা শুনে ধড়মড় ক'রে জেগে উঠে রুমালী, দেখে যে শয্যা শূন্য। তখন মুহূর্তে রাতের সব কথা মনে পড়ে যায়, জীবন আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েও আসে নি। আশাভঙ্গের ক্ষোভে মন ভরে যায়, বিশ্বচরাচর তিক্ত বিষাক্ত।

'কি হ'ল' বলতে বলতে দরজা খোলে রুমালী, সম্মুখে দাঁড়িয়ে পল্টন, তার চোখ মুখ কালো।

কি হ'ল রে তোর ?

সে প্রায় কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে বলে, বহিন, জীবনলালজী গ্রেপ্তার হয়েছে।

গ্রেপ্তার হয়েছে !

কথাটার মর্ম অনুধাবন করতে পারে না, শুধোয়, কি হয়েছে ?

গ্রেপ্তার।

কে করল ? কখন করল ? জানলি কি ক'রে ?

কাল রাতে যখন সে শহরে ঢুকছিল আবুবকরের বরকন্দাজ গ্রেপ্তার করেছে। আজ যখন এখানে আসছিলাম ঘণ্টেওয়ালা ডেকে বলল, পল্টন, তোর রুমালী বহিনের দাদা তো গ্রেপ্তার হ'ল। শুনেই ছুটে আসছি।

জীবনলাল গ্রেপ্তার হয়েছে। এখন কি করা যায়—বসে পড়ে রুমালী। কোন কিনারা খুঁজে পায় না।

তার মনের খুব ভিতরে, প্রায় অগোচরে কে যেন বলে ওঠে, তাই বলো। গ্রেপ্তার হয়েছে বলেই আসতে পারে নি, নতুবা সে কি না এসে পারে। আর সে গ্রেপ্তার কিনা তার আহ্বানে আসতে গিয়েই। তখনি মনের মধ্যে খুব মিহি একটা আনন্দের রেখা ফুটে ওঠে। জীবনের গ্রেপ্তারে দুঃখ ; তার

আহ্বানে আসতে গিয়ে গ্রেপ্তার তাই আনন্দ, আর এই গ্রেপ্তারের মূল হেতু যে তুলসী তার উপরে বিজাতীয় বিদ্বেষ, এতগুলি বিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী ভাব বর্ষার আকাশের ইন্দ্রচাপের মতো দেখা দিতে থাকে তার মনের মধ্যে। যারা বলে মানুষ ভগবানের সৃষ্টি তারা কম বলে, ভগবানে ও শয়তানে অন্তত একবার সহযোগিতা হয়েছে মানুষ সৃষ্টির কাজে।

কোন প্রতিকার পড়ে না রুমালীর চোখে, মূঢ়ের মতো বসে থাকে, পাশেই নীরব নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে থাকে পল্টন।

তুলসীর যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা হয়েছে। তাড়া তাড়ি শ্যামসুন্দরকে প্রণাম সেরে বের হয়ে এসে ভূতি বুড়ীকে বলল, ডাকিস নি যে বড়!

কে কাকে ডাকবে দিদি, আমি কি আর আমাতে আছি।

কেন কি হ'ল আবার তোর?

আমার আবার কি হবে! ভোর না হ'তেই উজীর সাহেবের তুরুক সওয়ার এসে হাজির, এখনি যেতে হবে কর্তাবাবুকে!

কোথায়?

উজীর সাহেবের কুঠিতে।

কেন?

তুরুক সওয়ার কবে কেনর উত্তর দেয় দিদি?

দাদা কোথায় গিয়েছেন?

সে যে কখন কোথায় যায় কাউকে বলে যায় কি?

এ আবার কি বিপদ! বলে ওঠে তুলসী।

বিপদ নয়! যেদিন তুমি স্বরূপদাদার সঙ্গে বের হয়ে গেলে সেদিন থেকে এ বাড়িতে শান্তি নেই।

থাম, থাম, আর পণ্ডিতের মতো কথা বলিস নে!

কখন যে ওরা ফিরবে?

তুরুক সওয়ারের ডাকে গেলে কাউকে তো বড় ফিরতে দেখি না!

আবার! ফের! ধমক দেয় তুলসী। তখন তার মনে হঠাৎ বিদ্যুতের মতো খেলে যায় জীবন নিরাপদে আছে তো! তার তো কোন বিপদ-আপদ ঘটে নি! চারদিক তাকিয়ে কোথাও কূল দেখতে পায় না। ছুটে চলে যায় শ্যামসুন্দরের ঘরে, পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বলে, ঠাকুর, এ কি করলে, আমি যে বড় একলা।

॥ ৭ ॥

জীবনলালের বিচার

সুখানন্দ পণ্ডিত হাকিম সাহেবের কুঠিতে পৌছতেই একজন চাপরাসী তাকে নিয়ে যায় আসানুল্লার খাস কামরায়। তারপরে যায় খবর দিতে উজীর সাহেবকে। এই রকমই হুকুম ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আসানুল্লা প্রবেশ করে। দু'জনে সেলাম বিনিময় শেষ হ'লে সুখানন্দ শুধোয়, হঠাৎ জোর তলব কেন, হাকিম সাহেব?

অনেক কথা আছে, স্থির হয়ে বসুন।

তবু ভালো। তুরুক সওয়ার দেখে আমি ভাবলাম বুঝি বা এতদিন পরে শির যায়।

সেই রকমই যোগাড় প্রায় হয়েছে, তবে কার শির যাবে সেটাই সমস্যা।

কেমন?

এমন সময়ে খানসামা এসে দু'জনকে আলবোলা দিয়ে গেল। সুখানন্দর জন্য জলশূন্য।

হাকিম সাহেব বলল, নিন, আগে একটু আয়েস করুন, তারপরে কাজের কথা হবে।

ধূমপান করতে করতে সুখানন্দ বলল, বাড়িতে ঢোকবার সময়ে চোখে পড়লো আপনার এজলাস-ঘরে অনেক লোক। এত সকালে কি ব্যাপার?

সেইজন্যেই তো ডেকেছি।

আমি তো ভেবে পাচ্ছি না বিচার-এজলাসের সঙ্গে আমার কি যোগ থাকতে পারে।

হেসে উঠে আসানুল্লা বলে, এই তো হেরে গেলেন পণ্ডিতজী, দূর আসমানের গ্রহনক্ষত্রের খবর রাখেন, আর নিজের ঘরের খবর রাখেন না।

কথাটা নেহাৎ ভুল নয় হাকিম সাহেব। এই গদরে ঘর আর বাইরে জট পাকিয়ে গিয়েছে। তবে একটা সুখবর আছে, আজই আপনাকে জানাতাম, তার আগেই এই তলব।

আমিই না হয় আপনাকে সুখবরটা দিই, দেখুন জ্যোতিষ জানি কি না। পরশু রাতে তুলসীমাঈ ফিরে এসেছে।

চমকে ওঠে সুখানন্দ, কি ক'রে জানলেন?

এখনই শেষ হয় নি, আরো আছে, শুনুন। মীর্জা আবুবকর লুটে নিয়ে গিয়েছিল তাকে, কোম্পানীর এক রেসালাদার তাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে পৌঁছে দেয় আপনার বাড়িতে।

বিস্ময়ে বলে সুখানন্দ, আপনি কি জাদু জানেন ?

জাদু না জ্যোতিষ ?

হাকিম সাহেব, জ্যোতিষ জানি বলেই জানি যে জ্যোতিষে এত কথা জানা যায় না।

তবে না হয় ধরুন লোকমুখে সব শুনেছি।

এত কথা সেই রেসালাদার ছাড়া তো আর কারো জানবার নয়।

মনে করুন তার মুখেই শুনেছি।

কোথায় পেলেন তাকে ? সে তো কোম্পানীর ছাউনিতে।

না, সে আমার ঐ এজলাস-ঘরে।

সেখানে কেন ?

আসামীর স্থান এজলাস ছাড়া আর কোথায় হবে ?

কি বলবে ভেবে পায় না সুখানন্দ, শুধু মূঢ়ের মতো আবৃত্তি করে, এজলাসে, এজলাসে ?

হ্যাঁ, এজলাসে, যার একদিকে গারদ আর একদিকে ফাটক।

এতক্ষণে নামটা মনে পড়ে সুখানন্দের। বলে ওঠে, জীবনলাল কি শেষে ফাটকে যাবে! হাকিম সাহেব, সে যে আমার পরম উপকারী।

বিচলিত হবেন না পণ্ডিতজী, তাকে ফাটকে পাঠাবো স্থির করলে আর আপনাকে ডেকে পাঠাতাম না। তাকে খালাস ক'রেই দেবো, তার আগে একটু সলাহ্ করতে চাই আপনার সঙ্গে।

তার আগে বলুন, জীবনলাল ধরা পড়লো কখন।

কাল রাতে শহরে ঢুকছিল সেই সময়ে।

হঠাৎ শহরে আসতে গিয়েছিল কেন ?

ওর বহিনের বেমারির খবর পেয়ে।

সুখানন্দ বলে, বুঝেছি, রুমালীমাঈ। ঠিক বহিন নয়, তবে বহিনের চেয়ে কমও নয়।

আপনিই বা এত খবর জানলেন কি ক'রে ?

জানবো না! রুমালীর ঘরে আজ তিন মাস লুকিয়ে ছিল তুলসী। রুমালী আশ্রয় না দিলে ওকে কি আর ফিরে পেতাম!

সেখানে গেল কি ক'রে ?

আপনাকে বলেছি সাহেব, কাজের চাপে সব কথা ভুলে গিয়েছেন। ইমানী বেগমের কুঠি থেকে আসবার পথে তাকে লুট করবার চেষ্টা হয়। তখন ভগবানের দয়ায় পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় রুমালীর কুঠিতে।

তাই বলুন, এখন সব কথা মনে পড়ছে। তাহলে তুলসীমাঈর উপরে শাহ্‌জাদার অনেক দিন থেকে নজর।

আসাদুল্লার চাপা কণ্ঠস্বরে শাহ্‌জাদা শব্দটা শোনায় অনেকটা হারাম-জাদার মতো।

এবারে বলুন জীবনলালকে গ্রেপ্তার করলো কারা ?

মীর্জা আবুবকরের লোক।

হঠাৎ ? সে তো অনেকদিন আসা-যাওয়া করছে।

পণ্ডিতজী, আপনি সত্যি সত্যি কেতাবীমানুষ। কেন ধরলো বুঝতে পারছেন না! বেশ তো, এখন খোল আর নলচেতে মিলিয়ে নিন, আস্ত একটি হুঁকো দেখতে পাবেন।

আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, হাকিম সাহেব, সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। আপনিই বলুন।

তুলসীকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল—সেই আক্রোশে সেই অপমানে তাকে গ্রেপ্তার করলো।

বেশ তো, গ্রেপ্তার যখন করলো তখন বিচার করলো না কেন ?

সে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে বখৎ খাঁ। বিচারের অধিকার এখন উজীর হিসাবে আমার আর সিপাহ্‌সালার হিসাবে বখৎ খাঁর।

তবে বখৎ খাঁর কাছে না পাঠিয়ে আপনার কাছে কেন ? জীবনলাল কোম্পানীর রেসালাদার, তার বিচার হবে সিপাহ্‌সালারের এজলাসে।

আপনার প্রশ্নের জবাব দেব, তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন।

কি বলুন।

জীবনলাল একাকী মীর্জা আবুবকরের কুঠি থেকে তুলসীমাঈকে ছিনিয়ে নিয়ে এলো কিসের বলে ?

এত কথা কি আমার ভাববার সময় ছিল হাকিম সাহেব, তুলসীমাঈকে ফিরে-পেয়ে সব ভুলে গেলাম। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তাই তো, কিসের বলে বাঘের মুখ থেকে জীবনলাল ছিনিয়ে নিয়ে এল তুলসীকে ?

তার হাতে নিশ্চয় এমন কোন অস্ত্র ছিল যার ভয়ে ছেড়ে দিতে হয়েছিল তুলসীকে আর সেই একই ভয়ে জীবনলালকে পাঠাতে সাহস করে নি বখৎ খাঁর এজলাসে।

পণ্ডিতজীর মুখের দিকে তাকিয়ে আসাদুল্লা বোঝে যে, সে কিছুই বুঝতে পারে নি। তখন একটু এগিয়ে এসে বলে, জীবনলালের হাত দিয়ে মীর্জা আবুবকর কোম্পানীর জেনারেলের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, সেই চিঠি প্রকাশ ক'রে দেবে বলে শাসায় জীবনলাল, তখন বাধ্য হয়ে তুলসীকে ছেড়ে দেয় মীর্জা আবুবকর। কিন্তু মনে মনে গজরাতে থাকে অপমানে আর প্রথম সুযোগেই তাকে গ্রেপ্তার করে। তবে তাকে পাঠানো চলবে না। বখৎ খাঁর কাছে, চিঠির কথা ফাঁস ক'রে দিলে আবুবকরেরও সঙ্কট।

সুখানন্দ বলে, আপনার কাছে ফাঁস করতে পারে এ আশঙ্কা কি করে নি ?

করেছিল, তবে কি জানেন, শাহ্‌জাদারা অনেকেই আমার হাত দিয়ে কোম্পানীর ছাউনিতে চিঠি পাঠিয়েছে, কাজেই আর একখানা চিঠিতে কি হবে, এইরকম ভেবেছিল। বরঞ্চ ভেবেছিল আমার হাত দিয়ে চিঠি চালা-চালি হয় সেই দোষ ঢাকবার উদ্দেশ্যে জীবনলালকে সরাসরি কোতল করবার হুকুম দেব।

তারপরে একটু থেমে বলে, বুদ্ধিটা মন্দ আঁটে নি কিন্তু মাঝে মাঝে বঁড়শির দোষে মাছের টানে শিকারী অথৈ জলে গিয়ে পড়ে।

কেমন ?

কেমন কি, বুঝলেন না ? আমি যে চিঠি চালাচালি করি সে কথা ফাঁস করতে গেলে শাহ্‌জাদাদেরও মরতে হবে। কিন্তু আমার হাতে এমন প্রমাণ আছে যে, শাহ্‌জাদারা চিঠি চালাচলি করে।

কিন্তু তাতে যে মরবে জীবনলাল।

পাগল নাকি, তখন সে থাকবে কোম্পানীর ছাউনিতে আর তা ছাড়া সে চিঠি তো এখনই পেশ করছি না।

বুঝেছি, ক্ষেত্রে কর্ম বিধিয়তে। কিন্তু এত কথা জানলেন কি করে ?

আসামীকে সওয়াল ক'রে।

কি সর্বনাশ ? প্রকাশ্য এজলাসে এই সব গোপন কথা প্রকাশ হ'ল ?

পাগল হয়েছেন পণ্ডিতজী ! ব্যাপারটা আভাসে বুঝতে পেরেই এজলাস থেকে বাজে লোক সরিয়ে দিলাম, কেবল থাকলো আমার দু'চারজন বিশ্বস্ত কর্মচারী।

এখন আসামীর প্রতি কি হুকুম ?

ওকে সমর্পণ করবো আপনার হাতে, তবে সেটা লুকিয়ে। আর শাহ্‌জাদাকে বলে পাঠাবো কোম্পানীর রেসালাদারের বিচার করবার এক্তিয়ার নেই উজীরের, তাই তাকে পাঠিয়ে দিলাম বখৎ খাঁর কাছে। তখন দেখুন কেমন জোঁকের মুখে মুন পড়ে।

কিন্তু সত্যি তো ওকে পাঠাচ্ছেন না বখৎ খাঁর কাছে।

কিন্তু কথাটাতেই দশটা সত্যের কাজ হবে।

এ সব বিষয়ে আমার মাথা খেলে না, আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করুন। কিন্তু একবার দেখা হয় না জীবনলালজীর সঙ্গে ?

অবশ্যই হবে, তারই এই ভূমিকা। এজলাস থেকে উঠে আসবার সময়ে বলে এসেছি তোমরা অপেক্ষা করো, খাস কামরায় বসে ভেবে দেখি, তারপরে না হয় আবার আর এক দফা সওয়াল করবার জন্যে তলব করবো আসামীকে।

জীবনলাল কি ভয় পেয়ে গিয়েছে ?

ভয় পাওয়ার ছেলেই বটে সে! দারুণ জেরার সম্মুখেও তার মুখের হাসি মিলোতে চায় না। দাঁড়ান, ডেকে পাঠাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জীবনলাল এসে সেলাম ক'রে দাঁড়ায়। সুখানন্দকে দেখে অবাক হয়ে যায়—তুলসীর বাবা এলেন কোথা থেকে।

সুখানন্দ সস্নেহে শুধায়, জীবনলাল বাবা, সব ভালো তো।

পণ্ডিতজী, রাতটা যদি গারদে কাটাতে হয় আর অদূর সম্মুখে যদি ফাটক দেখা যায়, তবে ভালো আর কেমন ক'রে বলি।

ভয় পেয়ো না বাবা, উজীর সাহেব সুবিচারক।

সেটাই তো আরও ভয়ের। অবিচারকের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হ'লেও সুবিচারকের হাত এড়ানো কঠিন।

সে কি রকম ?

সুবিচারের অভিমান এমনি এক প্রেরণা যে, আসামীর খালাস পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

এবারে আসাদুল্লা কথা বলে, জীবনলাল, আমি সুবিচারক কি না জানি না, তবে তোমাকে খালাস ক'রেই দেব।

সে কী উজীর সাহেব, একেবারে বেকসুর ?

বেকসুর, তবে বে-ওজর নয়, ওর মধ্যে একটু চালাকি করতে হবে।

তোমার সব বিবরণ বলেছি পণ্ডিতজীকে। তুমি ওঁর উপকারী কাজেই আমার দোস্ত। তবে জানো তো, উজীরের দোস্তি সব সময়ে নিরাপদ নয়। সেইজন্যই চালাকি আবশ্যক। এজলাসে গিয়ে আহেদির উপরে হুকুম দেব তোমাকে বখৎ খাঁর দরবারে নিয়ে যেতে। তবে তাদের উপরে গোপন হুকুম থাকবে অন্যরকম, তারা পৌঁছে দেবে তোমাকে পণ্ডিতজীর কুঠিতে। সেখানে দিন-দুই গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে, তারপরে ব্যাপারটার জের চুকে গেলে কোম্পানীর ছাউনিতে চলে যেয়ো। তখন যদি ইচ্ছা হয় তোমার বহিনকেও দেখে যেতে পারবে।

জীবন ভাবে, এ তো বেকসুর ও বে-ওজর খালাস। কাল রাতে ভেবেছিল ফাঁসি শূল কয়েদ—না জানি কি হবে। এত সহজে খালাস পেয়ে একই সঙ্গে উল্লসিত ও বিস্মিত হ'ল। কিন্তু এত কথা তো বিচারককে বলা যায় না, তাই প্রসন্ন কৃতজ্ঞতায় একটি সেলাম করলো।

যাও তুমি এজলাসে যাও, আমি আসছি। জীবনলাল প্রস্থান করলে পণ্ডিতজীকে বলল, আপনি যেমন খিড়কি দরজা দিয়ে এসেছিলেন তেমনি বেরিয়ে চলে যান। একটু চোখ কান খুলে রাখবেন, ঝামেলা মিটে যাওয়ার আগে জীবনলালকে বাড়ির বাইরে যেতে দেবেন না।

সুখানন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আপনার আবার কবে দেখা পাবো?

দাঁড়ান, এবারে শুরু হবে বাঘের খেলা। আগে সেটা সামলে নিই।

বাঘের খেলা আবার কি?

এখনই এসে পড়বে শাহ্‌জাদার লোক—কি সাজা হ'ল জীবনলালের জানবার জন্যে।

যখন জানবে যে বখৎ খাঁর হাতে দিয়েছেন আসামীকে, তখন!

তখনই তো শুরু হবে বাঘের খেলা। শিকারী বুঝবে যে, বঁড়শি বিঁধে নিজেই পড়েছে জলে। এগোন পণ্ডিতজী, আর বিলম্ব করবেন না।

সুখানন্দ খিড়কির দিকে, আসাদুল্লা এজলাসের দিকে প্রস্থান করে।

আহেদিরা জীবনলালকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে এজলাস প্রায় শূন্য হ'ল। আসাদুল্লাও উঠবে উঠবে করছে, এমন সময়ে আবুবকরের খাস খানসামা চুনিলাল ঢুকে সেলাম ক'রে দাঁড়ালো।

কি খবর চুনিলাল?

আসাদুল্লা জানতো চুনিলালকে।

হুজুর, শাহ্‌জাদা জানতে চাইলেন, আসামীর কি সাজা হ'ল।

চুনিলাল, আসামী যে-সে লোক নয়, কোম্পানীর রেসালাদার মেজর, রীতিমতো বড় অফিসার। এ-সব জঙ্গী অফিসারের বিচার করবার ক্ষমতা আমার নেই তো। তাই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি সিপাহ্‌সালারের কাছে।

আসানুল্লার সিদ্ধান্ত শুনে চুনিলাল কাঠ হয়ে যায়। কি সর্বনাশ! বখৎ খাঁর কাছে পত্রঘটিত বৃত্তান্ত প্রকাশ হ'লে শাহ্‌জাদা চূড়ান্ত অপদস্থ হবে। খাস খানসামা হিসাবে শাহ্‌জাদার কুকীর্তির কোন বিবরণই অজানা নয় চুনিলালের।

চুনিলালের দারুভূত রূপ যে তার মনিবের রূপেরই পূর্বাভাস, এ-কথা বুঝলো আসানুল্লা। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে কাটা ঘায়ের উপরে নুনের ছিটে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, শাহ্‌জাদাকে আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম জানিয়ে ব'লো যে, আমি আইনের গোলাম, আইন বলছে জঙ্গী আসামীর বিচারের মালিক সিপাহ্‌সালার। পাঠিয়ে না দিয়ে উপায় কি! তবে কি জানো, বখৎ খাঁ খুব কড়া লোক, এতদিন গরীব-গুরবোকে ফাঁসি দিয়ে অনেক দড়ি নষ্ট করেছে, এবারে রঙীন আসামী পেয়েছে, সহজে ছাড়বে না।

চুনিলাল আর কিছু বলবার না পেয়ে ব'লে ওঠে, ফাঁসি হবে নিশ্চয়!

ফাঁসি ব'লে ফাঁসি। দোবরা ফাঁসি। এতক্ষণ বোধ করি হয়েই গেল। কি, চললে নাকি চুনিলাল?

হাঁ হুজুর, থেকে আর কি করি।

সেই ভালো, শাহ্‌জাদাকে গিয়ে খোস খবরটা দাও গে। বরঞ্চ এক কাজ করো না, একেবারে ওদিকটা ঘুরে নিজের চোখে দেখে যাও না, আসামী ঝুলে পড়লো কি না। অমনি নজর রেখো, আসামীর জেব থেকে চিঠিপত্র কিছু বের হ'ল কি না।

মারাত্মক ইশারা। বিনা অভিবাদনে ছুটে বেরিয়ে চ'লে যায় চুনিলাল।

শূন্য এজলাসে ব'সে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে আসানুল্লা। হো-হো-হো! অনেক দিন এমন প্রাণ খুলে হাসবার অবকাশ পায় নি। হো-হো-হো! জ্যয়সা কো ত্যয়সা! হো-হো-হো! হাসি আর থামতে চায় না।

॥ ৮ ॥

রুমালী কি দেখল

সুখানন্দ বাড়িতে পৌঁছে দেখতে পেলো যে, বাইরের ঘরে নয়নচাঁদ ও তুলসী অপেক্ষা করছে। নয়ন অপেক্ষা ক'রে না থেকে উজীর সাহেবের কুঠিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, তুলসী যেতে দেয় নি। দাদা যে রগচটা, ভালো করতে মন্দ ক'রে বসবে, তার চেয়ে এখানে থাক।

সুখানন্দ এখানে পৌঁছতেই তারা ছেঁকে ধরলো, কি হয়েছে বাবা, এত সকালে তলব হয়েছিল কেন?

সুখানন্দ বলল, সব বলছি আগে বসতে দাও। তারপরে আসন গ্রহণ ক'রে জীবনলাল সম্পর্কিত সব কথা বলতে শুরু করে, কেবল চিঠি-চালাচালির কথাটা বাদ দেয়, নয়নচাঁদ একে সিপাহী পক্ষের লোক তাতে গোঁয়ার, কি করতে কি ক'রে ফেলবে। অবশ্য জীবনকে বেকসুর খালাস দেওয়ার একটা কারণ দর্শানো আবশ্যক, তাই বলে যে জীবনলাল আমাদের পরম উপকারী, তাই তাকে মেয়াদ না দিয়ে আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, এই ব্যাপারের ঝামেলা মিটে না যাওয়া অবধি তাকে যেন আমরা লুকিয়ে রাখি।

নয়ন ও তুলসীর জেরার মুখে বিষয়টাকে বিস্তারিত করতে যাচ্ছিল সুখানন্দ, এমন সময়ে পাইকের জিম্মায় জীবনলাল বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হ'ল। পাইক দুজন তাকে ছেড়ে দিয়েই প্রস্থান করলো, সুখানন্দ উঠে গিয়ে তাকে ভিতরে টেনে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো।

এখানে থাকা নিরাপদ নয়, চলো ভিতরে চলো।

জীবনলালকে নিয়ে অন্দরমহলের দিকে এগোয় সুখানন্দ, পিছনে চলে নয়ন ও তুলসী। চকমিলানো বাড়ির উঠোনের মধ্যে প্রকাণ্ড ইঁদারা।

জীবনলাল বলে, পণ্ডিতজী, তার চেয়ে হুকুম করুন ঐ ইঁদারার মধ্যে লাফিয়ে পড়ি। ওর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আর কি হবে। আবার বেশ ঠাণ্ডাও।

ঠাট্টার কথা নয় বাবা, দিল্লি শহরের অনেক পুরানো ইঁদারার মধ্যেই লুকিয়ে থাকবার মতো ছোটখাটো ঘর আছে।

সত্যি নাকি? হঠাৎ এমন ব্যবস্থা কেন?

দিল্লি যে গদরের শহর। নাদির শা, আহমেদ শা আবদালি, গোলাম

. কাবে, মাধোজী সিন্ধিয়া, কার না নেকনজর পড়েছে এই শহরের উপরে! কেউ বা টাকাকড়ি চায়, কেউ বা তার চেয়ে বেশি। ইঁদারার মধ্যে লুকিয়ে থেকেও স্বস্তি নেই-! কেমন সুখের স্থান দেখছ তো।

জীবন বলে, পণ্ডিতজী, এরকম সুখের স্থানের অভাব নেই হিন্দুস্থানে। লখনৌতেও ঠিক এই রকম, নবাব আর উজীরের অত্যাচারে সবাই অস্থির।

লখনৌর এত খবর জানলে কি ক'রে।

আমরা যে লখনৌর অধিবাসী।

তাই নাকি, বেশ বেশ। পরে ধীরেসুস্থে সব শুনবো।

ততক্ষণে তারা অন্দরমহলের ভিতরের দিকে এসে পড়েছে। এ মহলটা পুরাতন, কেউ বড় থাকে না, আর বাইরের লোকেরও এদিকে আসবার সম্ভাবনা কম।

কি বলো নয়ন, এখানেই ওর থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যাক?

নয়ন বলল, আমি কাহ্নাইয়াকে ডেকে ধুইয়ে মুছিয়ে সব পরিষ্কার করিয়ে দিচ্ছি। এক ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে।

ততক্ষণ আমার ঘরে গিয়ে বসো। আর পোশাক খুলে ফেলে একটা ধুতি পরো, গা ঠাণ্ডা হোক। তারপরে স্নানাহার ক'রে ঘুমোও, কাল রাতে নিশ্চয় ঘুমও হয় নি, আহারও জোটে নি।

জীবন নীরবে হাসে।

তুলসী মা, নয়ন আর আমাকে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়, সব সময়ে বাড়িতে থাকতে পারি না, কাজেই জীবন তোমার জিম্মায় রইল।

তারপরে মনে করিয়ে দেয়, জীবনলালের জন্যই তোমাকে ফিরে পেয়েছি, আবার তোমার জন্যেই জীবনলাল গ্রেপ্তার হয়েছে—এইসব কথা মনে রেখে ওর যত্ন-আত্তি করবে। আর দেখো, বাইরে যেন জানাজানি না হয়।

তা কি ক'রে সম্ভব বাবা। কাহ্নাইয়া খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসেই ত-ত-ত ক'রে শুধোবে, ওটি কে হয় দিদি। তখন?

তখন যা বলবার আমি বলবো, বলবো আমার মৌসেরা ভাই।

বিশ্বাস করতে বয়েই গিয়েছে কাহ্নাইয়ার, বুঝবে, কাউকে লুকিয়ে রেখেছে।

রেখেছি তো রেখেছি বেশ করেছি, যা এখন ওর স্নানের ব্যবস্থা ক'রে দে।

জীবন বলে, তুলসী, এ কোন্ অন্ধকূপে নিয়ে এলে। এর চেয়ে যে বখৎ

খাঁর ফাটক অনেক ভালো।

ভাল বইকি! ফাটক তো কখনো দেখ নি।

দেখি নি, কি বলছ? কাল রাতটা কেটেছে উজীর সাহেবের গারদে। তার আগে এক রাত কেটেছিল মীর্জা আবুবকরের গারদে।

তার কুঠিতে আগেও গিয়েছিল নাকি? কেন?

সে অনেক কথা, পরে ধীরে সুস্থে না-হয় বলা যাবে। কিন্তু এ যে অন্ধকার।

বাতি জাললেই আলো হবে।

তা যেন হবে, কিন্তু দিনের বেলায় বাতি জালতে হবে কেন?

তোমাকে লুকিয়ে রাখবার জন্যে। এই অমূল্য রত্নটি বাবা আমার হাতে সমর্পণ করেছেন। শোন নি, তিনি বলেছিলেন খুব সাবধানে ওকে রাখিস মা!

কিন্তু সাবধানতায় যে পান্নাকে ছাড়িয়ে গেলে দেখছি।

চমকে উঠে তুলসী শুধোয়, পান্নাটি আবার কে?

আমার বোন।

বোন! এক বোন তো দেখলাম রুমালী। এখন আবার শুনছি পান্না। এরকম আর ক'টি বোন আছে?

আরও একটি।

সেটি কে, হীরা না মুক্তা?

তার নাম তুলসী!

হঠাৎ তীব্র আপত্তি ক'রে তুলসী বলে, না, না, আমি তোমার বোন হ'তে চাই না।

তারপরে সন্দেহের স্বরে বলে, তা তোমার সেই বোন তোমাকে কয়েদ করেছিল কেন?

তুমি যে জন্য করেছ।

পান্নার সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত হ'তে চায় না, তাই বলল, আমি তো কয়েদ করতে চাই না। যাও না, বেরিয়ে গিয়ে ধরা পড়ো বখৎ খাঁর হাতে।

পান্নাও বলেছিল ঠিক এই কথাই।

সেখানে তো বখৎ খাঁর ভয় ছিল না।

কে বলল ভয় ছিল না! এই বখৎ খাঁ-ই ছিল সেখানে।

তুলসী বলে, শুনেছি, বখৎ খাঁ বেরিলি শহরের লোক।

পান্নাও।

সব খুলে বলো।

বলছি, তার আগে ঐ ঘুলঘুলির পাল্লাটা খুলে দাও।

আলো আসবে যে।

নইলে তোমাকে দেখবো কি ক'রে?

কৃত্রিম বিরক্তির সঙ্গে তুলসী বলে, আমাকে এত দেখবার কি আছে?

সে তুমি কি ক'রে জানবে? ঊষা কি নিজেকে দেখতে চায়?

চমকে ওঠে তুলসী বলে, ঊষা! আর-এক বোন তাকি?

এবারে জোরে হেসে ওঠে জীবন, বলে, বোন হ'তে যাবে কেন? ঊষা মানে তুমিই, মানে একটু কবিত্ব ক'রে বললাম।

তুলসী চৌকির উপরে উঠে ঘুলঘুলির পাল্লা খুলে দিতে দিতে বলে, না, ও আর কবিত্বে দরকার নেই।

কেন দরকার নেই তুলসী। তুমি যদি হও ঊষার আলো, পান্না তবে জ্যোৎস্নার আলো।

তুলসীর ওষ্ঠাধরে অভিমান ঘনীভূত হয়ে ওঠে। বলে, তবে জ্যোৎস্নার আলো ছেড়ে ঊষার আলোয় কেন?

রাগ করলে; বুঝতে চেষ্টা করলে না যে, জ্যোৎস্নার আলো ঊষার কাছে ধার করা আলো।

জীবন হঠাৎ তাকায় তুলসীর মুখে, ঘুলঘুলি দিয়ে পিচকারির মতো আলো পড়েছে তুলসীর মুখের উপরে। আকাশের সমস্ত আলো একটি সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে এসে রাঙিয়ে তুলে দীপ্যমান ক'রে তুলেছে একখানি মাত্র কিশোর কোমল করুণ মুখচ্ছবি। ঐ আলোর রেখাটি, ঐ মুখের ছবিটি ছাড়া চরাচরে আর কিছু নেই। অবাক হ'য়ে নিস্পলক তাকিয়ে থাকে জীবন।

তুলসী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কথা ফুটলো না, শুধু নড়ে উঠল ঠোঁটের রাঙা পাপড়ি, তাতে আরো বেশি প্রকাশ পেলো মনের কথাটি। সময়বিশেষে নীরবতাই মুখরতা।

দুজনে মুখোমুখি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে, একটি অলক্ষ্য বৈদ্যুত ও একটি অব্যক্ত গন্ধের পরিমণ্ডলে দুজনে বেষ্টিত, থমথম করছে ঘরের আবহাওয়া, রি-রি ক'রে কাঁপছে শূন্যতা, ঝমাঝম লাগিয়েছে দেহের শিরা-উপশিরায় ছায়ানটের ঝঙ্কার। জীবনের সমস্ত অস্তিত্ব দুই চক্ষুর মধ্য দিয়ে নির্গলিত হয়ে নিবদ্ধ তুলসীর ওষ্ঠাধরযুগে, গোলাপের পাপড়ির মতো হাল্‌কা, কম্পমান,

সুগন্ধিমদির ওষ্ঠাধরযুগে। আর তুলসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ জীবনের তুটি চক্ষুতে, যেখানে আদিম সমুদ্র-মন্থন প্রক্রিয়ায় একে একে দেখা দিচ্ছে পারিজাত এবং কৌস্তুভ, অমৃত এবং হলাহল। এরকম তাৎপর্যপূর্ণ সান্নিধ্য বেশিক্ষণ চলতে পারে না।

তুলসী বোঝে অসহায় পুরুষের মনোবাঞ্ছা। কিন্তু কি করতে পারে সে। তখন জীবন তুই হাতের দশ আঙুল দিয়ে তুলসী-করপদ্মের দশ আঙুল জড়িয়ে ধরে, বাধা দেয় না তুলসীর ; জীবন আর একটুখানি কাছে টেনে নেয় তুলসীকে, ঐ একটুখানি ফাঁক ছিল তুজনের মধ্যে, বাধা দেয় না তুলসী ; কি হবে কি হবে কৌতূহলে তুজনের নিঃশ্বাস রুদ্ধপ্রায় ; তারপরে যখন জীবনের শিরাতন্ত্র-স্ফীত মুখমণ্ডল নত হয়ে পড়ে তুলসীর ওষ্ঠাধরের দিকে, তখন হঠাৎ সবলে তুলসী নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে পালায় ঘর থেকে। মূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে জীবনলাল। তরঙ্গতাড়িত মজ্জমান ব্যক্তি কূলে পদার্পণ করবার ঠিক পূর্বমূহূর্তে আবার গিয়ে পড়লো অতল সমুদ্রে।

জীবনলাল ও তুলসী এ রকম তন্ময় অবস্থায় না থাকলে অনায়াসে দেখতে পেতো যে, অনেকক্ষণ হ'ল ঐ ঘুলঘুলিতে ছোট একখানি মুখ ফুটে উঠেছে! সে মুখ রুমালীর।

॥ ৯ ॥

শাহ্‌জাদার ষড়যন্ত্র

চুনিলাল ফিরে গিয়ে সব কথা জানালো মীর্জা আবুবকরকে। শাহ্‌জাদা বুঝলো, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়! বুঝলো, আসামী বখৎ খাঁর হাতে পড়লে প্রাণ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে শাহ্‌জাদার চিঠিখানা দাখিল করবে, তখন শাহ্‌জাদার প্রাণ না হোক মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। আর কথাটা সিপাহীদের কানে গেলে জান যেতেই বা কতক্ষণ। সে জানে, বখৎ খাঁ ভুলবে না, না টাকায়, না শাহ্‌জাদার পদমর্যাদায়, কেননা সবাই যখন যুদ্ধটাকে একটা সাময়িক উত্তেজনারূপে মাত্র নিয়েছে, বখৎ খাঁ সত্যসত্যই তখন যুদ্ধ চায়। শাহ্‌জাদা বিচার ক'রে দেখল যে, বখৎ খাঁ, জীবনলাল ও হাকিম আসানুল্লা, এই তিন ব্যক্তির মধ্যে শেষোক্ত জন শিকলের তুর্বলতম গ্রন্থি, সেখানেই করতে হবে আঘাত। কিন্তু কি ভাবে তা

সম্ভব, বুঝতে পারে না, এ-সব মতলব তার মাথায় আসে না। অথচ কিছু না করলেও নয়, আর তা যত শীঘ্র সম্ভব হয়, ততই মঙ্গল।

শাহ্‌জাদা হুকুম করলো, জলদি আমার গাড়ি জুততে বলে দাও।

আবুবকর স্থির করেছে যেতে হবে মীর্জা খিজির সুলতানের কাছে, তার মাথায় অনেক রকম মতলব খেলে।

দুই শাহ্‌জাদা নিভৃতে গিয়ে বসলো, আর সব বৃত্তান্ত শুনে খিজির সুলতান বলল, শাহ্‌জাদা, কাজটা ভালো করো নি।

যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে, এখন প্রতিকার কি বলো।

কিন্তু প্রতিকার করতেও তো সময় লাগে, তার আগেই হয়তো আসামী বখৎ খাঁর কাছে চিঠিখানা পেশ করবে।

তা সম্ভব নয়, কারণ চিঠি তার সঙ্গে নেই।

মুখে শুনলেই বিশ্বাস করবে বখৎ খাঁ, কারণ কানাঘুষোয় শুনতে পেয়েছে যে, আমরা অনেকেই চিঠি চালাচালি করছি কোম্পানীর সঙ্গে।

আবুবকর বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, তোবা, তোবা, শাহ্‌জাদা, আমি কি বিপদের ফর্দ শুনতে চেয়েছি। বিপদ উদ্ধারের কি উপায় তাই এখন বলো।

ভয় পাও কেন শাহ্‌জাদা, যাঁহা মুশকিল, তাঁহা আসান। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেইজন্যেই তো এলাম তোমার কাছে। মীর্জা মুঘল নিজের তালে আছে। সে-ই এখন বাদশার বড় ছেলে, ঘোলা জলের মধ্যে থেকে বাদশাহীটা ধরা যাক কি না, সেই ফিকির দেখছে। বেগম সাহেবা ভাবছে কোন্ ফাঁকে তার ঐ কাঠের পুতুল জবান বখৎকে তক্ত-তাউস-এ বসাবে।

এই পর্যন্ত বলে খিজির সুলতানের দিকে তাকিয়ে বলে, শাহ্‌জাদার মধ্যে কেবল তুমি আর আমিই যা একটু ভাবছি বাদশাহী হিন্দুস্তানের জন্যে—

বাধা দিয়ে খিজির সুলতান বলে, বাদশাহী হিন্দুস্থান নয়, শাহ্‌জাদা জান, শাহ্‌জাদা জানের জন্য ভাবছি, কি ক'রে প্রাণ বাঁচানো যায়।

আবুবকর বলে ওঠে, সেটা এমন কি অন্যায় কাজ, নিজের প্রাণ রক্ষার কথা কে না ভাবে!

তোমার আসামী জীবনলালও ঠিক এইজন্যেই চিঠিখানা দেবে বখৎ খাঁর হাতে।

হয়তো বা এতক্ষণ দিয়েছে, হয়তো এতক্ষণ শাহী পরোয়ানা বের হয় গিয়েছে আমার নামে। কি কুক্ষণে নজর পড়েছিল আমার ঐ সুখানন্দ

পণ্ডিতের লেড়কীর দিকে।

এখনো তার আশা ছাড়তে পারো নি শাহ্‌জাদা! ঐ মেয়েই ঘটাবে তোমার সর্বনাশ।

সর্বনাশের আর বাকি কি মীর্জা খিজির সুলতান, সাঁতারের বাড়া পানি নেই, এক হাত বেশি কমে কি আসে যায়।

ওটা তো জুয়াড়ীর যুক্তি, এখনো সময় যায় নি, ফেরো।

আমি কি তোমার কাছে ধর্মকথা শুনতে এসেছি, তা হলে তো হাসান আকসারির কাছে গেলেই চলতো। হাকিম আসানুল্লাকে জব্দ করবার কিছু ফিকির জানো তো বলো।

তবে শোন। যতক্ষণ তোমার সঙ্গে ধর্মকথা বলছিলাম, মনে মনে মতলব ঠিক ক'রে ফেলেছি। ধর্মচিন্তার ঐ এক মস্ত সুবিধা। সবাই কানাঘুষোয় জানে যে, হাকিম সাহেব মনে মনে ইংরেজের দিকে, অনেকেই সন্দেহ করে যে, তার যোগাযোগ আছে কোম্পানীর ছাউনির সঙ্গে।

তোমার কথা ঠিক, কিন্তু প্রমাণ যে নেই।

দরকারও নেই। এ তো আদালতে যাচ্ছি না যে, প্রমাণ তলব হবে।

তবে?

তবে আর কি? যেমন আছে শাহী দরবার, উজীরের এজলাস, সিপাহ্‌সালারের আদালত, তেমনি আর-এক দরবার আছে মনে রেখো।

আর কি হ'তে পারে জানি না।

ফৌজী আদালত।

এ-নাম তো আগে শুনি নি।

শুনবার কথাও নয়, এখনি বানালাম।

বুঝতে না পেরে আবুবকর বলে, শাহ্‌জাদা সাহেব, তোমার যেমন এলেম তেমনি তালিম, আমি তোমার সঙ্গে পারবো কেন, একটু বুঝিয়ে বলো।

মন দিয়ে শুনে যাও। কোম্পানীর সঙ্গে লড়াইয়ের গতিক ভালো নয়, তার উপরে শহরের মধ্যে নিমকহারামি শুরু হয়ে গিয়েছে। সেদিন পাঁচ গাড়ি বারুদ চলে গেল কোম্পানীর ছাউনিতে, সেলিমগড়ের বড় কামান ছুটো দাগতে গিয়ে ফেটে গেল, কে ভিতরে ঢুকিয়ে রেখেছিল পাথরের টুকরো। তারপরে আবার এই সেদিন বাদশাহের সেরা গোলন্দাজ কুলি খাঁ জখম হয়েছে।

আবুবকর বলে, বেশ, তারপরে?

তারপরে আর কি? এগুলোকে একটা সুতোয় গেঁথে তোলো। কি দাঁড়ালো?

আবুবকর বলে, বেইমানী।

বহুৎ আচ্ছা। কে সেই বেইমান?

প্রতিধ্বনির কণ্ঠে আবুবকর বলে, কে সেই বেইমান?

প্রত্যেকটি শব্দের উপরে গজাল ঠুকে বলে যায় খিজির সুলতান, উজীর হাকিম আসানুল্লা খাঁ।

আসলে তো সে নয়।

শাহ্‌জাদা আবুবকর! ফৌজী আদালতে কিনা গণ-আদালতে আসল নকল নেই। যে রায়ের দিকে বেশি লোকের গলা, সেই রায়টাই সত্য। জোর গলা তো রায় সাচ্চা।

এখন কি করতে চাও বলো।

ঘউস মহম্মদ আর কুলিজ খাঁ, শেখ বান্নুর মগজে কথাটা ঢুকিয়ে দিতে হবে।

ঢোকাবে কি ক'রে? ওদের মগজ গজালের অসাধ্য।

কাজেই বোতলে সাধ্য ক'রে তুলতে হবে। ডজন দুই বার্গণ্ডি আর ব্রাণ্ডি সঙ্গে থাকলে ওরা সব বুঝতে পারে।

তখন?

তখন আর কি, ওরা শেখাবে ওদের ফৌজকে! ইংরেজকে মারতে না পেরে ফৌজের হাত নিশপিশ করছে, ওরা একটা সহজলভ্য আসামী চায়।

মনে করো, সত্যিই যদি মারা যায় আসানুল্লা সাহেব।

আপদ যায়। আর যদি জানে না মরে, তা হ'লেও আমাদের কাজ চলবে। যার উপরে ফৌজ ক্ষেপে উঠেছে, তার কথায় বিশ্বাস করবে, এমন সাধ্য কার? বখৎ খাঁ তো ছার, খোদ বাদশারও এখন সাধ্য নেই। এবারে বুঝলে?

এখন কি কর্তব্য?

এখনি দিলমঞ্জিলে ফিরে যাও, ফিরে গিয়েই জোর তলব করো কুলিজ খাঁ শেখ বান্নু আর ঘউস মহম্মদকে। আমিও যাচ্ছি। ব্যাপারটা কালকের মধ্যেই ঘটিয়ে তুলতে হবে, জুড়োতে দেওয়া চলবে না।

অন্ধকার রাত্রে আলোর বিন্দু দেখতে পায় আবুবকর, তবে সেটা আকাশের তারা না ঘরের দীপ, না বনের খদ্যোত সে বিচার করবার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না। জুড়ি হাঁকিয়ে সে রওনা হয়ে যায়।

॥ ১০ ॥

"পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে ?
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে।"

জীবনলাল গ্রেপ্তার হয়েছে জানতে পেরেই রুমালী পথে বের হয়ে পড়েছিল। কে গ্রেপ্তার করেছে, কেন গ্রেপ্তার করেছে, কোথায় আছে এখন, কিছুই জানে না ; শাহ্‌জাদার বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে সে নিতান্ত একা, এত বড় শাহ্‌জাহানাবাদ শহরে সে নিতান্ত অসহায়, এ-সব সূক্ষ্ম হিসাব তার মনেই এলো না, কেবল মনে হ'ল তার সাধ্য কিছু না থাক, করণীয় অবশ্যই কিছু আছে! কিন্তু কী? জানে না কি, শুধু এইটুকু জানে, এমন সঙ্কটের মুখে পুতুলের মতো বাড়ি বসে থাকা কিছুতেই চলে না। স্বপ্নগ্রস্তের মতো, নিশিতে পাওয়ার মতো সে এগিয়ে চলে।

তখনো শহর অর্ধনিদ্রিত, গৃহস্থ জাগে নি, কেবল ব্যবসায়ীরা জেগে উঠে দোকানের দরজা খুলছে, দোকানের সামনে রাস্তায় জল ছিটিয়ে ঝাঁট দিচ্ছে ; হালুইকর গরম সমোসা, কচৌড়ি জলেবি থালায় সাজিয়ে রাখছে আর সেই অর্ধনিদ্রিত শহরের অর্ধজাগ্রত চোখের উপর দিয়ে রোদ-পলাতক একখানা উদ্‌ভ্রান্ত স্বপ্নের মতো ছুটে চলেছে রুমালী।

ঘণ্টেওয়ালার দোকান ছাড়িয়ে গিয়ে পিছনে ফিরে তাকাতে দেখতে পেলো, পল্টন আসছে পিছু পিছু।

তুই কোথায় যাচ্ছিস পল্টন ?

তুমি যেখানে যাচ্ছ বহিন।

আমি কি জানি, কোথায় যাচ্ছি!

তবে আমিও না-হয় না জানলাম।

আমি যাচ্ছি জীবনলালকে খুঁজে বের করতে।

দু'জনে গেলে কাজটা আরও সহজ হবে।

কিন্তু এদিকে তো একজনের থাকা দরকার।

কোন্ দিকে ?

আমার কুঠিতে।

কেন ?

জীবন যদি অন্য পথে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়।

গ্রেপ্তার হয়েছে যে।

ছাড়া পেতেও তো পারে।

পল্টন উত্তর দেয় না, কি উত্তর দেবে ? ছেড়ে দেবার জন্যে কেউ কি কখনো গ্রেপ্তার করে ? সে নিতান্ত বালক হয়েও জানে, দিল্লির বাদশাহীর আজ ডুবন্ত অবস্থা। মজ্জমান ব্যক্তি যাকে চেপে ধরেছে, তাকে নিয়ে তলিয়ে যাবে অতলে।

তুই ফিরে যা ভাই।

তুমি একা গিয়ে কি করবে ?

দু'জনে গেলেই বা কতটুকু বেশি সুবিধা হবে। তার চেয়ে কুঠিতে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমার দেরি হবে না।

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরে যায় পল্টন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রুমালী এসে পৌছলো দিলমঞ্জিল প্রাসাদে। প্রকাণ্ড ফটকের দরজা অর্ধেক খোলা, ঢুকতে যাবে এমন সময়ে গালপাট্টা বাঁধা বিপুলবপু একটা লোক বাধা দিল, বলল, অন্দর যানা মানা হায়।

রুমলী বলল, আমি শাহ্‌জাদা সাহেবের সঙ্গে ভেট করবো।

সেই লোকটি এবারে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখল রুমালীকে, তারপরে বলল, বিবি তো খুবসুরৎ, রাতের বেলা হ'লে আমি নিজে নিয়ে যেতাম শাহ্‌জাদার কাছে, কিন্তু এখন ভোরবেলায় চলবে না।

রুমালী দেখল, লোকটি একটি আস্ত নির্বোধ, তাই তাকে খুশি ক'রে কাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে বলল, সুবেদার সাহেব।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটার ওষ্ঠাধরের যবনিকা ফাঁক হয়ে গিয়ে দন্তপংক্তি দেখা দিল, বলল, বিবি খুব এলেমদার, তবে কি জানো, আমি হাবিলদার, আমার বাবা সুবেদার; অবশ্য লড়াইটা শেষ হয়ে গেলে আমাকেও সুবেদার বানিয়ে দেবেন শাহ্‌জাদা সাহেব।

রুমালী মনে মনে বলল, লড়াই শেষ হ'লে ফেজটুকুও দেখা যাবে না তোমার শাহ্‌জাদার। মুখে বলল, তা না-হয় দু'দিন আগে থেকেই সুবেদার বললাম।

বেশ, বেশ, বিবির যেমন মেহেরবাণী।

তা সুবেদার সাহেব, কাল রাত্রে যে লোকটা গ্রেপ্তার হয়েছিল—

রুমালীর বাক্য শেষ হওয়ার আগেই লোকটা বলে উঠল, বিবি, সুবেদার (বিবির কথা মেনে নিয়েছে) দিল মহম্মদ ছাড়া কে পারতো তাকে গ্রেপ্তার করতে!

আমিও তাই ভাবি, তুমি তো খাস জঙ্গবাহাদুর। তা লোকটার কি করলে?

দিয়ে এলাম তাকে উজীর সাহেবের কুঠিতে, সারারাত থাকলো গারদে।

রুমালীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, আর এখানে থাকা নিষ্প্রয়োজন, কাজেই বিনা ভূমিকায় রওনা হ'ল।

দিল মহম্মদ বলল, আসামী তোমার কে হয়?

তা দিয়ে কি দরকার হাবিলদার সাহেবের।

দিল মহম্মদ আপত্তি ক'রে বলে, সুবেদার সাহেব।

সুবেদার তোমার বাপ, বলতে বলতে হনহন ক'রে এগিয়ে যায় রুমালী।

তখন দিল মহম্মদ অনুমান করে নিশ্চয় আশনাই-এর লোক। কাজেই হাতে তালি দিয়ে গুন গুন ক'রে গান ধরে—"যা, যারে ভওঁরা দূর দূর যা।"

রুমালী রওনা হ'ল উজীর সাহেবের কুঠির দিকে। জামি মসজিদের পশ্চিম দিকে হাকিম আসানুল্লার কুঠি সে চেনে। কে না চেনে? দিলমঞ্জিল থেকে চাঁদনী চক পেরিয়ে ছোট দরওয়া বাজার, ছাত্রা মদনগোপাল হয়ে ধরমপুরা দিয়ে সহজেই পৌছনো যায় সেখানে। এ-সব রাস্তা তার নখ-দর্পণে। কিন্তু তখন তার এমনি উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা যে, কোথা দিয়ে যাচ্ছে স্থির ছিল না। যেখানে আধ ঘণ্টায় পৌছতে পারা যায়, সেখানে ঘণ্টা দুই সময় ব্যয় ক'রে অবশেষে যখন উজীর সাহেবের কুঠিতে এসে পৌছলো, তখন বেলা প্রহর অতীত হয়েছে আর জীবনলালের বিচার শেষ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ।

উজীরের কুঠির ফটকে একজন বুড়ো দরোয়ান বসে খৈনি টিপছিল, রুমালী সরাসরি তাকে শুধালো, কাল রাতে যে আসামীকে ধরে আনা হয়েছিল, সে কোথায়?

রুমালীর বিহ্বল পরিশ্রান্ত অবস্থা দেখে দারোয়ানজীর বোধহয় মনে দয়া হ'ল, নতুবা স্বধর্মভ্রষ্ট হয়ে কেন বলতে যাবে যে, মাঈ, আসামীর বিচার শেষ হয়ে গিয়েছে, তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বখৎ খাঁর কুঠিতে।

বখৎ খাঁর কুঠিতে! চমকে ওঠে রুমালী। সেখানে কেন? আর যে

কারণেই হোক, বখৎ খাঁর কুঠি তার অজানা, আর যদিই-বা জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে গিয়ে পৌছয়, সিপাহ্‌সালারের দরবারে ঢুকবে কি ক'রে? এতক্ষণ তার মনে যে আশা ছিল, এক ফুঁয়ে নিবে গেল। সেখানেই পথের উপরে বসে পড়তো, কিন্তু না, নিতান্তই অভ্যাসের বশে চলতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ পেয়ে ভাবলো, এ কি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, এমন ক'রে বৃথা ঘুরে মরলে তো কোন লাভ হবে না। কিন্তু করবেই-বা কি? এতক্ষণে বুঝতে পারলো সে কি অসহায়, কি অকিঞ্চিৎকর! প্রেমের বিশ্বব্যাপী মহিমা, নক্ষত্রলোক থেকে পৃথিবীর অণু-পরমাণু তার অদৃশ্য শাসনে নিয়ন্ত্রিত, তৎসত্ত্বেও পথের পাথরখানা সরিয়ে ফেলতে সে অক্ষম।

হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় সুখানন্দ পণ্ডিতের কথা। সে জানতে পেরেছিল যে, পণ্ডিতজীর পরিচয় আছে উজীর সাহেবের সঙ্গে, কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তিও আছে উপর মহলে। সেখানেই কেন না যায়!

এই মাত্র দু'দিন আগে বাড়ি বয়ে গিয়ে তুলসীকে অপমান ক'রে এসেছে, জীবনকে নিয়ে তুলসীর সঙ্গে মন-কষাকষি অশোভন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পৌচেছে, সেই তুলসীর বাড়িতে যেতে এতটুকু দ্বিধা হ'ল না তার। মজ্জমান ব্যক্তি কাষ্ঠখণ্ডের বিচার করে না।

সুখানন্দর কুঠিতে পৌছে দেখল সদর দরজা বন্ধ। ডাকাডাকিতেও সাড়া পাওয়া গেল না; তখন সে গেল খিড়কি দরজায়, সে দরজাও বন্ধ, ডাকাডাকিতেও খুলল না। অথচ ভিতরে লোক আছে। তখন সে খুঁজতে লাগলো কোনো দিকে জানলা, ঘুলঘুলি খোলা আছে কি না। বেশি খুঁজতে হ'ল না, বাড়ির পশ্চিম দিকে খুব সরু একটা কানাগলি দেখতে পেলো, গলিটার মধ্যে ঢুকতেই দেখতে পেলো, মানুষের মাথাপ্রমাণ উঁচুতে একটা ছোট্ট জানলা, সৌভাগ্যবশত সেটা আবার খোলা। এতক্ষণ পরে তার মনে আশার সঞ্চার হ'ল, আশার সঙ্গে এলো আনন্দ, বুঝলো ঐ জানলা দিয়ে তাকালেই বাড়ির রহস্য আবিষ্কার হবে, আর তার ফলে জীবনলালকে মুক্ত করা সম্ভব হ'লেও হ'তে পারে।

তখন পায়ের আঙুলের উপরে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে ভিতরে তাকালো রুমালী। প্রথম নজরে ভালো ঠাহর হ'ল না, ভিতরের অস্পষ্ট আলোয় সব ঝাপ্‌সা। দ্বিতীয় নজরে চোখ অভ্যস্ত হয়ে এলো, দেখতে পেলো দু'জন যুবক-যুবতী সামনাসামনি আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দণ্ডায়মান, আর যুবকটির মুখ নত হয়ে পড়েছে যুবতীর মুখের দিকে; তৃতীয় নজর বলে দিল, ওরা জীবনলাল

ও তুলসী।

এ-দৃশ্য এমনি অসম্ভব যে, কিছুতেই বিশ্বাস হ'তে চায় না, চোখ বুঝি ঘুষ খেয়ে ভুল ছবি দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস কতক্ষণ স্থায়ী হতে পারে। ঐ তো জীবন—জঙ্গী পোশাক গায়ে, ঐ তো সেই মেয়েটা—সেই লাল শাড়িখানা পরনে। ঐ তো জীবনের ওষ্ঠ স্পর্শ করতে চলল মেয়েটার ওষ্ঠাধর! আঙুলগুলো শিথিল হয়ে আসে, খসে যায় জানলার শিক থেকে, কখন অজ্ঞাতসারে মাটির উপরে বসে পড়ে সে।

যখন সে সম্বিৎ পেলো, দেখলো যে, পুবের সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে, সামনের বাড়িটা সাপের মতো ছায়ার ফণা বিস্তার ক'রে তার রৌদ্র নিবারণ ক'রে রেখেছে। প্রথমেই তার মনে হ'ল ভাগ্যে কেউ আসে নি এদিকে, নতুবা কি মনে করতো তাকে দেখে। কিন্তু কিছু মনে পড়ে না তার, কেন এখানে এসেছিল, কেন বসে আছে—সমস্তই অস্পষ্ট, অব্যাখ্যাত। এ যেন, তার চিন্তার তলা খসে পড়ে গিয়েছে, যতদূর তাকানো যাক না সমস্তই অতলস্পর্শ শূন্যতা।

উঠে পড়লো রুমালী, চলতে শুরু করলো সামনের দিকে। উদ্দেশ্যহীন চলা, ঠেলে নিয়ে চলেছে পুরাতন অভ্যাসের বশে, আর কিছুই নয়; বসে থাকা চলবে না বলেই চলা, নতুবা চলবার আর কোন কারণ নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল জামি মসজিদের গম্বুজটা আর মিনারগুলো অপরাহ্নের বৃষ্টি মার্জিত আকাশে ঝকঝক করছে। অনেকবার দেখেছে এ দৃশ্য তবে আজ কেমন যেন নূতন বলে অনুভব করলো। এগিয়ে চলল সেইদিকে। মহল্লা চিৎলী কবর দিয়ে বেরিয়ে মীর মণ্ডী শাহে পৌঁছতে দেখল পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে একটা ভিখারী।

বেগম সাহেব, একঠো পয়সা দো।

চমকে ওঠে রুমালী, কই সঙ্গে তো কিছুই নেই, অথচ কখনো ভিক্ষুক ভিক্ষা না পেয়ে ফেরে নি ওর কাছে। আর কিছু না পেয়ে দোপাট্টাখানা খুলে দিল ভিক্ষুকের হাতে। ভিক্ষুকটি অবাক হয়ে গেল, তারপরেই ছুটে গেল ভোজলা পাহাড়ের দিকে, পাছে দাতা ভুল বুঝতে পেরে দাবি ক'রে বসে গায়ের কাপড়খানা।

চিৎলী কবর বাজারের মধ্যে চত্বরে ফোয়ারার জল পড়ছিল। জল দেখে তৃষ্ণা অনুভব করলো, ফোয়ারার কাছে গিয়ে দেখল চৌবাচ্চায় জল জমে রয়েছে, একেবারে কাকচক্ষু স্বচ্ছ, তাকাতেই দেখতে পেলো নিজের ছায়া।

চমকে উঠল, এ যে তার ছোট ভাইয়ের মুখ। এমনি লম্বা চুল রাখতো সে, গদরের সূচনাতেই একদিনে বাপ আর মায়ের সঙ্গে যে নিহত হয়েছিল, সে যেন ঐ জলের মধ্যে অপেক্ষা করছে। এই ক'মাসে দিল্লিতে যে চোখের জল পড়েছে তাতে চৌবাচ্চা ভরে উঠবার কথা। সেই ভরাজলের উপরে টলমল করে ভাসছে ছায়াপদ্ম। জল পান করতে ভুলে গেল সে।

এখান থেকে মসজিদের ভিতরটা দেখতে পাওয়া যায়। রুমালী দেখতে পেলো বাঁধানো চত্বরে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার নমাজ পড়ছে ভক্তগণ। এ দৃশ্যটিও তার অভিনব বোধ হ'ল, অথচ হাজার বার দেখা। সে ভাবে কার উদ্দেশ্যে এ ভক্তি নিবেদন? উপরে কেউ একজন আছে। কিন্তু ভক্তদের মধ্যে তার মতো ভাগ্যহত কেউ আছে কি? যদি থাকে তবে ভক্তির সঙ্গে জীবনের যত দায়দুশ্চিন্তা উপরঅলার হাতে তুলে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হচ্ছে। তবে তারই বা এত দায়দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কেন! তখনি তার মনে হয় ইচ্ছা করলেই তো সেটি হওয়ার উপায় নেই। মন্দির, মসজিদ, গির্জা কোথাও যায় নি সে, কেউ যেতেও বলে নি। ছোট ছেলেমেয়ে মায়ের সঙ্গে যেমন মন্দির বা গির্জায় যায়, তেমনি যেতে শিখেছিল সে মায়ের সঙ্গে লাল-কেল্লার রঙমহলে। অবশ্য সেখানেও ক্ষণেকের তরে দায়দুশ্চিন্তা অতলে তলিয়ে যায় কিন্তু সে যাওয়া যদি চরম হ'ত তবে কি তার আজ এমন দুর্দশা হ'ত। এমনি কত কি এলোমেলো চিন্তা সন্ধ্যার পাখীর মতো ছায়া ফেলে ফেলে চলে যায় তার মনের উপর দিয়ে।

কখন বসে পড়েছিল টের পায় নি। হঠাৎ দেখতে পেলো মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পথে একজন গোটা দুই পয়সা ফেলে দিল তার সম্মুখে। দীন ভিক্ষুক মনে করেছে তাকে। ঐ একটি ঘটনায় চাবুকে জাগিয়ে তুলল তার আত্মমর্যাদা। না, এত দীন অসহায় সে নয়। সবেগে শরীর ঝাড়া দিয়ে সমস্ত দায়দুশ্চিন্তা জীর্ণ কন্থার মতো মাটিতে নিক্ষেপ ক'রে ফেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো।

চলতে আরম্ভ করলো, যদিচ জানে না কোথায় যাবে। একবার এসে দাঁড়ালো ফোয়ারার কাছে সেই চৌবাচ্ছাটার ধারে, তাকিয়ে দেখল জলের মধ্যে, না, কিছু আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। তখন সে খাস সড়ক ধরে সোজা মসজিদের পাশ দিয়ে চলল রাজঘাট দরবাজার দিকে। অবশেষে এক সময়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই এসে উপস্থিত হ'ল যমুনার তীরে। মানুষের শেষ আকর্ষণ নদী।

সত্যি তো ওরা জীবন আর তুলসী? না, ভুল হওয়ার এতটুকু আশা নেই। অবশ্য ঘরটা আলো-আঁধারি ছিল, কিন্তু নিরেট অন্ধকার হ'লেই বা কি, নিশ্বাসের ছন্দ শুনে বুঝতে পারতো ওদের পরিচয়। সমগ্র মন ও স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে মনে আনতে চায় সেই দৃশ্যটি, বিষ পাথরের উপরে বেদনার বাটালি দিয়ে ক্ষোদিত সেই দৃশ্যটি, জীবনের মুখ নত হয়ে পড়ছে তুলসীর মুখের দিকে। ঠিক মনে পড়ে না তার—দুজনের ওষ্ঠাধর-স্পর্শ ঘটেছিল কিনা, আর তুলসীর পলায়ন দৃশ্যটি পিছলে চলে গিয়েছে মনের উপর দিয়ে, শুধু অক্ষয় বেদনায় ক্ষোদিত হয়ে আছে একটি চিরায়মান চুম্বন। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। আর কেন আশা, আর কেন বাঁচা!

রুমালী বসে পড়ে বালুর উপরে, পায়ের কাছেই জল, বর্ষায় নদী স্ফীত। বাবা, মা, ভাইয়ের কথা মনে পড়ে চোখে জল গড়ায়, তখনি আবার ভাবে তাদের ছেড়ে বেঁচে থাকাটাই তার অন্যায় হয়েছিল, এখন ভোগ করছে তারই দণ্ড। না, আর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবার কি প্রয়োজন! এলবিয়ন বিবির কথা মনে পড়ে। ধন্য সাহস, ইংরেজের মেয়ে কিনা। একবার, সে ভাবে শেষবার, তাকায় নদীর দিকে। যমুনার নীল জল রাতের অন্ধকারে ঘন কালো, একটানা ছলছল কলকল ধ্বনি প্রকাণ্ড একটা বিলাপের মতো, এখানে ওখানে আলোর ফুটকি, কতক আকাশের তারা কতক জনপদের আলো, কতক মনের মরীচিকা। চরাচর যেন পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে উঁকি মেরে আছে অনন্তের দিকে। এমন সুযোগ আর মিলবে না। সারাজীবন সুখ খুঁজে ফিরেছিল তার পরিণাম সম্মুখে ঐ যমুনার জল। উঠে পড়ে রুমালী, এক পা এক পা ক'রে এগোয় নদীর দিকে। জল স্পর্শ করে পা, পায়ের পাতা ডুবে যায়, জানু স্পর্শ করে জল, আর এক পা এগোলেই সর্বসমস্যার সমাধান, বর্ষার যমুনায় সাঁতার দিয়ে বাঁচবে এমন কারো সাধ্য নয়। 'মাগো' বলে যেমনি অগ্রসর হ'তে উদ্যত হয়েছে অমনি কার পুরুষ বাহু তার হাত ধরে ফেলল, আর এগিয়ো না, সামনে অথৈ জল।

চমকে ফিরে তাকায় রুমালী, কে তুমি?

আমি সুখ-মুসাফির।

সুখে আমার দরকার নেই, ছাড়ো।

তোমার দরকার না হ'তে পারে, আমার দরকার আছে। এসো।

এই বলে একরকম জোর ক'রে টেনে ডাঙায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে রুমালীকে।

॥ ১১

সুখ-মুসাফির

কি তোমার নাম?

নাম চাও, না পরিচয় চাও?

ও দুই কি এক নয়?

সব সময়ে নয়।

বেশ, তবে নামটাই বলো।

ভুলে গিয়েছি।

এমন তো কখনো শুনি নি।

তবে এবারে শুনে নাও।

ভুলে যাওয়ার কি কারণ?

পঁচিশ বছর আগেকার সব কথা কি মনে থাকে।

কি বলতে চাও বুঝতে পারছি না।

পঁচিশ বছর আগে বাপ-মায়ে নাম রেখেছিল, অব্যবহারে ভুলে যাবো না তো কি!

কেউ ব্যবহার করে নি?

না, বাপ-মা মরে গেল, কে আর ব্যবহার করবে? নামটা মানুষের সব চেয়ে আপন হ'লেও আপনি তো ব্যবহার করে না।

বেশ নাম না হয় গেল, এবারে পরিচয়টাই শুনি।

আমি সুখ-মুসাফির।

সুখ-মুসাফির! সে আবার কি?

সংসারে সুখের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই, সুখ-মুসাফির ছাড়া আর কি?

এ কি একটা পরিচয় হ'ল?

ভালো লাগলো না বুঝি। আরও আছে। আমার আর এক পরিচয়, সরাব মিঞা।

তবু কতকটা নামের মতো—কিন্তু বড় বিচিত্র।

মোটেই নয়, ওর মধ্যেই আছে আমার চরিত্র।

বুঝতেই পারছি, খুব মদ খাও বুঝি।

হাঁ, মদ না পেলে অন্ন কিছু খাই।

এত মদ যোগায় কে?

আগে অসুবিধা ছিল সত্যি, কিন্তু এখন যত চাও তত খাও।

পাও কোথায়?

ইংরেজ মদের কারবারী পালিয়েছে, তাদের দু-চারটে দোকানের তহ্‌খানার খবর রাখি কিনা।

বেশ আছ দেখছি!

মোটেই নয়।

কেন?

সুখ-মুসাফিরের সুখ মিলছে কই?

খোঁজো কোথায়?

সরাবে আর সাকীতে, সুরায় আর নারীতে।

সুখ মিলবে কি ক'রে? এত মদ খেলে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা।

আগে তাই ভাবতাম বটে। কিন্তু এখন দেখছি ঠিক উল্‌টো। মদ না খাওয়া অবধি দুনিয়াটা পাগলের হিজিবিজির মতো মনে হয়, তারপরে মদ খেতেই দেখি পাগলের হিজিবিজি শায়েরের গজলে পরিণত হ'ল, ছন্দ এলো, সুর এলো, অর্থ এলো।

তোমার কথা শুনে তো পাগল বলে মনে হচ্ছে না।

তার কারণ কি জানো পিয়ারী, এই কিছুক্ষণ হ'ল সরাব খেয়ে এসেছি, এখনো গলায় গলায় ভরতি, আমার কথাগুলো তারই ছিটে।

জগৎটাকে নিলেম চিনে
সরাব সুরার দুরবীনে,
সুখ-মুসাফির ঘুরে বেড়াই
সুখের খোঁজে রাত্রিদিনে॥

অবাক করলে দেখি। মদ খেলে মানুষে আবোল-তাবোল বকে, আর মদ খেয়ে তুমি গজল লেখো। এ যে উল্‌টো।

এটাই সোজা। এতকাল বিপরীত দিক থেকে দেখেছিলে, তাই উল্‌টো লাগছিল।

তোমার সব কথা বুঝতে পারছি না, কিন্তু এটুকু বুঝেছি যে, শায়ের হিসাবে তুমি গালিবের চেয়ে বড়।

জিতা রহো পিয়ারী, জিতা রহো।

এই বলে বিনা ভূমিকায় তাকে জড়িয়ে ধরে আদি-অন্তহীন ধারায় চুমো খেয়ে চলল।

ছাড়ো ছাড়ো, দম বন্ধ হয়ে গেল যে।

ক্ষতি কি, জলের তলে গেলেও যেত।

বেশ হ'ত।

তা জানি। কিন্তু দুটো উপায়ের মধ্যে এটাই কি বেশি মিষ্টি নয়?

আলবৎ নয়।

তবে যাও, জলের তলে। ও কি, এগোতে চাও না কেন? দরিয়াকে এত ভয় কিসের? এই তো নেমে গিয়েছিলে। বুঝেছি। তখন দম বন্ধ হওয়ার অন্য উপায়টা জানতে না বুঝি?

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, একটা বেগানা মেয়েকে চুমো খেলে, শরম হ'ল না।

তুমি তো বেগানা নও বিবি, তোমাকে চিনতে পেরেছি।

কি চিনলে?

তুমি এক সুখের খনি।

এই অন্ধকারেও চিনলে?

খনি তো অন্ধকার হবেই।

বেশ, বুঝলাম তুমি সুখ খুঁজে বেড়াও, কিন্তু সত্যি কথা বলো তো, সুখ কি পেয়েছ কখনো?

পেয়েছি বলতে পারি না, আবার পাই নি তা-ও নয়।

কেম ?

মুঠো ক'রে চেপে ধরতেই আঙুলের মধ্যে দিয়ে গলে চলে যায়। আঙুর মনে ক'রে মুখে দিই, কেবল খাট্টা আর তিতো। যে-মুহূর্তে নারীদেহ মুঠো ক'রে ধরে ভাবছি পেলাম, এমন সময়ে তাকিয়ে দেখি কোথায় সুখ, এ যে কেবল মাংসপিণ্ড। বোতল বোঝাই সরাব দেখে মনে হ'লো সুখ, গলায় ঢেলে দিয়ে দেখি তরল আগুন। পিয়ারী, সুখপরীর আঁচল চেপে ধরতেই তার পাখা ঝাপটিয়ে ওঠে।

তবে আর কেন, ও পথ ছাড়ো না, অনেক তো হ'ল?

পিয়ারী, এই পাওয়া-না-পাওয়ার লুকোচুরিটাই বুঝি সুখ। তা ছাড়া, অন্য পথই বা কোথায়? যাকগে, আমার কথা তো অনেক হ'ল, এবারে তোমার কথা শুনি, মরতে যাচ্ছিলে কেন?

মনের দুঃখে।

হাসালে পিয়ারী, হাসালে। মন বলে কিছু আছে কিনা জানি না, আর থাকলেও তার সুখ-দুঃখ নেই। যা কিছু দুঃখ দেহের।

বলো কি, তোমার খুব আপনজন চিরকালের মতো তোমাকে ছেড়ে গেল, সে দুঃখ কি দেহের?

দেহের বৈকি। তোমার দেহ তার সঙ্গে অভ্যস্ত, হঠাৎ সেই অভ্যাসের অভাবটাই দুঃখ। আবার কালক্রমে সেই অভাবে দেহ অভ্যস্ত হয়ে এলে দুঃখবোধ দূর হয়ে যাবে।

তবে দেহের দুঃখকে মনের দুঃখ বলে বোধ হয় কেন?

অহমিকার ফলে। আমার খুব আপনজনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা যে কেবল দেহের, এই স্থূল কথাটা স্বীকার করবার মধ্যে লজ্জা আছে, তাই এখানে মানসিক সম্বন্ধের আমদানি করা হয়ে থাকে। সম্বন্ধ দেহের সঙ্গে দেহের।

মাত্র এইটুকু?

এই কি যথেষ্ট নয়? দেহটা কি কম হ'ল? কি রহস্যময়, কি মধুর, কি অদ্ভুত। তার বেশী যদি কিছু থাকে তবে জানি না।

সেই জন্যই তো সুখ-মুসাফিরের সুখ মেলে না।

কারো ভাগ্যে কখনো সুখ মিলেছে বলে শুনেছ? দুনিয়ার বাদশা আর নাগা ফকির—কেউ কখনো সুখ পেয়েছে? ডাঙায় সুখ পাও নি বলে তুমি জলে ডুবতে যাচ্ছিলে, দেখতে পেতে সেখানেও সুখ নেই।

অন্তত দুঃখের অবসান হ'ত।

দেহ না থাকলে সুখ দুঃখ সমান।

তবে কি বেঁচে থেকে ভুগবো?

ভুগবে কেন, সাকী, ভোগ করবে। এমন দেহ আর পাবে না। ফুলের গন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে, পাখীর গানে সচকিত হয়ে ওঠে, নারীর স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, সুরার অমৃতে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, পিয়ারীর মুখের দিকে চেয়ে দীনদুনিয়ার কথা ভুলে গিয়ে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে, এমন দেহ কি আর পাবে? নারীকে কোলের ওপর বসিয়ে নিয়ে দুনিয়ার কথা কেন ভুলে যায় মানুষ? বেহেস্তে এমন কোন্ সুখ আছে নারীর দেহ-সৌরভের চেয়ে মধুর? দোজখে এমন কোন্ আগুন আছে যার তেজ প্রিয়-বিচ্ছেদের চেয়ে প্রখর? নারীদেহ দুই মুঠোতে ধারণ করলেই ধরা পড়ে দুনিয়ার সব শোভা, সব সৌন্দর্য, সব রহস্য। নারীদেহে দুনিয়া মূর্তিমেয়। না, তার চেয়েও

বেশি। চরাচর এই দেহের মধ্যে ঘনীভূত। বাদশা শাহ্‌জাহান দেওয়ানী খাসের বেনামে বেগম মমতাজকে লক্ষ্য ক'রেই বলেছেন—

অগর ফিরদৌস বর রুয়ে জমীন অস্ত্‌

ওয়া হমীনস্ত্‌, ওয়া হমীনস্ত্‌, ওয়া হমীনস্ত্‌।

এই বলে সে এগিয়ে গিয়ে এক হাতে রুমালীর কোমর পেচিয়ে ধরে, আর এক হাত দিয়ে মুখখানা তুলে ধরে চুম্বনের ফাঁকে ফাঁকে বলতে থাকে, ওয়া হমীনস্ত্‌, ওয়া হমীনস্ত্‌ ওয়া হমীনস্ত্‌।

পাগল নাকি?

না, পিয়ারী, সুখ-মুসাফির।

তারপরে হঠাৎ বুকভাঙা আর্তনাদে চিৎকার ক'রে ওঠে, সুখ মিলছে না কেন বলতে পারো?

কাউকে ভালোবাসো নি মনে হচ্ছে।

ভালোবাসলে বুঝি সুখী হওয়া যায়?

ভালোবাসাই সুখ।

তুমিও দেখছি খুরশিদ জানের মতো কথা বলছ।

সে কে?

নিকা কাটরার বাঈজী খুরশিদ জান, তার জুড়ি নেই।

তবে যেন মনে হচ্ছে তাকে ভালোবাসো।

ভালোবাসি, কিন্তু সুখী হই কোথায়?

ঐ তো বারে বারে ভুল করছ। ভালোবাসা আর সুখ কি আলাদা? জল আর তৃষ্ণা নিবারণ একই বিষয়।

এ তো জল নয়। সরাব, তৃষ্ণা কেবলি বেড়ে যায়।

সুখ-মুসাফির, ভালোবাসা যখন জলের মতো সহজ হবে, দেখবে আর তৃষ্ণা নেই, বড শান্তি, বড় আরাম।

তার মানে তখন মৃত্যু হয়েছে। না বিবি, জলে আমার কাজ নেই। আমি চাই জলন্ত গলন্ত টগবগন্ত সুরা, ঐ সুরায় আকণ্ঠ পূর্ণ হয়ে জলেপুড়ে মরি, সো ভি আচ্ছা, কিন্তু জলো শান্তির আরামে আমার দরকার নেই।

বেচারা! তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।

কেন বলো তো।

ভালোবাসার স্বাদ জানলে না।

কেন জানবো না। দেহের পক্ষে যতদূর যাওয়া সম্ভব গিয়েছি,

ভালোবাসার অস্তিত্ব যদি তার বাইরে হয়, তবে কবুল জবাব দিচ্ছি, সে বস্তুতে আমার আবশ্যক নেই, আর তা-ছাড়া সে বস্তু জানাই সম্ভব নয়।

মন দিয়ে জানা অবশ্যই সম্ভব।

যদি মন থাকে। আর যদি'বা থাকে, তবে সে বস্তু দেহেরই প্রক্ষেপ।

কি রকম?

যেমন ছায়া। দেহ আছে ব'লেই আছে।

কিন্তু অন্ধকারে?

তখন দেহও নেই! আমি কি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি?...যাকগে ও-সব কথা। আমার পরিচয় তো জানলে, এবার তোমার পরিচয় শুনি।

আমার পরিচয় নেই, নাম আছে, রুমালী।

বাঃ, বেশ মোলায়েম নাম তো।

নাম আবার মোলায়েম হয় নাকি?

হয় বইকি! তোমার নামটি শুনে মনে হ'ল দামী নরম রেশম স্পর্শ করলাম। তা রুমালী, ডুবে মরতে গিয়েছিলে কেন?

মনের দুঃখে।

বলো, দেহের দুঃখে। বুঝেছি, তোমার আপন জন কেউ ছেড়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ।

চলো শুনবো সব কথা। কিন্তু এখানে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়। থাকো কোথায়?

চৌরাহার কাছে।

সে যে অনেক দূর! তা হোক চলো, সেখানে পৌঁছে দিই তোমাকে। এ কি কাঁপছো যে!

ঠাণ্ডায়।

তাই তো, কাপড় ভিজে গিয়েছে। সারাদিন খাও নি মনে হচ্ছে।

যে-জগৎ স্নেহমমতাশূন্য মনে হয়েছিল, সেই মরুভূমির জগৎ থেকে একটুখানি স্নেহের সমীরণ আসতেই জল গড়াতে লাগলো রুমালীর চোখে। আর ঐ বাহুর নিবিড় উষ্ণ সান্নিধ্যে ভারি একটি আরাম, একটি আশ্রয়, একটি নির্ভর সে অনুভব করতে লাগলো। এতক্ষণ পরে তার পায়ের নিচে মাটি যেন শক্ত বোধ হ'ল।

যমুনার ধার বরাবর চলে তারা কলকাত্তা দরবাজা দিয়ে শহরে ঢুকে পড়লো, আর যতদূর সম্ভব বড় রাস্তা এড়িয়ে অবশেষে এক সময়ে এসে পড়লো

রুমালীর কুঠিতে। তখন রাত্রি গভীর, নিচতলার অধিবাসীরা নিদ্রিত, কেউ জানতে পেলো না কখন তারা পৌঁছল।

রুমালী দরজা খুলে ঢুকলে সরাব মিঞা বলল, নাও, বাতি জ্বালো।

বাতি জ্বালা হ'লে সরাব ব'লে উঠল, বাঃ বেশ ঘরটি তো। ঘরে নিশ্চয় খাবার নেই। আচ্ছা, তুমি ব'সো, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরছি।

সরাব মিঞা বেরিয়ে গেলে তক্তপোশের উপরে বসে পড়লো রুমালী, তার মনে হ'ল দীর্ঘ একটা দুঃস্বপ্ন অন্তে সে যেন আবার জেগে উঠল বাস্তব জগতে। শুধু আজকের দিনটার দুঃস্বপ্ন নয়—এই এক মাসের দুঃস্বপ্ন, যখন প্রথম দেখা হয়েছিল জীবনের সঙ্গে। জীবনের আকর্ষণ অভ্যস্ত আচরণের দৃঢ় তটভূমি থেকে তাকে সবলে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল অপরিচিত মনস্তত্ত্বের প্রবল স্রোতের মধ্যে। তার নর্তকী মা ছিল দেহচারিণী, মনের ধার ধারত না, বাল্যকাল থেকে সে নিজেও শিক্ষা পেয়েছিল দেহাচারে, মনের সন্ধান কেউ দেয় নি তাকে। দৈহিক মাত্রাবোধে সে ছিল একচারিণী। তারপরে এলো জীবন, দেহের সঙ্গে পেলো মনের সন্ধান, ধীরে ধীরে একচারিণী হয়ে উঠল দ্বিচারিণী। সুখ গেল, স্বস্তি গেল, ক্ষুধা গেল, নিদ্রা গেল, অবশেষে মরতে বসেছিল। যার যা নয় সে পথ নিলে চলবে কেন? দ্বিচারিত্বের দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে আবার সে জেগে উঠেছে একচারিতার জগতে। ঐ সরাব-কোকিলের রবে ভোর হয়েছে তার কালরাত্রি। সে ভারি একটি কৃতজ্ঞতা বোধ করলো সরাবের প্রতি। না, না, না,—দেহ ছাড়া আর কিছুকে সে প্রশ্রয় দেবে না।

সরাব মিঞা ঘরে প্রবেশ করলো, এক হাতে দুটো বোতল, আর-এক হাতের পাত্রে মাংসের কাবাব।

এত রাত্রে এ-সব পেলে কোথায় ভাই?

দিল্লি শহরে রাতের দুনিয়ার বেসাতি যেখানে চলে।

অনেক খরচ হ'ল।

এক পয়সাও নয়।

এমনি দেয়?

তাই কি দেয় কেউ? আমি ওদের গজল লিখে দিই, ওরা আমাকে খেতে দেয়। কাবাব আর সরাব, তার সঙ্গে গজল না হ'লে জমবে কেন?

তুমি থাকো কোথায়?

আজ এখানে থাকবো।

এখানে যদি না জুটতো?

চাঁদনী চকের নহরের মধ্যে। অবাক হচ্ছ কেন। তুমি তো তার চেয়ে গভীর জলে থাকতে যাচ্ছিলে। নাও, আরম্ভ করো, বড় খিদে পেয়েছে।

ভোর রাতে বিদায় নেওয়ার সময়ে সরাব বলল, রুমালী ভাই, এই জিনিসটা রাখো।

কি এটা?

চেয়েই ছাখো।

প্রদীপের ম্লান আলোয় রুমালী দেখতে পেলো, রুপোর সরু শিকলিতে ঝোলানো সোনার একটি ছোট তক্তি।

কি এটা?

যা দেখতে পাচ্ছ।

পেলে কোথায়?

একটা দেহাতী লোক আড়াই টাকায় বেচেছিল।

তোমার কাছেই থাক না।

না, না, কোনদিন হয়তো অভাবের তাগিদে বেচে দেবো। তা-ছাড়া তোমার কাছে থাক আমার একটা ইয়াদি (স্মরণচিহ্ন)।

থাক্, বলে গলায় পরে নেয়। বলে, বেশ সুন্দর জিনিসটি।

রেখে দাও কাছে, কোনদিন হয়তো প্রয়োজনে লেগে যাবে। আমি যখন কিনেছিলাম, তখন কি জানতাম তোমাকে দেবো!

আবার কবে আসবে?

একদিন ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়বো আবার।—এই বলে বেরিয়ে যায় সরাব মিঞা।

ক্লান্ত দেহ বিছানায় টেনে নিয়ে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে রুমালী।

॥ ১২ ॥

উজীর যখন লুকিয়ে যাতায়াত করে

যে-রাতে যমুনার জলে ডুবে মরতে গিয়েছিল রুমালী, সে রাতে বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে বিনিদ্র সুখানন্দ পণ্ডিত। দূরে কোথায় কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজে লগি ঠেলে অন্ধকার রাত্র এগিয়ে যায়, কিন্তু যে চিন্তার দহে পড়েছে

সুখানন্দ, সেখান থেকে আর উঠতে পারে না।

তার মন থেকে সন্দেহের শেষ লেশটুকুও অপসৃত হয়ে যায়, তার আর কোন সংশয় থাকে না যে এই জীবনলাল তার লখনৌ-এর যৌবনের বন্ধু নবীন দত্তের পুত্র। না, সন্দেহ করবার এতটুকু কারণ থাকে না। দূর নিকট নানা দিক থেকে সন্তর্পণে জেরা ক'রে বুঝেছে জীবনলালের পুরো নাম জীবনলাল দত্ত, আর সে লখনৌ শহরের নবাবগঞ্জ মহল্লার নবীন দত্তের একমাত্র সন্তান।

জীবনলাল, বাবা তুমি তো বলছ তুমি বাঙালী, তবে নামটা এমন খোট্টাই করলে কেন?

যে দেশে যেমন ব্যবহার, ইংরেজিতে বলে, রোমনগরে গেলে রোমানদের মতো আচরণ করতে হয়।

তা বটে, আমরাও তো বস্তু, কিন্তু ঐ লেজটুকু ছেঁটে ফেলে দিয়ে হয়েছি সুখানন্দ আর নয়নচাঁদ।

তবেই দেখুন, আমরাও ভুল করি নি। বাবা বলতেন এ দেশে এসে যখন এদেশী পোশাক-আশাক খাদ্য-খানা ধরেছি তখন নামটাই বা নয় কেন?

তা হ'লে তোমার পুরো নামটা কি দাঁড়াচ্ছে, বাবা?

জীবনলাল দত্ত।

ঠাকুরের নাম?

৺নবীনলাল দত্ত।

চমকে উঠে সুখানন্দ শুধোয়, কি নাম বললে?

৺নবীনলাল দত্ত। চিনতেন নাকি?

হঠাৎ এ কথা কেন মনে হ'ল বলো তো?

বিশেষ কোন কারণ নেই, তবে আপনাদের সমান বয়স হবে। আর এদেশে বাঙালী বা কয়জন!

সুখানন্দর মনে সন্দেহ জাগ্রত হয়েছে কিন্তু সন্দেহের কুয়াশা গলে এখনো প্রত্যয়ের নির্মল শিশিরবিন্দু দেখা দেয় নি।

তোমার মুখে তো কাশী আর লখনৌ দুটো শহরের কথাই শুনি, কোথায় ছিলে তোমরা?

দু' জায়গায়ই বলতে পারেন। আমার জন্ম শিক্ষা কাশীতে মাতুলালয়ে, মাঝে মাঝে বাবার কাছে লখনৌতে আসতাম। লখনৌ-এর হাওয়া ভালো নয় বলে সেখানে রাখতে চাইতেন না বাবা।

সুখানন্দ স্বগতোক্তিতে বলে ওঠে, লখনৌ-এর আবহাওয়া গেরস্ত মানুষের বাসযোগ্য নয়।

ঠিক বলেছেন, আমার কাকা ভৈরব চাটুজ্জে মশায়ও ঠিক এই কথাই বলতেন।

ভৈরব চাটুজ্জে তো ব্রাহ্মণ। ওঃ বুঝেছি, বাবার বন্ধু বলে কাকা।

আজ্ঞে হাঁ, এমন বন্ধু হয় না, আর এমন আপনও হয় না।

তিনি এখনো জীবিত?

আজ্ঞে হাঁ, জীবিত দেখেই তো রওনা হয়েছিলাম, তারপরে লখনৌ শহরে গদর আরম্ভ হয়েছে। ভগবান করুন, বেঁচে যেন থাকেন।

আবার চমকে ওঠে সুখানন্দ, এ নামটাও যেন পরিচিত।

অনেকদিন পরে ভৈরব কাকার কথা মনে পড়ে। জীবনের অবশ্য অনেক সময়ে অনেকবারই মনে পড়েছে, বিশেষ লখনৌ-এ গদর হয়েছে সংবাদ পাওয়ার পরে, কিন্তু এমনভাবে সহৃদয় শ্রোতার কানে সে কথা ঢালবার সুযোগ পায় নি, তাই বলে যায়, পর যে এমন আপন হ'তে পারে জানতে পারতাম না তাঁকে না দেখলে। বাবা গত হওয়ার পরে সে আজ বছর দুয়ের ঘটনা, তিনি আমাকে বুকে তুলে নিলেন। বাবাও জানতেন যে, তিনি মারা গেলেও আমি পিতৃহীন হবো না।

ভয়ে ভয়ে সুখানন্দ শুধোয়, তোমার মা?

তিনি গত হয়েছেন আমার বাল্যকালে। তাই তো থাকতাম কাশীতে, বাবা একলা, আমাকে সামলাবেন, না বিষয়কর্ম দেখবেন।

সুখানন্দ প্রশ্ন ক'রে বসে, তোমার বাবার আর কোন বন্ধু ছিল না?

পরিচিত ব্যক্তি অনেক ছিল, ঘনিষ্ঠও ছিল অনেকে, কিন্তু বন্ধু বলতে ঐ একজন।

এমনি সব প্রশ্নোত্তরের টুকরো জেগে ওঠে বিনিদ্র মনে, আর বিনিদ্র চোখের উপরে ভেসে ভেসে ওঠে একটার পর একটা ছবি। সে-সব ছবি আজ এতদিন পরেও নিঃশেষে অস্তগত পাপের আভায় উজ্জ্বল। কত ঘটনা, কত অপকার্য। যে অধ্যায়ের পাতা ক'খানা সমূলে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, আজ উল্টো বাতাসে সেই অধ্যায়ের খানকতক পাতা আচম্বিতে এসে পড়লো সম্মুখে। পাতা জীর্ণ হয়ে গিয়েছে কিন্তু লেখাগুলো যে তেমনি মসীময়, বরঞ্চ আরও যেন বেড়েছে তার কালিমা। সমস্ত বুক মন্থিত ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। ভগবান, তোমার ক্ষমা তো এখনো ধুয়ে দিতে পারে নি সেদিনকার

কলঙ্ক। অনুতপ্তের হৃদয়বাষ্পের মেঘ থেকে যদি করুণার বর্ষণ হয় তবে কেন ধুয়ে গেল না সে-সব পাপের স্মৃতি। কেন তারা আজও জ্বলন্ত মশাল হাতে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায় মনের মধ্যে। সঙ্কল্প করে আর ভাববে না সে-সব দিনের কথা, কিন্তু মন কি কারো নিজের হাতে!

কত কথাই না আজ মনে পড়ে। সুখানন্দরা দুপুরুষ লখনৌ শহরের অধিবাসী, অবস্থাও বেশ সচ্ছল। এমন সময়ে ঘটলো পিতৃবিয়োগ। সেই উদ্দাম কৈশোরের দিনে হাতে এলো অনেক টাকা। আর জুটে গেল কিশোর সঙ্গী নবীন দত্ত। দু'জনেই অভিভাবকহীন। সে কি উন্মত্ত দিন আর উন্মাদনাময় রাত্রি। কেউ নিষেধ করবার নেই, কেউ সৎপরামর্শ দেওয়ার নেই, দুষ্কর্মের চৌঘুড়ি ছুটে চলল মদিরাপিচ্ছিল নিয়তির পথে। সেই অভিন্নহৃদয় অপকীর্তির দিনে কালীবাড়িতে গিয়ে কালীপ্রতিমার চরণ স্পর্শ করে দু'জনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তাদের ছেলে আর মেয়ে হ'লে তাদের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করবে।

বিছানায় উঠে বসে সুখানন্দ, সমস্ত বাড়ি, সমস্ত শহর সুষুপ্ত, জানলায় তাকিয়ে দেখে আকাশের তারাগুলোও ঘুমে ঢুলছে, চরাচর-ব্যাপী এই সুখনিদ্রার শয্যায় একাকী কেবল সে-ই নিদ্রাহীন।

জানলার শিক ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে সুখানন্দ ভাবে, নিয়তির গতি কি অমোঘ, ব্রহ্মাস্ত্রের গতিও এমন অব্যর্থ নয়। লখনৌ শহরের যে জীবনটাকে একদিন বিশ হাত মাটির তলে চাপা দিয়ে সরে পড়েছিল, কে জানতো আজ পঞ্চাশ বৎসর পরে করাল কঙ্কাল পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবে। এতদিন পরে সে নিশ্চিত বুঝলো নিয়তিকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, না মাটি চাপা দিয়ে, না বিস্মৃতি চাপা দিয়ে, পারার ঘায়ের মতো সে ফুটে বের হবেই, আজ না হোক দুপুরুষ পরে। দুশ্চিন্তার ভারে মাথা নত হয়ে আসে। চৌকাঠের বাতাটায় মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

কতক্ষণ এভাবে ছিল জানে না, মাথা তুলে দেখে আকাশের গায়ে নীলাভ আঁচড় কেটে খসে পড়ছে একটা উল্কা। হঠাৎ আর একটা উল্কার রেখা ছুটে চলে যায় তার মনের মধ্যে দিয়ে, যাকে নিয়তির অভিশাপ ভাবছে তা কি নিয়তির আশীর্বাদ নয়? অন্ধকারে যাকে কঙ্কাল মনে হচ্ছে তা কি একটি সুঠাম ফলবান বৃক্ষ নয়? কে বলতে পারে? এই তো তুলসীর বর, এই জীবনলাল। সেদিন কালীর চরণ স্পর্শ ক'রে যে শপথ করেছিল তা কি মিথ্যা হ'তে পারে। সে দুর্বৃত্ত হ'তে পারে কিন্তু দেবীর কাছে তো শিশু।

কোন্ শিশু নিষ্পাপ নয়? সে ভুলে গিয়েছিল সেদিনের শপথ, নবীনও ভুলেছিল নিশ্চয়, কিন্তু দেবী তো ভোলেন নি, তাই এতকাল পরে যথাসময়ে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছেন তুলসীর বরকে। স্থান কাল পাত্রের অপ্রত্যাশিত আকস্মিক যোগ বিস্ময় সৃষ্টি করে তার মনে। বিস্ময় আনে ভক্তি। চিন্তার প্রত্যেক পদক্ষেপে তার ধারণা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হ'তে থাকে। বুঝতে না পেরে কি ভুলই না সে করেছিল। ফলবান বৃক্ষকে করাল কঙ্কাল ভেবেছিল। তখনি তার মনে হয় মা সমস্ত পাপ নিজহাতে ধুয়ে মুছে স্খালন ক'রে দিয়েছেন। কোন পাপ তাঁর কাছে ক্ষমার অযোগ্য নয়। ভক্তি আর অনুতাপ থাকলে নৃমুণ্ডমালিনী নরহত্যার পাপও ক্ষমা ক'রে থাকেন। মস্ত স্বস্তি অনুভব করে সে।

দেবীর দয়ায় তার মেয়ের, মানে তুলসীর বর উপযাচক হয়ে বাড়িতে এসে উঠেছে—আর সে কি না আকাশ-পাতাল ভেবে মরছে। কিন্তু···কিন্তু তখনি অনেকগুলো 'কিন্তু' খোঁচা মারতে থাকে মনের মধ্যে। জীবনলাল কি রাজী হবে? আজকালকার ছেলেদের আবার দেবীর উপরে তেমন ভয় ভক্তি দেখা যায় না। দেবীর লীলা খুব সম্ভব সে বুঝবে না, আর সেদিনের শপথ প্রকাশ ক'রে বললেও বিশ্বাস করবে কি না বলা শক্ত। তাছাড়া, নবীন ওকে কিছু বলে নি তো? না, তা সম্ভব নয়, বলতে গেলে নিজের দুষ্কৃতিও প্রকাশ করতে হয়। তার উপরে, মনে মনে হিসাব ধরে ধরে দেখলো, সেই শোচনীয় অধ্যায়টার অনেক পরে জীবনের জন্ম, ততদিনে নিশ্চয় সব কথা চাপা পড়ে গিয়েছে নবীনের মনে। এদিকে আবার ভয় ঐ নয়নচাঁদটাকে, যে গোঁয়ার! স্বরূপের সঙ্গে তুলসীর বিয়েতে আপত্তি করেছিল—স্বরূপ নাকি মনে মনে কোম্পানীর দিকে, আর এ যে খাস কোম্পানীর সেপাই। বেটার মনে দেব-দেবীর প্রতি ভক্তির অভাব নেই, কিন্তু মুশকিল এই যে, দেবীর চরণস্পর্শ ক'রে শপথ বর্ণনা করতে গেলে ঘটনার টানে সেদিনের দুষ্কৃতি বের হয়ে পড়বার আশঙ্কা। তাতে বিয়ে তো ভাঙবেই, ছেলে দুটোর মন ভাঙতেই বা বাধা কি, তবে ইদানীং সিপাহীদের কাণ্ডকারখানা দেখে মনটা যেন একটু নরম হয়েছে, নইলে কোম্পানীর লোক জেনেও ওকে আশ্রয় দিত না। দেখা যাক, যা করেন মা কালী।

এমন সময়ে হঠাৎ চমকে উঠে দেখলো মানুষ সমান উঁচু জানলার কাছে অন্ধকারের মধ্যে একটি মানুষের মাথা।

কে?

চাপা গলায় উত্তর এলো, পণ্ডিতজী, শিগ্‌গীর দরজা খুলুন।

এ কি হাকিম সাহেব যে! এত রাত্রে একা।

সব বলছি, শিগ্‌গীর দরজা খুলে দিন। চাকর-বাকর ডাকবেন না, নিজে কষ্টটুকু স্বীকার করুন।

দাঁড়ান, এখনি যাচ্ছি।

হাকিম আসানুল্লা বাড়িতে প্রবেশ করলে আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দু'জনে পূর্ববর্ণিত ঘরে এসে বসলো।

না, না, বাতি জ্বালাবেন না। লুকিয়ে অন্ধকারে এসেছি, লুকিয়ে অন্ধকারে ফিরতে হবে।

হাকিম সাহেব, যে-রাজ্যের উজীরকে লুকিয়ে অন্ধকারে যাতায়াত করতে হয়, সে রাজ্যের ভবিষ্যৎ তো ভালো নয়!

পণ্ডিতজী. এখনো কি এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ বলে কিছু আছে? অতীতের ভাঙা ডালখানা কোন রকমে লেগে আছে গাছের সঙ্গে। আর দু'একটা দমকা এলেই ব্যস্‌।

সুখানন্দ শুধোয়. এই ক'ঘণ্টার মধ্যে আবার নূতন কি ঘটলো!

সেই কথাই তো বলতে আসা। গলা শুকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু না, থাক, চাকর-বাকরকে জাগিয়ে কাজ নেই।

চিন্তা করবেন না। আমি নিজেই আনছি।

উজীর সাহেব জলপান ক'রে সুস্থ হয়ে বসলে সুখানন্দ বলল, এবারে বলুন কি ব্যাপার।

ব্যাপার তো সকালবেলাতেই বলেছি। এবারে তার—

বাধা দিয়ে সুখানন্দ বলে, এবারে তার উপসংহার।

উপসংহার নয় পণ্ডিতজী, তার চেয়ে অনেক বেশি, একেবারে উজীর সংহার।

কি সর্বনাশ!

আজকের এই প্রলয়কাণ্ডের মধ্যে অর্ধনাশ হবে এমন আশা করছেন কেন?

তাই বলে উজীরের উপরে আক্রমণ!

পণ্ডিতজী, যে-উজীর নামে মাত্র উজীর, আক্রমণের সেই তো নিরাপদতম লক্ষ্য। শুনুন, শাহ্‌জাদাদের ধারণা হয়েছিল যে জীবনলালকে আমি কোতল করবার হুকুম দেব, কাজেই তার সঙ্গে শাহ্‌জাদাদের চিঠিগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে

যাবে। কিন্তু যখন তারা শুনলো আসামীকে পাঠিয়ে দিয়েছি সিপাহ্‌সালারের কাছে, আর আসামী প্রাণ বাঁচাবার জন্যে চিঠির কথা প্রকাশ করবে তার কাছে—তখন শাহ্‌জাদারা প্রমাদ গুনলো।

কিন্তু আপনার উপর আক্রমণ চালিয়ে কি লাভ?

প্রথম লাভ প্রতিশোধ। দ্বিতীয় লাভ আমাকে কোম্পানীর অনুগত প্রমাণ করতে পারলে, চিঠিগুলো যে জাল প্রমাণ করা কঠিন হবে না।

সুখানন্দ কোন উত্তর দেয় না দেখে আসাদুল্লা বলে, কি ভাবছেন?

ভাবছি এই যে, শাহ্‌জাদারা গোড়া থেকে এত হিসাব ক'রে চললে বাদশাহীর আজ এই অবস্থা হ'ত না।

পণ্ডিতজী, বড় বড় বিষয়ে যারা বেহিসাবী, তুচ্ছ ব্যাপারে তারাই সূক্ষ্ম হিসাব করতে বসে। যাক গে, তারপরে শুনুন। কাল সকালে শাহ্‌জাদাদের পল্টন আমার বাড়ির উপরে এসে চড়াও হবে।

এত কথা জানলেন কি ক'রে?

আপনি আসমানের ব্যাপার নিয়ে থাকেন, আর আমার পেশা মাটির খবর রাখা। উজীরী বলুন আর ফকিরী বলুন সকলেরই মূল গোয়েন্দাগিরি।

ওঃ বুঝেছি। আচ্ছা, কালকের দিনটা আপনার গা-ঢাকা দিয়ে থাকলে হয় না?

কি সর্বনাশ, তা হ'লে কি আর পরে মুখ দেখাতে পারবো। তাই স্থির করেছি কালকে থাকবো সবচেয়ে প্রকাশ্য জায়গায়।

কোথায়?

বাদশার দরবারে। আমাকে না পেয়ে শাহ্‌জাদাদের ফৌজ যাবে লাল-কেল্লায়। সেখানে বাদশার সামনে মামলার ফয়সালা হবে। তা ছাড়া পণ্ডিতজী, আমার হাতেও কিছু অস্ত্র আছে।

অবশ্যই আছে। কি শুনতে পারি কি?

বলতে বাধা নেই, পরে সমস্তই জানতে পাবেন। এখন যে-জন্যে এসেছিলাম—জীবনলালকে একটু সাবধানে রাখবেন।

অন্দরমহলের ভিতরের দিকে রেখেছি, হঠাৎ কেউ খুঁজে পাবে না।

বেশ করেছেন।

তার উপরেও হামলার আশঙ্কা আছে নাকি?

অবশ্যই আছে, সেই তো মূল আসামী, সে হাতছাড়া হয়েছে বলেই আমার উপরে রাগ, তাকে পেলে কি আর কথা আছে।

আপনার পাইক দু'জন ছাড়া আর কেউ জানে না যে এ বাড়িতে সে আছে।

তারা খুব বিশ্বাসী লোক, তারা কোন কথা প্রকাশ করবে না।

তবে আর কি?

যদি আর কেউ দেখে থাকে।

কে বা চেনে তাকে।

সেই তো ভরসা, তবু সাবধানে থাকা দরকার।

সে কথা একশ' বার। জীবনলালের জন্য আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না।

যাক, নিশ্চিন্ত হ'লাম। এবারে উঠি পণ্ডিতজী।

তারপরেই বিনা উপসংহারে উঠে দাঁড়ায় হাকিম আসানুল্লা খাঁ। দু'জনে দরজার কাছে আসে, সন্তর্পণে দরজা খোলে সুখানন্দ পণ্ডিত, ততোধিক সন্তর্পণে নিক্রান্ত হয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায় হাকিমসাহেব। দরজা বন্ধ ক'রে দেয় সুখানন্দ। দূরে ঘড়িতে বাজে দুটো।

॥ ১৩ ॥

রুমালীর এজাহার

ভোরবেলা রুমালী একাকী বসে বসে ভাবছিল, সমস্ত শরীর মন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। কাল রাতে সুখ-মুসাফিরের সান্নিধ্যে তার মনে হয়েছিল সুখটাই সব, প্রেম কিছু নয়। আজ একাকী বসতেই বুঝতে পারলো ভুল, বুঝলো সুখ হচ্ছে ফেনা, আর প্রেম হচ্ছে জল; বুঝলো ফেনা জলের বিকার, এই আছে এই নেই; জল চিরন্তন, বুঝলো অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভুল বুঝিয়ে গিয়েছে সুখ-মুসাফির।

এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করলো পল্টন, হাতে ছোট একটা হাঁড়ি।

কি রে পল্টন, এ কদিন তুই কোথায় ছিলি? দেখা পাই নি কেন?

সে অনেক কথা, দিল্লিতেই ছিলাম না, পরে না হয় ধীরেসুস্থে শুনো, এখন তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

কেন রে, এত তাড়া কিসের?

তোমার খিদে পেয়েছে যে।

বুঝলি কি ক'রে?

আমার খিদে পেয়েছে দেখে।

বোকা ছেলে, তোর খিদে পেলে আমার খিদে পেতে যাবে কেন?

আলবৎ খিদে পাবে। তুমি না আমার দিদি।

ব্যস, এ এমন একটা যুক্তি যার উত্তর এ পর্যন্ত কেউ খুঁজে পায় নি, কাজেই রুমালীকে রাজী হ'তে হয়। তাছাড়া, পল্টনের অনুমান মিথ্যা নয়, সত্যই তার খুব খিদে পেয়েছিল।

দু'জনে পাশাপাশি খেতে বসে। রুমালী শুধায়, এবারে বল তো ব্যাপার কি, এত তাড়া কিসের?

এখনি লালকেল্লায় যাবো, তুমিও চলো।

কেন রে, সেখানে কি হবে?

কি হবে তা কি এখনি কেউ বলতে পারে, তবে মনে হচ্ছে দু'শো মজা হবে। সিপাহীরা সব ক্ষেপে গিয়েছে, তারা আজ দেওয়ানী আমে যাবে বাদশার কাছে দরবার করতে।

তা যাক, তাতে তোর আমার কি?

তুমি আমি মজা দেখবো। সিপাহীর দরবার মানেই একটা হাতাহাতি ব্যাপার।

কার সঙ্গে?

নিজেদের সঙ্গে, নিজেদের মধ্যে, ওরা কার সঙ্গে লড়বে?

কি নিয়ে দরবার কিছু জানিস?

অতশত জানিনে দিদি, শুনলাম, হাজার হাজার সিপাহী যাবে তাই ছুটে এলাম, ভাবলাম একলা দেখে সুখ নেই, দিদিকেও নিয়ে যাই।

আমার শরীর ভালো নেই রে, আমি যাবো না, তুই যা।

এটা কি একটা কথা হ'ল দিদি! শরীর আজ ভালো নেই—কাল ভাল হবে, কিন্তু দরবার তো রোজ হবে না।

কিন্তু কি লাভ আমাদের?

ক্ষতিটাই বা কি?

আচ্ছা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু সত্যি বল্ ভাই, এত কথা জানলি কি ক'রে?

গ্রেপ্তার হওয়ার পরে জীবনলালজীর কি হ'ল জানবার জন্যে কাল থেকে চেষ্টা করছি, কত জায়গাতেই না গেলাম, হিন্দুরাও কুঠিতে গেলাম মেওয়া-অলা সেজে—না, সেখানে ফেরে নি জীবনলালজী। তারপরে গেলাম বখৎ

খাঁর কুঠিতে, সেখানেও কেউ বলতে পারলো না। আজ সকালে গিয়েছিলাম দিলমঞ্জিলে—না, কেউ কিছু জানে না। ফিরে আসছি, এমন সময় এক সিপাহী বলল, বেফায়দা এখানে ওখানে না ঘুরে লালকেল্লায় যাও, তুশো মজা দেখতে পাবে। তার পরেই ছুটে আসি তোমার কাছে। অবশ্য মাঝে একবার থেমেছিলাম ঘণ্টেওয়ালার দোকানে। শুনলে তো সব, নাও এখন চলো।

নিতান্তই যখন ছাড়বি নে, চল্।

তুজনে রওনা হয়।

গলির মধ্যে দিয়ে সোজা দক্ষিণে গিয়ে চাঁদনী চকে পড়তেই রুমালী দেখলো পল্টন বাড়িয়ে বলে নি; কাতারে কাতারে লোক চলেছে, সিপাহী, দোকানী, বেকার সব রকম লোকই আছে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে সবাই ছুটেছে লালকেল্লার দিকে। কেউ বলছে লড়াই ফতে হয়ে গিয়েছে, কোম্পানীর জাঁদরেল বাহাদুর কোতল হবে। কেউ বলছে বাদশা শিরোপা দেবেন বখৎ খাঁ আর শাহ্‌জাদাদের। কেউ বলছে কি হয় গিয়ে দেখা যাক। সকলের সঙ্গে মিলে ওরাও তুজনে ছুটলো।

আসল ব্যাপার অন্য রকম। শাহ্‌জাদাদের প্ররোচনায় মীরাটী ফৌজ আর নিমচী ফৌজের কতক লোক ক্ষেপে ওঠে, বলে যে, উজীর হাকিম আসাহুল্লা খাঁ বেইমানী করছে বলেই আজও লড়াই ফতে হচ্ছে না, বাদশাহী কামান বিগড়ে গিয়ে কুলি খাঁর হাত জখম হয়েছে। তাদের দাবী উজীরকে না সরালে সিপাহীর জিতবার আশা নেই। তারা সরাসরি উজীরের কুঠিতে গিয়ে চড়াও হয়ে শুনতে পায় উজীর সাহেব ভোরবেলাতেই লাল পর্দায় (বাদশার দরবারের নাম) গিয়েছে। তখন সকলে ছুটলো লালকেল্লার দিকে।

জলে জল বাধে, ভিড়ে ভিড় বাড়ে। সিপাহীদের লালকেল্লার দিকে ছুটতে দেখে অন্য লোকেও ছুটতে লাগলো। ক্রমে মূল উদ্দেশ্য লোপ পেয়ে গিয়ে উপসর্গটাই প্রবল হয়ে উঠল।

রুমালী আর পল্টন লাহোরী দরবাজার কাছে উপস্থিত হয়ে দেখল অবাধ জনস্রোত ঢুকছে ভিতরে, ছাত্তাচক পেরিয়ে, নৌবৎখানা পেরিয়ে দেওয়ানী আমের দিকে। তারা অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখলো যে দেওয়ানী আমের প্রশস্ত চত্বর লোকে ঠাসাঠাসি ভরতি হয়ে গিয়েছে। তারা শুনলো নানা কণ্ঠে নানা রকম আওয়াজ উঠছে, 'বে-ইমান উজীর বরবাদ'! 'বাহাদুর শাহ্‌ জিন্দাবাদ'! কেউ বলছে বাদশা কোথায়? কেউ বলছে উজীর কোথায়? কেউ বা বলছে বাদশা উজীর এককাট্টা, বাদশাই লুকিয়ে

রেখেছে উজীরকে। আবার ওরই মধ্যে ব্যবসাও চলছে, কেউ লাড্ডু বেচছে, কেউ সুর্মা আর আতর। রুমালী ভাবলো, পণ্টন মিথ্যা বলে নি। দুশো মজাই বটে। ভালো ক'রে দেখবার আশায় ওরা একটু উঁচু জায়গায় উঠে দাঁড়ালো।

ওরা দেখতে পায় জনস্রোত ঢুকবার বিরাম নেই, পিছনের ঠেলায় সামনের ভিড় এসে দেওয়ানী আমের ভিতর পর্যন্ত পৌঁছল। তবু পড়ছে পিছন থেকে ঠেলা। তখন অগত্যা প্রথম সারির লোকে দেওয়ানী আমের মেঝের উপরে উঠে দাঁড়ালো। তাদের দেখাদেখি সাহস পেয়ে আরও লোকে উঠল, ক্রমে প্রায় সব বাড়িটা জনতায় ভরে গেল, কেবল ফাঁক রইলো শ্বেত পাথরের বাদশাহী মসনদখানা। রুমালী ও পণ্টনের দূরদর্শিতা থাকলে বুঝতে পারতো যে, সত্য সত্যই বাদশাহীর পতন হয়েছে, নতুবা জনতা এসে চড়াও হ'তে পারতো না দেওয়ানী আমে, যে জায়গায় শাহ্‌জাদা, পাঁচ হাজারী, সাত হাজারী মনসবদার আর উজীর, সিপাহ্‌সালার প্রভৃতি অত্যুচ্চ শ্রেণীর কর্মচারী ছাড়া এর আগে কেউ কখনো পদার্পণ করে নি। প্রতিষ্ঠানের পতন হ'লেও কিছুদিন বজায় থাকে ঠাট, সদ্য মৃতের দেহে জীবনের তাপের মতো।

কিন্তু কই, যার কাছে দরবার—সেই বাদশা কোথায়? কোথায় শাহ্‌জাদার দল? কোথায় উজীর, সিপাহ্‌সালার, মীর আতশ, মীর বক্‌শী? কোথায় সব? সব পালিয়েছে নাকি? এতক্ষণ জনতা আত্মবিনোদনে নিযুক্ত ছিল, কেউ কিনছে, কেউ খাচ্ছে, কেউ পরিচিত লোককে বলছে, তুমিও এসেছ দেখছি, আর কেউ কেউ বা জনসমাবেশের কারণ অনুমানের চেষ্টা করছে। কিন্তু বেলা বেড়ে উঠে রোদের তাপ কড়া হয়ে উঠতেই জনতার মেজাজও কড়া হয়ে উঠল। তখন তারা যে-সব মন্তব্য শুরু করলো তা শুনলে বাদশা শাহ্‌জাহান ও আলমগীর কবরের মধ্যে পাশ ফিরে শুতেন। জনতার কণ্ঠ আছে মস্তিষ্ক নেই, আর মস্তিষ্ক নেই বলে মস্তক হারাবার আশঙ্কা নেই। জনতা সাহসী নয় উদাসীন, সকলেরই ধারণা আঘাতটা পড়বে পার্শ্ববর্তীর মাথায়, তার কোন ভয় নেই।

বে-ইমান হাকিম সাহেব কোথায়?

শাহ্‌জাদারা কোথায় গেল?

তলে তলে সব এককাট্টা!

ঠিক বলেছ, ওরা গোপনে কোম্পানীর সঙ্গে চিঠি চালাচালি করে।

মরতে মরবো আমরা।

বাদশা আসছেন না কেন ?

না ভাই, ঐ বুড়োকে দিয়ে বাদশাহী চলবে না।

নূতন বাদশা না হ'লে লড়াই ফতে হবে না।

পাওয়া যাবে কোথায় ?

কেন, বাদশার অভাব কি ? সালাতিন থেকে একটা শাহ্‌জাদা বের ক'রে আনলেই হ'ল। অনেক মাছ জিয়ানো আছে।

যারা শুনলো হেসে উঠল। এমন সময়ে ভিড়ের মধ্যে এক ছোকরা পটকার আওয়াজ করতেই, 'শালা কোম্পানীর তোপ নাকি' বলে দু'একজন মন্তব্য করলো। তা শুনে আবার কেউ কেউ বলল, এই সাহস নিয়ে লড়াই করবে, যাও ঘাগরা পরে অন্দর মহলে গিয়ে ঘুমোও।

পণ্টন কুনুইয়ের গুঁতো মারে রুমালীকে, কেমন, বলেছিলাম না দুশো মজা।

এমন সময়ে হৈ হৈ ক'রে ওঠে জনতা—ঐ আসছে, ঐ আসছে।

পিছনের যারা দেখতে পায় না, শুধোয়, কে আসছে ভাই ?

যারা দেখতে পায় বলতে থাকে, বাদশা, শাহ্‌জাদা মীর্জা মুঘল, সিপাহ্‌-সালার বখৎ খাঁ।

পিছন থেকে প্রশ্ন ওঠে, বে-ইমান শালা কোথায় ?

সামনের লোকে বলে যায়, হাসান আকসারি, উজীর হাকিম আসানুল্লা খাঁ।

আসানুল্লার নাম শোনবামাত্র জনতা গর্জন ক'রে ওঠে, বেইমান !

অদৃষ্টের ব ির মতো সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করে বাদশা ও প্রধানগণ।

জনতা না করে কুর্নিশ, না দেয় নজরানা। বাদশার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে।

তখন মীর্জা মুঘল এগিয়ে এসে বলে, বাদশা জানতে চান তোমরা কেন এসেছ ?

অনেকে চীৎকার ক'রে ওঠে, বিচার চাই, বিচার চাই।

মীর্জা মুঘল আবার বলে, কার বিচার, কি অপরাধ ?

জনতার মধ্যে থেকে রব ওঠে, উজীর সাহেবের বিচার চাই।

কি অপরাধ ?

উজীর সাহেব শাহী কামান বিগড়ে দিয়েছে !

বাদশা তাকান উজীরের দিকে।

উজীর কুর্নিশ ক'রে বলে, শাহেন শা, কামান রইলো সেলিমগড়ের বুরুজের উপরে, আর আমি রইলাম আমার গরীবখানায়, কেমন ক'রে আমি বিগড়ে

দিলাম কামান? তা ছাড়া জাঁহাপনা, কামান বন্দুককে আমার বড় ভয়, জীবনে ওসব বস্তুর কাছে যাই নি।

একজন বলে ওঠে, গোলন্দাজ কুলি খাঁর হাত পুড়ে গিয়েছে।

আসানুল্লা বলে, ঘটনাটা বড়ই দুঃখের কিন্তু আমার অপরাধ কি?

বখৎ খাঁ এগিয়ে এসে বলে, কামান ছুঁড়তে গেলে এমন মাঝে মাঝে হয়।

মীর্জা মুঘল বলে, উজীর সাহেবের বিরুদ্ধে আর কি নালিশ আছে বলো।

কেউ কিছু বলে না, এ ওর মুখ চায়। তখন নিমচী ফৌজের সুবেদার ঘউস মহম্মদ এসে কুর্নিশ ক'রে বলে, জাঁহাপনা, ওসব বাজে লোকের ফালতু নালিশ।

তোমার নালিশ কি?—শুধোয় মীর্জা মুঘল।

ঘউস মহম্মদের অতিকায় বপু লক্ষ্য ক'রে জনতার মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, ওরে বাবা, এ যে আস্ত কুতুব মিনার।

আর একজন বলল, আলাই মিনার।

ঘউস মহম্মদের পক্ষে দেহ যতটা নত করা সম্ভব নত ক'রে কুর্নিশ ক'রে কোন রকমে সোজা হয়ে, দাঁড়ালো।

তার সোজা হয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে দেখে একজন বলল, কি খাঁ সাহেব, টেনে তুলবো নাকি?

মীর্জা মুঘল আবার শুধোয়, কি তোমার নালিশ?

সে বাদশার দিকে তাকিয়ে বলল, শাহানশা, তখন সন্ধ্যাবেলা আকাশে ঘোলাটে চাঁদ আস্ত একখানা কাবাবের মতো দেখা যাচ্ছে---

জনতার মধ্য থেকে একজন হিন্দু বলে উঠল, তোমার মতো এমন আস্ত রাহু থাকতেও চাঁদ রক্ষা পেয়ে গেল!

আমি দেখলাম কলকাত্তা দরবাজা দিয়ে একটা কোম্পানীর সিপাহী ছিপকে ছিপকে ঢুকছে।

তোমার চোখে কি দুরবীন আঁটা ছিল খাঁ সাহেব, যে দেখেই বুঝলে কোম্পানীর সিপাহী।

মীর্জা মুঘল বলে, বলে যাও।

দুশমনটা আমাকে দেখেই ছুটলো, আমিও ছুটলাম।

ঘউস মহম্মদ ছুটছে—কল্পনায় দেখে অনেকে হেসে উঠল। একজন চোপদার আসাসোঁটা ঘুরিয়ে বলল, হাসো মৎ।

চোপদারের হুঁশিয়ারির প্রয়োজন ছিল না, কেননা জনতার বারো আনা

লোক ইতিমধ্যে স'রে পড়েছিল। জনতা ও বন্যার আগমন ও নির্গমন দুই অতর্কিত। এখন শুধু ছিল দেওয়ানী আমের ভিতরে কিছু লোক আর আশেপাশে আর কিছু। জনতা ভেবেছিল উজীর হোক, নাজির হোক, কোম্পানীর পক্ষ হোক, সিপাহী পক্ষ হোক, কেউ একজন কোতল হবে, কার্যকালে ঘটনা অন্য রকম দেখে হতাশ হয়ে পড়লো, কাজেই তাদের আর হাজির থাকবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল না।

মীর্জা মুঘল বলে, তারপরে?

এবারে শাহ্‌জাদার দিকে তাকিয়ে বলল, হাঁ হুজুর, তাকে ধরে ফেলতেই লোকটা কবুল করলো যে সে কোম্পানীর সিপাহী, ছিপকে ছিপকে এসেছে খবর যোগাড় করতে।

বেশ, তারপরে কি করলে?

লোকটাকে নিয়ে গেলাম, মানে আমার হাবিলদার দিল মহম্মদ নিয়ে গেল উজীর সাহেবের কাছে।

মীর্জা মুঘল শুধায়, তোমার নালিশ কার বিরুদ্ধে, সেই লোকটার বিরুদ্ধে, না উজীর সাহেবের বিরুদ্ধে?

উজীর সাহেবের বিরুদ্ধে।

কি নালিশ?

উজীর সাহেব সেই গোয়েন্দাকে বে-কসুর খালাস ক'রে দিয়েছেন।

অভিযোগটা গুরুতর। বাদশা তাকান উজীরের দিকে।

হাকিম আসানুল্লা বলে, বিলকুল ঝুটা শাহানশা। আমি যখন দেখলাম যে লোকটা সিপাহী, বুঝলাম, সিপাহীর বিচারের ভার সিপাহ্‌সালারের উপরে, উজীরের উপরে নয়। আমি আসামীকে দু'জন পাইকের পাহারায় পাঠিয়ে দিলাম সিপাহ্‌সালারের এজলাসে।

বাদশা স্বয়ং বলেন, তারপরে?

লোকটা মাঝপথে পাইকদের হাত থেকে পালিয়ে গিয়েছে, অনেক খুঁজেও তার পাত্তা পাওয়া যায় নি।

বখৎ খাঁ বলল—এতক্ষণ সে নীরব দর্শকমাত্র ছিল—বলল, উজীর সহেবের কথা সত্য, আসামী পৌছয় নি আমার এজলাসে।

সমস্ত শুনে বাদশা বললেন, উজীর সাহেবের আর একটু হুঁশিয়ার হওয়া দরকার ছিল। যাই হোক, এজন্য তাঁকে দোষী করা চলে না।

সমস্ত মামলা যখন নিরুপদ্রবে মিটে যাওয়ার মুখে, সেই সময়ে এক ঘটনা

ঘটলো।

সকলে চমকিত হয়ে শুনলো, জাঁহাপনা, আমি জানি আসামী কোথায় লুকিয়ে আছে, আরও জানি যে, উজীর সাহেব নিজেই তাকে লুকিয়ে রেখেছেন, কারণ সে বাড়ি তাঁর দোস্তের।

সকলে সঙ্গে সঙ্গে চমকিত হয়ে দেখলো, একটি সুঠাম তরুণীর দেহ কুর্নিশ ক'রে উঠে দাঁড়াচ্ছে, তখনো সম্পূর্ণ ঋজু হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। সকলে দেখে বিস্মিত হ'ল যুবতী যে-ই হোক—অপরূপ সুন্দরী, যদিচ তার বেশবাস মলিন ও ছিন্ন, সেইজন্যেই সে যেন আরও সুন্দরী, ছেঁড়া কালো মেঘের ফাঁকে এ যেন পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য।

প্রথম এক মুহূর্ত কারো মুখে বাক্য সরলো না, এমন কি বাদশার মুখেও নয়। বাদশার স্থান অত্যুচ্চ কিন্তু চাঁদের স্থান তো তারও উঁচুতে। মেয়েটি রূপে, সাহসে ও নালিশের হঠকারিতায় সকলকে অবাক ক'রে দিল। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়ে গেল পন্টন। রুমালীদি এ কি ক'রে বসলো! উজীরের বিরুদ্ধে নালিশ করছে বাদশার কাছে, সাহস তো কম নয়! অবশ্য সে জানতো না যে আসামী জীবনলাল। তাহ'লে নিশ্চয় তার ধারণা হ'ত যে, রুমালীদির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু পন্টনের চেয়েও কেউ যদি অধিক বিস্মিত হয়ে থাকে তবে সে রুমালী নিজে। কথাটা মুখ দিয়ে বের হয়ে কানে প্রবেশ করতেই বুঝলো অতলে ঝাঁপ দিয়েছে জীবনলালকে জড়িয়ে নিয়ে, নিচে নিশ্চিন্ত মৃত্যু। এক মুহূর্ত আগেও জানতো না কি করতে যাচ্ছে, এক মুহূর্ত পরেও আর কিছু নেই, কেবল মাঝখানকার ঐ মুহূর্তটি দ্রুত দক্ষতায় ফাঁস এঁটে দিয়েছে তার কণ্ঠে। উদ্ধারের পথ নেই।

মীর্জা মুঘল ব'লে উঠল, বিবি, তোমার এজাহার গুরুতর! এখনো ভেবে ছাখো ফিরিয়ে নেবে কিনা।

একটা স্তম্ভ হেলান দিয়ে পতন থেকে আত্মরক্ষা ক'রে রুমালী বলল, আমার এজাহার সত্য।

মিথ্যা প্রমাণ হ'লে কি দণ্ড জানো?

আর যদি সত্য প্রমাণ হয়?

সত্য ব'লে প্রমাণ ক'রে দিতে পারো?

না পারলে কি দীনদুনিয়ার মালিক খোদ বাদশার কাছে মিথ্যা কথা বলতে এসেছি।

তবে বলো কোথায় আছে আসামী ?

বিচারের সময়ে বলবো।

এই তো বিচার সভা।

কেমন ক'রে বুঝবো শাহ্‌জাদা। আগে উজীর সাহেবকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে দেখি। আমি তো সাক্ষী বই নই।

বাদশা ঝামেলা এড়াতে চান, ব'লে উঠলেন, বিবির কথা ঠিক। সিপাহ্‌সালার, তুমি বিচার ক'রে মামলা মিটিয়ে দাও।

তারপরে আসানুল্লার দিকে তাকিয়ে বললেন, আশা করি ব্যাপারটা সত্য নয়।

আবার রুমালীর দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও বিবি এদের সঙ্গে যাও, ঘটনা সত্য হ'লে তোমার ভয় নেই।

তারপরে ধীরে ধীরে ফিরে চললেন বাদশা।

বাদশাকে সেলাম ক'রে বখৎ খাঁ বলল, শাহ্‌জাদা, এদের নিয়ে যাই ?

তা ছাড়া আর কি উপায় ?

চলুন হাকিম সাহেব আমার গরীবখানায়।

বখৎ খাঁ ও আসানুল্লা নিজ নিজ তাঞ্জামে চাপলো।

দুইজন পাইক এসে রুমালীকে বলল, চলো বিবি।

রুমালী দেখল আসামী চলল তাঞ্জামে, আর ফরিয়াদী হয়ে সে চলল কিনা প্রহরাধীন। উজীর প্রবল, সে দুর্বল,। দুর্বল সর্বদাই আসামী।

পণ্টন পিছনে পিছনে চলল, গাল সুড় সুড় করছে অনুভব ক'রে হাত দিয়ে দেখলো জল। পণ্টনের চোখে জল! তার আর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না, ভাবে, দুনিয়ায় এখনো অনেক কিছু জানতে বাকি।

॥ ১৪ ॥

"রমণীরে কে বা জানে
মন তার কোনখানে।"

কাবুল দরবাজা ও শাহী বুরুজের মাঝামাঝি জায়গায় প্রাচীরের গায়ে, যমুনা-খালের উত্তরে সিপাহ্‌সালার বখৎ খাঁর ছাউনি। ছাউনি বলতে তাঁবু বা অস্থায়ী কিছু নয়, পাকা ইমারত, তবে সিপাহ্‌সালারের বাস ব'লেই ছাউনি। ছাউনি, মঞ্জিল, দরবার, এজলাস, হেড কোয়ার্টার—যা বলো এই জায়গাটিই

কোম্পানীর ছাউনির সব চেয়ে নিকটে, এখানেই সবচেয়ে বেশী আক্রমণ চলেছে। শাহীবুরুজ কোম্পানীর কামানের পাল্লার মধ্যে, যদিচ গোলা এখানে ভিতরে এসে পড়ে না। তবে বখৎ খাঁ সকলকে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছে, খুব যেন নিশ্চিন্ত না থাকে তারা, ভারী কামান এসে পৌছলে গোলা ভিতরে এসে পড়তে পারে।

প্রকাশ্য এজলাসে বিচার আরম্ভ হয়েছে, নামে উজীরের বিচার, কার্যত রুমালীর। রুমালী ফরিয়াদী ও সাক্ষী, সে সম্মুখে দণ্ডায়মান, আর পাশাপাশি দু'খানা মস্ত কুর্শিতে উপবিষ্ট বখৎ খাঁ ও হাকিম আসাদুল্লা খাঁ। রুমালীর তরুণ বয়স ও রূপলাবণ্যে দর্শকদের অনেকে প্রথমে সমবেদনাশীল হয়ে উঠেছিল, তার নীরব একগুঁয়েমিতে এতক্ষণে সবাই বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

আ ম'ল যা, ছুঁড়ি যে মুখে কুলুপ দিয়েছে।

দাগী আসামী।

দাগী খানকী।

সকালবেলার তামাশাটাই মাটি করলে

মর মাগী, দুটো কথা বল্! শুনি কাক ডাকে কি কোকিল ডাকে।

অত অনুযোগ যার সম্বন্ধে, সে পাষাণ-মূর্তিবৎ নীরব নিস্তব্ধ। পাষাণী ব'লেই মানুষের এত আকর্ষণ তার প্রতি।

জেরার মুখে একটিমাত্র সে কথা বলেছিল, বলেছিল, আমি যা বলেছি বলেছি, অতিরিক্ত একটি কথাও বলতে পারবো না। ফাঁসি দিতে হয়, শূলে দিতে হয় যা ইচ্ছে হয় করুন।

তখনি একবার চোখে প'ড়ে গেল পণ্টনকে, তার উদ্দেশ্যে বলল, তুই এখানে কি করছিস, যা বাড়ী পালা।

পণ্টন স'রে গিয়ে আড়ালে দাঁড়ালো।

বখৎ খাঁ প্রশ্ন করছে, তুমি যখন জেরার জবাব দিতে রাজী নও তখন ধরে নিচ্ছি তুমি জেনেশুনে মিথ্যা এজাহার দিয়েছিলে উজীর সাহেবের বিরুদ্ধে।

রুমালী নীরব।

হাঁ কি না বলো।

রুমালী কথা বলে না।

পলাতক আসামীকে আগে চিনতে?

উদাসীন ভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে রুমালী।

আসাদুল্লা অবাক হয়ে দেখে মেয়েটিকে, আগে কখনো তাকে দেখে নি।

দেখে আর ভাবে, এ মেয়ে হীরের কুচি, যেমনি শক্ত, তেমনি সুন্দর, তেমনি দুর্লভ।

পণ্টন ভাবে, দিদি বড়ই একগুঁয়ে। নামটা ব'লে ফেললেই চুকে যায়, দু'জনে বাড়ি ফিরে যাই। সে কেমন ক'রে জানবে যে আসামী জীবনলাল, আর জানলেও নিশ্চয় বিশ্বাস করতো না—দিদি ধরিয়ে দেবে জীবনলালকে, তার ভাইকে!

রথৎ খাঁ বলে, জানো মিথ্যা এজাহারের সাজা কি? ঐ জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফাঁসিকাঠ।

রুমালী তাকিয়ে দেখবার কষ্টটুকুও স্বীকার করে না। মনে মনে ভাবে ফাঁসির দড়িই এখন তার বন্ধু, এ কষ্ট আর সহ্য হয় না। কেন সে মরতে গিয়েছিল সুখানন্দ পণ্ডিতের বাড়িতে! কেন সে মরতে কবুল করলো যে, আসামীকে দেখেছে লুকিয়ে থাকতে?

আসামীকে কিভাবে কথা বলাতে হয় জানি। সাঁড়াশি পুড়িয়ে মাংস টেনে ছিঁড়বার বাদশাহী নিয়ম নিশ্চয় জানো।

রুমালীর এ-কান দিয়ে ঢুকে ও-কান দিয়ে বেরিয়ে যায় কথাটা। তার মনে পড়ে অনেক অবাঞ্ছিত পুরুষের পরুষ আলিঙ্গন, সে-সব কি তপ্ত সাঁড়াশির চেয়ে আরামপ্রদ? সে ভাবে, হ'ত আসামী তুলসী, এতক্ষণে একশোবার তার নাম কবুল করতো। এ যে জীবনলাল, যার বাহুর মাংশপেশী কঠিন অথচ মুখখানি কোমল; দেহে যার দুর্জয় পৌরুষ অথচ মনে যার সুকুমার লাবণ্য; যার রক্তিম জিহ্বা আর আরক্ত অধরোষ্ঠের মধ্যে সাদা দাঁতগুলি কি সুন্দর! মনের সমস্ত স্মৃতিকে একাগ্র সচেতন ক'রে তুলে কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করে সেই অধরোষ্ঠ কি স্পর্শ করেছিল তুলসীর মুখ? না, না, না। তখনি মনের মধ্যে খচ ক'রে বেঁধে, তখন না হোক পরে করতে পারে, নিশ্চয়ই করেছে, অত কাছাকাছি এসে নিষ্ফল ফিরে যায় না। নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়। সে যখন ফাঁসি-কাঠের ছায়ায়, তখন কি না তারা—নাঃ, আর স্থির থাকতে পারে না, নামটা মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিল, এমন সময়ে চমকে ওঠে।

জানো আদালতের জেরায় যারা জবাব দিতে চায় না তাদের জন্যে আর কি ব্যবস্থা আছে? তাদের উল্টো গাধায় চড়িয়ে শহর থেকে বের ক'রে দিই, মেয়েছেলে হ'লে সেই সঙ্গে ক্ষুর দিয়ে মাথা ন্যাড়া ক'রে দেওয়া হয়।

রুমালীর নিস্তরঙ্গ মুখের উপর দিয়ে উদ্বেগের ছায়া উড়ে চলে যায়।

কিন্তু তখনি আবার তরল জলাশয় জমে কঠিন হয়ে ওঠে। ভাবে জোর ক'রে কথা আদায় করবে সে মেয়ে রুমালী নয়। নিজ ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে ভুলে যায় জীবন আর তুলসীর কথা। না, নিজে পরাজয় স্বীকার ক'রে ওদের উপরে বিজয়ী হ'তে চায় না সে।

নাঃ, আর অপেক্ষা করতে পারি না—তুমি কখন মেহেরবানী ক'রে মুখ খুলবে সেই ভরসায়। তোমার নীরবতাই তোমার দোষের প্রমাণ। যাই হোক, তোমার বয়স অল্প, তোমাকে একেবারে প্রাণে মারতে চাই না, মাথা ন্যাড়া ক'রে উল্টো গাধায় চড়িয়ে তোমাকে শহর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

রুমালীর মুখে একটি রেখাও তরঙ্গিত হয় না।

বখৎ খাঁ হাঁকে, ছন্নু মিঞা, যেমন বললাম তেমনি সাজা দেওয়ার ইন্তিজাম করো, দেখো যেন না পালায়।

বখৎ খাঁ ও আসানুল্লা খাঁ এজলাস ছেড়ে উঠে খাস কামরায় যায়, দু'জন সশস্ত্র প্রহরী এসে দাঁড়ায় রুমালীর দু'পাশে। ছন্নু মিঞা গাধা ও নাপিতের সন্ধানে বের হয়।

পল্টন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, রুমালীদিকে উদ্ধার করতেই হবে। একবার তার মনে হ'ল মহাবীর পল্টন নিয়ে এসে ছিনিয়ে নিয়ে যায় দিদিকে। কিন্তু তখনি মনে পড়ে প্রস্তাবের অসম্ভাব্যতা। এত বড় দিল্লি শহরে কে আছে তার সহায়, কার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে সে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় সুখানন্দ পণ্ডিতের নাম। রঈস আদমি, তা ছাড়া তার মেয়েকে রক্ষা করেছিল রুমালী, এখন রুমালীকে রক্ষার জন্যে তার কাছে কি সাহায্য পাওয়া যাবে না?

তখনি বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে হেঁটেই রওনা হয়েছিল, কিন্তু তখনি মনে পড়ে কাবুল দরবাজা থেকে ফুলকী-মণ্ডী অনেকটা পথ, এদিকে সময় নেই। একটা টাঙ্গার কাছে গিয়ে বলে, ফুলকী-মণ্ডী যাবে?

টাঙ্গাঅলা শুধোয়, যানা-আনা?

হাঁ, বলেই সে লাফিয়ে উঠে পড়ে। বলে, জোরে হাঁকাও।

দর[illegible]র করলো না বলে খটকা লাগে টাঙ্গাঅলার মনে, ভাড়া দেবে তো? বলল, [illegible]না-আনা এক রুপিয়া লাগে গা!

[illegible]র পক্ষ উত্তর দেয় না দেখে ব্যাখ্যা-স্বরূপ বলে, গেঁহু রুপিয়ামে দশ সের [illegible]উ রুপিয়ামে ঢাই সের! বাজার মে আগ লাগ গিয়া, বাপরে বাপ!

পল্টন ওসব কথায় কান না দিয়ে বলে, আউর থোড়া জোরসে চালাও,

ভাইয়া।

টঙ্গাঅলা ঘোড়ার পিঠে সপাসপ চাবুক কষিয়ে দিয়ে গুন গুন ক'রে গান ধরে, "খানা বেগর মরে লেড়কা জরু।"

টঙ্গাঅলার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে পণ্টন অনুরোধ করে, আউরভি থোড়া জোরসে, বড়ে মিঞা।

॥ ১৫ ॥

"Then learn that mortal man
must always look to his ending,
And none can be called happy
until that day when he carries
His happiness down to the
grave in peace."

King Oedipus-Sophocles.

অনেকদিন পরে সুখানন্দ পণ্ডিতের বাড়িতে আজ সুখের হাওয়া বইতে শুরু করেছে, এতদিন সবাই যেন ভারি লোহার মতো বিষাদের সলিলে নিমগ্ন হয়ে ছিল, আজ হাল্‌কা সোলার মতো ভেসে উঠে উল্লাসের তরঙ্গে আন্দোলিত হচ্ছে। সুখানন্দ, নয়নচাঁদ, তুলসী, ভূতি বুড়ী, এমন কি খোঁড়া কাহ্নাইয়া, সকলেরই মনটা খুশী। সকলের মধ্যে ভূতি বুড়ীর উল্লাসটাই সবচেয়ে প্রকট ও অনর্গল। অপরের উল্লাসবাক্য দাঁতের বাধা ডিঙিয়ে বের হয়ে আসতে কিছু সময় নেয়, কিছু পরিমাণে বিকৃত হয়, কিন্তু ভূতি বুড়ীর দাঁতের বালাই না থাকায় মনের ভাব সরাসরি রসনাপথে ছড়িয়ে পড়ে। ওদিকে কাহ্নাইয়া দিদির সাদিতে একখানা লুই দাবী ক'রে বসেছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, ভূতি বুড়ী আজ সে দাবীর সমর্থক, জীবনে এই প্রথম। সুখানন্দ সকলকে আনন্দমিশ্রিত আশ্বাস দিয়ে বলেছে, ভয় নেই, সকলকেই খুশী ক'রে দেব।

সুখানন্দর সবচেয়ে ভয় ছিল নয়নচাঁদকে, কোম্পানীর রোসালাদারের সঙ্গে তুলসীর বিয়েতে কি রাজী হবে? যে গোঁয়ার! কিন্তু ভোররাতে জাগিয়ে কুণ্ঠিত ভাবে যখন প্রস্তাবটা করলো, নয়ন এক কথায় রাজী হয়ে গেল। বললো, জীবনলালকে তো ভালো বলেই মনে হচ্ছে, তা রাজী হয় তো দিয়ে দাও না বিয়ে।

সুখানন্দ মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বলল, শুধু ভালো-মন্দ নয় রে, বাঙালী সবর্ণ, বিষয়সম্পত্তিও আছে, আর লখনৌ থাকবার সময়ে ওর বাপকে জানতাম। অবশ্য তখন তোরা কেউ হ'স নি, সে আমার বিয়ের আগে।

তবে তো কথাই নেই, প্রস্তাব করে ফেল।

তা তো করবো, আগে তোকে একবার জানানো দরকার।

আমার আপত্তি নেই।

সুখানন্দ বুঝতে পারে না এত সহজে নয়নচাঁদের সম্মত হওয়ার কারণ। কারণ আর কিছুই নয়, যে উপাদানে বিপ্লবী তৈরি হয় সে উপাদানে নয়নচাঁদ গঠিত নয়। সে বিপ্লবী নয়, গোঁয়ার। সাময়িক উত্তেজনায় ও সমধর্মী বন্ধুদের দৃষ্টান্তে সিপাহীপক্ষে জুটেছিল, তারপর সিপাহীদের অনেকের আচরণ, যুদ্ধ ও বিপ্লবের প্রকৃত মূর্তি দেখে তার মন সঙ্কুচিত হয়েছে, সর্বোপরি গত তিন মাসে তুলসীর যে দুর্দশা ঘটেছে তা উটের পিঠে শেষ বোঝার মতো কাজ করলো তার মনের উপরে। মনে মনে এখন সে সিপাহী-পক্ষ ত্যাগ করেছে, যদিচ কার্যত দলত্যাগ সম্ভব হয় নি, আর হবে বলেও মনে হয় না। দলে প্রবেশ যত সহজ দলত্যাগ তত সহজ নয়। কেবল একটি বিষয়ে তার বিদ্বেষ আগের মতোই প্রবল আছে। স্বরূপ সম্বন্ধে তার ধারণার পরিবর্তন ঘটে নি, হাতের কাছে পেলে গুলী ক'রে মারতে দ্বিধাবোধ করবে না। তার ধারণা স্বরূপ নিরুদ্দিষ্ট বা মৃত। সেটা তার মস্ত আক্ষেপ, আহা, নিজ হাতে মারবার সুযোগ ঘটলো না! স্বরূপ তার চোখে সিপাহীপক্ষের সংহত মূর্তি।

নয়নচাঁদ বলল, জীবনলাল রাজী হবে তো? আমরা যে আবার সিপাহী-পক্ষের লোক।

বাবা নয়ন, তুলসীকে শাহ্‌জাদার মুখ থেকে ছিনিয়ে আনতে যখন গিয়েছিল তখন কি জানতো না যে, সিপাহীপক্ষের মেয়ে। এ কাজে তার প্রাণ গেলেও যেতে পারতো। না, বাবা, জীবনের ভাবসাব দেখে মনে হয় আপত্তি করবে না। তবে তুলসীর কি মত জানি না।

নয়ন গর্জে ওঠে, তুলসীর আবার মত কি? সেই বাউণ্ডুলেটার হাত থেকে বেঁচে গিয়ে ওর মস্ত ফাঁড়া কেটে গিয়েছে। সহজে রাজী না হ'লে ওকে কিলিয়ে রাজী করাবো।

তবে জীবনকে প্রস্তাবটা ক'রে দেখি, বলে সুখানন্দ জীবনের সন্ধানে যায়।

প্রস্তাব শুনে জীবন এক কথায় রাজী হয়। বরং সত্য কথা বলতে কি,

একটিও কথা না বলে রাজী হয়। প্রস্তাবটা শুনেই সুখানন্দকে সে প্রণাম করল—সুখানন্দ বুঝলো জীবনের আপত্তি নেই।

সুখানন্দ এসে নয়নকে বলল, বাবা, জীবন তো রাজী, এখন তুলসীকে একবার বাজিয়ে ছাখো। যে গোঁয়ার মেয়ে।

নয়ন যখন তুলসীর ঘরে প্রবেশ করলো, দেখলো সে উপুড় হয়ে পড়ে বুকের মধ্যে বালিশ জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।

কিরে, কি হয়েছে তোর ?

তুলসী উত্তর দেয় না।

কেউ কিছু বলেছে ? কে কি বলেছে বল্।

নয়ন সত্যি ভালোবাসে তুলসীকে, তাঁকে কাঁদতে দেখে তার মন বিচলিত হ'ল, বলল, কি হয়েছে বোন বল্ ? কিসের দুঃখ তোর ?

হাওয়ায় কথাটা টের পেরেছে তুলসী, তাই সে কাঁদছে। মানুষের সুখেও কান্না, দুঃখেও কান্না। চোখের জলের রশি নামিয়ে মানুষ স্পর্শ করতে চেষ্টা করে সুখ-দুঃখের তলা।

কিছুতেই যখন রা করলো না তুলসী, তখন নয়ন বলল, বাবা একটা বিষয়ে তোর মত জানতে পাঠিয়েছিলেন, এখন যাই, পরে না হয় আবার আসবো।

তেমনি ভাবে মুখ গুঁজে পড়ে থেকেই তুলসী বলল, কিসের মত বলেই ফেলো না।

নয়ন দেখলো তখনো সে ফুলে ফুলে উঠছে কান্নায়। একবার মনে হ'ল বুঝি বা হাসিতে।

জীবনলালের সঙ্গে বাবা তোর বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন, জীবনলাল রাজী হয়েছে।

উগ্রভাবে তুলসী বলে উঠে, তবে আর কি, আমার মাথা কিনে নিয়েছেন !

অবাক হয়ে যায় নয়ন। তবে কি তুলসীর মত নেই ?

কিছুক্ষণ উভয় পক্ষের নীরবতার পরে নয়ন বলে, তবে বাবাকে গিয়ে সেই কথা বলি, তোর আপত্তি আছে।

প্রস্থানোদ্যত নয়নকে পুনরায় বিস্মিত ক'রে দিয়ে উঠে বসে তুলসী, কিছু উষ্মার সঙ্গেই বলে, আপত্তিও নেই, সম্মতিও নেই।

অবাক নয়ন বলে, আ ম'ল যা, তবে বাবাকে কি বলবো বল্।

যা বোঝো তাই।

হতবুদ্ধি নয়ন প্রস্থান করে। তুলসী আবার উপড় হয়ে পড়ে বালিশে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে, এবার আর কান্নায় নয়, হাসিতে। নারীর মন পুরুষে বোঝে না, নারী কি নিজেই বোঝে!

জীবন খুঁজে বেড়াচ্ছিল তুলসীকে, দেখা পেলে গতকালের চুম্বনটাকে আদায় ক'রে নেবে, সে ভাবে পিতৃভক্ত কন্যা নিশ্চয় আজ আর আপত্তি করবে না। কিন্তু কোথায় গেল সে? বাড়িটা বড়, লোকসংখ্যা কম, এমন সুযোগবহুল পরিস্থিতি সচরাচর জোটে না—অথচ মানুষটার দেখা নেই—হাওয়া হয়ে গেল নাকি? এই রকম সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে নিজের সেই শয়নগৃহটায় ঢুকতেই দেখতে পেলো তুলসী বিছানা গুছিয়ে রাখছে। সে পিছন ফিরে কাজ করছিল, দেখতে পেলো না জীবনকে, কিম্বা দেখতে পেয়েও হয়তো না দেখবার ভান করলো; ভাবটা এই যে, দেখাই যাক না কি করে লোকটা। জীবন ফৌজী আদমি, মন স্থির করতে বিলম্ব হয় না, পিছন থেকে তুলসীর চোখ টিপে ধরলো।

আঃ কাহ্নাইয়া, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়, আমার চোখ টিপে ধরেছো।

কেউ উত্তর দেয় না। কাহ্নাইয়ার আস্পর্ধা সত্যই কম নয়।

তুলসী হাত দিয়ে হাত দুখানা অনুভব ক'রে বলে, নাঃ, এ তো ভূতি বুড়ীর হাত নয়, বেশ চোয়াড়ে রকম দেখছি।

তবে কে এলো, বাইরের লোক নাকি?

এবারে চোখ ছেড়ে দিয়ে তুলসীকে ঘুরিয়ে নিয়ে মুখোমুখি দাঁড় করায় জীবন, বলে সত্যি বাইরের লোক, তবে এবাবে ভিতরে ঢুকবার অনুমতি পেয়েছি।

কার অনুমতি?

বাড়ির মালিক পণ্ডিতজীর।

তবে তাঁর বাড়িতে ঢোকো।

ঢুকেইছি তো।

তবে আর কি!

তা নয়, আরও কিছু অনুমতি পেয়েছি।

কৃত্রিম বিস্ময়ে শুধোয়, আবার কি অনুমতি মিলল? পণ্ডিতজীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ভাগও মিলেছে নাকি?

নেহাৎ মিথ্যা বলো নি। তবে স্থাবরের প্রতি আমার লোভ নেই, এই অস্থাবরটির মালিকানা লাভের অনুমতি মিলেছে—

এই বলে এক হাত দিয়ে তুলসীর কোমর জড়িয়ে ধরে আর এক হাত দিয়ে তার চিবুক তুলে ধরে।

আঃ কি করছ? কেউ দেখবে।

ও বুঝেছি, কেউ না দেখলে বুঝি আপত্তি নেই? তা ভয় নেই, এ গর্ভগৃহের সন্ধান বাদশার গোয়েন্দা রজব আলিও পাবে না।

না, না, ছাড়ো।

ততক্ষণে জীবনের বাহুবন্ধন দৃঢ়তর হয়েছে, তুলসীর হাত দুটো তুলে নিজের গলায় পেঁচিয়ে নিয়েছে আর তৃষ্ণা-মিশ্রিত সুধা বর্ষণ ক'রে জীবন নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে তুলসীর দিকে, ফাল্গুনের পূর্ণিমার চাঁদ যেমন তাকিয়ে থাকে সমুদ্রের উদ্বেলতরঙ্গ রহস্যময় মাধুর্যের প্রতি। কারো মুখে কথা নেই, রক্তে গতি নেই, জগৎ সম্বন্ধে সম্বিৎ নেই, শুধু এক জোড়া চোখ আর এক জোড়া চোখের দিকে তাকিয়ে সেই অলৌকিক দুরবীনের পথে যে দৃশ্যের আভাস দেখতে পাচ্ছে, সেখানে ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে বৈকুণ্ঠের সীমান্ত। কতক্ষণ এমন কাটলো জানে না, হঠাৎ সম্বিৎ লাভ ক'রে জীবন জিজ্ঞাসা করলো, তুলসী, একটা চুমো খাই, আপত্তি আছে?

এ ঠিক অনুমতি প্রার্থনা নয়, শব্দেন্দ্রিয় দিয়ে বস্তুটার স্বাদ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা।

দুই চোখের চাহনিতে সম্পূর্ণ সম্মতি জানিয়েও তুলসী মুখে বলল, অতি ধীরে, অতি মৃদুস্বরে যেন, ও বলা বলা নয়,—আপত্তি আছে।

এ ঠিক অসম্মতি নয়, বিজিত পূর্বসংস্কারে পরাজয়জ্ঞাপক অন্তিম নিশ্বাস।

ম্লান হয়ে ওঠে জীবনের চোখ। পূর্ণ চাঁদের উপরে এসে পড়ে স্বচ্ছ লঘু মেঘখণ্ড।

তুলসী ভাবে জীবন নিশ্চয় আপত্তিটাকে আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করবে না। সে ভাবে যে ফলটি পরিণত হয়ে খসে পড়বার জন্যে উদ্যত, তাকেও তো একটু টোকা দিতে হয়। জীবন নিশ্চয়ই সেটুকু দেবে।

তা দেয় না জীবন, বিষণ্ণ গভীরতায় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তুলসীর মুখের দিকে, যেন ওর রক্তের মধ্যে ঢুকে গিয়ে আপত্তির তল স্পর্শ করবার চেষ্টা করছে।

তুলসী ভাবে, কেন মুখে জিজ্ঞাসা করতে গেল? সর্বদেহ দিয়ে কি সম্মতি জানাই নি! তবে আবার মুখে কেন? মুখ কি আমার বশ? মুখে মনে যে নিত্য আড়াআড়ি। সে ভাবে, না, ঐ অতলস্পর্শ বিশ্বাসকে কিছুতেই বিচলিত হ'তে দেবে না, ভাবে সমস্ত সংস্কার দলিত ক'রে দিয়ে জীবনের তৃষ্ণা মিটিয়ে দিয়ে পরিপূর্ণ পরাজয় স্বীকার ক'রে নেবে। মন স্থির ক'রে ফেলে ওষ্ঠাধর

এগিয়ে দিতে উদ্যত, এমন সময়ে বাইরের ঘরে একটা সোরগোল উঠল।

বাহুবন্ধন ছেড়ে দিয়ে ওরা সোজা হয়ে দাঁড়ালো। না, গোল যেন বাড়ছে, তখন দ্রুতপায়ে দু'জনে চলে গেল বাইরের ঘরের দিকে। সেই অচরিতার্থ প্রথম চুম্বন নলের রাজহংসের মতো বৃথা পাখা ঝাপটে উড়তে লাগলো প্রণয়-সম্ভাষণে থমথমে সেই শূন্য গৃহের বিদ্যুৎবর্ষী আকাশে।

বাইরের ঘরে গিয়ে ওরা দেখতে পায়, দেখে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না, মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে পল্টন অঝোরে কাঁদছে।

পল্টনের চোখে জল, অবাক হয়ে যায় তুলসী ও জীবন, আর কি না তার এমন হতভম্ব অবস্থা। ব্যাপার কি?

এবারে ওদের দেখতে পেয়ে হাউমাউ ক'রে কেঁদে ওঠে পল্টন।

কি হয়েছে রে পল্টন, শুধোয় তুলসী।

রুমালী দিদিকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

কে?

বখৎ খাঁ।

কেন রে?

বিচার করবে বলে।

কি তার অপরাধ, শুধোয় জীবন।

ঠিক বুঝতে পারলাম না, দিদি নাকি কোন্ আসামীকে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে দেখেছে তাই।

আসামী কে? শুধোয় তুলসী।

দিদি তার নাম বলল না।

কোথায় লুকিয়ে আছে?

তাও বলল না দিদি।

কি সাজা হ'ল রে?

এখানো হয় নি, তবে খুন হবে কি কয়েদ হবে কে জানে।

আর কেউ কিছু বুঝতে পারলো কিনা জানি না তবে মুহূর্ত-মধ্যে সমস্ত ঘটনা পরিষ্কার হয়ে যায় জীবনের কাছে। যেমন ভাবেই হোক রুমালী জানতে পেরেছে জীবনের লুকিয়ে থাকার স্থান। যে-কারণেই হোক রুমালী ঘটনাটা বলেছিল, শেষ পর্যন্ত নামধাম প্রকাশ করতে রাজী হয় নি।

সুখানন্দ বলে, তা আমরা কি করবো? এসব দেখছি রাজা-বাদশার ব্যাপার।

পল্টন অসহায় আর্তভাবে বলে ওঠে, তবে আমি কার কাছে যাবো? আর কাউকে তো চিনি নে। ওরা যে দিদিকে মেরে ফেলবে।

ওকি, তুমি কোথায় চললে?—শুধোয় সুখানন্দ।

বখৎ খাঁর এজলাসে।

সে কি? তুমিও যে একজন ফেরারী আসামী, তার উপর কোম্পানীর লোক।

তা হোক।

গুরুতর বিপদ আছে যে।

আমাকে যেতেই হবে, চল্ পল্টন, বলে আর দ্বিধামাত্র না ক'রে বাইরে গিয়ে টঙ্গায় চেপে বলে ওঠে, জোরে হাঁকাও।

সুখানন্দ, নয়নচাঁদ ও তুলসী তিনটি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপরে সংজ্ঞালাভ ক'রে তুলসী বলে, দাদা, আমিও যাবো।

নয়ন বলে, চল্ আমিও যাচ্ছি।

তুলসী বলে, একটু দাঁড়াও।

সে ভিতরে গিয়ে ফিরে এসে বলে, চলো দাদা।

নয়ন বলে, বাবা, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমরা সকলেই শীগ্‌গির ফিরে আসছি।

এই বলে তারা বেরিয়ে আর একখানা টঙ্গা নিয়ে কাবুল দরবাজার দিকে ছোটে। আর শূন্য গৃহে বসে নিঃসঙ্গ সুখানন্দ জপ করতে থাকে।

॥ ১৬ ॥

"Boot, saddle, to horse and away!
Rescue 'my castle' before the hot day
Brightens to blue from its silvery grey,
(chorus) Boot, saddle, to horse and away.

—Dramatic lyrics (Browning)

জীবন ও পল্টন গিয়ে যখন উপস্থিত হ'ল তখন রুমালীর দণ্ডবিধানের উদ্যোগপর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। নাপিত ক্ষুর শানাচ্ছে, মাথা মুড়িয়ে দেবে; জনকতক সিপাহী পাশে দণ্ডায়মান, আসামী বাধা দিলে বলপ্রয়োগে শায়েস্তা করবে; আর তামাশা দেখবার আশায় ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গিয়েছে। বখৎ

খাঁ ও আসাদুল্লা আগের মতোই উপবিষ্ট, দু'জনেরই মুখ অপ্রসন্ন। আর তাদের সম্মুখে রুমালী পাষাণ-মূর্তির মতো নিশ্চল, তার চোখের দিকে তাকালে মনে হয় সে যেন এ জগতের লোক নয়। সমস্তা ঘরটা থম্‌থমে নিস্তব্ধ।

এমন সময়ে দু'জনে ঝড়ের ঝাপ্‌টার মতো প্রবেশ করলো, পল্টন ইশারায় দেখিয়ে দিল বখৎ খাঁকে। জীবন স্যালুট ক'রে দাঁড়িয়ে বলল, জেনারেল, আপনি যে আসামীর খোঁজ করছেন আমিই সেই আসামী, কোম্পানীর রেসালাদার মেজর জীবনলাল।

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হয়ে সকলকে চমকে দিল। বখৎ খাঁ ও আসাদুল্লা চমকে উঠল। লোকটা বলে কি! পাগল নাকি! এর পরিণাম যে মৃত্যু তা কি জানে না!

পল্টনের চমক আর ভাঙতে চায় না। এ আবার কি, জীবনভাই আসামী আর রুমালীদি তাকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল! আর যদি তা-ই হয়, সব জেনে শুনে জীবনলাল এসে দাঁড়ালো কি না মৃত্যুর মুখোমুখি!

রুমালীর চমক লাগে, জীবনলাল খবর পেলো কি ক'রে? আর এমন-ভাবে ধরা দিতে এলোই বা কেন? সে তো ভালোবাসে তুলসীকে, স্বচক্ষে প্রমাণ পেয়েছে! তবে কেন রুমালীকে বাঁচাতে এলো, তবে কেন তুলসীকে ছেড়ে নিশ্চিত মৃত্যুকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে এলো! তবে কি সে সত্যি ভালবাসে রুমালীকে? তখন তার আবার বাঁচতে ইচ্ছা হ'ল।

না হুজুর, এ লোকটা যা বলছে সব ঝুটা। আমি যাকে লুকিয়ে থাকতে দেখেছিলাম সে এ ব্যক্তি নয়।

বখৎ খাঁ বোঝে, আসল লোক এসে হাজির হয়েছে। তবে কেন এভাবে এলো বুঝতে পারে না। আসাদুল্লা বোঝে, সম্মুখে তার আসামী, তবে রুমালীর সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ, কেনই বা ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল, কেনই বা শেষে অস্বীকার করলো আর কেনই বা জীবনলাল ধরা দিতে এলো কিছুই বুঝতে পারে না। ভাবে দূর ছাই, জোয়ান বয়সটাই যত নষ্টের মূল, মানুষ যদি শৈশব থেকে একলাফে বার্ধক্যে এসে পৌঁছতো তবে দুনিয়া অনেক ঝামেলা থেকে রক্ষা পেয়ে যেতো।

বখৎ খাঁ বলে, রেসালাদার, আমার সন্দেহ নেই যে তুমিই আসামী। এর দণ্ড কি জানো?

জীবনলাল নির্ভয়ে বলে, মৃত্যু।

তোমাকে বেকসুর খালাস দিতে পারি, যদি আমার প্রশ্নের সদুত্তর পাই।

বলবার মতো হ'লে অবশ্যই বলবো।

কোম্পানীর ছাউনিতে রেসালা গোলন্দাজ, সিপাহী সব মিলে কত ফৌজ?

এ যে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন।

মৃত্যুর চেয়ে আর কি কঠিন হ'তে পারে?

নিমকহারামী।

নিমক তো বাদশাহের, কোম্পানী তো লুটের।

যদি বা তা-ই হয়—তবু আমি লুটেরার নিমক খেয়েছি, তার ইজ্জত আমাকে রাখতেই হবে।

তার মানে বাঁচতে চাও না?

বে-ইমানী ক'রে নিশ্চয়ই চাই না।

ছাখো এখনো সময় আছে।

মত বদলের সময় আর নেই।

বখৎ খাঁ বোঝে খাঁটি সোনা, ভাবে, এমন খাঁটি সোনা যদি তার পক্ষে আসতো!

তবে তাই হোক।

তখন সে হুকুম দেয় এই বিবিকে ছেড়ে দাও।

বন্ধনমুক্ত রুমালী কেঁদে ওঠে, এতক্ষণে এই প্রথম কাঁদলো।—হুজুর, আমি ছাড়া চাই নে, আমি মরতে চাই।

এই বলে ছুটে এসে পড়ে বখৎ খাঁর পায়ের কাছে, মাথা কুটতে থাকে, হুজুর আসামীকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে প্রাণদণ্ড দিন। আর তা যদি না হয়, তবে আসামীর সঙ্গে আমাকেও মরতে দিন, খোদা আপনার ভালো করবেন, হুজুর।

কেন তুমি মরতে চাও আসামীর সঙ্গে, সে কি তোমার দোস্ত?

না, হুজুর না, আসামী আমার দুশমন, দুশমন, সবচেয়ে বড় দুশমন।

বখৎ খাঁ যেন কিছু বুঝতে পারে, তার মনে পড়ে অনেক কাল আগেকার কথা, তখন তার বয়স এদের মতোই। ফতেমার চেয়ে কেউ তাকে বেশি ভালোবাসত না, আগেও নয়, পরেও নয়। সেই ফতেমা রেগে গেলে বলতো, দুশমন, দুশমন, তুমি আমার দুশমন। কোথায় গেল সেই ফতেমা, কার ঘরে বিয়ে হয়ে! কোথায় গেল সেই সব দিন!

না বিবি, তা হ'তে পারে না।

অশ্রুবিগলিত মুখমণ্ডল উচুঁ ক'রে শুধোয়, কেন পারে না খোদাবন্দ! কি

অন্তরায় ?

আইন।

আইন তো মানুষে গড়েছে আর আল্লায় গড়েছে—

কি গড়েছে বিবি ?

দিল।

বখৎ খাঁ সস্নেহে শুধোয়, তুমি কি আসামীকে ভালোবাসো বিবি ?

দিলে কি শুধু ভালোবাসাই আছে ? দিলে কি রাগ নেই, হিংসা নেই, ঈর্ষা নেই, দিলে কি জিঘাংসা নেই ?

বখৎ খাঁ তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, গভীর আসক্তি ও প্রচণ্ড হিংসায় মাখামাখি, বোঝে এ নারী বিকারগ্রস্ত। তাকে সরিয়ে নিতে হুকুম করে। কয়েকজন প্রহরী এসে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

এবারে জীবনের দিকে তাকিয়ে বখৎ খাঁ বলে, রেসালাদার, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

জীবন শান্তভাবে বলে, সিপাহী কখন অপ্রস্তুত ? তারপরে বলে, দয়া ক'রে হুকুম দিন আমাকে যেন গুলী ক'রে মারা হয়।

তা সম্ভব নয়।

কেন, জেনারেল, আমি তো সিপাহী।

তুমি গোয়েন্দা হয়ে এসেছ, তাই তোমাকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

তার মানে গাছের ডালে, একেবারে বিনা খরচে !

সেটাই এখন রীতি দাঁড়িয়েছে, সত্যিই খরচ অনেক কম, কিন্তু শহরের মধ্যে মজবুত গাছের অভাব, তাই ফাঁসিকাঠেরও বন্দোবস্ত আছে, বিশেষ এ কিনা হিন্দুস্থানের রাজধানী, গাছের ডালে ঝোলাতে আদব-কায়দায় বাধে।

কথাটা মিথ্যা নয়, জেনারেল, তবে যে মরছে তার পক্ষে দুটোই প্রায় সমান।

বখৎ খাঁ শুধোয়, কিন্তু যে মারছে ?

তার প্রেস্টিজের কথাটা অবশ্যই ভাবতে হয়।

এই বলে হাসে জীবনলাল, এ সেই অকারণ হাসি দেখে মুগ্ধ হ'ত স্যার হেনরী লরেন্স, ভবিষ্যদ্বাণী করতো—'দিস্ স্মাইল উইল টেক ইউ ফার !' জীবনলাল ভাবে স্যার হেনরি ন্যূনোক্তি করেছিল—এই হাসি তাকে 'ফারদেস্ট' নিয়ে এসেছে, একেবারে ফাঁসিকাঠের গোড়া পর্যন্ত।

বখৎ খাঁর ইঙ্গিতে প্রহরীরা জীবনলালকে ফাঁসিকাঠের নিচে নিয়ে যায়।

কাবুল দরবাজার বাঁ দিকে সুউচ্চ ফাঁসিকাঠ, প্রায় প্রাচীরের মাথা পর্যন্ত উঠেছে—সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়।

আসামুল্লার দিকে তাকিয়ে বখৎ খাঁ বলে, চলুন হাকিম সাহেব, এবার যাওয়া যাক। দুজনে চলে যায় বখৎ খাঁর কুঠির দিকে। পাহারায় রইলো দুজন ঘোড়সওয়ার, কয়েকজন সিপাহী আর যথাসময়ে এসে উপস্থিত হ'ল জল্লাদ। তা ছাড়া অনেকদিন পরে ফাঁসি হবে শুনে জুটে গেল একটি কৌতূহলী জনতা।

এ পর্যন্ত জীবনলাল পল্টন বা রুমালীর সঙ্গে কথা বলে নি, তার ইচ্ছা নয় যে, ওদের সঙ্গে পরিচয়টা প্রকাশ পায়। ফাঁসির হুকুম শুনে পল্টন যে হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে শুরু করেছিল তার আর বিরাম নেই। রুমালী কান্নাকাটির পালা শেষ ক'রে দিয়ে আবার পাষাণ-প্রতিমায় পরিণত হয়েছে।

জল্লাদ যখন জীবনকে নিয়ে ফাঁসির কাঠগড়ায় উঠছে তখন তুলসী ও নয়নের টঙ্গা পৌঁছল সেখানে। তারা দেখতে পেলো যে জল্লাদের সঙ্গে জীবন উপরে উঠছে, তার প্রশস্ত মুখমণ্ডলে ভয়ের একটি রেখাও প্রকটিত হয় নি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় তুলসী ও নয়ন হঠাৎ স্থাণু হয়ে গেল। অল্প কারণেই লোকে বিচলিত হয়, বেশী কারণ ঘটলে বিচলিত হওয়ার শক্তিও লোপ পায়। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র চঞ্চল, সূর্যোদয়ে ভুলে যায় চঞ্চল হ'তে।

তুলসী ও নয়ন দেখতে পায়—জল্লাদ পিঠমোড়া ক'রে বাঁধে জীবনের হাত আর তার পরে ফাঁসির দড়ি তার গলায় পরাতে উদ্যত। এমন সময় এক কাণ্ড ঘটে।

হঠাৎ বাইরে কড়-কড় রবে ডেকে ওঠে কামান আর সঙ্গে সঙ্গে একটা মাঝারি আকারের গোলা এসে পড়ে ভিড়ের মধ্যে। এক মুহূর্তে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। পরমুহূর্তে আর একটা গোলা প্রাচীরের মাথা ঘেঁষে এসে জল্লাদের মাথা উড়িয়ে দেয়, আসামীর গলায় দড়ি পরাবার উদ্দেশ্যে উত্থিত হাত দুটো হঠাৎ ঝুলে পড়ে, ছিন্ন স্কন্ধ থেকে উৎসারিত রক্তের ফোয়ারা রাঙিয়ে দেয় জীবনের সর্বাঙ্গ। তার পরের মুহূর্তেই আর একটা গোলায় ঘোড়সওয়ারদের একজনকে নিহত করে। আর একজন আগেই পালিয়েছিল। এই সব ঘটনার বর্ণনায় কাগজের উপরে কালি শুকোতে যতটুকু সময় লাগে তার চেয়েও অল্প সময়ে কাণ্ডটি ঘটে গেল। কেউ বুঝতে পারে না কেমন ক'রে কি ঘটে গেল, বুঝতে পারবার কথাও নয়। ইতিপূর্বে কোম্পানীর কামানের গোলা শহরের মধ্যে পড়ে নি, এখন যে পড়লো তার কারণ জন

নিকলসনের সঙ্গে ভারী পাল্লার কামান এসে পৌঁচেছে পাঞ্জাব থেকে।

তখন জনতাশূন্য বধ্যভূমিতে উপস্থিত নয়ন, তুলসী, পল্টন আর রুমালী, আর ফাঁসিকাঠের উপরে জীবন। জীবন আগেই দেখতে পেয়েছিল নয়ন ও তুলসীকে। এখন নয়নকে ডেকে বলল, একটা ছুরি দিয়ে হাতের বাঁধন কেটে দিতে পারো?

ছুরি কোথায়—ভাবে নয়ন। তুলসী আঁচল সরিয়ে বের ক'রে দেয় একখানা ছোরা। শেষ মুহূর্তে বাড়ির মধ্যে গিয়ে নিয়ে এসেছিল, প্রয়োজন হ'তে পারে ভেবে, প্রয়োজন তো সত্যই হ'ল।

নয়ন চট্ ক'রে ফাঁসিকাঠের উপরে উঠে হাতের দড়ি কেটে দিতেই দুজনে নেমে আসে।

নয়ন বলে, এখন কি করবে?

জীবন বলে, আমার উপায় আমি দেখছি, তোমরা এখনি সরে পড়ো।

আর তুমি?

জীবন এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখে সেই নিহত ঘোড়সওয়ারের ঘোড়াটা তখনো মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াটাকে ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে বলে, আমি ছাউনিতে ফিরে চললাম।

সিপাহী ফৌজের মধ্যে দিয়ে?

লড়াই বেধে উঠেছে, এখন কে সিপাহী, কে কোম্পানী—খোঁজ রাখছে কে?

কবে আবার আসবে?

ঘোড়ায় উঠতে উঠতে জীবন উত্তর দেয়—শীগ্গিরই আসবো, তবে কবে—তারিখ ঠিক ক'রে বলতে পারি নে।

এই বলে পা দিয়ে ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিতেই ঘোড়া ছুটতে শুরু করে।

তোমরা সাবধানে থেকো—বলে ডান হাত তুলে বিদায়-ইঙ্গিত ক'রে ছুটে চলে যায় কাবুল দরবাজার দিকে।

ওরা দেখতে পায়, দু-এক লহমার মধ্যেই আরও অনেক ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে মিশে জীবন বেরিয়ে চলে যায় শহর থেকে।

রুমালী ও তুলসী নিশ্বাস রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ কারো দিকে ফিরে তাকায় না।

এতক্ষণ পরে পল্টনের মুখে হাসির রেখা।

নয়ন বলে, চল্ তুলসী, আর এখানে থাকা কিছু নয়।

বাইরে তখন দুই পক্ষের কামান ঘোর গর্জনে আগুন ওগরাচ্ছে।

দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

তৃতীয় খণ্ড

॥ ১ ॥

জীবনের প্রত্যাবর্তন

কাবুল দরবাজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে জীবনলাল দেখলো যুদ্ধের কোন আয়োজন বা লক্ষণ নেই—অথচ শহরের মধ্যে, কাবুল দরবাজার কাছে খুব হুড়োহুড়ি লক্ষ্য করেছিল, সকলেরই পালাও, পালাও ভাব। সে বিস্মিত হয়ে গেল। ভাবলো, ভালই হ'ল, এই সুযোগে ছাউনিতে ফিরে যাওয়া যাক। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। ঘোড়ায় থাকলে শত্রু মিত্র সকলেরই চোখে পড়বার আশঙ্কা, নোম্যান্‌স্‌ল্যাণ্ডের সিপাহী উভয় পক্ষেরই অস্ত্রের লক্ষ্য। ঘোড়া থেকে নেমে খানিকটা চলে ইদগার কাছে এসে পৌছল। ইদগার ঠিক পশ্চিমেই মেজর রীডের সৈন্যবাহিনী। সেখানে পৌছে সে নিশ্চিন্ত হ'ল। তারপরে পাহাড়ে উঠে সোজা উত্তর মুখে রওনা হ'ল এবং কিছুক্ষণ পরেই হিন্দুরাও কুঠিতে এসে পৌছল।

জীবনভাই যে! আমরা তো চিন্তায় পড়েছিলাম, আর তোমার আশা এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলাম।

গুরবচনের উদ্দেশে জীবন বলে, ফিরে আসাতে আবার বুঝি দুশ্চিন্তা আরম্ভ হ'ল।

হোঃ হোঃ শব্দে হেসে ওঠে গুরবচন সিং।

তোমার হাতে ও কাগজখানা কিসের?

তোমার মৃত্যু-সংবাদের চিঠি।

মৃত্যু-সংবাদ পেলে কোথায়?

ওটুকু জেনারেল ব্রিজম্যানের অনুমান। আর এছাড়া কী অনুমানই বা সম্ভব? শত্রুপুরীতে নিরস্ত্র একাকী গিয়েছো, তিন দিন তিন রাতের মধ্যে পাত্তা নেই। মৃত্যু হয়েছে বলেই ধরে নিতে হবে।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?

জেনারেল আর্চডেল উইলসনের হেডকোয়ার্টারে।

তার চেয়ে বরঞ্চ এখন মৃত মানুষটিকে ব্রিজম্যানের কাছে নিয়ে চলো।

নিশ্চয়।

তিন দিন তিন রাত শুনে চমকে উঠেছিল জীবনলাল। তাই তো বটে, মাত্র তিন দিন তিন রাত! কিন্তু এই সামান্য সময়ের মধ্যে যে একটা লম্বা অভিজ্ঞতা ঘটে গিয়েছে, আর তা চমকপ্রদ ঘটনাপুঞ্জে ঠেসে ভর্তি করা। মীর্জা আবুবকরের কুঠি থেকে তুলসীকে উদ্ধার, তাকে পৌঁছে দেওয়া সুখানন্দ পণ্ডিতের কুঠিতে, তুলসীর কাছে প্রণয় প্রকাশ, বিবাহ-প্রস্তাব স্বীকার, রুমালীকে উদ্ধার করতে গিয়ে ফাঁসি-কাষ্ঠে আরোহণ আর সর্বশেষে অপ্রত্যাশিত উপায়ে মুক্তি ও পলায়ন। আরব্যোপন্যাসের সেই জেলের কলসীর মধ্যে অতিকায় দৈত্যের কাহিনী তার মনে পড়ে যায়।

হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা ক'রে বসে, তাই গুরবচন, আজ কোম্পানীর কামানের গোলা শহরের মধ্যে গিয়ে পড়লো কিভাবে? এর আগে তো পড়ে নি। ব্যাপার কি?

পড়েছে নাকি? খুব সুসংবাদ। জেনারেল নিকলসনের সঙ্গে যে ভারি কামান এসেছে তাতেই Traget Practice চলছিল। চলো এ সংবাদটাও ব্রিজম্যানকে দিতে হবে, খুব খুশী হবেন।

ব্রিজম্যানকে আনুপূর্বিক বিবরণ জানিয়ে তারা ফিরতে উদ্যত, এমন সময়ে ব্রিজম্যান বলল, গীবন, এখন বিশ্রাম করোগে, তোমার উপর দিয়ে অনেক ঝামেলা গিয়েছে। তবে সন্ধ্যাবেলায় তোমরা অবশ্য অবশ্য একবার আসবে, স্বরূপকেও সঙ্গে আনবে, একটা বিষয়ে জরুরী পরামর্শ আবশ্যক। জোন্স, রীড, ক্রসম্যান সকলেই থাকবে, এ থেকেই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারছ। আচ্ছা এখন যাও।

কুঠিতে এসে পৌঁছতেই ক্যালিবান ছুটে এসে জীবনের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে গড়াতে থাকে।

জীবন তার গায়ে হাত বুলিয়ে, চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে দিয়ে বলে, ওঠ্, ওঠ্, খুব হয়েছে, এখন ওঠ্।

ক্যালিবান আনন্দের আতিশয্যে গড়াতেই থাকে।

গুরবচন, ক্যালিবান এ ক'দিন খেয়েছিল তো?

প্রথম দিনটা কিছুই খায় নি, তারপরে কাঁচা মাংস মুখের কাছে ধরলে অল্প অল্প খেতো।

দিতো কে?

তোমাকে ছাড়া ও চেনে আমাকে আর স্বরূপজীকে, আর কারো সাধ্য নেই

ওর কাছে এগোয়।

সংবাদটা খচ্ ক'রে বেঁধে জীবনের মনে। ঐ জীবটার মনে এতদিন ছিল তার নিঃসপত্ন আসন, এখন দেখলো পাশে আরও দু'খানা ছোট আসন পড়েছে; ভালো লাগে না তার। একটা নরপশুর মন নিয়ে যদি এমন রেষারেষি চলে, তবে মানুষের মন নিয়ে না জানি কি কাণ্ড ঘটে। প্রেমের রথের চাকা ঈর্ষার ধাতুতে গঠিত।

স্বরূপ বুকে জড়িয়ে ধরে জীবনকে, বলে, ভাই জীবন, তোমার জন্য সত্যই আমি চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম, দিল্লি শহরের অবস্থা আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। শত্রু মিত্র কারো জানপ্রাণ এখানে নিরাপদ নয়, মুহুর্মুহু ভাগ্য পরিবর্তন ঘটছে এখানে মানুষের।

তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য, এই বিপদ ও ভাগ্য পরিবর্তনের আমি একজন ভুক্তভোগী। বিশ্রাম ক'রে উঠে তোমার সঙ্গে সব আলোচনা করবো—কিছু পরামর্শও আছে, সে পরামর্শ একমাত্র তোমার সঙ্গেই করা চলে।

সন্ধ্যাবেলা ব্রিজম্যানের তাঁবুতে যাওয়ার জন্য যখন স্বরূপের খোঁজ করলো, কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। তখন অগত্যা জীবন ও গুরবচন স্বরূপকে ছেড়েই রওনা হ'ল।

জীবন ভাবে সারাটা বিকাল আজ কাটিয়েছে স্বরূপের সঙ্গে, তারপরে বলা নেই কওয়া নেই কোথায় গেল হঠাৎ স্বরূপ—কূল-কিনারা পায় না ভেবে।

॥ ২ ॥

স্বরূপের সংকল্প

কুত্তীতলাও-এর স্নিগ্ধ অকম্পিত জলতলে টুপ টুপ ক'রে একটির পরে একটি উপলখণ্ড পড়ে। পাথরের ছোট্ট টুকরোটি পড়বামাত্র একটুখানি জল টোপ খেয়ে ওঠে, চাঁদের আলো তার চূড়া ঘিরে একটি কিরীট পরিয়ে দেয়, তারপরে সেই উথলে ওঠা জলতরঙ্গবলয় বিস্তার করে। সে রেখা মুছে যেতে না যেতেই আর একটি উপল এসে পড়ে, আবার আগের মতো জল টোপ খেয়ে উঠে, তরঙ্গ-বলয় বিস্তার হয়ে যায়। এমনি চলছে অনেকক্ষণ থেকে। ওপারের গাছ-পালার মাথা ঝাপ্সা শুভ্র, জলের কিনারে তাদের কালো কালো ছাপ। মাথার উপরে অনেক উঁচুতে পিউ-কাঁহা বারে বারে হেঁকে যাচ্ছে। আর কোথাও কিছু

শব্দ নেই, জনপ্রাণী নেই, কেবল ঐ জলে উপল পড়বার টুপটাপ আর অন্তরীক্ষে উত্তরহীন প্রশ্ন, পিউ-কাঁহা, পিউ-কাঁহা।

অবশেষে এক সময়ে উপল পড়া বন্ধ হয়, হাতের কাছে পাথরের টুকরো নেই।

প্রিয়জনের জন্য আত্মবিসর্জনেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা, প্রিয়জনের কল্যাণেই প্রেমের চরিতার্থতা, এমন কত কথাই না শুনেছে সে, যেমন সকলেই শুনেছে। কখনো উপদেষ্টার মুখে, কখনো বইয়ের পাতায়। কিন্তু কই, আজ যখন সে জানলো তুলসী মারা যায় নি, নানারকম নিগ্রহ পার হয়ে নিরাপদে বাড়ী ফিরে এসেছে—তখন যে পরিমাণ আনন্দ অনুভব করা উচিত ছিল তার, কই তা হ'ল! বরঞ্চ মনে হ'ল, সত্য গোপন ক'রে কি লাভ, মনের দেবতার কাছে তো কিছুই গুপ্ত থাকে না, বরঞ্চ মনে হ'ল তুলসী মারা গেলেই বুঝি সে সুখী হ'ত, অবশ্য খুশী হ'ত না নিশ্চয়ই। খুশি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়—তারপর কি ঘটল জানবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। সুখের মধ্যে পূর্ণতা আছে, মৃত্যুতে যেমন আছে পূর্ণতা। সমস্ত মৃত্যু-শোকের তলাতেই লুকিয়ে থাকে একটি সুখের অতি ক্ষুদ্র কণা।

জীবন যখন একে একে দিল্লির অভিজ্ঞতা বলতে শুরু করলো, প্রথমটা বুঝতে পারে নি স্বরূপ যে তুলসীকে কেন্দ্র ক'রেই এ অভিজ্ঞতা বিকশিত। তারপরে এক সময়ে নিদারুণতম আঘাতটি দিয়ে জীবন বলল, ভাই স্বরূপ, তুলসীকে আমি ভালোবাসি।

স্বরূপ কোন উত্তর দেয় না, কী উত্তর দেবে, প্রচণ্ড শক্তিতে কোনরকমে আত্ম-সংযম রক্ষা করে। হয়তো তার মুখের ভাবে কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছিল তবে তা লক্ষ্য করবার মতো মনের অবস্থা ছিল না জীবনের। সে তখন আপন খুশিতে ভরপুর। সে সুখী, কাজেই তার বিশ্বাস জগৎটাও সুখী। প্রেমিক বড় স্বার্থপর।

উল্লাসের সঙ্গে জীবন বলে যায়—এতদিন এসব কথা শুনবার লোক পায় নি—বলে, ভাই স্বরূপ, তুলসীও আমাকে ভালোবাসে, গোড়াতে ভেবেছিলাম বাসে না।

ভালোবাসার অভিজ্ঞতা শুধু অনুভব করায় যেন সুখের পূর্ণতা নয়—তাই বলতে চায়, শোনাতে চায়, অপরের মুখ থেকে ফিরে শুনতে চায়—উতোর চাপানে সুখ পূর্ণতর হয়ে ওঠে।

স্বরূপ যে উত্তর দিচ্ছে না, মসীঢালা মুখে শুনে যাচ্ছে, সেদিকে লক্ষ্য ছিল না জীবনের।

স্বরূপ ভাই, তুমি তো দিল্লিবালা আদমি! তুলসীর বাবা সুখানন্দ পণ্ডিত

কেমন লোক?

ভালো বলেই শুনেছি।

শুনবেই তো, শুনবেই তো, দিল্লিতে ক'জনই বা বাঙালী, জানাশোনা অবশ্যই থাকবে। আর তুলসীর ভাই নয়নচাঁদকে আমার খুব ভালো লাগে, যেমন অমায়িক স্বভাব তেমনি মিষ্ট কথাবার্তা।

একটু থেমে আবার বলে ওঠে, ওঃ, আসল কথাটাই বলতে ভুলে গিয়েছি। সুখানন্দ পণ্ডিত তুলসীর সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন।

তারপর?

অবশ্যই রাজী হয়েছি, যে-কেউ হবে, তুমি হ'লেও রাজী হতে, তুলসীর মতো মেয়ে কোটিকে গোটিক হয়। কি বলো?

তা বৈকি।

তারপরে বলে, তুলসী রাজী আছো তো?

লীলাচ্ছলে স্বরূপের গায়ে একটি ছোট ধাক্কা দিয়ে জীবন বলে, কি যে বলো? তুলসী রাজী না হলে পণ্ডিতজী প্রস্তাব করতে যাবেন কেন। আর তা ছাড়া, তুলসীর মনের যে পরিচয় পেয়েছি।

কথা শেষ করতে দেয় না স্বরূপ, বলে ওঠে, ক্যালিবানকে অনেকক্ষণ খেতে দেওয়া হয় নি।

দুজনে ক্যালিবানকে খেতে দিয়ে আবার এসে বসে।

আচ্ছা স্বরূপ ভাই, তুমি যখন পণ্ডিতজীকে জানো, তুলসীকে নিশ্চয় কখনো দেখেছ।

হাঁ, দেখেছি দু-একবার।

কেমন, সুন্দরী নয়?

মন্দ নয়।

মন্দ নয়! মাত্র ঐটুকু! ওরকম রূপ তো আমার কোথাও চোখে পড়ে নি। ভালো ক'রে দেখবার সুযোগ পাও নি বলেই মন্দ নয় বলতে পারলে।

তা অসম্ভব নয়।

যাই হোক এবারে সুযোগ পাবে, বিয়ের পরে আমাদের সঙ্গে তোমাকে কিছুদিন থাকতে হবে, তোমার ঘরবাড়িগুলো আবার মেরামত না হওয়া অবধি। আর সেই সঙ্গে গুরবচনও আসবে চন্দ্রিমাকে নিয়ে। বেশ থাকা যাবে কিছুদিন সকলে মিলে।

বিয়ের দিন স্থির হয়েছে নাকি?

লড়াইটা চুকে গেলেই হবে, বলেছেন পণ্ডিতজী।

একটু থেমে বলে, ছাখো ভাই, এখানে আমি কাউকে জানি নে, আমাকেও কেউ জানে না, আমার দিকের সব বন্দোবস্ত করবার ভার তোমার উপরে রইলো। দিল্লি শহর তোমার নখদর্পণে। ভেবো না, ফাঁকি পড়বে না। সুন্দর রাঁধে তুলসী, তোমাকে স্বহস্তে রেঁধে খাওয়াবে।

কেমন ক'রে জানলে সুন্দর রাঁধে, রেঁধে খাইয়েছে নাকি?

খাওয়ায় নি বটে, তবে অমন সুন্দর যার হাত তার রান্না কি সুন্দর না হয়ে যায়।

স্বরূপের মনে পড়ে গুরবচন-গৃহিণী চন্দ্রিমার কাবাবের গল্প।

আমি এখন উঠি, সন্ধ্যার পরেই যেতে হবে ব্রিজম্যান সাহেবের তাঁবুতে, তৈরি হয়ে নাও।

ঝড়ের বেগে বের হয়ে যায় জীবন।

অনেকক্ষণ পাথরের মতো বসে থাকে স্বরূপ। তারপরে উঠে পড়ে চলতে আরম্ভ করে। কখন যে কুস্তীতলাও-এ এসে পড়ে নিজেই বুঝতে পারে না। অনেকটা পথ।

স্বরূপরামের মনে পড়ে, একদিন মীর্জা গালিবের মুখে শুনেছিল যে, মানুষের জীবন চোখের জলের কুলপির মতো, অনেক পরিমাণে শর্করা আর মশলা মিশিয়ে তাকে মধুর ক'রে তোলা হয় সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রসনায় কটুস্বাদ রেখে যায়। সেদিন যাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার মনে হয়েছিল আজ তাই মনে হ'ল বাস্তবতম সত্যরূপে। স্বরূপের রসনা তার শ্রেষ্ঠ সাক্ষী, সেখানে আজ কটু স্বাদ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আর যদি বা কিছু থাকে তাকে স্বতন্ত্র ক'রে নেওয়ার উপায় নেই, কেননা সব স্বাদে আজ রামধনুকের রঙের মতো জড়াজড়ি। তুলসী বেঁচে আছে শুনে তার আনন্দ হয়েছিল নিঃসন্দেহ, কিন্তু যেমনি শুনলো যে স্বরূপের নামটিও উচ্চারণ করে না, ভাবলো এর চেয়ে মরাই তো ভালো ছিল। সিপাহীদের হাতে তুলসীর লাঞ্ছনা ঘটে নি শোনার আনন্দ সঙ্গে সঙ্গে চাপা পড়ে গেল জীবনের প্রতি সে প্রেমাসক্ত সংবাদে। স্বরূপ যার জন্যে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার চালচুলা ঘুচে গিয়েছে, সে কিনা উন্মুত অপর এক পুরুষকে বিয়ে করতে! মাথার মধ্যে রক্ত টগবগ ক'রে ফুটতে থাকে, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সুনির্দিষ্ট ক্রোধে নয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অব্যক্ত এক প্রকার ভাব সে অনুভব করতে থাকে, মানব ভাষায় যার নিকটতম নাম ক্রোধ। সেই নির্বিশেষ ক্রোধ কাউকে আহত করতে পারে না, না তুলসীকে, না জীবনকে, না সিপাহীপক্ষকে, না কাউকে।

অবশেষে ব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র ফিরে এসে অস্ত্রীকে আঘাত করে। স্বরূপের জীবনধারণের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাকে মরতে হবে।

এমন সময়ে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে যে বিস্তৃত কুস্তীতলাও-এর বারিতলে নিমজ্জমান চাঁদের ছায়া। চাঁদ ডুবছে, রাত গভীর। সে-ও কেন না অমনি তলিয়ে যায় জলতলে। কার কি ক্ষতি? ওই উপলখণ্ডগুলোর মতো একবার ক্ষণকালের জন্য টোপ উঠবে—তারপরেই ব্যস্‌, সমস্ত অবসিত। তুলসী জীবন সিপাহী কোম্পানী সমস্তই। মৃত্যু কঠিন কিন্তু জীবন যখন কঠিনতর হয়ে ওঠে তখন কঠিন সহজ হয়ে আসে। কারো কাছে যখন দায় নেই তখন চিঠি লিখিবার ভূমিকাও নিষ্প্রয়োজন। স্বরূপ উঠে পড়ে।

এতক্ষণ সে দীঘিটার পুব দিকে বসেছিল। সেদিকটা জলের সমতল, পশ্চিম দিকে উঁচু পাড়, সেই দিকে সে চলল।

খুব উঁচু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে যাবে তখন হঠাৎ তার মনে পড়লো এমন অসহায় ভাবে মরে কি লাভ? ক'দিন বাদেই শুরু হবে দিল্লি দখলের প্রচণ্ড যুদ্ধ, তখন আর মৃত্যুকে খুঁজে বেড়াতে হবে না, মৃত্যুই খুঁজে বেড়াবে শিকার। সামনে এমন সুযোগ থাকতে এখানে রাতের অন্ধকারে চোরের মতো কাপুরুষোচিত মৃত্যু কেন? আর দুটো দিন অপেক্ষা করলেই তো বীরের বরণীয় মৃত্যু লাভ করতে পারে।

এ তার বিচার, না প্রাণের প্রতি সূক্ষ্ম আসক্তি একমাত্র তিনিই বলতে পারেন, পৃথিবীকে নন্দনের ছাঁচে তৈরি ক'রে তার মধ্যে যিনি আস্ত একটা শয়তানকে অবাধ ছাড়পত্র দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন।

স্বরূপ উপবেশন করলো। তখন চাঁদ অস্ত গিয়েছে।

॥ ৩ ॥

পান্নার তাঁবুতে

পান্নাবিবি, এবার তোমার তাঁবুতে আমাদের জঙ্গী পরামর্শের দোসরা বৈঠক—বলতে বলতে ঢোকে কর্নেল ক্রসম্যান, পিছনে জীবনলাল।

পান্না উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ক'রে হেসে বলে, তবে আমি বুঝিবা চাঁদ-সুলতানা কিম্বা সুলতানা রিজিয়া?

তারপরে দেখিয়ে দেয় দু'খানা সুখাসন।

ক্রসম্যান বলে, আসছি কর্নেল ব্রিজম্যানের তাঁবু থেকে, সেখানে ঘণ্টাখানেক আলোচনা ক'রেও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারা গেল না, দিল্লি দখলের শেষ সংগ্রাম আরম্ভ হ'লে পান্না বিবিকে কোথায় রাখা যায়?

কর্নেল সাহেব, আমি তো আর সত্যিকার পান্না নই যে এত সতর্ক হ'তে হবে!

সত্যিকার পান্না হ'লে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন ছিল না।

তাই তো দেখছি, কোহিনূর হীরেখানার জন্যেও বুঝি এমন খবরদারির অবশ্যক হয় নি।

নিতান্ত মিথ্যা বলো নি।

কিন্তু কর্নেল সাহেব, লড়াই হোক না, একজন মেয়ে কি এতই বাধা?

তা নয় বিবি, আমার ধরণা কি জানো, তিনি হঠাৎ চাঁদ-বিবির মতো বীরত্ব প্রকাশ করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত লোকে স্থির করতে পারবে না, কে দিল্লি দখল করলো, জেনারেল আর্চডেল উইলসন, না পান্না বিবি।

তাই বলুন!—বলে হেসে ওঠে পান্না, সঙ্গে সাহেবও।

সাহেবে পান্নায় এই সহজ অন্তরঙ্গতা ভালো লাগে না জীবনের, করতলে মুখ রেখে মেঝেয় পাতা মসলন্দের নক্সার আঁকি-বুকির মধ্যে মনটা ঘোরাতে থাকে।

কর্নেল সাহেব. শুনেছি আরও একজন জেনানা আছে ছাউনিতে।

মিসেস ডেনিংস। বেবিকে নিয়ে সে রওনা হয়ে যাচ্ছে সিমলাতে। তুমি ইচ্ছে করলে যেতে পারো সেই সঙ্গে।

যাবো যদি তবে এখানে এলাম কেন?

আমিও তোমাকে দূরে পাঠাতে চাই নে, কাছাকাছি কোথাও রাখতে চাই। কিন্তু ছাউনিতে রাখা কিছুতেই চলবে না, জেনারেলের কড়া হুকুম।

তারপরে একটু চিন্তা ক'রে বলে, অবশ্য হাতের কাছে থাকলে শেষ পর্যন্ত জেনারেলও খুশী হবেন। তুমি ভুলে যাচ্ছ পান্না বিবি, বেরিলি থেকে তোমাকে সঙ্গে আনতে কেন রাজী হ'লাম। দিল্লি দখল হ'লে দেওয়ানী খাসে তোমার নাচ হবে। কেমন, বলেছিলাম না? সেই জন্যেই তোমাকে নিয়ে এসেছি, সেই জন্যেই তোমাকে কাছাকাছি রাখতে চাই, যাতে সময়মতো হাতের মাথায় পাওয়া যায়। বেরিলি বা সিমলে তোমাকে পাঠাতে আমিও চাই নে, কিন্তু মুশকিল এই যে,ছাউনিতে রাখা একেবারেই চলবে না।

এবারে জীবন কথা বলল। বলল, কর্নেল সাহেব যদি অনুমতি দেন তবে আমি একটা প্রস্তাব করতে পারি, তাতে পান্না বিবি দূরে গিয়ে না পড়ে বরঞ্চ দেওয়ানী খাসের কাছে এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করবে।

বলো দেখি তোমার কি প্ল্যান?

জেনারেল যদি অনুমতি দেন আর পান্না বিবি যদি আপত্তি না করে, তবে শাহ জাহানাবাদে এক দোস্তর বাড়িতে ওকে রেখে আসতে পারি।

তারপরে পান্নার দিকে তাকিয়ে বলে, সুখানন্দ পণ্ডিতের নাম আমার মুখে শুনেছ, তাঁরই বাড়ির কথা ভাবছি।

এর চেয়ে উৎকৃষ্ট প্ল্যান আর হ'তে পারে না গীবন, তবে অনেকগুলি বাধা।

কি কি শুনি।

তুমি শহরে ঢুকবে কি ক'রে?

আমি তো প্রায় যাতায়াত করছি।

এবারে সঙ্গে আওরৎ থাকবে।

তাতেই আরও প্রমাণ হবে আমাদের জঙ্গী মতলব নেই।

এবারে পান্না বলে, জীবনলালজী, সত্য বটে তুমি অনেকবার যাতায়াত করেছ শহরে, কিন্তু এখন কি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে নি?

কি পরিবর্তন?

কলকাত্তা দরবাজা দিয়ে তোমার ঢোকবার উপায় নেই, মীর্জা অবুবকরের লোক তোমার প্রতি খড়্গহস্ত, কাবুল দরবাজা আর লাহোর দরবাজায় বখৎ খাঁর লোক থানা দিচ্ছে, তাদের হাত থেকে সম্প্রতি পালিয়ে এসেছ। তোমাকে নিশ্চয় চিনে ফেলবে।

এসব আশঙ্কা আগে উদিত হয় নি জীবনের মনে। এখন ব্যাপারের অসম্ভবতা লক্ষ্য ক'রে চুপ ক'রে থাকে।

তবে এখন উপায়?—শুধোয় কর্নেল ক্রসম্যান।

একেবারে অসম্ভব নয়, বলে পান্না। জীবন ও ক্রসম্যান তার দিকে মুখ তুলে তাকায়।

জীবনলালজী যদি জঙ্গী পোশাক ছেড়ে ধুতি, মেরজাই আর নাগরা জুতো পরতে রাজী হয় তবে অনায়াসে দুজনে ভিতর চলে যেতে পারবো।

কি পরিচয় দেবে?

আমি নাচওয়ালী আর জীবনলালজী সারেঙ্গীবালা।

হোঃ হোঃ শব্দে হেসে ওঠে ক্রসম্যান। চমৎকার, পান্না বিবি, আমি যখন জেনারেল হবো তোমাকে করবো চীফ অব স্টাফ। বাই দি বাই, গীবনের বন্দুকে হাত পাকা, আশা করি সারেঙ্গীতেও হাত আছে।

না থাকলেও ক্ষতি নেই।

বলো কি ?

আমার নাচ যারা দেখবে, গান যারা শুনবে, তাদের লক্ষ্যই থাকবে না কে বাজাচ্ছে—কি বাজাচ্ছে।

আবার হোঃ হোঃ শব্দে হেসে ওঠে ক্রসম্যান, বলে, এই জন্যেই তো আমি পান্না বিবির গোঁড়া।

তবে তাই ঠিক, কি বলো গীবন ?

আমার আপত্তি নেই।

তবে চলো, বলে উঠে দাঁড়ায় ক্রসম্যান। বলে, চলো ব্রিজম্যানকে সব বালগে আর তারপরে জেনারেলকে বলে তোমার ছুটি করিয়ে দিই। এখন নূতন নিয়ম অনুসারে ছাউনি পরিত্যাগ করবার হুকুম জেনারেল ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না।

তারপরে জীবনের দিকে তাকিয়ে শুধোয়—কদিনের ছুটি চাও ?

আগে থেকে তো বলা যায় না। তবে এই কদিনের অভিজ্ঞতায় দেখলাম যে ভিতরে যাওয়ার চেয়ে বাইরে আসা কঠিন। একেবারে এক সপ্তাহের ছুটি কারয়ে দিন, আগে ফিরে আসতে পারি উত্তম।

পান্না বিবি, তুমি তৈরি হয়ে নাও।

কবে রওনা হ'তে হবে ?

আজ শেষ রাত্রেই।

আমার জিনিসপত্র ?

যেমন আছে থাকুক, পাহারা বসিয়ে দেবো। চলো গীবন।

পান্না শুধোয়, কখন ফিরবে তুমি ?

ভোর হওয়ার আগেই, ইতিমধ্যে তুমি তৈরি হয়ে থেকো।

থাকবো, সংক্ষেপে উত্তর দেয় পান্না।

তাঁবুর বাইরে যেতে যেতে হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে ক্রসম্যান বলে ওঠে, গীবনের সারেঙ্গীটা নিতে যেন ভুল না হয়, তা হ'লেই সব মাটি হয়ে যাবে।

পান্না হাসে। ক্রসম্যান মনে মনে বলে, পান্নার একটি হাসির মূল্য দশ হাজার মোহর।

॥ ৪ ॥

He is with her ; and they know
that I know
Where they are, what they do,
they believe my tears flow
While they laugh, laugh at me,
at me fled to the drear
Empty church, to pray God in,
for them ! I am here.—Browning

পরাজয়, পরাজয়, নীরন্ধ্র, নিশ্ছিদ্র, নির্ভেজাল পরাজয়। কোথাও আর এতটুকু সান্ত্বনার রশ্মি নেই, আত্মপ্রতারণা ক'রে সান্ত্বনা পাওয়া যাবে এমন এতটুকু ছলছুতোও হাতে আর নেই। কখনো কারো ভাগ্যে এমন পরাজয় ঘটেছে, পরাজয় আর সেই সঙ্গে আকণ্ঠ গ্লানি আর অগৌরব!

ভাবে আর শূন্য শয্যায় মাথা কুটে মরে রুমালী।

আর কেন, ওগো আর কেন? এখনো কিসের আশ্বাসে বেঁচে থাকা? জীবনপাত্র কি সম্পূর্ণ উপুড় হয়ে পড়ে যায় নি? হাঁ, পাত্রে মধু ছিল নিঃসন্দেহে, গলায় গলায় পূর্ণ ছিল জীবন-পুষ্পের মধু, কিন্তু পাত্র যে এখন উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছে তবু কি এখনো ভরসা রাখতে হবে? মধুর পাত্র বলেই কি মধুময়? শূন্য হ'লেও মধুময়! কিছুক্ষণ বাদে যে মাছিটিও বসবে না গায়ে—তবু কি সেই পাত্রে আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে!

শূন্য শয্যায় এপাশ ওপাশ করে আর ভেবে মরে রুমালী। এমনভাবে সকাল বিকাল সন্ধ্যা গিয়েছে, রাত পার হয়ে আবার ভোর হয়েছে। বার দুই পল্টন এসে দরজা ধাক্কিয়েছিল, সাড়া দেয় নি রুমালী।

দিদি, দরজার কাছে এক ভাঁড় দুধ রেখে গেলাম, খেয়ো।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় পল্টনের পদশব্দ। কিছুক্ষণ বাদে শুনতে পায় ভাঁড়টা নড়ছে, অবশেষে কাত হয়ে পড়ে যাওয়ার আওয়াজ, তারপরেই চক চক রসনার শব্দ। বিড়াল কি কুকুরে দুধ পান করছে। করুক গে। তবু তো কারো ভোগে লাগলো।

কিন্তু আশ্চর্য ঐ ছেলেটা পল্টন, বয়সে কনিষ্ঠ স্নেহে অগ্রজ, ঐ একটুখানি

ক্ষীণ সুতোয় ঝুলছে রুমালীর জীবন। ফাঁসিতলা থেকে সবাই যখন পালালো, জীবনলাল যখন তার দিকে দৃষ্টিপাতটুকুও না ক'রে চলে গেল, তখনকার বিভ্রান্ত অবস্থা কি কখনো ভুলতে পারবে? একেই বোধ করি বলে মানুষের কাঠ হয়ে যাওয়া। হঠাৎ একটা ঝটকা টান অনুভব করে।

পালিয়ে এসো দিদি।

প্রথমটায় ঠাহর হয় না কে বলছে। ওঃ, তাও বটে, পল্টন।

কেন রে, পালাতে যাবো কেন? কি হয়েছে?

হ'তে আর কি বাকি আছে। এখনি বখৎ খাঁর ঘোড়সওয়ার ছুটে আসবে।

আমরা তো আসামী নই।

এতদিনে বুঝি এই বুদ্ধি হ'ল! ঘোড়সওয়ার বুঝি আসামী খুঁজে বেড়ায়? যাকে সম্মুখে পায় সে-ই আসামী তার কাছে। আর তা ছাড়া—

আর তা ছাড়া কি, থামলি কেন? বল্ কি হয়েছে?

তুমিই তো গোলটি পাকিয়েছ? কি দরকার ছিল আসামী সনাক্ত করবার বাহাদুরি ক'রে? বিশেষ যখন জানতে যে আসামী খাস জীবনলাল।

কি ক'রে বলবো ভাই, মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল।

আচ্ছা, চলো, এখন মাথা নিয়ে পালাও। বখৎ খাঁর ফৌজের হাতে পড়লে মাথা আর আস্ত থাকবে না, এসো।

এই বলে একরকম তাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে ছুটে পালায় পল্টন। রুমালী ভাবে আশ্চর্য এই ছেলেটা।

ঘরে এসে দরজা দেয় রুমালী।

জানবার আর তো কিছুই বাকি নেই। জীবনলাল তুলসীকে ভালোবাসে। আর বাসবেই বা না কেন, রুমালী তাকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল। তবে?···না, না ধরিয়ে দিতে চায় নি, অন্ধ আক্রোশে আংশিক স্বীকার করেছিল, শেষ পর্যন্ত নাম তো বলতে রাজী হয় নি, বরঞ্চ নিজেই মাথা পেতে দণ্ড নিতে প্রস্তুত ছিল। এতেও কি জীবনলাল বুঝতে পারলো না যে রুমালী তাকে ভালোবাসে? কিন্তু একটা রহস্যের কূটগ্রন্থি কিছুতেই খুলতে চায় না তার মনে। সমস্ত বিপদের গুরুত্ব জেনেশুনেও জীবনলাল ধরা দিতে এলো কেন? সে কি রুমালীকে মিথ্যা এজাহারের দণ্ড থেকে বাঁচাবার জন্যে? বিপদের ঝুঁকি আছে জেনেশুনেও এসে উপস্থিত হ'ল কেন? বাঁচাবার জন্যে? কেন বাঁচাবার চেষ্টা? ভালোবাসা? আবার, ফের। নিজেকে শাসায় রুমালী। সমস্তই কি দেউলে হয়ে যায় নি যখন রুমালীর দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে, তুলসী আর নয়নকে ইঙ্গিতে বিদায় জানিয়ে

ছুটে চলে গেল জীবন! ভাঙা হাঁড়ির টুকরোর মতো পড়ে রইলো রুমালী। ভাঙা হাঁড়ি ছেঁড়া পাতার চেয়ে বেশি রুপার পাত্র। দূর, দূর, দূর!

সময় আর কাটে না। প্রবল দুঃখ-স্রোতের প্রতিকূলে রুমালী যেন সাঁতার দিতে উদ্যত, এক হাত অগ্রসর হ'তে হাত-পা ভেঙে আসে। এমনভাবে কতখানি অগ্রসর হওয়া যায়, আর অগ্রসর হ'লেই বা কি লাভ? এমন অসহায়ভাবে বাঁচবার চেষ্টার চেয়ে কি মৃত্যু ভালো নয়? মরতেই তো সে গিয়েছিল, আবার না যায় কেন? যদি যাবে তো ফিরলো কেন? ফিরলো হঠাৎ সুখ-মুসাফিরের দেখা পেলো বলে। তখন সেই অদ্ভুত লোকটা জুড়ে বসে রুমালীর সমস্ত মন। লোকটা বড়ই কৌশলী, কেমন ভুলিয়ে-ভালিয়ে তুলে নিয়ে এলো অতল থেকে। তখন মনের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষার মতো জাগলো আবার দেখা পাওয়া যায় না সুখ-মুসাফিরের! তার দেখা পাওয়া যে বড় দরকার।

তখন রুমালী ভাবে, কেন চায় সুখ-মুসাফিরের সাক্ষাৎ? তবে কি সে বাঁচতে চায়? বাঁচতে না চায় কে? তবে কিনা বাঁচার মতো ক'রে বাঁচতে হবে। সেটা আবার কি? রুমালী জানতো দেহটাই সব। প্রেম স্নেহ দয়া মায়া সমস্তই দেহের ধর্ম। এমন সময়ে তার জীবনে এলো জীবনলাল নামে ঐ লোকটা। ক্রমে ক্রমে রুমালীর অভ্যস্ত তত্ত্বে চিড় খেলো, বুঝতে পারলো, না, দেহ ছাড়াও কিছু আছে, প্রেম স্নেহ দয়া মায়া ঠিক দেহের ধর্ম নয়—তদতিরিক্ত কিছু।

হঠাৎ এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে কূল-কিনারা হারিয়ে যাওয়ায় বিভ্রান্ত হয়ে যমুনায় ডুবতে গিয়েছিল সে। এমন সময়ে এলো সুখ-মুসাফির, বলল দেহ ছাড়া কিছু নেই, বলল প্রেম আর কাম এক, বাসনা আর আদর্শ এক, বাস্তব আর স্বপ্ন এক। বলল তেমন ক'রে জোরে দেহটাকে চেপে ধরলে সমস্ত স্বীকার করবে। বলল আহাম্মকের মতো মরতে যাচ্ছ কোন শোকে?

ঘরে ফিরে এসেছিল রুমালী। সে রাতে মনে হয়েছিল সুখ-মুসাফিরের কথাই সত্য। তবে তার পরদিন কেন দেওয়ানী খাসে গিয়ে নূতন সঙ্কটে জড়িয়ে পড়লো, সে ব্যাখ্যা এখনো খুঁজে পায় নি। নাঃ, আর সে পারে না। জীবনলাল তাকে বলছে, দেহ ছাড়াও কিছু আছে, সেখানেই প্রেমের বনিয়াদ। আর অন্যদিকে সুখ-মুসাফির বলছে, দেহটাই সব আর সে কিনা এই দুই কূলের মধ্যে তরঙ্গতাড়িত হয়ে দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে। সে ভাবে, কেউ এসে টেনে তুলে নেয় না! যে-কোন একটা কূলে! জীবনলালের আসবার পথ যখন চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে তখন কেন না আসে সুখ-মুসাফির! সুখ-মুসাফিরের সঙ্গ তার

উদগ্র কামনা হয়ে ওঠে।

সুখ-মুসাফিরের স্মৃতি প্রবল হয়ে উঠতেই মনে পড়ে যায় একটা সোনার হার দিয়ে গিয়েছিল সে। এই দু'দিন কিছু মনে ছিল না। কৌতূহলের বশে তাড়াতাড়ি বের ক'রে নেয় সেটা, অবলম্বনহীন চিন্তার মধ্যে যাই হোক, যেমনি হোক একটা চিন্তার সূত্র পাওয়া গেল। জানালা খুলে দিতেই ভোরের আলো ঢোকে, রুমালী ভেবে পায় না, এক রাত বাদে ভোর না দু'রাত বাদে ভোর।

ভোরের আলোয় সে আবিষ্কার করে, না, সোনার নয়, রূপোর সরু শিকলিতে পরানো সোনার একটা তক্তি। কোন্ দেহাতী লোকের কাছে থেকে নাকি আড়াই টাকায় কিনে নিয়েছিল সুখ-মুসাফির, বলেছিল, রেখে দাও, মাঝে মাঝে দেখলে মনে পড়বে তাকে।

সোনার তক্তিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, না, এমন কিছু সূক্ষ্ম শিল্প নয়, নিতান্তই স্থূল হাতের কাজ, নইলে আড়াই টাকায় পাওয়া যায়! হারটা রেখে দিতে যাবে, এমন সময়ে চমকে ওঠে, কী লেখা নয়? সত্যিই তো, তক্তির উপরে কিছু লেখাই তো বটে! চোখের কাছে তুলে ধরে।

রুমালী দেখতে পায় সোনার পাতের উপরে সূক্ষ্ম হরফে খোদাই-করা কিছু। তারিখ বলেই মনে হ'ল! হাঁ তারিখই বটে, ইংরেজী হরফে ইংরেজী তারিখ। ২৮শে আগস্ট! নিচে ওটা কি লেখা? সাল নাকি? ইংরাজী হরফে ইংরাজী সাল। ১৮৫৭।৫ অঙ্কটা ভালো ক'রে ওঠে নি—তবু বুঝতে পারা যায়। তখনি তার মনে পড়ে যায়—এটাই তো ১৮৫৭ সাল বটে। আর তারিখ? আজ-কালের মধ্যেই হবে, কেবনা বখৎ খাঁর এজলাসে একবার ইংরেজী তারিখের উল্লেখ শুনেছিল ২৬শে আগস্ট। তার ভারি মজা লাগে, অনন্তকালের মধ্যে এত সব তারিখ থাকতে তক্তিটার উপরে কি না এমন অঙ্ক লিখিত যা ঠিক হাতের কাছের, আজকের বা কালকের দিনটা। কৌতূহল পরিণত হয় বিস্ময়ে। ব্যাপার কি? নিগূঢ় কোন্ কার্যকারণের রহস্যময় এই সূত্রটা এসে পড়েছে তার হাতের উপরে। সে অবাক হয়ে বসে থাকে।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটলে আবার নাড়াচাড়া করতে থাকে তক্তিটা। হঠাৎ আবার চোখে পড়ে যায় তক্তির অন্য দিকটায় ইংরেজী হরফ। আগ্রহের সঙ্গে চোখের কাছে নিয়ে এসে অক্ষরের সঙ্গে অক্ষর জুড়ে পাঠ ক'রে অস্ফুট চীৎকার ক'রে ওঠে। জীবনলাল। এ নাম যে তার পরিচিত জীবনলালের ছাড়া আর কারো নয়—এই ধারণা তাকে পেয়ে বসে। তাই তো, জীবনলাল! জীবনলালের নাম এখানে এলো কি ক'রে? একবারও তার মনে হ'ল না—এ

তার পরিচিত জীবনলাল নাও হ'তে পারে।

এবারে নিগূঢ় কার্যকারণের সূত্রটা অধিকতর রহস্যময় হয়ে ওঠে, আজকের সাল তারিখের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নামটা আর সেই সঙ্গে তক্তিটা একটা নিদারুণ রমণীয়তা লাভ করে—কি আছে এর মধ্যে, কি এর সম্বন্ধ জীবনলালের সঙ্গে।

প্রথমে তার মনে হ'ল আর কিছুই নয়। বালকদের গলায় যেমন সোনার তক্তি থাকে, এ সেই রকম একটা অলঙ্কার। জীবনলালের গলাতেই বাল্যকালে ছিল। তার পরে হিন্দুস্থানময় যে ওলটপালট চলছে তারই ফলে কোথাকার জিনিস কোথায় এসে ঠেকেছে। এ কিছুই অসম্ভব নয়, সত্য। কিন্তু অসম্ভব আর আশ্চর্য হাতে এসে পৌছানো যখন জীবনলালের সঙ্গে তার জীবন জড়িত হয়ে গিয়ে একটা দুর্মোচ্য গ্রন্থির সৃষ্টি করেছে।

আচ্ছা, ভিতরে কিছু নেই তো! তক্তিটা বেশ পুরু, ভিতরে কিছু থাকা আদৌ অসম্ভব নয়। দেখাই যাক না, জীবনলালের কোন এক অজ্ঞাত পর্ব উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় কি না। তক্তির জোড়ের উপরে ছুরি দিয়ে চাপ দিতেই সোনার পাত আলগা হয়ে দু'ভাগ হয়ে গেল, আর ভিতরে থেকে বের হয়ে পড়লো সযত্নে ভাঁজ করা অনেকখানি পাতলা কাগজ, আগাগোড়া ইংরেজী লেখায় পূর্ণ।

সন্তর্পণে ভাঁজ খুলে নেয় পাতলা জীর্ণ কাগজের। হ্যাঁ, ভিতরেও সম্বোধন জীবনলাল, "মাই ডিয়ার জীবনলাল"। উপরে লেখা লখনৌ। জীবনলাল তো লখনৌর লোকই বটে। সংসারে হাজার হাজার জীবনলাল থাকা সম্ভব—কিন্তু লখনৌর এই জীবনলাল তার জীবনলাল ছাড়া আর কেউ হ'তেই পারে না। তার জীবনলাল ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তার জীবনলাল অর্থাৎ তুলসীর বা আর কারো জীবনলাল নয়।

কে লিখলো জীবনলালকে এই চিঠি? দীর্ঘ চিঠির তলাতে যেখানে গিয়ে চোখ বাধা পায় সেখানে লেখা—With blessings, your father.

বাপ ছেলেকে চিঠি লিখবে, তার এত তোড়জোড় আয়োজন কেন? এমন সোনার তক্তিরই বা কি প্রয়োজন হয়? বাপ-ছেলের সম্বন্ধের মধ্যে এমন কি গোপনীয়তা থাকতে পারে, যাতে দিনের আলোকে লুকিয়ে সোনার তক্তির অন্ধকারকে অবলম্বন করতে হয়! পড়াই যাক। রুমালী তন্ময় হয়ে পড়তে থাকে। অগ্রসর হ'তে হ'তে অবশেষে এক সময়ে তার মনে হ'ল, ভঙ্গুর ভেলায় চেপে সে যেন অনন্ত সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে!

যতই অগ্রসর হয় বিস্ময় বাড়তে থাকে রুমালীর! এ কি কাণ্ড! অবশেষে উগ্র কৌতূহল তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় শেষ পংক্তি পর্যন্ত, নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ

দেয় না। সমস্ত পড়া হয়ে গেল, তবু বিস্ময়ের রঙ ফিকে হ'তে চায় না, বরঞ্চ আরও প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। চিঠিখানার ছত্রগুলোর ফাঁকে ফাঁকে অনেকটা অদৃশ্য আকাশ রয়ে যায় তার, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি চোখে পড়ে না রুমালীর, চোখে পড়বার কথাও নয়, তবু ছত্রগুলো যা অবারিত ক'রে ধরে, তা-ও কম রহস্যময়, কম বিস্ময়কর নয়।

পিতা মরবার আগে বিবাহ সম্বন্ধে অনুশাসন দিয়ে যাচ্ছে পুত্রের প্রতি, সে যেন বিশেষ একটি ঘরের মেয়েকে বিবাহ না করে। হাঁ, অবশ্য সেই ঘরের মেয়ের সঙ্গে জীবনের বিয়ে দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জীবনের পিতা, কিন্তু তারপরে তুজনের জীবনেই অনেক ওলট-পালট ঘটে যায়, যারা হ'তে পারতো ঘনিষ্ঠতম বান্ধব, তারাই হয়ে দাঁড়ালো পরম শত্রু। রুমালীর সন্দেহ মাত্র থাকে না যে, সুখানন্দ পণ্ডিতই লখনৌবাসী সেই বন্ধু, নাম সাক্ষ্য, ধাম সাক্ষ্য, আর সাক্ষ্য হাতের ঐ কাটা তুটো আঙুল। একবার রুমালীর মনে হয় ছেলেকে মুখে বলে গেলেই হ'ত, এত ঘটা ক'রে লিখে সোনার তক্তিতে পুরে দেওয়া কেন? তার যদি বিস্ময় ও রহস্যবোধ কিছু কম হ'ত, তবে অনায়াসে বুঝতে পারতো, চিঠির মধ্যে পিতার জীবনের এমন একটা অধ্যায়ের আভাস আছে, যা পিতার পক্ষে পুত্রকে মুখে বলা সহজ নয়।

কিন্তু সব ছাপিয়ে ওঠে তার মনের মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত তীব্র আনন্দের অনুভূতি, নিরস্ত্র যোদ্ধার হঠাৎ জুটে গিয়েছে ব্রহ্মাস্ত্র। সে নিশ্চিন্ত হয় যে, যথাসময়ে এই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হ'লে তুলসী আর জীবনের বিয়ে অবশ্যই ভেঙে যাবে। মৃত পিতার অনুশাসন জীবিত পিতার শাসনের চেয়ে অনেক বেশি তুর্লঙ্ঘ্য। তা হ'লে আর দেরি নয়।

এখনি পৌঁছে দিতে হবে অনুশাসন তুলসীর হাতে, পত্রাকারে নয়, বিবাহের উপহাররূপে তক্তির আকারে। তখনি চিঠিখানা ভরে ফেলে তক্তির মধ্যে, অল্প চাপ দিতেই বেশ জোড়া লেগে যায়, কেউ খুলেছিল বলে বুঝতে পারা যায় না। তুলসীর সঙ্গে জীবনের বিয়ে হবে শুনে অবধি আনন্দে তার চোখে ঘুম নেই, মুখে ভাত নেই! (কতকটা সত্য বটে), তা শুভকার্যে কিছু উপহার দিতে চায় তুলসীকে, কী-ই বা দেবে, কী-ই বা আছে তার। সে যে নিতান্ত দরিদ্র। থাকবার মধ্যে আছে এই হারটুকু, রূপোর শিকলিতে পরানো সোনার এক টুকরো তক্তি, আড়াই টাকা দিয়ে কিনেছিল এক দেহাতী লোকের কাছ থেকে। (এই অংশ সত্য বটে)। বড় বোনের এই সামান্য উপহারটুকু তুলসী যেন গ্রহণ করে।

রুমালী বোঝে তুলসী অবশ্যই নেবে, না নেওয়ার কারণ থাকতে পারে না। রুমালীর সম্বন্ধে তার যেমনই মনোভাব থাক না কেন, বিবাহে উপহার দান মানেই যে তার পরাজয় স্বীকার—এ কথা তুলসীর মতো হাবাগোবা মেয়েরও বোঝবার ক্ষমতা আছে।

তখনি মনের মধ্যে সন্দেহ খোঁচা মারে, বিয়ের আগে তক্তির উপরকার লেখাটা কি পড়বে জীবনের চোখে? তুলসীর না পড়তে পারে, আর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করাও উচিত হবে না এদিকে, কিন্তু জীবনের চোখে অবশ্যই পড়বে, কারণ এ-তক্তি তার পরিচিত, পথের ডামাডোলে নিশ্চয় খোয়া গিয়েছে।

তুলসী নিশ্চয় দেখাবে জীবনকে, দ্যাখো, দ্যাখো, রুমালী কি দিয়ে গিয়েছে। জীবন চিনবে হারানো তক্তি, তখনি মনে পড়বে আজকালের মধ্যে আটাশে আগস্ট, যেটা কিনা জীবনের জন্মদিন, যখন এই তক্তি খুলে চিঠি পড়বার কথা।

রুমালীর মনে আর আনন্দ ধরে না। তুলসীর রঙীন বুদ্বুদ অকালে ফেঁসে গেল। আর একবার বিয়ে ভেঙে গেলে—তখনি নূতন নূতন সম্ভাবনার কচি কিশলয় রঙীন ইঙ্গিত করতে থাকে তার মনের মধ্যে—কিছুই অসম্ভব বোধ হয় না তার।

তখনি সে উঠে পড়ে। স্নান ক'রে এবং যথোচিত পোশাক না পরে যাওয়া যায় না, খিন্ন মুখমণ্ডল ও মলিন বেশে কি শুভকার্যের উপহার নিয়ে যাওয়া চলে!

কিছুক্ষণ পরে যখন সে রওনা হ'ল সুখানন্দ পণ্ডিতের বাড়ি বলে, মনের মধ্যে হঠাৎ কেমন যেন বিষাদের ছায়া নেমে আসে। তুলসীর সম্ভাবিত দুঃখের কথা ভেবে নয়, নিশ্চয়ই নয়। তবে? তুলসী আর জীবনের মধ্যে যে অলঙ্ঘ্য যোগাযোগ ঘটে উঠেছে, তা ভিন্ন ক'রে দেখতে অবশেষে কিনা দৈবের সহায় নিতে হ'ল! তুলসী পরাজিত হয়েও যে জিতে গেল। পরাজিত হবেই, সে বিষয়ে তার মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। নারীসুলভ সহজাত বুদ্ধিতে বুঝেছিল সে, পিতার অনুশাসন কিছুতেই লঙ্ঘন করবে না জীবন। তবু মনের ভয় যেতে চায় না।

সামনেই পড়লো একটা শিবমন্দির। মন্দির মসজিদ গীর্জার ধার ধারে না রুমালী। তবু কেন জানি না, আজ মন্দিরের সম্মুখে একবার থমকে দাঁড়ালো, একবার চারদিক চেয়ে দেখলো কেউ লক্ষ্য করছে কি না, আর তার পরেই চট্ ক'রে একবার মাথা ঠুকে প্রণাম ক'রে দ্রুততর পায়ে ছুটে চলল ফুলকী-মণ্ডির দিকে।

॥ ৫ ॥

পুনর্মিলন (।)

তুলসী স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে দুদিন যেতে না যেতেই জীবনলাল ফিরে আসবে। এই কয়েকটি ঘণ্টা, একটি দিন ও রাত্রি, আটটি প্রহর, অনেকগুলি দণ্ড এবং অসংখ্য পল-বিপল কি ভাবে তার কেটেছে সে জানে আর জানেন তিনি, মানুষকে বিপুল সুখ-দুঃখ অনুভব করবার শক্তি দিয়ে যিনি গড়েছেন। ফাঁসির মঞ্চে দণ্ডায়মান গলবদ্ধরজ্জু জীবনলালের স্মৃতি মনে উদিত হ'তেই তার সমস্ত অন্তরাত্মা চমকে ওঠে, সর্বনাশ কানের কত কাছ দিয়েই না গিয়েছে। হঠাৎ কেন যে জল্লাদ নিহত হ'তে গেল, পাহারাঅলারা পলায়ন করলো—সেই সুযোগে জীবনের প্রস্থান করা সম্ভব হ'ল—এ সমস্তব রহস্য এখনো পর্যন্ত তার কাছে রহস্যই রয়ে গিয়েছে, কখনো সমাধান হবে এমন সম্ভাবনা নেই। তাই সমস্ত সমস্যা নিয়ে এসে শ্যামসুন্দরের পায়ের তলায় সমর্পণ ক'রে বলেছে, ঠাকুর, এ সমস্যাও তোমার, এ সমাধানও তোমার, জীবনলালও তোমার। আমি চিন্তা করবার কে? আমি তো আর পারি নে প্রভু, আমাকে পায়ের তলায় ঠাঁই দাও। কিন্তু ঠাঁই দাও বললেই যে ঠাঁই দেন, শ্যামসুন্দর তেমন সহজ দেবতা নন। তিনি প্রেমের ঠাকুর সত্য কিন্তু তেমনি সত্য যে তিনি আবার পাথরে গড়া। পাথরের মধ্যেই যে ঝরনার বান এ কথা বুঝতে কিছু সাধনার আবশ্যক।

জীবন যখন ঘোড়ায় চেপে কাবুল দরবাজা দিয়ে বের হয়ে গেল, তখন আর থাকা নিরাপদ নয় ভেবে নয়ন আর তুলসী টঙ্গা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। তুলসী উঠতে চায় নি, ফিরতে চায় নি, নয়ন বলেছিল, বোন, এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়।

আপদটা কিসের দাদা?

জীবনের। বখৎ খাঁর লোক যদি বুঝতে পারে যে জীবনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে, তবে শুধু আমাদের বিপদ নয় জীবনলালেরও বিপদ ঘটতে পারে।

তবে চলো।

সেই ভালো।

আর এখানে বসে থেকেই বা কি লাভ?

কিছুই নয়।

টঙ্গায় আসতে আসতে তুলসী শুধোয়, আচ্ছা দাদা, জীবনলাল নিরাপদে গিয়ে পৌঁছতে পারবেন তো? চার দিকেই সিপাহী ফৌজ!

এমন একটা আশঙ্কা নয়নের মনেও হয়েছিল, তা ছাড়া ধাবমান ঘোড়সওয়ার দেখলে দুই পক্ষেরই ফৌজ হয়তো গুলী ছুঁড়বে। সে ভাবল, ভয় যা থাকবার তা তো আছেই, মিছে আর তুলসীর ভয় বাড়িয়ে কি লাভ?

নয়ন বলল, জীবন বুঝে-শুঝেই যাবে—আমার তো মনে হয় ভয়ের কারণ নেই।

অভয়বাণী যতই শূন্যগর্ভ হোক না কেন তবু তার প্রতিক্রিয়া না হয়ে যায় না। নয়নের সাহসে তুলসী সাহস পেলো। বলল, হাঁ, তিনি কি আর না বুঝে গিয়েছেন!

বাড়ি ফিরে এসে শ্যামসুন্দরের ঘরে গিয়ে প্রণাম ক'রে তুলসী বলে, ঠাকুর, তোমার ধন তুমি রক্ষা করো।

রাত্রে ঘুম আসতে চায় না তুলসীর, পরে মনে পড়ে জীবনের সেই বিদ্যুৎগর্ভ অকৃত চুম্বনটি, মুখের কাছে নমিত হয়ে পড়েও যা অকৃতার্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে তুলসীর সমস্ত দেহমন, সমস্ত অন্তরাত্মা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল, স্বাতী তিথির বারি-বিন্দুর জন্য উন্মুক্তমুখ শুক্তি যেমন অপেক্ষা ক'রে থাকে; পুষ্পরাগ-রঞ্জিত ভ্রমরের জন্য ঈষন্মুক্ত পদ্মকোরক যেমন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে; তেমনি ভাবে, না, ততোধিক ব্যগ্রতায় ঈষদ্‌ভিন্ন কিশলয় অধরোষ্ঠের মধ্যে দুগ্ধশুভ্র দন্তের আভাস বিকশিত ক'রে প্রণয়-নিমীলিতনেত্রে অপেক্ষা ক'রে ছিল, অপেক্ষা করছিল অমৃত-গরলময় একটি উষ্ণ সুখদ স্পর্শ অনুভব করবে! কিন্তু হঠাৎ এ কি হ'ল, নিজের দেহটাই বিদ্রোহী হয়ে উঠে দয়িতকে দূরে ঠেলে দিল কেন? মন যখন বলছে দাও, দাও, দাও, দেহটা তখন আপত্তি করে কেন? তখনো বুঝতে পারে নি, এখনো বুঝতে পারে না, মাঝে থেকে একটি চরম সার্থকতা অকৃতার্থ হয়ে ফিরে যায়—নল রাজার প্রেরিত হংসদূতের মতো। হায়, হায়, দেহ-মনের আড়াআড়ি ভাঙতেই অর্ধেক জীবন অতিবাহিত হয়, যখন দুয়ে আপস হয় তখন দেওয়ার মতো কিম্বা নেওয়ার মতো আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

তুলসী দেখতে পায় একটি ধবধবে সাদা রঙের রাজহাঁস—তার দেহ যেন মানস সরোবরের ফেনা জমিয়ে তৈরি, তার ঠোঁটে লাল রঙের একটি ফুটনোন্মুখ পদ্মের কুঁড়ি, সে-রকম গাঢ় কোমল রঙ কোথাও দেখে নি আগে, ও রঙ যেন

রতির প্রসাধনের কুঙ্কুম-পেটিকা থেকে নেওয়া—সেই রাজহংস সেই লাল পদ্মের কুঁড়িটি নিয়ে তার চারপাশে চক্রাকারে ঘুরছে। তুলসীর ডাকে কাছে আসে না, তুলসী ধরতে যায় ধরা দেয় না, অথচ তাকেই চক্রাকারে ঘিরে ঘিরে বিহ্বল ক'রে তোলে। কে পাঠালো এই রাজহাঁসটি, কেনই বা পাঠালো বুঝতে পারে না। হঠাৎ তার চোখে পড়ে হাঁসটির পিছনে অদূরে দাঁড়িয়ে হাসছে জীবনলাল। তার চোখ দুটো যেন বলছে, কেমন ধরতে পারছ না তো? ইচ্ছা করলেই ধরতে পারবে এমন হাঁস ও নয়।

পোষা হাঁস নয়? শুধোয় তুলসী।

ও হাঁস কখনো পোষ মানে না।

বনের হাঁস?

না, মনের হাঁস।

তুমিই ধরে দাও না কেন?

কেন দেবো?

তবে সরো, আমি ধরি।

বেশ তো, চেষ্টা ক'রে ছাখো না কেন?

হঠাৎ তুলসীর মনে পড়ে যায়, জীবন তো চলে গিয়েছিল, তবে এলো কখন?

তুমি ফিরলে কখন?

এই তো, এই মাত্র আসছি।...

কি আশ্চর্য! এসো ভাই জীবন, এসো, এসো। কখন এলে?

এই তো, এই মাত্র আসছি।

সচকিত হয়ে জেগে ওঠে তুলসী, ও কি স্বপ্নে শোনা না কানে শোনা, বুঝতে পারে না। ঐ তো পাশের ঘরে জীবনের কণ্ঠস্বর। স্বপ্ন ও জাগরণের জোড়-মেলানো রেখার উপরে জেগে ওঠে সে। ব্যাপার কি?

এমন সময়ে দরজার কাছে ভূতিবুড়ীকে দেখতে পেয়ে শুধোয়—কে রে পাশের ঘরে?

কি ক'রে জানবো দিদি, এক সারেঙ্গীঅলা এসেছে এক নাচওয়ালীকে সঙ্গে নিয়ে। আমি তো তাড়িয়েই দিয়েছিলাম, তোমরা যাও বাপু, এখন আমাদের নাচ দেখবার সময় নেই। এমন সময়ে দাদাবাবু এসে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে, কাকে তাড়াচ্ছিস তুই, এ যে আমার জীবনভাই।

জীবনলাল নাকি?—শুধোয় তুলসী।

কেমন ক'রে বুঝবো দিদি, তাকে আগে দেখেছি ফৌজী পোশাকে, এখন দেখি দিব্যি সারেঙ্গীঅলা। বোঝে কার সাধ্য।

সঙ্গে আবার কে রে ?

আগে কখনো দেখি নি, এক নাচওয়ালী।

তুলসী ভাবে, আর যেই হোক, রুমালী নয়, আগের দিন সন্ধ্যায় এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি হার উপহার দিয়ে গিয়েছে। জীবনলালের আশা ছেড়ে দিয়েছে সে।

তুলসী, এদিকে আয়।

নয়নের ডাক শুনে চট্ ক'রে হাত দিয়ে এলোমেলো চুলগুলো একটু সাব্যস্ত ক'রে নিয়ে পাশের ঘরে যায়—দেখে, চুড়িদার পায়জামা, কলিদার পিরান, তার উপরে হাতকাটা খাটো কোর্তা, মাথায় টেরা ক'রে বসানো ফুলকাটা লখনৌবালা টুপি, হাতে সারেঙ্গী—মূর্তিমান সারেঙ্গীঅলা জীবনলাল, কে বলবে, সে কোম্পানীর রেসালাদার। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে, ঘাগরা, কাঁচুলি, দোপাট্টায় সজ্জিত নাচওয়ালী। বয়স যেমন অল্প, রূপ তেমনি বেশী।

তুলসী মনে মনে ভাবে, এ আবার কি নূতন হাঙ্গামা !

তুলসীকে হতবুদ্ধি দেখে হো-হো ক'রে হেসে ওঠে নয়ন।

কি রে, বুঝতে পারলি নে। আমাদের জীবনলাল যে।

এবারে জীবন ছোট্ট একটি সেলাম ক'রে বলে, মালেকান কুছ ফরমাইয়ে।

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, চোখ ছলছল করে ওঠে তুলসীর। রুমালী যেতে না যেতেই এ আবার কি এক জঞ্জাল।

এবারে পান্না বলে জীবনভাই, আমায় পরিচয় করিয়ে দাও।

তুলসী, এই আমার সেই বেরিলির পান্নাদিদি, যার কথা আমার কাছে আগে অনেকবার শুনেছ।

এই প্রথম কথা বলে তুলসী, কিন্তু এ কি পোশাক ?

জঙ্গী পোশাকে আসতে গেলে পাছে ধরা পড়ি, তাই এই নূতন ভেক নিতে হয়েছে।

অবশ্য আমার কাছে এ-পোশাক নূতন নয়, পেশাতে সত্যিই আমি নাচওয়ালী।

তারপরে নয়নচাঁদকে উদ্দেশ ক'রে বলে, নয়নচাঁদজী, জীবনভাই যখন বলল যে, চলো তোমাকে পণ্ডিতজীর বাড়িতে নিয়ে লুকিয়ে রাখি, তখন আমিই বললাম, তুমি সারেঙ্গীঅলার পোশাক প'রে নাও, যে কাণ্ড করে পালিয়ে এসেছ, জঙ্গী পোশাকে গেলে চিনে ফেলতে কতক্ষণ।

মন্দ পরামর্শ দাও নি পান্নাবিবি, তা ছাড়া সারেঙ্গীঅলার পোশাকে জীবনলালকে মানিয়েছে ভালো।

ভালো মানিয়েছে না ছাই!—বলে ওঠে তুলসী।

নয়ন বলে, সে বিচার না হয় পরে করা যাবে, আপাতত এদের হাত-মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও। চলো ভাই জীবন, তোমার ঘরে চলো—তুলসী তুই নিয়ে যা পান্নাবিবিকে।

পান্না বলে, আপনি আমাকে পান্নাদিদি বলে ডাকবেন।

বেশ, তাই হবে!

পণ্ডিতজী কোথায়?

তিনি পূজোর ঘরে, বের হ'লে দেখা করিয়ে দেবো. এখন চলো।

আশ্চর্য এই মেয়েটি পান্না, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ির সকলের মন জয় ক'রে নিলো, কিংবা তার চেয়েও বেশী। সে যে এই বাড়িয়ে মেয়ে নয়, পণ্ডিতজী যে তার চাচা নয়, নয়ন যে তার ভাইসাহেব নয়, তুলসী যে তার বহিন নয়, এমন কি, ভূতি বুড়ী ও কাহ্নাইয়া যে তার দিদি দাদা নয়, বোঝে কার সাধ্য।

পণ্ডিতজী বলে, পান্না মা, আমার বড মেয়েটি অল্প বয়সে আমাদের ছেড়ে গিয়েছিল, তুমিই আমার সেই মা—আবার এতকাল পরে ফিরে এসেছ।

নয়নচাঁদ বলে, পান্নাদিদি, গদর মিটে গেলেই বেরিলি ফিরে যাবে যদি মনে ক'রে থাকো, তবে এখন থেকেই বলে রাখছি—সেটি হবে না।

পান্না বলে, কি সর্বনাশ, এ কোথায় নিয়ে এলে জীবনভাই, এ যে যাবজ্জীবন কয়েদের যোগাড় দেখছি।

নয়ন বলে, জীবনকে আর দলে টেনো না দিদি, ওর যাবজ্জীবন মেয়াদের হুকুম হয়ে গিয়েছে।

পান্না বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়। কিন্তু আমার কি লাভটা?

চাও তো সে ব্যবস্থাও ক'রে দিতে পারি। আমাদের কাহ্নাইয়ার দুই জরু, তার উপরে না হয় আর একটা হবে।

বাপর, ওর এক ঠ্যাঙের দাপট কি সহ্য করতে পারবো।

এক ঠ্যাঙ যদি পছন্দ না হয়, সিপাহীদের মধ্যে থেকে দু' ঠ্যাঙঅলা একটা বেছে দেবো—অভাব কি।

তুলসী প্রথমে সন্দেহের চোখে দেখেছিল পান্নাকে। এমন সুন্দরী যুবতী মেয়ের ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করে নি জীবনের সঙ্গে, ভেবেছিল, চারদিকে বিপদ, কোন্ দিক সামলাই। রুমালীর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে-না-হতে এলো পান্না।

রুমালীর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার বিশেষ কারণ ঘটেছিল। আগের দিন সন্ধ্যার সময়ে এসে জীবনের সঙ্গে তুলসীর বিবাহ-সংবাদকে অভিনন্দিত ক'রে গিয়েছিল, শুধু তা-ই নয়, অনেক সঙ্কোচ, অনেক দীনতা প্রকাশ ক'রে বলেছিল, তুলসীকে উপহার দিতে পারে, এমন কিছুই তার নেই। হয়তো শুধু হাতেই শুভেচ্ছা জানাতে হ'ত, এমন সময়ে ঘটনাক্রমে এই হারটি হাতে এলো।

এই বলে সেই রুপোর শিকলিতে পরানো সোনার তক্তিটা বের ক'রে বলে, একটা দেহাতী লোকের কাছ থেকে আড়াই টাকায় কিনে নিয়েছে।

এটা নাও ভাই—বলে স্বহস্তে পরিয়ে দেয় তুলসীর গলায়।

তুলসী সরল আগ্রহে বলে ওঠে, কি সুন্দর, কি চমৎকার।

অতি সামান্য বস্তু !

তুলসী বলে, রুমালীদিদি, গালিব সাহেবের মুখে শুনেছি, দাতার আন্তরিকতায় সামান্য বস্তু অসামান্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু জীবনলাল দেখলে না জানি কি মনে করবে, হয়তো মনে করবে, এই সামান্য বস্তুটা দিয়ে রুমালী আমাদের বিয়েকে অবজ্ঞা ক'রে গেল।

কখ্‌খনো নয়, তিনি কখনোই এমন ভাবতে পারেন না, তিনি এলেই আমি দেখাবো।

রুমালীও তাই চায়।

রুমালীর সম্বন্ধে যখন সে নিশ্চিন্ত হয়েছে, সেই সময়ে এই নূতন উৎপাত। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সহজাত বুদ্ধিবলে সে বুঝতে পারলো জীবনের সম্বন্ধে পান্নার যে মনোভাবই হোক না কেন, তার মধ্যে প্রণয়ের গন্ধ নেই। জীবনের নামে তার মুখে হাসি ফোটে না, চোখে আলো জ্বলে ওঠে না, কণ্ঠস্বরে গদগদ মাধুর্য দেখা দেয় না। না, পান্না ভালোবাসে না জীবনকে।

এবারে সে নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভয়ে কাছে টেনে নেয় পান্নাকে। কিন্তু গল্প করতে করতেই হঠাৎ কখন উধাও হয়ে যায়।

তুলসী কোথায় গেলি রে, শুধোয় নয়ন। সকলে দেখে তুলসীও নেই জীবনও নেই!—সকলে মুচকি হাসে।

পান্না বলে ওঠে—

প্রেমিক তস্কর কবি
করে সদা সুবর্ণ সন্ধান,
মধুময় অন্ধকার,
এতটুকু নিরিবিলি স্থান

নয়ন শুধোয়, এরা কি ?

সমস্তই একসঙ্গে।

কবিও ?

নিশ্চয়ই, প্রেমে অ-কবিকেও কবি ক'রে তোলে যাই হোক, ওদিকে আর যেয়ো না নয়নভাই।—নিষেধ করে পান্না।

॥ ৬ ॥

"২৮শে আগস্ট"

ও তুমি এখানে, আমি বুঝতে পাড়ি নি, হঠাৎ এসে পড়েছি।

জীবনের শয়নকক্ষে প্রবেশ ক'রে বলে ওঠে তুলসী।

জীবন বলে, একেবারেই হঠাৎ ? কিছুই কি উদ্দেশ্য ছিল না ?

ছিল বৈকি, তোমার বিছানাটা একটু গুছিয়ে দেবো বলে এসেছিলাম।

আর বিছানার মালিক সম্বন্ধে কোন মতলব ছিল না ?

বিছানার মালিক যে বিছানায় ব'সে তা কি ক'রে জানবো ?

তা বৈকি ! বাড়িতে যেন অনেক লোক, আর বাড়িটাও যেন লালকেল্লার মতো প্রকাণ্ড, কোথায় গেল না জানবারই কথা বটে !

না হয় আমাদের গরীবের বাড়িই হ'ল, তা এখানে চোরের মতো লুকিয়ে বসে থাকা কেন ?

পরীক্ষা করছি দারোগা কি রকম কর্তব্যপরায়ণ—চোর ধরতে পারে কি না !

গরীবখানায় চুরি করবার মতো আছেই বা কী ?

আছে কি নেই, তাই তো তল্লাস করছি।

মিলল কিছু ?

এতক্ষণে যেন মিলবে বলে মনে হচ্ছে।

তবে মিলুক, আমি চললাম।

চললাম বলেও চলবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করে না তুলসী।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও না ! বলে একেবারে বিনা ভূমিকায় তুলসীকে টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে জীবন।

ও কি হচ্ছে ? এ তো চোরের মতো ব্যবহার নয়।

নয়ই তো। মাঝে মাঝে চোরে চেপে ধরে দারোগাকে, খবর পাও না ?

আঃ ছাড়ো, লোকে দেখে ফেলবে যে।

মুখে ছাড়ো বললেও অনুরূপ চেষ্টা প্রকাশ পায় না তুলসীর ব্যবহারে।

জীবন বলে, লোকে দেখলে ভয় আছে বৈকি! এমন আনাড়ি দারোগার চাকরিটি যাবে।

এমন ব্যবহার করলে এখনই খবর পাঠাব বখৎ খাঁকে।

খুব ভালো হবে, এবারে আর ভুল করবে না। তুমিও নিষ্কৃতি পাবে আমার হাত থেকে।

আমি কি তাই বলেছি?

বলো নি তো? আচ্ছা তবে চুপ ক'রে থাকো।

আমার খুশী আমি কথা বলবো।

কথা যাতে বলতে না পারো তার ব্যবস্থা করছি।

মধুকর ভারাক্রান্ত তন্ময় পদ্মকোরকের মতো টলমল ক'রে নড়তে থাকে তুলসীর মুখমণ্ডল. ইচ্ছা থাকলেও কথা বলতে পারে না, সত্যই অব্যর্থ ব্যবস্থা জীবনলালের।

অনেকক্ষণ পরে ছাড়া পেয়ে তুলসী বলে, এটা কি হ'ল?

এমন কিছুই নয়, সেদিনকার অসম্পূর্ণ কাজটা আজ সম্পূর্ণ করলাম।

তুমি ভারি বেয়াদব।

নিশ্চয়ই। ফৌজী লোকের আদবকায়দাই কিছু আলাদা।

খাটের উপরে পা ঝুলিয়ে উপবিষ্ট জীবন বাঁ হাতে তুলসীর কোমর জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়েছে কাছে, ডান হাতে তুলে ধরেছে তার মুখখানি, দু'খানি মুখের মধ্যে মৃদু নিশ্বাসের ব্যবধান। তুলসীর চোখ প্রণয়স্তিমিত, শিশিরের ভারে আচ্ছন্ন পদ্মকুঁড়ি, জীবনের চোখ জাগ্রত জ্যোতিষীর মতো সজাগ। জীবন ওর চোখের মধ্যে দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে, যতই ঢুকছে শেষ আর দেখতে পাচ্ছে না, কেবলই খুলে যাচ্ছে একটার পরে একটা গবাক্ষ। প্রিয়জনকে যতই দেখা যায় ততই অধিকতর রহস্যময় হয়ে ওঠে সে। প্রেমের পথ চেনা থেকে অচেনায়।

হঠাৎ দুর্গম বক্ষ-সঙ্কটের দিকে নজর পড়তেই চমকে বলে ওঠে জীবন, এটা কি তোমার গলায়?

চোখে পড়েছে?

হাঁ, হাঁ, খোলো, খোলো, বলে তুলসীর অপেক্ষা না ক'রে হাত চালিয়ে দিয়ে টেনে বের ক'রে ফেলে হারটা—সেই রূপোর শিকলির আগায় সেই সোনার

তক্তি !

বিস্মিত বিমূঢ় বিহ্বল জীবন বলে, এটা এলো কোথা থেকে।

রহস্যময় হাসি হেসে তুলসী বলে, তুমিই বলো তো এলো কোথা থেকে।

সেদিকে কান দেয় না জীবন, নিজের মনেই বলে, দিল্লির পথে গলা থেকে খোয়া গিয়েছিল। হঠাৎ এখানে এসে পৌছলো ! আশ্চর্য ! আশ্চর্য !

শক্ত ক'রে ধরেছে হারটা, যেন আর ফস্‌কে না যায়। তারপরে তক্তিটা চোখের কাছে নিয়ে আর একবার চমকে ওঠে—এই তো লেখা জীবনলাল।

কই, দেখি, দেখি, আমার তো চোখে পড়ে নি।...সত্যিই তো খোদা রয়েছে জীবনলাল। এ যে ইংরেজি অক্ষর।

তুলসীর ইংরেজি অক্ষর পরিচয় ছিল, সামান্যরকম ইংরেজিও জানতো, তবে বই পড়বার মতো নয়।

এই তো লেখা রয়েছে, "২৮শে আগস্ট"! ২৮শে আগস্টই তো আমার জন্মদিন।

তারপরে আবার এক দফা চমকে ওঠে, আজই তো ২৮শে আগস্ট বটে, কালকে ছুটির দরখাস্ত সই করেছি ২৭শে আগস্ট বলে। কি আশ্চর্য, ঠিক জন্মদিনেই তক্তিটা এসে উপস্থিত হ'ল আমার হাতে !

আজ কি তোমার জন্মদিন নাকি ?

উত্তর পায় না।

কিছুই বুঝতে পারে না তুলসী, অবাক হয়ে যায়, শুধোয়—ব্যাপার কি খুলে বলো।

কি ছাই খুলে বলবো, আমিই কি কিছু জানি।

সে বলে যায় লখ্‌নৌ ছাড়বার আগে কাকাবাবু আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, এটি তোমার বাবার শেষ দান। মৃত্যুর আগে তিনি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, এটি সযত্নে রক্ষা করবে আর জন্মদিনে খুলবে।

খুলবে ! কি খুলবে ? এর মধ্যে কিছু আছে নাকি ?

আছে বৈকি, বাবার শেষ নির্দেশের চিঠি।

মুখে বলেন নি কেন ?

আমি থাকতাম কাশীতে, পড়তাম সেখানকার কলেজে, মৃত্যুর আগে দেখা না হ'তে পারে ভেবে লিখে এই তক্তির মধ্যে পুরে রেখে গিয়েছিলেন।

তারপরে বলে যায়, সত্যিই তো দেখা হ'ল না, লিখে না গেলে জানতেই পেতাম না।

রহস্যময় ঠেকে ব্যাপারটা তুলসীর কাছে। পিতা জানাবে পুত্রকে তার মধ্যে রহস্য কেন, ডাকে লিখলেই হ'ত। শুধোয়—কি লিখে রেখে গিয়েছেন?

না খুললে কি ক'রে জানবো।

তবে খোলো।

খুলছি। তুলসী লক্ষ্মীটি, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও, চিঠিখানা পড়ে নিই।

পড়া শেষ হ'লে ডাক দিয়ো।

অবশ্যই ডাকবো।

তুলসী বের হয়ে যেতেই জীবন তক্তিটার উপরে চাপ দেয়, সামান্য একটুখানি চাপ পড়তেই সোনার পাত আলগা হয়ে পড়ে, বের হয়ে আসে ভাঁজ-করা পাতলা কাগজের চিঠি। ব্যগ্র হাতে খুলে ফেলে জীবন, দেখতে পায় আগাগোড়া পিতার পরিচিত ইংরেজি হস্তাক্ষরে পূর্ণ, প্রথমেই আরম্ভ হয়েছে "মাই ডিয়ার জীবন" দিয়ে।

ব্যস্তভাবে চোখ বুলিয়ে পড়তে থাকে সে, যেন এক নিমেষে সবটা গিলে ফেলতে চায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একবার—প্রথমবার—পড়া হয়ে গেল, কিন্তু কিছুই বুঝি বোধগম্য হ'ল না। তখন পর পর আরও তিন-চারবার পড়ে ফেলল, তাতেও বুঝি কিছু বোধগম্য হ'ল না, বরঞ্চ এতদিনে তার কুড়ি বছরের জীবনে যা কিছু বোধগম্য হয়েছে সে-সমস্ত কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। তার মনে হ'ল পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে গিয়েছে, সে যেন এত অতলস্পর্শ শূন্যতার মধ্যে পড়তে শুরু করেছে যে পতনের আর শেষ নেই। দুই হাত দিয়ে কপালের দুই প্রান্ত চেপে ধরে দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে পড়ে সে।

অনেকক্ষণ পরে মনে হ'ল কখন না জানি তুলসী ফিরে আসবে, ডাকবার কথা ছিল তাকে। কিন্তু এখন সে সবচেয়ে বেশি ক'রে এড়িয়ে চলতে চায় তুলসীকেই, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ নিরর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

না, না, ভুল হওয়ার এতটুকু আশা নেই। পিতার উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের বন্ধু সুখানন্দ রায় আর সুখানন্দ পণ্ডিত একই ব্যক্তি, সেই লখনৌ বাসের স্বীকৃতি, সেই কাটা আঙুল—না, না, ভুল হ'তে যাবে কেন? ভগবানের চালে ভুল হ'লেও শয়তানের চালে কখনো ভুল হয় না। সেই সুখানন্দের কন্যা তুলসী! হিন্দুস্থানের বিবাহযোগ্যা সমস্ত নারীর মধ্যে একমাত্র তাকেই বিবাহ করতে পিতার দুর্জয় নিষেধ!

একবার তার মনে হ'ল পিতা বেঁচে থাকলে পায়ে ধরে নিষেধ ফিরিয়ে নিতে

ঘটিত করতো, কিন্তু এখন চরম পরিসমাপ্তির অলঙ্ঘ্য রেখা টানা হয়ে গিয়েছে।

সে ভাবে, অন্তত পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে, ঘটনাগুলো কেমন সাজেগুজে গুছিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তুলসীর সঙ্গে প্রণয়, বিবাহের অনুমতি লাভ, জন্মদিন, এমন সময়ে হারিয়ে-যাওয়া তক্তির অকস্মাৎ আবির্ভাব। সুদক্ষ নাট্যকারের হাতে সন্নিবিষ্ট ঘটনাবলী। কিন্তু কি মর্মান্তিক প্রহসন।

দরজার কাছে তুলসী এসে দাঁড়ায়, কি, ডাকবার নামটি পর্যন্ত নেই, পড়া হ'ল চিঠি?

তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, একি, মুখে কালি ঢেলে দিয়েছে যে।

অসামান্য সংযম-বলে আত্মসম্বরণ ক'রে নিয়ে জীবন বলে, অনেক দিন পরে বাবার চিঠি পড়ে তাঁর মৃত্যুশোক নূতন ক'রে অনুভব করলাম, মুখে কালি ঢেলে দিলে আর বিচিত্র কি?

দাও না পড়ি চিঠিখানা।

টানা হাতের ইংরাজি লেখা বুঝতে পারবে না।

একবার চিঠিখানি নেড়েচেড়ে ফিরিয়ে দেয়, বলে, না, বুঝবার সাধ্য আমার নাই।

এখানে বসে থেকে কি ফল, চলো ও ঘরে দাদা আর পান্নাদি গল্প করছেন সেখানে যাই।

রাতে নামেমাত্র পাতে বসলো জীবন এবং তাড়াতাড়ি ঘরে এসে দরজা দিয়ে শুয়ে পড়লো। একাকী সমস্ত বিষয়টা আলোচনা ক'রে দেখতে চায় কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সে।

মানুষ শয্যাগ্রহণ করে হয় নিদ্রায় নয় চিন্তায়। নিদ্রার সময় আজ নয় জীবনলালের, অকূল চিন্তাসমুদ্রে সে ভাসমান। কার কাছে চিন্তার ভার নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে, কার কাছে পরামর্শ গ্রহণ করবে বুঝতে পারে না। এই কয়েক মাসের মধ্যে কতবার সে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আজকার মতো এমন নিঃসহায় বোধ করে নি। এক-একবার ভাবে সমস্তটাই একটা বীভৎস দুঃস্বপ্ন, হঠাৎ চটকা ভেঙে গিয়ে জেগে উঠে দেখবে সব আগের মতোই চলছে। আবার ভাবে আজ রাতেই যদি অকস্মাৎ জীবনের অবসান ঘটে যায় তবে এই দুর্মোচ্য সমস্যার চমৎকার সমাধান ঘটে। একটি মৃত্যুতে বিরাট দুঃখের অবসান ঘটে যায়। কিন্তু না, তা হওয়ার নয়। মৃত্যু নিজের সময়মতো আসে, মুমূর্ষুর প্রয়োজন অনুসারে নয়। মৃত্যু কারো হাতধরা নয়। আর

দুঃস্বপ্ন। এই যে চারটা নিরেট দেয়াল, মাথার উপরে কড়িবরগার ছাদ, এই সুকোমল শয্যা, তুলসী কখন রেখে গিয়েছে এক মুঠো বকুল ফুল—এ সমস্তই যে স্বপ্ন-পরিকল্পনার পরিপন্থী। সে জাগ্রত এবং সচেতন আর তার সম্মুখে উদ্যতফণা এই আশীবিষ। কি করবে সে ভেবে পায় না।

তার মনে পড়ে গুরবচন সিং-এর কথা। এ অবস্থায় পড়লে, খুব সম্ভব সে হয়তো চিঠিখানা কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে তুলসীকে বিয়ে ক'রে ফেলতো, যেমন ভাবে সমস্ত প্রতিকূলতার সম্মুখে বিয়ে ক'রে ফেলেছিল চন্দ্রিমাকে। না, তেমন তার দ্বারা সম্ভব নয়। মৃত পিতা জীবিত পিতার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। একে একে তার মনে পড়তে থাকে চিঠির বয়ানগুলো।

'তোমাকে ইংরেজিতে লিখছি দেখে বিস্মিত হ'তে পারো। কিন্তু জেনো এমন কথাও থাকতে পারে যা মুখে বলা সম্ভব নয় (সেই জন্যই এতকাল বলি নি) আর মাতৃভাষা যে মুখের ভাষা। যে কথা এখন বলতে যাচ্ছি তার জন্যে একটুখানি আড়ালের আবশ্যক—ইংরাজি ভাষায় আছে সেই আড়াল।'

সে ভাবে সত্যই আড়ালের আবশ্যক আছে। পিতার উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের বৃত্তান্ত পুত্রের কানে না পৌঁছানোই ভালো, তবে নিতান্তই যদি পৌঁছে দিতে হয় তবে ইংরেজির মতো কেতাবী ভাষাই সবচেয়ে প্রশস্ত।

তারপরে একে একে বর্ণিত বিবরণ মনে পড়ে যায়—ঘর অন্ধকার নইলে আর একবার পড়তো, চিঠিখানা জেব থেকে বের ক'রে রেখেছে বালিশের তলায়।

প্রথম যৌবনে নবাব সরকারে চাকরি নিয়ে কাশী থেকে লখনৌ আগমন; একাকী এলো, কাশীতে রয়ে গেল আবাল্য বন্ধু ভৈরব চাটুজ্জে। নিঃসঙ্গ যুবক, অঢেল অর্থ, সরকারী চাকুরির অপ্রতিহত ক্ষমতা, জুটে গেল অনেক বন্ধু, যাদের বন্ধুত্বের পথ লোভনীয় করেছে মদে, রমণীয় করেছে নারীতে, আর স্পৃহণীয় ক'রে তুলেছে শত রকম দুষ্কর্মে।

ভাবতেও লজ্জা করে জীবনের, পিতার দুষ্কৃতি পুত্রের লজ্জা।

এই সময়ে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হয়ে দাঁড়ালো তারই মতো নবাব-সরকারের চাকুরে এক বাঙালী যুবক, সুখানন্দ বসু রায়। দুজনেই অবিবাহিত, অভিভাবকহীন আর সুখান্বেষী। তারা হয়ে দাঁড়ালো দিবারাত্রির সঙ্গী। এই বন্ধুত্ব তাদের কাছে এমন অলঙ্ঘ্য মনে হ'ল যে, তাকে চিরস্থায়ী করবার উপায় সন্ধান করতে লাগলো। অবশেষে একদিন লখনৌ শহরের কালীবাড়ীতে গিয়ে দেবীর চরণ শপথ ক'রে তারা প্রতিজ্ঞা করলো যে তাদের পুত্র ও কন্যা যদি জন্মগ্রহণ করে

তবে তাদের বিবাহ দেবে—আর প্রতিশ্রুতি রক্তের অক্ষরে লিখে বেলপাতাটি সমর্পণ করলো দেবীর পায়ের উপরে।

বারংবার পড়ে সমস্ত মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল জীবনের।

'এসব কথা কোনদিন জানাই নি, তখনো নয়, তারপরেও নয়, আমার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ভৈরবকে। তাকে যদি জানাতাম তবে এই চিঠি লিখবার প্রয়োজন হ'ত না, তার মুখ দিয়েই তোমাকে বলাতে পারতাম, আর জানি যে তার কথা আমার কথার মতোই সমান ওজনের তোমার কাছে।'

জীবনের মনে পড়তে থাকে, 'আমি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলেও পাপ করি নি কখনো কিন্তু ঐ পাষণ্ড সুখানন্দ যে শুধু উচ্ছৃঙ্খল নয়, পাপিষ্ঠ—এ খবর আমিও রাখতাম না। যখনি জানতে পারলাম তখনি তার সঙ্গ পরিত্যাগ করলাম, তবে তার আবশ্যক ছিল না, তারপরে সেই যে সে লখনৌ পরিত্যাগ করলো অদ্যাবধি আর তার খবর পাই নি।

'এই সময়ে অমর সিং বলে নবাবের এক তহশীলদার নিহত হ'ল। সরকার পক্ষ রটনা করলো মৃত্যুটা আত্মহত্যা। কিন্তু সংকারের সময়ে আবিষ্কৃত হ'ল তার মুখের মধ্যে দুটো ছিন্ন অঙ্গুলির অংশ। পরদিন দেখলাম সুখানন্দর হাতে দুটো আঙুলের আগা নেই। কী ভীষণ যোগাযোগ! সে অবশ্য অনেক বাজে অজুহাত দেখালো কিন্তু আমি হলাম নিঃসন্দেহ—সুখানন্দই অমর সিং-এর হত্যাকারী। শহরের লোকেও বুঝলো, কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই, সুখানন্দ নবাবের আশ্রিত। তবে সে একঘরে হয়ে পড়লো। তখন অপমানে ও লজ্জায় একদিন নিরুদ্দেশ হ'ল। আজ কোথায় আছে, কেমন আছে, আদৌ আছে কি না জানি না, জানবার প্রয়োজনও অনুভব করি না।'

তারপরেই সেই ভীষণ অনুজ্ঞা।

এমন সময়ে তার কান শুনতে পায় দূরে বাজছে ঘড়ি। এক, দুই, তিন। আর বাজে না। চমকে উঠে ভাবে, এ কি তিনটা বাজলো, রাত যে শেষ হয়ে গেল। ঘড়ির আওয়াজ শুনে ভেবেছিল এগারোটা কি বারোটা হবে। একেবারে তিনটা। সারাটা রাত সেই চিঠির ছত্রে ছত্রে ঘুরে মরেছে—তবু শেষ হয় নি, এখানো বাকি ভীষণতম অনুজ্ঞাটি।

তার মনে পড়ে, 'পিতার শপথ গিয়ে বর্তায় পুত্রে, কাজেই ধর্মত তুমি সুখানন্দের কন্যাকে (যদি কখনো তেমন সম্ভাবনা উপস্থিত হয়) বিবাহ করতে বাধ্য। তবে পিতা যদি শপথের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয় তবে আর দায় থাকে না পুত্রের। আমি তোমাকে শপথের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিলাম আর শুধু তাই

নয়, তোমার প্রতি আমার অন্তিম অনুজ্ঞা রইলো, মুমূর্ষু পিতার শেষ আদেশ—যখন এ চিঠি তুমি পড়বে তখন আমি মৃত,—কখনো বিয়ে করবে না সুখানন্দর কন্যাকে—কখনো নয়, কখনো নয়, কখনো নয়।'

পিতার নিষেধ জীবনের মাথার মধ্যে হাতুড়ি ঠুকতে থাকে, জোর আঘাতে অনুজ্ঞার গজালগুলো বসিয়ে দিতে থাকে তার মগজের মধ্যে, তার অস্তিত্বের মধ্যে।

'জীবন, এ দুনিয়া প্রকাণ্ড। সুখানন্দ কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না, তার বিবাহযোগ্য কন্যা আছে কি না তাও অনিশ্চিত, কাজেই খুব সম্ভব এমন অনুজ্ঞার আবশ্যক ছিল না। কিন্তু হাজারকরা একবারও তো অসম্ভব সম্ভব হ'তে পারে, কাজেই নিষেধ যে একেবারে অনাবশ্যক তা নয়। কেন নিষেধ করলাম খুলেই বলি। নরহত্যাকারী মহাপাপীর রক্ত বহন করছে যে বালিকা, সে নিজে নিষ্পাপ হ'লেও রক্তের অভিশাপ তাতে বর্তাবেই। তেমন মেয়ে কখনো ঘরে আনবে না, বাবা।

'তুমি ভাবতে পারো এমন জরুরী কথা এতকাল বলি নি কেন? এসব কথা কি বাপ হয়ে ছেলেকে বলতে ভালো লাগে—নিজের উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের কথা? তাই অশুভস্য কালহরণ করেছি—তা ছাড়া বেঁচেই তো আছি, বিয়ে তো আমিই দেবো—তাড়াহুড়ো ক'রে বলবার প্রয়োজন অনুভব করি নি। কিন্তু কিছুদিন হ'ল মৃত্যুর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, হয়তো শেষ সময়ে দেখা হবে না, আমি থাকি লখনৌ, তুমি থাকো কাশীতে, কিম্বা দেখা হ'লেও কথাগুলো গলায় বেধে যেতে পারে—তাই লিখে কবচে ভ'রে ভৈরবের জিম্মা ক'রে দিলাম—একুশে পদার্পণের জন্মতারিখে খুলে পড়বার অনুরোধ জানিয়ে। একুশে পড়বার আগে তোমাকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছিলাম সে কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। যাক্, আমার কথা শেষ হ'ল, এবারে কর্তব্য পালনের ইতিহাস আরম্ভ হবে। আমার হাতে আর বেশি সময় নেই, তোমার হাতে সময় অক্ষয় হোক। আশীর্বাদক বাবা।'

একটা অক্ষরও তার মন থেকে খ'সে পড়ে যায় নি, বরঞ্চ এই কয় ঘণ্টার মানসিক আবৃত্তিতে চিঠির লেখার চেয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে মনের স্মৃতি।

জীবন স্থির ক'রে ফেলেছে, এ বিবাহ সে করবে না। কিন্তু নিষ্কৃতির পথ কি? পালিয়ে চলে যাবে? না, বিনা ভূমিকায় পালিয়ে যাওয়া চলে না। তবে জানাবে কাকে? তুলসীকে কিছুতেই এমন কথা সে বলতে পারে না, সুখানন্দকেও বলা কঠিন, উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের কথা, নরহত্যার কথা কেমন ক'রে

বলবে বুড়ো মানুষের মুখের উপরে। নয়নের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা হয় নি।
তখনি মনে পড়ে পান্নার সঙ্গে পরামর্শ করা যেতে পারে—সংসারে একমাত্র তার সঙ্গেই পরামর্শ করা যেতে পারে। কিন্তু সে সুযোগ কি পাওয়া যাবে? পান্নাকে নিরিবিলি পাওয়ার উপায় কি?

এমন সময়ে দরজায় ঘা পড়ে, ওঠো, ওঠো।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেয়—ভোরের আলোয় বাড়ি ভ'রে গিয়েছে।

তুলসী বলে, এ কি, তোমার মুখ-চোখ এমন শুকনো কেন?

রাতে বড় গরম ছিল, ভালো ঘুম হয় নি।—ভালো ক'রে তাকাতে পারে না তুলসীর মুখের দিকে।

মাটির দিকে তাকিয়ে শুধোয়, এত ভোরে তোমরা চললে কোথায়?

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল নয়নচাঁদ।

আজ মীর্জা গালিব সাহেবের জন্মদিন। বাবা, দাদা, আমি চললাম তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে, প্রত্যেক বৎসর যাই কিনা।

কখন ফিরবে?

দুপুরের আগেই ফিরবো। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও, ভুতি বুড়ী রইলো, কোন অসুবিধা হবে না।

না, কিছু অসুবিধা হবে না, তোমরা এগোও।

তারা বের হয়ে যেতেই চট্ ক'রে হাত-মুখ ধুয়ে ডাক দেয়, পান্না, একবার এসো তো।

কি হ'ল জীবন ভাই?

এসো, গুরুতর কথা আছে। বলে পান্নাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়।

॥ ৭ ॥

পান্নার পরামর্শ

দরজা বন্ধ করলে কেন?

সে কথার উত্তর দেয় না জীবন। তার বদলে সরাসরি প্রসঙ্গে গিয়ে পড়ে, বলে, পান্না, আমার সেই হারানো তক্তি পাওয়া গিয়েছে।

ছাউনিতে দেখা হওয়ার পরে তক্তি হারাবার কথা বলেছিল জীবন।

পান্না শুনে বলেছিল, আহা, তোমার বাবার শেষ নির্দেশ কি ছিল জানতে

পারলে না!

কি আর হবে বলো। তবে আশা করছি অন্তিম আশীর্বাদ ছাড়া আর কি এমন থাকবে তাতে।

তা কি বলা যায়? শুধু আশীর্বাদের জন্য এত সতর্কতা কেন অবলম্বন করবেন। আমার কি মনে হয় জানো জীবন, গুরুতর কোন রহস্য ছিল তক্তিটার মধ্যে।

যদিই বা থাকে তবে চিরকালের জন্য তা রয়ে গেল রহস্যময়।

পান্না সংক্ষেপে বলেছিল, তা বটে।

এখন সেই হারানো তক্তি পাওয়ার সংবাদে কৌতূহলী হয়ে ওঠে পান্না, শুধোয়, কি ক'রে পাওয়া গেল?

সেও এক রহস্য, সব কথা না হয় পরে শুনো,—বলে বালিশের তলা থেকে চিঠিখানা বের করে।

চিঠি এলো কোথা থেকে?

ঐ তক্তির মধ্যে ছিল।

তখনি জানতাম, নিশ্চয় কোন গুরুতর কথা আছে।

সে কথা যে কতখানি গুরুতর কল্পনাও করতে পারবে না।

তারপরে জিজ্ঞাসা করে, তুমি তো টানা হাতের ইংরেজি লেখা পড়তে পারো।

পান্না বলে, আমার ইংরেজ ভক্তদের কৃপায় সবই শিখতে হয়েছে, পড়তে পারি বৈকি।

তবে নাও পড়ো, পড়া শেষ না হ'লে কোন মন্তব্য ক'রো না।

বলে এগিয়ে দেয় চিঠিখানা। পান্না পড়তে শুরু করে। জীবন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে পান্নার, তারপরে পড়া শেষ হ'লে, তখন মুখে সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠেছে, বলে, এখন!

আর কিছু বলতে পারে না। আর বলবার আছেই বা কী।,

বাবার নির্দেশ পালন করতে হবে। তার কি পথ আছে বলো।

অবশ্যই পালন করতে হবে, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তো বাদানুবাদ চলে না, তবে তুলসীর প্রতিও তো একটা কর্তব্য আছে।

দুটো কর্তব্য একসঙ্গে হ'তে পারে না।

কেন পারে না, জীবন?

এই জন্যে পারে না যে জীবিত ব্যক্তির সঙ্গে বাদানুবাদ চলে।

তুমি কি এ বিষয়ে তুলসীর সঙ্গে বাদানুবাদ করবে নাকি? তাকে বলেছ

বলে তো মনে হয় না।

না বলি নি, আর বাদানুবাদও করতে পারবো না।

কেন পারবে না?

তা হ'লে তাকে জানাতে হবে যে তার পিতা নরঘাতক।

সে কি ক'রে বলা যায় কন্যাকে।

তারপরে ক্ষীণ আশার রশ্মি যেন দেখতে পায়, শুধোয়, তুমি কি নিশ্চিত যে সুখানন্দ পণ্ডিতই সেই সুখানন্দ বসু রায়।

নিশ্চিতের চেয়ে নিশ্চিত। পালাবার পথ নেই পান্না। চতুর শিকারীর মতো অদৃষ্ট পথ-ঘাট বন্ধ ক'রে আমাকে চেপে ধরেছে—এখন একমাত্র উপায় আত্মসমর্পণ।

কার কাছে?

অদৃষ্টের কাছে।

কিন্তু তুলসী!

বারে বারে তুলসীর উল্লেখ ক'রো না পান্না। এ ক'মাসের মধ্যে অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি—সত্যি বলছি, ভয় পাই নি। কিন্তু আজ সাহস পাচ্ছি না তুলসীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে, দৈবের আঘাতে আমার হাড়-পাঁজরা ভেঙে গিয়েছে।

কিন্তু কিভাবে কথাটা প্রকাশ করবে?

সেই পরামর্শের জন্যই তো তোমাকে ডাকা। আজ সকালবেলায় এই সুযোগটুকু মিলবে ভাবি নি, ওদের ফিরতে এখনো কিছু বিলম্ব আছে। বলো, কিভাবে এগোই, কাকে বলি।

তুলসীকে বলা চলতে পারে না, নয়নচাঁদকেও নয়।

তবে?

এসব ব্যাপারে ঘোরপ্যাঁচ করতে গেলেই সঙ্কট বাড়ে। সরাসরি বলতে হবে পণ্ডিতজীকে, তারপরে তিনি যেমন ক'রে পারেন প্রকাশ করবেন ছেলে-মেয়ের কাছে।

কিন্তু পান্না, কি ক'রে আমি ঐ বুড়ো মানুষকে বলি যে, আপনি নরঘাতক, পারবো না আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে।

মুখে বলবার প্রয়োজন নেই, চিঠিখানা দাও তাঁর হাতে।

তুলসীর মন যে একেবারে ভেঙে পড়বে।

তুমি কি করবে বলো? দৈব যে সেই-ভাবেই রঙ্গমঞ্চে ঘটনার সন্নিবেশ

করেছেন। ভবিতব্য তোমার হাতেও নয়, তার হাতেও নয়—সত্য কথা বলতে কি, মানুষের হাতের বাইরে গিয়ে পড়েছে এখন।

পান্না, তুমি কি পাথরে তৈরী? মনে হচ্ছে তুমি যেন সেই দৈবের মুখপাত্রী।

ভাই, পান্না হচ্ছে জল ছাঁকবার কলসীতে বালুর স্তর। তার ভিতর দিয়ে জল গ'লে গিয়ে বিশুদ্ধ পানীয় হয়ে ওঠে, কিন্তু তার শুষ্কতা কিছুতেই ঘোচে না। আগেও যে বালু, পরেও সেই বালু। চিরকাল শুষ্ক আর নীরস।

উত্তর দেয় না জীবন।

পান্না বলে, এর পরে তুমি কি করবে?

শীঘ্রই দিল্লি দখলের লড়াই শুরু হবে, তখন মরবার সুযোগ পাবো।

জীবন, তুমি এতবার নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে গিয়েছ, এবারেও মৃত্যু তোমার কাছে ঘেঁষবে না।

তা বটে। হতভাগ্যের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, মৃত্যুর সুলভ সমাধান তার জন্যে নয়।

তারপরে বলে, জানো পান্না, রাতের বেলায় একবার ভেবেছিলাম, কাউকে না বলে অন্ধকারে স'রে পড়ি।

সেটা ঘোরতর অন্যায় হ'ত।

কিন্তু বলে ক'য়ে স'রে পড়াও যে ঘোরতর কঠিন।

অবশ্যই কঠিন কিন্তু তার জন্যে কি তুমি দায়ী। ধর্মের গোয়েন্দা এতকাল পরে পাপীকে যদি খুঁজে বের করে, সে দায় কি তোমার?

সে দায় কি তুলসীর?

নরঘাতকের কন্যা হিসাবে খানিকটা বৈকি। জীবন, তুমি এবং তুলসী দুজনেই নিজ নিজ পিতার দায় বহন করছ। দায় তোমাদের, যদিচ দায়িত্ব নয়।

ব্যাকুলভাবে জীবন শুধোয়, এমন কেন হয় ভাই?

কেমন ক'রে বলবো জীবন, তবে দেখছি যে হয়। পাপের আগুনে শুধু পাপীকে নয় তার পরিবেশকেও দগ্ধ করে। পিতার পাপরক্তের ধারা বেয়ে নেমে আসে পুত্রপৌত্র কন্যা-দৌহিত্রে। রাজার দণ্ডে আর ধর্মের দণ্ডে এইখানে প্রভেদ।

বাইরে শব্দ শুনে পান্না বলে ওঠে, ঐ যে পণ্ডিতজীর গলা। ওরা বোধ হয় ফিরলো।

যাও না, দেখে এসো, আজ তুলসীকে আমার সবচেয়ে ভয়।

পান্না দরজা খুলে বের হয়ে যায়। পণ্ডিতজীর সঙ্গে তার কথাবার্তা চলে, ভিতরে বসে শুনতে পায় জীবন।

আপনি ফিরে এলেন কাকাবাবু, ওরা কোথায়?

ওরা খাওয়া-দাওয়া সেরে সন্ধ্যাবেলায় ফিরবে। আমি এখন আর বাইরে কোথাও খাই নে। জীবনলাল কোথায়?

কাল সারারাত গরমে ঘুমোতে পারে নি, এখন বিশ্রাম করছে।

হাঁ, কাল রাতে গরম পড়েছিল বটে। আচ্ছা, এখন বিশ্রাম করুক, বিকাল-বেলায় হারানো দিনের গল্প করবো তার সঙ্গে। তুমি ভালো আছো তো মা?

ভালো আছি বৈকি কাকাবাবু।

পান্না ফিরে এসে বলে, এই সুযোগ, ওরা বাইরে আছে, খাওয়ার পরে পণ্ডিতজীর হাতে চিঠিখানা দিলেই হবে।

জীবন উত্তর দেয় না, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

পান্না বলে, তক্তিটা কি ক'রে ফিরে পেলে বললে না তো?

চমকে ওঠে জীবন, বলি নি?

কখন বললে?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, তবে শোন, পাপের ব্রহ্মাস্ত্রের মতো খুঁজে বের করেছে আমাকে—হারিয়ে গিয়েও হারায় নি, ঠিক সময়টি বুঝে ফিরে এসেছে।

তারপরে হারানো প্রাপ্তির ইতিহাস বর্ণনা ক'রে যায়, ধীরে ধীরে, একটার পরে একটা গ্রন্থি উন্মোচন করতে করতে।

সমস্ত এক মনে শুনে পান্না বলে ওঠে, রুমালী যে এর মধ্যে এত সব কাণ্ড ঘটিয়েছে তা বলো নি কেন?

বলবো ভেবেছিলাম কিন্তু সময় পেলাম কই? যেদিন গিয়েছি তার পরদিন ভোরবেলাতেই তোমাকে নিয়ে রওনা হয়েছি। এই প্রথম সুযোগ পেলাম তোমার সঙ্গে একটু নিরিবিলি কথা বলবার।

তারপরে শুধোয়, রুমালী হঠাৎ এমন করতে গেল কেন বলতে পারো?

এ তো খুব সরল। দুধ টকে দই হয়ে গিয়েছে। তোমার উপরে ওর যে ভালোবাসা ছিল তা এখন ঘোরতর বিদ্বেষে পরিণত।

বলো কি?

ঠিকই বলছি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ঐ তক্তি ওর হাতে আসবার পরে তোমার নামটি খোদিত দেখতে পেয়ে কৌতূহলের তাড়ায় সেটা খুলে ফেলে চিঠিখানা পড়েছে। তখনি বুঝতে পেরেছে লখনৌর সুখানন্দ রায় আর দিল্লির সুখানন্দ পণ্ডিত একই ব্যক্তি। কাজেই তুলসীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'তে

পারবে না। তারপরে ওটা আবার তক্তির মধ্যে ভ'রে উপহার দিয়ে গিয়েছে তুলসীকে। জানে যে তোমার চোখে পড়লে তক্তি খুলে তুমি চিঠিখানা পড়বে।

এতক্ষণে ঘটনার কার্যকারণ পরিষ্কার হয়ে যায় জীবনের কাছে, বলে ওঠে, রুমালী একটি শয়তানী।

ছাখো জীবন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ছোট্ট একটি শয়তানের বাস। অধিকাংশ সময় সেটা চাপা পড়ে থাকে—তবে যখনি সুযোগ পায় শুরু ক'রে দেয় তার কার্যকলাপ। শয়তান আর দেবতা মানুষের হৃদয়ের মধ্যে নিকটতম প্রতিবেশী।

একটু পরে আবার :

কিন্তু আমি ভাবছি কি জানো, রুমালীর বাড়িতে যাওয়ার পথ বন্ধ হ'ল।

হঠাৎ সেখানে যেতে যাবো কেন ?

এখানে যেমন ঘটনার ঘনঘটা ঘনীভূত হয়ে উঠছে, বেশিক্ষণ যে আর এখানে থাকতে পারবে মনে হয় না, রুমালী আগের মতো থাকলে সেখানে যেতে পারতে।

না, এখন আর তা সম্ভব নয়, বলে জীবন। ছাউনিতেই চলে যাই না কেন ?

না, শেষ না দেখে যেতে পারবে না। জীবনভাই, অদৃষ্টের কাছ থেকে পালাবার পথ নেই।

তবে ?

আজ কি নাওয়া-খাওয়া হবে নি দিদিমণি ?—ভূতি বুড়ীর গলা।

আসছি, আসছি। বলে ওঠে পান্না, জীবনের উদ্দেশ্যে বলে, নাও, উঠে স্নান ক'রে খাওয়া সেরে নাও।

এর পরেও খাওয়া গলা দিয়ে কি নামবে ?

প্রয়োজন-মতো অভিনয় করতে পারে বলেই দুঃখের সংসারে মানুষ আজও টিকে আছে—বলতে বলতে বের হয়ে যায় পান্না।

॥ ৮ ॥

অতীতের প্রেত

নিঃসঙ্গ সুখানন্দ পণ্ডিত বন্ধ ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধভাবে বসে আছে। ঘণ্টাখানেক আগে জীবনলাল যখন হঠাৎ ঘরে ঢুকে চিঠিখানা হাতে দেয়—দিয়েই যেমন এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে যায়, 'জীবনলাল, এ কার চিঠি, ব্যাপার কি', কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে নি,—তখন থেকেই পণ্ডিতজী ঠায় একভাবে বসে আছে। না, চিঠিখানার উপরে চোখ বুলিয়ে চমকে উঠে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল, কিন্তু তারপরে আর আসন পরিত্যাগ করে নি। ভাঁজ-খোলা চিঠিখানা চারপাইয়ের উপরে পড়ে আছে আর সেইদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে—মন্ত্রমুগ্ধ দর্দুর যেভাবে উদ্যত-ফণা বিষধরের দিকে চেয়ে থাকে —বসে আছে সুখানন্দ পণ্ডিত।

জীবনের হাত থেকে চিঠিখানা পেয়ে প্রথমে গুরুত্ব বুঝতে পারে নি, ভেবেছিল ভাবী জামাই বোধ করি কিছু দাবী জানিয়েছে, লজ্জায় মুখে বলা সম্ভব হয় নি তাই পত্রাকারে লিখেছে। তাই স্নেহ কৌতূহলবশে চিঠিখানা তুলে নিয়েছিল হাতে, কিন্তু চিঠির সম্ভাষণ দেখেই চমকে উঠল, এক নিমেষে দৃষ্টি চলে গেল পত্রের শেষে লেখকের নামের দিকে, নামটি দেখবামাত্র মনে হ'ল চারপাইখানা কাঁপছে, ঘরের দেওয়াল ছাদ কড়িকাট সব যেন কেমন আলগা হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ লাগলো মনটাকে শক্ত ক'রে নিতে, তারপরে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলল চিঠিখানা, কতক বোধগম্য হ'ল, কতক হ'ল না, কিন্তু যেটুকু হ'ল তাতেই বুঝলো তার পৃথিবী দ্বিধা হয়ে গিয়েছে—এখন বিধাতা দয়া ক'রে ভূগর্ভে টেনে নিলেই সে বেঁচে যায়। সে ভাবলো চিঠিখানা আর পড়বে না, যা পড়েছে তাই কি যথেষ্ট নয়? কিন্তু ভয়ের একটা নিদারুণ আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণ তাকে বাধ্য করলো চিঠিখানা বারে বারে পড়তে, সাকুল্য পড়তে, আদ্যন্ত পড়তে। দৈবের গ্রন্থিতে কোথাও একটুকু ফাঁক নেই যে পালাবে। তখন নিরুপায় হয়ে মূঢ়ের মতো গালে হাত দিয়ে বসে রইলো, সম্মুখে পড়ে রইলো উদ্যত-ফণা বিষধর পত্রখানা।

বিষম অভিঘাতে মনটা তার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে সত্য, তাই বলে স্মৃতি তো লোপ পায় নি। স্মৃতির পর্দার উপরে পঞ্চাশ বছর আগেকার উন্মত্ত জীবনের ছায়াছবির শোভাযাত্রা প্রবহমান। সে যেন নিস্পৃহ, নিরীহ, নির্বিকার দর্শক,

যেন আর একজন লোক, যেন যোগ নেই এই স্মৃতির-প্রবাহের সঙ্গে। যোগ না থাকলেই বোধ করি ভালো হ'ত, তাই বা বলি কি ক'রে, তাহ'লে কি এমন আকর্ষণ অনুভব করতো এই মারাত্মক লীলার প্রতি।

হাতে অঢেল টাকা, অভিভাবকহীন নবীন যৌবন, তার উপরে কলির সন্ধ্যার আভায় মনোরম লখনৌ শহর; সঙ্গীরও অভাব নাই, সঙ্গেরও অভাব নাই। এমন সময় সমবয়স্ক নবীন এসে জুটলো। তাকে দলে টানতে প্রথমে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল, তার গোড়াপত্তনটা কলকাতায় কিনা। নবীনের উপরে আবার পড়েছে কাশীর শিক্ষা-দীক্ষার পবিত্র পলিমাটি। আর এদিকে সুখানন্দরা দুই পুরুষ লখনৌর অধিবাসী, না পেয়েছে ইংরেজি শিক্ষা, না পেয়েছে শাস্ত্রীয় দীক্ষা। ষোল আনা লখনৌবালা। আর ষোল আনা লখনৌবালা মানেই বারো আনা শয়তান। তবু শেষ পর্যন্ত নবীন এলো দলে। আসতেই হবে, দেব-দানবের যুদ্ধে প্রথম কিস্তিতে সর্বদাই দানবের জয় হয়ে থাকে।

অবশ্য নবীনের টাকা নেই, কিন্তু তাতে কি আসে যায়! উচ্ছৃঙ্খলতার কর্মসূচীতে টাকার হিসাব কেউ তোলে না। চাল কেনবার জন্যে যে টাকা ধার দিতে নারাজ, মদের খরচের বেলায় তার উদারতার অন্ত থাকে না।

লখনৌ শহরের বাঙালী মহলে অল্পদিনেই রটে গেল সুখানন্দ আর নবীন রাম লক্ষণ, যদিচ পৌরাণিক কীর্তির প্রভাব বড় দেখা যায় না তাদের কার্যকলাপে। দেখতে দেখতে বেশ জমে উঠল। আর দিনগুলো রজত-খণ্ডের চাকায় আর রাতগুলো মদিরা-স্রোতের বেগে পিচ্ছিল মসৃণ পথে বড় আনন্দে বড় বেগে ছুটে চলল। তাদের মনে হ'ল এ বন্ধুত্বের মতো ধ্রুব আর অচ্ছেদ্য জগতে বুঝি কিছু নেই। তাই বন্ধুত্বকে উত্তর পুরুষের মধ্যে স্থায়িত্ব দেবার আশায় দুজনে কালীবাড়িতে গিয়ে মায়ের চরণ স্পর্শ ক'রে শপথ করলো, বেলপাতায় বুকের রক্তে লিখে মায়ের চরণে সমর্পণ করলো, তাদের ছেলেমেয়ে হ'লে বিবাহ দেবে। বাধা ছিল না, দুজনেই স্বজাতি।

সুখানন্দ দেখে আর ভাবে পঞ্চাশ বছরের পুরনো ছবির উপরে কোথাও এতটুকু ধুলো জমে নি, ছবির পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য এতটুকু লোপ পায় নি। সমস্ত কেমন সাপের ফণার মতো ভীষণ উজ্জ্বল।

ক্রমে টাকায় টানাটানি দেখা যায়। রজত-চক্রযানে নিম্নমুখে যার গতি একাকী সে তো অধঃপাতে যায় না, সঙ্গে টাকাও যায়। তখন নবাব তহশীলে কাজ নেয় সুখানন্দ। টানতে চেষ্টা করে নবীনকে, বলে, তুমিও এসো। রেসিডেন্সিতে এত পরিশ্রম ক'রে সামান্য ক'টা টাকা পাও, আর এখানে বিন

পরিশ্রমে অজেল টাকা, চলে এসো।

নবীন বলে, না ভাই, ঐটি পারছি নে, আমার গুরু ডেবিড হেয়ার সাহেব বিদায়কালে বলে দিয়েছিলেন—নবীন, যদি চাকরি করতেই হয় ইংরেজের কাছে চাকরি করবে আর কখনো দেশীয় রাজাদের সরকারে চাকুরি করবে না। না ভাই, হেয়ার সাহেবের উপদেশ অমান্ত করতে পারবো না।

সুখানন্দ বোঝে, নবীনের চরিত্রে ইংরেজি শিক্ষার বনিয়াদটাই যত গোল বাধিয়েছে—তাই একটুখানি দূরত্ব রয়ে যাচ্ছে দুই বন্ধুর মধ্যে। কিন্তু ঐ একটুখানি যে কতখানি তা নিজেও জানতো না। নবাবের তহ্‌শীলে কাজ করা মানে নরকের বড় রাস্তার রাহী হওয়া, যে রাস্তাটা নাকি রাহাজানি, ঘরজ্বালানি, তহবিল তছরূপ, নারীহরণ, গুমখুন এবং প্রকাশ্য নরহত্যা দিয়ে তৈরি। এখন তার গা শিউরে ওঠে, তখন কিছু বুঝতে পারে নি। যথার্থ বিপদ চলে গেলে তবেই বুঝতে পারা যায় তার ভয়াবহতা।

কেমন ক'রে যে অমর সিং-এর হত্যাকাণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে পড়লো জানে না, সে যে সবচেয়ে বড় অপরাধী ছিল তা নয়, কিন্তু তার দেহে ও মনেও রেখে গেল সবচেয়ে বড় ক্ষতির চিহ্ন। ডান হাতের ছিন্ন আঙুল দুটো তার জীবনের গতি পরিবর্তনের কারণ হয়ে দেখা দিল।

কেউ বিশ্বাস করলো না তার কথা যে, মারামারিতে কাটা গিয়েছে, সকলেই মনে মনে বুঝলো অমর সিং-এর মুখের মধ্যে আঙুলের যে দুটো ডগা পাওয়া গিয়েছে তা কার! মুখে কেউ কিছু বলল না, সুখানন্দ নবাবের আশ্রিত। লখনৌ-এর বাঙালী সমাজে, হিন্দুস্থানী সমাজেও একঘরে হয়ে পড়লো সে। সে কি শুধু ঘৃণায়? হত্যাকারীকে মানুষের বড় ভয়।

শেষ আঘাত এলো নবীনের কাছে থেকে। নবীন বলল, ব্যস, তোমার আমার সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল—এই বলে তার মুখের সামনে দড়াম্‌ ক'রে দরজা দিল বন্ধ ক'রে।

তখন কি সে বুঝতে পেরেছিল সম্বন্ধ শেষ বলতে কতদূর কি বোঝায়? তার সঙ্কল্প যে ভবিষ্যতের উপরেও বাঁশগাড়ি করেছে, তার প্রমাণ ঐ তো সম্মুখে পড়ে আছে চিঠিখানা।

ঐ চিঠিখানা চোখে পড়বামাত্র মনটা চলে আসে অতীত থেকে বর্তমানে। না বিয়েটা শুধু ভেঙে গেল তা নয়—ঐ বিয়ে ভাঙার কারণ যোগাতে গিয়ে ছেলেমেয়ের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়বে তার নরঘাতক পরিচয়। শিউরে ওঠে সে।

দেয়ালে টাঙানো ছিল গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের ছবি, তুলসীর হাতে আঁকা। উঠে গিয়ে দাঁড়ায় শ্যামসুন্দরের সম্মুখে। ঠাকুর, কত দুঃখ ভোগ, কত চোখের জল, কত অনুশোচনা লাগে একটা পাপের প্রায়শ্চিত্তে! তারপরেও যদি কিছু বাকি থাকে সেটুকু তুমি মার্জনা ক'রে দিয়ে থাক বলে শুনতে পাই।

এখন মনে মনে নয়, প্রায় মৃদুস্বরে বলে যায়—চোখের জলের ধারা সমান্তরালে ঝরতে থাকে—ঠাকুর, পঞ্চাশ বছর, পঞ্চাশ বছরেও কি প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নি? ঐ ছিন্ন আঙুলের প্রমাণ লুকোবার জন্য সারা হিন্দুস্থান ঘুরে বেড়িয়েছি, চাল নেই, চুলো নেই, আপনার বলতে কেউ নেই। হাটে গঞ্জে নগরে গ্রামে সকলের মুখেই ঐ এক প্রশ্ন, আঙুল কাটা গেল কি রকমে? মনে হ'ত সবাই জানতে পেরেছে অমর সিং-এর মৃত্যুর বিবরণ। কোথাও শান্তি নেই, কোথাও স্থিতি নেই, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে, এক শহর থেকে অন্য শহরে। এখনো কি শেষ হয় নি প্রায়শ্চিত্ত? ঠাকুর, তোমার দেহের মতো মনটাও কি পাথরে গড়া! পাথরেও তো থাকে ঝরণা। 'ঠাকুর, ঠাকুর, ঠাকুর!' বলে দেওয়ালে মাথা কুটতে থাকে প্রায়োন্মাদ বৃদ্ধ!

আবার এসে বসে বিছানায়, সোজা হয়ে বসে থাকতে পারে না, তাকিয়ায় ঠেস দিতেই চোখ পড়ে কড়িকাঠের দিকে।

ছাদের দিকে তাকাতেই মনটা চলে যায় ছাদের গড়ন আর কড়ি-বরগার বিন্যাসের মধ্যে। তার চোখে পড়ে নিচু ছাদটা চৌকো পাথরের টালি দিয়ে গড়া, প্রত্যেকটার সীমানা ফেটে যাওয়ায় আয়তন বেশ বুঝতে পারা যায়, ঘন ঘন কড়ি-বরগা না থাকলে বোধ করি পাথরের টুকরোগুলো খুলে পড়ে যেতো। সে ভাবে কড়ি-বরগাগুলো শাল কাঠেরই হবে। শালবন তো কাছকাছি নেই, তবে বুঝি পাহাড় থেকে কেটে যমুনা দিয়ে ভাসিয়ে এনেছিল। নিশ্চয়ই তাই। পাহাড়ী শাল ছাড়া এমন মজবুত হ'তেই পারে না, কত বড় বাড়িটাকে সে অনায়াসে ধরে রেখেছে। হাঁ, পাহাড়ী শাল বৈকি। হিমালয়ের দক্ষিণে আগাগোড়া শালের অরণ্য, পশ্চিম থেকে পূর্ব সীমান্ত অবধি। নিজের মনেই সে বলতে থাকে, শাল গাছ দেখেছিলাম বটে, একটা হ'লেই জাহাজের মাস্তুল তৈরি করা যায়, নৈনিতালের চারদিকে। নৈনিতাল···হলদোয়ানি···কাশীপুর—রামপুর···চারপুরা···বহেড়ি,—বেরিলি···। হঠাৎ জাহাজ ধাক্কা খায় চোরা পাহাড়ে, আগাগোড়া থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে। কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছে, ছাদের কড়ি-বরগা থেকে বেরিলি। তখন আর ফিরবার উপায় নেই, স্মৃতির টানে, স্রোতের টানে ঘা-খাওয়া জাহাজ এগিয়ে চলে, ফুটো দিয়ে গলগল

ক'রে জল ঢুকছে। বেরিলি···বহেড়ি···মহাদেওপুর।

ঘুরে ফিরে বার বার উচ্চারণ করতে থাকে মহাদেওপুর, মহাদেওপুর, মহাদেওপুর। লোভী বালক যেমন মিছরির খণ্ড ধীরে ধীরে চুষতে থাকে, ফুরিয়ে যাবে আশঙ্কায় চিবোয় না, তেমনিভাবে নামটি মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে থাকে। কুড়ি বছর হন্সে জীবন যাপন করবার পরে ঐ নামটি জমাট পাহাড়ী মধুর মতো পেয়েছিল সে। তার মতো পাষণ্ডের জীবনেও তো এলো মাধুর্য। বিধাতা নির্মম কিন্তু নিষ্ঠুর নন, পাষণ্ডতমকেও অন্তত একবার মাধুর্যের স্বাদ দিয়ে থাকেন। কপাল হাতে ঠেকিয়ে প্রণাম করে সে শ্যামসুন্দরকে।

হঠাৎ আমলা তেলের সুগন্ধে ঘর ভরে যায়, চমকে ওঠে সুখানন্দ, কোথা থেকে আসছে এই গন্ধ রস? তবে বুঝি কোনখানে স্মৃতির ফোয়ারা খুলে গিয়েছে! কেন আর কার এলোচুলের এই সুগন্ধ? তখনি মনে পড়ে যায়, ছায়ার পর্দা সরিয়ে বিস্মৃত যুগটা চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। কোথায় ছিল এতদিন এই চির-পরিচিত? যাকে ভুলেছি ভেবে মানুষ নিশ্চিন্ত থাকে, একদিন হঠাৎ সে যখন সম্মুখে এসে উপস্থিত হয় তখন বিস্ময়ের অন্ত থাকে না মানুষের।

শর্বরী।

গাঁয়ে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিয়েছিল নামটা, মহাদেওপুর। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। গাঁয়ের সকলেই অজানা, কাজেই কাউকে বিশেষভাবে বাছবার ছিল না, প্রয়োজনও নেই, সাধ্যও নেই। পায়ের শক্তির শেষ সীমানায় যে বাড়িখানা দেখতে পেলো তারই দাওয়ায় বসে পড়লো। একটু গড়িয়ে নিই ভেবে যেমনি শুয়েছি অমনি অঘোর ঘুম। তেমন ঘুম একমাত্র শিশু, সাধু ও ক্লান্ত পথিকেই সম্ভব।

কে গো এখানে শুয়ে?

ধড়ফড় ক'রে উঠে বসে সুখানন্দ, দেখতে পায় আলোয় আকাশ ভরে গিয়েছে আর সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক সুপুরুষ বৃদ্ধ।

আমি পথিক, সাহেব।

সে তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু এমনভাবে খোলা জায়গায় ঘুমোনো উচিত হয় নি, কাছেই বন, রাতের বেলায় মাঝে মাঝে নেকড়ে বের হয়।

নেকড়েতে আমার কি করবে, সাহেব?

বৃদ্ধ হেসে উঠে বলে, কি আর করবে, ধরে খেয়ে ফেলবে।

দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বলে, তাহ'লে তো বেঁচে যাই।

কেন, তোমার এত কিসের দুঃখ?

সুখই বা কিসের? যার চাল নেই চুলো নেই, আপন বলতে কেউ নেই, নেকড়েটাও তার কাছে ঘেঁষে না।

এতক্ষণ দুজনে হিন্দিতে কথা চলছিল, এবারে হঠাৎ বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো, আচ্ছা, তুমি কি বাঙালী?

সুখানন্দ প্রথমে ভাবলো পরিচয় গোপন করে, তারপরে ভাবলো আসল পরিচয় তো বিধাতা দেগে দিয়েছেন ছিন্ন আঙুলে, তারপরে ভাবলো, নিতান্তই যদি ধরা পড়ে যাই হিমালয় তো বেশী দূর নয়, সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলেই চলবে। হিমালয়ের কোলে সাধু ও পাষণ্ড সকলেরই সমান আশ্রয়।

ত্রিশ বৎসর আগেকার প্রত্যেকটি কথা কোথায় খোদিত ছিল পাথরের উপরে, এতটুকু মুছে যায় নি। দুর্ভাগ্যের আঘাতে ভাঙনধরা নদীর কূলে বসে রোমন্থন করতে থাকে সেই সব দিনের স্মৃতি।

বৃদ্ধ তাকে সস্নেহে ডেকে নিয়ে যায় বাড়ির মধ্যে, খুলে দেয় একখানা ঘর, বলে, এখানে যতদিন খুশী থাকো।

ক্রমে পরিচয় হয়। বৃদ্ধের নাম বৃন্দাবন ঘোষ, জাতিতে কায়স্থ, আদিবাড়ি হুগলি সপ্তগ্রাম। কৈশোরে চলে এসেছিল এদিকে। তারপর দীর্ঘকাল রামপুর রাজসরকারে চাকরি ক'রে কিছুকাল হ'ল অবসর নিয়েছে। কিছু জোতজমি আর বাড়িখানা আছে, এক রকম ক'রে চলে যায়, সংসার ছোট, নিজে আর তার একমাত্র সন্তান শর্ব্বরী, অবিবাহিত। এই পাহাড়ে জঙ্গলে যোগ্য বর পাওয়া সহজ নয়।

ক্রমে পরিবারভুক্ত হয়ে যায় সুখানন্দ। একদিন বৃন্দাবন বলে, বাবা, একটা প্রস্তাব করি, তুমি শর্ব্বরীকে বিয়ে করো, তাহলে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারবো।

এ তো সৌভাগ্যের কথা কাকাবাবু, কিন্তু আমার বয়স যে চল্লিশ হ'ল।

শর্ব্বরীর বয়সও পঁচিশ পেরিয়েছে, যোগ্য বর পেলে এতদিন কবে বিয়ে হয়ে যেতো। বাবা, তুমি আর আপত্তি ক'রো না। বাবা ধোপেশ্বর রাজ্য খুঁজে বর জুটিয়ে এনে দিয়েছেন, স্বজাতি, স্বশ্রেণী আর কি চাই? এইসব বাড়িঘর জোতজমা সবই তোমাদের হবে।

শর্ব্বরীর সঙ্গে সুখানন্দর বিয়ে হয়ে গেল। বছর দুই বেশ আনন্দে কাটলো। পাহাড়ে অঞ্চলে কেউ নেই যে তার পূর্ব ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন করে। একদিন বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করেছিল, বাবা, আঙুল দুটো গেল কি ক'রে?

খুব শান্ত ছিলাম কিনা, কাকাবাবু, তলোয়ার খেলতে গিয়ে কাটা পড়লো। আরো বেশি যেতে পারতো।

আড়াল থেকে শুনে শিউরে ওঠে শর্বরী।

বেশ সুখে কাটছিল তাদের জীবন। সুখানন্দ ভাবে এতদিনে বুঝি প্রায়শ্চিত্ত শেষ হ'ল নইলে এত সুখ কেন? এমন সময়ে সৌভাগ্যের নৈবেদ্যে চিনির চূড়াটির মতো প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল, একেবারে পুত্রসন্তান। বৃন্দাবন নাম দিল নয়নচাঁদ। 'নয়নচাঁদ মায়ার ফাঁদ, অনেকদিনের অনেক সাধ'—এই হ'ল তার অষ্টপ্রহরের বুলি।

এমন সময়ে একদিন অল্প সময় রোগভোগের পরে বৃন্দাবনের মৃত্যু হ'ল। মানুষ যায়, সংসার তো যায় না, সে আপন নিয়মে চলে। অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু-শোকের ক্ষত শুকিয়ে এলো। নয়নচাঁদের জন্মের বছর চার-পাঁচ পরে একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হ'ল। কন্যাটি হ'ল শর্বরীর নয়নের মণি। সুখানন্দর সৌভাগ্যের নৌকায় স্রোতের অনুকূলে পাল খাটানো হ'ল। কিন্তু কে জানতো যে সম্মুখেই আছে চোরা পাথর। হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে মারা গেল মেয়েটি। নয়নের মণি হারিয়ে শর্বরী একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠল। তার ধারণা হ'ল, সুখানন্দ মেয়েটিকে লুকিয়ে রেখেছে। দাও, দাও, আমার নয়নমণিকে ফিরিয়ে দাও, বলে প্রথমে বাড়িময় তারপরে পাড়াময় দাপাদাপি ক'রে বেড়াতে লাগলো শর্বরী। হরকিষণ ওদের প্রতিবেশী, বলল, দাদা, এমন চললে যে শেষে ভাবীজী মারা পড়বে, একটা কিছু প্রতিকার করো।

সুখানন্দ বলে, ভাই, মৃত্যুর আর কি প্রতিকার সম্ভব?

কয়েকদিন পরে হরকিষণ বলে, দাদা, পাশের গাঁয়ে গরীব পরিবারে একটি মেয়ে আছে, তোমার মেয়েরই বয়সী, কিছু টাকা পেলে মেয়েটিকে ওরা বেচতে রাজী আছে।

বলো কি, মেয়ে বেচবে?

কেন বেচবে না দাদা, একে দিন চলে না, তার উপরে মেয়ে! ওরা যা বলল, না খেতে পেয়ে মরে যাওয়ার চেয়ে অপরের বাড়ি বেঁচে গিয়ে থাকুক!

বাপ বলল, মেয়ে আর কার চিরদিন ঘরে থাকে? বয়স হ'লে তো বিয়ে দিয়ে বিদায় করতেই হবে।

সুখানন্দ শুধোয়, নিজের মেয়েকে বিদায় করবার এত আগ্রহ।

হরকিষণ বলে, তোমার সন্দেহ বোধ করি মিথ্যা নয়, গাঁয়ের লোকে বলল, মেয়েটা ওদের নিজের নয়, টাকার লোভে মেয়েকে পালন করছে।

তারপরে তারা যখন এসে দাবী করবে?

ম'রে গিয়েছে বললেই ফুরিয়ে যাবে।

তাই বলো।—বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুখানন্দ।

কি বলো? শুধোয় হরকিষণ।

কি জাতভিত কিছুই জানি নে।

তোমাদের স্বজাতি, কায়স্থ, খোঁজ নিয়েছি।

বিবেচনা করবার জন্য দু'চারদিন সময় নেয় সুখানন্দ। কিন্তু দু'চারদিন যাওয়ার আগেই রাজী হ'তে হয়, শর্বরীর এমন পূর্ণোন্মাদ অবস্থা।

একদিন সন্ধ্যাবেলা হরকিষণের সঙ্গে গিয়ে সুখানন্দ দেখে আসে মেয়েটিকে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে, নয়নমণির বয়সীই বটে। তার পরদিন গিয়ে নগদ একশ' টাকা দিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে চলে আসে।

এই নাও তোমার মেয়ে।

সুখানন্দর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে শর্বরী বলে ওঠে, তবে যে বলছিলে লুকিয়ে রাখো নি, আমি ঠিকই বুঝেছিলাম।

তারপরে মেয়েটিকে বুকের মধ্যে সবলে জড়িয়ে ধরে বলে, এই তো আমার নয়নমণি, সেই চোখ, সেই নাক, সেই দুধে-ধোওয়া গায়ের রঙ।

সুখানন্দ বোঝে—এ কথা বেশি কাল চাপা থাকবে না, শর্বরী সুস্থ হয়ে উঠলেই সহৃদয় প্রতিবেশীরা প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে যাবে। তখন না-জানি আবার কি অবস্থা হবে। কাজেই কিছুদিনের মধ্যে জমিজমা বেচে ফেলে—বাড়িটা আর বেচলো না, মহাদেওপুর ত্যাগ ক'রে রওনা হ'ল। সকলকে জানালো লখনৌ যাচ্ছে, সেখানে পৈতৃক বাড়ি আছে। আসলে চললো দিল্লিতে।

আজ কেন এত সব কথা মনে পড়ছে জানে না সুখানন্দ। হয়তো সামনে দুর্ভেদ্য দেওয়াল উঠেছে বলেই পিছনে ফিরতে বাধ্য হয়েছে। এতকাল মনে হয়েছিল ওসব কথা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু কি আশ্চর্য, আজ হঠাৎ আবিষ্কার করলো দুঃখের মধ্যেও কোথায় যেন মাধুর্য লুকিয়ে ছিল। সংসার নিমের মধু।

আজ কি ঘর থেকে বের হওয়া হবে নি, ঠাকুরের সন্ধ্যা-আরতি করবে কে?

বর্তমানের ধাক্কা খেয়ে জেগে ওঠে সুখানন্দ, দরজায় কণ্ঠস্বর ও ধাক্কা ভুতি বুড়ীর।

কেন, ওরা ফেরে নি?

তাদের কি আর বাড়ি ফেরার দিকে মন আছে—এখন তারা বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

আচ্ছা, বের হচ্ছি।

দাও, ঐ বুঝি ওরা এলো। সদর খুলে দিয়ে আসি।

অপস্রিয়মাণ পদশব্দে বোঝা যায় ভূতি বুড়ী সদরের দিকে যাচ্ছে।

এই অবসরে সুখানন্দ ঘর থেকে বের হয়ে খিড়কি দিয়ে প্রস্থান করে।

তুলসীর সম্মুখে আজ দাঁড়াবে কি ক'রে? হন হন ক'রে ছুটতে থাকে গালিব সাহেবের কুঠির দিকে।

॥ ৯ ॥

গালিবের উপদেশ

তখনো গালিব সাহেবের বৈঠকখানায় আলো জ্বালা হয় নি। সারাদিন গিয়েছে জন্মদিনের ধকল, বন্ধু ও গুণগ্রাহীর দল এসে সওগাত দিয়ে গিয়েছে ফুলের মালা আর নানা রকম মিটাই। এতক্ষণ পরে বন্ধুবান্ধব চলে যাওয়ায় একটু ফুরসত পেয়েছে, উঠবে উঠবে ভাবছে, এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলো সুখানন্দ পণ্ডিত। প্রথম নজরে তাকে চিনতে না পেরে মীর্জাসাহেব বলে উঠলো, কে ও?

তার পরেই চিনতে পেরে বলে উঠলো, একদিনে দু'বার দেখা পেলাম, কি সৌভাগ্য। একটু বসুন, আমি একটা বাতি নিয়ে আসি।

বাতি নিয়ে এসে পণ্ডিতজীর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে, এ কি ব্যাপার পণ্ডিতজী, পাকা-ফসল ক্ষেতের উপর দিয়ে যে বন্যার জল চলে গিয়েছে।

প্রতিবাদ করে না সুখানন্দ, বরঞ্চ আর একটা অলঙ্কার ব্যবহার ক'রে সমর্থন করে গালিবকে।

মীর্জা সাহেব, যে-মেঘ থেকে বর্ষার জল পাবো আশা করেছিলাম সেই মেঘ থেকে নিক্ষিপ্ত হ'ল কিনা নিদারুণ বজ্র।

গালিব বোঝে অবস্থা যেমন ভেবেছিলো তার চেয়েও গুরুতর। কিন্তু এই ক'ঘণ্টার মধ্যে এমন কি ঘটতে পারে বুঝতে পারে না।

এমন কি ঘটলো এই ক'ঘণ্টার মধ্যে পণ্ডিতজী?

এই ক'ঘণ্টার পিছনে দীর্ঘকালের হাত। এই বলে এগিয়ে দেয় চিঠিখানা।

এ কার চিঠি?

পড়লেই সব বুঝতে পারবেন।

গালিব পড়তে শুরু করে। চিঠির সাকিন ও সন তারিখ দেখে চমকে ওঠে,

কে আনলো এ চিঠি?

দৈব।

সব কাজের মূলেই তো দৈব, তবু তো একজন মানুষকে বাহন হ'তে হয়।

পড়ুন, সমস্তই বুঝতে পারবেন।

এ জীবনলাল কি তুলসীর রক্ষাকর্তা?

সে-ই বটে।

নিবিষ্ট মনে পড়ে যায় গালিব, আর আপন মনে নিজে দুঃখের কথা বলে যায় সুখানন্দ।

মীর্জা সাহেব, আপনার মতো বন্ধু আর আমার নেই। স্ত্রী আর দুটি শিশু সন্তান নিয়ে অসহায় অবস্থায় এসেছিলাম দিল্লিতে। আপনি হাতে ধরে তুলেছেন কোথা থেকে কোথায়, ঘোর দারিদ্র্য থেকে খোদ বাদশাহের দরবারে। এখানকার বাড়িঘর, টাকাকড়ি যা কিছু সবই আপনার কল্যাণে। আমার জীবনের সব ঘটনাই বলেছি আপনাকে—কেবল একটি ছাড়া, অনেকদিন বলি বলি ক'রেও মুখ ফুটে সেই লজ্জার কথা, সেই পাপের কথা বলতে পারি নি।

ততক্ষণে পড়া শেষ হয়ে গিয়েছে গালিবের, এবারে মুখ তুলে শুধোল, কেন পারেন নি পণ্ডিতজী?

বেশ বুঝতে পারা যায় গালিবের কান সজাগ ছিল, কোন কথা এড়ায় নি।

কেন জিজ্ঞাসা করছেন, চিঠিখানা পড়বার পরেও?

করছি বৈকি।···আচ্ছা থাক, আপনাকে বলতে হবে না, আমিই বলছি। যৌবনে ঘটনাচক্রে একটা খুনের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন, এই তো!

এ কি কম?

প্রৌঢ় বয়সে জুয়ো খেলার দায়ে যে কয়েদ ভোগ করছে তার কাছে বেশি নয়।

তারপরে বলে, পণ্ডিতজী, আপনি পাপের উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন, আমি নিচের ধাপে, মাঝখানে কতটুকু ফারাক!

আপনারটা অপরাধ, আমারটা পাপ।

পণ্ডিতজী, আইনের চোখে দুটোই অপরাধ।

কিন্তু ভগবানের চোখে?

ভগবানের চোখের খবর মানুষে কি জানে?

মানুষে না জানলেও আপনার মতো শায়েরের অজানা নয়।

তবে শুনুন। মানুষ অনুতাপ করতে আরম্ভ করেছে জানলেই খোদা

এগিয়ে এসে তার পাপের বোঝা স্বহস্তে অনেকটা হাল্কা ক'রে দেন। এরই নাম ক্ষমা। নইলে আমাদের মতো সামান্য জীবের সাধ্য কি নিজের চেষ্টায় সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে ফেলি।

তবে কি আপনি বলতে চান যে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে।

অনেকদিন পণ্ডিতজী, অনেকদিন। চোখের জলে যেটুকু ধুয়ে মুছে যেতে বাকি ছিল, খোদা স্বহস্তে তা অপসারিত ক'রে দিয়েছেন। পণ্ডিতজী, আপনাকে তো আমি কুড়ি বছর দেখছি, আপনিও যদি ক্ষালিত-পাপ না হন—তবে আমরা সবাই ঘোরতর পাপী।

তখন সুখানন্দ হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ক'রে বসলো, অকস্মাৎ নত হয়ে প'ড়ে গালিবের পদস্পর্শ করলো, বলল, একটু পায়ের ধুলো নিলাম।

ছিঃ ছিঃ একি করলেন,--বলে পিছিয়ে যায় গালিব, বলে, আপনি উচ্চবর্ণ হিন্দু, এ উচিত হয় নি।

সুখানন্দ বলে আপনি মানুষ নন, আপনি মানুষের বিবেক, কবিরা মানুষের বিশুদ্ধ বিবেক। আপনার আশ্বাসবাণী শুনবার আগে ভেবেছিলাম তলিয়ে গিয়েছি।

তলিয়ে গিয়ে নূতন রাজ্যে উপস্থিত হয়েছেন। মানুষ যাকে অতল বলে সেখানেও তো খোদার অধিকার।

বুঝতে পারে না সুখানন্দ, শুধোয় কি রকম?

আপনি ভাবছেন, কিস্তি বানচাল হয়ে গিয়েছে, কিছুই রক্ষা পেলো না। আর আমি দেখছি, কিস্তি ডুবলেও চড়নদার সবাই রক্ষা পেয়ে গিয়েছে।

বলুন, বলুন, বুঝিয়ে বলুন, সাগ্রহে বলে ওঠে সুখানন্দ।

তার আগে আর একটা সংবাদ জেনে নিই। ওদের এই চিঠির বিবরণ জানিয়েছেন কি?

ওরা তখন বাড়ি ছিল না, আর ওদের বাড়িতে ঢুকবার সাড়া পেয়েই পালিয়ে চলে এসেছি এখানে।

ওদের তো বলতে হয়, আর তো গোপন রাখা উচিত নয়।

কি সর্বনাশ! বাপ হয়ে নিজের কলঙ্কের কথা কেমন ক'রে বলি সন্তানদের।

বাধা কি? লখনৌর সুখানন্দ বসু রায় আর দিল্লির সুখানন্দ পণ্ডিত তো এক ব্যক্তি নয়।

সে আপনার মতো কবির দৃষ্টিতে, সাধারণে এ প্রভেদ বুঝবে না।

তবু বলতে হবে, প্রায়শ্চিত্তের ঐটুকুই বাকি আছে।

কি বলছেন, আমি যে নরহত্যার জালে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

সে জাল সব খুলে পড়ে গিয়েছে।

তার ফল কি হবে জানেন? বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় ভেঙে পড়বে তুলসী।

বিয়ে ভাঙবে না, সেই তো রক্ষা।

ভাঙবে বৈকি, জীবন কিছুতেই বিয়েতে রাজী হবে না এ চিঠি পড়বার ফলে।

আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী না হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু—

কিন্তু কি?

তুলসী তো আপনার মেয়ে নয়!

এই সুপরিজ্ঞাত তথ্যটা অজ্ঞাত বাণের মতো প্রবেশ করে সুখানন্দের চৈতন্যে, সে চমকে ওঠে, কি বলবে ভেবে পায় না, শুধু তার মুখ দিয়ে বের হয় —মীর্জা সাহেব!

এ ছাড়া উপায় নেই পণ্ডিতজী।

এতদিন পরে এ কথায় কে বিশ্বাস করবে? ভাববে বিয়ে যাতে না ভেঙে যায় তাই এই ছলনার সাহায্য নিচ্ছি।

আপনি আমি দুজনে বললে অবশ্যই বিশ্বাস করবে, আর তাহ'লেই দেখবে যে বিয়ে ভেঙে দেবার কোন কারণ নাই।

কিন্তু মীর্জা সাহেব, বিয়ে ভেঙে যাওয়ার চেয়েও এ কি বেশি মর্মান্তিক নয়? না, না, এ আমি পারবো না।—বলে দুই হাতে মুখ ঢাকে সুখানন্দ।

পারতেই হবে, পণ্ডিতজী, পারতেই হবে। একটু ধীরভাবে চিন্তা ক'রে দেখুন, এ-ছাড়া আর উপায় নেই।

এতে যে তুলসীকে অতল শূন্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।

অতল শূন্যও তো দুনিয়ার মালিকের এলাকাভুক্ত। তাঁর ধন তিনি রক্ষা করবেন, ডান হাত থেকে বাম হাতে গেলে সর্বনাশ হবে কেন ভাবছেন।

সুখানন্দ স্বপ্নগ্রস্তের মতো মনে মনে বলে, সত্যিই তো তুলসী আমার নয়।

সত্যই তুলসী আপনার, সত্যই আপনার বলেই তার সুখের, ভবিষ্যতের অন্তরায় হ'তে পারেন না আপনি।

কিন্তু তুলসী কি ভাববে বলুন, তার বাপ নেই মা নেই আত্মীয়স্বজন নেই, কোন্ ঘর কোন্ পরিবার থেকে এসেছে তার স্থিরতা নেই!

পণ্ডিতজী, আপনি তাকে গ্রহণ করার সময়ে সব দিক বিবেচনা ক'রে নিয়েছিলেন, আজ তাকে নির্ভর করতে হবে সেই বিবেচনার উপরে।

সেই অজ্ঞাতকুলশীল বালিকাকে বিয়ে করবার জন্য তখনো কি আগ্রহ

থাকবে জীবনলালের।

বেশি ক্ষতি আর কি হবে, এখনো তো বিয়ে করতে রাজী নয়।

তবু এখন তুলসীর আছে বাপের ঘর। তখন বাপের ঘরও যাবে, স্বামীর ঘরও পাবে না। না, মীর্জা সাহেব, ওটা পারবো না, তা:ক তিনকুলহারা করতে পারবো না। তার সুখদুঃখের মালিক তাকে সুখদুঃখ যোগাবেন, আমার পাপপুণ্যের মালিক আমাকে দণ্ড-পুরস্কার যোগাবেন। ওটা আমি কিছুতেই পারবো না।

বেশ, ওটুকু না হয় হাতেই থাক। তবু পত্রের মর্ম তো না জানিয়ে আর থাকা যায় না।

নিজের মুখে আমি জানাতে পারবো না। বরঞ্চ আপনি যদি—

সুখানন্দের বাক্য শেষ না হ'তেই গালিব বলে ওঠে, বেশ, আমিই গিয়ে তাদের বলছি। ভয় নেই পণ্ডিতজী, নিজের ভাইয়ের কথা ভাইপো-ভাইঝিদের কাছে যে-ভাবে বলা উচিত সেইভাবেই বলবো। ওরা জানবে সমস্তটাই অদৃষ্টের ফাঁস, কেন সে ফাঁস পড়লো জানতে পাবে না। আপনি শান্ত হোন।

তারপরে শুধোয়, এখন নিশ্চয় ওদের পাবো বাড়িতে।

আর কোথায় যাবে!

যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে গালিব বলে, পণ্ডিতজী, আপনি এখানে বিশ্রাম করুন, আমি যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে আসছি।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিদায়োন্মুখ গালিবকে সুখানন্দ বলে, মীর্জা সাহেব, আর একটা রাতও বাঁচতে আমার ইচ্ছা করে না।

রাতদিনের বরাদ্দ যিনি করেছেন সেটা তাঁর ইচ্ছা পণ্ডিতজী, আপনি আমি কে?

বলতে বলতে গলির ঘনায়মান অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায় বৃদ্ধ কবির মূর্তি।

নিশ্বাস ফেলে চৌকিতে এসে বসে সুখানন্দ। আজকের এই কয়েকটি ঘণ্টার উপরে সে অনুভব করতে পারছে পঞ্চাশ বছরের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দুঃসহ চাপ।

"Misfortune never comes alone"

সুখানন্দ বের হয়ে যাওয়ার কিছু আগে জীবনলাল বের হয়ে পড়েছিল। পান্নাকে ডেকে বলল, পান্না, তুমি থাকো, আমি একটু বাইরে ঘুরে আসি, এই বদ্ধ আবহাওয়ায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

পান্না বলল, আমাকে ফেলে চললে এই দুঃখের আবহাওয়ায়?

পান্না, তুমি দুঃখের রিজিয়া সুলতানা, অন্যের কাছে দুঃখ প্রভু, তোমার কাছে ক্রীতদাস। তোমার আবার ভয় কিসের?

এসো, সাবধানে চলাফেরা ক'রো।

পান্নার সতর্কবাণী কানে পৌঁছবার আগেই জীবনলাল বেরিয়ে পড়েছে।

কোথায় যাবে, কোন পথে যাবে, কেন যাবে কিছু স্থির ছিল না, তবে শুধু স্থির ছিল যে উপরে নিচে দুঃখের কটাহে পুটপাক হওয়া থেকে সে মুক্তি চায়। এই বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকাপাত না দেখে ছাউনিতে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না বুঝেছিল, নতুবা ছাউনি বলেই রওনা হয়ে যেতো সে।

দিল্লি শহরের দুটো চারটে পথ ছাড়া আর সমস্তই তার অপরিচিত, কিন্তু কি আসে যায়, যেখানে উদ্দেশ্য নেই, লক্ষ্য নেই, আছে একমাত্র শুধু যাওয়াটাই। চোখ জোড়াকে ভার দিল পথ দেখবার, মনটা তখন অনেক দূরে দূরে, কখনো তুলসীর কাছে, কখনো লখনৌ শহরের নবাবগঞ্জ মহল্লায়, যেখানে ছিল তাদের বাস।

মহল্লা চিৎলী কব্বর রাস্তা বরাবর চলে ভোজলা পাহাড় হয়ে চুড়িওয়ালা বাজার দিয়ে চলতে লাগলো জীবন। তখনো দিনের আলো আছে, চোখে পড়ছে শহরের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি, কিন্তু সে-সব মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁচচ্ছে না। অবশেষে এক সময়ে কুচা চাবিওয়ালা গলি দিয়ে, কুচা বেলিওয়ারা গলি দিয়ে এসে পৌঁছলো চাঁদনী চকে। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, পা দুটো আর চলতে চাইছে না, কোথাও বসা দরকার। সামনেই বেগমবাগ। ঢুকে পড়লো সেখানে, বাগিচা তখন জনপ্রাণীহীন, হল্লার দিনে সন্ধ্যা না হ'তেই ঘরে ফিরে গিয়েছে। একটা ফোয়ারার ধারে বাঁধানো চাতালে গিয়ে বসে পড়লো, অঞ্জলি ভরে পান করলো নির্মল শীতল জল, তারপরে সেই চাতালটার উপরে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো, চোখে পড়লো আকাশে তারার বিন্দু।

তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সংখ্যা গুনতে চেষ্টা করলো যেমন করতো বাল্যকালে, এক একবার গোনে, তারপরে সব গোলমাল হয়ে যায়, আবার গুনতে শুরু করে, আবার গোলমাল হয়ে যায়। এমনিভাবে কিছুক্ষণ কাটলো। জীবনের মনটা এমনি বিকল হয়ে গিয়েছিল যে, গত চব্বিশ ঘন্টার অভিজ্ঞতা কেমন যেন ফস্‌কে চলে যায় মনের উপর দিয়ে, কোন ছাপ রাখতে পারে না। অবশেষে তারা গোনার নিষ্ফল প্রয়াস পরিত্যাগ করে, হঠাৎ পড়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস।

সেই সঙ্গে চকিত হয়ে ওঠে ফোয়ারার অপর দিকে শায়িত এক ব্যক্তি, তার অস্তিত্ব জানতে পারে নি জীবন। লোকটা উঠে বসে এদিক ওদিক তাকায়, দেখতে পায় না কাউকে, তখন বলে ওঠে, কে আবার এলো এখানে মরতে, একটু নিরিবিলি যে বিশ্রাম করবো তারও উপায় নেই।

এবারে উঠে বসে জীবনলাল, উঠে বসতেই তারা পরস্পরকে দেখতে পায়। অপর ব্যক্তিটি শুধোয়, তুমি কে?

জীবন বলে, আমি হতভাগ্য একটা লোক।

তা জানি ইয়ার, সৌভাগ্যবান লোক যে এখানে শুতে আসবে না সহজেই বুঝতে পারি। তবু পরিচয় কি?

প্রকৃত পরিচয় গোপন ক'রে জীবন বলে, হতভাগ্যের আবার পরিচয় কি?

বহুৎ আচ্ছা, বলে লোকটা পাশে এসে বসে, তারপরে বলে, বেশ বলেছ, দুনিয়ার সব হতভাগ্যই এক ঝাঁকের পাখি।

এবারে উল্টে জীবন শুধোয়, তুমিও কি হতভাগ্য নাকি?

শোনো কথা একবার, আমি হতভাগ্য নাকি! তবে হাঁ, সৌভাগ্য কাকে বলে কখনো জানবার সুযোগ হয় নি, তাই হয়তো হতভাগ্য নই।

থাকো কোথায়?

কখনো ফোয়ারার ধারে, কখনো চাঁদনী চকের লহরে।

খাও কি?

সরাব।

জোটে?

যত চাও।

খানা?

জোটে না, তাই খাই না।

এ কি রকম? খানা জোটে না, পিনা জোটে।

এই হচ্ছে ছুনিয়ার হাল, খানা জোটে না পিনা জুটে যায়।

তবে তো ভালোই আছ।

তাই তো বললাম, সৌভাগ্য জানি না, তাই ভালো আছি কি খারাপ আছি বুঝতে পারি না। আর তুমি?

জীবন বলে, আমি সৌভাগ্যের শুকনো ডাঙা থেকে অথৈ জলে পড়ে গিয়েছি।

ভাই, ডাঙায় হাঁটার চেয়ে জলে সাঁতার দেওয়া অনেক সহজ। স্রোতে আপনি টেনে নিয়ে যায়।

সেই ভরসাতেই গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছি।

চমৎকার। আমারও ঐ দশা। এখন তুমি আমার দোস্ত্।

জীবনের ভারি মজার লাগে এই অপরিচিত লোকটাকে, কেমন দিলখোলা ভাব। বিশেষ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার পরে।

আজ রাতটা কি এখানেই কাটবে দোস্ত?

জীবন বলে, ক্ষতি কি?

কিচ্ছু না, আমি কত রাত কাটিয়েছি, তবে যদি আমার সঙ্গে আসো, তবে ছাদের তলে রাত কাটাতে পারো।

বাড়িঘর আছে নাকি?

আমার না থাকলেও অপরের আছে।

অপরের বাড়িতে নিয়ে যাবে আমাকে, কেউ চেনে না যে।

আরে ইয়ার, হতভাগ্য লোককে অন্ধকারে চিনতে পারা যায়। যাবে তো ওঠো।

কোথায়?

এই কাছেই, খুরশিদ জানের বাড়িতে।

মনে হচ্ছে সেটা ফুর্তির জায়গা, আমার মতো ভাঙা নৌকোকে নিয়ে যাবে সেখানে?

এই কিছুক্ষণ আগেই আর একখানা ভাঙা নৌকো সেখানে দেখে এসেছি—ছুজনে বেশ মিলবে।

চলো,—বলে উঠে পড়ে জীবন। নিজের দুঃসহ অবস্থাটা ভুলতে চায় সে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্তেও। তাই কিছু আগ্রহের সঙ্গেই চলতে থাকে নূতন দোস্তর সঙ্গে।

দোস্ত্, তোমার নামটি কি?

নবাব মিঞা।

বেশ চমৎকার নাম তো। পেশা কি তোমার?

গজল লেখা।

গজল লেখো নাকি?

গালিব মিঞার চেয়ে ভালো।

শোনাও না।

চলো আগে ঠিকানায় গিয়ে পৌছাই।

অল্প সময়ের মধ্যেই দুজনে খুরশিদ জানের বাড়িতে এসে পৌছলো।

তখনো খুরশিদ জানের সন্ধ্যার আসর জমে নি, আজকাল আগের মতো জমে না, গদরের সময় সন্ধ্যার পরে কেউ বড় বাড়ির বের হ'তে চায় না। খুরশিদ জান একা বসে একখানা ফার্সি বই পড়ছিল এমন সময়ে সরাব মিঞা ও নবাগন্তুককে দেখে বলে উঠল, এসো ভাই সরাব!

নবাগন্তুকের উদ্দেশ্যে বলল, আপনি এই কুর্সিটাতে বসুন।

খুরশিদ জানের কাছে সবাই স্বাগত, বিশেষ যদি সরাব মিঞার সঙ্গে আসে।

জীবন উপবেশন করলে খুরশিদ ইশারায় তার পরিচয় শুধালো।

সরাব বলে ওঠে, এঁর পরিচয় জানতে চাও? এই ইয়ার আমার রাহীদোস্ত, পথে দেখা। আরও জানতে চাও? ভাঙা নৌকার মাঝি। বেকায়দা পথে পড়েছিল। ভাবলাম, এমন লোকের যোগ্য স্থান খুরশিদ জানের বাড়ি। তাই নিয়ে এলাম, ভুল করেছি কি?

খুরশিদ বলল, ভুল হ'তে যাবে কেন? তুমি যা করো তা-ই ঠিক।

তারপরে জীবনের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার মুখ শুকনো দেখছি, আমার ঘরে যদি খেতে আপত্তি না থাকে, তবে কিছু খান।

এতক্ষণে জীবনের মনে পড়ে যে, সে ক্ষুধার্ত। বলে, বিলক্ষণ। আপনার অসুবিধা না হ'লে আমার আপত্তি নেই।

খুরশিদ জান উঠে ভিতরে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পরে দাসীর সঙ্গে ফিরে আসে, দাসীর হাতে থালায় মিঠাই, গেলাসে শরবৎ।

জীবন মুখ নত ক'রে যখন খাচ্ছিল, ভাবছিল, খুরশিদ জানের কথা। এ আবার কোন নারীর আবির্ভাব হ'ল জীবনে। পান্না, রুমালী, তুলসী,—এবারে খুরশিদ। সে ভাবে, পান্না, রুমালী, খুরশিদ তিনজনেই এক পর্যায়ের মেয়ে, কেবল তুলসী আলাদা। তুলসীর কথা মনে আসতেই বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। অন্য প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করবার আশায় মুখ ফেরায়, দেখতে পায় আয়নায় খুরশিদের ছায়া, খুরশিদ গল্প করছে সরাব মিঞার সঙ্গে। ঐ ছায়াময়ী

মূর্তি দেখে জীবন বোঝে পান্না আর খুরশিদ সমবয়স্ক হবে। খুব সম্ভব কমালীরও ঐ বয়স, আর সকলের ছোট তুলসী। আবার তুলসী। দাবানলের বনে হরিণ যেদিকেই তাকায় দেখে সর্বত্র আগুন, তখন সে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে আগুনের মধ্যে। জীবনও করলো। তুলসীকে পাওয়ার আশা আর নেই, তাই বলে তার কথা না ভাববে কেন? তুলসী কি খবরটা জানতে পেরেছে। কি ভাবছে, কি করছে? এবারে নিজের দুঃখকে ছাপিয়ে ওঠে তুলসীর দুঃখ। নিজের জন্য দুঃখবোধ প্রেমের ফুল আর অপরের জন্য দুঃখবোধ প্রেমের ফল। জীবনের প্রেম এখন ফলে পরিণত হয়েছে।

কি ভাই খাওয়া হ'ল?

দাসী বাসন সরিয়ে নিয়ে যায়।

খুরশিদ বলে, একটু বিশ্রাম ক'রে নাও।

বাধা দিয়ে সরাব বলে, দুঃখীর বিশ্রাম সমদুঃখীর সঙ্গলাভ।

তারপর খুরশিদের উদ্দেশ্যে বলে, আর একজন ভাঙা নৌকোর মাঝি যে এসেছিল? কোথায় সে?

পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে।

ছাখো না, উঠে থাকলে নিয়ে এসো। দুই স্যাঙাতে আলাপ হোক।

খুরশিদ পাশের ঘরে চলে যায়।

সরাব বলতে থাকে, দোস্ত্, ধার্মিক আর দার্শনিকেরা গোরস্তানে গিয়ে বসে থাকে কেন জানো? ঐ সব কবর মনে করিয়ে দেয় মৃত্যু দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম, কোন ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা নয়। ঘরের মধ্যে মৃত্যুকে দেখলে মনে হ'তে পারে এ কেবল তোমার উপরে খোদার জুলুম, কিন্তু গোরস্তানে গেলে সে ভুল ভেঙে যায়—মৃত্যু খোদার আমহুকুম, কোতলে-আম। দুঃখেরও এই একই রীতি—তাই ডেকে পাঠালাম আর একজন দুঃখীকে, দুজনে নথী মিলিয়ে নাও। দুজনেরই দুঃখের তেজ কমে আসবে।

এমন সময় নয়নচাঁদকে নিয়ে প্রবেশ করে খুরশিদ। নয়ন ও জীবন অপ্রত্যাশিতভাবে পরস্পরকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে বজ্রাহতবৎ তাকিয়ে থাকে। তাদের ভাব দেখে সরাব ও খুরশিদও কম বিস্মিত হয় না।

প্রথম দু'চার মুহূর্ত কারো মুখ দিয়ে কথা বের হয় না।

প্রথমে কথা বলে সরাব, কি দোস্ত্, তোমরা পরিচিত নাকি?

স্বাভাবিক স্ত্রী-বুদ্ধির প্রেরণায় খুরশিদ বলে, ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারছ না?

এবারে সয়াব সব বুঝতে পারে, বলে, বুঝেছি শুধু পরিচয় নয়, এক চোরা পাহাড়ের ঘায়েই দুজনের নৌকো বানচাল হয়েছে, কি বলো ?

জীবন ও নয়ন সে কথার উত্তর দেয় না, নিজেদের প্রশ্নে তারা ব্যাকুল, কেবল জানে না কোথা থেকে আরম্ভ করবে।

মুখে ভাব প্রকাশের চেয়ে ভাবে ভাবপ্রকাশ বোধ করি সহজ, তাই নয়ন এগিয়ে এসে হঠাৎ সবলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে জীবনকে, জীবন বিনা বাধায় ধরা দেয়। প্রেম ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন নয়। খুরশিদ ইশারায় সয়াবকে ডেকে নিয়ে গৃহান্তরে যায়। আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে জীবন ও নয়ন মুখোমুখি বসে। এই ক'মাসে পারিবারিক সঙ্কট ও নাগরিক অশান্তির সাহচর্যে নয়নের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যে-ব্যক্তির সামান্য কারণে স্বরূপের উপরে জাতক্রোধ হয়েছিল, এ আর সে-লোক নয়। এখন সে দুঃখের পাঠশালায় উত্তীর্ণ ছাত্র।

তবু মুখের কথা জুটতে চায় না, দুজনে নীরবে মুখোমুখি বসে ভাবে কোন্ প্রসঙ্গ থেকে কি ভাবে শুরু করবে। এমন সময়ে দৈব প্রসঙ্গ জুটিয়ে দেয়। খুরশিদ জানের দেওয়াল-ঘড়িতে সশব্দে দশটা বাজে।

বিস্মিত নয়ন বলে ওঠে, ওঃ, দশটা বেজে গেল।

জীবনও কম বিস্মিত হয় না, বলে, তাই তো।

জীবন বাড়ি ফিরবে না ?

তোমাদের বাড়িতে ফিরবার মুখ কি আর আমার আছে ?

সে কি কথা জীবন, মুখ তো নেই আমাদেরই। তোমার কাছ থেকে পালাবার উদ্দেশ্যে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম, আর বিধাতা কি না এখানেই টেনে নিয়ে এলেন তোমাকে !

তোমার কি দোষ ভাই ?

তোমারই বা কি দোষ, বলে নয়ন।—দোষ কারোরই নয়, অথচ দুঃখ সকলেরই।

আমি তো পালিয়ে এলাম, সব বৃত্তান্ত জানলে কি ক'রে ?

বাবা গিয়ে সব কথা বললেন মীর্জা সাহেবকে, চিঠিখানাও দেখিয়েছেন, তিনিই এসে আমাদের ডেকে নিয়ে সব প্রকাশ করলেন।

গালিবের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব ক'রে জীবন বলে, এ কথা শায়েরের মুখ ছাড়া বের হ'লে বোধ করি দুঃসহ হ'ত।

জীবনের ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করে, তুলসী কেমন আছে, তুলসী কিভাবে নিয়েছে কথাটা, কিন্তু সাহস হয় না শুধোতে। অন্যমনস্কভাবে পিরানের বোতাম নাড়তে

থাকে। অথচ বেশ বোঝে এই নীরবতা মুখরতার চেয়েও অনেক বেশি পীড়াদায়ক। কিছু বলা আবশ্যক।

তখন সে বলে, ভালই হ'ল অপ্রত্যাশিতভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে, এবারে ছেড়ে দাও, ছাউনিতে ফিরে যাই।

বিস্মিত হয়ে নয়ন শুধোয়, কেন?

কেন আর কি ভাই, জীবনের একটা পর্ব তো শেষ হয়ে গেল। আর তোমাদের বাড়িতে গিয়ে কি করবো?

বলো কি? তা হ'লে তুলসীকে তো বাঁচানো কঠিন হয়ে যাবে।

সুযোগ পায় জীবন, শুধোয়, কেমন আছে সে?

কেমন আছে? না থাকার মতোই আছে। মীর্জা সাহেবের কথা শুনে উঠে চলে গেল। কোথায় গেল খুঁজতে গিয়ে দেখি ঘরে নেই, এঘর ওঘর খুঁজে শেষে ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখি ঠাকুরের পায়ের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। কোন রকমে তাকে উঠিয়ে বিছানায় এনে শুইয়ে দিলাম।

কি বলবে ভেবে পায় না জীবন।

নয়ন বলে, জীবন ভাই, আর কি কোন উপায় নেই?

বাবা বেঁচে থাকলে হাতে-পায়ে ধরে উপায় ক'রে নিতাম—এখন নিরুপায়।

আবার নীরবতা কায়েম হয়ে বসে।

কিছুক্ষণ পরে জীবন শুধোয়, পণ্ডিতজী কি ফিরেছেন?

আমি যখন আসি তখনো ফেরেন নি, গালিব সাহেব বললেন, ফিরে গিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন।

তাঁর দুঃখটাই সবচেয়ে বেশি।

কিন্তু সে দুঃখ আর কত দিনের? তুলসীর আর তোমার দুঃখ যে দীর্ঘমেয়াদী।

এমন সময়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কাহ্নাইয়া।

চমকে উঠে নয়ন শুধোয়, কাহ্নাইয়া, তুই এখানে?

তোমার কাছেই এসেছি দাদাবাবু, এখনি বাড়ি চলো। নিচে টঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে।

কেন রে, সব ভালো তো?

জীবন শুধোয়, তুলসী ভালো আছে তো?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নয়নের উদ্দেশ্যে বলে, পণ্ডিতজী খুন হয়েছেন।

খুন হয়েছেন! বাবা!

হাঁ দাদাবাবু, শীগ্‌গীর ওঠো।

দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতে বলে, খুন হয়েছেন, বলিস কিরে? কে করলো এমন কাজ!

সে-সব পরে হবে, সমস্তই জানতে পারবে, এখন এসো।

চলো ভাই জীবন।

জীবন আপত্তি করে না, নয়নের সঙ্গে রওনা হয়।

এর মধ্যে খুরশিদ ও সরাব ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছে, পাশের ঘর থেকে শুনতে পেয়েছে নিদারুণ সংবাদ।

চললাম খুরশিদ।

এসো, আশা করি বিশেষ কিছু নয়।

কাহ্নাইয়া, নয়ন ও জীবন বেরিয়ে চলে যায়।

এ আবার কি হ'ল, বলে ওঠে খুরশিদ।

সরাব বলে, খুরশিদ সুখ আসে একা একা চোরের মতো, আর দুঃখ আসে ঝাঁক বেঁধে ডাকাতের মতো। নূতন আর কি হবে—এই তো চলছে চিরকাল।

সুখদুঃখের দার্শনিক ব্যাখ্যায় খুরশিদ যে সান্ত্বনা পেলো মনে হয় না, মাথায় হাত দিয়ে সে বসে পড়লো।

॥ ১১ ॥

নিহত ও হত্যাকারী

জীবনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে নয়ন দেখল যে বাড়ি লোকে লোকারণ্য। সামনের গলিটা লোকে বোঝাই, ভিতরে ঢুকে দেখল বাইরের ঘরে লোকের ভিড়, ভিতরে গিয়ে দেখল বারান্দাতেও ভিড়। কোনরকমে ভিড় ঠেলেঠুলে সুখানন্দর ঘরে ঢুকলো, দেখলো সেখানেও বিস্তর লোক। নয়ন দেখতে পেলো শয্যার উপরে সুখানন্দ শায়িত, তার বুকে একটা পটি বাঁধা, সেটা রক্তে ভিজে গিয়েছে, মুদ্রিত-চক্ষু সুখানন্দ নীরবে পড়ে আছে। মাথার কাছে দণ্ডায়মান নিস্পন্দ তুলসী।

ভিড়ের মুখে মুখে রব উঠল, এই যে নয়ন এসেছে।

সুখানন্দ শুনতে পেলো মনে হয় না, তখন তুলসী কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, বাবা, দাদা এসেছে।

এবারে সুখানন্দ চোখ খুলল, খোলা চোখের দৃষ্টি এদিকে ওদিকে সঞ্চারিত হ'ল, বোধ করি পুত্রের সন্ধানে। কিন্তু কাউকে দেখে না পড়ায় শুধু বলল, বাতাস বাতাস, নিশ্বাস নিতে পারছি না।

এবারে নয়ন কথা বলল, বাবা, আমি এসেছি, কী কষ্ট হচ্ছে ?

বাতাস, বাতাস।

তুলসী হাতপাখা নিয়ে বাতাস দিতে শুরু করলো।

নয়ন জনতার উদ্দেশ্যে বলল, আপনারা বাইরে যান, বাবার কষ্ট হচ্ছে।

জনতা কর্ণপাত করলো না। তখন নয়ন আর একবার অনুরোধ করলো। এবারে জনতার মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, আ ম'লো যা, এতক্ষণ ছিলেন কোথায় ? আমরা গলি থেকে তুলে না নিয়ে এলে যে সেখানেই শেষ হয়ে যেতো।

আর একজন বলল, আমরা না থাকলে আসামী যে বেকসুর পালাতো। আমরাই তো তাকে গ্রেপ্তার করলাম। আর এতক্ষণ পরে এসে বলা হচ্ছে—বাবার কষ্ট হচ্ছে।

অন্য একজন মন্তব্য করলো, পিতৃভক্ত পুত্র রামচন্দ্র আর কি !

বাতাস, বাতাস, আরও জোরে।

এবারে দৃঢ়স্বরে অনুরোধটা ঘোষণা করলো নয়ন, শীগ্‌গীর সবাই বাইরে যান।

অগত্যা সবাই গজ গজ করতে করতে বের হয়ে গেল। ঘরে থাকলো শুধু সুখানন্দ, নয়ন, তুলসী, পান্না আর জীবন। এতক্ষণ ভিড়ের মধ্যে তুলসী দেখতে পায় নি জীবনকে, এবারে দেখতে পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

এমন সময়ে জুতো মস্‌মস্ করে ডাক্তার মিশির ঘরে প্রবেশ করলো। ডাক্তার মিশির প্রতিবেশী, তাকে খবর দেওয়া হয়েছিল। জুতোর শব্দে সচেতন হয়ে উঠে সুখানন্দ শুধালো, কে ?

বাবা, ডাক্তার মিশির এসেছেন,—বলল তুলসী।

আবার ডাক্তার কেন ?

উত্তরে ডাক্তার বলল, এখন কেমন আছেন পণ্ডিতজী।

আর থাকাথাকি নয় ডাক্তার, এবারে যেতে দাও।

কে যেতে দিচ্ছে আপনাকে পণ্ডিতজী ! একবার পরীক্ষাটা করি।

ডাক্তার পরীক্ষা শুরু করলে সুখানন্দ নয়নকে ডেকে বলল, আসামীকে ওরা গ্রেপ্তার করেছে, বাইরের ঘরে আছে, তুমি গিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করো।

বিস্মিত নয়ন বলে ওঠে, ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা! সে কি কথা!

যা বলছি তাই করো; তার কোন দোষ নেই।

ডাক্তার নয়নের উদ্দেশ্যে বলল, যা বলছেন তাই করুন। রোগী উত্তেজিত হয়ে উঠলে রক্তক্ষরণ থামানো যাবে না।

বাধ্য হয়ে নয়ন বাইরের ঘরে চলে যায়, সঙ্গে যায় জীবন। সেখানে গিয়ে তারা দেখলো মেঝের উপরে ওপরে একটা লোক হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে, আগে ভিড়ের জন্যে চোখে পড়ে নি। জনতা চলে গিয়েছে, দু'চারজন মাত্র অবশিষ্ট আছে।

নয়ন আলো তুলে ধরতে জীবন চমকে ওঠে, এ যে অনুপ সিং!

নিজের নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে আসামী তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ মেলে, জীবনকে বোধহয় চিনতে পারে, বলে, হাঁ জী, অনুপ সিং। লখনৌ শহরের অমর সিং-এর ভাই।

প্রসঙ্গটা নয়ন বুঝতে না পারলেও জীবন বোঝে. পত্রে উল্লিখিত বিবরণের পটে সব কথা তার মনে পড়ে যায়। জীবন বোঝে পণ্ডিতজী কেন বলেছিলেন দোষ তার নয়, কেন বলেছিলেন তাকে ছেড়ে দিতে, সে বুঝলো পণ্ডিতজী ব্যাপারটা প্রায়শ্চিত্ত বলে মনে করছেন, হত্যা বলে নয়। জীবন বুঝলো বটে, কিন্তু ভিতরের কথা না জানায় নয়ন কিছুই বুঝতে পারলো না।

সে শুধোলো, তুমি এমন কাজ করতে গেল কেন?

সে অনেক কথা, বলবার আর সময় নেই, ফাঁসি, শূল, কয়েদ যা খুশি হুকুম করতে পারেন।

নয়ন বলল, পণ্ডিতজীর হুকুম—তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে। তোমার বাঁধন খুলে দিচ্ছি, যেখানে খুশি চলে যাও।

তাই তো যাচ্ছি সাহেব, অনেক দূরে যাচ্ছি, ভাইসাহেব অমর সিং-এর কাছে যাচ্ছি।

তবু বুঝতে পারে না নয়ন, শুধোয়, কোথায় সে?

ঐ ঐখানে, বলে হাত তুলে আকাশের দিকে দেখায়।

এবারে কেমন খটকা লাগে নয়নের, শুধোয়, সে কি মারা গিয়েছে?

অনেকদিন আগে, পঞ্চাশ বছর হবে।

তার জন্যে বাবাকে মারতে গেলে কেন?

সরাসরি কথাটার উত্তর দেয় না অনুপ সিং তবে নিজের মনে বকে যায়—আজ পঞ্চাশ বছর থেকে ছোরা হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি, প্রতিহিংসা নিতে হবে,

জানের বদলে জান, বদলা। ঐ ছিল ধ্যান জ্ঞান লক্ষ্য উদ্দেশ্য—ঐ ছিল জীবনের একমাত্র আনন্দ। ঐ কথা ভাবতে ভাবতে আসামীকে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে বুঢ্ঢা হয়ে গেলাম। ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলাম বদলাতে সুখ নেই। কতদিন রাত্রে অমর সিং স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছে, ওরে বে-অকুফ বদলাতে সুখ নেই, ও পথ ছেড়ে দে। কিন্তু ছাড়বো কি, ঐ বদলার আশাতে যে সব ছেড়েছি—এখন বদলা ছাড়লে কি থাকে? শেষে ঠিক করলাম এক হাতে আসামীকে খুন করবো, আর এক হাতে বিষ খাবো। আজ দুই-ই করেছি।

তুমি কি বিষ খেয়েছ নাকি, শুধোয় জীবন।

বদলার পরে আর তো কিছু হাতে থাকে না, বাঁচে মানুষ আশায়, আমার কোন্ আশা আছে? বাঁচে মানুষ কাজের উদ্দেশ্যে—আমার সব কাজ তো শেষ হয়ে গিয়েছে। না, না, সাহেব বদলাতে সুখ নেই।

তবে এমন কাজ করতে গেলে কেন?

উত্তর দেয় না অনুপ সিং, শুধু কপালে হাত ঠেকায়।

তারপরে বলে, করতেই হবে—ক্ষত্রিয়ের শপথ।

তবে বিষ খেতে গেলে কেন?

আবার কপালে হাত ঠেকায়, বলে, নসিব, ধরম।

বলে ওঠে, জল, বড় তিয়াস।

একজন একঘটি জল নিয়ে আসে।

না, নিজে খাওয়ার মতো জোর নেই। যে জল নিয়ে এসেছিল সে মুখের কাছে ধরে ঘটিটা।

না, আপনি খাইয়ে দিন সাহেব, আপনি তো পণ্ডিতজীর লেড়কা।

নয়ন মুখের কাছে ধরে ঘটিটা, অনেকটা জল পান ক'রে আরামের 'আঃ' শব্দ করে অনুপ সিং।

জলপান করবার পরে হঠাৎ সে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তীব্র হলাহলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে এতক্ষণের উত্তেজনা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুপ সিং-এর দেহ অসাড় হয়ে পড়ে, তার প্রাণ চলে যায় অমর সিং-এর কাছে। এতদিনে বুঝি তার জীবন-সমস্যার সমাধান হ'ল।

তার দেহ চাদর চাপা দিয়ে রেখে নয়ন ও জীবন ফিরে যায় সুখানন্দের ঘরের দিকে। পথের মধ্যে দেখা ডাক্তার মিশিরের সঙ্গে।

কি রকম দেখলেন ডাক্তার সাহেব।

ভালো নয় নয়নচাঁদজী। একটা ফুসফুস ফুটো হয়ে গিয়েছে, তার উপর

অনেক বয়স। দেখা যাক চেষ্টা ক'রে, আমি এখনি একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ডাক্তার বের হয়ে যেতে নয়নরা ঢোকে রুগীর ঘরে।

বাবা, এখন কেমন আছ?

রুগী এতক্ষণ চোখ বুজে ছিল, এবারে তাকায়, শুধোয়, আসামীর কি হ'ল?

নয়ন বলতে যাচ্ছিল যে, আসামী মারা গিয়েছে, হঠাৎ জীবন তার মুখ চেপে ধরে বলে, আসামীর বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে।

কে, জীবনলাল নাকি?

হাঁ পণ্ডিতজী। এখন কেমন আছেন?

ভালো নয় জীবনলাল, বোধহয় আর বেশিক্ষণ নয়।

নয়ন ও তুলসী যুগপৎ বলে ওঠে, না বাবা, তোমাকে আগের চেয়ে সুস্থ দেখছি।

উত্তরে সুখানন্দ নীরবে হাসে। ম্লান হাসি ঘোষণা করে, সন্ধ্যা আসন্ন। জীবনলাল এই কয়েক মাসে অনেক মৃত্যু দেখেছে, বোঝে যে পণ্ডিতজীর কথাই সত্য, আর বেশিক্ষণ নয়। সত্যই সময় অল্প, রুগীর মুখ ক্রমেই রক্তহীন এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া কঠিনতর হয়ে পড়ে। পান্না ও জীবনের চোখ এড়ায় না এ সব উপসর্গ, যদিচ নয়ন ও তুলসীর মন স্বীকার করতে চায় না যে বাবার শেষ সময় আগত। স্নেহ সামান্য সঙ্কটে বড় ক'রে আর প্রবল সঙ্কটকে লঘু ক'রে দেখে থাকে।

সুখানন্দ শুধোয়, ঘরে কে কে আছে?

নয়ন বলে, তুলসী আর আমি ছাড়া আছে জীবন ও পান্না।

বেশ, আর কেউ যেন না আসতে পারে, বরঞ্চ দরজাটা বন্ধ করে দাও।

নয়ন দরজা বন্ধ ক'রে দেয়।

জল, জল।

ধীরে ধীরে জলপান করায় তুলসী।

বাতাস, বাতাস, আরও জোরে।

ক্লান্ত তুলসীর হাত থেকে পাখা নিয়ে পান্না বাতাস করতে থাক।

মীর্জা সাহেবকে খবর দেওয়া যাবে কি?

রাত অনেক হয়েছে, তিনি ঘুমাচ্ছেন, কাল সকালে খবর দিলেই হবে, বলে নয়ন।

আবার ম্লান হাসি হাসে সুখানন্দ, কাল সকাল আর আসবে না আমার জীবনে।

বাবা, একটু শান্ত হও, কথা বললে দুর্বল হয়ে পড়বে।

ওরে পাগলি মেয়ে, কথা বলবার এই শেষ সুযোগ, এটুকু নষ্ট করবো না।

তারপরে একবার রোগীর দেহ বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ কেঁপে ওঠে, বোধ করি রোগী শেষ জাগরণের প্রচণ্ড প্রয়াসে দেহ ও মনের সমস্ত শক্তিকে সক্রিয় ক'রে তোলে।

শোন তোমরা, ভেবেছিলাম এই শেষ রহস্যটুকু নিয়েই মরতে পারবো, প্রকাশ করবার আর প্রয়োজন হবে না। কিন্তু না, বিধি বাম। তা ছাড়া আমার স্বীকারোক্তির উপরে—জল, জল।

জলপান ক'রে আবার ধীরে ধীরে আরম্ভ করে—আমার স্বীকারোক্তির উপরে তুলসীর সুখদুঃখ নির্ভর করেছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, কেন নিজের সুখের জন্য তাকে বঞ্চিত করবো…আজ সারাটা দিন শুধু এই কথাই ভেবেছি, তুলসীর কি দোষ, সে কেন দুঃখভোগ করবে। জল, জল।

নয়ন জল দিতে যায়, পণ্ডিতজী তুলসীর দিকে তাকিয়ে বলে, তুলসী মা, তুমি দাও।

পণ্ডিতজী কি বলতে চায় কেউ বুঝতে পারে না, ভাবে রোগের প্রলাপ।

এবারে রুগী এক নিশ্বাসে অপ্রিয়তম রহস্যটা প্রকাশ করে—তুলসী আমার মেয়ে নয়।

শ্রোতারা বিশ্বাস করতে পারে না নিজেদের কানকে।

কি বললে, বাবা?

তুলসী আমার মেয়ে নয়।

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হ'লেও বোধ করি এমন বিস্ময় সৃষ্টি হ'ত না কারো মুখ দিয়ে কথা সরে না।

আমার বড় মেয়ের মৃত্যুর পরে,—না, না, আর সময় নেই, যা বলবার এখনি বলতে হবে।

কার উদ্দেশ্যে এ কথা ক'টা রুগী বলল কেউ বুঝতে পারলো না, হয়তো নিজের উদ্দেশ্যেই।

আমার স্ত্রী যখন পাগলের মতো হয়ে উঠল, পাগল ছাড়া আর কি, তখন দু'মাস বয়সের তুলসীকে এনে তার কোলে দিয়ে বললাম, এই নাও তোমার মেয়ে।

তুলসী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে, বাবা, এ কি সত্যি?

তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সুখানন্দ বলে, মা, মুমূর্ষু কখনো মিথ্যা

কথা বলে না। গালিব সাহেব সব জানেন, তাঁকে অনেকদিন আগে সব বলেছি। জীবন কোথায় ?

এই যে আমি পণ্ডিতজী।

এবার আর তোমাদের বিয়েতে বাধা থাকলো না।

সে-সব কথা পরে হবে পণ্ডিতজী, এখন থাক।

তুলসী শুধোয়, আমি কোন্ ঘরের, কার মেয়ে ?

সদ্বংশের মেয়ে মা, গরীব বলেই আমাকে দিয়েছিল।

কোথায় পেয়েছিলে আমাকে ?

বলবো, তার আগে একবার বলো, বাবা।

'বাবা' বলে তুলসী সুখানন্দকে জড়িয়ে ধরে বুকের উপরে মুখ গোঁজে, আবার বলে, বাবা।

নৈনিতাল জেলায়, পাহাড়ের কাছে, বনের ধারে, গাঁয়ের নাম······

পান্না কৌতূহলে চমকে তাকিয়ে দেখে তুলসীর মুখ।

ওকি ওকি ওকি হ'ল !—সকলে চীৎকার ক'রে ওঠে।

রুগীর চোখ একবার ঘূর্ণিত হয়ে, চোয়াল শক্ত হয়ে সমস্ত দেহ কেঁপে ওঠে, মুখের বাক্য শেষ হ'তে পায় না।

নয়ন তুলসী পান্না সমস্বরে কেঁদে ওঠে, জীবন নিস্পন্দ স্থির।

ছিন্নমূল লতার মতো তুলসী লুটিয়ে পড়ে ডুকরে কাঁদতে থাকে। কোন পালক পিতার অভাবে কোন পালিতা কন্যা বুঝি এমন ক'রে কখনো কাঁদে নি।

॥ ১২ ॥

পরদিন সৎকার শেষ ক'রে নিগমবোধ ঘাট থেকে ফিরে আসতে নয়ন, জীবন ও শ্মশানযাত্রীদের সন্ধ্যা হয়ে গেল। গালিব সাহেবের পরামর্শে সুখানন্দ পণ্ডিত ও অনুপ সিং-এর দেহ পাশাপাশি চিতায় দাহ করা হ'ল। গালিব সাহেব খবর পেয়ে সকালবেলায় এসেছিলো, সব শুনে বলল, সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে; বলল, নয়ন যদি শুনতে চায় সব কথা বলতে পারে। নয়ন জানিয়েছিল অতীতকালের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কৌতূহল তার নেই। গালিব বলল, খুব ভালো বাবা, খুব ভালো, এ তোমার যোগ্য কথা বটে। তবে জেনে রাখো, তোমার বাবাকে আমার চেয়ে বেশি কেউ জানতো

না, তাঁর মতো সজ্জন অল্পই দেখেছি।—গালিব তখনি পরামর্শ দিয়েছিলো দুটি দেহই যেন পাশাপাশি চিতায় সৎকৃত হয়।

শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে মীর্জা সাহেবও পণ্ডিতজীর বাড়িতে ফিরে এলো আর বিদায় নেওয়ার সময়ে নয়নকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলল, বাবা নয়ন, পণ্ডিতজীর শেষ ইচ্ছা যেন অপূর্ণ না থাকে।

কি সেটা মীর্জা সাহেব?

পণ্ডিতজী অনেকদিন আগে আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন তুলসীকে পাওয়ার রহস্য, এ কথা আমি ছাড়া আর কেউ জানতো না, আর কাউকে জানাতে হবে স্বপ্নেও তিনি ভাবেন নি। শেষ মুহূর্তে যে সে কথা প্রকাশ করলেন তার অর্থটা বুঝে দেখো।

বুঝেছি মীর্জা সাহেব, যাতে বিয়ের অন্তরায়টা দূর হয়ে যায়।

ঠিক বুঝেছ বাবা, জীবনলালের সঙ্গে ওর বিয়ে হ'লে অতলস্পর্শ শূন্যতা থেকে রক্ষা পাবে মেয়েটা। নইলে ওর মতো হতভাগিনী আর কেউ থাকবে না সংসারে।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বাবার ইচ্ছা ও আপনার পরামর্শ কোনটাই লঙ্ঘন করবো না।

আচ্ছা আজ আসি, কাল সকালে আবার আসবো।

গালিব সাহেব চলে যায়।

যতক্ষণ সবাই শ্মশানে ছিল, বাড়িতে ছিল শুধু পান্না আর তুলসী। ভূতি বুড়ীও গিয়েছিল শ্মশানে। দুজনে ঘরে একা বসেছিল, তুলসী অশ্রু-বিগলিতমুখী, পান্না জমাট অশ্রু। এতদিন যাকে নিশ্চিত আশ্রয় মনে ক'রে তুলসী নিশ্চিন্ত ছিল, পণ্ডিতজী যাওয়ার সময়ে তা ভেঙে দিয়ে গিয়েছেন। তুলসী আজ চারদিকে নিরাশ্রয়, শূন্য থেকে সে গভীরতর শূন্যে পড়েই চলেছে। অপ্রত্যাশিত অভিঘাতে দুঃখ অনুভব করবার শক্তিও লোপ পেয়েছে তার, এখন চারদিক ঘিরে এক অস্পষ্ট নৈরাশ্য। সেই কুয়াশার সমুদ্রে সে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, ধরতে পারে না কিছু, কিম্বা যাকে জড়িয়ে ধরে পরমুহূর্তে প্রকাশ পায় তা কুয়াশার কুণ্ডলী মাত্র।

পান্নাদি, তখন থেকে আমার দিকে চেয়ে আছ কেন?

রাগ করলে বোন?

তোমার উপরে রাগ করতে যাবো দিদি, এখন তুমিই যে আমার সবচেয়ে আপন।

সে তো আমার সৌভাগ্য, তবে হঠাৎ এ কথা মনে হ'ল কেন?

এতদিন যাদের আপন বলে জানতাম তারা গিয়েছে আজ সরে, তাই তোমার

মতো অনাত্মীয়ের কাছে এসে পড়েছি।

মনে করো না কেন সেই জন্যেই তোমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে দেখছি।

হঠাৎ ব্যাকুলভাবে তুলসী বলে ওঠে, তার কণ্ঠস্বর যেন অনেক কালের চোখের জলের বাষ্প দিয়ে গড়া, বলে, এখন আমার কি হবে দিদি, আমার যে কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই।

কেন বোন, সবচেয়ে আপন সবচেয়ে কাছে রয়েছে।

বুঝতে পারে না তুলসী।

জীবনলাল রয়েছে, বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবে তোমাকে।

এর পরেও কি তা সম্ভব ?

যা কিছু অসম্ভব ছিল স্বহস্তে তা দূর ক'রে দিয়ে গিয়েছেন পণ্ডিতজী। তোমার উপরে পিতৃত্বের দাবী সম্বরণ ক'রে নিয়ে তোমাদের বিয়ের পথ উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে গেলেন তিনি। এমন পিতৃস্নেহের কি তুলনা আছে ?

এদিক থেকে কথাগুলোকে বিচার করবার অবসর হয় নি তুলসীর, পর পর অভাবিত আঘাতে তার মন অসাড় হয়ে পড়ে'ছিল।

এখন পণ্ডিতজীর কথার যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে দ্বিগুণ বেগে জল পড়তে লাগলো তার চোখ দিয়ে, বিছানায় লুটিয়ে পড়ে চীৎকার ক'রে উঠল, বাবা, বাবা।

কিন্তু তখনি সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম আনন্দের একটি রশ্মিরেখা মনের মধ্যে এসে পড়লো, জীবনের সঙ্গে বিয়েতে আর বাধা নেই। এমন ঘনীভূত শোকের মধ্যে আনন্দের আবির্ভাবে সে প্রথমে বিস্মিত তারপরে লজ্জিত হ'ল। ছিঃ ছিঃ, সে বড় স্বার্থপর। পিতৃবিয়োগ-দুঃখের চেয়েও জীবনকে লাভের আনন্দ প্রবলতর হ'ল ! সে ক্ষমা করতে পারে না নিজেকে। উঠে অন্যত্র চলে যায়, যেন স্থান বদল হ'লেই মন বদল সম্ভব হবে।

পান্না একা বসে ভাবে কোন্ কূলের ফুল কোথায় এসে ভিড়লো। মনে পড়ে তারও এক বোন এমনি ভাবেই হয়তো ভেসে বেড়াচ্ছে, আর—কোথাও যদি আশ্রয় পেয়েও থাকে তবে হয়তো বা কোন্ দুর্গতির মধ্যে। আর সেই শিশুটি যে এসে বোনের স্থান জুড়ে বসেছিল, সেই বা গেল কোথায়, কোন্ নেকড়ের পেটে, কোন্ নেকড়ের ঘরে। আর সে নিজেই বা কি সৌভাগ্যবতী। ফৌজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, শেষ হবে গিয়ে কোন্ ভাগাড়ে কে জানে। তুলনায় অনেক বেশি সৌভাগ্য তুলসীর !

তুলসীর কথা মনে হ'তেই মনে পড়ে তুলসীর কথাগুলো। সত্যি আজ তুলসী তার সবচেয়ে আপন। স্রোতের ফুল আপনি এসে উঠেছে তার ঘাটের মধ্যে।

তখনি মনে পড়ে যায় তুলসীর মুখখানা, সে যেন কোন্ জন্মান্তের স্মৃতিকে মন্থন করতে থাকে। নৈনিতাল জেলায়, পাহাড়ের নীচে, বনের ধারে—এতখানি বলেও চরম রহস্যটুকু হাতে নিয়ে চলে গেলেন পণ্ডিতজী। নাঃ, জীবন-পাত্রের তলানি পর্যন্ত কিছুতেই পৌঁছতে পারা যায় না।

এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করে নয়নচাঁদ।

পান্নাদি, জীবন ফিরে যেতে চাইছে।

হাঁ, তাকে আর আটকে রাখা উচিত হবে না। কিন্তু আসবে কবে?

সে তো বলে, যত শীঘ্র সম্ভব আসতে চেষ্টা করবে, তবে ফৌজী ব্যাপার, নিশ্চয় ক'রে বলা সম্ভব নয়।

সে কথা সত্য।

তা ছাড়া, সে বলল, এবারে বোধহয় দিল্লি আক্রমণ শুরু হবে, তাই সমস্তই অনিশ্চিত।

পান্না বলে, তখন যে কি কাণ্ড ঘটবে ভাবতেই ভয় করছে।

জীবন বলেছে, সে দায়িত্ব তার, আমাদের বাড়ির উপরে যাতে হামলা না হয় তার ব্যবস্থা সে করবে।

তা করতে সে পারে। কর্নেল ব্রিজম্যানের সে ডান হাত। তবে আর তাকে আটকে রেখো না। কিন্তু যাওয়ার আগে একবার তুলসীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে না?

তুলসীর খোঁজেই তো এসেছিলাম, কোথায় গেল সে?

এখানেই ছিল, এইমাত্র গেল তার ঘরে।

তুলসীর ঘরে প্রবেশ ক'রে জীবন দেখতে পেলে যে সে বিছানার উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। বিনা ভূমিকায় তাকে তুলে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো; বাধা দিল না তুলসী। সে আজ সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, এমন অবস্থায় আশ্রয় যদি আগ বাড়িয়ে কাছে এসে থাকে তবে তাকে পরিত্যাগ করবে কেন? নারী ও লতা আশ্রয় ছাড়া বাঁচে না, যে-আশ্রয় কাছে পায় তাকেই জড়িয়ে ধরে। জীবনের মতো ধ্রুব আশ্রয় আর কোথায়?

জীবন তার মুখখানা তুলে ধরে চুমো খায়, অশ্রুসিক্ত কপোলের লাবণ্য লবণাক্ত লাগে তার মুখে। জীবন ভাবে, সুধা কি তবে লবণার্দ্র? ভাবে, হবেও বা, লবণাম্বুধি থেকেই তো একদিন উঠেছিল সুধাভাণ্ড!

শান্ত সমুদ্রের বুকের উপরে যে তরী দুখানা বারে বারে কাছে এসেও পরস্পরকে স্পর্শ করতে পারে নি, ঝটিকার তাড়ায় আজ তারা অনায়াসে

পাশাপাশি এসে ভিড়লো। তারা পরস্পরের দিকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো, কথা বলতে ভুলে গেল, কথা বলবার প্রয়োজন অনুভব করলো না, এই মুহূর্তের উপযোগী কথার এখনো সৃষ্টি হয় নি।

ঘড়িতে বাজে দশঘড়ি।

পরদিন ভোর হওয়ার আগেই জীবনলাল কোম্পানীর ছাউনিতে রওনা হয়ে গেল।

রুমালী এই ক'দিন ছট্‌ফট ক'রে মরেছে, সেই যে সোনার তক্তিটা পাঠিয়েছিল তার কি ফল হ'ল জানাবার জন্যে। অবশেষে আর কৌতূহল সম্বরণ করতে পারলো না, যেদিন জীবন রওনা হয়ে গেল তার কিছুক্ষণ পরেই সে উপস্থিত হ'ল পণ্ডিতজীর বাড়ির কাছে। দরজার সম্মুখেই দেখতে পেলো কাহ্নাইয়াকে, শুধালো, জীবনলালজী কোথায়? কাহ্নাইয়া ভিতরের কথা জানতো না, সোজাসুজি বলল, চলে গিয়েছে। পাছে আর কারো চোখে পড়ে যায় সেই ভয়ে রুমালী তাড়াতাড়ি ফিরে চলে এল। বাড়ি পৌঁছে অনেক দিন পরে তার মুখে হাসি ফুটলো, বুঝলো ফিরে যাওয়ার একটাই অর্থ সম্ভব, তক্তির রহস্য অবগত হয়ে বিয়ে ভেঙে গিয়েছে। তখন কি করবে ভেবে না পেয়ে আয়না বের করলো, অনেকদিন মুখ দেখে নি। কিন্তু আয়নাখানা সম্মুখে ধরেই চমকে উঠল—এ কি, গাছের কচিপাতা আগুনে ঝল্‌সে গেলে যেমন অবস্থা হয় তেমনি হয়েছে তার চেহারা। তবু তার মনে এতটুকু দুঃখ হ'ল না। কিসের জন্য চেহারা, কিসের জন্য রূপ। যার জন্য রূপ যৌবন সে তো চলে গিয়েছে চিরকালের জন্যে। তবে আর কেন? এখন থেকে মনের আগুনে ঝলসাতে থাকুক পোড়া রূপ, পোড়া যৌবন, কিছুতে তার আর প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

॥ দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত ॥

তৃতীয় ভাগ

॥ ১ ॥

নিকলসন-আবির্ভাব

ছাউনিতে পৌঁছতে ভোর হয়ে গেল।

হিন্দুরাও কুঠির কাছে যেতেই দেখা হ'ল গুরবচন সিং-এর সঙ্গে। সে তখন একখানা পাথরের উপরে বসে দাঁতন করছিল।

কখন এলে জীবনলালজী?

এই তো এসে পৌঁচচ্ছি, এখনো কুঠিতে ঢুকি নি।

এসেছ ভালই, তোমার ঐ ক্যালিবানকে সামলাও।

কেন, সে আবার কি করলো?

একসঙ্গে ক'দিকে লড়াই কবেবো বলো, ওদিকে সিপাহীদের হামলা, এদিকে ক্যালিবানের। আজ ক'দিন হ'ল ও বড ক্ষেপে উঠেছে।

আমি এসেছি, এখন ঠিক হয়ে যাবে।

তা যাবে, কিন্তু কর্নেল সাহেব খোঁজ করছিলেন যে, তুমি ফিরেছ নাকি?

হঠাৎ? আমার ছুটি তো এখনো ফুরোয় নি।

ফুরোয় নি সত্যি, তবে এদিকে বড় তাড়া।

কিসের?

শীগ্‌গিরই দিল্লি দখলের লড়াই শুরু হবে।

দিন-তারিখ ঠিক হয়ে গিয়েছে নাকি?

ভাবে-গতিকে তাই মনে হয়।

এই তো ক'দিন আগে গেলাম, তখনো তো কিছু শুনি নি।

ইতিমধ্যে যে জেনারেল নিকলসন এসে উপস্থিত হয়েছেন।

তাই নাকি! তবে তো সত্যই আর দেরি নেই।

আনন্দে আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জীবনলালের মুখ, বলে, এই ব্যাপারটা চুকে গেলে বাঁচা যায়।

গুরবচন বলে, বাঁচা যায় কি মরা যায় কে জানে?

ফৌজি আদমির পক্ষে ও দু-ই এক। তারপরে শুধোয়, এদিকে আয়োজন কি রকম কি হচ্ছে, বলো শুনি।

চলো কুঠিতে যাই, বলে লোটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায় গুরবচন।

জীবন শুধোয়, স্বরূপ কেমন আছে?

আছে ভালই, তবে কেমন মন-মরা, কারো সঙ্গে কথা বলে না, মেশে না, একা একা বসে থাকে, ঐ একরকম।

তারপরে বলে, লড়াই আসছে বলে কি ভয় পেয়ে গেল?

জীবন বলে, ভয় পাওয়ার লোক তো স্বরূপজী নয়।

দুজনে কুঠির দিকে যায়। জীবন বলে, এবারে আসল কথা বলো, তোমার আমার কথা থাক।

দিল্লি আক্রমণের তারিখ নিয়ে অনেক কথাই হয়েছে, কানাঘুষাও আমাদের কানে কিছু এসে পৌঁচেছে।

কি রকম, খুলে বলো।

জেনারেল নিকলসন এসেই দেখা করলেন জেনারেল আচডেল উইলসনের সঙ্গে, অনুরোধ করলেন, তিন দিনের মাথায় আক্রমণ শুরু করতে হবে। জেনারেল সাহেব রাজী হয় না, গাঁইগুঁই করে, এটা নেই সেটা নেই। তখন নিকলসন সাহেব রেগে লাল হয়ে বেরিয়ে চলে এলেন জেনারেলের তাঁবু থেকে।

জীবন আগ্রহের সঙ্গে শুধোয়, তারপরে?

তারপর আর কি, সোজা চলে এলেন এখানে কর্নেল ব্রিজম্যানের তাঁবুতে। আমি তখন ডিউটিতে ছিলাম। ভিতরে কথা হচ্ছিল নিকলসন, ব্রিজম্যান, ক্রসম্যান আর রবার্টস্-এর মধ্যে।

শেষের লোকটি কে হে?

একবারে ছোকরা, সেকেণ্ড লেফ্‌টেনান্ট, নিকলসনের পূর্ব-পরিচিত।

গুরবচন বলে যায়, জেনারেল উইলসন যদি আবার দিন পিছিয়ে দিতে চায়, বাইরে থেকে বেশ শুনতে পাচ্ছি জীবনলাল, নিকলসন বলছে, তবে আমি কাউন্সিলে প্রস্তাব করবো যে, উইলসনকে সেনাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। একথা শুনে রবার্টস্ বলে ওঠে, সেটা কি ক'রে হবে জেনারেল? পদমর্যাদায় তুমি উইলসনের ঠিক নিচেই। লোকে ভাববে নিজে সেনাপতি হওয়ার আশাতে বোধ হয়—

কথা শেষ করতে দেয় না রবার্টস্‌কে, নিকলসন বলে ওঠে, সে বিষয়েও আমি ভেবে ঠিক ক'রে রেখেছি। আমিই প্রস্তাব করবো কর্নেল ক্যাম্বেলের নাম, ক্যাম্বেলকে সেনাপতি পদ দেওয়া হোক।

তারপরে ঘোষণা করে, পদমর্যাদায় আমি ক্যাম্বেলের উপরে হ'লেও দিল্লি

দখলের লড়াইয়ে তার অধীনে কাজ করতে রাজী আছি।

এই পর্যন্ত বলে গুরবচন সিং থামে।

আর কিছু শুনেছ নাকি ?

গুজব শুনছি নাকি নিকলসন ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করেছে উইলসনকে।

কী সর্বনাশ !

সর্বনাশ নয় ?

জীবন চমকে উঠে বলে, আরে থাম্ থাম্, হয়েছে, হয়েছে খুব হয়েছে, এখন থাম্।

ক্যালিবান ছুটে এসে জীবনের পায়ের কাছে গড়াতে শুরু করেছে।

গুরবচন বলে, হাত দিয়ে একটু আদর না করলে থামবে না।

তখন জীবন নত হয়ে পড়ে হাত দিয়ে তার চুলের ঝুঁটি টেনে দেয়, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, পিঠের উপরে স্নেহের সঙ্গে চাপড় মারে, এতক্ষণ পরে সে শান্ত হয় আর ধীরে ধীরে বীভৎস সুন্দর মুখখানা তুলে তাকায় জীবনলালের দিকে। জীবন দেখতে পায় তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে ঠোঁটের কোণায় এসে বাধছে, যেখানে বিকশিত হয়ে আছে একটি হাসি, রাহুর পাহারায় শিশু চাঁদের ফালি।

কিরে কি ভাবছিস ? আহা, প্রকাশ করবার শক্তি নেই। দুঃখ কি রে, আমরাও সব কথা প্রকাশ ক'রে বলতে পারি নে।

মূক ও মুখরের অভিনয় দেখে কৌতুক অনুভব করে গুরবচন সিং।

এমন সময়ে বের হয়ে আসে স্বরূপ।

স্বরূপ ভাই, কেমন আছ ?

আছি এক রকম, তুমি কখন ফিরলে জীবনলাল।

এই তো আসছি।

তারপরে, ওদিকের সব খবর ভালো ?

কোন্ দিককার বুঝতে পারে না জীবনলাল।

স্বরূপ বোঝে, মনের ভিতরকার কথাটা উছলে উঠেছে মুখে, কিছু অপ্রস্তুত হয়ে সংশোধন ক'রে নেয়, শুধোয়, পান্না বিবি ভালো আছে তো ?

রেখে তো এলাম ভালোয় ভালোয়, তবে দিল্লি দখলের লড়াই আরম্ভ হ'লে কেমন দাঁড়াবে বলা যায় না।

এ আশঙ্কা আগে দেখা দেয় নি স্বরূপের মনে, এখন দেখা দেয়, বলে, সেটা ভয়ের কারণ বৈকি। তখন কি আর দোষী-নির্দোষ বিচার করবার অবস্থা থাকবে ?

জীবন বলে, পান্না বিবির চ্যাম্পিয়ান হচ্ছে কর্নেল ক্রসম্যান, তাকে বলে

একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

ভালোবাসার অনেক দায়।

সে তো বুঝতেই পারছি স্বরূপভাই। এই দেখো না কেন, ক্যালিবান একটা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ও আবার দায় হ'তে যাবে কেন?

লড়াই বেধে উঠলে ক'দিন চলবে কে জানে, তখন ওকে কার কাছে রেখে যাবো, বলো তো।

ছাউনিতে পাহারার লোক থাকবে, তাদেরই জিম্মায় দিয়ে যাবে।

তাদের জিম্মায়! ও যে আর কারো হাতে খায় না।

দায়ে পড়লে খাবে।

তারপরে, যদি মরি?

তা-ও ক্রমে সহ্য হয়ে যাবে। ছনিয়ায় সবই সহ্য হয়ে যায়।

জীবন সংক্ষেপে বলে, তা বটে।

কিন্তু স্বরূপের বক্তব্য এত সংক্ষিপ্ত নয়। সেটা বাইরে প্রকাশ না পেলেও মনের অন্ধকারে বাদুড়ের মতো পাখা ঝাপ্‌টাতে থাকে। স্বরূপের বিচ্ছেদ সহ্য হয়ে এসেছে তুলসীর, তুলসীর বিচ্ছেদ সহ্য করবার চেষ্টা করছে স্বরূপ; আবার জীবনের যদি কিছু হয় তা-ও কালক্রমে সহ্য হয়ে যাবে তুলসীর। সংসার সহিষ্ণুতা-শিক্ষার পাঠশালা। স্বরূপের একবার ইচ্ছা হয়েছিল তুলসীর খবর শুধোয়, মুখে বাধলো, মনেও। না, একবার যখন পঞ্চমাঙ্কের অবসানে যবনিকা পড়েছে আর তুলবার চেষ্টা উচিত নয়। বিয়োগান্ত নাটকের পরে প্রহসনের অভিনয় নিতান্তই কটু হবে।

গুরবচন বলে, চলো, ভিতরে চলো। তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে নিতে হবে।

এত তাড়া কিসের?

সারাদিন ড্রিল আর ডিউটি। সেদিন আর নেই ভাই। জেনারেল উইলসনের ঘুমন্ত পালে বাঘ পড়েছে—জেনারেল নিকলসন, পেশবারী পল্টন যাকে সমীহ ক'রে বলে নিকলসাঁই। চলো।

সারাদিনের ডিউটি সেরে জীবনলাল যখন শয্যাগ্রহণ করলো তখন ঘাড়তে দশটা বেজে গিয়েছে। ঘুম আসতে চায় না, সারাদিনের বিচিত্র পর্যায় যেন দিনটাকে লম্বা ক'রে দিয়েছে। সে ভাবে, কাজ করলে এত কাজের সময় পাওয়া যায়, দিন আর ফুরোতেই চায় না। কুঁড়েতেই কেবল বলে থাকে, সময়

পাই না, দিনটা চট্‌ ক'রে চলে গেল।

প্রথমে গিয়ে সে রিপোর্ট করেছিল কর্নেল ব্রিজম্যানের কাছে।

স্তালুট ক'রে দাঁড়াতেই ব্রিজম্যান বলে উঠল, গীবন, তুমি নিশ্চয় জীবনরক্ষার মাদুলি পেয়েছ, নইলে এতবার শত্রুপুরীতে গিয়ে নিরাপদে ফিরে আসছ কি ক'রে?

জীবন সেই হাসি হাসে যা দেখে স্তার হেনরি লরেন্স মুগ্ধ হ'ত। জীবনের মনে পড়ে তার কথা।

যাই হোক আর ছুটিছাটার দরখাস্ত ক'রো না। শীঘ্রই আক্রমণ আরম্ভ হবে।

তারিখ ঠিক হয়েছে কি?

এখনো সুনিশ্চিত ভাবে হয় নি, তবে যত কাছে ভাবছ তার চেয়েও কাছে, সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পার হবে মনে হয় না।

আমার স্পেশাল ডিউটি কিছু পড়েছে কি?

স্পেশাল ডিউটি এখনো ভাগ করা হয় নি, তবে একটা জেনারেল ডিউটি সকলকেই বহন করতে হবে।

কি সেটা স্তার?

মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকা। এখন যাও।

স্তালুট ক'রে বিদায় নিয়ে সে চলে যায় কর্নেল ক্রসম্যানের তাঁবুতে। পান্নার বিষয় তাঁকে জানানো দরকার।

কি জীবন, সব ঠিক মতো হয়েছে তো?

আজ্ঞে হাঁ।

যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটে নি তো?

না।

কার বাড়িতে রেখে এলে?

পণ্ডিত সুখানন্দজীর বাড়িতে, তাঁরা কোম্পানীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

সে তো বুঝতেই পারছি, নইলে সেখানে নিয়ে যাবে কেন?

একটা কথা ভাবছি স্তার।

কি বলো।

লড়াই আরম্ভ হয়ে গেলে সে-বাড়িতে না অত্যাচার হয়।

সে আশঙ্কা যে একেবারে নেই তা নয়। আচ্ছা, বাড়িটা শহরের কোন্‌ দিকে বলো তো?

শাহ্‌জাহানাবাদের একেবারে দক্ষিণ দিকে, দিল্লি সদর বাজারের কাছাকাছি।

তবে নিশ্চিন্ত থাকো। লড়াইয়ের ঢেউ ও পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই লড়াই খতম হয়ে যাবে।

জীবন ভাবে, নিশ্চিন্ত হওয়া ছাড়া আর উপায় কি? বিদায় নিয়ে চলে যায়।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে, একে একে মনে পড়ে সারাদিনের অভিজ্ঞতা, ছাউনি জুড়ে লোকের ব্যস্তসমস্ত ভাব, প্রকাণ্ড মৌচাকের কর্মচঞ্চলতা। ভারি একটা আত্মগ্লানির ভাব অনুভব করে। তার সমস্ত মৃত্যুর সঙ্গীরা, বড় থেকে ছোট, যে যার ডিউটি ক'রে যাচ্ছে আর সে কি না প্রেম ও নারী নিয়ে মত্ত হয়ে রয়েছে। সেই যে সেদিন এলিনা ক্লিফোর্ডের তত্ত্ব নিতে গিয়েছিল তারপর থেকে কী বিচিত্র নাগরদোলার ঘুরপাক খেয়ে মরছে সে। বেশ কিছুকাল হ'ল। কোথায় পড়ে রইলো সামরিক কর্তব্য, সে পরিণত হ'ল নারী-বাহনে, রুমালী, পান্না, তুলসী। না, না, এমন আর চলতে দেওয়া উচিত নয়। কাল থেকে নিজেকে ডুবিয়ে দেবে কঠোর কর্তব্যের লবণাম্বুতে, সকলের সঙ্গে মিলে মৃত্যুকে নেবে ভাগাভাগি ক'রে।

হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায়, ভোরবেলাকার বিউগল বাজছে, আর সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে গুরবচন সিং।

কি, ঘুম ভাঙলো?

লজ্জিত জীবনলাল উঠে দাঁড়ায়।

॥ ২ ॥

স্বরূপের সঙ্কল্প

জীবনকে নিয়ে গুরবচন সিং গিয়ে ওঠে অবজারভেটারির মাথায়, সঙ্গে স্বরূপ।

গুরবচন বলে, জীবনলালজী, তুমি যে-কয়দিন গরহাজির ছিলে তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, সরেজমিনে দেখিয়ে দেবো বলেই এখানে এসেছি তোমাকে নিয়ে।

পরিবর্তনের বহর লক্ষ্য ক'রে সত্যই বিস্মিত হয় জীবনলাল, বলে, তাই তো দেখছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কাণ্ড ঘটলো কি ক'রে?

গুরবচন বলে, জেনারেল নিকলসনের হুকুমে।

তারপরে মন্তব্য করে, মানুষ তো নয়, আগুনের হল্‌কা।

স্বরূপ কোন মন্তব্য করে না, সঙ্গদানের ইচ্ছায় এসেছে, নীরবে শুনে যায়।

গুরবচন বলে যায়, আমাদের ছাউনিতে একটা কথা মুখে মুখে চলছে, জেনারেল উইলসন বরফের চাঙড়, যেমন ঠাণ্ডা তেমনি স্থাণু, নড়েও না গলেও না। আর জেনারেল নিকলসন হচ্ছে চলন্ত আগুন। তার তাপে এতদিন পরে বরফের চাঙড় গলে নড়তে শুরু করেছে।

তাই তো মনে হচ্ছে।

আর শুধু জেনারেল উইলসনকেই বা কেন, ছাউনি সুদ্ধ ছোট বড় সকলকে নড়িয়ে তুলেছে।

জীবনলাল এতক্ষণ পূব দিকে অর্থাৎ পাহাড় ও শহরের মাঝখানকার জায়গাটা লক্ষ্য করছিল, এবারে বলল, অনেকগুলো নূতন ব্যাটারি বসানো হয়েছে দেখছি।

হাঁ, চারটে। এসব ভারি ওজনের কামান এসেছে জেনারেল নিকলসনের সঙ্গে। এদেরই একটা গোলা শহরের মধ্যে গিয়ে ঠিকরে পড়ে তোমার জল্লাদকে বধ করেছিল। বাবা, এ হচ্ছে নিকলসনের অন্তর্যামী গোলা।

এই বলে নিজের রসিকতায় নিজে হেসে ওঠে।

ব্যাটারির সংস্থান লক্ষ্য ক'রে জীবন মন্তব্য করে, এতদিন পরে সত্য সত্যই অফেন্‌সিভ লড়াই শুরু হবে মনে হচ্ছে।

এই বলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, বলে, যাক, তাহলে এতদিনকার ডিফেন্‌সিভ লড়াইয়ের পালা শেষ হ'ল।

তারপরে বলে, ব্যাটারির তিনটেই দেখছি কাশ্মীর দরবাজা থেকে পানিবুরুজ পর্যন্ত উত্তর দিকে। মনে হচ্ছে আক্রমণটা ঐ দিকেই হবে।

এ কথা তোমার আর স্বরূপজীর চেয়ে কারো বেশি জানবার নয়, তোমরা সেদিন রাতে গিয়ে কার্জন হাউসের ভাঙা বাড়িটা তদারক ক'রে এসেছিলে।

জীবনের মন সেদিকে ছিল না, দুরবীন বাগিয়ে ভালো ক'রে দেখে নিচ্ছিল ব্যাটারিগুলো। এদিকে গুরবচন আপন মনে বকে যায়—চন্দ্রিমার কাবাবের গন্ধ কর্নেলের কানে পৌঁছেই আমার যাওয়া বন্ধ হ'ল, নইলে আমিও যেতে পারতাম।

এবারে জীবন সাড়া দেয়, বলে, আর তুমি মারা গেলে চন্দ্রিমার কাবাবগুলোর কি হ'ত?

প্রেত হয়ে এসে খেয়ে যেতাম। সত্যি ভাই খাসা কাবাব, নিজের জন্ধ বলে

বড়াই করছি না। সে কাবাব খেলে স্বরূপজীর গোমড়া মুখেও হাসি ফুটতো।

স্বরূপের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে জীবনলাল, শুধায়, স্বরূপ ভাই, তোমাকে ক'দিন থেকে এমন বিষণ্ণ দেখছি কেন?

স্বরূপ বলে, দুনিয়ায় খুশী হওয়ার মতো কিছু তো দেখতে পাই নে। যতক্ষণ প্রাণ থাকে দেহটাকে টেনে যাও—এরই নাম জীবনধারণ, কি বলো?

গুরবচন বলে, কিন্তু আমাদের এই জীবনের রকম-সকম ভিন্ন, সবতাতেই খুশি, সবতাতেই হাসি। সব্‌সে রস লেনা চাহিয়ে ভাই।

জীবন মন্তব্য করে, ঠিক বলেছ গুরবচন ভাই, চন্দ্রিমার কাবাব আর চোপা দুটোরই রস নিতে হবে। নয় ভাই গুরবচন?

গুরবচনের বদলে স্বরূপ উত্তর দেয়, কিন্তু পরিবেশনের ভুলে কারো কারো পাতে শুধু চোপা পড়ে।

জীবন ও গুরবচন বুঝতে পারে না, এমন কি দুর্ভাগ্য ঘটেছে এই ক'দিনের মধ্যে স্বরূপের।

তখন প্রসঙ্গ বদলে জীবন শুধায়, সামি হাউসের পুব দিকে এই নূতন ব্যাটারিটা আবার কেন? আক্রমণ তো হবে উত্তর থেকে।

গুরবচন বলে, এটা বোধহয় ধোঁকা দেওয়ার জন্যে, ওরা যাতে ভাবে আক্রমণ হবে লাহোর দরজার উপরে।

কিম্বা এমনও হ'তে পারে, সিপাহী ফৌজ যাতে আমাদের ছাউনির পাশ কাটিয়ে পিছনে গিয়ে না পড়তে পারে সেই জন্য এই ব্যবস্থা।

দুটো উদ্দেশ্যই একসঙ্গে থাকা বিচিত্র নয়।

ওদিকে কি দেখছ জীবনলালজী, ও তো শহর শাহ্‌জাহানাবাদের দক্ষিণ দিকে তাকিয়েছ, ওখানে শাহী ফৌজ আছে কিনা জানি না, কোম্পানী ফৌজ অবশ্যই নেই।

জীবন সত্য সত্যই দুরবীন উঁচিয়ে তাকিয়েছে ফুলকী-মণ্ডীর বাড়িগুলোর দিকে।

স্বরূপ মনে মনে বলে, ওখানে ফৌজ নেই মৌজ আছে।

জীবন অপ্রস্তুত হয়ে দুরবীন নামায়। গুরবচন হঠাৎ হেসে উঠে বলে, বুঝেছি, ওখানে বুঝি পান্না বিবিকে রেখে এসেছ।

আবার স্বরূপ মনে মনে বলে, পান্না তুচ্ছ, ওখানে আছে খাস হীরের খনি।

অবাধ্য মনকে শাসায় স্বরূপ, আবার কেন? তোমার ভাগ্যে সুখ না জুটে

যদি অপরের ভাগ্যে জুটে থাকে, সে দোষ কি অপরের ? দুর্ভাগ্যের উপরে আর ঈর্ষার পাপে পাপী হয়ো না।—কিন্তু অবাধ্য মন কি বোঝে ? ভাবে স্বরূপ বেঁচে আছে জানলে তুলসী কখনো রাজী হ'ত না জীবনকে বিয়ে করতে। চিরকাল তো আর তার পক্ষে আইবুড়ো থাকা সম্ভব নয়। মন বোঝে বলে বোধ হয় না।

পান্না বিবিকে ছাদের উপরে দেখতে পেলে কি ?

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেওয়ার আশায় জীবন শুধোয়, এতগুলো ব্যাটারি তৈরি হ'ল, সিপাহী ফৌজ বাধা দিল না !

জানতে পারলে তো। সমস্ত এক রাতের মধ্যে তৈরি ক'রে ফেলা হয়েছে। ভোরবেলা উঠে ওরা অবশ্য খুব কামান চালাল, কিন্তু তখন আমাদেরও কামান তৈরি।

এবারে তবে উদ্যোগ-পর্ব শেষ হয়েছে বলা যেতে পারে ?

স্বরূপের অবাধ্য মন মন্তব্য করে, তোমার পক্ষে আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে স্ত্রী-পর্ব।

এমন সময়ে কর্নেল ব্রিজম্যানের অর্ডারলি এসে জানায়, কর্নেল সাহেব তাদের তিনজনকে জোর তলব করেছেন।

অবজারভেটারি টাওয়ার থেকে নেমে কর্নেলের কামরায় ঢুকে তারা তিন-জনে স্যালুট ক'রে দাঁড়ায়।

কোন রকম ভূমিকা না ক'রে ব্রিজম্যান শুরু করে, স্বারূপ, অতিশয় বিপজ্জ-নক কাজের জন্য ভলান্টিয়ার চেয়েছিলাম, অনেকগুলি নাম পাওয়া গিয়েছে। সেই তালিকার একটা কপি এসেছে আমার কাছে। দেখে বিস্মিত হলাম যে, তার মধ্যে তোমার নাম রয়েছে।

বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারলাম না, স্যার।

আমাকে আগে জানাতে পারতে।

সেরকম তো কোন বিধিনিষেধ দেখলাম না আহ্বানপত্রে।

তা না হয় যাক, এ কাজ যে অতিশয় বিপজ্জনক তা নিশ্চয় জানো।

আহ্বানপত্রে সেই রকমই উল্লেখ ছিল, আরও উল্লেখ ছিল যে বিবাহিত ব্যক্তিকে গ্রহণ করা হবে না ভলান্টিয়ার রূপে।

তবে ?

চুপ ক'রে থাকে স্বরূপ, অন্য দুইজনেও। তারা বিন্দুবিসর্গ জানতো না এ ব্যাপারের।

এ কাজে মৃত্যু হবে বলে ধরে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে।

সে কথা আমি ভেবেছি।

তবে কেন মরতে চাও?

গোরা সিপাহী যারা নাম লিখিয়েছে তারা কেন মরতে চাইছে?

সাম্রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে।

আর যে-সব হিন্দুস্থানী সিপাহী নাম লিখিয়েছে?

তারা নিমকের মূল্য দিতে চায়। তুমি তো সিপাহী নও, তবে কেন অযথা মরতে চাও?

স্বরূপের মুখ দিয়ে আর একটু হ'লেই বেরিয়ে গিয়েছিল আর কি, আমার বাঁচবার ইচ্ছে নেই।

এখন যাও, তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করো গিয়ে।

তারপরে জীবন ও গুরবচনের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমরা চেষ্টা করো তোমাদের বন্ধুকে নিবৃত্ত করতে। হিসাবে এমন মাথাওয়ালা লোকটিকে আমি হারাতে চাই নে। বারোটার মধ্যে য়্যাডজুটাণ্ট জেনারেলের কাছে আমার মন্তব্য পাঠাতে হবে, আশা করি তার আগে পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত জানতে পাবো। এখন যাও।

স্যালুট ক'রে তিনজনে বিদায় নেয়।

॥ ৩ ॥

বখৎ খাঁর খাস কামরায়

সিপাহ্‌সালার বখৎ খাঁর খাস কামরায় কোম্পানী পক্ষের আসন্ন আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পরামর্শ-সভা বসেছে। সিপাহ্‌সালার বখৎ খাঁ, চীফ ইঞ্জিনিয়ার মহম্মদ আলি, মীর আতশ বা হেড গোলন্দাজ কুলি খাঁ, য়্যাডজুটাণ্ট জেনারেল মীর্জা মুঘল, কর্নেল মীর্জা খিজির সুলতান, মীর্জা আবুবকর, মীরাটী ফৌজের অধিনায়ক কুলিজ খাঁ ও শেখ বান্নু এবং নিমচী ফৌজের অধিনায়ক ঘউস মহম্মদ প্রভৃতি যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট। আর এইসব সামরিক ব্যক্তি ছাড়া আছে—উজীর হাকিম আসানুল্লা খাঁ।

হাকিম আসানুল্লা একবার সকলকে দেখে নিয়ে বলল, সিপাহ্‌সালার সাহেব, এইসব সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে আমার উপস্থিতি হাঁসের সভায়

বকের মতো নয় কি ?

সেইজন্যই তো আপনার দরকার সবচেয়ে বেশী। শিকারী হিসাবে বকের স্থান হাঁসের অনেক উপরে, বকের ঠোঁটের ও নখের ধার হাঁস কোথায় পাবে ?

এই যদি আপনার অস্ত্রের নমুনা হয়, তবে লড়াই ফতে করবার আশা দেখতে পাচ্ছি না।

বখৎ খাঁ হেসে বলল, আরও কিছু অস্ত্র অবশ্য আছে।

এই ব'লে তাকালো কুলি খাঁর দিকে, বলল, মীর আতশ, তোমার বক্তব্য বলো।

হেড গোলন্দাজ কুলি খাঁর চেহারা একটা নিরেট কামানের গোলার মতো। যেমন শক্ত, তেমনি কালো, তেমনি গোলাকার। গোলন্দাজরা কানাকানি করে, মীর আতশকে কামানে ভ'রে দাগলে কুতুবমিনারটাকে ধসিয়ে দিতে পারে।

সেই মীর আতশ আরম্ভ করলো :

সিপাহ্‌সালার, এতদিন আমাদের ধারণা ছিল দিল্লি দখলের সময়ে কোম্পানী আক্রমণ করবে কাশ্মীর দরবাজা থেকে লাহোর দরবাজার মধ্যে। সেইভাবেই পরিখা খুঁড়েছি, বুরুজে কামান সাজিয়েছি, আরও যা যা দরকার করেছি। কিন্তু ক'দিন আগে কোম্পানী শহরের উত্তর দিকে ভারি কামানের তিনটে নূতন ব্যাটারি তৈরি করেছে, তাতে মনে হচ্ছে আক্রমণটা আসবে কাশ্মীরবুরুজ আর পানিবুরুজের মধ্যে প্রাচীরের উপরে। এই সংবাদ রিপোর্ট করবার জন্যই আজ আপনাদের এখানে ডেকেছি।

কুলি খাঁ থামবামাত্র কুলিজ খাঁ ব'লে উঠল, আমি চললাম।

এরই মধ্যে ? সলা শুরু না হ'তেই ?—ব'লে ওঠে কুলি খাঁ।

সিপাহ্‌সালার ডাকলে আমরা আসতে বাধ্য, কিন্তু মীর আতশের ডাকে আসবো কেন ? ওঠে হে শেখ বান্নু।

এই ব'লে শেখ বান্নুর হাত ধরে টানে। কিন্তু শেখ বান্নুর তখন উঠবার অবস্থা নেই। শূন্য দুটি ব্রাণ্ডির বোতল তার কারণ। আর একবার টান দিতেই নিমীলিত নেত্র কোনক্রমে অর্ধনিমীলিত ক'রে শেখ বান্নু তাকায় তৃতীয় বোতলটার দিকে। বোঝা গেল যে, সেটার মধ্যে কিছু বস্তু অবশিষ্ট থাকা অবধি সে উঠবে না। অগত্যা বসে পড়ে কুলিজ খাঁ।

বখৎ খাঁ বলে, কর্নেল, [illegible]নারা আমার ডাকে এসেছেন, তবে যে মীর

আতশ তার ডাক বলল—সেটা ভুল।

কুলিজ খাঁ বলল, মীর আতশের কামান ও মুখ দুয়েরই এক অবস্থা, ভুল করতেই জানে। আজ তিন মাস হয়ে গেল কোম্পানীর ক'টা সৈন্যকে হঠাতে পারলো না পাহাড় থেকে।

আহা কুলিজ খাঁ, তুমি থামো। ঘরের মধ্যে আর লড়াইয়ের কারণ ঘটিয়ো না, বাইরে বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে।

কুলি খাঁ কোন রকমে আত্মসংযম রক্ষা করে।

আপনারা মিছামিছি মীর আতশকে দায়ী করছেন। সিপাহ্‌সালারের হাতের লোক, তিনি যা শিখিয়েছেন তেমনি বলেছে লোকটা।

এই পর্যন্ত সাধারণভাবে ব'লে ঘউস মহম্মদ তাকায় সিপাহ্‌সালারের দিকে। বলে, আপনি কি বলতে চান, উত্তর দিকে আক্রমণ হ'লে আমার নিমচী ফৌজ আটকাতে পারবে না? আমরা কি নাবালক নাকি?

না, বালক!—ব'লে ওঠে কুলি খাঁ। এতখানি শ্লেষ কেউ আশা করে নি ঐ নিরেট লোকটার মধ্যে, অনেকে হেসে ওঠে।

এবারে ঘউস মহম্মদ দাঁড়িয়ে উঠে বলে, এমন হ'লে আমার নিমচী ফৌজ নিয়ে স'রে পড়বো, যমুনার পুলের কাছেই আমাদের থানা।

মহম্মদ আলি নিমচী ফৌজ ও মীরাটী ফৌজের ব্যবহারে তিতবিরক্ত হয়ে গিয়েছিল, কাজেই ব'লে উঠল, সেইজন্যই তো ওখানে থানা গেড়েছ।

তার মানে?

পালাবার পথের মুখে আছো—যাতে যথাসময়ে স'রে পড়তে পারো, পড়বেও তাই।

আহা, চীফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, আপনি থামুন!—বলল বখৎ খাঁ।

সিপাহ্‌সালার সাহেব, আজ তিন মাস থেমেই তো আছি, কিন্তু সংযমেরও একটা সীমা আছে। সেই গোড়া থেকে লক্ষ্য করছি, নিমচী ফৌজ আর মীরাটী ফৌজ যত নষ্টের গোড়া। ওরা না থাকলে আমাদের কাজ অনেক সহজ হ'ত।

বখৎ খাঁ বাধা দেয় না, তার মনের কথাও প্রায় এইরকম। প্রধানত রাজনৈতিক কারণেই এতদিন ব্যক্ত করতে পারে নি। এখন অপর একজনে বলছে—ভাবলো, ভালই।

মহম্মদ আলি ব'লে যায়, সত্যি সিপাহ্‌সালার, আমি বুঝতে পারছি না; আমাদের প্রধান শত্রু কে,—কোম্পানীর ফৌজ, না এই দুই ফৌজ! ওরা

আসবার পর থেকে শহরে শান্তি নেই। লুটতরাজ, খুনখারাপি, রাহাজানি, ডাণ্ডাবাজি, গুণ্ডাবাজি, মায় ভদ্রঘরের মেয়ে নিয়ে টানাটানি।

মুখ সামলে বেয়াদব!—গর্জে ওঠে আবুবকর।

আপনাকে বলি নি, শাহ্‌জাদা।

ফের মুখের উপরে কথা, বেয়াদব!

এবারে আবুবকর তাকায় অপর দুই শাহ্‌জাদার দিকে, উঠুন, এখানে মিছিমিছি এসব বেইমানী কথা শুনে কি লাভ?

সাড়া দেয় না মীর্জা মুঘল ও খিজির সুলতান।

এবারে বখৎ খাঁ বলে, শাহ্‌জাদা, আপনি অকারণ গোসা করছেন। ভেবে দেখুন, আমরা জান কবুল ক'রে লড়ছি কাদের জন্য?

তন্‌খা খাও সেইজন্যে লড়ছ। আর কি?

কোম্পানী কি তন্‌খা দিত না? মাসের পয়লা তারিখে দিত। আর এখানে তিন মাসের তন্‌খা বাকি।

এবারে ঘউস মহম্মদ সুযোগ পেলো, তবেই বুঝুন, লুটতরাজ না করলে চলে কি ক'রে?

তার কথায় কর্ণপাত না ক'রে বখৎ খাঁ বলে যায় আবুবকরের উদ্দেশে—না শাহ্‌জাদা, আমরা তন্‌খার আশায় লড়ছি না; তনখার লোভে জান দেওয়া যায় না। আমরা লড়ছি ফিরিঙ্গী দুশমনকে হিন্দুস্থান থেকে হঠিয়ে দিয়ে বাদশাহী কায়েম করবার জন্যে। আর খাস শাহ্‌জাদার মুখে কিনা এই কথা!

আরে মিঞা, বাদশাহী কায়েম হ'লে আমার কি? যতদিন বুঢ্‌ঢা আছে ততদিন গদির আশা কারো নেই। তারপরে হয় মীর্জা মুঘল, নয় ওই কাঠের পুতুল জবান বখৎ গদিতে বসবে, আমার কি লাভ?

একসঙ্গে সকলে তো বাদশা হ'তে পারে না।

তবেই বোঝো আমার কি লাভ!

কিন্তু বাদশাহী গেলে, শাহ্‌জাদা?

তখনো যে চাটাই এখনো সেই চাটাই।

না শাহ্‌জাদা, তার চেয়েও বেশী। কোম্পানী জিতলে কোন শাহ্‌জাদা প্রাণে বাঁচবে না। দিল্লিতে যে-সব ফিরিঙ্গী কোতল হয়েছে তার পাক্কা হিসাব আছে কোম্পানীর খাতায়। রক্তের অক্ষর ধুলে যাবে না।

ব্যঙ্গের হাসি হেসে আবুবকর বলে, এমন জুজুর ভয় না পেলে আর

সিপাহ্সালার। আর দেরি কেন, যাও জেনারেল উইলসনের বুট্ জুতোর উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ো গিয়ে। আশা করি চিঠি চালাচালি শুরু হয়ে গিয়েছে।

এবারে মহম্মদ আলি উত্তর দেয়, শাহ্জাদাদের দৃষ্টান্তে সেটা এতদিনে শেখা উচিত ছিল।

মীর্জা মুঘল দেখে যে, বিতণ্ডা বিপদের কাছে এসে পড়েছে। বলে, অনেক হয়েছে, এখন থামো শাহ্জাদা।

আবুবকর অগ্নিগর্ভ-পর্বতের মতো গুমরে গুমরে উঠতে থাকে, যে-কোন মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাত হওয়ার আশঙ্কা।

হাকিম আসানুল্লা মনে মনে ভাবে, চ্যাঙড়া শাহ্জাদার দল সিপাহীদের প্রশ্রয় দিয়ে বিপদটা বাধিয়েছে, মরতে মরবে বুড়ো বাদশা। বৃদ্ধ বাহাদুর শার প্রতি তার আনুগত্য ও শ্রদ্ধা ছিল। বাদশা বিপন্ন হন এ তার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু আজকে সে নিশ্চয় ক'রে বুঝতে পারলো, তাঁকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই। বুঝলো যে, বাদশাহীর শেষ ও শেষ বাদশার অন্তিমকাল আসন্ন। কিন্তু মুখ খুলতে সাহস হয় না, দুই পক্ষেই তালরক্ষা ক'রে চলতে চেষ্টা করছে সে। কাজেই এমন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ পন্থা নীরবতা।

আপনি কি বলেন, উজীর সাহেব?—শুধোয় সিপাহ্সালার।

আমি তো আগেই বলেছি, যুদ্ধবিগ্রহের আমি কিছু বুঝি নে।

ঘউস মহম্মদ বলে, আদায়-উসুলের কাজ বোঝেন তো? আমার পল্টন আজ তিন মাস তন্‌খা পায় নি, তার কি হয়?

কর্নেল সাহেব, আপনার পল্টন বাদশার জন্য স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে এসেছে, তন্‌খার প্রশ্ন উঠছে কেন?

ঘউস মহম্মদ বলে, না খেয়ে প্রাণ গেলে দেবে কি?

সেটাও আপনাদের বুঝবার ভুলে। চুপচাপ বসে না থেকে লড়াই করলে এতদিনে রাজ্য উদ্ধার হ'ত।

কিংবা প্রাণটা যেতো—বলে ঘউস মহম্মদ।

প্রাণে মরবে না অথচ লড়াই করবে এমন যুদ্ধের রীতি তো আমার জানা নেই, কর্নেল সাহেব!—বলল আসানুল্লা খাঁ।

কথাটা মিথ্যা নয়, এই তিন মাসের মধ্যে নিমচী ফৌজ একবারও লড়াইয়ে নামে নি।

দোষটা বখৎ খাঁর ঘাড়ে চাপাবার উদ্দেশ্যে ঘউস মহম্মদ বলে, সিপাহ্-

সালার হুকুম করবার মালিক।

তখন সিপাহ্‌সালার বলে, সেই হুকুম করবার জন্যই তো ডেকেছি।

হুকুমটা কি শুনি?

বখৎ খাঁ দেখলো যে, সরাসরি নিমচী ফৌজকে উত্তর দিকে থেকে স'রে আসতে হুকুম করলে মানবে না, তাই একটু রাজনীতি ক'রে বলল, মীরাটী ফৌজ আর নিমচী ফৌজ জায়গা বদল করবে।

ফল হ'ল উল্টো। একসঙ্গে কুলিজ খাঁ ও ঘউস মহম্মদ লাফিয়ে উঠে বলল, কভি নেহি, মেরি ঝাঁসি নেহি ছোড়েঙ্গী।

শেষোক্ত বাক্যটা তখন মুখে মুখে ছড়িয়ে প'ড়ে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। হতাশ বখৎ খাঁ বলে, এমন করলে কোম্পানীর ফৌজকে হঠানো যাবে কি উপায়ে?

এতক্ষণ আবুবকর মনে মনে গজরাচ্ছিল, আর চুপ ক'রে থাকতে পারলো না। বলে উঠল, লড়াই ফতে করবার তো আশা দেখি না।

কেন, শাহ্‌জাদা?—শুধালো বখৎ খাঁ।

যেখানে উজীর আর সিপাহ্‌সালার যোগসাজসে কোম্পানীর গোয়েন্দাকে পালাবার সুযোগ ক'রে দেয়, সেখানে লড়াই হওয়ার প্রশ্ন বেইমানী ছাড়া আর কি?

সকলেই বোঝে, জীবনলালের পলায়নের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

শাহ্‌জাদা, বেইমান শব্দটা বড়ই বেয়াদবি।

শাহ্‌জাদার মুখেও?

বখৎ খাঁ বলে, হাঁ, শাহ্‌জাদার মুখেও।

আর কাজটা?

কাজটা তো করেছেন শাহ্‌জাদা।

কি রকম?

ভদ্রঘরের মেয়ে লুট ক'রে এনে হারেমে তোলা।

সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ আলি পদপূরণ করে, যদিচ তাকে রাখবার ক্ষমতা নেই, একলা একটা লোকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়! Imbecile! না-মরদ।

কি, এত বড় কথা!

লাফিয়ে উঠে তলোয়ার খুলে দাঁড়ায় আবুবকর। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তলোয়ার খোলে মীর্জা মুঘল ও মীর্জা খিজির সুলতান। সব সহ্য করতে পারে শাহ্‌জাদার দল, কেবল ঐ অপবাদটি ছাড়া। এই দুর্দিনেও

নাকি যাদের হারেমে বাঁদীর সংখ্যা চার হাত-পায়ের আঙুলে গুনে শেষ করা যায় না।

শাহ্‌জাদারা যদি তলোয়ার খোলে তবে ঘউস মহম্মদ কুলিজ খাঁ-ই বা বসে থাকে কি ক'রে? তারাও উন্মুক্ত তরবারি হাতে উঠে দাঁড়ায়।

মীর আতশ কুলি খাঁ এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। এবারে বলল, শাহ্‌জাদারা, এই বীরত্বটা কোম্পানীর জন্যে রাখলে ভালো হ'ত না?

এতক্ষণে শেখ বান্নু বুঝতে পারে, কিছু একটা ব্যাপার হচ্ছে এবং তারও কিছু করা আবশ্যক। তখন সে অতিকষ্টে নিঃশেষিত-পানীয় তৃতীয় বোতলটা হাতে করে উঠে দাঁড়ায়। বলে, ছোঃ, তলোয়ারে কি হবে? গদা, গদা, এই বলে বোতলটা গদারূপে মাথার উপরে ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ সশব্দে মাটিতে পড়ে যায়।

সেদিকে কেউ লক্ষ্য করে না, যেন মাঝখানে কিছুই ঘটে নি। বখৎ খাঁ শান্ত দৃঢ়স্বরে বলে, শাহ্‌জাদারা, আমি সিপাহ্‌সালার হিসাবে হুকুম করছি, অবিলম্বে তলোয়ার কোষবদ্ধ করুন।

কেউ কর্ণপাত করে না সে হুকুমে। সকলেই দাঁড়িয়ে থাকে খোলা তলোয়ার হাতে। যে-কোন মুহূর্তে রক্তপাত শুরু হ'তে পারে।

বখৎ খাঁ আবার হুকুম করে, শাহ্‌জাদারা, অবিলম্বে এ স্থান পরিত্যাগ করুন।

তবু কেউ নড়ে না। সমস্ত কক্ষ রুদ্ধনিশ্বাস।

শাহ্‌জাদারা!

বখৎ খাঁর কণ্ঠস্বর, চোখমুখে এমন কিছু দৃঢ়তা ছিল যে, দু-চার মুহূর্ত স্থাণুভাবে দাঁড়িয়ে থেকে শাহ্‌জাদার দল কক্ষ পরিত্যাগ করে, অনুসরণ করে ঘউস মহম্মদ ও কুলিজ খাঁ।

বাইরে থেকে আবুবকরের কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়, দেখি কে রক্ষা করে তাকে, আমি কিনা নপুংসক, না-মরদ!

হাকিম আসানুল্লা মনে মনে স্থির করে, পণ্ডিতজীর বাড়ীতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে।

মহম্মদ আলি বলে, সিপাহ্‌সালার, ব্যাপারটা এখানেই শেষ হবে মনে হয় না। শাহ্‌জাদা যদি আবার ঝামেলা সৃষ্টি করেন তবে যুদ্ধে ব্যাঘাত ঘটবে। আমার মনে হয়, সমস্ত ঘটনা বাদশাকে জানিয়ে রাখা আবশ্যক।

আমিও এই কথাই ভাবছিলাম। উজীর সাহেব, চলুন একবার লাল-পর্দায়

যাওয়া যাক।

আসাহুল্লা বোঝে এবারে দুমুখো লড়াই শুরু হবে—এক কোম্পানী-সিপাহীতে আর এক শাহ্জাদায়-সিপাহীতে। অবস্থা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। মুখে বলে, চলুন, আমি প্রস্তুত আছি।

॥ ৪ ॥

রুমালীর শেষরক্ষা হ'ল না

রুমালী যখন জানলো যে, জীবনলাল চলে গিয়েছে পণ্ডিতজীর বাড়ি ত্যাগ ক'রে, তখন তার মনের কালো মেঘে সোনালী পাহাড় দেখা দিল। তার নিশ্চিত ধারণা হ'ল, তক্তির ভিতরে যে চিঠি ছিল, তার মর্ম অবগত হওয়াতেই এমনটি ঘটেছে। বিয়ে ভেঙে গিয়েছে, সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে জীবনলাল বিদায় হয়ে গিয়েছে। পণ্ডিতজীর মৃত্যু ও অন্যান্য খবর জানাবার সুযোগ সে পেলো না, কাজেই এইরকম সিদ্ধান্ত করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

তখন সে বিবেচনা করলো জীবনলালের হৃদয়ে তুলসীর শূন্য স্থান পুরণ করবার এই হচ্ছে চরম সুযোগ। এবারে জীবনলালের কাছে উপস্থিত হ'লে নিশ্চয় প্রত্যাখ্যাত হবে না। কিন্তু তার কাছে উপস্থিত হওয়ার উপায় কি? জীবনলালের শহরে প্রবেশ আর সম্ভব নয়। আর প্রবেশের কোন কারণই নেই। অতএব তাকেই যেতে হবে জীবনলালের কাছে। অচিরে সিদ্ধান্ত সংকল্পে পরিণত হ'ল, তখনই সে রওনা হ'ল কোম্পানীর ছাউনির উদ্দেশে।

শহর থেকে বের হয়ে রুমালী বিস্মিত হয়ে গেল। এ কি, এতদিনকার শূন্যপ্রায় বেওয়ারিশ ভূখণ্ড যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে! জায়গায় জায়গায় কামানের বুরুজ বসেছে, নূতন নূতন পরিখা খনিত হয়েছে, আর তার পাশে পাশে মাটির প্রাকারের অন্তরালে পাহারা দিচ্ছে কোম্পানীর সিপাহী। গোরা, কালা দুই-ই আছে। আগে বিনা বাধায় গিয়েছে, এখন ক্ষণে ক্ষণে হুকুমদার আওয়াজে চমকে দেয়। অবশ্য মেয়েছেলে দেখে তেমন কেউ গা করে না, কিন্তু এভাবে অগ্রসর হওয়া তো সম্ভব নয়। সে বুঝলো, শেষ মুহূর্তে কোথাও গিয়ে আটকে পড়তে হবে। তাই সোজা পথ পরিত্যাগ ক'রে যমুনার ধার বরাবর চলতে শুরু করলো। কিন্তু দেখলো, এ দিকটায়

যুদ্ধোদ্যমের চিহ্ন আরো বেশি। সমস্ত স্থানটা কামানে ও ফৌজে কণ্টকিত। তখন সে ওদিক দিয়ে যাওয়ার আশা পরিত্যাগ ক'রে শহরের দক্ষিণ দিকে চলে গিয়ে আজমীঢ় দরবাজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হ'ল। না, এদিকটা প্রায় অরক্ষিত। পাহাড়গঞ্জ, পাহাড়পুর, কিষেণগঞ্জ হয়ে সন্ধ্যার আগে সে পৌঁছলো সবজিমণ্ডিতে। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের সুযোগে পৌঁছলো হিন্দুরাও কুঠিতে, সৌভাগ্যক্রমে কোথাও কেউ বাধা দিল না।

পথ চলতে চলতে যুদ্ধের আয়োজন দেখে রুমালী বুঝেছে যে, বড় রকম একটা লড়াই আসন্ন। জীবনলালের জন্য তার মনে ভয় হ'ল। লোকটা যে গোঁয়ার, গোলার আওয়াজ শুনে লড়াইয়ের ঘোড়ার মতো মেতে ওঠে—ওকে রক্ষা করবার উপায় কি? ভাবলো, ভালোবাসার জালে জড়িয়ে ফেলতে পারলে হয়তো একটু সংযত হয়ে চলবে। প্রেমিক যখন প্রণয়ীর কথা ভাবে, তখন রূপান্তরে যে নিজের কথাই ভাবে, বুঝতে পারে না।

হঠাৎ চাপা গর্জনে চ্যালেঞ্জ শুনতে পেয়ে উত্তরে রুমালী বলে ওঠে, রাইয়ত। তবু চাপা গর্জনে চ্যালেঞ্জ থামে না, কাজেই থামে রুমালার উত্তরদান, রাইয়ত। রুমালী ভাবে, এ আবার কি রকম চ্যালেঞ্জ, একবার শুনলেই তো থামা উচিত, আরও উচ্চস্বরে চিৎকার ক'রে বলে, রাইয়ত, হাম কোম্পানীকা রাইয়ত হ্যায়। তবু থামে না চ্যালেঞ্জের চাপা গর্জন।

এমন সময়ে হিন্দুরাও কুঠির ভিতর থেকে হো-হো শব্দে হাসি ওঠে। বলে, ওটা চ্যালেঞ্জ নয়, ক্যালিবানের গর্জন। আর তারপরেই দরজার চৌকাঠের ফ্রেমে ভেসে ওঠে এক মূর্তি। তারা পরস্পরকে দেখতে পায়, চিনতে পারে না।

কে ও?

আমি।

আমি কে? রুমালী নাকি?

হাঁ, জীবনলাল।

এত রাতে, এখানে, কি ব্যাপার?

তোমাকে দেখতে এসেছি।

দেখতে এসেছ? কেন? জীবনের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের আমেজ।

ও বুঝেছি। দেখতে এসেছ, মরেছি না বেঁচে আছি! তা এসেছ, দেখে যাও, বেঁচে আছি!

উত্তর যোগায় না রুমালীর মুখে। রুমালী বাক্‌পটু ও সাহসী। কিন্তু আজ তার সে সাহস, সে বাকপটুতা লোপ পেয়েছে। কোনও দুঃখে যে ডরায় নি, কোন্ দুঃখে আজ তার এমন অবস্থা? রুমালী আজ ভালোবেসেছে, তাই সে বড় অসহায়।

কি, উত্তর দাও না যে! জানো, তোমাকে ইচ্ছা করলে এখনি গোয়েন্দা বলে ধরিয়ে দিয়ে ফাঁসি দেওয়াতে পারি?

এবারে আবেগের সঙ্গে রুমালী বলে ওঠে, তাই দাও জীবন, তাই দাও এ প্রাণ আর রাখতে ইচ্ছা নেই।

ব্যঙ্গের স্বরে জীবন বলে, কেন সখী, হঠাৎ অমৃতে অরুচি!

অমৃত আজ বিষিয়ে উঠেছে।

কি আশ্চর্য! হঠাৎ এমন হ'তে গেল কেন?

সে তুমি বুঝবে না।

তাই যদি হয় তবে এমন অসময়ে আমার কাছে কেন?

আর কার কাছে যাবো? তোমাকে যে ভালোবাসি!

বাহবা রুমালী, বাহবা! একবার ভালোবাসার ঠেলায় ফাঁসিকাঠে চড়িয়েছিলে, আবারও ইচ্ছা আছে নাকি?

আমি তো তোমার নাম বলি নি।

না, নাম বলো নি, কেবল ইঙ্গিত দেখিয়ে দিয়েছিলে। খুব হয়েছে, আর নয়, এবারে যাও।

যাওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করে না রুমালী।

কি নড়ছ না যে! ডাকবো নাকি পাহারাঅলা?

ডাকো, ডাকো, যেখানে যে আছে ডাকো, আজ তোমাকে না নিয়ে আমি যাবো না।

ওঃ বুঝেছি, দুজনে একসঙ্গে ফাঁসি যেতে হবে, ফাঁসির সহমরণ আর কি! তা এমন বিচিত্র শখ কেন?

তোমাকে নিয়ে যাবো আমার কুঠিতে।

আর ডেকে পাঠাবে বখৎ খাঁর সেপাইকে, কি বলো?

বারে বারে গঞ্জনা দিয়ো না, জীবন।

গঞ্জনা? এর চেয়ে সত্য কথা আর কি?

এর চেয়ে সত্য—তোমাকে আমি ভালোবাসি, এত ভালো কেউ কাউকে কখনো বাসে নি, না লায়লা মজনুকে, না মমতাজ শাহ্‌জাহানকে।

এবারে সংকটে ফেললে পিয়ারী, আমি বাদশা নই যে, তুমি মরলে আর একটা তাজমহল গড়িয়ে দেবো।

ঠাট্টা ক'রো না, জীবন।

এ যদি ঠাট্টা হয় তবে তা তোমার কাছেই যে শেখা। ওই যে সোনার তক্তিটা তুলসীকে উপহার দিয়ে এসেছিলে সেটাও তবে ঠাট্টা! ভেবেছিলে, ওই চিঠি পড়বার ফলে আমাদের বিয়েটা ভেঙে গিয়েছে।

নিশ্চয় গিয়েছে জীবন, আমি জানি, তুমি আর যা-ই হও, পিতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করতে পারবে না।

বাপ রে, এতখানি ভরসা আমার উপরে! সত্য কথাই বলেছ, আমি পিতৃসত্যের অনুরোধে সুখানন্দ পণ্ডিতের মেয়েকে বিবাহ করতে অক্ষম। কিন্তু জেনে রাখো যে, তুলসী পণ্ডিতজীর মেয়ে নয়।

চমকে উঠে রুমালী বলে, পণ্ডিতজীর মেয়ে নয়?

না, পালিত কন্যা।

মিথ্যা কথা! গর্জে ওঠে রুমালী।—বাপে-বেটিতে সাজিয়ে কহানী রচনা করেছে।

মৃত্যুকালে মানুষে মিথ্যা বলে না।

কে মরেছে?

না, না, উল্লসিত হ'য়ো না। তুলসী মরে নি, মরেছেন পণ্ডিতজী।

শেষ আশার স্তম্ভ ধূলিসাৎ হয়ে যায় রুমালীর।

কেমন রুমালী, এসব ঠাট্টা তোমার কাছে থেকেই তো শেখা। প্রথম-বারের ঠাট্টায় চড়িয়ে দিলে ফাঁসিকাঠে, তাতে যখন মরলাম না, তখন দ্বিতীয়বারের ঠাট্টায় বিয়ে ভেঙে দিতে চেয়েছিলে। না জানি এবার তৃতীয়বারের ঠাট্টায় কি পালা অভিনীত হবে।

জীবন, তোমাকে হৃদয়বান মনে করেছিলাম, এখন দেখছি তুমি নিষ্ঠুর, তুমি পাষণ্ড, তুমি পৈশাচিক।

বেশ তো, তাতে তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি?

তোমাকে যে ভালোবাসি প্রাণের চেয়ে, মানের চেয়ে, সারা জাহানের চেয়ে!

তোমার ভালোবাসায় আমার দরকার নেই, তুলসীকে আমি ভালোবাসি।

ক্রোধে, আক্রোশে, মর্মান্তিক যাতনায় রুমালী ব'লে ওঠে, তুলসীকে? তুলসীর কি আছে? ঐ জল-মেশানো দুধে না মিটবে তোমার দুধের

ক্ষুধা, না মিটবে তোমার জলের তৃষ্ণা। তোমার মতো বীরের যোগ্য নারী আমি।

আরও অনেক বীর আছে দুই পক্ষে, তাদের কাউকে ভজনা করো গিয়ে সুন্দরী। আমার অনেক কাজ আছে, চললাম।

সত্যই যাওয়ার জন্যে তাকে উদ্যত দেখে ছুটে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে রুমালী। সেই সদাপ্রফুল্ল চিরগর্বিতা, দুঃখের দুর্দমনীয় সওয়ার এই মেয়েটির ঐ সর্বস্ব নিবেদনের মহিমা অন্ধকারের অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ বুঝলো না। বৃক্ষের মতো অটল দাঁড়িয়ে রইলো জীবনলাল আর রুমালী চোখের জলে আর চুম্বনে তার পা দু'খানি অভিষিক্ত ক'রে দিয়ে মাথা কুটতে লাগলো। ভারি ফৌজী বুটের আঘাতে কপাল ফেটে রক্ত পড়লো, চুল খুলে গেল, তবু তার মাথা কুটবার অবাসন হ'ল না।

জীবন, জীবন, তুমি আমার সব, তুমি আমার সর্বস্ব, যেখানে খুশি আমাকে নিয়ে চলো, যা খুশি আমাকে শাস্তি দাও, আমাকে মারো, আমাকে খুন ক'রে ফেলো, শুধু বলো যে, আমাকে ভালোবাসো। জীবন, আমি পাপিষ্ঠা, আমি স্বৈরিণী, আমি নারকী, তবু আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ফাঁসিকাঠে চড়িয়েছি, তোমার বিবাহের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছি, আমার পাপের অন্ত নেই। কিন্তু জীবন, যিনি পাপ সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি প্রেম সৃষ্টি করেন নি? যিনি নরক সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি স্বর্গ সৃষ্টি করেন নি? যিনি তুলসীকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি রুমালীকে সৃষ্টি করেন নি? না না, জীবন, আমাকে তুমি অবিশ্বাস ক'রো না। ভাই, আমার অঙ্গে অনেক কলঙ্ক কিন্তু আমার প্রেম নির্মল। তোমাকে দেখবার আগে সে তো ছিল না, তার গায়ে লাগে নি ধুলো। তোমাকে দেখে ফুটেছে, তোমার দিকে উন্মুখ হয়ে আছে, তোমাকে বই আর কাউকে জানে না আমার প্রেম। আমি তোমারই, তুলসী তোমার কেউ নয়।

রুমালী যখন বিকারের রোগীর মতো মাথা কুটছিল আর বকছিল তখন নরপশু ঐ ক্যালিবানটা স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিল ঐ অবগুণ্ঠমান নারী-মূর্তির দিকে। যে বেদনায় মানুষ অবিচল, হয়তো তা বিচলিত ক'রে তুলেছিল ঐ অর্ধমানুষটাকে। প্রেম পাষাণে গঠিত করুণার মূর্তি।

জীবনলাল মাটি থেকে জোর ক'রে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল রুমালীকে। বলল, অনেক রাত হয়েছে, এবারে যাও।

সম্বিৎহীন রুমালী মুহূর্তকাল তাকিয়ে দেখলো তাকে, মনে হ'ল, জীবনের

কথার তাৎপর্য বুঝতে পারে নি।

তখন জীবন আবার বলল, এখন যাও।

এবারে কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হ'ল রুমালীর। শান্ত দৃঢ়স্বরে ব'লে উঠল, আমি যাচ্ছি, কিন্তু দুনিয়ায় যদি প্রেমের বিধাতা কেউ থাকেন তবে জেনো, তুলসী কখনো তোমার হবে না। কখনো না, কখনো না, কখনো না।

চোখের জল তার ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই এবারে চোখ থেকেস্ফু লিঙ্গ বর্ষিত হ'তে লাগলো। জল আর আগুন দুয়েরই বাসা মানুষের চোখে। সুগভীর প্রেম নিদারুণ জিঘাংসায় পরিণত হয়েছে তার হৃদয়ে।

বাড়ি ফিরবার পথে রুমালীর একমাত্র চিন্তা—কিভাবে এই জিঘাংসা আপন উদ্দেশ্য সাধন করবে। তার মনের অবস্থা এখন এমন যে, অনায়াসে বিনা দ্বিধায় হত্যা করতে পারে জীবনলাল আর তুলসীকে, মাছি মারলেও যেটুকু দুঃখ অনুভূত হয় তাও অনুভব করবে না রুমালী। কিন্তু উপায় কি, কি উপায়? নিত্য হত্যাকার্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে, সেখানে দাঁড়িয়ে হত্যার গোপন উপায় পড়ে না তার চোখে। নানারকম বাস্তব ও অবাস্তব উপায় চিন্তা করতে করতে সে অগ্রসর হয়। এবারে আর নিরাপদ পথ নয়, সংক্ষিপ্ত সঙ্কটময় পথেই নিঃশঙ্কচিত্তে চলতে থাকে। আশার সঙ্গে ভয় দূর হয়েছে তার মন থেকে।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে বাসায় উপস্থিত হয়ে দেখলো, মীর্জা আবুবকরের খাস খানসামা চুনিলাল বসে আছে।

লালকেল্লায় যাতায়াতের আমলে চুনিলালের সঙ্গে পরিচয় ছিল।

কি খবর চুনিলাল? কতক্ষণ বসে আছো?

অনেকক্ষণ। শাহ্‌জাদা একবার তলব করেছেন।

এত রাতে?

চুনিলাল মৃদু হেসে বলে, আপনার মতো সুন্দরী মেয়ের তলব তো রাতের বেলাতেই হবে।

গা জলে যায় রুমালীর, বলে, আচ্ছা তুমি ব'সো, আমি কাপড় বদলে নিই।

না করবার উপায় নেই রুমালীর। শাহ্‌জাদার তলব আর যমের তলব প্রায় এক পর্যায়ের, তবে যমের তলবে বচ্ছি আছে—এক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রুমালীর তাঞ্জাম আর চুনিলালের ঘোড়া রওনা হয়ে যায় দিল-মঞ্জিলের দিকে।

॥ ৫ ॥

"শাহ্জাদা ফাঁদে পড়িল"

রুমালী দিল-মঞ্জিলে গিয়ে পৌঁছতেই একজন বাঁদী এসে সাদরে তাকে উপরে নিয়ে গেল আবুবকরের খাস কামরায়। তাকে ঢুকতে দেখে হাতের সরাবের পাত্রটা রেখে দিয়ে হেসে অভ্যর্থনা জানালো শাহ্জাদা, বলল, পিয়ারী, অনেককাল তোমাকে দেখি নি।

রুমালী বুঝলো আজ গরজ কিছু বেশি দেখছি, কিন্তু কেন? মুখে বলল, শাহ্জাদার আর কি পুরনো জিনিসে রুচি আছে?

তোবা, তোবা! পিয়ারী, পুরনো জিনিসের স্বাদ কি নূতনে আছে? এই ছাখো না কেন, এই বোতলের সরাব বাদশা জাহাঙ্গীরের আমলে চোলাই করা হয়েছিল। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে না হয় এক পাত্র খেয়ে ছাখো।

এই বলে কাঁচের গেলাসে মদ ঢেলে এগিয়ে দেয়।

রুমালীর না বলবার পথ বন্ধ, লালকেল্লায় অনেক দিনের, অনেক রাতের সুরাপানের সঙ্গিনী সে। মদের পাত্র সে মুখে তোলে।

কি, কেমন?

চমৎকার, শাহ্জাদার দান কি খারাপ হ'তে পারে!

তবেই ছাখো, পুরনোর কাছে নূতন!

তবু রুমালী বুঝতে পারে না উপমাটা কোন্দিকে গড়াচ্ছে আর কতদূর গড়াবে। রুমালী বোঝে যে এই সরাবের মধ্যেও রাজনীতি আছে। শাহ্জাদা তাকে বেহুঁশ ক'রে কিছু কাজ আদায় ক'রে নিতে চায়, তাই স্থির করে এমন মাত্রায় পান করবে যাতে বিবেচনাবুদ্ধি লোপ না পায়। তাছাড়া মদ খেয়ে মাতলামি করবার মতো তার মনের অবস্থা নয়, মাথায় জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন। কিন্তু এসব তো মুখে প্রকাশ করা যায় না, তাই মুখে বলে, শাহ্জাদার মেহেরবানিতে ধন্য হলাম, এখন বাঁদীর প্রতি কি হুকুম?

বিলক্ষণ, হুকুম আবার কি। তুমি এসেছ তাতেই আমার গরীবখানা উজ্জ্বল

হয়েছে। আবার হুকুম!

রুমালী ভাবে, আবুবকর, তোমার মতলব এখনো বুঝতে পারছি না, তবে যে একটা শয়তানী মতলব আঁটছ, তা যদি না বুঝতে পারি তবে আমার নাম রুমালী নয়।

রুমালীর নেশা জমে উঠেছে ভেবে আবুবকর বলল, পিয়ারী, তোমার কুঠিতে তুলসী বলে যে মেয়েটা এসেছিল সেটা ভারি বজ্জাত।

তাই বলো!—ভাবে রুমালী।

শাহ্‌জাদা, বজ্জাত যদি তবে তাকে লুট ক'রে নিয়ে এলেন কেন?

শায়েস্তা করবার মতলবে।

শুনেছি তাকে শায়েস্তা না ক'রেই ছেড়ে দিয়েছেন। কেন?

রুমালীর কথায় আবুবকরের মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে। তার মনে হয় ঐ বিনম্র জিজ্ঞাসার মধ্যেও নিদারুণ ব্যঙ্গ আছে। সব কথা নিশ্চয় শুনেছে। তার কানে বাজতে থাকে মহম্মদ আলির মর্মান্তিক পরিহাস—Imbecile! না-মরদ!

হাঁ, সেবারে তবিয়ৎ খারাপ ছিল বলে তাকে শায়েস্তা করতে পারি নি, কিন্তু তাই বলে বেয়াদব মেয়েটাকে ছাড়ছি নে।

পাবেন কোথায়?

তুমি নিশ্চয় জানো।

আমি নিশ্চয় জানি নে।

এ কি একটা কথা পিয়ারী, তোমার দোস্ত্‌!

আর জানলেই বা কি শাহ্‌জাদা। আমার কথায় সে আসবে কেন, কেউ কি স্বেচ্ছায় শায়েস্তা হ'তে আসে?

ঐটুকু মতলব তোমাকে করতে হবে পিয়ারী,—এই বলে গলা থেকে মুক্তোর মালা খুলে পরিয়ে দেয়।

না হয় করলাম, কিন্তু আবার যদি তবিয়ৎ খারাপ হয়ে পড়ে?

না, না, এবারে বিমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

বিমারের জন্যই কি শাহ্‌জাদা তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন?

তবে আবার কিসের জন্য?

শুনেছি জীবনলাল নামে—

খবরদার বাঁদী, মুখ সামলে!

বাঁদী মুখ সামলাবার লক্ষণ দেখায় না, তার বদলে বাক্যটা সম্পূর্ণ করে, একজন কোম্পানীর রেসালাদার

এই, কোন্ হ্যায় রে !—গর্জে ওঠে আবুবকর।

অত জোরে নয় শাহ্‌জাদা, কথাটা জানাজানি হয়ে যাবে, এখনো বেশি লোকে জানে না।

শাহ্‌জাদাকে শান্ত হ'তে হয়, তা ছাড়া আর কীই বা উপায় ছিল। রুমালীকে দিয়েই কার্যোদ্ধার করতে হবে—অতএব মুহূর্ত-মধ্যে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, ওসব কথা ছেড়ে দাও, এখন কি ভাবে মেয়েটাকে পাওয়া যায় এক্‌টা মতলব বাত্‌লাও। তোমাকে জায়গীর দিতে ভুলবো না।

রুমালী মনে মনে ভাবে, কোম্পানীর ছাউনিতে যে বন্দোবস্ত দেখে এলাম তাতে জায়গীর দেওয়ার মতোই তোমার অবস্থা বটে!

তোমাকে শিরোপা দেবো।

রুমালী মনে মনে বলে, আগে শির বাঁচাও, তার পরে শিরোপা দিয়ো।

কি ভাবছ পিয়ারী?

সবুর করুন, গোলমাল করবেন না, মতলব আঁটছি।

বহুৎ খুব। এই আমি চুপ করলাম!—এই বলে মদের গেলাসে চুমুক দিতে থাকে।

রুমালী ভাবছে। জীবনলালকে আঘাত করবার উপায় নেই, সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে সে। কিন্তু শাহ্‌জাদাকে দিয়ে যদি তুলসীকে "সায়েস্তা" করানো যায় তবে জীবনলালকে চরম আঘাত হানা হবে। ভাগ্যক্রমে শাহ্‌জাদার ও তার লক্ষ্য একই দিকে। কিন্তু তার উপায় কি? জীবনলালের কথায় সে বুঝেছিল যে, তুলসীর বাড়ির দরজা তার কাছে বন্ধ। সেই সোনার তক্তি উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে রুমালীর আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এখন ও-বাড়ির দিকে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারা যায় না। অথচ শাহ্‌জাদার ক্রোধটাকেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'তে দেওয়া চলে না। এইটাই তার শেষ সম্বল, হঠাৎ এমন সম্বল জুটে যাবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

মতলব ঠিক হ'ল রুমালীর?

সবুরে মেওয়া ফলে শাহ্‌জাদা।

চমৎকার বলেছ। কিন্তু কোন্ মেওয়া ফলবে, কাশ্মীরের পেস্তা, না কাবুলের আঙুর?

ওসব তো খাট্টা মেওয়া শাহ্‌জাদা, ফলবে সুবে বাঙ্গলার ফজলি আম।

বাহবা, বাহবা!

আর এক ছড়া মালা ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গী করে রুমালীর দিকে।

রুমালী ভাবে কি উপায়ে তুলসীকে করায়ত্ত ক'রে দেওয়া যায় শাহ্‌জাদার। কোন পথ চোখে পড়ে না, তবু আশা ছাড়ে না, জীবনে কখনো পরাজয় স্বীকার করে নি সে।

ওদিকে আবুবকরের বড় ভালো লেগেছে রুমালীর বর্ণনা—তুলসী কিনা স্বাদে বাঙ্গলার ফজলি আম! আপন মনে ফজলি আম শব্দটা উচ্চারণ করতে থাকে। মুখ উজ্জ্বল, জিহ্বা সরস হয়ে উঠে, যেন একসঙ্গে ফজলি আম ও তুলসীর স্বাদ গ্রহণ করছে। আহা, বাহা বাহা! যেমন রঙ, তেমনি ঢঙ, তেমনি স্বাদ! কোথায় লাগে নূরজাহান আর মমতাজ বেগম। এমন আওরৎ না পেলে জীবনটাই ব্যর্থ। আর এক ছড়া মালা ছুঁড়ে দিতেই চমকে ওঠে রুমালী।

শাহ্‌জাদা, আমাকেই যদি সব দিয়ে দিলেন তবে তুলসীকে দেবেন কি?

তাকে দেব দিল, পিয়ারী।

মালার চেয়ে দিলের মূল্য বুঝি বেশি?

ঠিক বুঝেছ বিবি, মুক্তোর মালা মূল্যবান, দিল অমূল্য।

একথা নূতন বটে।

কেন?

শাহ্‌জাদার যে দিল আছে এ সংবাদ নূতন ছাড়া আর কি?

রুমালীর কণ্ঠস্বরে যে ঈষৎ বিরক্তি ও ব্যঙ্গ ধ্বনিত হ'ল তা বুঝবার মতো অবস্থা আবুবকরের ছিল না।

নূতন নয় বিবি, তবে কিনা তেমন আওরৎ মিললে তবেই তো দিল দেওয়া যায়।

তেমন মেয়ে বুঝি আগে চোখে পড়ে নি।

রুমালীর কণ্ঠস্বরে অধিকতর ব্যঙ্গ।

ঠিক বলেছ, কেমন ক'রে চোখে পড়বে? এমনটি না আছে কেতাবে না আছে দুনিয়ায়, নূরজাহান মমতাজসে ভি আচ্ছা।

কখনো কোথাও চোখে পড়ে নি শাহ্‌জাদা?

রুমালীর ইঙ্গিত বুঝতে পারে না শাহ্‌জাদা, বলে, কভি নেহি।

আবুবকরের নির্লজ্জ স্বীকারোক্তিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে যায় রুমালীর মনোভাবে। সে ভাবে, ওঃ বেইমান, তবে তোমার ধারণা তুলসী সকলের চেয়ে সুন্দরী! নূরজাহান, মমতাজ সকলের চেয়ে—এমন কি আমার চেয়েও! তার মনে পড়ে লালকেল্লায় রাতের পর রাত, কত রাত এই কথা শুনেছে

আবুবকরের মুখে—পিয়ারী, তোমার চেয়ে সুন্দরী তো কাউকে দেখি না; না নূরজাহানকে, না মমতাজকে, তুমি সবসে ভি আচ্ছা। আর আজ পাওয়া আঙুর টক হয়ে গিয়েছে, না পাওয়া ফজলি আমের জন্য ছট্‌ফট ক'রে মরছো! দাঁড়াও, তোমাকে খাওয়াচ্ছি সুবে বাঙ্গলার ফজলি আম!

কি বিবি, কবে খাওয়াবে সুবে বাঙ্গলার ফজলি আম?

যেদিন খুশী, আগামী কালকে।

বহুৎ আচ্ছা। এই জন্যেই তোমাকে তো মুক্তোর মালা বকশিশ করি।

এখন এগুলো রাখুন, আম খেয়ে খুশী হ'লে তখন না হয় বকশিশ করবার কথা ভাববেন।

এই বলে উঠে গিয়ে মালাগুলি প্রত্যর্পণ করে আবুবকরের হাতে।

তখন শাহ্‌জাদা আম খাওয়ার লোভে এমনি মুগ্ধ যে এ বেয়াদবি গ্রাহ্য করে না।

কালকে তা হ'লে নিয়ে আসবে?

সেটি হবে না শাহ্‌জাদা, এখানে আনতে গেলে কে কোথা থেকে দেখবে, তার আবার রেসালাদার ভাই আছে কি না।

এই বলে মুখ টিপে হেসে অপাঙ্গে তাকায় শাহ্‌জাদার দিকে।

তবে?

মেহেরবানি ক'রে আপনাকেই যেতে হবে আমার গরীবখানায়।

তারপর?

তাকে কালকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসবো।

চমৎকার মতলব করেছ।

কিন্তু বেশি লোকজন নিয়ে যাবেন না।

আরে না না, আমার তাঞ্জামের সঙ্গে শুধু চুনিলাল যাবে, আর কেউ নয়।

রাত প্রথম প্রহরের পরে গিয়ে পৌঁছবেন, তার আগে নয়।

বেশ, তাই হবে।

তাহলে আজ বিদায় দিন।

আচ্ছা, যাও। কথা ঠিক থাকবে তো?

শাহ্‌জাদার সঙ্গে কথার খেলাপ করি আমার গর্দানে কয়টা মাথা?

কি শিরোপা চাও তুমি বিবি?

আগে আম চাখুন তারপরে না হয় শুনবেন।

কুর্নিশ ক'রে বিদায় হয়ে যায় রুমালী।

ফজলি আমের স্বাদে গন্ধে বর্ণে মশগুল শাহ্‌জাদা গুন গুন ক'রে একটি গজল ধরে।

রুমালীর মনের পরিবর্তন অকস্মাৎ হ'লেও অসম্ভব নয়। জীবনলালের প্রতি হিংসায় যখন সে তুলসীকে অপমানিত করবার পন্থা অনুসন্ধানে ব্যস্ত, সেই সময়ে তুলসীর সৌন্দর্যের প্রশংসা তার মনকে বিষাক্ত ক'রে তুলল শাহ্‌জাদার বিরুদ্ধে। জীবনলাল বেয়াদব হ'তে পারে, শাহ্‌জাদা বেইমান। কাজেই সে দণ্ডের যোগ্য—এই হ'ল তার ধারণা। নারী সৌন্দর্যের দাস, পুরুষ সৌন্দর্যের ক্রীতদাস।

পরদিন যথাসময়ে তাঞ্জামবাহিত আবুবকর রুমালীর কুঠিতে পৌছল, সঙ্গে মাত্র চুনিলাল। রুমালী শাহ্‌জাদাকে অভ্যর্থনা ক'রে দোতলায় নিয়ে গেল, চুনিলালকে বলল, তুমি এখানেই অপেক্ষা করো। দোতলায় গিয়ে মুখে আঙুল দিয়ে শাহ্‌জাদাকে শব্দ করতে নিষেধ ক'রে অন্য একটা আঙুল দিয়ে অন্ধকার একটা ঘরের অর্ধোন্মুক্ত দরজা দেখিয়ে দিল। লুব্ধ শাহ্‌জাদা মৃদুস্বরে শিস দিয়ে উঠে ঘরে প্রবেশ করতেই বাইরে থেকে দরজায় শিকল এঁটে দিল রুমালী। বলল, শাহ্‌জাদা, সুবে বাঙ্গলার ফজলি আম চেখে দেখুন, নূরজাহান মমতাজের চেয়ে ভি আচ্ছা। শাহ্‌জাদা দেখল ঘর শূন্য। রুমালী দোতলার পিছনদিকের সিঁড়ি দিয়ে বের হয়ে চলে গেল। ঠিক এই সময়ে শাহ্‌জাহানাবাদের সমস্ত উত্তর দিকটা কাঁপিয়ে কামান গর্জন শুরু হয়ে গেল।

॥ ৬ ॥

"হে রুদ্র আমার,
মার্জনা তোমার
গর্জমান বজ্রাগ্নি শিখায়,
সূর্যাস্তের প্রলয় নিশায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।"

শহর শাহ্‌জাহানাবাদের সমস্ত উত্তর দিক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কামান গর্জনে। সে ভৈরব আরাব উত্তর দিকের প্রাচীরে বুরুজে, শহরের মিনারে গম্বুজে প্রাসাদে মসজিদে ধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে পুব দিকে যমুনায়, যেখানে

অনপগত বর্ষার বিপুল বাষ্পরাশির ঊর্মিমালা তাকে সঞ্চালিত ক'রে দেয় আরও খানিকটা পূবে, যেখানে উচ্চতটে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিরূপে ফিরে আসে সেই শহর শাহ্‌জাহানাবাদের দিকে। বুম, বুম, বুম; বু-বু বুম, বু-বু বুম, বু-বু বুম। ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে দুই হাতে লোফালুফি করে নিস্তব্ধতার গোলকটাকে। সত্যই নিস্তব্ধতা, কারণ ভয়াবহ গর্জন সত্ত্বেও কেমন এক প্রকার অনৈসর্গিক স্তব্ধতা। এ যেন নিস্তব্ধতার মাতৃগর্ভ থেকে ঘটোৎকচের বহিরাগমন, যেমন ওই উত্তর দিকের আকাশে ঘনান্ধকারের অণ্ড বিদীর্ণ ক'রে আবির্ভাব হয়েছে অকাল গরুড়ের, যার অগ্নিময় বিশাল পক্ষ ক্রমেই অধিকতর বিস্তৃত হয়ে পড়েছে আকাশের উর্ধ্বে অধে পূবে পশ্চিমে। সেরাত্রে যদি কারো কান ও চোখ প্রকৃতিস্থ থাকতো তবে শুনতে পেতো, দেখতে পেতো—এমন শব্দ, এমন দৃশ্য—যার অনুরূপ একবারের বেশি দেখতে পাওয়া যায় না জীবনে। কিন্তু তেমন প্রকৃতিস্থতা কারো ছিল না সে শহরে।

সেরাত্রে শহরে কারো চোখে নিদ্রা ছিল না; নিদ্রিতরা জেগে উঠল, জাগ্রতরা ঘুমের আশা পরিত্যাগ করলো। শিশু মাতৃস্তনে মুখ দিয়ে আকর্ষণ করতে ভুলে গেল। আজ ক'মাসে কামানের গর্জনে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, ও যেন ঝড় বজ্রপাতের মতোই নৈসর্গিক ব্যাপার, কিন্তু আজকের গর্জন যেন কিছু স্বতন্ত্র, প্রমাণ প্রয়োগের সাহায্য ছাড়াই এ কথাটা বুঝতে পারলো সকলের অবচেতন সত্তা। যারা শহর ত্যাগ করবে ভাবছিল তারা সঙ্কল্প করলো ভোরের আলো হওয়ার আগেই বের হয়ে পড়বে, যেখানে দু চোখ যায়, এ অগ্নিকটাহে আর নয়। যাদের যাওয়ার কোন স্থান নেই তারা অটল হয়ে বসলো। নিরুপায়ের বীর্য।

বখৎ খাঁ, কুলি খাঁ, মহম্মদ আলি দিল-মঞ্জিলে পৌঁছে শুনলো যে, শাহ্‌জাদা মীর্জা আবুবকর প্রাসাদে নেই, সন্ধ্যার সময় বাইরে গিয়েছেন।

মহম্মদ আলি বলল, তাহলে কি চিড়িয়া উড়ে গেল নাকি?

সেই রকমই তো সন্দেহ হচ্ছে।—বলে বখৎ খাঁ।

কেমন করে সংবাদ পেলো?—শুধোয় কুলি খাঁ।

বাদশার দরবার থেকে কেউ জানিয়ে থাকবে।

তা কি ক'রে সম্ভব মহম্মদ আলি। বাদশা যখন গ্রেপ্তারের হুকুম দেন তখন হাকিম আসাদুল্লা ও আমি ছাড়া কেউ উপস্থিত ছিল না।

সিপাহ্‌সালার যদি মাপ করেন তবে বলি, ঐ লোকটির সম্বন্ধে নানারকম কথা শোনা যায়।

সেকথা মিথ্যা নয়, তবে শাহ্‌জাদাদের অনুকূলে কিছু করবার লোক নয় উজীর সাহেব।

কুলি খাঁ বলল, মিছে কাজিয়া ক'রে লাভ নেই, চিড়িয়া পালিয়েছে, চলুন আমরাও যাই। অনেক কাজ আছে।

মীর্জা আবুবকর যুদ্ধজয়ের পক্ষে বিঘ্ন এই আরজি নিয়ে এরা বাদশার কাছে হাজির হ'লে বাদশা সরাসরি তাকে গ্রেপ্তার করতে হুকুম দেন। কয়েকজন সিপাহী নিয়ে দিল-মঞ্জিলে তাই তারা এসেছিল, কিন্তু তাকে দেখতে না পেয়ে অনুমান করলো কোন রকমে সংবাদ পেয়ে শাহ্‌জাদা গা-ঢাকা দিয়েছে।

বখৎ খাঁ বলল, এ মন্দের ভালো হ'ল। শাহজাদাকে গ্রেপ্তার করলে খুব সম্ভব নিমচী ফৌজ লড়তে অস্বীকার করতো, তারা শাহ্‌জাদার হাতের মুঠোর মধ্যে।

আবার গ্রেপ্তার না করলে শহরে যে বিদ্রোহ হয়।

সেই তো হয়েছে মুশকিল শাহ্‌জাদাদের নিয়ে, মহম্মদ আলি সাহেব। কি করি বলুন ?

কি আর করবেন, আপাতত ফিরে চলুন।

যখন তারা ফিরতে উদ্যত সেই সময়ে তাদের কানে প্রবেশ করলো সেই কামান গর্জন। বখৎ খাঁ ও মহম্মদ আলির কান শব্দের বৈশিষ্ট্য ধরতে পারলো না, কিন্তু ভুল করলো না মীর আতশ আলি খাঁর কান।

সে বলে উঠল, সিপাহ্‌সালার, এ যেন চব্বিশ পাউণ্ডার হাউইটজারের আওয়াজ।

এবারে সচেতন হয়ে ওঠে বখৎ খাঁ ও মহম্মদ আলি।

তা-ই তো মনে হচ্ছে।

সিপাহ্‌শালার যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটলো।

কি ব্যাপার, মীর আতশ।

কোম্পানীর ফৌজ উত্তর দিকের প্রাচীর আক্রমণ করেছে আর এদিকে আমরা তৈরি হয়ে আছি পশ্চিম দিকে।

কিন্তু উত্তর দিকের পানিবুরুজ আর কাশ্মীরীবুরুজেও তো কামান আছে।

না থাকারই সামিল সাহেব, সেগুলো যে নিমচী ফৌজের হাতে।

তোমার কি মনে হয় যে ওরা লড়বে না ?

যেমন এতদিন লড়েছে, তার বেশি নয়। মীর আতশ ও সিপাহ্‌সালারে

এতক্ষণ উত্তর প্রত্যুত্তর চলছিল, এবারে সুযোগ পেয়ে মহম্মদ আলি বলল, আমার তো সন্দেহ হচ্ছে আজকের আক্রমণ কোম্পানী আর শাহ্‌জাদার যোগসাজসে ঘটেছে—তোমরা আমক্রণ করো, আমার ফৌজ কিছু করবে না।

এখন আর সেকথা ভেবে লাভ নেই, যা আছে তাই দিয়েই যেমন ক'রে হোক ঠেকাতে হবে—বলে সেলাম জানিয়ে দ্রুত চলে যায় কুলি খাঁ।

তা বটে। A good general never blames his tools, চলুন সিপাহ্‌সালার।

ওরা চলে যেতেই আসে ঘউস মহম্মদ ও দিল মহম্মদ, যাদের খাড়াই আর বহর দেখে লোকে নামকরণ করেছে কুতবমিনার আর আলাইমিনার।

তারা দেখলো যে শাহ্‌জাদা নেই, আর শুনলো যে এইমাত্র সিপাহ্‌-সালার একদল সিপাহী নিয়ে এসেছিল। এবারে এই দুই ঘটনার যোগফলে ভুল ক'রে তারা সিদ্ধান্ত করলো যে, শাহ্‌জাদাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গিয়েছে। প্রকৃত ঘটনা ব্যাখ্যা করবার মতো দায়িত্বসম্পন্ন কেউ ছিল না দিল-মঞ্জিলে। কামানের আওয়াজ শুনে সবাই পালিয়েছিল। কামানের আওয়াজ শুনেই ঘউস মহম্মদ এসেছিল শাহ্‌জাদার কাছে আক্রমণ প্রতিরোধ সম্বন্ধে সলা পারামর্শ করতে। কিন্তু এখন যখন বুঝলো যে, শাহ্‌জাদা গ্রেপ্তার হয়েছে তখন স্থির করলো তারা নড়বে না।

তারা বের হয়ে যমুনা খাল পর্যন্ত গিয়েছে, এমন সময়ে দেখতে পেলো পদব্রজে আসছে মীর্জা আবুবকর, সঙ্গে চুনিলাল।

শাহ্‌জাদাকে ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে পালিয়েছিল রুমালী। শূন্য ঘর দেখে মুহূর্ত-মধ্যে বুঝে নিল প্রকৃত ব্যাপার, বাঘের উপরেও টাঘ আছে।

কি করবে ভাবছে এমন সময়ে উত্তর দিকে গর্জে উঠল কামান। তখন চুনিলালের নাম ধরে ডাকলো। ডাক শুনে চুনিলাল গিয়ে দেখলো বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। শাহ্‌জাদার খানসামা হিসাবে নানারূপ অসম্ভব পরিস্থিতির সঙ্গে তার পরিচয়, কিছুতেই আর বিস্ময় বোধ করে না, সে জানে কখনো নৌকার উপরে গাড়ি, কখনো গাড়ির উপরে নৌকা, কেবল সে কথাটা জানাজানি না হ'লেই হ'ল। দরজা খোলা পেয়ে আবুবকর বেরিয়ে এলো। বলল, চলো।

তারা নিচে নেমে এসে দেখল যে, তাঞ্জামবাহীরা কামানের আওয়াজে ভয় পেয়ে পালিয়েছে। অগত্যা পদব্রজেই চলল দিল-মঞ্জিলের দিকে। এমন সময়ে মাঝপথে তাদের সাক্ষাৎ ঘউস ও দিল মহম্মদের সঙ্গে।

ঘউস মহম্মদ কুর্নিশ ক'রে বলল, বেইমানরা তাহ'লে ছেড়ে দিয়েছে শাহ্‌জাদাকে।

দিল মহম্মদ বলল, বেইমান বখৎ খাঁর সাধ্য কি শাহ্‌জাদাকে গ্রেপ্তার ক'রে রাখে! ছেড়ে দিতেই হবে।

শাহ্‌জাদা চট ক'রে অনুমান ক'রে নিলো যে ইতিমধ্যে কিছু একটা ঘটে থাকবে। হ'তে পারে যে, বাদশাহের কাছ থেকে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা নিয়ে বখৎ খাঁ গিয়েছিল দিল-মঞ্জিলে। কিছুই অসম্ভব নয়, সময়টা খারাপ, ততোধিক খারাপ বাদশার মাথা। তাই মাঝামাঝি রকম একটা মন্তব্য করলো, যার নানা রকম অর্থ সম্ভব।

হাঁ, হাঁ, সাধ্য কি বখৎ খাঁর!

এবার ঘউস মহম্মদ বলে, শাহ্‌জাদা, আমি স্থির করছি নিমচী ফৌজ লড়বে না এমন বেইমান সিপাহ্‌সালারের অধীনে।

তোমরা যেমন ভালো বোঝো তা-ই করো।

কুতবমিনারে ধ্বনি হয়, এহি তো শাহ্‌জাদাকো মাফিক বাত।

আলাইমিনারে প্রতিধ্বনি করে, এহি তো শাহ্‌জাদাকো মাফিক বাত।

দুজনে একসঙ্গে কুর্নিশ ক'রে বিদায় নেয়। ঘউস মহম্মদ বলে যায়, শাহ্‌জাদা, আজ আর দিল-মঞ্জিলের দিকে যাবেন না। সাবধানের মার নেই।

দিল মহম্মদও বলে, সাবধানের মার নেই। আবুবকর দেখল কথাটা মিথ্যা নয়, কাজেই দিল-মঞ্জিলে যাওয়ার আশা পরিত্যাগ ক'রে রওনা হয় দরিয়াগঞ্জে মীর্জা খিজির সুলতানের কুঠির দিকে।

পায়ে হেঁটে চলেছে শাহ্‌জাদা, কেউ লক্ষ্য করলো না। সে রাতে লোকের মনের এমন অবস্থা যে খাস বাদশা আলমগীর সম্মুখ দিয়ে হেঁটে গেলেও কেউ লক্ষ্য করতো না।

তারপর, স্বরূপপ্রসাদ, কেমন আছো?

আর ভাই থাকাথাকি, না থাকলে নয় তাই আছি।

তা যেমনই থাকো—তোমার অশ্‌শি হজার আকবরি মোহরগুলো সাবধানে রেখো।

ওসব ঠাট্টা-তামাশা ছেড়ে দাও ভাই সরাব, অশ্‌শি হজার মোহর দূরে থাক, অশ্‌শি হজার পয়সা দেখে নি আমার দাদা, পরদাদা।

না স্বরূপপ্রসাদ, ঠাট্টা-তামাশা করছিনে, যার যা আছে সামাল ক'রে রাখা

দরকার, কোম্পানী ফৌজ শহরে ঢুকলে এমন লুট করবে যার কাছে জাঠ রোহিলা ইরাণী আফগান হার মেনে যায়। ভাই, এখন আমরা সব কাঁটার বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি।

হো-হো শব্দে হেসে ওঠে সুরযপ্রসাদ। বলে, তুমি যেমন কাঁটার বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছ, তেমন কাঁটার বালিশ কে না আকাঙ্ক্ষা করে।

আরে ভাই কাঁটা গাছে কি ফুল ফোটে না?

ফোটে বৈকি, তবে কিনা তোমার ভাগ্যে সমস্তই ফুল, অপরের ভাগ্যে সমস্তই কাঁটা। বিধাতা বড় একচোখো।

তা না হ'লে আর তোমার ভাগ্যে অশ্‌শি হজার মোহর জুটিয়ে দিয়ে আমার হাতে দেন খোলামকুচি!

তেমনি যে পুষিয়ে দিয়েছেন খুরশিদের কোমল উরুটাকে বালিশ বানিয়ে মাথার তলায় গুঁজে দিয়ে—কি বলো ভাই নয়ন?

নয়ন সংক্ষেপে বলে, তা বটে।

তারপরে যেমন নীরবে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল, তেমনি নীরবে তাকিয়ে থাকে।

খুরশিদের খাস কামরার মসলন্দ পাতা প্রশস্ত মেজের উপরে খুরশিদের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে ছিল সরাব মিঞা, আর পাশেই নয়নচাঁদ একটা তাকিয়ে টেনে নিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে পড়ে ছিল। এখন তার সেই অবস্থা, যাতে চোখ বাইরে নিবদ্ধ থাকলেও দৃষ্টি ভিতরে নিবদ্ধ থাকে। পণ্ডিতজীর মৃত্যুর পর থেকে চলছে এইরকম। এমন সময় সুরযপ্রসাদ প্রবেশ করতে পূর্বোক্ত কথোপকথন শুরু হয়ে যায়।

এবারে সুরযপ্রসাদ শুধোয়, ভাই সরাব, তুমি তো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াও, ছোটবড় সব রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করো, বলো দেখি কবে কোম্পানীর ফৌজ শহর আক্রমণ করবে?

কবে করবে জানি না, তবে করবে নিশ্চয়।

বুঝলে কি করে?

পিঁপড়ের দল ডিম মুখে ক'রে সার বেঁধে পালায় দেখেছ কি? কেন পালায়? বৃষ্টি হবে বুঝতে পারে। যখন দেখতে পাই যে, শহর ছেড়ে মানুষের সার চলেছে কোলে ছেলেমেয়ে, মাথায় মোটঘাট, তখন বুঝতে পারি বড় রকম লড়াই শুরু হবে। বিশ্বাস না হয়, যমুনার পুলের কাছে দিল্লি দরবাজার কাছে দাঁড়িয়ে একবার ছাখো—কাতারে কাতারে লোক

শহর ছেড়ে পালাচ্ছে—বৃষ্টি নামবে।

আর যারা যাচ্ছে না, তারা কি ভরসায় আছে ?

সোনাদানার মায়ায় আছে, যেমন এই তুমি। আর যাওয়ার জায়গা নেই বলে আছে, যেমন এই নয়নচাঁদ, আর বাঁচা-মরা সমান বলে আছে, যেমন এই আমি।

এতক্ষণ পরে খুরশিদ প্রথম মুখ খোলে। শুধোয়, কেন ভাই, তোমার কাছে মরাবাঁচা সমান ?

সে অনেক কথা, আর একদিন সময় পেলে বলবো, তবে আজ এইটুকু শুনে রাখো যে, জীবনভোর যা খুঁজলাম অথচ পেলাম না, একবার মরে দেখতে হবে তা পাওয়া যায় কি না।

কি সেই জিনিস, ভাই ?

সুখ।

কখনো পাও নি ?—বলে স্নেহকৌতুকে খুরশিদ তাকায় সরাবের মুখের দিকে, সরাব চোখ তুলে তাকায় খুরশিদের মুখে, দেখে খুরশিদ বড় সুন্দর, অস্তগত সূর্যের রশ্মিলাবণ্যে মার্জিত আকাশে নবোদিত সন্ধ্যাতারা যেমন সুন্দর তেমনি।

সরাব দৃঢ়স্বরে জানায়, না, কখনো পাই নি।

তবে বোধ করি নেই।

অবশ্যই আছে।

অবশ্যই আছে, অথচ পেলে না, বলো কি ?

বিস্মিত হচ্ছ কেন খুরশিদ, এমন কি হয় না ? সন্ধ্যাতারা অবশ্যই আছে, তাই বলে কি পাওয়া যায় হাতের মুঠোয় ? ফুলের প্রজাপতিকে ধরতে গেলেই উড়ে পালায়।

তবে এমন বৃথা চেষ্টা কেন করো ?

কেন করি ? অদৃষ্ট, নসিব।

ওরা থামে। এমন সময়ে সুযোগ পেয়ে বলে ওঠে নয়ন, আমি কেন আছি জানো ? যাওয়ার জায়গা নেই বলে নয়, একটা হিসাবনিকাশ শোধ করবার আশায় আমি আছি।

সকলেই ইঙ্গিতটা বোঝে। বলে, আর কেন ভাই, ওসব তো চুকেবুকে গিয়েছে।

চুকেবুকে গিয়েছে ! কখ্‌খনো নয়। ঐ বেইমানটা কোম্পানীর ফৌজের

সঙ্গে ঢুকলে আমি নিজে হাতে তাকে কোতল করবো এই আশায় আছি।

কিন্তু তাতে নিজেরও কোতল হওয়ার আশঙ্কা আছে মনে রেখো।

ক্ষতি কি?

বহিনের দায়িত্ব আছে!

সে দায়িত্ব নেওয়ার লোক জুটেছে।

এতদিন এই সুখবরটা দাও নি কেন, ইয়ার!

সুরয বলে, তবে এবার স্বরূপরামকে ক্ষমা করো।

কখ্খনো নয়—গর্জে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে কোম্পানীর চারটে ব্যাটারির ভারি হাউইটজার কামানগুলো।

ঐ আরম্ভ হয়ে গেল,—বলে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে সরাব মিঞা।

খুরশিদ টেনে বসাতে চেষ্টা করে। বলে, কামানের আওয়াজ তো নিত্যকার ব্যাপার, এমন উতলা হচ্ছ কেন?

পিয়ারী, কান থাকলে বুঝতে পারতে এ আওয়াজে আর নিত্যকার আওয়াজে তফাৎ আছে। এ হচ্ছে রোজ কিয়ামতের দিনের নাকাড়া! এবারে চূড়ান্ত হিসাবনিকাশের পালা আসন্ন। ছাড়ো ছাড়ো।

বুম বুম আওয়াজে গর্জে চলে কামান। বাড়িটা, সমস্ত মহল্লাটা কাঁপতে থাকে, ঝাড়-লণ্ঠনে ঝন্‌ঝনি ওঠে।

উঠে বসে নয়ন আর স্বরূপ, বলে, এবারে বোধ করি শহর আক্রমণের পালা আরম্ভ হ'ল।

সরাব বলে, কি, তোমরা যাবে না?

এই বলে বন্দুকটা হাতে নেয়। লড়াই শুরু হওয়ার পর থেকেই একটা বন্দুক তার নিত্য সঙ্গী। এক হাতে বন্দুক আর এক হাতে বোতল, ব্যস, এ হ'ল ভালো, সরাবের দুটো হাতই এবারে মনের মতো কাজ পেয়েছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে অনেকেই বন্দুক সঙ্গে রাখতো, নয়নেরও ছিল, বাড়িতে রাখলে সবাই হাউমাউ ক'রে কাঁদাকাটি করবে আশঙ্কায় বন্দুকটা রাখতো খুরশিদের বাড়িতে।

সুরয বলে, এত রাতে কোথায় যাবে?

রাত কি আর আছে, কামানের আগুনে দিব্বি আলো হয়েছে—ঐ ছাখো, নাও এখন ওঠো।

ওদেরও কৌতূহল কিছু কম নয়। উঠে দাঁড়ায় নয়ন, শুধোয়, কোন্ দিকে যাবে?

কেন, কাশ্মীর দরবাজায়, সেইখানেই গোলা পড়ছে, বুঝতে পারছ না।

নয়ন বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়।

স্বরয, তোমার বন্দুক কই?

বন্দুকে কি হবে, বন্দুক দিয়ে কে কবে লড়াই জিতেছে?

তবে?

স্বরয তর্জনী ঠেকায় কপালে, বলে, বুদ্ধি।

বেশ বেশ, বলে ওঠে সরাব, বন্দুক, বারুদ, বুদ্ধি, তিন ভি—'ব', সময় থাকলে একটা গজল লিখতাম। নাও, এখন চলো।

খুরশিদ বলে ওঠে, সত্যি যাবে, ওখানে যে বিপদ আছে।

সরাব কাছে এসে দাঁড়ায় খুরশিদের, তুলে ধরে তার চিবুক, বলে ওঠে, পিয়ারী, সম্পদ তো অনেক দেখলাম সুখ মিলল না, এবারে দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষ চেষ্টা ক'রে দেখি হাঙরের মুখ থেকে মুক্তো কেড়ে নেওয়া যায় কিনা।

তারপরে বিনা উপসংহারে সরাব বেরিয়ে চলে যায়, অনুসরণ করে নয়নচাঁদ ও স্বরযপ্রসাদ।

শূন্যকক্ষে বিহ্বল খুরশিদ একাকিনী বসে থেকে কামানের আওয়াজে প্রণয়ের দামামা শুনতে থাকে।

শাহ্‌জাদাকে ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে রুমালী নিচে এসে সিঁড়ির উপরে বসলো, মনে মনে বলল, নাও, এবারে তুলসীর খোয়াব ছাখো, যেমন লোভ তেমনি সাজা।

তুলসীর উপরে রুমালী খুশী নয়, তার সর্বনাশ হ'লেই তার সুখ। কিন্তু সেই তুলসীর রূপ-গুণের বর্ণনা শাহ্‌জাদার মুখে শুনে তাকেও সমান দোষী বলে মনে হ'ল। ভাবলো আগে শাহ্‌জাদার শাস্তিটা হয়ে যাক, তার পরে তুলসীর সাজার ব্যবস্থা করলেই হবে। এই সব কথা ভাবছে এমন সময়ে বুম বুম ক'রে কামানের আওয়াজ হ'ল। চমকে উঠল রুমালী। এ কি, আওয়াজ যে থামে না! গভীর গম্ভীর আওয়াজ হয়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে।

শহরের উত্তর দিকে রুমালীর কুঠি,—সমস্ত বাড়ি-ঘর কামানের আওয়াজের তালে তালে কাঁপছে। রুমালী তাকিয়ে দেখে উত্তর দিকের আকাশটা আলোয় আলোময়, মেঘগুলোর উপরে আলোর ছটা প'ড়ে সমস্ত রক্তাভ হয়ে উঠেছে, যেন কলির রক্তসন্ধ্যা।

কামানের আওয়াজে শহরের সকলেই সন্ত্রস্ত, রুমালীও। কিন্তু আজকের

আওয়াজে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল—এতগুলো কামান এতক্ষণ ধরে রাতের বেলায় এর আগে গজরায় নি। তার বড় ভয় হ'ল, ভাবলো শাহ্‌জাদাকে আর আটকে রাখা উচিত নয়। তখনি উপরে উঠে এলো, দেখলো দরজা খোলা, শাহ্‌জাদা পালিয়েছে, কেমন ক'রে দরজা খুললো ভাববার সময় ছিল না, তখন সে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। নিজেকে অসহায় মনে হ'তেই পল্টনের কথা মনে পড়লো, সে কাছে থাকলে সান্ত্বনা পাওয়া যেতো। কিন্তু কোথায় সে? আজ অনেক-ক'দিন তার দেখা নেই।

হঠাৎ তার মনে পড়ে শাহ্‌জাদার বন্দী অবস্থা, চুরি করতে এসে চোর ধরা পড়ে গিয়েছে। তখনি হাসি পায়। সেখানেই মাটির উপরে বসে পড়ে হো-হো শব্দে খুব একচোট হেসে নেয়। হাসিতে মনের ভার লঘু হয়ে যায়, মনের ভার লঘু হয়ে যেতেই দেহের দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। খিদে পেয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার পেটে কিছু পড়ে নি, এতক্ষণ মনটা প্রচণ্ড বেগে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল দেহটাকে। এবারে দেহ অচল হয়ে পড়বার মতো। কিন্তু এত রাতে খাদ্য মিলবে কোথায়? তখন মনে পড়লো, ঘণ্টেওয়ালার দোকানে গেলে হয়—রাতের বেলাতেই সেখানে মিঠাই তৈরি হয়। অমনি চললো ঘণ্টেওয়ালার দোকানের দিকে। সেখানে পৌঁছে দেখে মহাবীর পল্টন নিয়ে খোদ পল্টন হাজির।

কি রে, তুই এখানে?

পল্টন বলে—এই যে দিদি, এসেছ, খুব ভালো হয়েছে, যত খুশি পেট ভরে খেয়ে নাও।

দাম দিতে হবে না বুঝি!

দাম কোথায়? ঘণ্টেওয়ালা সব বিলিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ তার এত সুবুদ্ধি কেন?

ঐ যে, তাকেই জিজ্ঞাসা করো।

পাকা গোঁফ ও আঁচিল নিয়ে বের হয়ে এলো ঘণ্টেওয়ালা, বললো, বহিন, কত খাবে খাও।

এ-সব বিলিয়ে দিচ্ছ কেন ভাইজী?

শুনছ না তোপের আওয়াজ! কোম্পানীর ফৌজ ঢুকলে কি আর দোকানে কিছু রাখবে? সব লুটেপুটে খাবে, তাই বিলিয়ে দিয়ে কিছু 'পুণ' করছি।

রুমালী শুধোয়, সব লুটেপুটে নেবে, বলো কি?

ফৌজে কবে দাম দেয় বহিন?

কি ক'রে জানলে ?

নিজে যে এক সময়ে ফৌজে ছিলাম। তা-ছাড়া দাদা, পরদাদার কাছে শুনেছি কি না, জাঠ ফৌজ, রোহিলা ফৌজ, কোম্পানীর ফৌজ যতবার শাহ্‌জাহানাবাদে ঢুকেছে, আগে লুটেছে আমাদের দোকান। এবারেও তাই হবে। নে ভাই পল্টন, যত পারিস খেয়ে নে,—যা খেতে না পারিস, ধোতিতে বেঁধে নিয়ে যা। নাও দিদি, কি খাবে খেয়ে নাও।

তোমরা কি করবে ?

বাসনগুলো মাটিতে পুঁতে রেখে, দোকান বন্ধ ক'রে দিয়ে কোথাও ছিপ্‌কে থাকবো।

মহাবীর পল্টন খায়, কাপড়ে বেঁধে নেয়। রুমালীও কিছু খায়। খায় আর হাসে শাহ্‌জাদার অবস্থা স্মরণ করে।

হাসছ কেন দিদি ?

বিনা পয়সায় খেতে পেয়ে।

পয়সা খরচ ক'রে কবে খেয়েছ ?

নে এখন চুপ কর, কামানের আওয়াজে কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

তুলসী ও পান্না পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, এখন তোপের আওয়াজে দুজনেই এক সময়ে জেগে উঠল। প্রথমে দুজনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে শুনলো, ভাবলো এখনি থামবে, কিন্তু না, থামে না, আওয়াজ ক্রমেই প্রচণ্ডতর হয়ে ওঠে।

দিদি।

কি, তুলসী ?

এ কি কোম্পানীর তোপ ?

তাই তো মনে হচ্ছে।

থামে না যে !

থামবে না তো।

কেন ?

কেন কি, মনে নেই, যাওয়ার আগে জীবন বলে গিয়েছিল যে, রাতের বেলায় অনেকক্ষণ ধরে তোপের আওয়াজ চললে বুঝতে হবে যে, কোম্পানীর ফৌজ দিল্লি আক্রমণ করবে।

তবে কি কোম্পানীর ফৌজ এবারে দিল্লিতে ঢুকবে নাকি ?

দিল্লিতে না ঢুকলে লড়াই হবে কি ক'রে ?

আমার যে ভয় করছে, দিদি।

কেন, বহিন ?

যদি ওঁর কিছু হয় ?

শ্যামসুন্দর রক্ষা করবেন।

দেবতা কি সত্যি রক্ষা করতে পারেন ?

তবে এতদিন পূজো করলে কেন ?

যারা পূজো করে তারা কি মরে না ?

যখন মারেন, তখন মরে।

কি জানি দিদি, ভয়ে আমার গা কাঁপছে।

তুমি যে ভালোবাসার চৌদোলে চেপে চলেছ, গা তো কাঁপবেই।

এখানে থাকতে মন সরছে না, চলো, ঠাকুরঘরে গিয়ে বসি।

তখন দুজনে উঠে ঠাকুরঘরে গিয়ে শ্যামসুন্দরের সম্মুখে বসে।

তুলসী বলে, দিদি একটা গান গাও।

কি গান গাইবো।

যাতে সাহস পাই।

তখন শ্যামসুন্দরের দিকে তাকিয়ে পান্না গান ধরলো, সঙ্গে খঞ্জনী বাজাতে লাগলো তুলসী।

"পিয়া বিন রহো না জায়।
তন মন মেরো পিয়া বর করু,
বার বার বলি জায়।
নিসদিন জোঁউ বাট পিয়াকী,
কবরে মিলে গো আয়।
মীরাকে প্রভু আস তুহামী,
লীজো কণ্ঠ লগায়।"

গানের সুর ছাপিয়ে ওঠে কামানের গর্জনকে, সুর ক্রমে ক্রমে পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে অধে উর্ধ্বে ছড়িয়ে পড়ে, গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা তাদের চোখে। সমস্ত চরাচর যেন গ'লে গিয়ে গানের ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে মীরার প্রভুর সুন্দর চরণকমল দু'খানির দিকে। "পিয়া বিন রহো না জায়, পিয়া বিন রহো না জায়।" ওরা তন্ময়, বিশ্ব চিন্ময়।

লালকেল্লায় তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বাদশা বললেন, বেগম সাহেবা, আজ মেঘের ভারি আওয়াজ।

পাশ ফিরে শুতে শুতে বেগম বললেন, না জাঁহাপনা, দরিয়ায় জোর বান ডেকেছে।

॥ ৭ ॥

"The end of the beginning"

একটি নীরস পরিচ্ছেদ

আজ বৃটিশ ছাউনিতে উদ্যোগ-পর্বের সমাপ্তি। সেরাতে ঘুম ছিল না কারো চোখে। একদিকে চার-চারটে বৃটিশ ব্যাটারির হাউইটজার কামানের গর্জন, আর একদিকে শাহ্‌জাহানাবাদের পশ্চিম দিকের বুরুজগুলো থেকে ভারি ও মাঝারি কামানের গর্জন—দুয়ে মিলে নিশীথের নিস্তব্ধতাকে মন্থন ক'রে চলেছে। কামানের গোলার আলোয় দেখতে পাওয়া যায় বারুদের ধোঁয়া আর সিপাহী পক্ষের হাউইগুলো আকাশের গায়ে নীলাভ রেখা টেনে টেনে তাকে শতখণ্ড ক'রে দিচ্ছে। তার উপরে সকলেরই মনে চূড়ান্ত আক্রমণের পরিণামের কৌতূহল আর আকাঙ্ক্ষা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিষ্পত্তি হয়ে যাবে মরণ-বাঁচনের সমস্যা।

হিন্দুরাও কুঠি থেকে শুরু ক'রে পাহাড় বরাবর ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার অবধি যেখানে যত কুঠি আর তাঁবু, সামান্য পদাতিক থেকে শুরু ক'রে জেনারেল উইলসন অবধি যেখানে যত সৈনিক, সর্বত্রই সকলেরই আজ এক অবস্থা। মৃত্যুর সম্মুখে ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে যায়।

তাঁবুর মধ্যে সঞ্চরমাণ আলো, উত্তেজনাপূর্ণ চাপাকণ্ঠের শব্দ, ফৌজী বুটের মসমস আওয়াজ, সমস্তই জাগ্রতকে জাগিয়ে রাখবার, তন্দ্রাতুরের তন্দ্রা ভাঙাবার পক্ষে কাজ করছে, এমন কি যারা ক্ষণিক অবসরে শেষ চিঠিগুলো লিখে ফেলবার আশায় কাগজের উপরে দ্রুতবেগে পালকের কলম চালিয়ে যাচ্ছে—সেই খসখস রব, কারো কণ্ঠ থেকে স্বগত প্রার্থনার মৃদু শব্দ—সমস্তই অদ্ভুত স্পষ্ট হয়ে প্রবেশ করছে এসে কানে। শেষ ঘুম ঘুমিয়ে নেওয়ার আশা এরা সকলেই ত্যাগ করেছে।

"আমরা সকলেই পরীক্ষা ক'রে নিচ্ছিলাম পিস্তল আর জলের বোতল ভরা আছে কিনা, তা ছাড়া মাথাটা রক্ষা করবার আরও কি ব্যবস্থা করা

যায় সেদিকেও নজর দিচ্ছিলাম। কারণ মই বেয়ে প্রাচীরে উঠবার সময়ে মাথাতেই প্রথম আঘাত লাগবার আশঙ্কা। মাথার টুপির উপরে আমি ভবল পাগড়ি বেঁধে নিলাম আর তার মধ্যে রেখে দিলাম সিমলা থেকে প্রাপ্ত শেষ চিঠিখানা, আর তারপরে নিজেকে সমর্পণ করলাম ভগবানের হাতে। সে রাতে ছাউনিতে বড় কারো ঘুম ছিল না। আমি মাঝে মাঝে ঝিমোচ্ছিলাম সত্য, তবে দীর্ঘকাল নয়। তন্দ্রা ছুটে যেতেই দেখতে পেলাম অফিসারদের তাঁবুতে আলো, চাপা কণ্ঠস্বরের আওয়াজ, পিস্তলের ঘোড়া টিপবার শব্দ, বন্দুকের নল পরীক্ষা করবার শব্দ, চারিদিকেই আসন্ন যুদ্ধের উদ্যোগ। মধ্যরাত্রি নাগাদ আমরা সকলে সমবেত হ'লাম আর লণ্ঠনের আলোয় একজন অফিসার যুদ্ধের পরিকল্পনা ও আদেশ পাঠ ক'রে আমাদের শোনালেন। কোন অফিসার বা সৈনিক আহত হয়ে পড়ে গেলে তাকে কেউ সাহায্য করবার কিম্বা সরিয়ে নেবার আশায় লাইন ভেঙে অগ্রসর হবে না, কারণ তত লোক নেই আমাদের। আক্রমণ যদি সফল হয় তবে ডুলিঅলারা তাদের তুলে নিয়ে যাবে হাসপাতালে। আর যদি আমরা পরাজিত হই, তবে আহত ও সুস্থ সকলকেই প্রস্তুত থাকতে হবে চরম নিগ্রহের জন্য।"

ইংরেজ ফৌজ পাঁচটি কলম বা দলে বিভক্ত হয়ে প্রস্তুত হ'ল দিল্লি আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে। প্রথম দলের নেতা নিকলসন, দ্বিতীয় দলের জোন্‌স্, তৃতীয় দলের ক্যাম্বেল, চতুর্থ দলের রীড আর পঞ্চম দলের লঙফিল্ড।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম এই চারটি দল শাহ্‌জাহানাবাদের উত্তর দিকে লাডলো ক্যাস্‌ল্ ও কুদশিয়া বাগের মধ্যে অপেক্ষা করবে উপযুক্ত সময়ের আশায়। চতুর্থ দল থাকবে সব্‌জিমণ্ডির সম্মুখে পূবদিকে।

বৃটিশ ব্যাটারি উত্তর দিকের প্রাচীরে দু' জায়গায় ভাঙবার চেষ্টা করবে, সেই ভাঙন দিয়ে ঢুকবে প্রথম ও দ্বিতীয় দল; বারুদ দিয়ে কাশ্মীর দরবাজা উড়িয়ে দিয়ে সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকবে তৃতীয় দলটি। প্রথম ও দ্বিতীয় দল শহরে ঢুকে পশ্চিম দিকের প্রাচীর বরাবর লাহোর দরবাজার দিকে অগ্রসর হবে, তৃতীয় দল চাঁদনী চক হয়ে যাবে জামি মসজিদের দিকে। প্রথম ও দ্বিতীয় দল লাহোর দরবাজা দখল ক'রে খুলে দিলে চতুর্থ দল শহরে ঢুকে পড়বে। তখন প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ দল একত্রে গিয়ে মিলিত হবে তৃতীয় দলের সঙ্গে জামি মসজিদে। চতুর্থ দল যতক্ষণ না শহরে প্রবেশ করছে ততক্ষণ তার দায়িত্ব বৃটিশ ছাউনি রক্ষা করা। পঞ্চম দলটি রিজার্ভ, যেখানে যখন প্রয়োজন হয় যাবে। কোন দলই—অফিসারে ও সৈনিকে—হাজারের

বেশি নয়। আর একটি অতি ক্ষুদ্র দল ছিল, গোরায় ও হিন্দুস্থানীতে, তার সংখ্যা পাঁচ-সাতজনের বেশি নয়—হোম, সাল্‌কেল্‌ড, বার্জেস আর চারজন হিন্দুস্থানী সিপাহী। এই দলটিকে Suicide Squad বলা চলে। প্রত্যেকে পঁচিশ পাউণ্ড বারুদের থলে নিয়ে অগ্রসর হবে, সেই সঙ্গে দেশলাই ও পলতে। বারুদে আগুন জ্বালিয়ে কাশ্মীর দরবাজা উড়িয়ে দেওয়ার ভার এদের উপরে। এই দলের অন্তর্গত স্বরূপরাম।

ব্রিজম্যান, ক্রসম্যান, গুরবচন সিং ও জীবনলাল তৃতীয় দলের অন্তর্গত হ'ল। এই যোগাযোগে জীবন মনে মনে খুব খুশী হ'ল। এতক্ষণ তার আশঙ্কা ছিল, না জানি কোন্ দলে তাকে দেওয়া হয়। তৃতীয় দলের লক্ষ্য সরাসরি জামি মসজিদ, জামি মসজিদ থেকে ফুলকী-মণ্ডীতে তুলসীদের বাড়ি বেশি দূর নয়। ইচ্ছা হ'লে একবার দেখে আসতে পারবে, দরকার হ'লে লুটতরাজের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। জীবন ভাবলো, এ ভগবানের বিশেষ দয়া। গুরগাঁওয়ের ম্যাজিস্ট্রেট ক্রফর্ডকে এই দলে টেনে নিল ব্রিজম্যান।

ব্রিজম্যানের খাস কামরায় দাঁড়িয়ে জীবন ও গুরবচন সিং যখন চূড়ান্ত আদেশ শুনে নিচ্ছিল সেই সময়ে প্রবেশ করলো বিল ক্রফোর্ড। ব্রিজম্যান ওদের গিয়ে প্রস্তুত হওয়ার জন্যে আদেশ করলো, ওরাও মনে মনে যাওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। গুরবচন চন্দ্রিমাকে চিঠি লিখবে আর জীবন দেখা করবে স্বরূপরামের সঙ্গে। ওরা স্যালুট ক'রে বিদায় হয়ে গেল।

তারপরে বিল, তুমি কি শহরে প্রবেশ করবে, না ছাউনিতে থাকবে?

আমি যদি ছাউনিতেই থাকবো তবে গুরগাঁওয়ে থাকতে কি দোষ ছিল?

মনে রেখো, শহরে প্রবেশ করলে বিপদ আছে।

আমি কি নিরাপত্তার কাঙালী?

নিশ্চয়ই নও, তবু একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য মনে করলাম।

সেজন্য ধন্যবাদ। কিন্তু ভুলে যেয়ো না, কি আশায় এতদিন এখানে পড়ে আছি, কি প্রত্যাশায় শহরে ঢুকতে যাচ্ছি।

অবশ্যই ভুলি নি। কিন্তু ভেবে ছাখো, এতদিন পরে এরকম প্রতিহিংসা গ্রহণের কি প্রয়োজন আছে?

তোমার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ ব্রিজম্যান। কিন্তু যে শহরে যেভাবে আমার ভগ্নী অপমানিত, সেখানে সেইভাবে একটি নারীকে অপমানিত না করা অবধি আমার মন শান্তি পাবে না, এলিনার মনও পাবে না।

ব্রিজম্যান বুঝলো ক্রফোর্ডের সঙ্কল্প অচল অটল। তখন সে বললো, এক মুহূর্ত অপেক্ষা করো। এই বলে ভিতরে গিয়ে কাগজে জড়ানো কি একটা বস্তু নিয়ে এলো। বলল, ছাখো তো ক্রফোর্ড চিনতে পারো কিনা?

কৌতূহলী ক্রফোর্ড কাগজ খুলে ফেলতেই বের হয়ে পড়লো ছোট একখানা শাদা রুমাল, কয়েক জায়গায় রক্তের ছোপে রাঙা।

কি এটা?

ভালো ক'রে ছাখো।

এবারে ক্রফোর্ডের চোখ আবিষ্কার করলো এক কোণে লালস্থতোয় অঙ্কিত ছুটি ইংরাজি অক্ষর, ই. সি.।

আবেগে চীৎকার ক'রে ওঠে ক্রফোর্ড—এই তো এলিনার রুমাল! এলিনা ক্রফোর্ড! কোথায় পেলে এ রুমাল ব্রিজম্যান?

শহরে।

এসব কি রক্তের দাগ?

উত্তর দিল না ব্রিজম্যান।

মাই গড, মাই গড!—বলে বসে পড়ে ক্রফোর্ড।

কিছুক্ষণ পরে বলে ওঠে, ব্রিজম্যান, এইরকম অকাট্য প্রমাণ হাতে থাকতেও তুমি অনুরোধ করছিলে যে আমি নিরাপদে ছাউনিতে বসে থাকি?

অধিক বলতে পারে না, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

যাই হোক, শহরে যখন ঢুকবেই—সঙ্গে অস্ত্র নিয়ো।

অস্ত্র আছে বই কি! এই বলে ক্রফোর্ড পকেট থেকে একমুঠো মোহর তুলে দেখায়।

ব্রিজম্যান বোঝে শোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণে সাময়িকভাবে ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কি বলা উচিত ভাবছে, এমন সময়ে আবিষ্কার করে যে ক্রফোর্ড ঘর থেকে চলে গিয়েছে। নিষ্কৃতির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব্রিজম্যান।

এদিকে ঘর থেকে বের হয়ে জীবন ঘড়িতে দেখল যে প্রায় ছুটো বাজে। বুঝলো আক্রমণের সময় আসন্ন, এখনি ছাউনি ছেড়ে ছুটতে হবে কুদশিয়া বাগে, নিজ দলে জমায়েত হওয়ার জন্যে। সময় সংক্ষিপ্ত, কাজেই দ্রুত পা চালালো স্বরূপরামের ঘরের দিকে। স্বরূপরামের ঘরে প্রবেশ করতেই দেখতে পেলো যে সে বারুদের থলে দেশলাই ও পলতে নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে, এখনি রওনা হবে। বিধাতা মানুষের চরম মুহূর্তগুলির উপযোগী বাক্য তৈরি করেন নি,

হয়তো ইচ্ছা ক'রেই করেন নি, যাতে অবিমুক্ত মানবপ্রকৃতি উদ্‌ঘাটিত হ'তে পারে। তাই উপযুক্ত বাক্যের অভাবে মানুষকে অকিঞ্চিৎকর কথা ব্যবহার করতে হয়।

কি স্বরূপ ভাই, চললে নাকি?

হ্যাঁ, অনেকটা পথ যেতে হবে, কাশ্মীর দরবাজা তো কাছে নয়।

হ্যাঁ, অনেকটা দূর বটে।

জীবনলালের একান্ত ইচ্ছা মৃত্যুপথযাত্রীকে একবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠে না। তার ইচ্ছা হ'ল অনুরোধ করে যে, এমন বিপজ্জনক কাজে নাই গেলে। শেষ মুহূর্তেও ফিরবার পথ আছে, স্বরূপ ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে ফিরতে পারে, উপর থেকে সেই রকম হুকুম ছিল। কিন্তু বলা সম্ভব হ'ল না স্বরূপের মুখের দিকে তাকিয়ে। মনে হ'ল সে যেন অনেক দূরের মানুষ, ইতিমধ্যেই যেন মর্ত্যের সীমা পার হয়ে গিয়েছে।

জীবন, চললাম, আর দেরি করা উচিত হবে না।

সমস্ত পৃথিবী তার চোখে সাপের খোলসের মতো আজ নিরর্থক। অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ ক'রে সে এগিয়ে গেল—একবারও পিছনে ফিরে তাকালো না। ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হ'তে দেখে জীবনের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। যতক্ষণ স্বরূপকে দেখা গেল দাঁড়িয়ে দেখল, তারপরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে কুঠিতে এসে ঢুকলো।

তার আর একটা কাজ বাকি আছে। ক্যালিবানকে একবার আদর ক'রে যেতে হবে। ছাউনির একজন চাপরাসীকে কিছু বকশিশ দিয়ে জীবন রাজী করিয়েছিল যে, সে ক্যালিবানকে নিয়মিত খেতে দেবে, আর জীবন যদি মারা যায় তবে তাকে নিয়ে গিয়ে একটা বনের ধারে ছেড়ে দেবে। চাপরাসীটাকে বিশেষভাবে নিষেধ ক'রে দিয়েছিল কিছুতেই যেন না বাঁধে তাকে, বাঁধলে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে শুকিয়ে মারা যাবে।

কি রে, কেমন আছিস?

জীবনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে শিশুর মতো সরল, পরিণত বয়স্ক সেই নরপশুটা এসে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে।

জীবন তার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে চিরুনির মতো আঁচড়াতে থাকে আর জন্তুটা আরামে ও সন্তোষে চোখ বুজে পড়ে থাকে পায়ের কাছে।

ক্যালিবানের দিকে তাকাতেই মনে পড়ে তুলসীর কথা। ক্যালিবানের

বিবরণ শুনে তুলসী বলেছিল, একবার নিয়ে এসো, ওরকম জীব কখনো দেখি নি।

জীবন উত্তর দেওয়ার আগেই পান্না বলে ওঠে, আগে যে জীবটিকে পেয়েছ তাকে ভালো ক'রে দেখে নাও, বুঝে নাও, তারপরে অন্য জীব দেখবার বায়না ধরো।

জীবন কৃত্রিম অভিমানে বলে, পান্না, আমি কি নরপশু ?

পান্নাও কৃত্রিম কোমলতায় বলে, না ভাই, তুমি নিছক পশু।

কি ক'রে বুঝলে ?

পরীক্ষা ক'রে দেখেছি যে, পোষ মানানো অসম্ভব। তুলসী বোন খুব সাবধান, খুব ক'রে খাটিয়ে নেবে আর নিয়মিত দানাপানি দেবে, ছাখো, তোমার ভাগ্যে যদি পোষ মানে।

সুখের দিনের এইসব কথা আজ দুঃখের দেউড়িতে বসে মনে পড়তে থাকে তার। স্মৃতিশক্তি আছে বলেই মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ, নতুবা প্রত্যেকটি মানুষ একটি আস্ত ক্যালিবান।··

এবারে তার চুলের ঝুঁটি টেনে দিয়ে বলে, কি রে, লড়াই করতে যাবি নাকি আমার সঙ্গে ?

মুখ তুলে তাকায় ক্যালিবান।

লড়াই কাকে বলে বুঝতে পারছিস নে ? তা কি ক'রে পারবি, তোরা যে পশু !

ওর চোখের দৃষ্টিতে এর মুখের কথায় উত্তর প্রত্যুত্তর চলে।

আরে, তোরা লড়িস দাঁত নখ দিয়ে তাই তোরা পশু। আমরা লড়ি ঢাল তলোয়ার কামান বন্দুক দিয়ে, আমরা মানুষ কিনা। মানুষ কেমন ক'রে লড়ে যদি দেখতে চাস তবে চল্ আমার সঙ্গে।

তারপরে ওর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, না, মানুষের পশুত্ব আর দেখে কাজ নেই। এখানেই থাক।

উঠে পড়ে জীবনলাল, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় ক্যালিবান।

কি রে, সত্যি সত্যি সঙ্গে যাবি নাকি রে ! খবরদার, খবরদার, এমন কাজ করিস নে, মারা পড়বি। বোস, বোস, আমার পিছু পিছু যেন আসিস নে।

জীবনের ইঙ্গিতে ক্যালিবান বসে পড়ে।

এমন সময়ে সারা ছাউনিময় বিউগল বেজে ওঠে, নিজ নিজ দলে

যোগদানের আহ্বান।

জীবন পিঠে হাত দিয়ে দেখে জলের বোতল, রেশন ব্যাগ ঠিক আছে কিনা। কোমরে হাত দিয়ে দেখে পিস্তল ও বারুদের থলি শক্ত ক'রে আঁটা আছে কিনা। তারপরে দেওয়ালে ঠেস দেওয়া বন্দুকটা হাতে তুলে নেয়।

শেষবার ক্যালিবানকে আদর ক'রে, 'পিছু পিছু আসিস নে' সতর্ক বাণী উচ্চারণ ক'রে ছুটতে আরম্ভ করে কুদশিয়া বাগের দিকে। ছাউনিময় শত শত ধাবমান পদধ্বনির শব্দ, দিগ্‌দিগন্তে শব্দের জাল নিক্ষেপী বিউগলের শিবাধ্বনি আর সর্বোপরি গভীর গম্ভীর আরাব। সবসুদ্ধ মিলে সে এক শব্দের অরাজকতা।

খুরশিদ জানের ঘর থেকে বের হয়ে সরাব মিঞা আর তার দুই বন্ধু চললো কাশ্মীর দরবাজার দিকে। বেগম বাগ থেকে কাশ্মীর দরবাজা বেশি দূরে নয়। কিছু পথ এগোতেই তারা দেখলো যে, কাশ্মীরবুরুজের কতক অংশ ভেঙে পড়েছে, ডানদিকে পানিবুরুজেরও কতকটা অংশ ভগ্ন। এই দুই জায়গাতেই পড়ছে কোম্পানির কামানের গোলা। তখন তারা আর একটু পশ্চিম ঘেঁষে স্কিনার সাহেবের বাগিচার মধ্যে দিয়ে কাশ্মীর দরবাজার কাছে এসে দাঁড়ালো। কাশ্মীর দরবাজা শহরের দুটো দেওয়ালের সন্ধিস্থলে, পশ্চিমমুখো, সে জায়গাটা নিরাপদ। ব্যাপার কি ভালো ক'রে দেখবার আশায় তারা প্রাচীরের উপরে উঠে কাশ্মীর দরবাজার মাথায় এসে উপস্থিত হ'ল। সুরযপ্রসাদ বলল, দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়, শুয়ে পড়ো। তখন তিনজনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে তাকালো বাইরের দিকে।

তারা বুঝলো যে কুদশিয়া বাগের মধ্যে কাস্টম হাউসের ভগ্নাবশিষ্ট দেওয়ালটার আড়াল থেকে গোলা আসছে। শাহী কামানের গোলা সেখানে পৌঁচচ্ছে না, সবগুলোর মুখ পশ্চিম দিকে, উত্তর দিকের বুরুজে যে সব কামান আছে সেগুলো নিরুত্তর। কেন বুঝতে পারলো না, তারা জানতো না নিমচী ফৌজের প্রতিক্রিয়া।

তারা শুয়ে শুয়ে দেখতে পায় অদূরে গাছপালার আড়ালে আগুনের ঝলক ওঠে, তারপরেই বু-বু-বুম আওয়াজ। এক মুহূর্ত পরে প্রাচীরের কতকগুলো পাথর হুড়মুড়হুড় ক'রে খসে পড়ে, তারপরেই ধোঁয়ায় আর বারুদের গন্ধে চারিদিক আচ্ছন্ন, দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আবার ঠিক তারপরেই আগুনের ঝলক, বু-বু-বুম আওয়াজ, প্রাচীর ভেঙে

পড়বার আওয়াজ, আবার ধোঁয়া ও বারুদের গন্ধ। এই প্রক্রিয়ার আর অন্ত নেই।

তবে তাদের তিনজনের মনের গতিবিধি ঠিক একমুখী নয়। সরাবের মনে কৌতূহল ও বিস্ময়। পর পর অনেকগুলো অপ্রত্যাশিত আঘাতে নয়নের মন অসাড়, কেবল একটিমাত্র বিষয়ে সচেতন ছিল, সব নষ্টের মূল স্বরূপকে হাতের কাছে পেলে প্রতিশোধ গ্রহণ করতো, তারপরে মরতেও তার দুঃখ নেই। কিন্তু সে আশা অসম্ভব। আর স্বরূপপ্রসাদের মন আদৌ এদিকে ছিল না। পরিবারবর্গকে মথুরায় পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ির দেওয়ালে গর্ত ক'রে "অশ্শি হজার" মোহর লুকিয়ে রেখেছিল। তবু মন শান্তি পায় না, দেওয়াল ভেঙে বার করতে কতক্ষণ। ইঁদারার মধ্যে ফেলে রাখলে কি আরও নিরাপদ হ'ত না? না, বিপদ কেটে গেলে তুলে আনা কঠিন হ'ত, ইঁদারাটা অতলস্পর্শ। আর কি উপায় আছে ভাবতে থাকে স্বরূপপ্রসাদ।

কতক্ষণ তারা এমনভাবে শুয়েছিল বুঝতে পারে না, আওয়াজের হট্টগোলে সময়ের হিসাব গুলিয়ে যায়। তবে রাত বোধ করি শেষ হ'তে আর বিলম্ব নেই। এক সময়ে হঠাৎ তারা নিস্তব্ধতার আঘাতে চমকে ওঠে। কামানগুলো একযোগে সব থেমে গিয়েছে। কি করবে তারা ভাবছে এমন সময়ে দেখতে পায়—

ভোররাতের হাল্কা অন্ধকারে সাত আটজন লোক। অন্ধকারে সংখ্যা সঠিক অনুমান হয় না, কাশ্মীর দরবাজা বরাবর ছুটে আসছে। ব্যাপার কি? এরাই কি আক্রমণ করবে নাকি? এই কজনে? ততক্ষণে তারা কাছে এসে পড়েছে। সরাব মিঞারা দেখতে পায় প্রত্যেকের হাতে একটা বড় থলে। কি আছে ওতে? এ কি, সিপাহীরা গুলী চালাচ্ছে না কেন? এবারে তারা দরবাজার সম্মুখে পরিখার উপরে যেখানে টানা পুল ছিল, পুল ভেঙে দেওয়াতে এখন এপার-ওপার হয়ে পড়ে আছে শুধু গোটা দুই লোহার কড়ি—সেখানে এসে পৌঁচেছে। সরাব ফিসফিস রবে শুধোয়, নয়ন, ওরা কি পরিখা পেরিয়ে দরবাজার কাছে আসবে নাকি?

তাই তো মনে হচ্ছে।

মরতে চায় দেখছি।

নয়ন বলে, যুদ্ধ মানেই তো মরা।

তাই বলে ইচ্ছা ক'রে!

এবারে সিপাহীদের সম্বিৎ হয়, সরাবদেরও বটে।—ওহো, তাই বলো,

শয়তানরা গেটটা উড়িয়ে দিতে চায়। হাতে ওগুলো বারুদের থলে।

শয়তান ছাড়া এমন দুঃসাহস আর কার হবে!

গুলী চলতে শুরু করে সিপাহী পক্ষ থেকে। একজন পরিখার মধ্যে পড়ে যায়। ঐ আর একজন উল্টে পড়ে গেল। কিন্তু এ কি, পড়বার মুখেও অপর আর একজনের হাতে কি দিয়ে গেল? পলতে দেশলাই নাকি?

জনচারেক দরবাজার কাছে, একেবারে প্রাচীরের নিচে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাদের উপরে আর গুলী চালানো সম্ভব নয়, ভালো ক'রে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এখনো একজন কড়ির উপর দিয়ে পরিখা পার হচ্ছে। নয়ন তার পিঠের বারুদের থলে লক্ষ্য ক'রে গুলী চালায়। বারুদের থলেয় বিস্ফোরণ ঘটে আর সেই খণ্ডিত মুহূর্তের মধ্যে নয়ন দেখতে পায়,—না, ভুল হওয়ার এতটুকু কারণ নেই—সরাব মিঞা ও স্বরূপপ্রসাদ তিনজনেই দেখতে পায়—স্বরূপরাম।

সরাব মিঞা বলে ওঠে, কি নয়ন, এবারে খুশী হ'লে তো?

কিন্তু কই খুশী হ'তে পারলো সে? যেমনটি ভেবেছিল তেমনটি তো হ'ল না, সব কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে।

কি হ'ল নয়ন?

নয়ন উত্তর দেওয়ার জন্যে মুখ খুলছে কিন্তু কথা বের হওয়ার আগেই পায়ের তলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তিন ফুট পুরু প্রাচীর থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে ধোঁয়ায়, বারুদের গন্ধে চারিদিক ভরে যায়, ছোটখাটো পাথরের টুকরো গায়ে এসে পড়ে। বারুদের আগুনে দরবাজা উড়িয়ে দিয়েছে। শয়তান না হ'লে আর এমন দুঃসাহস হয়!

কিন্তু বেশি চিন্তা করবার সময় পায় না তারা। সঙ্গে সঙ্গে কুদশিয়া বাগের মধ্যে লৌহকণ্ঠে আদেশ ধ্বনিত হয়—এ্যাডভান্স! আর প্রচণ্ড উল্লাস-কোলাহলে হাজার হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—এ্যাডভান্স! তারপরেই ওরা দেখতে পায় কুদশিয়া বাগের ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে ছুটে চলে আসছে কোম্পানির ফৌজ।

কাশ্মীর দরবাজা উড়িয়ে দেওয়ার কাণ্ড দেখে সিপাহীরা এমন বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল যে গুলী ছুঁড়তে ভুলে যায়। ইত্যবসরে কোম্পানীর ফৌজ, গোরা ও দেশী, মই হাতে ক'রে ঝুপঝাপ লাফিয়ে পড়ে গভীর পরিখার মধ্যে, তারপরে মই লাগিয়ে এদিকে ওঠে, আর ভাঙা প্রাচীর ও দরজার ফাঁক দিয়ে জলস্রোতের মতো ঢুকতে চেষ্টা করে। এবারে সিপাহীরা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে গুলী চালাতে

শুরু করেছে, আহত নিহত উল্টে গিয়ে পড়ছে পরিখার মধ্যে, কেউবা নিম্নবর্তীর ঘাড়ে।

সরাব মিঞা ও নয়নচাঁদ বাস্তবজ্ঞান-রহিত অবস্থায় সব দেখছিল, বাস্তবজ্ঞানের চাঁচি শূরযপ্রসাদ বলল, ভাই, আর এখানে থেকে লাভ নেই।

কেন?—শুধোয় সরাব মিঞা।

ওদের ঢুকতে বাধা দেওয়া সম্ভব হ'ল না, এবারে অন্য উপায়ে বাধা দিতে হবে।

ঢাল নেই তলোয়ার নেই—বাধা দেবে তুমি কি দিয়ে?

শূরয নীরবে কপালে তর্জনী স্পর্শ করলো, ঈষৎ নড়লো ঠোঁট দুটো। ওরা বুঝলো, বুদ্ধি।

অনেক হতাহত হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানীর ফৌজ প্রবেশ করতে সক্ষম হ'ল শহর শাহ্‌জাহানাবাদে। এ পর্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবেই চলছিল, এর পরেই আরম্ভ হ'ল গোল। অত্যন্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনাতেও ভুল হ'তে বাধা নেই। যুদ্ধের ইতিহাস প্রধানত অপ্রত্যাশিত ভুল-ভ্রান্তির ইতিহাস।

ব্রিগেডিয়ার জোন্‌সের নেতৃত্বে ২নং দলটি পানিবুরুজের ভগ্নাবশেষ দিয়ে প্রবেশ ক'রে প্রায় নির্বিঘ্নে জামি মসজিদে এসে উপস্থিত হ'ল। এ অংশ পরিকল্পনা মতোই হ'ল। ব্রিগেডিয়ার নিকলসনের নেতৃত্বে ১নং দল কাশ্মীর বুরুজের ভাঙা দেওয়াল দিয়ে ঢুকলো আর কর্নেল ক্যাম্বেলের নেতৃত্বে ৩নং দল ঢুকলো ভাঙা কাশ্মীরী দরবাজা দিয়ে! ১নং এবং ৩নং দল পশ্চিম প্রাচীর বরাবর রওনা হ'ল লাহোর দরবাজার দিকে। পশ্চিম প্রাচীরের উপরে মীর আতশ কুলি খাঁর গোলন্দাজ ফৌজ আর সিপাহ্‌সালার বখৎ খাঁর ফৌজ, কাজেই কোম্পানীর ফৌজ না পারলো লাহোর দরবাজা দখল করতে না পারলো সেখানে পৌছতে। ওদিকে মেজর রীডের নেতৃত্বে সব্‌জিমণ্ডিতে যে ৪নং দলটি ছিল তারা আক্রান্ত হ'ল সিপাহী ফৌজ কর্তৃক। আর এই দুই বিপর্যয়ের পরিণামে ২নং দলটি জামি মসজিদে পৌছা সত্ত্বেও, কিম্বা পৌছবার ফলেই, মূল কোম্পানীর ফৌজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। ব্রিগেডিয়ার জোন্‌স্ প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করছিল ১নং, ৩নং ও ৪নং দলের আগমন।

মধ্যাহ্ন অতীত হয়ে যাওয়ার পরে জোন্‌স্ বুঝলো "Some one has blundered!" যাই হোক, এমন বিচ্ছিন্ন ভাবে শত্রুপুরীর মধ্যে আর

বেশিক্ষণ অবস্থান করা উচিত নয়। জোন্‌স্ ফিরে চলল উত্তর দিকে, এসে উপস্থিত হ'ল স্কিনার সাহেবের কুঠিতে, সেখানে আহত ও সুস্থ অনেককেই দেখতে পেলো, তখন অপরাহ্ণ অতিক্রান্ত।

ইতিমধ্যে বৃটিশ ফৌজে একটি গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিকলসন মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে প্রেরিত হয়েছে। ৩নং দলটিকে লাহোর দরবাজায় পৌছতে অক্ষম হয়ে ফিরে আসতে দেখে নিকলসন এগিয়ে গিয়ে তাদের নিয়ে গিয়েছিল লাহোর দরবাজার দিকে সরু একটা গলির মধ্যে দিয়ে। উপর-থেকে বন্দুকের গুলী এসে লাগলো তার পিঠে, বাঁ দিকের ফুসফুস ফুটো হয়ে গেল।

সন্ধ্যার আগে জেনারেল উইলসন লাডলো ক্যাসল থেকে এসে উপস্থিত হ'ল স্কিনারের গির্জায়। ৪নং দলের অসাফল্য, ১নং ২নং ও ৩নং দলের বিপর্যয় এবং হতাহতের দীর্ঘ তালিকা দেখে উইলসন সসৈন্যে শহর ত্যাগের বিষয় চিন্তা করতে শুরু করলো। এ কথা কানে যাওয়া মাত্র শয্যাশায়ী নিকলসন বলে উঠল, ভগবানকে ধন্যবাদ যে ওকে গুলী ক'রে হত্যা করবার মতো শক্তি এখানে আছে আমার দেহে। কিন্তু তার প্রয়োজন হ'ল না, ব্রিগেডিয়ার নেভিল চেম্বারলেন ও বেয়ার্ড স্মিথ প্রভৃতির পরামর্শে বৃটিশ ফৌজ শহরে অবস্থান সিদ্ধান্ত ক'রে স্কিনার সাহেবের গির্জা ও কুঠি আঁকড়ে সেরাত্রির মতো পড়ে থাকলো। শহরের উত্তরাংশের সামান্য একটি ফালিমাত্র পানিবুরুজ থেকে কাবুল দরবাজা পর্যন্ত এসেছে কোম্পানির অধিকারে।

এমনিভাবে কাটলো চৌদ্দই সেপ্টেম্বর দিনমান ও রাত্রি।

॥ ৮ ॥

"The beginning of the end"

আর একটি নীরস পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের গতিক ভালো নয় বুঝতে পেরে দিল্লির বেসামরিক জনতা এবারে শহর পরিত্যাগ করতে শুরু করলো। গ্রামাঞ্চলে যাদের বাড়িঘর বা অন্য আশ্রয় ছিল তারা অনেক আগেই চলে গিয়েছিল, এবারে আশ্রয়হীন ব্যক্তিরা আশ্রয়ের আশায় শহর ছেড়ে চললো। যমুনার পুল পেরিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না, মীরাটী ও নিমচী ফৌজ পুল দখল ক'রে নিয়েছে। সারাদিন ও সারারাত

তারা সারিবদ্ধভাবে পার হচ্ছে পুল। পিঠে, মাথায়, ঠেলাগাড়িতে লুটের মাল; শহরের ঘোড়া উট খচ্চর জবরদখল ক'রে নিয়ে তাদের পিঠে চাপিয়েছে হাতের কাছে যা পেয়েছে।

মীরাটী ফৌজের কুলিজ খাঁ ও শেখ বান্নু আগেই চলে গিয়েছিল। নিমচী ফৌজের ঘউস মহম্মদ ও দিল মহম্মদের কিছু বিলম্ব হয়েছে, তাদের লোভ ও লুটের মাল পরিমাণে কিছু বেশি। একজন শুধিয়েছিল, খাঁ সাহেব, তোমরা যে চললে, লড়াই করবে কে?

খাঁ সাহেব অর্থাৎ ঘউস মহম্মদ বলল, চললাম কোথায়? ঘুরে এসে আক্রমণ করবো কোম্পানী ফৌজের পিছের দিকে, লড়াইয়ের এই তো কানুন।

কাজেই বেসামরিক জনতার বাইরে যাওয়ার একমাত্র উন্মুক্ত পথ দিল্লি দরবাজা। ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ কাতারে কাতারে চলেছে। অনেকের বহু পুরুষ দিল্লিতে বাস, বাইরে কোথাও আশ্রয় নেই, তবু চলেছে, কেননা প্রতিবেশী চলেছে। কোথায় চলেছে? কেউ যাবে ফিরোজ শা কোটলা, কেউ যাবে পুরানা দিল্লি, কেউ যাবে হুমায়ুন শার কবর, আরও দূরে যার লক্ষ্য সে যাবে হাউজ খাস কিম্বা কুতুবমিনারের পাড়ায়, মেহ্‌রৌলী। সেখানে কি আশ্রয় মিলবে? সবাই জানে দিনের রোদ ও রাতের শীত ছাড়া অন্য কিছু তাদের জন্য অপেক্ষা করছে না, আর আছে গুজার লুটেরা। তবু যেতে হবে, কেননা গোরা সিপাহী ও কালা সিপাহীর সম্মুখে তারা পড়তে চায় না। বিজয়ী সৈন্যের লুটের গল্প শুনেছে তারা। না, কিছুতেই তাদের হাতে পড়বে না, তাতে প্রাণও যাবে, মানও যাবে—টাকাকড়ি তো যাবেই, তার আর আছেই বা কি! পাহাড়ের জঙ্গলে আছে ভালুক, আছে নেকড়ে বাঘ। সে-ও বরং বাঞ্ছনীয়। অতএব সবাই চলেছে। পুরুষের দুই কাঁধে দুই শিশু, মেয়ের মাথায় মোট। অবিশ্রান্ত অবিরাম, সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে ভোর—এই একই দৃশ্য।

তবে বাদশাহের পক্ষে লড়ছে কে? শহরের মধ্যে বখৎ খাঁ আর তার বেরিলীর ফৌজ। আর প্রাচীরের উপরে বুরুজে বুরুজে কুলি খাঁ আর তার গোলন্দাজ ফৌজ। লাহোর গেট বেশিক্ষণ হাতে রাখা যাবে না বুঝতে পেরে বখৎ খাঁ তার হেড-কোয়ার্টার সরিয়ে এনেছে আজমীঢ় দরবাজার কাছে গুলজারি গঞ্জে। কুলি খাঁর অধীনে এখনো লাহোর দরবাজা থেকে আরম্ভ ক'রে দিল্লি দরবাজা পর্যন্ত শহরের প্রাচীরের সমস্তটা। শাহ্‌জাদারা কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে কেউ জানে না।

পনেরোই তারিখ সকালে আবার দুই পক্ষের লড়াই আরম্ভ হ'ল। বখৎ খাঁর হুকুমে শহরের বাইরে কিষেণগঞ্জ, পাহাড়পুর, তেলিওয়ারায় যে ফৌজ ছিল তারা চলে এলো ভিতরে, কাজেই শহরের মধ্যে প্রতিরোধ বৃদ্ধি পেয়ে যুদ্ধ তীব্রতর আকার ধারণ করলো। কিন্তু একে আর ব্যূহযুদ্ধ বলা চলে না। সরু গলি ও অট্টালিকাবহুল শহরের মধ্যে বা পার্বত্য অঞ্চলে ব্যূহবদ্ধ যুদ্ধের স্থলে দেখা দেয় খণ্ডযুদ্ধ, সৈন্যবাহিনীর উপরে প্রাধান্য লাভ করে সৈন্য-বিশেষ। এক্ষেত্রেও তা-ই ঘটলো। বাড়ির ঘুলঘুলি জানলা, আল্‌সের ফাঁক-ফুকর দিয়ে গুলী এসে পড়তে লাগলো কোম্পানীর ফৌজের উপরে, নিহতের সংখ্যা গেল বেড়ে। তখন খণ্ডযুদ্ধ স্থগিত ক'রে কোম্পানীপক্ষ বাইরে ভারি কামান নিয়ে এসে তোপখানার উত্তরে সরকারী কলেজের হাতার মধ্যে ব্যাটারি স্থাপিত করলো, আর নিয়ে এলো কতকগুলো হাল্‌কা কামান বাড়ির দরজা ভাঙবার উদ্দেশ্যে। ব্যাটারি থেকে গোলা চলতে শুরু করলো সেলিম-গড়ে আর লালকেল্লায়। তখন দেখা দিল গুলী বনাম গোলার যুদ্ধ, সিপাহী পক্ষের বন্দুকের গুলী বনাম কোম্পানী পক্ষের কামানের গোলা। সিপাহী পক্ষের লক্ষ্য কোম্পানীর ফৌজ, কোম্পানীপক্ষের লক্ষ্য সেলিমগড় ও লাল-কেল্লার মতো দুর্ভেদ্য দুর্গ। কুলি খাঁর হাতে অবশ্য অনেক কামান ছিল কিন্তু খুব কাজে লাগল না। ভারিগুলো পশ্চিমমুখে শক্ত ক'রে বুরুজে গাঁথা, হাল্কাগুলোর গোলা এসে পৌছয় না এতদূরে।

পনেরোই তারিখটা এইভাবেই কাটলো। কোম্পানী এক পা এক পা ক'রে এগোচ্ছে, সিপাহী এক পা এক পা ক'রে হঠছে।

ষোলই তারিখেও চলল গুলী বনাম গোলার যুদ্ধ, তবে কোম্পানীপক্ষ সেদিন অধিকাংশ ফৌজ নিযুক্ত করলো লাহোর দরবাজা দখল করবার উদ্দেশ্যে।

সন্ধ্যাবেলায় কুলি খাঁ এসে উপস্থিত হ'ল বখৎ খাঁর হেড কোয়ার্টারে।

কি খবর মীর আতশ?

সিপাহ্‌সালার, লড়াইয়ের গতিক ভালো নয়।

সে তো বুঝতেই পারছি।

কুলি খাঁ বলে, কালকের দিনটাও হয়তো লাহোর দরবাজা দখলে রাখতে পারবো—তার বেশি নয়।

সিপাহ্‌সালার সমস্তই জানে, সমস্তই বোঝে, কাজেই কি আর উত্তর দেবে।

কুলি খাঁ বলে, কালকের দিনটাও যেমন ক'রে পারি লাহোর দরবাজা দখলে রাখবো, আপনি ইতিমধ্যে বাদশাকে নিয়ে লখনৌ চলে যান, সেখানে

এখনো লড়াই চলছে।

তারপর ?

তারপর আর কি! সেখানে শাহী ঝাণ্ডা দেখতে পেলে হিন্দুস্থানের তামাম সিপাহী লোক এসে জুটবে। সে লড়াই এত সহজে শেষ হওয়ার নয়। যান, আপনি বাদশাকে নিয়ে চলে যান।

বখৎ খাঁ সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, যদি যান।

না গিয়ে কি করবেন ?

এখানে থাকবেন।

চমকে ওঠে কুলি খাঁ।

এখানে থাকবেন ? কি সর্বনাশ, তার পরিণাম কি বোঝেন না ? কোম্পানীকে আপনিও জানেন, আমিও জানি।

বাদশা জানেন বলে মনে হয় না।

বুঝিয়ে বলুন। আপনার ফৌজ নিয়ে, বাদশাকে নিয়ে কালকেই চ'লে যান। এখনো যমুনার পুল আমাদের হাতে, কালও থাকবে, পরশু না থাকতেও পারে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বখৎ খাঁ শুধোয়, তুমি এখানে থেকে কি করবে মীর আতশ, তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে!

আমি গেলে কোম্পানীর ফৌজকে আটকে রাখবে কে ? আপনারা বাদশাকে নিয়ে বিদায় না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমাকে থাকতেই হবে কামানের কাছে

তারপর ?

তার পরে আর নেই সিপাহ্‌সালার। তবে এ কথা জেনে রাখুন, কুলি খাঁ জীবিত থাকতে কামান দখল করতে পারবে না কোম্পানীর ফৌজ।

এই ব'লে আদাব জানিয়ে দ্রুত বের হয়ে যায় মীর আতশ কুলি খাঁ।

এই কে আছিস, একবার চীফ এঞ্জিনিয়ার মহম্মদ আলি খাঁকে পাঠিয়ে দে আমার খাস কামরায়—ব'লে বখৎ খাঁ গিয়ে প্রবেশ করে খাস কামরায়।

। ১ ।

"What of the faith and fire within us
Men who march away
Ere the barn-cocks say
Night is growing grey,
Leaving all that here can win us ;
What of the faith and fire within us
Men who march away."

—Hardy

খণ্ডযুদ্ধের মতো মর্মান্তিক আর কিছু নেই। ব্যূহবদ্ধ যুদ্ধে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি সত্য, কিন্তু সে মৃত্যু ব্যূহবদ্ধ সৈন্যের, পরিচয় যাদের নেই। খণ্ডযুদ্ধে ব্যক্তির আক্রমণে ব্যক্তির মৃত্যু। ষোলই সেপ্টেম্বর থেকে শহর শাহ্‌জাহানাবাদে সেই খণ্ডযুদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যুর দৃশ্য দেখা দিল।

গোরা সৈন্য বাড়ি লক্ষ্য ক'রে হাল্‌কা কামানের গোলা চালায়, সিপাহী আল্‌সে ঘুলঘুলির আড়াল থেকে গোরাকে লক্ষ্য ক'রে বন্দুক চালায়। হয়তো মাথায় গুলীর আঘাত খেয়ে টাল্ খেয়ে পড়ে লোকটা,—They have done for me! হয়তো ঐ কথাটাও বলতে পারে না। এদিকে গোটা দুই গোলার ঘায়ে বাড়ির প্রাচীর খানিকটা ধ্বসে যায়। বাড়িটা শূন্য হ'লে কেউ বের হয়ে আসে না, নতুবা ছেলেমেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে আসে বুড়ো-বুড়ী। সঙীনের খোঁচায় প্রাণে বেঁচে গেলে ছুটে পালায়। জনকতক কোম্পানীর সৈন্য ঢুকে পড়ে বাড়িতে। না, কাউকে গ্রেপ্তার করবার উদ্দেশ্যে নয়। টাকাকড়ি কোথায় লুকানো আছে তারি খোঁজে।

লুঠ-তরাজের কলাকৌশলে ওরা সিদ্ধহস্ত। ওরা জানে হিন্দুস্থানের লোকে বিপদ আসন্ন দেখলে ধনরত্ন দেওয়ালে গেঁথে রাখে, নয়তো বাক্সে পুরে বাড়ির ইঁদারার মধ্যে ফেলে দেয়—আর হিন্দু হ'লে ঠাকুরের বেদী খুঁড়ে তার মধ্যে পুঁতে রাখে। এ সমস্তই জানে গোরার দল। বইয়ে পড়ে, পরস্পরের মুখে শুনে, সমস্ত আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে। দেয়ালে কাঁচা গাঁথুনি দেখলেই সঙীনের খোঁচা মারে, ঠাকুরঘরে প্রবেশ ক'রে বুটজুতোর আঘাতে মূর্তি সরিয়ে দিয়ে খুঁড়ে ফেলে বেদী। ওদের অনুসন্ধিৎসা একেবারে ব্যর্থ হয় না, অনেক জায়গাতেই আবিষ্কৃত হয় গহনাপত্র, হীরেমুক্তো, বাদশাহী মোহর।

কয়েকজনে ভাগ ক'রে আত্মসাৎ করে। এমনি চলে বাড়ির পরে বাড়িতে। দিল্লি শহর বহুবার লুণ্ঠিত হওয়া সত্ত্বে তার ঐশ্বর্যের পরিমাণ সামান্য নয়, বেশ ভারি হয়ে ওঠে ইংরেজ সৈনিকের পিঠের থলিটা। বলা বাহুল্য প্রাইজ এজেন্টের হাতে কেউ কিছু সমর্পণ করে না।

হাঁ, একজন প্রাইজ এজেন্ট গোড়া থেকেই নিযুক্ত হয়েছে। সে একজন পদস্থ সামরিক অফিসার, তার লুটের মালের জিম্মেদারী। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে সামরিক মর্যাদা অনুসারে সেই মালের ভাগ-বখরা হবে। কিছু কিছু তার তহবিলে এসে জোটে, তবে বারো আনা ভাগ যায় আবিষ্কর্তার পিঠের থলিতে। এর পরে লণ্ডনের হীরে-জহরতের বাজারে এসব মাল গিয়ে উপস্থিত হবে, কিছুদিনের জন্য হীরে-জহরত সোনারুপোর দর প'ড়ে যাবে। লক্ষ্মী যখন গৃহ থেকে গৃহান্তরে যান, তখন এরকম ওলট-পালট অনিবার্য।

চাঁদনীচকের দক্ষিণ গলিতে রহমান ও চাঁদনী চকের মোড়ের উপরে সুরযপ্রসাদের কুঠি। সুরযপ্রসাদ আগেই স্ত্রীপুত্রদের মথুরায় চাচার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ইচ্ছা করলে নিজেও যেতে পারতো, লড়াই ব্যাপারটা কি রকম দেখবার আগ্রহে রয়ে গিয়েছিল। সে যোদ্ধা নয় তবে ভীরুও নয়। তার 'অশশি হাজার' আকবরী মোহর কোথায় যে লুকিয়েছে কেউ জানে না। স্ত্রী জিজ্ঞাসা ক'রে উত্তর পেয়েছিল, মেয়েছেলের পেটে কথা থাকে না। তলে তলে লুটেরাদের ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যথোচিত ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল। দেওয়ালে তিন-চার স্থানে চুনবালির কাঁচা আস্তর ক'রে রেখেছিল, পূজোর বেদী থেকে বিগ্রহ সরিয়ে স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল মথুরায়। ঘটা ক'রে কতকগুলি পাথরের গায়ে সিঁদুর মাখিয়ে বসিয়ে রেখেছিল, আর সর্বোপরি একটা মস্ত মজবুত স্টীলের বাক্সে পাথরের টুকরো ভ'রে তাকে ভারি ক'রে রেখেছিল। এইভাবে প্রস্তুত হয়ে সে অপেক্ষা করছিল গোরা লুটেরার আগমনের আশায়।

৩নং দলের জনতিনেক ইংরেজ সৈন্য সুরযপ্রসাদের বাড়ির সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'তেই একজন ব'লে উঠল, I say, Tom, he is a sensible fellow—পাছে কামানের গোলাতে দরজা জানলা ভেঙে যায় তাই সব খুলে রেখেছে।

তাতেই মনে হচ্ছে কিছু নেই।

অসম্ভব নয়, তবু একবার খুঁজে দেখা ভালো।

তিনজনে প্রবেশ করে বাড়ির মধ্যে।

It's a pretty big house, নিশ্চয়ই কিছু আছে।

এমন সময়ে ওদের চোখ পড়ে দেওয়ালের তিন-চার জায়গায় যেখানে কাঁচা আস্তর। তিনজন একসঙ্গে চীৎকার ক'রে ওঠে—By Jove, it's a regular treasure trove!

দেওয়াল খোঁচাতে থাকে সঙীন দিয়ে। ঠিক সেই সময়ে ভীরু বীরপদে একটা ঘর থেকে বেরিয়ে মস্ত বাক্সটা ইঁদারার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সুরয-প্রসাদ, আর দিয়েই খিড়কি দরজা দিয়ে ছুটে পালায়।

ব্যাপার দেখে তিন গোরা আবার একত্রে চীৎকার ক'রে ওঠে, আসল treasure trove ঐ গেল ইঁদারার মধ্যে। I say, let us go down।

কথাটা সুরযপ্রসাদের কানে যায়। মনে মনে হাসতে হাসতে বলে, নে বেটারা, এখন পাতালপুরীতে নেমে ঠাণ্ডাজলের মধ্যে হাতড়ে মর।

ব্রিগেডিয়ার অধীনস্থ ২নং দলের উপরে ভার পড়েছিল Mopping-up Operation-এর, অর্থাৎ অধিকৃত অঞ্চলে শাসন কায়েম করবার, দু'চারজন বেয়াড়া লোক থাকলে তাদের সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করবার, আর খালি বাড়িগুলো দখলে আনবার।

ব্রিজম্যান ও ক্রসম্যান তালিকা ও ম্যাপ অনুযায়ী কাজ ক'রে যাচ্ছিল। জীবনলাল ভাবছিল লড়াইয়ের যে গতিক দেখছি তাতে এ ঢেউ জামি মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতেই শেষ হয়ে যাবে। কাজেই তুলসীদের ভয় নেই।

তুলসীদের বাড়ি ফুলকি-মণ্ডী শহরের একেবারে দক্ষিণ দিকে।

গুরবচন বলছিল, চলো ভাই জীবন, এই ফাঁকে একবার তুলসীবাঈকে দেখে আসি।

তা কি ক'রে হয় ভাই, এখনো লড়াই চলছে।

সেইজন্যেই তো ভরসা, কেউ খোঁজ করবে না।

তারপরে বলে, তুমি যে কি ক'রে এ কয়দিন তাকে না দেখে আছো তাই ভাবছি।

তুমিও তো ভাই চন্দ্রিমাকে অনেক মাস না দেখে আছ।

আরে সে যে আমার শাদি-করা বহু।

তাতে কি হ'ল?

শাদি হ'লে বুঝবে। শাদি-করা বহুকে যত কম দেখবে তত মিঠা।

এই বলে হোঃ হোঃ শব্দে হেসে ওঠে গুরবচন সিং।

এদিকে সকলের পিছনে ক্ষুধিত ভালভুতার চোখ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে

উইলিয়াম ক্রফোর্ড, এলিনার অনুরূপ সুন্দরী মেয়ে পেলে তাকে প্রকাশ্যে বে-ইজ্জৎ করবে। কিন্তু এই তিন দিনে যোগ্য মেয়ে একটিও চোখে পড়ে নি। কখনো-সখনো দেখতে পেয়েছে যুবতী মেয়ে। কাছে ছুটে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে, আরে ছিঃ, এলিনার নখেরও যোগ্য নয়। ব্রিজম্যান, ব্রিগেডিয়ার জোন্‌স্ প্রত্যেকে নিষেধ করেছে তাকে, বলেছে, এ ইংরেজের যোগ্য আচরণ নয়। উত্তর পেয়েছে, ইংরেজের যোগ্য আচরণ অসহায় নারীকে ধর্ষিত হ'তে দেওয়া ?

ক্রসম্যান বলেছিল, এ কি খ্রীষ্টানের মতো কাজ ?

ক্রফোর্ড গর্জে উঠে বলেছিল, যারা খ্রীষ্টকে বাঁচাতে পারে নি তাদের মুখে এমন উপদেশ সাজে না।

জেনারেল উইলসন শুনলে কি বলবে ?

আমি তো জেনারেলের ফৌজের অন্তর্গত নই।

কিন্তু ভেবে ছাখো ক্রফোর্ড, তোমার প্রস্তাবিত আচরণ দেখলে কোম্পানির প্রজাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে ?

ব্রিজম্যান, এই প্রতিক্রিয়া হবে যে তারা আর কখনো ইংরেজ নারীকে ধর্ষণের কথা স্বপ্নেও ভাববে না।

এমন সময়ে অদূরে পথের মোড়ে দেখা যায় একটি মেয়েকে,—শিকারী ডালকুত্তার গতিতে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ক্রফোর্ড।

ওরা এখান থেকেই দেখতে পায়, হতাশ হয়ে তার হাত ছেড়ে দিয়েছে ক্রফোর্ড।

ব্রিজম্যান বলে, সাময়িকভাবে লোকটা insane হয়ে গিয়েছে, রুমালখানা না দিলে হ'ত।

লাহোর দরবাজা থেকে কুলি খাঁ জরুরী সংবাদ পাঠায় বখৎ খাঁর কাছে, সিপাহ্‌সালার, ভিতরে বাইরে থেকে আক্রমণ শুরু হয়েছে, আমার গোলন্দাজদের কতক মরেছে, কতক পালিয়েছে। আর বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবো না, মনে রেখো লাহোর দরবাজা অধিকার ক'রে নিলেই সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়বে। অতএব যা করবার শীঘ্র ক'রে ফেলো।

বখৎ খাঁ উত্তরে বলে পাঠায়, আজ সন্ধ্যা অবধি দরবাজা হাত-ছাড়া হ'তে দিয়ো না। এখনি চীফ এঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে লাল পর্দায় (বাদশাহী দরবার) চললাম, আশা করছি বাদশাকে সঙ্গে নিয়ে রাতেই লখনৌ রওনা হয়ে যেতে পারবো। আমার ফৌজ যমুনা পার হ'তে শুরু করেছে। আল্লা তোমাকে

রক্ষা করুন।

পত্র প'ড়ে কুলি খাঁ ভাবে, বখৎ খাঁর কথাই সত্য, আল্লা ছাড়া এখন আর অন্য ভরসা নেই। যেমন ক'রেই হোক সন্ধ্যা পর্যন্ত দরবাজা দখলে রাখতে হবে। তারপরে—তারপরে আর কিছু নেই; না না, শুধরে নিয়ে ভাবে, তারপরে আছেন আল্লা।

কিন্তু বেশি ভাববার সময় পায় না। বাইরে থেকে ভারি কামানের গোলা এসে পৌছতে শুরু করেছে বার্ন বুরুজের উপরে, অথচ সেখানকার কামানগুলো নীরব, গোলন্দাজরা পালিয়েছে। দক্ষিণে গার্স্টিন বুরুজের কামান এখনো চলছে, কিন্তু দূরপাল্লার কামান নয়, গোলা পৌঁচচ্ছে না কোম্পানীর ফৌজের উপরে। এখন একমাত্র ভরসা লাহোর দরবাজার উপরের কামানটা। এখানে কামান থাকবার কথা নয়, কিন্তু কুলি খাঁর ব্যবস্থাতেই বাদশাহের সবচেয়ে ভারি কামানটা বসানো হয়েছে এখানে, যার গোলা পৌঁছয় হিন্দুরাও কুঠি পর্যন্ত।

কুলি খাঁ স্নেহ-মিশ্রিত ভরসায় হাত বুলোয় কালু খাঁর গায়ে। কালু খাঁ কামানটার নাম। নিজের নাম কুলি খাঁ, কামানটার নাম কালু খাঁ। নাম-সাম্যে কামানটাকে বলতো মিতা। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কত কথাই না তার মনে পড়ছে।

কিছুক্ষণ কামানটার গায়ে হাতে বুলিয়ে পাশে বসে কামানটার গায়ে ঠেস দিয়ে। বন্ধু যেমন বন্ধুর গায়ে ঠেস দিয়ে বসে সেইভাবে। ওর বাবার নাম ছিল রেস্তম খাঁ, এই কামানটার গোলন্দাজ। সেরা গোলন্দাজ ছিল সেদিনের ফৌজে। অবশ্য ও মীর আতশ হয়েছে, সে সৌভাগ্য হয় নি রেস্তম খাঁর। তবে আজকার বাদশাহী ভাঙা হাটে মীর আতশদের কি আর এমন গৌরব।

তার মনে পড়ে রেস্তম খাঁর উক্তি—বা'জান, আমার মতো তুমিও হবে কালু খাঁর গোলন্দাজ, তোমার নাম কুলি খাঁ, এর নাম কালু খাঁ, দুই মিতা। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার বাপজান, কামান যেন কখনো হাতছাড়া না হয়, ওর চেয়ে বড় অপমান আর নেই। জান যায় সেও ভালো, তবু যেন কামান না গিয়ে পড়ে শত্রুর হাতে।

তারপরে বাঁ হাতে মস্ত একটা কাটা দাগ দেখিয়ে বলে, পাটপারগঞ্জের লড়াইয়ে জেনারেল লেকের ফৌজে আমি যোগ দিয়েছিলাম কালু খাঁকে নিয়ে, বাদশা শাহ আলমের হুকুমে। লড়াই যখন প্রায় ফতে হয়ে গিয়েছে সেই

সময়ে হঠাৎ কয়েকজন মারাঠী ঘোড়সওয়ার চড়াও হয় এসে আমাদের ব্যাটারির উপরে। তার মধ্যে সেরা কামান এই কালু খাঁ। সঙীনের খোঁচায় আমার হাতটা তামায় চিরে গেল—তবু ছাড়ি নি কামান। যাক জান, তবু নয় কামান। জানো বাবা, কালু খাঁ বাদশা আলমগীরের আমলের কামান, কত লড়াই ফতে ক'রেছে, কত পাহাড়ী গড় ভেঙে গুঁড়ো ক'রে দিয়েছে।

এই সব পুরানো দিনের কথা বলতে বলতে বাপ হাত বুলোত কালু খাঁর গায়ে, যেমন আজ ও বুলোচ্ছে হাত।

ও মনে মনে হাসে। যারা জানে না তারা মনে করে কিরীচ, বন্দুক, সড়কি, কামান এসব কেবল লোহার টুকরো। লোহার টুকরো দিয়ে কি লড়াই করা যায়—ওদের মধ্যে যে জান আছে, জান আছে বলেই জান নিতে পারে।

এমন সময়ে চিন্তার সুতো চট ক'রে ছিঁড়ে যায়। একদল কোম্পানীর ঘোড়সওয়ার চার্জ ক'রে সোজা ছুটে আসছে। গোলা আগে থেকেই ভরা ছিল, বাদশাহী খেলটা দেখিয়ে দাও তো।

কালু খাঁ মৃত্যু উদ্‌গীরণ করে, দেয়াল কেঁপে ওঠে। ধোঁয়া কেটে গেলে দেখা যায় ঘোরসওয়ারের একটাও আস্ত নেই, সমস্ত ছিন্নভিন্ন মাংসপিণ্ড।

ব'সে পড়ে ভাবে, না পালাবেই বা কেন, কালু খাঁ তো ওদের মিতা নয়, ওরা তো জান কবুল করে নি বাপের কাছে। এখানে আর থাকা মানে খাড়া দাঁড়িয়ে মরা। বাইরে থেকে ঘোড়সওয়ারের আক্রমণকে ও ভয় করে না, কালু খাঁ একাই তাদের শায়েস্তা করতে পারে। কিন্তু গোল বাধিয়েছে শহরের ভিতর থেকে আক্রমণে, কালু খাঁকে তো ঘোরানো যাবে না।

ও দেখতে পায় বার্ন বুরুজ, গার্স্টিন বুরুজ দুটোই দখল ক'রে নিয়েছে কোম্পানীর ফৌজে, তার উপরে বড়বাজারে ব্যাটারি তৈরি করাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিন দিক থেকে ওকে ঘিরে ধরেছে, এখন একটি মাত্র দিক খোলা, সেইদিক দিয়েই ওকে সগৌরবে নিষ্ক্রান্ত হ'তে হবে। কর্তব্য ওর স্থির করাই ছিল, এবারে কর্তব্যসাধন।

একক চেষ্টায় কামানে বারুদ ঠাসলো, মস্ত গোলাটাকে কোন রকমে ঠেলে তুলে ভিতরে পুরলো, তারপরে পলতে তৈরি ক'রে রেখে জলে হাত-পা ধুয়ে নবাজের গাজচেখানা পেতে নমাজ পড়তে বসলো। তখন সম্মুখে রোশেনারা বাগানের গাছগুলোর আড়ালে সূর্য ডুবছে।

নমাজ শেষ হয়ে গেলে একবার পূর্ব দিকে ফিরে তাকালো জামি মসজিদের দিকে। বলল, আল্লা হাফিজ। তারপরে তাকালো লালকেল্লার দিকে। কার উদ্দেশ্যে না-জানি স্থালুট করলো। বলল, সিপাহ্‌সালার, কুলি খাঁ জীবিত থাকতে কামান হাত-ছাড়া হবে না। তারপর কামানটার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে কয়েকবার তার গায়ে হাত বুলোল, মিতা, এবারে মিতার কাজ করো।

তারপরে পলতেয় আগুন ধরিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে নিজেকে বেঁধে ফেলল, কামানের মুখে।

কালু খাঁ গর্জন ক'রে উঠল। কুলি খাঁ জীবিত থাকতে কামান হাতছাড়া করে নি।

॥ ১০ ॥

"I hate my beauty in the glass ;
My beauty is not I ,
I wear it ; None cares whether, alas
It's wearer live or die."

—Hardy

রুমালী ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকলো। শেষ পর্যন্ত মান না খুইয়ে ঘরে ফিরতে পারবে এমন আশা ছিল না। প্রাণটাও যেতে পারতো। তার সামনেই তো দু'দুটো লোক মারা পড়লো। তাছাড়া আজকের দিনে দিল্লি শহরে প্রাণের মূল্য কি আছে ? হতাহত চলার পথকে বিঘ্নিত ক'রে তুলেছে। তবু তো সহজে কেউ ছাড়তে চায় না প্রাণের মায়া। সে-ও ছাড়তে পারে নি, কোন রকমে ঘরে এসে পৌঁচেছে।

চারপাইয়ের উপরে বসে পড়ে রুমালী। দুই হাতে বুক চেপে ধরে, বেশ অনুভব করতে পারে হৃদ্‌পিণ্ডটা আছাড় খাচ্ছে। হৃৎপিণ্ড বেচারীর দোষ নেই, আজ ক'দিন ধরে যে ধকল চলছে তার উপরে, ওদিকে আবার নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, না দিনে না রাতে। বুঝতে পারে না কেন সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল, কেনই বা সে শহর ছেড়ে দূরে যায় নি।

ঘণ্টেওয়ালা বলেছিল, বহিন, এখানে থেকে আর কি করবে, চলো দু'জনে মথুরায় চলে গিয়ে কিছুদিন ছিপ্‌কে থাকি, গদর মিটে গেলে আবার ফিরে আসলেই হবে।

রুমালী বলেছিল, দাদা গদর সর্বত্র, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, প্রয়াগ কোথায় নয়? তার চেয়ে চেনা জায়গাতে থাকাই ভালো।

ঘণ্টেওয়ালা বুড়ো সহজেই রাজী হ'ল, দোকানপাট ছেড়ে কোথায় যাবে, কেবল তার যোগানদার মখ্‌খনলালের কথায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তাই বলল, সেই ভালো দিদি, আজ হিন্দুস্থান জুড়ে কংসের রাজগী।

রুমালী নিজের কাছে স্বীকার করুক নাই করুক, আসল কথা শাহ্‌জাহানাবাদ মানে জীবনলালকে ছেড়ে যেতে সে রাজী নয়। এখানেই তো ঢুকবে, একবারও দেখা মিলবে না এমন হ'তে পারে না। কল্পনায় নানারকম ছবি আঁকে। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে তাকে হয়তো বাঁচাতে পারবে কিম্বা পথে আহত পড়ে থাকতে দেখলে ঘরে নিয়ে এসে সেবা ক'রে সারিয়ে তুলবে—তখন নিশ্চয়ই আবার তার মন অনুকূল হবে রুমালীর প্রতি। নারী স্বভাব-দুর্বল বলেই কখনো চূড়ান্ত বিশ্বাস করতে পারে না যে, প্রণয়ীর আর সদয় হওয়ার আশা নেই। অসহায় যাত্রী ডুবন্ত নৌকার দখল ছাড়তে চায় না।

কোম্পানীর ফৌজ শহরে ঢুকবার পর থেকেই সে লক্ষ্য রেখেছিল জীবনলালকে দেখতে পাওয়া যায় কিনা। লড়াইটা যে শহরের উত্তর দিকে হচ্ছে, যে দিকটায় নাকি তার বাস, এটাকে সে মস্ত সৌভাগ্য মনে করেছিল। কাছাকাছি নিশ্চয় আছে কোথাও জীবনলাল। আজ তিন দিন, কর গুনে হিসাব ক'রে দেখে, হাঁ তিন দিনই বটে—১৪ই, ১৫ই, ১৬ই—তার না ছিল বিশ্রাম, না ছিল আহার, না ছিল নিদ্রা। জঙ্গী ফৌজের সান্নিধ্য যে নানা কারণে বিপজ্জনক—এ সন্দেহকে আমল দেয় নি সে। দেশী ফৌজ দেখলেই কাছাকাছি ঘেঁষেছে, আহত দেখলেই উঁকি মেরে দেখেছে, নিহত দেখলেই উল্টেপাল্টে দেখেছে। কোথায় জীবনলাল?

জীবনলাল তো এখন সেরা দুশমন, তবে আবার কেন? মনের মধ্যে কি কোথাও কাঁচা আছে, আশা আছে? দূর দূর দূর, বলে এক ঝটকায় প্রশ্নটাকে উড়িয়ে দিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় সন্ধান শুরু ক'রে দেয়। ১৪ই, ১৫ই তার কোন বিপদ ঘটে নি। ঘটা উচিত ছিল। হামেশা গুলী-গোলা চলেছে, পদাতিক সঙীন চার্জ করেছে, কেমন ক'রে অক্ষত থাকলো সে, ভাবলে বিস্মিত বোধ করতো, কিন্তু ভাববার সময় তার কোথায়?

চাঁদনীচকের উপরে সোনা মসজিদের কাছে একটি গলিতে ঢুকতে যাবে, পথ সংক্ষেপ করবে ছিল উদ্দেশ্য, এমন সময়ে তাকে দেখতে পেয়ে এক

সাহেব ছুটে এলো, শিকারী কুকুরের মতো তার চোখ দুটো,—Here's a fine specimen, একে দিয়েই কাজ চলবে।

সাহেব ছুটে এসে তাকে পাকড়াবার আগেই সে এক ছুটে গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো, সাহেবও ঢুকলো। কিন্তু পারবে কেন? সব গলিঘুঁজি তার মুখস্থ। এগলি, ওগলি, এবাড়ি ওবাড়ি, সব বাড়িই এখন খালি। পাড়া ডিঙিয়ে নিকা কাটরা হয়ে এসে পড়লো বেগম বাগের মধ্যে। তাকিয়ে দেখে, না, কোথাও সাহেবটার চিহ্ন নেই। তখন সে একটা আঙুরলতার ছায়ায় বসলো, খুব হাঁপিয়ে পড়েছিল। এখন মনে পড়তে থাকে তার সেই সব ভয়াবহ স্মৃতি।

কিন্তু আজ বুঝি বিপদ ব্যূহ সাজিয়ে তাকে আক্রমণ করবে। একটু জিরোতে না জিরোতেই সম্মুখে দেখতে পায় এক জঙ্গী সাহেব, আগেরটার ছিল বেসামরিক পোশাক।

সেই সৈনিকটি তার কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপরে লুব্ধ নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, Beauty, আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চলো।

কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না, মানুষে এত নির্লজ্জও হ'তে পারে! এরা যে শাহ্‌জাদাদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছে। এরা আবার লড়াই করবে!

এসো, বলে দুটি হাত বাড়িয়ে দেয় লোকটা।

এমন সময়ে পিছন থেকে আর একটি বিজাতীয় কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, This is not fair Bob, I am following her for a pretty long time!

সম্মুখের লোকটা বলে, But I am in possession of her. Don't you know that possession is the essence of right.

Right! Absolutely wrong, you cad!

Indeed!

ভটস্থের মতো চেয়ে দেখে রুমালী। দুজনে দুই পিস্তল বের ক'রে বসেছে এবং পরমুহূর্তে দেখে দুজনে আহত হয়ে পড়ে গিয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আরও বেশি বিপদে জড়িয়ে পড়বার আগেই সে ছুটে পালিয়ে চলে আসে বাড়িতে। এখন এই সব বিপদের স্মৃতিতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঘটনার চেয়ে ঘটনার স্মৃতি বেশি ভয়াবহ।

এতক্ষণে সে অনেকটা সুস্থ হয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে বাতি জ্বালায়। বাতি

জালতেই কাচের শার্সিটার উপরে পড়ে ছায়া। ছায়াটার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। কে এই আশ্চর্য সুন্দর মেয়েটা ?

রূপকে ধুয়ে মুছে সাজিয়ে গুছিয়ে সযত্নে রক্ষা করতে হয়, সৌন্দর্য আপন স্বভাবে নিত্যনবীন। রূপ কাগজের ফুল, একটুখানি হাওয়া, একটুখানি ধুলো লাগলে মলিন হয়। আর সৌন্দর্য সরোবরের শতদল, ধুলো যার উপরে পত্রলেখা আঁকে, ঝোড়ো বাতাস তার দলগুলি আরো বেশি উন্মীলিত ক'রে দিয়ে অবারিত ক'রে দেয় রহস্যময় মধু-কোষ। রূপ মানবীয়, সৌন্দর্য দৈব।

রুমালী দেখলো ঐ শার্সির কাচের উপরে সদ্যদোহিত দুধের উপরে ননীর মতো সৌন্দর্য ভাসছে। এ কি সে ? না, তার উপরে ভর করেছে পুরাণে শোনা কোন সুন্দরী মায়াবিনী ? রুমালী জানতো সুন্দর সে। আয়নায় দেখেছে, বিমুগ্ধ পুরুষের চোখে দেখেছে, বিহ্বল পুরুষের কাকুতিতে শুনেছে, কিন্তু আয়নায় ভাসমান সৌন্দর্য যে সমস্ত প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে ! এ কেমন করে সম্ভব হ'ল। অনাহার, অনিদ্রা, অবিশ্রাম আর অশেষ উদ্বেগ যেন ডুবুরীর মতো ডুব দিয়ে অতল থেকে তুলেছে, এনেছে এই মূর্তি। সমুদ্র মন্থনে সব রহস্য উদ্ধার হয় নি, এটি এতকাল অপেক্ষা ক'রে বসেছিল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রুমালী। হঠাৎ তার মনে হয় এই সৌন্দর্য তো গৌরব নয়, প্রকাণ্ড এক অভিশাপ। এই যে এই কিছুক্ষণ আগে দুটো লোক খুনোখুনি ক'রে মরা গেল—সে তো তার জন্যে নয়, তার উপরকার ভাসমান ঐ লাবণ্যটুকুর জন্যে। শাহ্‌জাদাদের আসরে ডাক পড়েছে সে-ও ওরই জন্যে। সে-ও ঐটুকুর জন্যে। মানুষটার প্রতি কারো দৃষ্টি নেই, সে মরলো কি বাঁচলো তাতে কার কি আসে যায়। এতদিন তো এই খেলাই সে খেলে এসেছে, আজ এই খেলাকে কালনাগিনীর সঙ্গে খেলা বলে বুঝতে পারলো। ঐ যে সে মোহিনী ফণা বিস্তার ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছে তাকে। পলকের মধ্যে তার বিমুগ্ধ ভাব বিমূঢ়তার মধ্যে দিয়ে ভীতিতে গিয়ে পৌছল। কি করছে ভালো ক'রে বুঝবার আগেই পাথরের ফুলদানিটা ছুঁড়ে মারলো আয়নার উপরে। তরল আর্তনাদ ক'রে শতখণ্ডে ভেঙে পড়লো স্ফটিক দর্পণ।

কিন্তু এ কি, আর্তনাদ থামে না কেন ? কাচের শব্দ মানব-ভাষায় রূপান্তরিত হ'ল কি ক'রে ?

দিদি, দিদি, আমি গেলাম।

কে ডাকে ?

দিদি, রুমালী দিদি, আমাকে মেরে ফেলেছে।

এ যে পল্টনের গলা ! কোথায় সে ?

মুহূর্তকাল পরে পল্টনকে পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে প্রবেশ করে বুড়া ঘন্টেওয়ালা।

দাদা, এ কি ?

ঘন্টেওয়ালা মুখ খুলবার আগেই পল্টন বলে ওঠে, দিদি, ওরা আমাকে খুন করেছে।

কারা ? সত্যি তো কাপড়চোপড় রক্তে ভেসে গিয়েছে।

ততক্ষণে তাকে শুইয়ে দিয়েছে বিছানায়। বুড়ো হাঁফিয়ে পড়েছিল।

কি ক'রে এমন সর্বনাশ হ'ল দাদা ?

ঘন্টেওয়ালার গলা বোধহয় অশ্রুতে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, স্বর খুঁজে যাওয়ার আগেই পল্টন বলে, ওরা চাচাজীর উপরে চড়াও হয়েছিল। বলে, তোমার অনেক টাকা। শীগ্‌গির বের করো।

তুই কথা বলিস নে পল্টন, আমি ভাইয়ের মুখে শুনি।

আমার মুখে শোনো দিদি, আমার মুখে শোনো। এরপরে আর আমার মুখে শুনতে পাবে না, তখন দুঃখ হবে।

আচ্ছা, কি হয়েছিল সে কথা না হয় পরে শুনবো, এখন হাকিম ডাকি।

তার চেয়ে দিদি তুমি কাছে বসো, আমাকে আর বেশিক্ষণ রাখতে পারবে না।

গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, না রে, এমন কিছু তোর হয় নি, এক্ষুনি সেরে যাবে।

কি যে বলছ দিদি, ছোরা ঢুকে গিয়েছিল বুকের মধ্যে। অনেকক্ষণ মরে যেতাম, কেবল তোমাকে দেখবার জন্যেই বেঁচে আছি।

দেখ্, পল্টন, তুই যদি চুপ না করিস, আমি চলে যাবো অন্য ঘরে।

ভয় পেয়ে পল্টন তার আঁচল ধরে।

বলো তো দাদা, কি হয়েছিল ?

বহিন, নূতন ক'রে আর কি বলবো, এ যে লড়াই চলছে। দুই বেটা সিপাহী এসে আমার ঘরে চড়াও হ'ল, বলল টাকা বের করো।

কোন্ পক্ষের সিপাহী, কোম্পানীর না বাদশাহের ? মুখ খুলিস নে পল্টন,

তা হ'লেই চলে যাবো অন্ত ঘরে।

কেমন ক'রে বলবো দিদি, কোন পক্ষের কারো লোভ তো কম নয়। তখন আমি বললাম, ভাইসাহেব, আমি লাচার বুঢ্ঢা, আমার কিচ্ছু নেই। ওরা তার উত্তরে বের করলো ছোরা, বলল, শীগ্গির দাও নইলে দেখছ তো। এমন সময়ে কোথা থেকে এসে উপস্থিত পল্টন। সব ব্যাপার বুঝে নিয়ে চড়াও হ'ল তাদের উপরে।

ঐ অতটুকু ছেলেকে মারতে হাত উঠল ওদের ?

না বহিন, ওরা সিপাহী হ'লেও মানুষ, বোধহয় ওদের কারো ঘরে পল্টনের বয়সের লেড়কা আছে। তাই একজন ব'লে উঠল, আহা ঐ বাচ্চাটাকে মেরো না।

রুমালী শুধোয়, তাহ'লে ?

আমি তখন বলে উঠলাম, আমি বাচ্চা ! তোমার মতো অনেক ছেলের জন্ম দিয়েছি। বিশ্বাস না হয় শুধিয়ে দেখো তোমার জরুকে।

এই কথা বললি ?

ওরা কেন আমাকে বাচ্চা বলল ?

তাই ব'লে এমন খারাপ কথা বলবি ?

খারাপ কথা কেন বলছ দিদি, এমন কত কথা তো আমরা হামেশা বলে থাকি।

কিছু বলবার কি দরকার ছিল ?

নইলে যে চাচাজীকে মেরে ফেলতো। ভাবলাম ওরা আমার উপরে চড়াও হ'লে সেই সুযোগে চাচাজী পালাতে পারবে।

এবারে বুড়ো ঘণ্টেওয়ালা ডুকরে কেঁদে ওঠে। ওরে পল্টন, আমার মতো বুড়োকে বাঁচাতে গিয়ে কচি প্রাণটা দিলি, আমি আর ক'দিন বাঁচতাম।

পল্টন স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছে শুনে রুমালীর ধারণা হয়েছিল এমন মারাত্মক কিছু নয়। কিন্তু এবার ওকে নিস্তেজ হয়ে পড়তে দেখে আলো নিয়ে এসে ক্ষতস্থান দেখে চমকে ওঠে। যেমন গভীর, তেমনি চওড়া, রক্ত নিঃসরণের আর বিরাম নেই।

পল্টন লক্ষ্য করে রুমালীর চোখ। বোঝে যে ক্ষতের ভয়াবহতা সে বুঝতে পেরেছে। তখন বলে, দেখলে তো দিদি ?

এই বলে হাসে। সে হাসি মৃত্যুর খাস পরওয়ানা।

ক্রমে আরও বেশি নিস্তেজ হয়ে পড়ে, বলে, দিদি, আমার মাথাটা কোলে

তুলে নাও, তার আগে একটু জল দাও।

জলের ঘটি আগিয়ে দেয় ঘন্টেওয়ালা।

জলপান ক'রে বলে, দিদি আমার একটা কথা রেখো, এ শয়তানের শহর ত্যাগ ক'রে চলে যেয়ো। না না, দিদি, এখানে আর কিছুতেই থেকো না।

রুমালী কথা বলতে পারে না, পল্টনের মাথায় গায়ে হাত বুলোয়, ঘন্টেওয়ালা কাঁদে আর কপাল চাপড়ায়, আর ধীরে ধীরে ভাটা পড়ে আসে পল্টনের জীবনীশক্তিতে। অবশেষে এক সময়ে এক ফালি মলিন হাসি ওষ্ঠাধরে রেখে শেষ হয়ে যায় সব।

নিগমবোধ ঘাটে যখন পল্টনের অন্ত্যেষ্টি শেষ হ'ল, তখনো কিছুটা রাত বাকী। ঘন্টেওয়ালা বলল, বহিন, এবার ঘরে ফিরে চলো।

রুমালী বলল, দাদা, তুমি যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

রুমালী যে কেন গেল না, কেন একাকী বসে থাকলো নিজেও জানে না। নির্জন, নিস্তব্ধ, নিকষকৃষ্ণ রাতের দিকে তাকিয়ে সে বসে রইলো। এমন ভাবে কখনো রাতের দিকে তাকিয়ে দেখে নি সে, যদিচ রাত্রিজাগরণই তার ব্যবসায়।

আকাশের অসংখ্য তারা, বাতাসে জোনাকীর জ্বলা-নেভা, নদীস্রোতে দ্রুত অপস্রিয়মাণ নৌকার বাতি, ঘন কালো জলতলে এই সব আলোর প্রতিফলন তার চোখের তারায় ছবি আঁকছিল, কিন্তু বোধ করি তার অর্থ পৌঁচচ্ছিল না ওর মনের মধ্যে। নদীর ছলছল কলকল, দাঁড় ফেলার ছপাছপ, নৈশ বিহঙ্গের পাখা ঝটপট—কত রকম শব্দ পৌঁচচ্ছিল তার কর্ণপটাহে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তাদের কোন অর্থ নেই ওর কাছে। ওর ইন্দ্রিয়গ্রাম আর বুদ্ধি আজ ভিন্নপথগামী। তাই সমস্ত চরাচর ওর কাছে আজ এলোমেলো, অর্থহীন। পথ খুঁজে পাচ্ছে না ওর মন এই অরাজকতার রাজ্যে। যমুনার তীরে অসংখ্য মাটির ঢিবির মতো আর একটি ঢিবি বনে সে বসে রইলো। ওর মন আজ ডুবুরীর মতো নেমে গিয়েছে অতলে, হাতড়ে মরছে জলতলে, কিছুই ধরা পড়ছে না হাতে।

একটা কিছু সে ধরতে চায়, এমন নৈরাজ্যের মধ্যে একটা কিছু না ধরতে পারলে যে ভেসে যেতে হয়। কি ধরবে সে জানে না, আদৌ যে কিছু ধরবার প্রয়োজন আছে তা জানলো পল্টনের দেহটা ভস্মীভূত হয়ে গেলে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলো ঐ বালক বয়সে তার চেয়ে ছোট হ'লেও তার যথার্থ আশ্রয় ছিল। আজ সেই একমাত্র আশ্রয়টাও গেল। যতক্ষণ দেহটা পড়েছিল ভরসা ছিল ঐ তো আছে। তারপরে সমস্ত ভস্মময় হয়ে গেলে তার মন একেবারে ভেঙে পড়লো, অপার সমুদ্রের সহায় কাষ্ঠখণ্ডটিও অন্তর্হিত হল।

তখন তার মনে হ'ল এই জন্তেই বুঝি লোকে ভগবানের শরণ নেয়। প্রতিদিন কত লোককে মন্দিরে যেতে দেখেছে, মসজিদে নমাজ পড়তে দেখেছে, গীর্জায় প্রার্থনা করতে দেখেছে—সে কোথাও যায় নি, কোথাও যেতে কেউ তাকে নির্দেশ দেয় নি। তার ধর্ম ছিল ইন্দ্রিয়াসক্তি, তার মন্দির ছিল রঙমহল, তার দেবতা ছিল আত্মসুখ চরিতার্থতা। বাল্যকাল থেকে উপদেশে ও দৃষ্টান্তে এই শিক্ষাই পেয়েছে, কেউ নিষেধ করে নি, কেউ অন্য পথ দেখায় নি, ভেবেছিল এইভাবেই চলবে।

আজ বুঝলো চলবে না, চলে না। ঐ চিতানল নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার তুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল। আজ তার ভিতরে বাইরে অন্ধকার অসহায় ভাসমান জীব আজ আলো চায়, আশ্রয় চায়, কিছু একটা সবলে পেয়ে ধরতে চায়।

আল্লা, হরি, যীশু, কে তার দেবতা জানে না, কাকে ডাকবে জানে না, কীভাবে ডাকবে জানে না। শুধু জানে যে বড় আবশ্যক কাউকে। মনে মনে ভাবছিল, আল্লা, হরি, যীশু। অসহায় দরিদ্র যেমন অন্ধভাবে এখানে ওখানে হাত পেতে বেড়ায়, তেমনি ভাবে নাম থেকে নামান্তরে তার মন ঘুরে মরতে লাগলো। কোথায় আছ, কে আছ, আমাকে আশ্রয় দাও, রক্ষা করো, আমি যে আর পারি নে।

কখন মনের ভাবনা অগোচরে ওষ্ঠাধরে উচ্চারিত হ'ল, আল্লা, হরি, যীশু। বড় বিসদৃশ লাগলো কানে, তখনি ছুটে গেল মনের তন্ময় অবস্থা। তাকিয়ে দেখল ওপারে অন্ধকারের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে, ভোর হ'তে আর দেরি নেই। এতক্ষণের চিন্তাকে সবলে দু'হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপরে দ্রুত বাড়ি ফিরে এসে সমস্ত জিনিসপত্র উঠানে জড়ো ক'রে আগুন লাগিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেল। মনের মধ্যে জাগছে তার পণ্টনের অন্তিম মিনতি,—এ শয়তানের শহর ছেড়ে এখনি চলে যাও দিদি, এখানে আর থেকো না।

॥ ১১ ॥

"Never to have lived is best,
ancient writers say ,
Never to have drawn the breath
of life,
Never to have looked into the
eye of day ;
The second bests a gay goodnight
and quickly turn away."

Sophocles—Yeats

অনেকদিন পরে আজ খুরশিদ জানের আসর বসেছে। আসর বসেছে তবে তেমন জমছে না। আগের সে জলুস, আমোদ-আহ্লাদ নেই, সমস্ত কেমন থমথমে। এমন না হওয়া অস্বাভাবিক। ক'মাস ধরে শহরে যে কাণ্ড চলছে তারই উপসংহাররূপে এসেছে দিল্লি আক্রমণ, তারও আজ ক'দিন হয়ে গেল। গোলাগুলীর আওয়াজ, সৈন্যদলের মার্চ, আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই, শহরটা এখন মস্ত একটা সামরিক শিবির। নিকা কাটরা ও গলি সরবাহুর বাঈজী মহল্লা শহরের উত্তর দিকে হওয়ায় একেবারে তোপের মুখে। বাঈজীদের অন্যত্র আশ্রয় নেই যে শহর ছেড়ে যাবে। তবু যারা পেরেছে শহরের দক্ষিণে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। খুরশিদের জান যায় নি, বলে, ঘরের চেয়ে বাইরে কি বিপদ কম? মরতে হয় এখানেই মরবে। যে-কারণের হোক, বাঈজী মহল্লার উপরে আক্রমণ হয় নি। আর বাঈজী মহল্লাও আলো নিভিয়ে, গান থামিয়ে, প্রাণের উচ্ছ্বাস বন্ধ ক'রে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। যে-সব রঙ্গিস লোক এখানে আসতো তারা গা-ঢাকা দিয়েছে, কেউ বড় আসে না। আসবার মধ্যে সরাব মিঞা, সুরযপ্রসাদ, নয়নচাঁদ, মহম্মদ আলি—তাদেরও সব সময়ে দেখা পাওয়া যায় না।

আজ অনেকদিন পরে এসেছে সুরযপ্রসাদ আর মহম্মদ আলি। আগে সুরযপ্রসাদ, তারপরে মহম্মদ আলি।

খুরশিদ শুধালো, সুরযভাই, নয়নচাঁদের খবর কি?

কেন, বেখবর নাকি?

তাই তো মনে হচ্ছে।

কেন?

তার বাড়ি থেকে দুদিন এসে খোঁজ ক'রে গিয়েছে, আজ সকালেও এসেছিল।

কি বলে?

নয়ন আজ তিন দিন বাড়ি যায় নি, এখানে আসতে পারে ভেবে খোঁজ করতে এসেছিল।

আবার কি হুজ্জৎ বাঁধালো নয়ন!

তখনি তার মনে পড়ে যে সে-ও তো বাড়ি থেকে পালিয়ে নানা জায়গায় গা-ঢাকা দিয়ে কাটাচ্ছে। নয়নও হয়তো তেমনি ক'রে থাকবে। সেই কথা বলে।

খুরশিদ বলে, তোমার বাড়িতে কেউ নেই, তোমার এখন সব জায়গাই সমান। নয়নের বাড়িতে লোকজন আছে, খবর না দিলে ভাববে বইকি।

তারপরে শুধোয়, তোমার সঙ্গে তার শেষ দেখা কখন হয়েছিল?

সে তো আজ তিন দিন হয়ে গেল, কাশ্মীর দরবাজায়, আমাদের সঙ্গে সরাব মিঞাও ছিল।

তারপরে?

নয়নের গুলীতে মরলো স্বরূপরাম।

চমকে ওঠে খুরশিদ।

কেন, সে মরতে যাবে কেন?

বারুদের থলে নিয়ে দরবাজা উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে এগোচ্ছিল, এমন সময়ে চলল নয়নের বন্দুক।

জেনেশুনে মারলো ওকে!

না, না-জেনে মেরেছিল, মারবার পরে জানতে পারলো।

তারপরে একটু ভেবে বলে, তবে বোধ করি জানতে পারলেও মারতো। জানো তো ওর উপরে নয়নের মনোভাব।

আহা, বড় সরল ছিল লোকটা।

খুরশিদের খেদোক্তির জবাব না দিয়ে স্বরূপ বলে, তারপরে ও কোথায় গেল আর কিছু জানি নে।

এমন সময়ে ঘরে ঢুকলো মহম্মদ আলি, কাজেই নয়নের প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল।

আসুন আলি সাহেব, বলল খুরশিদ।

কোনরূপ শিষ্টাচারের ভূমিকা না ক'রে মহম্মদ আলি বলল, বিদায় নিতে এলাম বিবিসাহেবা।

বিদায়! বিস্মিত হয় খুরশিদ। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, যে দিনকাল পড়েছে বিদায় নিয়ে রাখাই ভালো, কার ভাগ্যে কখন কি লেখা আছে কে বলতে পারে।

তা তো আছেই। তবে সে-বিদায়ের কথা বলছি না, দিল্লি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

একা তুমি?

না, আমি যাচ্ছি, বখৎ খাঁ যাচ্ছে, বখৎ খাঁর ফৌজ যাচ্ছে।

তোমরা সবাই যাচ্ছ, তবে লড়াই করবে কারা?

লড়াই কি আর হচ্ছে? দিল্লির লড়াই শেষ হয়ে গিয়েছে।

এমন সংবাদের জন্য প্রস্তুত ছিল না খুরশিদ, ভীত কণ্ঠে শুধালো, কোথায় চললে তোমরা?

লখনৌ।

এবারে সুরযপ্রসাদ বলে, শুনেছিলাম তোমাদের সঙ্গে বাদশাও যাচ্ছেন।

যাবেন আশা ক'রেই তো তাঁর কাছে দরবার করতে গিয়েছিলাম, সোজা আসছি শাহী দরবার থেকে।

সুরয বলে, তাহলে তিনিও যাচ্ছেন?

ব্যাকুলভাবে খুরশিদ বলে ওঠে, বাদশাহও যাবেন?

আর কিছু বলতে পারে না, বাদশা-হীন দিল্লি তার কল্পনাতীত, যেন বাদশা গেলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকলো না।

খুরশিদের ব্যাকুলতা এড়ায় না মহম্মদ আলির চোখ। সে বলে, না খুরশিদ জান, তোমার ব্যাকুলতা অমূলক, বাদশা যাচ্ছেন না।

খুরশিদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু বাদশার না যাওয়ার গুরুত্ব, বাদশার দিল্লিতে থাকবার সঙ্কট বুঝতে পারে সুরযপ্রসাদ। বলে, গেলে কি ভালো হ'ত না?

বোঝে কে?

বাদশা এত বোঝেন আর এটুকু বোঝেন না?

বাদশা বোঝেন তো বেগম বোঝেন না। আর সবচেয়ে কম বোঝে হাসান আকসারি নামে ঐ বুজরুকটা। বেটা বলে কি জানো, আপনারা

মিছে ভয় পাচ্ছেন, বাদশার কোন ভয়ের কারণ নেই। বাদশা একটু জলপড়া ছিটিয়ে দেবেন যমুনায়, অমনি দরিয়ায় বান ডেকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কোম্পানীর ফৌজ, একবার কুত্তাগুলা আসুক না লালকেল্লার দরজায়। আবার কখনো বা বলে, বাদশা মচ্ছর হয়ে উড়ে চলে যাবেন।

কি সর্বনাশ! এসব কথা বিশ্বাস করেন বাদশা!

না, বাদশা নির্বোধ নন।

খুরশিদ বলে, হ'তেও তো পারে বাদশা জিন্দাপীর?

সুরয বলে, নির্বোধ আর কাকে বলে!

তারপরে শুধোয়, তোমরা কি বললে?

যা বলবার বখৎ খাঁ বলল, আমি সঙ্গে ছিলাম মাত্র।

তা সিপাহ্সালার কি বলল?

বলল, দিল্লির লড়াই শেষ হয়ে গিয়েছে, ফৌজ কতক মরেছে, কতক পালিয়েছে, কুলি খাঁ শহিদ হয়েছে—এখানে আর লড়াই চালানো সম্ভব নয়। বলল, জাঁহাপনা, আমাদের সঙ্গে লখনৌ চলুন। সেখানে এখনো জোর লড়াই চলছে। নানা জায়গা থেকে আশি হাজার সিপাহী সেখানে জমায়েত হয়েছে। এখন যদি সেখানে বাদশাহী ঝাণ্ডা ওড়ে তবে কোম্পানীকে হার মানতেই হবে। বাদশা বললেন, দিল্লি হচ্ছে রাজধানী, রাজধানী ছেড়ে গেলে লোকে মনে করবে হার হয়েছে। বখৎ খাঁ বলল, যেখানে বাদশা সেখানে রাজধানী। বলল, আলমগীর বাদশা কুড়ি বচ্ছর দিল্লি ছাড়া ছিলেন, তাতে কি তাঁর হার হয়েছিল? তারপরে সঙ্কোচের সঙ্গে জানালো, এখানে বসে থেকে বন্দী হ'লে বাদশাহও যাবেন, বাদশাহীও যাবে, রাজশ্রীও যাবে, রাজধানীও যাবে। বাদশা বললেন, তোমার ফৌজ আছে কি জন্যে? বখৎ খাঁ বলল, আমার ফৌজ আছে লড়াই করবার জন্যে। যেখানে লড়াই হবে সেখানে যাবে আমার ফৌজ। এখানে লড়াই আর কোথায়? দিল্লির লড়াই শেষ হয়ে গিয়েছে।

মহম্মদ আলি বলে যায়, তখন ঐ বুজরুকটা কি বলে জানো? বলে, সিপাহ্সালারের লড়াই শেষ হ'তে পারে, এবারে শুরু হবে পীরের লড়াই। বাদশা এক মুঠো ধুলো-পড়া ছুঁড়ে মারবেন অমনি আঁধি উঠে বেবাক কোম্পানীর ফৌজ অন্ধা হয়ে যাবে। তখন জলপড়ার গুণে দরিয়ায় বান ডেকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সেই বেইমান ফৌজগুলোকে। কিসের ভয় দেখাচ্ছেন সিপাহ্সালার?

সুরযপ্রসাদ বলে, আকন্দারির কথা শুনে মনে হচ্ছে বাদশাকে এখানে রাখবার প্রতিশ্রুতিতে বেটা ঘুষ খেয়েছে।

বিচিত্র নয়, বুজরুকের অনেক গুণ।

তবে তুমি সত্যিই চললে আলি খাঁ, বলে ওঠে সরাব মিঞা।

সে কখন যে প্রবেশ করেছে, নীরবে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখেছে হাতের বন্দুকটা, এতক্ষণ কেউ লক্ষ্য করে নি। এবারে সকলে তাকায় তার দিকে, দেখে কামান বন্দুকের কালিঝুলিতে তার আগাগোড়া আচ্ছন্ন।

স্নেহের সঙ্গে খুরশিদ বলে, সরাব ভাই, তোমার জামা পিরান যে সব কালিতে কালিময়।

কামান বন্দুক থেকে তো আতর-গোলাপজল ছিটোয় না!

তুমি কি লড়াই করছিলে নাকি?

তবে কি মাইফেল করছিলাম! চুপ করো কসবি।

তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে সরাব ভাই।

না আলিসাহেব, আমার যা কাজ তা এই দিল্লিতেই।

এবারে মহম্মদ আলি বলে, আর সুরযপ্রসাদকে বলা তো ফালতু, তার অশশি হাজার আকবরী মোহর ছেড়ে সে কোথাও নড়বে না।

তার ব্যবস্থা একরকম করেছি সাহেব, বেটারা এখনো খুঁজে মরছে ইঁদারার মধ্যে।

সে কি রকম? সকলে একসঙ্গে শুধোয়।

তখন সবিস্তারে সেদিনের ইতিবৃত্ত বলে সুরযপ্রসাদ। সকলে হাসতে থাকে।

তোমার মাথায় এত মতলবও আসে!—বলে মহম্মদ আলি।

আরও শুনবে?

আবার কি করলে?

পরশু রোজ একবার মোরি দরবাজার দিকে গিয়েছিলাম, দেখি ব্যাপার কতদূর কি গড়ালো। তা কুচা মহাত্তের অবধি গিয়েছি, দেখি যে সব শাহী সিপাহী পালাচ্ছে। শুধালাম, খাঁ সাহেবরা সব পালাচ্ছ কেন? একজন সিপাহী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আংরেজ লোক তাড়া ক'রে আসছে। তা গুলী চালাও, পালাচ্ছ কেন? গুলী-বারুদ বেবাক ফুরিয়ে গিয়েছে। তবে তো মুশকিল দেখছি, বললাম আমি। এমন সময় চোখে পড়লো

পাশাপাশি ছুটো সরাবের দোকান। একটা দেশী, একটা বিলাতী। তখনই মাথায় এক মতলব এল। বললাম, গুলী-বারুদের দরকার হবে না, এসো কোম্পানীর ফৌজকে শায়েস্তা ক'রে দিচ্ছি। কেউ এগোয় না। তখন আমি গিয়ে দোকান থেকে বোতলগুলো বের ক'রে পথের ধারে রেখে দিলাম। তা ছু-তিনশ' বোতল হবে। ইতিমধ্যে এসে পড়লো কোম্পানীর ফৌজ, খাস মানোয়ারী গোরা। ঐ বোতলগুলো দেখতে পেয়ে হাতের বন্দুক ফেলে রেখে তুলে নেয় বোতলগুলো। ছু-ছুটো বগলে চেপে রেখে তেসরাটা খুলে গলগল ক'রে ঢেলে দেয় মুখের মধ্যে। যারা পরে এসেছে, বোতল পায় নি, অপরের বগল থেকে কেড়ে নেয় বোতল। ব্যস, পনেরো মিনিটের মধ্যে জঙ্গী গোরার দল পথের ধুলোয় লুটোপুটি শুরু ক'রে দিল। অফিসাররা এসে দেখে বেগতিক, উঠতে হুকুম করে, ছড়ি দিয়ে মারে, কে কার কথা শুনছে। সবাই তখন চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে বিলায়তী বিবির মুখ খোয়াব দেখছে। তখন আমি ডেকে বললাম, কেমন খাঁ সাহেব, দেখলে তো, লড়াই মানে ডাণ্ডাবাজি নয়, মতলববাজি।

খুরশিদ শুধোয়, তারপরে ?

তারপরে কি আর ওখানে থাকতে আছে ! এই ব'লে সে হাসতে থাকে।

খুরশিদ বলে, এত ছুঃখের মধ্যেও তোমার হাসি পায় ?

স্বরযপ্রসাদ বলে, খুরশিদ ভাই, চোখের পানি আর মুখের হাসি ভিন্ন নয়। কখনো কখনো চোখের পানি ছুঃখের তাপে বাষ্প হয়ে বের হয়, তাকেই মনে হয় হাসি বলে।

তখন মহম্মদ আলি বলে, এবারে উঠতে হয়, কাল আবার অন্ধকার থাকতেই রওনা হ'তে হবে।

তারপরে সরাব মিঞার দিকে তাকিয়ে বলে, সরাব ভাই, তুমিও কেন চলো না আমাদের সঙ্গে।

না, আমার কাজ এখানেই।

খুরশিদ আশ্বস্ত হয়। বিদেশে গিয়ে সরাবের কি দশা হবে, এই ছুশ্চিন্তা তার মনে হয়েছিল মহম্মদ আলির আমন্ত্রণে !

আর স্বরযপ্রসাদকে যেতে বলা ফালতু, এখানে ও বসে থাকবে ওর অশর্ফি হজার মোহর আগলে।

আরে, আমার মোহর পাহারা দিচ্ছে ইঁদারার মধ্যে যক্ষিবুড়ি।

তবে উঠি।

আবার কবে দেখা হবে? ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে খুরশিদ।

খোদার মর্জি হ'লে অবশ্যই দেখা হবে, তবে কবে, কোথায়, কেউ জানে না।

এই ব'লে মহম্মদ আলি সেলাম ক'রে বের হয়ে যায়।

খুরশিদ বলে, সুরযভাই, রাত তো অনেক হয়েছে, এখানেই আজ থেকে যাও, তোমার তো বাড়ি ফিরবার উপায় নেই।

না বিবি, একবার পণ্ডিতজীর বাড়িতে গিয়ে খবর-পাত্তা নিতে হবে, নয়ন বেখোঁজ হওয়ায় ওরা নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে।

সুরযপ্রসাদ চলে গেলে খুরশিদ বলে, সরাব ভাই, তুমি নিশ্চয় এখানেই থাকবে।

তবে আর যাবো কোন্ চুলোয়! চাঁদনীচকের নহরটা দিব্যি ঘুমোবার জায়গা, তবে এখন আর সেদিকে যাওয়ার উপায় নেই, হারামজাদা কোম্পানীর ফৌজ সেখানে পাহারা বসিয়েছে।

তবে খাবার যোগাড় করি।

তার চেয়ে সরাব নিয়ে এসো।

খানা খাবে না?

আরে পিয়ারী, যারা সরাব পায় না, তারাই খানা খায়। ও কি আবার একটা খাবার যুগ্যি জিনিস, চিবোতে চিবোতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়। আর সরাব দেখো তো, কেমন সরল তরল গরল চোলাই-করা অনল! বোতলের মুখ খোলো, নিজের মুখ খোলো, ঢেলে দাও গলগল ক'রে। এক লহমার মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা কাণ্ডজ্ঞান—সব লোপ পেয়ে যায়। এমন জিনিস আর আছে!

তারপরে খুরশিদের কাছে গিয়ে তার গাল টিপে দিয়ে বলে, কেবল তুমি ছাড়া।

তার মুখে মদের গন্ধ পেয়ে খুরশিদ বলে, সরাব তো খেয়েই এসেছ।

ঠিক ধরেছ পিয়ারী, ঠিক ধরেছ, এখন শাহ্‌জাহানাবাদে সরাব বিনা দামে বিকোচ্ছে। সরাবঅলারা সব পালিয়েছে দোকান ফেলে।

তাই ব'লে এত খাবে, মরবে যে।

এই যে এত লোক মরছে, তারা কি সব সরাব খেয়েছে।

তারা লড়াই করছে, মরছে।

আমিও তো লড়াই করছি।

কার সঙ্গে?

নিজের সঙ্গে।

বুঝতে পারে না খুরশিদ। শুধোয়, সে আবার কি?

বুঝলে না বিবি? আমার মধ্যে একজন আছে, যে চায় সুখ, আর একজন আছে, যে বলছে সুখ ব'লে কিছু নেই। এই নিয়েই তো মামলা হামলা। আমাকে এতকাল দেখেও বুঝতে পারলে না?

আমার আর বুঝে কাজ নেই।

তবে এসো বুঝিয়ে দিই।

থাক, থাক, এখন আমি পাগলের সঙ্গে পাগলামি করতে পারবো না, তার চেয়ে চলো শোবে।

এই ব'লে তাকে টেনে নিয়ে যায় গৃহান্তরে।

ঘুম ভেঙে জেগে উঠে সরাব মিঞা দেখে আলোয় আকাশ ভ'রে গিয়েছে, অনেক বেলা। শুনতে পায়, জানলার নিচেই রাস্তার উপরে ভারি ফৌজী জুতোর গটগট আওয়াজ, বিজাতীয় কণ্ঠে order হাঁকবার শব্দ, কামানের গাড়ির গড়গড় রব। ওরই মধ্যে একবার বন্দুকের শব্দ হ'ল। জানলায় উঁকি মেরে দেখল, নিকা কাটরার গলিটা গোরা ফৌজে ভ'রে গিয়েছে। ফিরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ে শিথিলবসনা নিদ্রিতা খুরশিদ, তার দেহের নানাস্থানে সুখসন্ধানের চিহ্ন। তখনি মনে পড়ে গতরাত্রির অভিজ্ঞতা, সেই সঙ্গে জানলা দিয়ে কানে ঢোকে বিচিত্র আওয়াজ। হঠাৎ নিজের প্রতি ধিক্কারে সরাব চিৎকার ক'রে ওঠে, বাদশাহী আজ রসাতল, শাহ্‌জাহানাবাদ টলমল, আর আমি কিনা কসবির কোলে ঘুমোচ্ছি।

সেই শব্দে জেগে ওঠে খুরশিদ, কাপড়চোপড় খানিকটা সামলে নিয়ে শুধায়, কি হ'ল?

কি হ'ল! কি আর হবে! বাদশাহী আজ রসাতল, শাহ্‌জাহানাবাদ টলমল, আর আমি কিনা কসবির আঁচল ঢাকা দিয়ে ঘুমোচ্ছি। সরাবের উন্মাদপ্রায় অবস্থা দেখে ভীত খুরসিদ বলে, আমার কি দোষ বলো!

তোমার কি দোষ! তুমি কেন বললে যে, সুখ দিতে পারো?

সরাব, আমি তো কখনো এমন কথা বলি নি।

মুখে বলো নি ভাবে বলেছ, ভঙ্গীতে বলেছ, চোখের অপাঙ্গ ইঙ্গিতে বলেছ, জমাট সুরাসারে তৈরি তোমার ঐ আশ্চর্য দেহখানা দিয়ে বলেছ।

কি বলবে, ভেবে পায় না খুরশিদ। সরাবের বাতিকের সঙ্গে সে দীর্ঘকাল পরিচিত, কিন্তু এমন উন্মাদ অবস্থা ইতিপূর্বে দেখে নি। সে নীরবে বসে

থাকে—আশঙ্কায়, বিস্ময়ে কাঁপতে থাকে। আর গলন্ত সুরার মতো বাক্যস্রোত বের হ'তে থাকে সরাব মিঞার মুখ থেকে।

সুখ চাই, সুখ চাই। সুখের তল্লাসে কোথায় না গিয়েছি, কী না করেছি। নারীদেহের চরম ক'রে ছেড়েছি, সরাবের জ্বলন্ত আগুনে আকণ্ঠ পূর্ণ ক'রে নিয়েছি, হেন পাপ নেই, করি নি। দোজখের আগুনের মধ্যে বসে যখন সর্বাঙ্গ দগ্ধ হয়ে গিয়েছে, বেহস্তের দিকে হাত বাড়িয়ে শুধিয়েছি,—সুখ দিতে পারো তো যাবো। সবাই সুখের প্রতিশ্রুতি দেয়—কেউ দিতে পারে না, কাছে গেলে দেখি বিলকুল ধোঁকাবাজি। দুনিয়া জুড়ে সুখের নামে চলেছে ধাপ্পা, চলছে ধোঁকাবাজি!

অনর্গল বলে চলে সে। তার মুখ-চোখ উন্মাদের, মুখমণ্ডল আরক্তিম, কপালের শিরা দুটো নিথাদে স্পন্দিত হচ্ছে, স্বরের উগ্রতায় কণ্ঠে নীলাভ শিরা-উপশিরা দব-দব করছে। আবেগের তীব্রতায় দুই মুষ্টি উদ্যত করছে অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে।

মিঠা বলে মুখে দিই, দেখি খাট্টা; মন বলে দুই হাতে আঁকড়ে ধরি, দেখি মাংস, অমৃত বলে মুখে ঢেলে দিই, দেখি গরল; পিয়ারী বলে বুকে টেনে নিই, দেখি কসবি! এ কি শয়তানের খেলা, না আল্লার শয়তানি!

এমন সময়ে তার দৃষ্টি পড়ে বেপথুমতী খুরশিদের দিকে।

আর তুমি। সুখের তল্লাসে কোন্ অতলে না ডুব দিয়েছি তোমার মধ্যে। পারলে কি দিতে! ধাপে ধাপে জাহান্নমের অতলে নেমেছি, পারলে কি দিতে! ঐ সুন্দর দেহখানা মুচড়ে দুমড়ে নিঙড়ে নিঙড়ে দেখেছি, পারলে কি দিতে! না, না, কোথাও সুখ নেই, কেবল রক্ত, কেবল মাংস, কেবল ক্লান্তি, ভ্রান্তি, অতৃপ্তি।

তারপরে এগিয়ে গিয়ে দু হাতে তার মুখখানা তুলে ধরে বলে, কেন ঠকালে আমাকে পিয়ারী, কেন ঠকালে আমাকে? বললেই পারতে দেহ দিতে পারি, সুখ কোথায় পাবো।

খুরশিদ দেখতে পায় তার চোখে অশ্রুর আভাস, অমনি নিজের দু চোখে ধারা প্রবাহিত হয়।

স্বগতোক্তিতে বলতে থাকে সরাব, ঐ তো, ঐ চোখের জলের মুক্তো দিয়েই ভুলিয়েছ, হাসিতে মণি-মাণিক্য ছড়িয়ে ভুলিয়েছ, গালে গোলাপ ফুটিয়েই ভুলিয়েছ, রঙে জাফরান উড়িয়ে ভুলিয়েছ, বুকে নারিঙ্গী ফলিয়েই ভুলিয়েছ! কেন এমন ক'রে ভোলালে পিয়ারী, বললেই হ'ত সুখ

নেই আমার কাছে, অন্যত্র যাও!

এবারে কথা বলে খুরশিদ। সরাব, তুমি যাকে সুখ বলছ, লোকে তাকে বলে ভালোবাসা। আমি কসবি, ভালোবাসা পাবো কোথায়?

গর্জন ক'রে ওঠে সরাব মিঞা।

তবে ছাড়ো তোমার লোক ভোলাবার ব্যবসা।

আর কিছু বলবার না পেয়ে খুরশিদ বলে, তবে কি করবো?

কি করবে? আজ তামাম হিন্দুস্থানে একটিই মাত্র করণীয় আছে, যাও লড়াই করো গিয়ে।

অকৃত্রিম বিস্ময়ে বলে ওঠে খুরশিদ, আমি করবো লড়াই!

কেন, বাধা কি?

আমি কি হাতিয়ার চালাতে জানি!

কঠিন ব্যঙ্গের সুরে সরাব মিঞা বলে, চোখ চালাতে জানো তো, তাতেই হবে। যাও না, একটা গোরাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসো না। তারপরে না হয় আমরাই তাকে খতম ক'রে দেব।

খুরশিদ বোঝে উন্মাদের সঙ্গে তর্ক ক'রে লাভ নেই, চুপ ক'রে থাকে। কিন্তু চুপ ক'রে থেকেও উদ্ধার নেই। সরাব বলে, কিগো, বড় চুপ করলে যে?

তুমি পাগলের মতো কথা বলছ, সরাব।

খুরশিদের এই মন্তব্য উটের পিঠে শেষ কাষ্ঠখণ্ডের মতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সরাবের মনে। সে বলে, বটে, আমি পাগল! তা হ'তে পারে, কিন্তু তুমিও আর এখানে পটের বিবি সেজে বসে থাকতে পারছ না, যাও পথে যাও, ঐ শোনো ঘরের নিচেই হল্লা হচ্ছে, যাও, অন্তত একটা গোরা সৈন্যকে ঘায়েল করো গিয়ে। পুরুষ মরবে লড়াই ক'রে, আর তুমি সেজে-গুজে সুর্মা চোখে দিয়ে বসে থাকবে, তা কিছুতেই হবে না। যাও, এখনি যাও।

খুরশিদ তেমনি বসে থাকে। তখন সরাব গিয়ে ধরে তাকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করায়, সিঁড়ির দিকে ধাক্কা দেয়। খুরশিদ ভাবে, এর চেয়ে মৃত্যু ভালো, সরাব তার মৃত্যু চায়, বেশ তাই হবে। সরাব ধাক্কা দিতেই থাকে। খুরশিদ দোপাট্টাখানা টেনে নিয়ে নগ্ন গাত্রের উপর দেয়—ঠিক সেই মুহূর্তে সরাব তাকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়। অসহায় খুরশিদ পথের উপরে গিয়ে দাঁড়ায়। টেবিলের ওপর থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে বাকি সুরাটুকু গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে সরাব শুয়ে পড়ে বিছানায়।

খুরশিদ পথে নেমে কি করবে ভাবছে, এমন সময় একজন শ্বেতাঙ্গ বাঘের

মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপরে। সবলে তার হাতখানা ধরে বলে ওঠে, At last I have got what I wanted !

তারপরে নিবিষ্ট মনে তার মুখখানা ভালো ক'রে দেখে নিয়ে বলে, This is the counterpart of Elina !

খুরশিদের সমস্ত অস্তিত্ব এমনি অসাড় হয়ে গিয়েছিল যে, তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে না। বস্তুত সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে অর্থহীন মনে হয়।

উন্মাদ ক্লিফোর্ড গর্জে ওঠে, An eye for an eye, a tooth for a tooth, rape for rape !

ক্ষিপ্রহস্তে তার দোপাট্টা, ঘাগরা খুলে ফেলে, তারপরে দোপাট্টা দিয়ে তাকে শক্ত ক'রে বাঁধে কামানের গাড়ির চাকার সঙ্গে। খুরশিদ একটিও কথা বলে না।

তখন ক্লিফোর্ড অদূরস্থ একদল শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের উদ্দেশে বলে, Now, come volunteers, who will rape her ! Sixteen gold mohurs for the trouble ! Come one, come all !

শ্বেতাঙ্গরা কেউ অগ্রসর হয় না, কেবল অবাক হয়ে তাকায়।

None coming forward ! All right, I double the stake ! Thirtytwo gold mohurs for raping her !

একজন বলে ওঠে, Not a very unpleasant task. Why not do it yourself ?

আর একজন বলে, Save the money and have the pleasure ! All these and heaven too.

একজন অফিসার এগিয়ে এসে বলে, Mr. Clifford, this is not Christian like !

You old sinner ! You have crucified Christ, and I am going to have her raped.

তারপরে শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে বলে, None coming forward, you impotent lot ! Here is the stake raised again—one hundred gold mohurs—all cash !

বলে পকেট থেকে এক মুঠো মোহর বের ক'রে হাতের তালুতে ঝন ঝন ক'রে বাজায়।

এতক্ষণ খুরশিদ সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। বুঝতে পারে কি হ'তে চলেছে। তখন নিরুপায় আর্ত অসহায় কণ্ঠে চিৎকার ক'রে ওঠে, সরাব ভাই, ইজ্জৎ বাঁচাও।

নেশা ছুটে গিয়ে চমকে ওঠে সরাব মিঞা!

সরাব ভাই, ইজ্জৎ বাঁচাও।

এ যে খুরশিদের কণ্ঠ!

জানলায় উঁকি মেরে কিছু দেখতে না পেয়ে ছাদের উপরে গিয়ে ওঠে সরাব। দেখতে পায় সমস্ত। খুরশিদও দেখতে পায় সরাবকে। হাত জোড় ক'রে বলে ওঠে, সরাব ভাই, দিল আমার, ইজ্জৎ রক্ষা করো, আমাকে মেরে ফেলে বাঁচাও।

দ্রুত নেমে আসে ঘরের মধ্যে। বন্দুকটা তুলে নেয়, এ ছাড়া খুরশিদকে বাঁচাবার আর অন্য উপায় নেই। ছাদের উপরে উঠে এসে বন্দুক তুলে নিশানা করে।

খুরশিদের মুখে স্বস্তির লক্ষণ দেখা দেয়, সে এগিয়ে দেয় বুক, বলে, ঠিক নিশানা করো, এক গুলীতে মেরে ফেলে আমাকে বাঁচাও, ইজ্জৎ রক্ষা করো।

খুরশিদের বাক্য শেষ হওয়ার আগেই, অন্য সকলে তাকে দেখবার আগেই সরাবের বন্দুকের গুলী ছোটে। খুরশিদের ছিন্ন দেহ লুটিয়ে পড়ে কামানের চাকার উপরে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো বন্দুকের গুলী ছোটে সরাবের দিকে। তার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গিয়ে পড়ে যায় ছাদের উপরে।

॥ ১২ ॥

"তারপরে শূন্য হ'ল ঝঞ্ঝালুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লি রাজশালা,
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোকমালা।"

বাহাদুর শা লালকেল্লা ছাড়তে রাজী হলেন না। তিনি যদি বখৎ খাঁর সঙ্গে দিল্লি থেকে লখনৌ চলে যেতেন তবে সিপাহী যুদ্ধের শেষ পরিণাম যে অন্যরকম হ'ত তা নয়, তবে যুদ্ধ আরও সঙ্কটজনক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'ত নিশ্চিত। নবাবের নামে লখনৌর যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলেছিল। বস্তুত লখনৌতে

ও অযোধ্যা রাজ্যেই কোম্পানীকে সবচেয়ে বেশি সময় লড়তে হয়েছিল, সবচেয়ে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এখন নবাবের সঙ্গে বাদশাহী ঝাণ্ডা সেখানে উড়লে দিল্লি ও কানপুরের পতন হওয়া সত্ত্বেও লখনৌ হয়ে উঠতো সিপাহী যুদ্ধের কেন্দ্র। সামরিক গুরুত্বের সঙ্গে মিশ্রিত হ'ত রাজনৈতিক তাৎপর্য। শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর জয় হ'লেও অনেক বেশি রক্ত অনেক বেশি অর্থব্যয় করতে হ'ত। শুধু তা-ই নয়, বছর দুই ধরে যদি সেখানে বিরোধ-প্রতিরোধ চলতো তবে ভারতের সীমান্তে যেসব স্বাধীন রাজ্য ছিল তাদের উপরে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো বলা সহজ নয়। ভারতের মধ্যেও কোন কোন অঞ্চলে, যেমন নববিজিত পাঞ্জাবের পশ্চিম সীমান্তের উপজাতির মধ্যে, কোম্পানীর প্রতিকূলে প্রতিরোধ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব ছিল না। এসব অশুভ চিন্তা কোম্পানী সরকারের মনেও দেখা দিয়েছিল। সেইজন্যেই স-সমাট লালকেল্লার পতনে তারা স্বস্তি অনুভব করেছিল, বুঝেছিল সিপাহী প্রতিরোধের শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছে, রাজনৈতিক তাৎপর্য লোপ পেয়েছে। বাকী থাকলো কেবল সামরিক দিকটা। সেটাও কালক্রমে দূর হবে এই ধারণার বশেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ডযুদ্ধ চলবার কালেই মহারানী ভিক্টোরিয়ার বিখ্যাত ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়েছিল।

বাহাদুর শা কেন লালকেল্লা পরিত্যাগ করতে অসম্মত হলেন? তখনো কি তাঁর ধারণা ছিল কোম্পানীর সঙ্গে আপস সম্ভব?—কাজেই অনিশ্চয়ের পথে পদক্ষেপ ক'রে কোম্পানীর অধিকতর উষ্মাভাজন হওয়া অনাবশ্যক! কিম্বা অশীতিপর বয়সের জরা তাঁকে অভ্যস্ত আরাম ছেড়ে অন্যত্র যেতে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল? যাই হোক বাহাদুর শা আলমগীর হওয়া দূরে থাক, শাহ আলম বা শাহজাদা ফকরুদ্দিনও নন, অ্যাড্‌ভেঞ্চার করা ধাতে ছিল না, তাই তিনি যদ্‌-ভবিষ্য নীতি অবলম্বন করলেন। কিম্বা বেগম জিনৎ মহলের পরামর্শ তাঁর মনে বুদ্ধির কুহেলিকা সৃষ্টি ক'রে থাকবে। বাদশা যদি শাহ আলম বা শাহ্‌জাদা ফকরুদ্দিন না হন তবে বেগম জিনৎ মহল সুলতানা রিজিয়া বা নুরজাহান নন। তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান পুত্র জবান বখৎকে সিংহাসনে বসাতে হবে বাহাদুর শার পরে। এই সন্তানবৎসলা মুগ্ধা নারীর ধারণা হয়েছিল সিংহাসনের সঙ্গে লালকেল্লার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, কাজেই লালকেল্লা পরিত্যাগ মানে সিংহাসনের আশা পরিত্যাগ। কাজেই তিনি যে বাদশাকে লালকেল্লা পরিত্যাগ ক'রে বখৎ খাঁর সঙ্গে যেতে নিষেধ করবেন এমন অনুমান করা অন্যায় নয়।

শাহ্‌জাদাগণ কি পরামর্শ দিয়েছিল বাদশাকে? তারা জানতো কোম্পানীর খাতায় তাদের নাম রক্তের অক্ষরে লিখিত। তারা নিজের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত। কী পরামর্শ তারা দেবে অন্যকে? হাকিম আসানুল্লা বাদশার অন্তরঙ্গ এবং উজীর। সে কী পরামর্শ দিয়েছিল? বিচারকালে বাদশার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল সে। অনেকের অনুমান যে কোম্পানীর সঙ্গে তার তলে তলে যোগ ছিল। বাদশা সমেত লালকেল্লা কোম্পানীর হস্তগত হ'লে তার অখুশী হওয়ার কথা নয়। নিজের শির বাঁচাতে কে না চায়? ওর চেয়ে মূল্যবান আর কি আছে দুনিয়ায়।

তবে বাদশা লালকেল্লা পরিত্যাগ ক'রে হুমায়ুন শার কবরের কাছে চলে গেলেন অনেক কারণে। যুদ্ধের ঢেউ ক্রমেই এগিয়ে আসছে লালকেল্লার দিকে, ঝামেলা থেকে একটু দূরে থাকাই নিরাপদ। তারপরে যুদ্ধের গতিক বুঝে লালকেল্লার সিপাহী শান্ত্রী মন্ত্রী, হাজার রকম চাকর নফর সব সরে পড়েছিল। ২০শে সেপ্টেম্বর কোম্পানীর ফৌজ যখন লালকেল্লায় ঢুকলো, দেখলো সব খাঁ খাঁ করছে, কোথাও জনপ্রাণী নেই, কেবল নৌবৎ-খানার দরজায় দণ্ডায়মান একজন মাত্র বন্দুকধারী সিপাহী। সে-লোকটা সৌভাগ্যক্রমে মনিবের 'পহ্‌লে আত্মা' মন্ত্রে দীক্ষিত নয়। কোম্পানীর ফৌজ দেখে লোকটা গুলী চালালো, কেউ মরলো না, পরক্ষণেই অনেকগুলো গুলীতে নিহত হয়ে পড়ে গেল। লালকেল্লা রক্ষায় সেই সিপাহীটিই একমাত্র শহীদ। এমন জনশূন্য রাবণের পুরীতে জীবন ধারণ সম্ভব নয়। সেটাও বাদশার লালকেল্লা পরিত্যাগের অন্যতম কারণ। আরও কারণ আছে। হুমায়ুনের কবরের পত্তন দিল্লি শহরেরই অঙ্গ, সপ্ত দিল্লির অন্যতম দিল্লি। সেখানে গেলে দিল্লি পরিত্যাগ বোঝায় না। তা ছাড়া সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা আছে। তখনকার হুমায়ুন শার কবর এখনকার দিনের মত জনশূন্য পুরী নয়! কবরের চারদিকে লোকালয় ছিল। এই সৌধটি প্রথম মোগল বাদশার—যার কবর হিন্দুস্থানে। আর এখানেই আমীর তৈমুর বংশীয়দের আনুষ্ঠানিক গোরস্থান। অনেক কারণ সেখানে আশ্রয় গ্রহণের। হাকিম আসানুল্লা হয়তো মনে মনে হেসে ভেবেছিল, যাও, দুদিন আগেই না হয় গেলে। পাঠাবার খরচটা বেঁচে গেল কোম্পানীর।

কাজেই একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাদশা, বেগম, জবান বখৎ প্রভৃতি লাল-কেল্লার পানি দরবাজা দিয়ে বের হয়ে দাঁড়ালো যমুনার চরে, সেখানে শাহী বলদের গাড়ি প্রস্তুত ছিল। সেই গাড়িতে চেপে যমুনার ধার বরাবর তারা

রওনা হ'ল হুমায়ুন শার কবরের দিকে। সঙ্গে চলল বাদশার খাস খানসামা বসন্ত আলি খাঁ, বেগমের বাঁদী করিমন বিবি আর করিম খাঁ, বাদশাহী পিলখানার হেড মাহুত।

শাহ্‌জাদারা আগেই যার যার মতো রওনা হয়ে গিয়েছিল। আমীর তৈমুরের বংশের চরমতম সঙ্কটের দিনে উত্তরপুরুষরা গিয়ে সবলে আঁকড়ে ধরলো তাঁর কবর, যিনি নাকি একবার রাজ্য হারিয়েও আবার উদ্ধার ক'রে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রওনা হওয়ার সময়ে বাদশা শিস দিয়ে ডাকলেন প্রিয় বুলবুলিটাকে, সে আজ আর কাছে এলো না, উঁচু কুলুঙ্গিতে চুপ ক'রে বসে রইলো। বাদশা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন, ওর আর কি দোষ; মানুষেরই যে রকম ব্যবহার দেখছি, ও তো পাখী মাত্র।

তৃতীয় ভাগের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ ১ ॥

ততো দুঃশাসনো রাজন্!
দ্রৌপদ্যা বসনং বলাৎ
সভামধ্যে সমাক্ষিপ্য
ব্যাপাক্রষ্টুং প্রচক্রমে ॥

—মহাভারত

বাদশা আগেই চলে গিয়েছেন লালকেল্লা ছেড়ে সন্ধ্যাবেলায়। পরদিন সকাল-বেলা অবধি শাহ্‌জাদারা শাহ্‌জাহানাবাদ আঁকড়ে রইলো যদি এর মধ্যে কিছু ঘটে, কোন শেষ অপ্রত্যাশিত চালে খেলার মোড় ঘুরে যায়! না, একেবারে শেষ না দেখে শহর ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না। হাঁ, বাদশা যেতে পারেন, তাঁর সম্মুখে ভবিষ্যৎ সঙ্কীর্ণ, কিন্তু শাহ্‌জাদাদের সম্মুখে যে কিংখাব বিছানো ভবিষ্যতের দীর্ঘ রাজপথ।

এত সহজে কি ছেড়ে যাওয়া যায়? কি আশায় যে শাহ্‌জাদারা আঁকড়ে রইলো শহর, তারাই জানে। কুলি খাঁর মৃত্যুবরণে ও বখৎ খাঁর শহর ত্যাগে যুদ্ধ থেমে গিয়েছে, তবু কি না আশা! কর্মের দায়িত্ব যারা বহন করে না, একমাত্র তাদের পক্ষেই এমন অমূলক আশা পোষণ সম্ভব।

বিকালের দিকে মীর্জা মুঘলের দরিয়াগঞ্জের কুঠিতে তিন শাহ্‌জাদা মিলিত হয়েছে—মীর্জা খিজির সুলতান, মীর্জা আবুবকর আর মীর্জা মুঘল নিজে। মীর্জা মুঘল নির্বোধ নয়, যোদ্ধা না হ'লেও যুদ্ধের গতি বোঝে। সে বলল, শাহ্‌জাদা, আর অপেক্ষা করা কিছু নয়, এবারে যাত্রা করা আবশ্যক।

খিজির সুলতান বলল, দাঁড়াও না, এখনো শেষ চালে সব উল্টে যেতে পারে।

আর চাল দেবে কে? বখৎ খাঁ ফৌজ নিয়ে চলে গিয়েছে।

বখৎ খাঁ বেইমান।

আর কুলি খাঁ শহিদ হয়েছে।

খিজির সুলতান রেগে উঠে ধিক্কার দেয়—শহিদ হয়েছে! বলো না কেন মরেছে! বেটা সারা জীবন শাহী তন্‌খা ভোগ ক'রে এখন বিপদকালে শহিদ হয়েছে! বেটা উল্লু!

খিজির সুলতান, তুমিও তো শাহী তন্‌খা ভোগ করছ, কতটুকু কি করেছ ?

কেন, ফিরিঙ্গিগুলোকে কোতল করল কে ?

মনে আছে দেখছি, তবে আর শেষ চালের জন্য অপেক্ষা না ক'রে এখনি সরে পড়ো। মনে রেখো, কোম্পানীর খাতায় রক্তের অক্ষরে লিখিত রয়েছে তাদের নাম—যারা নিরীহ ফিরিঙ্গিদের কোতল করেছে।

শাহ্‌জাদা, তুমিও তো আছ সেই দলে।

আছি বলেই তো বলছি। চলো এখনো সরে পড়ি, দিল্লি হাতছাড়া হয়েছে।

কোম্পানীর কথা মনে পড়ায় খিজির সুলতান আর আপত্তি করে না, যেতে সম্মত হয়।

এবারে মীর্জা মুঘল বলে, কি শাহ্‌জাদা আবুবকর, তুমি যে বড় চুপ ?

বাস্তবিক এমন কথা কাটাকাটির মধ্যে একবারও মুখ খোলে নি আবুবকর—এ তার স্বভাবসিদ্ধ নয়।

ত্মাখো মীর্জা আবুবকর, ক'দিন থেকে তোমাকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখছি, ব্যাপার কি ?

বাদশাহীর এই হাল, খুশী হওয়ার তো কথা নয়।

ত্মাখো শাহ্‌জাদা, পীরের কাছে মামদোবাজি করতে এসো না, বাদশাহী হালের শোকে তো রাতে ঘুম নেই তোমার। আসল কথা, মনে মনে কিছু প্যাঁচ কষছ।

কি আর আছে প্যাঁচ কষবার, সব তো শেষ হয়ে গেল।

সব শেষ হয়ে গেলেও যারা প্যাঁচ খেলবার আশা রাখে, তাদেরই বলে বে-অকুফ। সাবধান ক'রে দিচ্ছি আবুবকর, এখনো পালালে বাঁচতে পারো, কোম্পানীর হাতে ধরা পড়লে রক্ষা নেই।

সে কি আর জানি নে। তোমরা এগোও, আমি আসছি।

এই বলে বেরিয়ে যায়। কাছেই দাঁড়িয়েছিল চুনিলাল, তাকে বলে, তাঞ্জাম।

চুনিলাল বলে, শাহ্‌জাদা, তাঞ্জামঅলারা পালিয়েছে।

পালিয়েছে! সব বেইমান। আচ্ছা এটুকু পায়দলেই যাওয়া যাবে।

আবুবকরের দিলমঞ্জিল কুঠি এখন কোম্পানীর অধিকারে। দিন-তিনেক আগে শাহ্‌জাদা চলে এসেছে ফৈজবাজারের একটা কুঠিতে। কুঠিতে পৌঁছে শুধালো, চুনিলাল, এবার বলো খবর কি ?

শাহ্‌জাদা, বিবির বাপ মারা গিয়েছে, ভাই লড়াইয়ে নিখোঁজ হয়েছে, বাড়িতে পুরুষ বলতে আর কেউ নেই।

চমৎকার খুশ খবর! শুনেছি ওর ভাইটা ছিল গোঁয়ার। বেটা নিখোঁজ হয়েছে, আবার না ফিরে আসে।

এ-সব কথার উত্তর হয় না, আর শাহ্‌জাদী মেজাজে অভ্যস্ত চুনিলাল জানে কখন উত্তর দিতে হবে আর কখন হবে না। চুপ ক'রে থাকে।

তুমি নিচে যাও, দুটো ঘোড়া নিয়ে তৈরি থেকো, আমি এখনি আসছি।

তারপরে প্রস্থানোদ্যত চুনিলালকে মনে করিয়ে দেয়, ওখান থেকেই সোজা চলতে হবে হুমায়ুনকা মকবারায়, এদিকে আর আসা নয়, সেইভাবেই তৈরি হয়ে যেয়ো।

চুনিলাল বের হয়ে যায়। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে আবু-বকর। এ কয়দিন তার মনের মধ্যে তপ্তশূল চালিয়েছে মহম্মদ আলির তীব্র বক্রোক্তি—Impotent, লা-মরদ! ঐ শব্দ দুটো মনে পড়তেই কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে, দুনিয়া বাষ্পের মতো ঝাপ্‌সা হয়ে আসে, আর আসমানের সব-গুলো গ্রহনক্ষত্র ধিক্কারের দন্ত বিকাশ ক'রে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। Impotent—লা-মরদ কোমরবন্ধ থেকে ছোরাখানা খুলে রেখে তার বদলে পরে নেয় তলোয়ার

Impotent, লা-মরদ! বটে! আমীর তৈমুরের বংশে কালে কালে মানব চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছে, কেবল ঐটি ছাড়া। এ বংশে নিষ্ঠুর জন্মেছে, পাষণ্ড জন্মেছে, যোদ্ধা জন্মেছে, শায়ের জন্মেছে, বাবর থেকে বাহাদুর শা অবধি কত বিচিত্র জীব জন্মেছে, কিন্তু কখনো লা-মরদ জন্মে নি! আজ সেই অভিযোগ কি না তার সম্বন্ধে—আর সে অভিযোগ করলো কি না সামান্য নগণ্য একটা লোক! আগেকার দিন থাকলে তাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াতো।

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততর হয়ে ওঠে তার গতি।

এই অভিযোগের শেলে আহত হয়েই রুমালী বিবির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু কি তার হাস্যকর পরিণাম! আগেকার দিন হ'লে মেয়েটাকে হেঁটে-কাঁটা উপরে-কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলতো।

আয়নায় ছায়া পড়ে—টকটক করছে রাঙা মুখ, রক্তের চাপ আর একটু বাড়লেই ফিন্‌কি দিয়ে ছুটবে। এত রক্ত যার, সে কি না লা-মরদ। আজ মাথার উপরে হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ছে বাদশাহী। একদণ্ড এদিক-ওদিক হ'লে কোম্পানীর ফৌজ এসে গ্রেপ্তার করবে—তবু ঐ অভিযোগের অসত্যতা

প্রমাণ না ক'রে ছাড়তে পারবে না দিল্লি শহর! কার কাছে প্রমাণ? নিজের কাছে! আমীর তৈমুর বংশের যে-সব বাদশা আর শাহ্‌জাদা কিয়ামতের দিনের অপেক্ষায় কবরের মধ্যে শুয়ে আছে তাদের সকলের কাছে!—না, না, এই অভিযোগ মাথায় বহন ক'রে মরলে ঠাঁই পাবো না তাদের কাছে, তারা সবাই পাশ ফিরে শোবে না-মরদকে দেখে! না, না, কিছুতেই ঘটতে দেবো না তা! চুনিলাল, ঘোড়া তৈরি?

হাঁ, শাহ্‌জাদা।

তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় মীর্জা আবুবকর।

দুজনে এসে উপস্থিত হয় ফুলকী-মণ্ডী গলির মোড়ে।

আবুবকর বলে, তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমার বেশিক্ষণ সময় লাগবে না।

এই বলে ঘোড়া থেকে নেমে বলে, ঘোড়াটা ধরো। তারপরে দ্রুত এগিয়ে চলে যায় সুখানন্দ পণ্ডিতের বাড়ির দিকে। চুনিলালের কাছ থেকে পথঘাট খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিল শাহ্‌জাদা, অসুবিধা হ'ল না। দু' দিকের বাড়ি সব খালি, পালিয়েছে বাসিন্দারা। যারা যেতে পারে নি, দরজা বন্ধ ক'রে আত্মগোপন করেছে। কেউ দেখল না শাহ্‌জাদাকে।

বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেল, নিঃশব্দে ঢুকে পড়লো আবুবকর। চক মিলানো বারান্দার প্রথম দিকের ঘরে ঢুকতে দেখতে পেলো অপরিচিতা যুবতীকে। পান্নাকে দেখে নি আবুবকর। ভাবলো, এ আবার কে? যাই হোক, এটিও মন্দ নয়। পান্না চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কে? জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে আসতে যাচ্ছিল। আবুবকর ধাক্কা দিয়ে তাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দরজায় শিকল তুলে দিল, বলল, চিড়িয়া এখন বন্ধ থাকো, পরে বোঝাপড়া করবো তোমার সঙ্গে।

এঘর-ওঘর উঁকি মেরে এগিয়ে চলল আবুবকর। অবশেষে গোটা-দুই ঘর পার হয়ে গিয়ে দেখলো, তুলসী আপন মনে একাকী বসে আছে। পিছন ফিরে বসেছিল বলে দেখতে পায় নি কে প্রবেশ করছে। দেখল তখন, যখন শাহ্‌জাদার নাগরা-জুতো মসমস শব্দ ক'রে উঠল।

ইতিমধ্যে ভূতি বুড়ী শাহ্‌জাদাকে দেখতে পেয়ে—ওরে বাবা, সেপাই-পল্টন এসেছে রে!—বলে একদৌড়ে বাড়ির দুর্গমতম কুঠুরিতে গিয়ে প্রবেশ করেছে।

বিস্মিত তুলসী বলে ওঠে, এ কি, শাহ্‌জাদা যে!

আবুবকর ব্যঙ্গভরে কুর্নিশ ক'রে বলে, বিবি দেখছি বান্দাকে ভোলে নি।

তুলসী বুঝলো আজ মহাসঙ্কট উপস্থিত, চীৎকার ক'রে উঠলো, পান্নাদি!

ওঃ, ওটির নাম পান্না বুঝি? তা নামের যোগ্য মাল বটে। ভয় নেই, পান্নার সঙ্গেও বোঝাপড়া হবে, আগে হীরের সঙ্গে হয়ে যাক।

পান্না দরজা ধাক্কাচ্ছে শুনতে পেয়ে বলে, পান্নাদিকে ঘরে বন্ধ করলো কে?

বিবি, কসুর নিয়ো না, আমিই বন্ধ করেছি। একসঙ্গে তো দু'টিকে চলবে না, মিছে রসভঙ্গ হ'ত।

তুলসী বলে, শাহ্‌জাদা, আমি সামান্য লোক, তাতে অসহায়, আপনার পরিহাসের পাত্রী নই।

তোবা, তোবা, বিবি! কে বলল তুমি সামান্য লোক? সামান্য লোকের কাছে কি আসে শাহ্‌জাদারা? তা-ও কি না প্রাণ হাতে ক'রে? আর অসহায়! বটে! কোথায় গেল তোমার সেই রেসালাদার বাহাদুর?

ক্রুদ্ধ তুলসী গর্জে ওঠে, সে থাকলে আপনি আসতে সাহস করতেন?

নেই? মরেছে নাকি? সাবাস। বেশ সময় বুঝে মরেছে। তবে কেন, এবারে রেসালাদার ছেড়ে শাহ্‌জাদাকে ভজো।

আপনি পাষণ্ড!

একশ'বার। আমি পাষণ্ড, নিষ্ঠুর, বেইমান সমস্তই—কেবল না-মরদ নই। সেই কথাটাই আজ প্রমাণ করবার আশায় এসেছি।

এই কি বেলেল্লাপনা করবার সময় শাহ্‌জাদা? আজ যে বাদশাহী টলমল করছে।

চমৎকার বলেছ পিয়ারী। পায়ের তলায় মাটি টলমল করছে, মাথার উপরে আসমানটা চাকার মতো বনবন ক'রে ঘুরছে, বাদশাহী আজ মাথার উপরে হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ছে—এই তো শেষ সময়। এর পরে কি আর সুযোগ পাওয়া যাবে! তখন তুমিই বা কোথায় আর আমিই বা কোথায়? অনেক হয়েছে, এসো—বলে এগিয়ে যায় আবুবকর।

পিছিয়ে গিয়ে তুলসী করুণভাবে বলে, শাহ্‌জাদার যোগ্য বিবির তো অভাব নেই শহরে।

বহুত আচ্ছা! কিন্তু তুমি আমার হাত ফসকে যাওয়ায় লোকে যে আমাকে না-মরদ বলছে।

কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না তুলসী। ক্রোধে, অপমানে, ভয়ে, সঙ্কোচে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে।

আবুবকর বলে যায়, মীর্জা আবুবকর যে লা-মরদ নয় তার সাক্ষী দিতে পারে শাহ্‌জাহানাবাদের পাঁচ-সাত হাজার মেয়েমানুষ। কিন্তু কে তাদের কথায় বিশ্বাস করবে, দু'চার টাকায় তারা সব রকম কথা বলতে রাজী। তা ছাড়া তোমাকেই নিয়েই উঠেছে নালিশ। আজ ডুববার আগে সেই নালিশের কারণ দূর ক'রে যাবো।

শাহ্‌জাদা এগিয়ে গিয়ে তুলসীর হাত ধরে। নিরুপায় তুলসী হাতে কামড় দেয়। আর্তনাদ ক'রে উঠে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে আবুবকর বলে, বিবির দাঁতের ধার দেখেই বুঝতে পারছি পীরিতের ধারও কম হবে না।

তারপরে কড়া স্বরে বলে, সময় অল্প, এগিয়ে এসো, আর টালবাহানা ক'রে সময় নষ্ট করো না, এগিয়ে এসো।

বলে নিজেই এগিয়ে গিয়ে তার আঁচল ধরে।

তখন নিরুপায় হয়ে ঘরের কোণে বসে পড়ে তুলসী, দুই হাত দিয়ে বুক আচ্ছাদিত করে, কি করবে, কি ভাববে—সচেতন ভাবে বুঝতে পারে না। মনে পড়ে সুখানন্দকে, নয়নচাঁদকে, জীবনলালকে। জানে আজ তারা কেউ উপস্থিত নেই, তারা কেউ রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না। হঠাৎ আপাদমস্তক আতঙ্কে শিউরে ওঠে! আজ আর রক্ষা নেই। তখন তার মনে পড়ে যায়, পিতার মুখে শ্রুত মহাভারতের সেই শ্লোকগুলি। কৌরবসভায় অসহায় দ্রৌপদী দুঃশাসনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করছে, মানুষের অক্ষমতা বুঝতে পেরে শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে—মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল সেই শ্লোকগুলো। যখন সে বুঝলো মানুষের পক্ষে আর তাকে রক্ষা করা সম্ভব নয়, তখন গত্যন্তরহীন অসহায় জীব শেষ গতির কাছে নিজেকে সমর্পণ করলো।

যুক্তকরে নতজানু হয়ে বসে তদ্‌গতস্বরে সে আবৃত্তি করতে লাগলো—

আকৃষ্যমানে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ! দ্বারকাবাসিন্। কৃষ্ণ গোপীজন প্রিয়॥
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব!
হে নাথ। হে রমানাথ। ব্রজনাথার্ত্তিনাশন্।
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্বজনার্দন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্, বিশ্বাত্মন্, বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং ত্রাহি গোবিন্দ। কুরুমধ্যে হবসীদতীম্॥

তার আলুলায়িত কুন্তল, বিগলিত অশ্রু, শিথিলিত বস্ত্র, ঊর্ধ্বগত নয়নতারা

আর কোথা থেকে কোন্ বৈকুণ্ঠের দৈবী আভা তার মুখমণ্ডলে নিপতিত। তুলসী তখন বাহ্যজ্ঞানলুপ্তা। সে সৌন্দর্য এমনি অলৌকিক, সে অবস্থা এমনি অপার্থিব যে ঐ পাষণ্ডটাও ক্ষণকালের জন্য বিস্মিত হয়ে স্তব্ধভাবে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে, আক্রমণ করতে ভুলে গেল। কিন্তু কেবল ক্ষণকালের জন্যই। মুহূর্তকাল পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে তার আঁচল ধরে টান দেয়—অনেক ছেনালি হয়েছে, নাও, এখন ওঠো।

শাহ্জাদা সাবধান!

চমকে পিছনে ফিরে আবুবকর বলে ওঠে, রেসালাদার দেখছি।

শাহ্জাদার চিনতে ভুল হয় নি।

জীবনলালের পিছু পিছু ঢোকে অবরোধমুক্ত পান্না।

জীবনলালের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে তদ্গতভাব ও শ্রীকৃষ্ণচিন্তা ছুটে যায় তুলসীর। আর্তোল্লাসে চীৎকার ক'রে ওঠে, জীবন, তুমি এসেছ! তারপরেই মূর্ছিতা হয়ে পড়ে যায়। ভগবান মানুষের বিকল্প, মধুর অভাবে গুড়।

কিন্তু তখন তুলসীর শুশ্রূষার সময় ছিল না, আগে পাষণ্ডটার সঙ্গে বোঝাপড়া করা আবশ্যক।

শাহ্জাদা, আপনাকে অধিক বিপন্ন করতে চাই না, আপনি এখনি বের হয়ে যান।

বেয়াদব, তুমি শাহ্জাদাকে হুকুম করবার কে?

হুকুম যারা করতে পারে খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা শাহ্জাদাদের।

এ যে প্রাণভিক্ষার মতো শোনাচ্ছে!

আজ শাহ্জাহানাবাদে শাহ্জাদাদের চেয়ে দীনতর ভিক্ষুক তো আর কাউকে দেখি না।

'বেইমান' বলে আবুবকর তলোয়ারের হাতলে হাত দেয়।

থাক, থাক! বলে ওঠে জীবনলাল, শাহ্জাদাদের তলোয়ারের যে কত ধার তা দেখতে পেয়েছে তামাম হিন্দুস্থানের লোক, ওটা আর বের করবেন না।

দুজনে যখন কথা কাটাকাটি হচ্ছিল, পান্না তুলসীকে মাটি থেকে তুলে কোলের উপরে শুইয়েছে।

এমন সময়ে বারান্দার অপর প্রান্ত থেকে চুনিলালের কণ্ঠ ধ্বনিত হয়, শাহ্জাদা চলে আসুন, কোম্পানীর ফৌজ আসছে মনে হ'ল।

বিবর্ণ হয়ে যায় আবুবকরের মুখ। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে, রওনা হয়ে

একবার ফিরে তাকায়, বলে, রেসালাদার, তোমার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া আজ বাকী রইলো, দু-দুবার বেয়াদবি করেছ তুমি।

জীবনলাল উত্তর দেবার আগেই চুনিলালকে অনুসরণ ক'রে শাহ্‌জাদা নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

পান্নার কোলের উপরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে তুলসী। যতক্ষণ ভয় ছিল, সংগ্রাম চলছিল, চৈতন্যকে সবলে আঁকড়ে ছিল সে। ভয়ের কারণ দূর হ'তেই, জীবনলাল আবির্ভূত হয়ে সংগ্রামে পক্ষ নিতেই চৈতন্য লুপ্ত হ'ল। পান্না পাখার বাতাস করে, জীবনলাল জলের ছিটা দেয়। অবশেষে এক সময় তুলসী চোখ মেলল, একটি ক্ষীণ হাসি ফুটলো তার মুখে। পান্না তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, ঐ ছাখো বোন, তোমার শ্রীকৃষ্ণ সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত।

আবার হাসি ফোটে তুলসীর মুখে, সে হাসিতে একসঙ্গে মিশ্রিত স্বস্তি, সুখ, শান্তি।

পান্না বলে, ওগো শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর, রক্ষা তো করলে, এবারে কোলে নিয়ে বসো, আমি কিছু ভোগ তৈরি করি তোমার জন্যে।

জীবন বলে, সে কথা মন্দ নয়, সৈনিকের জীবন, কখন ডাক পড়বে কে জানে, খিদেটাও পেয়েছে জোর।

লড়াই তো শেষ হয়ে গিয়েছে, আবার ডাক কিসের?

লড়াই শেষ হয়ে গিয়ে এখন চলছে চড়াই।

তার মানে?

আসামীরা কে কোথায় লুকিয়ে আছে, বাড়ি চড়াও হয়ে এখন তার সন্ধান চলছে, এক মুহূর্ত ছুটি নেই।

ছুটি নেই তো ছুটে এলে কি ক'রে? খবর শুনতে পেয়েছিলে বুঝি!

এক রকম তাই। সকাল থেকে ভাবছি আসবো আসবো, কর্নেলের হুকুম আর মেলে না। অবশেষে ঘণ্টাখানেকের জন্য ছুটি মঞ্জুর করলো কর্নেল ব্রিজম্যান। গুরবচনকে বলে এসেছি, প্রয়োজন হ'লেই যেন এসে ডেকে নিয়ে যায়।

গুরবচন আবার কে? ওঃ, সেই সেদিন যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলে সেই শিখ সিপাহীটি বুঝি? বেশ লোকটি, যেমন লম্বা-চওড়া, তেমনি দিল-খোলা।

পছন্দ হয়েছে নাকি? বলো তো ঘটকালি করি।

মন্দ কি।

মন্দ কিছুই নয়, তবে ঘরে আছে তার জরু চন্দ্রিমা বিবি। তা সে তোমার সঙ্গে পারবে কেন? নূতনের আদর পুরনোর চেয়ে বেশি।

তার চেয়ে তুমি এখানে বসো, আমি শ্রীকৃষ্ণের ভোগ তৈরি করতে যাই।

এই বলে উঠে পড়ে পান্না। তুলসী ততক্ষণে উঠে বসেছে। পান্না ও জীবনলালে যখন কথাবার্তা চলছিল একটি ভারি আরাম বোধ করছিল সে, দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার, কঠিন রোগমুক্তির আরাম।

পান্না বাইরে গিয়ে শিকল বন্ধ ক'রে দেয়।

জীবন শুধোয়, আবার শিকল দিলে কেন?

হাসতে হাসতে পান্না বলে, সাবধানের মার নেই, আবার যদি শাহ্‌জাদা কি নবাবজাদা এসে ঢোকে!

তার অপস্রিয়মাণ পদশব্দে তুলসী শঙ্কিত আনন্দ অনুভব করে, জীবন অমিশ্র আনন্দ।

তুলসী বলে, আমিও যাই পান্নাদিকে সাহায্য করিগে।

যথেষ্ট হয়েছে, আর সাহায্য করতে হবে না। তা ছাড়া দরজা বন্ধ।

পান্নাদি ভারি দুষ্টু।

আর ভালো বুঝি ঐ শাহ্‌জাদা?

আমি কি তাই বলেছি, তুমিও কম দুষ্টু নও।

তবে যাই।

সে কথার উত্তর না দিয়ে তুলসী বলে, তুমি না এসে পড়লে আজ আমার কি হ'ত!

মন্দ কি হ'ত! সিপাহীর জরু না হয়ে শাহ্‌জাদী হতে।

ছিঃ! বলে তর্জনী তুলে শাসায় তুলসী।

তা হ'লে খুশী হয়েছ? বেশ তবে বকশিশ দাও।

কী আছে আমার যে দেবো?

শুনবে? দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে লক্ষ লক্ষ চুমো খাও।

বাপ রে! একেবারে লক্ষ লক্ষ। গুনে শেষ করবো কি ক'রে?

গুনে শেষ করতে পারবে না, তাই চুমো খাওয়ারও শেষ হবে না।

তা হ'লে তো সারা জীবন চুমো খেয়েই কাটাতে হবে।

ক্ষতি কি? ওতে খরচ নেই, তা ছাড়া মিষ্টিও বটে।

চুমো বুঝি মিষ্টি?

পরীক্ষা ক'রেই দেখো না।

এই বলে জীবন টেনে নেয় তাকে বুকের মধ্যে, তার হাত দু'খানা জড়িয়ে নেয় গলায়, তারপরে তুলসীর মুখখানা নিজের মুখের কাছে টেনে নেয়, এত কাছে যে দুজনের নিঃশ্বাস অনুভব করতে পারে দুজনে, বলে, নাও খাও।

জীবন দেখে যে তুলসীর চোখ জলছে, কপোল তপ্ত হয়ে উঠেছে, কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছে, উন্মুখ ওষ্ঠাধর অধিকতর রক্তিম হয়ে উঠেছে, বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে। তুলসী দেখে যে, জীবনের চোখে গালে ওষ্ঠাধরে হঠাৎ জলে উঠেছে বাসনার সহস্র শিখাবাতি। দুজনে দুজনের দিকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। জীবনের চোখ ইঙ্গিত করে, এগিয়ে এসো। তুলসীর চোখ উত্তরে জানায়, না, না, না। ঐটুকু মধুর বাধাতে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জীবনের বাসনার শিখাগুলো। এই বাসনা ও বাধা, এই এগিয়ে এসে থেমে থাকা, ধরা দেওয়ার আগে স্থগিত ভাবটি হচ্ছে প্রেমের প্রদোষ, কামনার গোধূলি, যার পরে নাকি বাসরঘরের গভীর নিবিড় অন্ধকার আর অবলুপ্তি।

জীবনের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ লক্ষ চুমোর কতগুলো অনুষ্ঠিত হ'ল কেউ হিসাব রাখে নি, এসব ব্যাপারের যিনি দেবতা তাঁর মতো বেহিসাবী লোক ত্রিভুবনে আর নেই। তাই যখন দুজনের রক্তিম অধরোষ্ঠ থেকে রক্তাভ দাড়িম্বদানার মতো চুম্বন স্খলিত হয়ে চলেছে তখন নড়ে উঠল বাইরের শিকল। দুজন চমকে উঠল, এরি মধ্যে পান্নার রসুই হয়ে গেল! তাড়াতাড়িতে পান্না না জানি কী তৈরি করেছে। দুজনে একধারায় চিন্তা করে, এত শীগ্‌গির শেষ হয়ে গেল! মিলনের ক্ষণ ব্রহ্মার একনিমেষপাত।

কে?

ভয় নেই, শাহ্‌জাদা নয়, পান্নাবিবি। কি খুলবো নাকি?

জীবন বলে, বিলক্ষণ, এতক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

তাড়াতাড়ি কেশবাস সম্বৃত করে নেয় তুলসী, একবার ঠোঁটে গালে হাত দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করে লক্ষের চিহ্ন লক্ষ্যগোচর হয়ে আছে কিনা।

পান্না দরজা খুলে একবার তুলসীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে, এসো, শ্রীকৃষ্ণের ভোগ তৈরি।

ধূমায়মান সুগন্ধি পুরী-হালুয়ার থালার সম্মুখে জীবন যখন বসেছে, তখন বাইরের দরজায় কড়া নাড়বার শব্দ হ'ল।

কে এলো আবার?

তোমরা বসো, আমি দেখে আসছি। এই বলে পান্না যায় আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গুরবচনকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে। বলে, এই যে বলরাম দাদাও এসেছেন। নাও, বসে পড়ো, বলে আহ্বান করে গুরবচনকে। তারপরে বলে, অবশ্য তোমার চন্দ্রিমা দেবীর মতো হবে না—তবু যা হোক খেয়ে নাও।

গুরবচন খেতে বসলে জীবন শুধোয়, ব্যাপার কি গুরবচন ভাই?

আর ব্যাপার! কর্নেল ব্রিজম্যানের হুকুম, তোমাকে আর আমাকে যেতে হবে কর্নেল হডসনের সঙ্গে।

কোথায়? হঠাৎ?

হঠাৎ নয়। আজ সকালে তিনি বাদশা আর বেগমকে বন্দী ক'রে নিয়ে এসেছেন। এবারে যাচ্ছেন শাহ্‌জাদাদের বন্দী ক'রে আনতে। এখনি রওনা হ'তে হবে, জোর হুকুম।

তারপরে তুলসীর দিকে তাকিয়ে বলে, ভয় নেই ভাবিজী, এখন গুলী-গোলার কারবার খতম, এখন কেবল হাতকড়া আর রশারশি।

তবু ভয় যায় না তুলসীর, যদিচ বাইরে প্রকাশ পায় না সে ভাব।

পান্না শুধোয়, আবার কবে আসবে?

জীবন তাকায় গুরবচনের দিকে। বলে, আজ তো সন্ধ্যা হয়ে এলো, ওখানে গিয়ে কাজ শেষ ক'রে ফিরতে কিছু সময় লাগবে। তবে আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে নিশ্চয় ফিরতে পারবো। কি বলো গুরবচন?

জরুর। আমাদের জন্য খানা তৈরি রেখো পান্নাবিবি। সোজা এখানে চলে এসে দুজনে খাবো।

আমাদের তৈরি খানা জীবনের পছন্দ হ'লেও তোমার কি পছন্দ হবে সাহেব? তুমি যে চন্দ্রিমা দেবীর খানায় অভ্যস্ত।

আলবৎ পছন্দ হবে। আমাদের ভাবিজী চন্দ্রিমা দেবীর চেয়ে ব-হু-ৎ খুবসুরত। এই বলে সে হেসে ওঠে।

ভাগ্যিস এখানে নেই চন্দ্রিমা দেবী, নইলে আজ এক কাণ্ডই হ'ত।

আবার হেসে ওঠে গুরবচন সিং।

তখন দুইজনে হাতমুখ ধুয়ে, পানমসলা খেয়ে বের হয়ে যায়।

গুরবচন বলে, খানা যেন তৈরি থাকে।

জীবন ফিসফিস ক'রে তুলসীর কানে বলে, লক্ষের এখনো অনেক বাকি থাকলো, ফিরে এসে বাকিগুলো হবে।

তুলসী বলে, না।

জীবন বলে, যাওয়ার সময় না বলতে নেই, বলো হাঁ।

তুলসীর মুখ দিয়ে হাঁ বের হ'তে গিয়ে আবার বের হয়, না।

ওরা দুজনে চলে যায়। এরা দুজনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় দেখতে থাকে।

॥ ২ ॥

"Men are we, and must grieve when even the shade
Of that which once was great, is passed away.

—Wordsworth.

লালকেল্লার নৌবৎখানার উপরে পাশাপাশি ছোট দুটো ঘর। তারই উত্তর দিককার ঘরে একাকী দাঁড়িয়ে আছেন বাদশা বাহাদুর শা। পূব দিকে দরজা, দরজার দু'পাশে দুটো জানলা, উত্তর দিকে জানলাটার সম্মুখে স্থাণুবৎ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন বন্দী, বৃদ্ধ বাহাদুর—আমীর তৈমুর বংশের শেষ বাদশা। অশীতিপর বৃদ্ধের পক্ষে কি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব? কেন নয়? বজ্রাহত হ'লেও বনস্পতি তো দাঁড়িয়েই থাকে। পরাজিত, হৃতসর্বস্ব, সিংহাসনচ্যুত বৃদ্ধ সেই নিয়মের বশেই দাঁড়িয়ে আছেন। সিংহাসনে উপবেশনে যে ব্যক্তি অভ্যস্ত, গালচে দুলচে কিংখাব গদিকেও যে-ব্যক্তি কর্কশ মনে করতো, সে যখন দেখলো একখানা দড়ির চারপায়া তার জন্যে নির্দিষ্ট—না, সত্যের অপলাপ ক'রে লাভ নেই—উপরে একখানা ছেঁড়া শতরঞ্চি ও একটা মলিন তাকিয়াও ছিল,—তখন ঐ আয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে, তাদের অস্তিত্বকে সমূলে অস্বীকার ক'রে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। সেই বেলা প্রথম প্রহর থেকে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছেন, অস্নাত এবং অভুক্ত।

ঘরের এক কোণে মাটির কলসীতে জল—ঐ গোসলখানা। আর মাটির খাপরায় দু'খানা রুটি আর একটা কি পদার্থ—ঐ হচ্ছে খানা। বাদশা ফিরেও তাকালেন না। যে দুইজন গোরা সৈনিক সঙ্গে এসেছিল, তাদের একজন এইসব আয়োজন দেখে ব'লে উঠল, বিল, এ যেন খরচ কমানোর দিকে বাড়াবাড়ি হচ্ছে। অপরজন তদুত্তরে জানালো, কি করা যাবে বলো, লড়াইয়ে অনেক খরচ হয়ে গিয়েছে, এখন তো একটু টানাটানি করতেই

হবে। অন্তত এই হচ্ছে জেনারেলের মত। তা বটে, বলে প্রশ্নকর্তা।

নিশ্চয় খরচ কমাতে হবে। কামানের মুখে গোলাবারুদ ভরতে যারা উদারহস্ত ছিল, পরাজিত বাদশার মুখে অন্ন তুলে দিতে তাদের হাত কুণ্ঠিত হবে বই কি! অর্থশাস্ত্রের এই তো নিয়ম। বাদশার দৈনন্দিন খোরাকের বরাদ্দ দুই আনা পয়সা, বেগমেরও ঐ বরাদ্দ। তিনিও আছেন কিনা পাশের কামরায়।

হঠাৎ চটকা ভেঙে যায় তোপের আওয়াজে। পুরাতন অভ্যাসের বশে একবার মনে হ'ল এ বুঝি বাদশার অভ্যর্থনা। এক, দুই, তিন, আওয়াজ হয়েই চলেছে। না, না, না, এ কোম্পানীর বিজয় ঘোষণা, প্রতিধ্বনিরূপে সাগর পার হয়ে চলে যাচ্ছে ইংলণ্ডেশ্বরীকে সম্বর্ধিত করবার উদ্দেশ্যে। মহতাব বাগের মধ্যে তালে তালে বেজে উঠল ইংরেজি বাজনা। কানে হাত দিয়ে তো থাকা যায় না, চোখ না হয় সরিয়ে নেওয়া যায়, যেমন নিয়েছেন দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাসের উপরে উড্ডীয়নান ইংরেজি নিশান থেকে। এখানে দাঁড়ালে নিশানটা চোখে পড়ে না—এই এক মস্ত সুবিধা। বাদশা ভাবেন কতই বা চোখ ফেরানো যায়, কোথায় আজ ইংরেজের নিশান না উড়ছে! দিল্লি দরবাজা দিয়ে ঢুকবার সময়ে চোখে পড়লো দরজার মাথায় ইউনিয়ন জ্যাক—চোখ ঘুরিয়ে নিলেন বাদশা। কিন্তু তারপরে শহরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, ছোটবড় সব বাড়ির মাথায়, লালকেল্লার দরজায়, প্রাচীরে, বুরুজে সর্বত্র নানা আকারের নিশান। কোথায় ছিল এত নিশান। তারপরে এই তোপের আওয়াজ, ব্যাণ্ডের বাজনা। নিরুপায় অসহায় বৃদ্ধ অনিবার্যের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

এখন কত কথাই না মনে পড়ছে। অনেক রাত হয়ে গেল হুমায়ুন শার কবরে পৌঁছতে। মাঝখানে একটা দিন নিরাপদে অতিবাহিত না হ'তেই পরদিন ভোরবেলা খবর পৌঁছলো কোম্পানীর পণ্টন আসছে বন্দী করতে। তখন কতজনে কত রকম পরামর্শই না দিল। কেউ বলল, যমুনা পার হয়ে চলে যেতে, কেউ বলল, হাউজখাসে গিয়ে আশ্রয় নিতে। কেউ বলল, আরও দূরে যেতে—মেহরৌলিতে বা আদিলাবাদে। না, না, আর হন্যে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াতে পারা যায় না, সে শক্তি নেই। হাঁ, তেমন ক'রে অসম্ভবের রস দোহনের আশায় ঘুরে বেড়ানো যায়—যেমন ঘুরে বেড়িয়ে-ছিলেন একসময় বাদশা হুমায়ুন নিজে—যদি বয়স থাকে, যৌবন থাকে, সম্মুখে আশাময় ভবিষ্যৎ থাকে। বাদশার কিছুই নেই—অন্তত শান্তভাবে

নিরিবিলিতে মরবার মতো একটু ঠাঁই থাক। বন্দী বাদশা লালকেল্লায় ফিরে এলেন, ভাবলেন, আর একবার খোয়াবগায় গিয়ে শুতে পারবেন, মহতাব বাগে বেড়াতে পারবেন, শাঁবন মহলে ব'সে বুলবুল-ই-হুজার দস্তাঁর গান শুনতে পারবেন আর অবশেষে একদিন জীবন শেষ হয়ে এলে বাদশাহের স্মৃতি-বিজড়িত দৃশ্যের উপরে চোখ রেখে চোখ বুজতে পারবেন।

কিন্তু স্থান হ'ল কিনা নৌবৎখানার উপরে! পাশাপাশি দুই কামরায় শুধু বাদশা আর বেগম। নেই একজন বাঁদী, নেই একজন খানসামা। আর যখন মনে পড়ে যায় যে, অত আদরের পোষা বুলবুলিটাও কাছে ঘেঁষলো না, যাওয়ার সময়েও ঘেঁষে নি, ফিরবার পরেও ঘেঁষলো না—তখন সমস্ত দুঃখ একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসে পরিণত হয়ে বের হয়ে ঊর্ধ্বে উঠে যায় খোদার পায়ে আরজি জানাতে,—প্রভু, বেইমানির অভিশাপ থেকে জীবজগৎকে মুক্ত করো, আর যে দোষ থাকে থাকুক—এ দোষ অসহ্য।

ঐ তো পাখির গান উঠেছে মহতাব বাগের গাছপালার মধ্যে—ওর মধ্যে নিশ্চয় বুলবুলিটার কণ্ঠও আছে। সেই সুরের জটিল জটা ছাড়িয়ে বুলবুলিটার কণ্ঠস্বর আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন তন্ময় বাদশা, ধরি ধরি ক'রেও ধরতে পারেন না, তখন আবার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

এমন সময়ে চোখ পড়ে লালকেল্লার চিরপরিচিত ইমারতগুলোর দিকে। কই এমন ক'রে তো আগে চোখে পড়ে নি। কেমন ক'রে পড়বে, এখানে উঠে কখনো দেখা হয় নি। সন্ধ্যাসূর্যের আভায় সমস্ত কেল্লাটা অতিকায় একখানা চুনির মতো জলতে থাকে। বর্মা মুলুকের উজ্জল লাল চুনি, যেমন একখানা তাঁর আঙটিতে ছিল, যেটা গিয়েছে সিপাহীদের দাবি মেটাতে।

ধীরে ধীরে উজ্জল আভায় একপোঁচ ক'রে কালো মেশে, একখানা ক'রে পাতলা মলমলের পর্দা পড়ে; যমুনার ওপার থেকে দলে দলে হাঁস উড়ে চলে যায় মাথার উপর দিয়ে—পাখা দিয়ে রচনা ক'রে তোলে শব্দের তোরণ, ঠিক মাথার উপরে তার শিখাটা। বেশ ঝাপসা হয়ে এসেছে সমস্ত কিছু। এ আর যেন জীবন্ত লালকেল্লা নয়, তার অশরীরী প্রেত।

ঐ উপমায় মনের মধ্যে জেগে ওঠে লালকেল্লার সুদীর্ঘ দুঃখের ইতিহাস। বৃথাই এর নামকরণ হয়েছিল কিল্লা-ই-লা-মুবারক, ইতিহাস পর্বে পর্বে প্রমাণ করে দিয়েছে এ হচ্ছে কিল্লা-ই-লা-মুবারক। শাহ্‌জাহান বাদশা এ কেল্লা গড়লেন কিন্তু বাস করতে পারলেন না এখানে। বাদশা আলমগীর অনেক-গুলো ভায়ের রক্ত পার হয়ে এসে পৌছলেন এখানে, কিন্তু বছর পনেরো না

যেতেই সেই যে দক্ষিণ যাত্রা করলেন আর ফিরতে পারলেন না লালকেল্লায়। তারপর থেকে তো দুর্ভাগ্যের চাঁদমারি হয়ে বিরাজ করছে এই কেল্লা! তিন-তিনজন বাদশা এখানে খুন হয়েছে। একে নাদির শা লুটেছে, আহম্মদ শা লুটেছে, জাঠে লুটেছে, মারাঠায় লুটেছে, আফগান রোহিলা পাঠানে লুটেছে। আর আজ দরিয়াগঞ্জ হয়ে আসবার সময়ে স্বচক্ষে তিনি দেখেছেন, দুইজন গোরা সেপাই লুটের মাল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হচ্ছে! এ হচ্ছে কিল্লা-ই-লা-মুবারক। মোগল বাদশাহীর কবর, বাদশাহীকা মকবারা। প্রথম দৃষ্টির বিস্ময় আর শেষ দৃষ্টির অতৃপ্তি নিয়ে বাদশা তাকিয়ে থাকেন অন্ধকারে বিলীয়মান লালকেল্লার দিকে।

ঘর অন্ধকার, আলো জ্বালবার আয়োজন নেই; প্রয়োজন নেই, খরচ কমাতে হবে, লড়াই করতে অনেক খরচ হয়েছে কিনা। বাদশা ভাবেন ভালই হ'ল, নিজের কাছ থেকে লুকোবার এই তো সুযোগ। বাদশা নেই, বাদশাহী নেই, বাদশাহের রাজগী নেই, অন্ধকারের স্নেহময় পর্দা ঢেকে দিয়েছে সব লজ্জা, সব দুর্ভাগ্য, সমস্ত ভবিষ্যৎ। ধন্য, ধন্য অন্ধকার!

॥ ৩ ॥

"তুই একদিন কোম্পানীর গুলীতেই মরবি"

কর্নেল হডসন মেজর ম্যাকডুয়েলকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে যায় হুমায়ুন শার কবরের দিকে, সঙ্গে থাকে একশ' গোরা ও দেশী সিপাহী আর রেসালাদার দুইজন, জীবনলাল ও গুরবচন সিং। শাহ্‌জাহানাবাদ থেকে হুমায়ুনের কবর পাঁচ মাইল পথ।

হডসন যখন সদলে সেখানে পৌছল তখন অনেকক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, কাজেই ভোর হওয়ার আশায় তাদের অপেক্ষা ক'রে থাকতে হ'ল। আজকের দিনে হুমায়ুনের কবর জনশূন্য পুরী, জনকতক রক্ষক ও ভিক্ষুক ছাড়া সেখানে আর কেউ থাকে না, দিনের বেলায় ভিড় জমায় কৌতুহলী দর্শক। তখনকার দিনে এ অঞ্চল একটি জনপদ ছিল। কবরের চারদিকে যে অসংখ্য কক্ষশ্রেণী আছে নানা রকম লোকে সে-সব পূর্ণ ছিল। চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত পুরীর বড় দরজা বন্ধ ক'রে দিলে এটি একটি কেল্লার আকার ধারণ করতো।

হডসন আগের দিন গিয়ে বাদশা ও বেগমকে এখান থেকেই বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল লালকেল্লায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পাঁচ-সাত হাজার অনুচর ও অনুরাগী থাকা সত্ত্বেও কেউ আপত্তি করে নি, বাধা দেয় নি। আজ আবার হডসন ফিরে এসেছে শাহ্‌জাদাদের তিনজনকে—মীর্জা মুঘল, মীর্জা খিজির সুলতান ও মীর্জা আবুবকরকে বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে। দিল্লিতে শ্বেতকায় নরনারীকে হত্যার এরাই নাকি নায়ক ও প্রধান উদ্যোক্তা। তবে ভোর না হওয়া অবধি অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

অবশেষে ভোর হ'ল। হডসনের চিন্তা—নিরুপদ্রবে শাহ্‌জাদাদের বন্দী করা যাবে কিনা। অবশ্য বাদশাকে অবাধে বন্দী করবার ফলে তার সাহস বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনি মনে পড়ে বাদশা বৃদ্ধ ও স্থবির, এরা যুবক ও উদ্যমী—যদি বাধা দেয়, ইচ্ছা করলেই দিতে পারে। রজব আলি জানিয়েছিল হাজার তিনেক সিপাহী আছে এদের সঙ্গে। হডসন ভাবে, বাধা দিলে একশ' সিপাহী নিয়ে কিছুই করতে পারবে না, তখন দিল্লি থেকে ফৌজ ও তোপ আনাতে হবে, ইত্যবসরে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়বে। তবে ভরসার মধ্যে এই যে, পরাজিত হওয়ায় এখন আর তেমন উৎসাহ না থাকতেও পারে তাদের। তা ছাড়া এখন আর ফিরবার বা ভাববার সময় নেই। সাহসে ভর ক'রে হডসন এত্তেলা পাঠায় শাহ্‌জাদাদের কাছে।

অনেকবার দূত চালাচালি হ'ল। শাহ্‌জাদারা জীবনরক্ষার শর্ত চায়, হডসন বলে, সে ক্ষমতা তার নেই, বিচারে যা হয় হবে। হডসন যখন আশা পরিত্যাগ করেছে, তখন দেখতে পেল, শাহ্‌জাদারা তিনজন এসে উপস্থিত হয়েছে, পিছনে প্রকাণ্ড শাহী বলদে টানা গাড়ি। হডসনের হুকুমে তারা গাড়িতে চাপলে সৈন্য দিয়ে ঘেরাও ক'রে নিয়ে রওনা হ'ল শাহ্‌জাহানাবাদ বলে। সেখানে বেশ কয়েক হাজার লোক জমায়েত হয়েছিল, কেউ আপত্তি করলো না, কেউ বাধা দিল না, একটাও গুলী ছুঁড়বার কথা কেউ ভাবল না। এতখানি সৌভাগ্য আশা করতে পারে নি কর্নেল হডসন।

পাঁচ মাইল দীর্ঘ পথে কোথাও দেখা গেল না বাধা দেওয়ার লক্ষণ। কেউ কেউ শুধালো, কে যায়?—কেউ কেউ সেটুকু ঔৎসুক্যও প্রকাশ করলো না, অনেকেই গোরা সিপাহী দেখতে পেয়ে মানে মানে দূরে সরে গেল। অবশেষে ক্ষুদ্র বাহিনীটি এসে পৌঁছলো শহর শাহ্‌জাহানাবাদের দিল্লি দরবাজায়। দরজা দিয়ে হডসনের ফৌজ ঢুকলো শহরে, সঙ্গে শাহ্‌জাদাদের গাড়ি। তখন হডসন হুকুম করলো জীবনলাল ও গুরবচনকে, শাহ্‌জাদাদের গাড়ি থেকে

নামাতে। কেন—কেউ বুঝতে পারলো না, তারা দুজনে গিয়ে নামালো শাহ্‌জাদাদের। শাহ্‌জাদারা গাড়ি থেকে নামতেই অতর্কিতে হডসন পিস্তল বের ক'রে গুলী ছুঁড়লো।

হাঁ হাঁ কর্নেল, করো কি, করো কি, বলে এগিয়ে যেতেই প্রথম গুলীতেই নিহত হয়ে জীবনলাল মাটিতে পড়ে গেল। সেদিকে দৃক্‌পাত মাত্র না ক'রে পর পর তিন গুলীতে হডসন হত্যা করলো তিন শাহ্‌জাদাকে।

জীবনলাল ভাই—বলে গুরবচন গিয়ে পড়লো তার বুকের উপরে। অন্তিম নিশ্বাসের সঙ্গে সে জানালো, তুলসীকে খবরটা দিয়ো। তারপরে সব শেষ।

হডসনের হুকুমে শাহ্‌জাদাদের মৃতদেহ সেখানে ঐভাবে পড়ে রইলো, সরাতে পারবে না, স্পর্শ করতে পারবে না কেউ—অবহেলিত হয়ে পথের উপরে পড়ে থেকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বিদ্রোহীদের পরিণামের। লোক-শিক্ষার জন্যই নাকি বিশেষ প্রয়োজন এই ব্যবস্থার।

জীবনলালের দেহ সরিয়ে নেবার প্রার্থনা জানালো গুরবচন। হডসন একটু ভেবে বলল, না, ও-ও পড়ে থাক। বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ ব্যক্তির পরিণাম হিসাবেই বোধ করি এই দৃষ্টান্তটির প্রয়োজন। নিরুপায় গুরবচন চললো ব্রিজমানের কাছে দরবার করতে, ভাবলো, আগে এই জরুরী কাজটা সেরে নিই তারপরে তুলসীবাঈকে সংবাদ দিলেই হবে।

মৃতদেহ ক'টা পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে চারজন গোরা সৈন্য সেখানে বসে থেকে Rum টানতে লাগলো। তাদের উপরে কড়া হুকুম, কেউ যেন কোনরকমে সহানুভূতি প্রকাশ না করতে পারে মৃতদের প্রতি। আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় রোদনকে বিদ্রোহের অঙ্গ বলে গণ্য ক'রে থাকে প্রবল পক্ষ। এই ক'দিনেই শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল শূন্যপ্রায় দিল্লি নগরীর, তাই বলা বাহুল্য, কেউ ঘেঁবলো না ওদিকে। কেবল চারটি মৃতদেহের পাশে চারজন মত্ত ইংরেজ সৈনিক ব'সে ব'সে অশ্লীল গান গাইতে লাগলো।

রুমালী ফিরে এল। পল্টনের মৃত্যুর পরে দিল্লি ছেড়ে সে দক্ষিণদিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে চিন্তা করে নি, চিন্তা করবার শক্তি তার ছিল না, মন অসাড়, কেবল দেহটাই চলছে। দিল্লি ছেড়ে বের হ'তেই প্রথমে পড়লো ফিরুজাবাদ, তারপরে পুরানা কিল্লা, তারপরে আরব সরাই। খররৌদ্রে পা আর চলে না, তবু চলা ছাড়া আর উপায় নেই। হাতের ছোট্ট পুঁটুলিটা তার বোধ হ'তে শুরু করেছে, কিন্তু

সেটা ফেলে দেওয়ার মতো উত্তমটুকুও হ'ল না। এ পথটায় লোকের চলাচল বেশি, লোকের সঙ্গ আদৌ তার ভাল লাগছিল না। তাই নিজামুদ্দিন পর্যন্ত এসে পশ্চিমদিকে রওনা হ'ল, সম্মুখেই সফদরজঙ্। একটা গাছের ছায়ায় খানিকটা বিশ্রাম ক'রে নিয়ে আবার রওনা হ'ল দক্ষিণ দিকে। পথের দু'দিকে ইতিহাসের শ্মশান,—সিরি, জাহানপনা, হাউজ খাস, লালকোট। অবশেষে সন্ধ্যার সময়ে মেহরৌলি এসে পৌছল। সন্ধ্যা আসন্ন। একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্যে বসলো। ব'সে পড়তেই ইচ্ছা হ'ল একবার গড়িয়ে নেবে। তারপরে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না, একেবারে জাগলো ভোরবেলায়। ভোরবেলা জেগে উঠে শরীরটা সুস্থ বোধ হ'ল। শরীরে শক্তি পেতেই মনে আশার সঞ্চার হ'ল, আশার সঙ্গে ফিরে এলো উদ্যম। ভাবলো, এ কি করছে সে! তবে কি সে সত্যি হার মানলো, জীবনকে তুলসীর হাতে তুলে দিয়ে সত্যি কি আজ সে পলায়ন করছে! জন্মে হার মানে নি, আজ কি হার মানবে সে? না, না, না। এমন ভাবে পালিয়ে চলে যাবে না, জীবনে হোক মৃত্যুতে হোক, মিলিত হবেই সে জীবনলালের সঙ্গে। যেখানে জীবনলাল সেখানে রুমালী, কাছে ঘেঁষতে পাবে না তুলসী। তখনি আবার ফিরে চললো দিল্লির দিকে—পলায়নের এই পথটুকু স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারলে সে বাঁচে।

দিল্লি দরবাজার কাছে পৌছতে বিকেল হয়ে গেল। দেখলো ঢুকবার হুকুম নেই। একজনকে শুধিয়ে জানলো যে, শাহ্‌জাদাদের মৃতদেহ পড়ে আছে, তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু দিল্লিতে অবশ্যই ঢুকতে হবে, ঘুরে যেতে হ'লে অনেক সময় লাগবে, হয়তো বা সে-সব দরবাজাতেও কড়া পাহারা আছে। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে খানিকটা পশ্চিমে এসে তুর্কমান দরবাজায় পৌছলো, দেখলো পাহারা নেই। তখন সে তুর্কমান দরবাজার সিঁড়ি দিয়ে প্রাচীরের উপরে উঠল। শাহ্‌জাদাদের মৃতদেহগুলো কি অবস্থায় আছে দেখবার কৌতূহল অনুভব করছিল। ভাবলো, তার একমাত্র উপায় প্রাচীরের উপর দিয়ে দিল্লি দরবাজায় পৌছানো, একবার দেখে ফিরে এলেই হবে। তখন সে প্রাচীর বরাবর রওনা হ'ল, আসন্ন সন্ধ্যায় কেউ তাকে লক্ষ্য করলো না। দিল্লি দরবাজার ঠিক পশ্চিম দিকেই একটা বুরুজ, সেখানে দাঁড়ালে নিচে সব দেখতে পাওয়া যায়। বুরুজের আল্‌সেতে ভর দিয়ে দেখল, যা শুনেছিল তা মিথ্যে নয়, পাশাপাশি চারটে মৃতদেহ শায়িত। কিন্তু এ চতুর্থ দেহ কার? এ যে জীবনলালের! চোখের ভুল নয় তো! চোখের

ভুল হ'লেও হ'তে পারে, মনের ভুল অসম্ভব! জীবনলাল, জীবনলাল, এ যে তার জীবনলাল! বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্য তার সংজ্ঞালোপ হয়েছিল, আলসের আশ্রয় না পেলে নিচে প'ড়ে যেত। সংজ্ঞা ফিরে এলো, কিন্তু কই, দুঃখ তো অনুভব করলো না। কেন? তুলসী তাকে পাবে না এই শুভ্র আনন্দেই কি! কিংবা, দুঃখের প্রচণ্ডতা এমন এক অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছিল যখন আর দুঃখ অনুভব করবার শক্তি ছিল না—সেই জন্যেই? কিছু বুঝতে পারে না সে। তার না পড়লো এক ফোঁটা চোখের জল, না পড়ল একটা দীর্ঘশ্বাস। কেবল সঙ্কল্প করলো তাকেও মরতে হবে, জীবনলালকে একা যাত্রা করতে দেবে না অজ্ঞাত দীর্ঘপথে। উপায়? উপায় তো সম্মুখেই ইংরেজের নিশানরূপে উড্ডীয়মান। সে জানতো ঐ নিশান খুলে ফেলতে গেলেই তাকে গুলী ক'রে মারবে। তখন সে অবিচলিত পদে রওনা হ'ল দিল্লি দরবাজার উপরে প্রোথিত নিশান লক্ষ্য ক'রে, সঙ্গে সঙ্গে গাইতে শুরু করলো জীবনলালের মুখে শোনা সেই গানটি—

"জব ছোড় চলে লখনৌ নগরী
তব হালে আলি পর ক্যা গুজরী।
মহল মহল মে বেগম রোয়ে
জব হাম গুজরে দুনিয়া গুজরী।"

প্রথমটায় লক্ষ্য করে নি গোরা সৈনিকরা, তারা নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল। তারপর হঠাৎ একজন দেখতে পেলো রুমালীকে, অপরজনকে কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে দেখালো—Just see, what a fine sight!

তখন চারজনেরই নেশা ছুটে গেল। তারা একযোগে হল্লা ক'রে উঠল, শিস দিল, অশ্লীল গান ধরলো।

কোনদিকে দৃক্‌পাত, কর্ণপাত না ক'রে এগিয়ে চলল রুমালী—"জব ছোড় চলে লখনৌ নগরী"। অবশেষে গিয়ে ধরলো নিশানের দণ্ড। এতক্ষণ গোরা সৈনিকরা বুঝতে পারে নি মেয়েটা কি করতে চায়, এবারে বুঝলো যে, নিশান খুলে ফেলাই তার উদ্দেশ্য। অমনি চারটে গুলী নিক্ষিপ্ত হ'ল। তখনি রুমালীর মৃতদেহ আর সেই সঙ্গে দেহের ভারে উৎপাটিত নিশানখানা নিচে এসে জীবনলালের বুকের উপরে পড়লো। জীবিত না হোক—মৃত অবস্থায় রুমালীর মিলন ঘটলো জীবনলালের সঙ্গে। সৈনিক চারজন আবার Rum টেনে বুঁদ হয়ে ব'সে রইলো।

তখন রাত বোধহয় এক প্রহর হবে। ঘনান্ধকার করাতের মতো বিদীর্ণ ক'রে একটা কর্কশ করুণ উৎকট অপার্থিব আর্তনাদ ধ্বনিত হ'ল। নেশা ছুটে গিয়ে সৈনিকেরা শিউরে উঠলো। কে কাঁদে? কে শোক প্রকাশ করে মৃত বিদ্রোহীদের জন্যে? অন্ধকার এমন নিরেট যে দশ হাত দূরের বস্তুও চোখে পড়ে না, অথচ আর্তনাদ তো উঠছে মৃতদেহের কাছ থেকেই। তখন তারা চারজন একসঙ্গে রওনা হ'ল, মৃতদেহগুলোর কাছে এসে ঠাহর ক'রে দেখতে পেলো একটা মৃতদেহের শিয়রে ব'সে কি একটা কিম্ভূত জীব আর্তনাদ করছে। সেটা মানুষও নয়, জানোয়ারও নয়, দু'য়ে মেশানো কি একটা জন্তু। তাদের সাহস হ'ল না তাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছোঁড়ে। ভাবলো ডাকছে ডাকুক গে, মানুষ হ'লে না হয় গুলী করতো। তারা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ফিরে এসে আবার Rum-এর বোতল খুললো। আর ওদিকে সেই উৎকট আর্তনাদ শূন্যতাকে চিরে চিরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েই চলল।

॥ ৪ ॥

"সে যে আসে, আসে, আসে।"

সেরাত্রে দিল্লির অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর। পথে পথিক নেই কেবল মৃতদেহ, গৃহে জীবিত নেই কেবল হতাহত, পল্লীতে স্বাভাবিক শব্দ নেই কেবল আর্তনাদ। ধনীর প্রাসাদে ধন নেই কেবল লুণ্ঠনাবশেষ, আর ছোটবড় কোন দোকানে পণ্য নেই, কেবল ভস্মাবশেষ। কোথাও দীপে শিখা নেই, উনুনে অগ্নি নেই, চারিদিক নিস্তব্ধ, নির্জন, অন্ধকারে আচ্ছন্ন। জনশূন্য পল্লীতে যদি কোথাও মনুষ্য থাকে তবে তারা প্রচ্ছন্ন, ক্ষুধিত শিশু আজ মাতৃস্তন আকর্ষণে বিরত। অধিক কি, মৃত জননীর স্তন আকর্ষণে অপ্রাপ্তদুগ্ধ শিশুটিও আজ ক্রন্দনে অসমর্থ। শব্দের মধ্যে, প্রাণের চিহ্নের মধ্যে কেবল বিজাতীয় কণ্ঠের হুঁশিয়ারি, ভারি জুতোর গটমট, কামানের গাড়ির গড়গড় আর মাঝে মাঝে বন্দুকের দুম দুম। একটা অতিকায় শকুন যেন শহর শাহ্‌জাহানাবাদের মৃতদেহটার উপরে উপবিষ্ট।

দুঃখ যতই নিরেট হোক নীরন্ধ্র নয়, ওরই মধ্যে কোথা দিয়ে আলোর রশ্মি প্রবেশ করে। দিল্লি শহরের এই তো অবস্থা, তার উপরে তুলসীদের বাড়িতেও দুঃখের ঢেউ কিছু কম লাগে নি। পণ্ডিতজী শোচনীয় অবস্থার মধ্যে নিহত হ'ল, নয়নচাঁদ নিখোঁজ। তবু আজ অনেকদিন পরে তুলসীর

মুখে হাসি ফুটেছে। প্রেম বড় স্বার্থপর। ভোর হ'তে না হ'তে তার মনে হ'ল আজ জীবন আসবে। পান্না তার মুখ দেখে বলল, কি, হাসি ফুটেছে? তুলসী বলল, হাসলাম কোথায়? পান্না তার মুখ দেখে বলল, তোমার চোখ হাসছে, চোখের ভুরু হাসছে, গালের আভা হাসছে। কে বলল তুমি হাসছ? আর হাসলেই বা, অপরাধ তো করো নি।

এমনিভাবে আরম্ভ হয় দু'জনের দিনমান। দু'জনে অভ্যস্ত গৃহকাজ ক'রে যায়। তুলসী ভাবে আজ যেন বেলা এগোতেই চাইছে না, জীবন বলেছিল সন্ধ্যায় আসবে কিনা। পান্না আচমকা বলে বসল, কি গো তুলসীরাণী, দিন বুঝি যেতে চাইছে না?

আমি কি তাই ভেবেছি! বলল বটে—কিন্তু ভাবলো পান্না কি জানি মনের কথা বুঝলো কেমন ক'রে!

দুপুরবেলার পরে অসহায় তুলসী এসে আত্মসমর্পণ করলো পান্নার কাছে, কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল, দিদি, তিনি এখনো কেন আসছেন না?

শোন মেয়ের কথা। আমার ভাই রঈস আদমি নয় যে যখন খুশী আসবে, আমার ভাই লড়িয়ে পল্টন। হাতের কাজটুকু না মিটিয়ে আসে কি ক'রে?

যদি কিছু অমঙ্গল হয় তাঁর?

নাও, একবার বোকা মেয়ের কথা শোন। লড়াই কোথায়, যে অমঙ্গল হবে?

লড়াই যদি না থাকে তবে বিলম্ব হচ্ছে কেন?

লড়াই না থাকলেও চড়াই থাকতে পারে, মনে আছে তো জীবনের কথা। তার চেয়ে এসো বোন দু'জনে গোছগাছ করি, নিষ্কর্মার সময় যেতে চায় না। এসো আল্‌পনা দেওয়া যাক।

আবার আল্‌পনা কেন? আপত্তি করে তুলসী।

কেন নয়? লড়াই ফতে ক'রে আমার ভাই আসবে আর আল্‌পনা হবে না ঘরে!

তখন দু'জনে আল্‌পনা দেয়। ঘরের মেঝে দেখতে দেখতে শঙ্খ-পদ্ম-লতাপাতায় ভরে ওঠে।

এসো তুলসী, এই পিঁড়িখানাতে নকশা তোলা যাক।

দেখতে দেখতে পিঁড়িখানা অলংকৃত হয়ে ওঠে।

এসো এবারে বাড়িতে ঢুকবার সিঁড়িতে।

সেখানেও আল্‌পনা ঝলমল ক'রে ওঠে। তুলসী গোড়াতে আপত্তি

করলেও দেখা গেল শেষ পর্যন্ত তার উৎসাহটাই প্রবলতর। মুখে বলে যথেষ্ট হয়েছে, তবু হাত কামাই দেয় না।

তারপরে দু'জনে রান্নাঘরে ঢুকে ভূতি বুড়ীকে সরিয়ে দিল, বলল, আজ তোমার ছুটি। তখন সেই দুঃসময়ে যতটুকু যা সম্ভব আহার্য তৈরি করলো। বাসমতী চালের অন্ন, ছোলার ডাল, গোটাদুই তরকারী আর ঘরের গোরুর দুধে পায়েস। তা ছাড়া ঘি তো ছিলই।

রান্না হয়ে গেলে সব ঢেকেঢুকে রেখে পান্না বলল, এবারে আসল কাজটাই বাকী।

কি আবার বাকী থাকলো দিদি!

আমার ভাই কি আসবে এই ঘুঁটে-কুড়ুনীকে দেখতে?

যে যেমন ভাগ্য করেছে।

ভাগ্য আমার ভাইয়ের ভালই, নাও, কোথায় বেনারসী আছে বের করো।

তুলসীর আপত্তি শুনলো না, বেনারসী শাড়িতে, অলঙ্কারে তাকে সাজিয়ে দিল পান্না। তারপরে চুল বেঁধে দিয়ে কপালে গালে চন্দনের পত্রলেখা এঁকে দিল। তারপরে উঠোনের বেলফুলের গাছ থেকে ফুল তুলে মালা গেঁথে পরিয়ে দিল তার খোঁপায়। আগেই বেঁধে দিয়েছিল পৈঁচিফাস খোঁপা। তারপরে বলল, নাও, এবারে আয়নায় গিয়ে একবার ছাখো, আমার ভাইয়ের ভাগ্য ভালো কি মন্দ।

তারপরে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পান্না বলল, জীবনলালের মাথাটা না ঘুরে যায়।

হঠাৎ কাঁদো কাঁদো সুরে তুলসী ব'লে ওঠে, দিদি, সন্ধ্যা হয়ে গেল, এখনো যে আসছেন না।

পান্না তার গালে ছোট্ট একটি টোকা মেরে বলল, আ ম'ল যা, তোমাকে নিয়ে গল্প করা ছাড়া তার যেন আর কাজ নেই। জানো, কত বড় সেপাই আমার ভাই, একেবারে রেসালাদার মেজর।

তা হ'লে একটা গান করো, সময় কাটবে।

বেশ, কি গান করবো বলো।

ঠাকুর-দেবতার গান।

না ভাই, ঠাকুর-দেবতার গান নয়।

কেন?

ঠাকুর-দেবতারা কি মানুষের দুঃখ বোঝে ?

তবে ?

মানুষের গান গাই। মানুষের মানুষ ছাড়া আর কে আছে ?

কথাটা ভালো লাগে না তুলসীর, তবু আপত্তি করে না, মৃদুস্বরে বলে, তবে তাই গাও।

নাও শোন একটা বাংলা গান।

বাংলা গানও জানো নাকি ?

পান্নাবাঈকে সব রকম গানই জানতে হয়।

তাই ব'লে বাংলা গান শিখলে কোথায় ?

বেরিলিতে কোম্পানীর পল্টন ছাউনির খাজাঞ্চি ছিল দুর্গাদাসবাবু। আমার আসরে আসতো গান শুনতে। তারই কাছে শিখে নিয়েছিলাম, লোকটির খাসা গলা !

তবে গাও শুনি।

হাঁ, শোন আর ছাখো মনের সঙ্গে মেলে কিনা।

"মনে রইলো সই মনের বেদনা,
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলা হ'ল না।
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।"

তুলসী শোনে আর ভাবে, এ যে তারই মনের কথা, কেমন ক'রে জানলো কবি ? সত্যি তো তার বলবার ইচ্ছা ছিল, হাঁ, তবু কিনা পোড়ামুখ দিয়ে বের হয়ে গেল, না। ভাবে এবারে এলে আর মনেমুখে আলাদা হবে না। লক্ষের যা বাকী আছে তিনি যেন তা পুরিয়ে নেন, এতটুকু আপত্তি করবে না সে।

পান্না গেয়ে চলে—

"যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে।
নির্লজ্জা রমণী ব'লে হাসিত লোকে।
সখী ধিক আমারে, ধিক সে বিধাতারে
নারী জনম যেন করে না।"

আঃ, নিশ্চয় কবি জানত। এ যে তারই মনের কথা। যখন তিনি একটি চুম্বন প্রার্থনা করেছিলেন দেহ রাজী হয় নি, কিন্তু মন ব'লে উঠেছিল, প্রভু, প্রিয় শুধু একটি কেন, লক্ষ লক্ষ জন্ম তোমার বক্ষে লিপ্ত থেকে চুম্বন করলেও যে আকাঙ্ক্ষা দূর হবে না। কিন্তু তা যে পারি না, সে আমার অপরাধ

নয় প্রভু, আমার নারীজন্মের অপরাধ। তার চেয়ে তুমি চুম্বন বর্ষণ ক'রে আমাকে মেরে ফেলে দাও প্রিয়, আমার নারী-জন্মের জ্বালা দূর হোক।

অবশেষে এক সময়ে গান শেষ হয়ে যায়। রাত বোধ হয় এক প্রহর। কেন আসেন না তিনি? কেন আসে না জীবন? ভাবে দুজনে।

ঘরের মধ্যে আর ব'সে থাকতে পারে না তারা। আস্তে আস্তে সদর দরজা খুলে দুজনে সিঁড়ির উপরে দাঁড়ায়। সম্মুখে পাশে যে দিকে তাকায় অন্ধকারের ঘেরাটোপ মুড়ি দেওয়া শহর। সময়ের স্রোত যেন চলতে চলতে একটা দহের মধ্যে পড়ে আটকে রয়েছে। গলির মোড় পর্যন্ত অনেকটা পথ দেখা যায় - কেউ কোথাও নেই। এমন নিস্তব্ধতায় পায়ের শব্দ চাপা থাকবে না আশা ক'রে দুজনে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করে। হঠাৎ তাদের কানে ঢোকে উৎকট বিকট একটা আর্তনাদ। এ যেন শব্দ নয়, শব্দের প্রেতাত্মা,— জানাশোনা কোনো শব্দের সঙ্গে তার মিল নেই। অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠে দুজনে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়ায়। এমন সময়ে গলির মোড়ে বহু প্রতীক্ষিত পদশব্দটি ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

কর্নেল ব্রিজম্যানকে খুঁজে বের করতে বিলম্ব হ'ল গুরবচনের। আনুপূর্বিক সব জানিয়ে রাতটার ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিল গুরবচন, তার পরে চলল ফুলকি-মণ্ডীর দিকে। গলির মোড়ে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাবলো, অনেকবার চোখের জল মুছলো, তারপরে মনটাকে পাথরে পরিণত ক'রে ঢুকে পড়লো গলির মধ্যে।

এবারে তুলসী আর পান্না পদশব্দ শোনার সঙ্গে দেখতে পায় একটি মনুষ্যমূর্তির খসড়া। দুজনে আনন্দে উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। 'জীবন' ব'লে ডাকতে যাচ্ছিল পান্না, তুলসী মুখ চেপে ধরলো। পান্নার কণ্ঠ আগে তার কানে প্রবেশ করবে, এ তুলসীর অসহ্য। দুজনের প্রতীক্ষা আর বাঁধ মানতে চায় না। পদশব্দ ও মনুষ্যমূর্তি ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে।

—শেষ—